আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা

াংবাদিক ও 'কলামনিষ্ট'
সেবে খ্যাত আবদুল
ফ্ফার চৌধুরী মূলতঃ
াহিত্যিক। ইতিপূর্বে
কাশিত তাঁর বইগুলোর
ধ্যে রয়েছে: 'চন্দ্র দ্বীপের
পাখ্যান', 'নাম-না জানা
োর', 'নীল যমুনা', 'শেষ
জনীর চাঁদ', 'সম্রাটের ছবি',
ুন্দর হে সুন্দর', 'বাংলাদেশ
থা কয়' (সম্পাদনা)।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর
ৃতিচারণমূলক বই "ধীরে
হে বুড়িগঙ্গা" তিন খন্ডে
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও
তৃতীয় খন্ডের শিরোনাম
যথাক্রমে "স্মৃতির বন্দরে
ফিরে আসা" ও "বন্দরের
কাল হলো শেষ"। এই বই
গুলিতে তিনি চল্লিশের,
পঞ্চাশের ও ষাটের
দশকের বাংলাদেশের
রাজনৈতিক ও সামাজিক
বাস্তবতা সম্পর্কে অনবদ্য ছবি
এঁকেছেন। "ধীরে বহে
বুড়িগঙ্গা"র এই সংস্করণটি
সম্পূর্ন এক খন্ডে প্রকাশিত
হলো।

তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহের মধ্যে
রয়েছে "মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন
ও সওগাত যুগ", "কাছে ও
দূরে","বাংলাদেশ: বামপন্থি
রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা",
"আমরা বাংলাদেশী না
বাঙ্গালী?"

ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা

(তিন খণ্ডে সমাপ্ত)

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

জ্যোৎস্না পাবলিশার্স
ঢাকা

ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

প্রকাশক

স্বপন দত্ত

জ্যোৎস্না পাবলিশার্স

১২/১৩ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

©

লেখক

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি ২০০০

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০০৬

প্রচ্ছদ

সুব্রত সাহা

বর্ণবিন্যাস

শাহানা কম্পিউটার

৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পেস্টিং

সাইফুল ইসলাম সাফা

মুদ্রণ

আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স

৫৭, হৃষিকেশ দাস রোড

মূল্য

তিনশত পঞ্চাশ টাকা

Dhirey Bahey Burigaunga : Abdul Gaffar Chowdhury. First published in February 2000. Second Edition : June 2006. Published by Swapan Datta. Jyotsna Publishers. 12/13, Pyaridas Road, Dhaka-1100.

Price Tk. Three hundred fifty only. U.K.£ 12.00 US$ 24.00

ISBN 984 8139 52 4

আমার মায়ের অভাব যিনি পূরণ করেছিলেন—
হালিমা খাতুনের
স্মৃতির উদ্দেশে—

তিনখণ্ডে সমাপ্ত 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা'
এবং
লেখকের কথা

আমার স্মৃতিচারণামূলক বই 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গার' তিনটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডটি 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা' নামে প্রকাশ করেন ঢাকার 'অক্ষরবৃত্ত' নামক প্রকাশনা সংস্থা। পরবর্তী দু'টি খণ্ড যথাক্রমে 'স্মৃতির বন্দরে ফিরে আসা' এবং 'বন্দরের কাল হলো শেষ' এই উপনামে প্রকাশ করেন ঢাকার আরেকটি প্রকাশনা সংস্থা জ্যোৎস্না পাবলিশার্স। এই তিনটি খণ্ডের কাহিনীগুলো যদিও খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচিত্র, তথাপি তিনটি খণ্ড একই সঙ্গে প্রকাশের জন্য কিছু পাঠক এবং প্রকাশক কিছুকাল ধরেই অনুরোধ জানিয়েছেন। এখন জ্যোৎস্না পাবলিশার্স এই তিনটি খণ্ডকে একত্রে প্রকাশের দায়িত্বটি নিয়েছেন।

আগেই বলেছি, 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা' ইতিহাস নয়, পূর্ণ আত্মকথাও নয়। খণ্ড স্মৃতিচিত্র এবং খণ্ড সমাজচিত্রও। কিন্তু আমার ধারণা, সব কাহিনীগুলো মিলিয়ে পড়লে দেশ ও সমাজের একটি বিশেষ সময়ের সামগ্রিক চিত্রের কাঠামো হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। যাহোক প্রকাশকের আগ্রহ এবং কিছু পাঠকের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা'র তিনটি খণ্ডই একত্রে প্রকাশ করা হল। পাঠকদের ভালো লাগলেই এই উদ্যোগ সার্থক হলো ভাববো।

[signature]

এজওয়ার, মিডেলসেক্স, ইংল্যান্ড
৭ জানুয়ারি, শুক্রবার, ২০০০।

সূচীপত্র

লেখকের নিবেদন

'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা' আত্মজীবনী নয়, ইতিহাসও নয়। সতেরো বছর পর বিদেশ থেকে ঢাকায় গিয়ে দেশকে দেখার খণ্ড খণ্ড ছবি। যে ছবিতে রঙ মিশেছে অতীতের কিছু স্মৃতিরও। যে স্মৃতিকে এড়িয়ে বর্তমানকে দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। খণ্ড খণ্ড ছবিগুলোকে জোড়া দিলে একটা অখণ্ড ছবি পাওয়া যেতে পারে, কোন পূর্ণাঙ্গ ছবি বা তার ধারাবাহিকতা পাওয়া যাবে না। যখন যা দেখেছি, যখন যে স্মৃতি মনে জেগেছে, তাকেই ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। এটা অতীতকে ধুঁড়িছুয়ে বর্তমানকে চেনার চেষ্টার মতো। অতীতকে একেবারে ধরে রাখা বা তুলে ধরা নয়।

'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা' এখনো লেখা শেষ হয় নি। ঢাকায় 'দৈনিক বাংলার বাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে চলছে। এটি প্রথম খণ্ড। আশা করছি, দ্বিতীয় খণ্ডও যথাসময়ে প্রকাশ হবে। অতীত ও বর্তমানের কিছু সমাজ চিত্র, কিছু চরিত্র চিত্রণের পাশাপাশি আমার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাও রয়েছে এই বইটিতে। সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন এমন অসম্ভব প্রত্যাশা করি না। তবে অনেক ভুলে যাওয়া কথা, স্মৃতি ও চরিত্র অনেকের মনেই আনন্দ ও বেদনা দুইই জাগাবে বলে আমার ধারণা।

'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা' কোনো গ্রন্থিতে বাধা কাহিনী নয়। এই কাহিনীগুলোতে রয়েছে বন্ধনহীন গ্রন্থি। পাঠকেরাও যদি সেভাবেই বইটি গ্রহণ করেন, তাহলেই খুশি হব।

এজওয়ার, মিডেলসেক্স, ইংল্যান্ড

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

এক

১৯৯৩, ২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার, রাত ন'টা।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অপেক্ষমাণ বৃটিশ এয়ার ওয়েজের দৈত্যাকার দোতলা বিমানে আরোহণ করতে গিয়ে ঢাকা শহরের দিকে আরেকবার ফিরে তাকালাম। রাত্রির নিঃসাড় অন্ধকার চারদিকে। তার মাঝে ক্ষুদ্র জোনাকির মতো বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যারা বিদায় দিতে এসেছিলেন, তারা নির্দিষ্ট গেট পর্যন্ত এসে বিদায় নিয়েছেন। প্রতিটি মুখ বিষণ্ন, চোখে পানি। এতক্ষণ পর আমার চোখেও পানি জমলো। অসুস্থ স্ত্রী এবং মেয়ে যেন তা দেখতে না পায়, সেজন্য গোপনে মুছে ফেললাম। আমার কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের স্মৃতিময় ঢাকা শহর। সতেরো বছর তাকে দেখি নি। আবার কবে দেখবো জানি না। মনে হল, বিমান বন্দরের প্রতিটি বিদ্যুৎ বাতি যেন আমার দিকে ম্লান চোখে তাকিয়ে রয়েছে। নিরুচ্চার কণ্ঠে বলছে, 'যেতে নাহি দিব।' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, 'তবু যেতে দিতে হয়।'

বিমানের সিঁড়িতে পা রাখার আগে আরেকবার রানওয়ের মাটিতে হাত ঠেকালাম। ধুলো মাখলাম কপালে। মনে মনে বললাম ঃ

"রেখো মা দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন কোর না গো
তব মন কোকনদে।"

মাত্র এক মাস। ঠিক এক মাসও নয়। ৫ জানুয়ারী ঢাকায় পৌঁছেছি। তারপর ২ ফেব্রুয়ারী ফিরে চলেছি লন্ডনে। আটাশটা দিন যেন এক রাতের স্বপ্নের মতো সহসাই শেষ হয়ে গেল। ইচ্ছে ছিল গোটা ফেব্রুয়ারী মাস দেশে কাটাবো। একুশের ভোরে প্রভাতফেরিতে সামিল হব, প্রণতি জানাব আমার কৈশোরের সেইসব শহীদদের, যারা ভাষার জন্য আত্মদান করে স্বাধীনতার পথ রক্তসূর্যে আলোকিত করে গেছেন।

কিন্তু থাকা হল না। আমার অসুস্থ স্ত্রী হঠাৎ আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উদ্বেগ ভরা দশটা দিন ঢাকার হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে যমে মানুষে সে কি টানাটানি!

ফলে স্ত্রী একটু সুস্থ হতে, এক মাস না যেতেই দেশের মাটির মায়া ছেড়ে আবার লন্ডনে পাড়ি জমাতে হল।

পঁয়ত্রিশ বছর পর গিয়েছিলাম নিজের গ্রাম বরিশালের উলানিয়ায়। রবীন্দ্রনাথের মতো আমাকে গাইতে হয় নি— বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও, ফিরায়োনা জননী......।' আমি না চাইতেই আমাকে বুকে টেনে নিয়েছে সারা গ্রাম, গ্রামের মানুষ। পঁয়ত্রিশ বছর যে গ্রামে পা রাখিনি, যে গ্রামের মানুষের খোঁজখবর রাখি নি, যে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত হয় নি, তারাই ছুটে এসেছে দলে দলে অনুযোগবিহীন কণ্ঠে স্বাগত জানাতে। ভালবাসার আলিঙ্গনে আমাকে বুকে বাঁধতে। মনে মনে বলেছি, "ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ, ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।"

নিজের গ্রামে যাব বলে ঢাকার সদরঘাটে লঞ্চে চেপেছি ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায়। আলোকোজ্জ্বল লঞ্চঘাট। জনাকীর্ণ চারদিক। সেখান থেকে শেষ রাতে মল্লিকপুরে এসে লঞ্চ থামতেই মনে হল, নিউইয়র্ক শহর থেকে যেন আফ্রিকার কোনো বন্যগ্রামে এসে নেমেছি। কোথাও এক ফোটা আলো নেই। নদী ভাঙছে। লঞ্চ থেকে নামলেই সামনে বিরাট উঁচু খাড়া পাহাড়ের মতো নদীর ভাঙা পাড়। আমার মতো বেতো পায়ের মানুষের কেন, ভালো মানুষেরও এই উৎরাইয়ে চড়া বিপজ্জনক। যারা 'গানস্ অব নাভারন' ছবি দেখেছেন, সেই উঁচু খাড়া পাহাড়ের মসৃণ খাঁজে পা রেখে, প্রাণ বাজি রেখে ক'জন মানুষকে উপরে উঠতে দেখেছেন, তাদের কাছে মল্লিকপুরের যাত্রীদের লঞ্চ থেকে নেমে ওই খাড়াই বেয়ে উপরে ওঠার দৃশ্য বর্ণনা করতে হবে না। আমি ভাগ্যবান মানুষ। ক'জন সদয় সহযাত্রী আামাকে টেনে হিঁচড়ে উপরে তুললেন। উপরে একটা চেয়ার, ও টুলবিহীন খাপড়া ঘর। ছাদ দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সামনে বাঁশের ভাঙা মাচা। এটাই নাকি ওয়েটিং রুম কাম টী স্টল। শেষ রাত। তাই স্টলের মালিক আসেন নি। আমার সঙ্গে বেশ ক'জন আত্মীয়। অনুজ কবি আসাদ চৌধুরী, তার ছেলে। আমার দু'বোন। এক আত্মীয় সালেহ মোস্তফা খালেদ। এক বয়োবৃদ্ধ চাচাতো ভাই। আমার এক বোনের ছেলে। বাঁশ বাগানের মাথার উপরে আজ চাঁদ নেই। মিটিমিটি তারা জ্বলছে। তাতে অন্ধকার কাটেনি। শীতের ভোরের কুয়াশা অন্ধকার আরও গাঢ় করে রেখেছে। সেই ভাঙা বাঁশের মাচায় ভোরের আলোর প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। কাছে ধারের এক গ্রামের যাত্রী, যিনি আমার সঙ্গেই লঞ্চ থেকে নেমেছেন, তার হাতের হ্যারিকেনটি জ্বালিয়ে মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাই, আপনার বাড়ি তো কাছেই বললেন। তাহলে যাচ্ছেন না কেন?

আধা বয়সী লোকটি বললেন, এখানে আপনারা অন্ধকারে এমনভাবে বসে থাকবেন, তা ভালো লাগল না। আমার হ্যারিকেনটি তো অন্তত আছে।

আমার হাঁটুতে ব্যথা। নইলে এই অন্ধকারেই যাত্রা করতাম। ছেলেবেলায় এই পথে কত যাতায়াত করেছি। বললাম।

লোকটি শশব্যস্তে বললেন, না, না, এই অন্ধকারে হাঁটতে যাবেন না। আপনার ছেলেবেলার সেই পথঘাট আর নেই। অন্ধকারে গাছের আড়ালে হাইজ্যাকাররা লুকিয়ে থাকে। আমরাও অন্ধকারে পথ হাঁটি না।

গ্রামে এসেও হাইজ্যাকার শব্দটি গ্রামের একজন নিরক্ষর মানুষের মুখে উচ্চারিত হতে শুনলাম। দু'শ' বছর আগে এই শব্দটিই হয়তো ছিল বর্গী। সেই যে ছড়ায় আছে না— 'খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে।' বর্গীর ভয়ে গ্রামের মানুষ রাতে ঘুমাতে পারতো না। এখন বর্গীর স্থান দখল করেছে হাইজ্যাকার। তখন ছিল অনুন্নত নওয়াবী আমল। দু'শ' বছর পর এখন স্বাধীন উন্নত গণতান্ত্রিক সরকারের আমল। থানা পুলিশ, ইলেকট্রিসিটি, ইকেট্রোনিকের আমল। কিন্তু এই দু'শ' বছরে আমরা কতটুকু এগিয়েছি? ৩০ জানুয়ারী শনিবার ভোরে ঢাকা থেকে নদীপথে মাত্র আট ঘন্টা দূরের জনপদ—মল্লিকপুরের অন্ধকার লঞ্চঘাটার ভাঙা বাঁশের বেঞ্চিতে বসে মনে হল, নওয়াবী আমল থেকে বাংলার মানুষ সামনের দিকে এক পাও এগুতে পারে নি। যে তিমিরে তারা ছিল, সেই তিমিরেই তারা রয়ে গেছে। বরং সেই তিমির আরও ঘন এবং গাঢ় হয়েছে। যা কিছু আলো, তার বিচ্ছুরণ ঘটেছে মাত্র একটি শহরকে ঘিরে। ঢাকা শহর। তার বাইরে সারা গ্রাম-বাংলা অন্ধকারে আবৃত। যাতায়াত দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। এমনটা তো আমার শৈশবে সেই বৃটিশ আমলেও দেখি নি। তাহলে এই স্বরাজ, স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মদান আমাদের কতটা এগিয়ে দিল? স্মরণে এলো নজরুলের একটি কবিতা ঃ

"বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে
আমরা তখনো বসে
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজছি
হাদিস কোরআন চষে।
ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি
বাহিরের দিকে ততো,
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি
গরু ছাগলের মতো।"

নজরুলের ভাগ্য ভালো। তিনি এখন ঢাকা শহরেই 'শায়িত শান্তির মাঝে'

পাথুরে কবরে। তার 'গরু ছাগলের হাটের' বহু বিস্তৃতি এবং নির্মম ও করুণ অবস্থা তাকে আর চোখে দেখতে হচ্ছে না।

মল্লিকপুরের কথায় ফিরে যাই। মেঘনা পারের এই জনপদটি এককালে ছিল এই অঞ্চলের একটি সমৃদ্ধ বাজার। বড় বড় দোতলা টিনের ঘরে নানা ধরনের আড়ৎ ছিল। ছিল নানা ধরনের দোকান। স্কুল ছিল। প্রতি সপ্তাহে হাট বসতো। মল্লিকপুর থেকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রশস্ত সড়ক ছিল উলানিয়া পর্যন্ত; শাখা রাস্তা ছিল হিজলা, পাতারহাট, কালিগঞ্জ বন্দর অব্দি। মাঝে মাঝেই ছিল লোহার রেলিং দেওয়া কাঠের পুল। মল্লিকপুরের পাশেই ছিল সমৃদ্ধ গৌরব্দী গ্রাম। মল্লিকপুর থেকে উলানিয়ার দূরত্ব তখন ছিল তিন কি সাড়ে তিন মাইল। শৈশবে গৌরব্দীতে আত্মীয়-বাড়ি বেড়াতে এসে এই তিন মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফেরা আমার কাছে ছিল এক আনন্দকর অভিজ্ঞতা। এখন মনে হল, তা এক নিদারুণ দুঃস্বপ্ন। যদিও মেঘনার ভাঙনে গৌরব্দী গ্রাম, মল্লিকপুর বাজারের কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই এবং এই লঞ্চঘাটা থেকে উলানিয়ার দূরত্ব এসে দাঁড়িয়েছে মাইল কি সিকি মাইলে। তবু সেই পথে হাঁটতে হবে ভেবে আমার হৃদকম্প দেখা দিল। আকাশে তখন 'ধলপহর' দেখা দিয়েছে। মোরগ 'বাগ' দিয়েছে এবং গ্রামের কোনো মসজিদ থেকে ভোরের আজানের শিহরিত সুর শীতের বাতাসে ভেসে আসছে। সেই 'ধলপহরের' আলোয় সামনে তাকিয়ে দেখি, মল্লিকপুরের বৃটিশ আমলের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা এখন শুধু নামেই রাস্তা। ওই অপ্রশস্ত, এবড়ো থেবড়ো, মাটির ভাঙা রাস্তায় দু'জন লোক পাশাপাশি হাঁটা দুষ্কর। সহযাত্রী বললেন, আগের লোহার রেলিং দেয়া কাঠেরপুল একটিও নেই। দু'তিন জায়গায় রাস্তা বন্যার পানিতে ভেঙে গেছে। সেখানে বাঁশ বিছিয়ে অস্থায়ী সাঁকো তৈরী করা হয়েছে। গ্রামের লোকেরা ওই সাঁকো নামক 'পুল সেরাত' পার হতে অভ্যস্ত; কিন্তু আমার মতো শহুরে লোক, যিনি পঁয়ত্রিশ বছর পর নিজের গ্রামে পা দিয়েছেন, তার যদি সার্কাসের দড়িতে হাঁটার অভ্যাস না থাকে, তাহলে এই সাঁকো পার হওয়া সম্ভব নয়।

আমার সঙ্গে রয়েছেন দু'জন মহিলাও। একজন আমার নিজের বোন, অন্যটি চাচাতো বোন। দু'জনেই বয়সে আমার ছোট। কিন্তু শারীরিকভাবে রুগ্ন। দু'জনই দীর্ঘকাল পর স্বামীগৃহ থেকে পিতৃগৃহ দর্শনের আশায় আমার সঙ্গী হয়েছিলেন এটা জেনে যে, গ্রামের চলাচল ব্যবস্থার আজকাল অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে এবং মল্লিকপুর থেকে উলানিয়ায় যেতে রিকশা পাওয়া যায়। এখন গ্রামের 'রাজপথের' অবস্থা এবং অন্তত দু'তিন ইঞ্চি ফাঁক বাঁশ পেতে রাখা নড়বড়ে সাঁকো পার হতে হবে জেনে তারা কিঞ্চিত ভড়কে গেলেন। সঙ্গী তরুণেরা আশ্বাস দিলেন, ভয় পাবেন না; আমরা ধরে আপনাদের সাঁকো পার করাবো।

অনুজ কবি আসাদ চৌধুরী তার কবিতার মতোই সরল এবং দৃপ্তবাক্। তিনি আশ্বাস দিলেন, আগের দিনেই তিনি উলানিয়ায় খবর পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য লঞ্চঘাটে রিকশা পাঠাতে। আমরা একটু এগুলেই হয়তো পথে রিকশার দেখা পেয়ে যাব।

সেই ভাঙাচোরা গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে ভাবলাম, এই রাস্তায় রিকশা পেয়েই বা কি লাভ, আর না পেলেই বা কি ক্ষতি? গ্রামের রিকশাচালকেরা নিশ্চয়ই দক্ষ 'একরোব্যাট' নইলে এই বিপজ্জনক রাস্তায়, খানাখন্দ পেরিয়ে, এমন কি অন্ধকার রাতে একটি কেরোসিনের কুপি সম্বল করে রিকশা চালায় কিভাবে? এই রাস্তায় রিকশায় চড়ার বদলে আমি বরং হাঁটাই নিরাপদ মনে করি।

আমরা সম্ভবত মিনিট দশেক হেঁটেছি। মাঝখানে সেই আতংকময় 'পুলসেরাত' পার হলাম। একজন সামনে এবং আরেকজন পেছনে আমাকে সাবধানে ধরে রাখলেন। মহিলারাও সেভাবে সাঁকো পার হলেন। হোগলটুরি মাদ্রাসার কাছে পৌঁছে একটা দোকানের সামনে বাঁশের মাচায় বসে পড়লাম। আমার বেতো পা আর চলে না। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তিন স্বর্গীয় দূতের মতো তিনটি রিকশা ক্রিং ক্রিং শব্দ বাজিয়ে সামনে এসে হাজির হল। বলল, খবর পেয়ে উলানিয়া থেকে তারা এসেছে আমাদের নিতে। আমার সঙ্গীরা আনন্দ প্রকাশ করলেন। বিশেষ করে দুই মহিলা। আমি খুব একটা স্বস্তি পেলাম না। এই সরু মাটির রাস্তায় যা খানাখন্দ দেখছি, তাতে রিকশায় চাপতে গিয়ে গাড়ি উল্টে পাশের ধানক্ষেত কিম্বা পচাডোবায় গড়াগড়ি খাব কিনা, তা ভবিতব্যই জানেন।

আমার জন্য নির্দিষ্ট রিকশাটির চালকের নাম রহিম। লুঙ্গি এবং শার্ট পরিহিত এই যুবা আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, আপনি গাড়িতে উঠুন স্যার। পঁয়ত্রিশ বছর পর নিজের গ্রামে ফিরছেন, আপনাকে ধানক্ষেতে ফেল দেব না। আর মাইলখানেক পথও নেই। আমি রিকশা চালাবো না। টেনে নিয়ে যাব।

তার প্রতি মনে মনে গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম।

পাঠক, আমার স্বগ্রাম সফরের কাহিনী আপনাদের শোনানোর জন্য এই লেখার অবতারণা নয়। সতেরো বছর পর দেশে ফিরে (পঁয়ত্রিশ বছর পর নিজের গ্রামে ফিরে) কি দেখেছি, কি দেখি নি, কি পেয়েছি, কি পাই নি, তার একটা মোটা দাগের হিসেবের কড়চা এটাকে বলতে পারেন। হাতে সময় ছিল মোটে আঠাশ দিন। এরই মধ্যে ঢাকার উত্তরা বারিধারা থেকে বরিশালের উলানিয়া, ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত ঘুরেছি। কখনো গাড়িতে, কখনো লঞ্চে, কখনো ফেরীতে, কখনো নৌকায়, কখনো রিকশায়, কখনো হেঁটে। ঢাকার জনাকীর্ণ রাজপথে দাঁড়িয়ে ভেবেছি, '৭১ সালে কলকাতার শিয়ালদা'তে দাঁড়িয়েও কি এত লোক দেখেছি?

তখন কলকাতাকেই আমার মনে হয়েছিল, সবচাইতে জনাকীর্ণ শহর। চারদিকে কেবল মানুষের মাথা গিজগিজ করছে। বৌবাজারে দাঁড়ালে হাঁটতে হয় না। জনস্রোত ঠেলে নিয়ে আসে মৌলালির দিকে। বাইশ বছর পর ঢাকার শহীদ নূর হোসেন চত্বরে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল, এই ভিড়, যানবাহন, ধুলাবালি, ঠেলাঠেলির কাছে একাত্তরের কলকাতাও নস্যি। এই বাইশ বছরে আমার আরও অভিজ্ঞতা বেড়েছে। দুনিয়ার সবগুলো বড় শহর দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ঢাকার চাইতে কোনো কোনো শহর একশ' গুণ বড়। কিন্তু এমন উত্তাল জনজোয়ার আর কোথাও দেখিনি। সতেরো বছর আগে আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখনও ঢাকা ছিল একটি অযান্ত্রিক, অনাগরিক বর্ধিষ্ণু শহর। বলতে পারা যেতো— 'শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।' অন্তত রমনা গ্রীনকে আমার তাই মনে হতো। গড়ের মাঠের দুঃখ আমাদের কিছুটা ঘুচিয়েছিল রমনার মাঠ। এত মানুষ তখন ঢাকায় ছিল না। এত ধুলা এবং মশামাছিও না। স্বাধীনতার তখন সবে উন্মেষলগ্ন। তারপর বাইশ বছরেই শহরের এই স্ফীতি এবং জনস্ফীতি! আমাদের স্বাধীনতার ফসল কি তাহলে একমাত্র এই জন বিস্ফোরণ?

দেড়যুগ দেশে ছিলাম না। যখন দেশ ছেড়ে যাই তখন মুজিব আমল। তারপর আরও কয়েকটি আমল কেটেছে। জিয়ার আমল, সাত্তারের আমল, এরশাদের আমল। তারপর ম্যাডামের আমল। মাঝখানের তিনটি আমল আমি দেশে অনুপস্থিত। ফলে পরিবর্তনটা সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। সেই রমনা গ্রীন আর নেই। কোন এক জেনারেল নাকি 'গেরিলা যুদ্ধের' ভয়ে রমনার সব সবুজ গাছ হত্যা করেছেন। তখন থেকেই দেশে হত্যার রাজনীতি শুরু। এখনো চলছে। আমি দেশে থাকতেই চট্টগ্রামের হালিশহর রক্তস্নাত হল। অগ্নিদগ্ধ হল। একটি রাজনৈতিক সভায় গুলিবৃষ্টি চালাল মুখোশধারী সন্ত্রাসীর দল। সরকারের হাতে 'সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ' রয়েছে। এই অধ্যাদেশ অনেকটা সমারসেট মমের বিখ্যাত গল্প 'মিঃ নো অলের' নায়িকার গলার মুক্তার নেকলেসের মতো। ওটা আসল, না নকল, কেউ জানে না।

দেশে যাওয়ার আগে অনেকেই বলেছেন, দেশে যান না কেন? ঢাকা শহর দেখলে আর চিনতে পারবেন না। এত বড় হয়েছে। এত সুন্দর হয়েছে। উত্তরা, বারিধারার বাড়িঘর দেখলে তো আপনার মনে হবে, নিউইয়র্কে, কিম্বা প্যারিসে রয়েছেন। এরশাদের তৈরি সেনাকুঞ্জ দেখলে ভির্মি খাবেন। আমাদের জাতীয় ধ্বনি যদিও এখন বিসমিল্লাহ; কিন্তু মুজিব আমলের সেই কড়াকড়ি আর নেই। সবরকম ড্রিঙ্কস পাবেন। প্রাইভেট ডিস্কো ডান্সেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যাংককের চাইতেও ভালো ম্যাসাজ পার্লার রয়েছে। এগুলোকে আমরা বলি বিউটি পার্লার। কি দুঃখে আপনি লন্ডনে পড়ে রয়েছেন?

দুই

বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে ফিরে আসার পর বন্ধুবান্ধব সকলের মুখেই শুধু একটা প্রশ্নঃ দীর্ঘ সতেরো বছর পর দেশ ঘুরে এলেন। কি দেখলেন? কেমন দেখলেন? এক কথায় একটা জবাব দিন।

কেউ বুঝতে চান না, সতেরো বছর পর দেশে গেলেও সেখানে ছিলাম মাত্র আটাশ দিন। মাত্র আটাশ দিনে একটা দেশ (হোক নিজের দেশ) এবং তার নতুন প্রজন্মকে চট করে জানার ও বোঝার উপায় নেই। এ সম্পর্কে এক কথায় কিছু বলারও উপায় নেই।

তবু এক কথায় বলতে হলে বলবো, বহুকাল পরে নিজের দেশে ফিরে মনে হল, দেশটা যেন অনেকটা ভিক্ষুকের দেশে পরিণত হয়েছে। ধনী থেকে দরিদ্র, সকলেরই হাত পাতা। কিসিংগার বলেছিলেন, 'তলাবিহীন ঝুড়ি'। আমার মনে হল, এটা অতলস্পর্শী ঝুড়ি। সেই অতল পাতালে যে বৃহৎ হস্ত প্রসারিত, তা সবই গ্রাস করছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।' এও তাই। সকল বিত্ত, বৈভব, এমন কি মনের সম্পদও মহাচৌম্বিক টানে গ্রাস করছে এই বিপুল বৃহৎ হাত। এই হাতের পৃষ্ঠপোষক কখনো স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তি। কখনো নির্বাচিত দল। কিন্তু ভূমিকা একই। দেশে সচ্ছলতা যে আসে নি তা নয়, তাও ভিক্ষার সচ্ছলতা। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা রূপক গল্প হিসেবে পাঠকদের উপহার দিই।

ঢাকা থেকে ফিরে এসে একদিন লন্ডনের শহরতলীতে বো ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কে নিউজফ্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামে একটি ছাপাখানায় গেছি। আমি যে বাংলা সাপ্তাহিক কাগজটির সঙ্গে জড়িত ছিলাম, সেটি এখানে ছাপা হয়। বিরাট প্রেস। একতলা বাড়ির সমান উঁচু প্রিন্টিং মেশিন। ঢাকার ব্রডশীট দৈনিক পত্রিকার ৬৪ পৃষ্ঠা এক সঙ্গে বহুবর্ণে ছাপা হতে পারে। এখানে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের এবং জাপানের বিখ্যাত দৈনিক 'আশাহানি শিম্বুর' ইউরোপিয়ান সংস্করণ ছাপা হয়। এই প্রেসের কর্মীরাও নানা দেশের। ইংলিশ, আইরিশতো রয়েছেই; তাছাড়া রয়েছে টার্কিশ, জাপানী, নাইজেরিয়ান, কেনিয়ান, নানাজাতের কর্মী। নানা দেশের লোক নিত্য হাজির থাকে এই প্রেসে। আমি যেদিন প্রেসটাতে গেছি, সেদিন এক জাপানী ভদ্রলোক সেখানে হাজির। চমৎকার ইংরেজি বলেন। শুনলাম, তিনি জাপানী দৈনিকটির সঙ্গে জড়িত। আমি একজন বাঙালী সাংবাদিক জেনে তিনি

তার ব্যাগ থেকে একটা ম্যাগাজিন টেনে বের করলেন। নাম, 'ইলাস্ট্রেটেড নিউজ অব বাংলাদেশ'। হেসে বললেন, আমি সাংবাদিক নই, ব্যবসায়ী। ব্যবসায় উপলক্ষে মাঝে মাঝে ঢাকায় যাই। পত্রিকাটি ঢাকা থেকে আমার এক বন্ধু এনেছেন, বলেই কাগজটি আমার সামনে তিনি মেলে ধরলেন। চেয়ে দেখি, কভারে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর (তৎকালীন) একটি মাল্টিকালার ছবি। পরনে দামি রঙিন শাড়ি। চুলের রঙও ঈষৎ লাল। ঠোঁটে স্মিত হাসি।

জাপানী ভদ্রলোক বললেন, আমি স্বীকার করবো, তোমাদের প্রধানমন্ত্রী খুবই সুন্দরী। সেই সঙ্গে চেহারায় ব্যক্তিত্বের আভাও রয়েছে।

তাহলে তোমার এই কমপ্লিমেন্ট আমি প্রধানমন্ত্রীকে পৌঁছে দেব।

জাপানী ভদ্রলোক বললেনঃ আমার এতদিন ধারণা ছিল, পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টোই সম্ভবত প্রাচ্যের সবচাইতে সুন্দরী প্রধানমন্ত্রী। এখন আমার ধারণা পাল্টেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে পাল্টাল?

ঃ তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেখে। বেনজির ভুট্টো স্লিম এবং তন্বি। কিন্তু তিনি অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছেন। ফলে চেহারায় ওয়েষ্টার্ণ বিউটির ছাপ বেশি। তোমাদের প্রধানমন্ত্রী ইষ্টার্ন বিউটির প্রতীক। আমরা জাপানী পুরুষেরা এখনো ইষ্টার্ন বিউটির বেশি অনুরাগী।

জাপানের সাম্প্রতিক রাজনীতির কথা তুলে প্রসঙ্গ বদলাতে চাইলাম। কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। বললেনঃ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

ঃ বলুন।

ঃ আমি কয়েক বছর আগে ব্যবসা উপলক্ষে প্রায়ই ঢাকা যেতাম। তখন তোমাদের এই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একটি বড় বিরোধী দলের নেত্রী। তিনি তখন শাদা শাড়ি পরতেন। মাথার চুলে রঙ দিতেন না। ছবি দেখে মনে হতো খুবই সরল এবং সাদাসিধে মহিলা। আমার বন্ধুরা বলতেন, তিনি বিধবা। তাই রঙিন কাপড় চোপড় পরেন না। চুলে বা ঠোঁটে রঙ দেন না। এটাতো তোমাদের সামাজিক নীতি। তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার পর এই নিয়মনীতি ভাঙলেন কেন?

বললাম; বিধবা মহিলাদের রঙিন শাড়ি না পরা, সাজগোজ না করা পুরনো যুগের সামাজিক নিয়মনীতি। ওল্ড ফ্যাশন। ওটা এখন অনেকেই মেনে চলেন না। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও ক্ষমতায় বসার পর এই সেকেলে কুসংস্কার ভাঙতে বাধ্য হয়েছেন। তাকে এখন প্রায়ই বিদেশে যেতে হয়। বিদেশের রাজা, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে হয়। তুমি জানো, আমাদের দেশটা বড় গরীব। বছরে খরা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, সাইক্লোন লেগেই আছে। জাতীয় বাজেটের সবটা না হোক, বারো আনাই বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর। সাহায্য, দান, ঋণ, অনুদান না পেলে

আমাদের দেশ বাঁচে না। ফলে এসব সাহায্য ও দান চাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনেক সময় বিদেশে ছুটতে হয়। তুমি নিশ্চয়ই আশা কর না, এ সময় তিনি শাদা থান কাপড় পরে বিধবার বেশে এসব দাতা দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ছুটবেন।

মনে হল, জাপানী ভদ্রলোক আমার বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করেছেন। তিনি মাথা দুলিয়ে বার বার বললেন, সারটেনলি নট্, সারটেনলি নট্।

মাথা দোলানো বন্ধ করে তিনি ঢাকার ম্যাগাজিনটি তার ব্যাগে আবার পুরলেন। আমার দিকে মৃদু হাসিমাখা মুখে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে আমার লাষ্ট ঢাকা ভিজিটের একটা ঘটনা বলি।

এতক্ষণে স্বস্তি পেলাম। নিশ্চয় এবার তিনি আর কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আলাপ জুড়বেন না। তাকে ঘটনাটি বলার অনুমতি দিতেই তিনি জাপানী কায়দায় একটু মাথা নোয়ালেন। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। বললেন, আমি যখন শেষবার ঢাকায় যাই.......তখন দ্যাট পুওর চ্যাপ— কি নামটা তার? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে এরশাদ। তিনি আর ক্ষমতায় নেই। একটা ইন্টেরিম গভরমেন্ট ছিল, তাও চলে গেছে। এই মহিলা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তখন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। শুনলাম, নতুন পার্লামেন্ট বসেছে। বিরোধী দলের নেতাও একজন মহিলা। শুনে বড় ভালো লাগল। জাপানকে বলা হয়, প্রাচ্যের সর্বাধুনিক সবচাইতে ওয়েষ্টার্নারাইজড কান্ট্রি। কিন্তু আমাদের দেশেও নারী প্রগতি এতটা এগোয় নি। এখনতো শুনছি, বাংলাদেশের সবগুলো বড় আন্দোলনেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারা। তোমার কি মনে হয়, বাংলাদেশে আবার মাতৃতান্ত্রিক যুগ ফিরে আসছে? পুরুষতান্ত্রিক দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে?

একবার ভাবলাম, জাপানী ভদ্রলোককে ঢাকার তসলিমা নাসরিনের নামটা বলি। অনুরোধ করি, তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি জাপানকে বাংলাদেশের পুরুষতন্ত্র সম্পর্কে অনেক বেশি জ্ঞানদান করতে পারবেন। তারপরই মনে হল, না, না, তসলিমা নাসরিনের এখন বড় দুঃসময়। এই সময়ে তার আরও ক্ষতি করা ঠিক হবে না। জামাতীদের ঠেলায় বিএনপি এবং বিএনপির ঠেলায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ এখন তার পেছনে লেগেছে। হাস্যকর যুক্তিতে তার পাসপোর্ট আটক করেছিল। অভিযোগ এনেছিল,, আত্মপরিচয় গোপন করে তিনি বিদেশ সফরে যাচ্ছিলেন। এখন যদি আবার এই জাপানী ভদ্রলোক তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাহলে স্পেশাল ব্রাঞ্চের পোয়াবারো। তারা হয়তো নতুন অভিযোগ আনবেন, তসলিমা নাসরিন বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে গোপন উদ্দেশ্যে গোপন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমাকে ভাবতে দেখে জাপানী ভদ্রলোক বললেন, তুমি কিছু ভাবছো মনে হচ্ছে?

মনের আসল কথা গোপন করলাম। বললাম, পুরুষতন্ত্রের কথাই ভাবছি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুরষতন্ত্র পুরুষের হাতেই অক্কা পেয়েছে।

ঃ সে কি রকম? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

ঃ তুমি পঁচাত্তর সালের ঘটনা জানো না, পঞ্চাশ বছরের সাধনা, জেল জুলুমের পর বাংলাদেশে যে ক'জন বরেণ্য পুরুষ নেতা তৈরি হয়েছিলেন, ক্ষমতার লোভে পুরুষ কসাইরা তাদের হত্যা করে। এই পুরুষ কসাইদেরও কেউ কেউ পরে নিহত হয়, কেউ কেউ দেশত্যাগী হয়। ফলে বাংলাদেশে এখন পুরুষ নেতা নেই। সবই কেবল নারী নেতা।

জাপানী ভদ্রলোকঃ নারী নেতারা পুরুষ নেতাদের চাইতেও বিপজ্জনক হতে পারেন তা জানো? জীববিজ্ঞানের বইতে পড়েছি, কোনো কোনো স্ত্রী মাকড়সা সঙ্গমের পর পুরুষ মাকড়সাটিকে খেয়ে ফেলে।

বিস্মিত হলাম। এ তথ্য আমার জানা ছিল না। তসলিমা নাসরিনের কোনো লেখায় কিংবা হুমায়ুন আজাদের নাতিবৃহৎ 'নারী' গ্রন্থটিতেও এর উল্লেখ চোখে পড়েছে বলে মনে হল না। হয়তো মাকড়সারা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত নয় বলেই বিষয়টি তারা এড়িয়ে গেছেন। জাপানী ভদ্রলোককে সে কথা জানালাম। বললামঃ একজাতের স্ত্রী মাকড়সা কি করে, তার দ্বারা সভ্য, উন্নত মানবজাতির নারী সমাজ প্রভাবিত হতে পারে না।

জাপানী ভদ্রলোক বললেনঃ প্রভাব নয়, আমি তাদের একই রকম স্বভাবের কথা বলছি। এটা সত্য, মানব স্ত্রী কোন মানব স্বামীকে ভক্ষণ করে না। কিন্তু রাজনীতির দিকে যদি তাকাও, তাহলে দেখবে, নারী রাজনীতিক পুরুষ রাজনীতিক নিপাতনে কত সিদ্ধহস্ত। আমি শারীরিক হত্যার কথা বলছি না। বলছি রাজনৈতিক হত্যার কথা। প্রমাণ চাও?

বললাম, একটা দু'টো প্রমাণ দাও। যদিও তোমার কথার সঙ্গে আমি একমত নই।

জাপানী ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন। বললেন, ইসরায়েলের এককালের মহিলা প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারের কথা এখানে তুলবো না। তুমি নিশ্চয়ই ইহুদী রাষ্ট্রের কথা শুনতে চাও না। প্রতিবেশী ভারতের দিকে তাকাও। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ক'ডজন পুরুষ নেতাকে বধ করেছেন, আই মিন রাজনীতি থেকে বিদায় দিয়েছেন, তার হিসেব রাখো? যা, তার বাবা নেহেরুজী পর্যন্ত পারেন নি। জয়প্রকাশ

থেকে চন্দ্রশেখর, কামরাজ থেকে মোরারজী দেশাই, ক'জন পুরুষ নেতা তার আমলে রাজনীতিতে সারভাইভ করেছেন বলো দেখি? আরও সাম্প্রতিক উদাহরণ দেব? বৃটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচার। তার দ্বাদশ বর্ষব্যাপী শাসনামলে বিরোধী লেবার পার্টির তিন তিনজন পুরুষ নেতাকে একে একে বধ করেছেন— ক্যালাহান, মাইকেল ফুট, নিল কিনোক। নিজের দলে একজনও জাঁদরেল পুরুষ নেতাকে মাথা তুলতে দেন নি; পত্রপাঠ কেবিনেট থেকে বিদায় করেছেন। লর্ড কেরিংটন, মাইকেল হেজেলটাইন, নাইজেল লসন, জেফরি হাও — টোরি পার্টির এক একটা বিগ্ পিলার ম্যাগীর হাতে কেমন নিমিষে ধরাশায়ী হয়েছিলেন, তা জানোতো? উইনস্টন চার্চিল যা পারেন নি, বিগ্ ম্যাক বা ম্যাকমিলান যা পারেন নি, তা পেরেছেন মুদিকন্যা মার্গারেট থ্যাচার। কেবল নারী বলেই পেরেছেন। তুমি স্বীকার করবেতো?

আমি কোনো জবাব দেয়ার আগে তিনিই আবার বললেন, এই ব্যাপারে তোমাদের বর্তমান বিধবা প্রধানমন্ত্রীও কম যান না, কি বলো?

মনে মনে স্বীকার করলাম, আমাদের বিধবা প্রধানমন্ত্রীও পুরুষ নিপাতনে কম সিদ্ধহস্ত নন। তার প্রধান পুরুষ প্রতিপক্ষ এরশাদের ভিটেয়তো তিনি ঘুঘু চড়িয়েছেন; নিজের দলেও তিনি জাঁদরেল পুরুষ নেতাদের এক হাটে কিনে সেই হাটেই বিক্রি করে দিয়েছেন। মরহুম শাহ আজিজ, ধুরন্ধর ওবায়দুর রহমান, ব্যারিস্টার মওদুদ তার জ্বলন্ত সাক্ষী। ঢাকার এককালের 'আয়রনম্যান' মেয়র নামে পরিচিত আবুল হাসনাততো শেষ সময়ে উল্টো রথে চাপতে গিয়ে এখন রাজনীতি থেকেই বলতে গেলে লাপাত্তা। 'স্বাধীন বাংলার শেষ মুক্তিযোদ্ধা' জেনারেল' জিয়া এবং এরশাদও যাকে প্রতিপক্ষ ভেবে ভয় পেতেন, সেই জেনারেল শওকত ম্যাডামের কৃপায় এখন ক্ষমতাসীন দলে থেকেও ক্ষমতাহীন। ঢাকায় থাকাকালে ঢাকা ক্লাবের আড্ডায় তাকে কেউ কেউ 'কুইন্স পেজ' বলে ঠাট্টা করতেও নিজের কানে শুনেছি।

জাপানী ভদ্রলোককে কথাগুলো জানাতেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তাহলে তুমি স্বীকার করছো আমার থিয়োরি অকাট্য? তুমি দেখবে, তোমাদের এই ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী তার অবশিষ্ট প্রতিপক্ষকেও হজম করে ফেলবেন।

এবার আমি মৃদু কণ্ঠে বললাম, সম্ভবত তিনি তা পারবেন না।

ঃ কেন পারবেন না? এবার জাপানী ভদ্রলোকের কণ্ঠে বিস্ময়।

বললাম, ম্যাডামের প্রধান প্রতিপক্ষ এখন পুরুষ নন, একজন মহিলা। শেখ হাসিনা। তুমি নাম শুনেছো?

জাপানী ভদ্রলোক বললেন, আলবৎ শুনেছি, দ্য ডটার অব শেখ মুজিব, ফাউন্ডিং ফাদার অব বাংলাদেশ। শুনেছি, বাপের মতোই জেদী আর সাহসী।

বললাম, ঠিক শুনেছো।

জাপানী ভদ্রলোক আমতা আমতা করলেন। বললেন, তাহলেতো ম্যাডামের জন্য সমস্যা। আমি এদিকটা ভেবে দেখি নি। বলেই তিনি আমাকে আকস্মিকভাবে 'গুডবাই' জানানোর উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। তা দেখে বললাম, তুমি আমাকে তোমার লাস্ট ঢাকা ভিজিটের সময়ের একটা ঘটনার কথা বলবে বলেছিলে, তা বলো নি।

জাপানী ভদ্রলোক আবার মাথা নুইয়ে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, কথার ভিড়ে আসল কথার খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাহলে সেই গল্পটাও বলি। তখন তোমাদের ম্যাডাম মাত্র প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আমি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমে বাইরে এসে ট্যাক্সির খোঁজ করছি। এমন সময় একটি তরুণী সামনে এসে দাঁড়াল। ধুলিমলিন চেহারা, চুল উস্কোখুস্কো। একটু বাথ্‌টাথ্‌ করে, সামান্য প্রসাধনী মাখলে তাকে 'এ' গ্রেড সুন্দরী বলা যেতো। দেখেই বুঝলাম ভিখিরি মেয়ে। পরনে পুরনো হলেও দামি ফিনফিনে শাড়ি। মনে হল শিফন। তার কাঁধে একটা ভ্যানিটি ব্যাগের মতো ঝোলানো। তোমাদের ভিখিরি মেয়েরা সাধারণত ব্রা কিংবা ব্লাউজ পরে না দেখেছি। মোটা কাপড়েই শরীর ঢেকে রাখে। এর শিফনের শাড়ি ঢাকা নিটোল উন্নত বুক দেখে বিমোহিত হলাম। এয়ারপোর্টে কিছু ডলার ভাঙিয়ে নিয়েছিলাম। সে না চাইতেই দু'টো দশ টাকার নোট দিলাম তাকে। সে সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে ভাঙা ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে যা বলল, তার অর্থ ধরে নিলাম, সাহেব, একটা বা দু'টো ডলার দাও না প্লিজ।

ব্রা কিংবা ব্লাউজবিহীন শিপনের শাড়ি পরা ভিখিরি মেয়ে, তার মুখেও ভাঙা ভাঙা ইংরেজি কথা, প্লিজ উচ্চারণ! বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, তোমাদের দেশটা, কত এগিয়ে গেছে। শুধু মেয়েরা নয়, ভিখিরি মেয়েরাও কতটা লিবারেটেড্‌ হয়েছে তা এতদিন বুঝতে পারি নি। খুশী হয়ে তাকে দশ ডলার দিলাম। বললাম, তুমিতো ভিক্ষে করো দেখছি। এই শিফনের শাড়ি, ভ্যানিটি ব্যাগ কোথায় পেয়েছো?

আরও বিস্মিত হয়ে দেখলাম, সে আমার ইংরেজি বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরে আমাকে এক টুকরো মধুর হাসি উপহার দিচ্ছে। হাসি থামিয়ে তেমনি ভাঙা ইংরেজি বাংলায় বলছে, এই শাড়ি ও ব্যাগ ভিক্ষে করে পেয়েছি স্যার। দশ ডলার দেয়ার জন্য তোমাকে অশেষ থ্যাঙ্ক্যু।

জাপানী ভদ্রলোক গল্প শেষ করে বিদায় নিলেন। আমি আরও কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে সেখানে বসে রইলাম। ভাবলাম, আমিতো আটাশ দিন বাংলাদেশে কাটিয়ে

এসেছি। কিন্তু আমিও কি পারতাম, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি আর বাজার অর্থনীতির চেহারা সম্পর্কে এমন চমৎকার গল্প আপনাদের উপহার দিতে?

তিন

বাংলাদেশে একটি নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা লাভ যেমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা নয়, তেমনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে সাময়িক নারী প্রাধান্যও দেশে নারী জাগরণ বা নারী-মুক্তির কোনো মাপকাঠি নয়। বৃটেনে বর্তমানে পশ্চিমা অন্যান্য দেশের মতো কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ পদ থেকে সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চ পদেও নারীরা অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ১৯৯৩ সালের কথা বলছি।বিবিসি'র হেড অব নেটওয়ার্ক রেডিও এখন একজন মহিলা। প্রধানমন্ত্রীর পলিসি ইউনিট এবং গোয়েন্দা সংস্থা এমআই ফাইভের প্রধানও এখন মহিলা। এপ্রিল মাস থেকে বৃটেনের আবগারী ও শুল্ক বোর্ডের চেয়ারপার্সোনও একজন মহিলাকে করা হয়েছে। লেখিকা জ্যানেট কোহেন চার্টার হাউস ব্যাংকের ডিরেক্টর। বড় বড় কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ পদেও রয়েছেন এখন মহিলারা। উঁচু পর্যায়ে না হোক, মাঝারি পর্যায় থেকে বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রে নারী এখন পুরুষের প্রধান প্রতিযোগী। লন্ডনের 'সানডে টাইমস'—এর একটা জরিপে দেখা যায়, একাউন্টেন্সি এবং ফার্মেসী সংক্রান্ত পেশায় যথাক্রমে ৩০ ভাগ এবং ৭০ ভাগ চাকুরি এখন নারীদের দখলে। এতদসত্ত্বেও বৃটেনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক কোনো ক্ষেত্রেই নারী এখনও যথার্থ অর্থে সমানাধিকার অর্জন করতে পারে নি। বৃটেনে যদিও প্রায় এক দশকের বেশি একজন নারী (মার্গারেট থ্যাচার) প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তা সত্ত্বেও তার আমলে নারী সমাজের তেমন কোনো অগ্রগতি ঘটে নি। একজন নারী হয়েও মিসেস থ্যাচার ভিক্টোরিয়ান ভ্যালুজ বা ভিক্টোরিয়া যুগের মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামে নারীর পারিবারিক দায়িত্ব বহনের (স্ত্রী ও মা হিসেবে) উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। থ্যাচারবাদের মূল লক্ষ্যই ছিল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থায় ওয়েলফেয়ার স্টেটের জনকল্যাণমূলক পদ্ধতির প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কার নয়, তার ধ্বংস সাধন এবং অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণগুলোও প্রত্যাহার করে অবাধ অর্থনীতির নামে মুষ্টিমেয় ধনীর অবাধ লুণ্ঠনের রাস্তা উন্মুক্ত করে দেয়া। সেই সঙ্গে নারীদের সংগঠিত ও সমানাধিকারপ্রাপ্ত 'ওয়ার্ক ফোর্স' হিসেবে গড়ে উঠতে না দিয়ে আবার পুরুষশাসিত সমাজের বলয় রেখায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

লক্ষ্য করার বিষয়, বৃটেনে ফ্যামিনিস্ট বা নারীবাদী আন্দোলন যতটা তুঙ্গে, সমাজের বিভিন্ন পেশার তুঙ্গে নারী অধিকার ততটা বিস্তৃত নয়। বৃটেনের বর্তমান (১৯৯৩) মন্ত্রিসভায় মাত্র দু'জন সদস্য মহিলা। হাউস অব কমন্স এ (পার্লামেন্টে) ৬৫১ জন সদস্যের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ৫৮ জন। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ১০০ টি টপ এস্টাবলিসমেন্ট পোস্টে নারী কোম্পানীগুলোতে এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টার পদে নারীর সংখ্যা শতকরা একভাগেরও কম। ফিউডাল যুগে ব্যারন ও লর্ডদের বাড়িতে, শস্য খামারে কিম্বা শিল্পবিপ্লবের আগে কায়িক শ্রমে চালিত কলে কারখানায় নারী শ্রমিকের (আসলে দাসী ও মজুর) সংখ্যা যেমন তাদের অধিকার ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতার পরিচয়জ্ঞাপক ছিল না; বর্তমানেও তেমনি বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে বিশেষ করে বৃটেনে বিভিন্ন পেশার মাঝারি ও নীচু পর্যায়ে নারী কর্মীর বিরাট বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি তাদের সমমর্যাদা ও সমানাধিকারের পরিচয় বহন করে না। পশ্চিমা দেশগুলোতে নারী পারিবারিক বন্দীশালার দেয়াল টপ্‌কেছে, কিন্তু নিজেকে এবং সামাজিক বিধি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের সমানাধিকার ও সমান সুযোগ সে এখনো সর্বতোভাবে অর্জন করতে পারে নি।

উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোতেই যেখানে নারীদের অবস্থা এই, সেখানে অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের (সাবেক সোভিয়েত মডেলের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতনের পর এখন আর তৃতীয় বিশ্ব বলা চলে কি?) দরিদ্রতম একটি দেশ—বাংলাদেশে সরকারী দল থেকে শুরু করে বিরোধী দল, এমন কি ঘাতক দালাল নির্মূল অভিযানেও একচ্ছত্র নারী নেতৃত্ব উন্নত দেশগুলোর অনেক পর্যবেক্ষকের মনেই বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। তাদের কারো কারো ধারণা, এটা সম্ভবত বাংলাদেশের নারীবাদী আন্দোলনের একটা বড় সাফল্য অথবা নারী জাগরণের ফসল। বাংলাদেশেও অনেকে এই বিভ্রমে ভোগেন। আমি এবার ঢাকায় যেতেই বৈঠকি আলাপে অনেক বন্ধু আমাকে বলেছেন, বহুদিন পর দেশে এসেছেন। প্রথমেই যে পরিবর্তনটা আপনার চোখে পড়বে, তাহল, ঢাকা আর 'অবরোধবাসিনী' নগর নয়। বেগম রোকেয়ার যুগ বহু আগে বাসি হয়ে গেছে। মেয়েরা আর ঘরে বন্দী নয়। কাস্টমস্ থেকে শুরু করে সরকারী বেসরকারী সকল কমার্শিয়াল অফিসে, বীমা অফিসে, ব্যাংকে নারী কর্মী পাবেন। কুড়ি বছর আগে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তের বাড়িতেও যে ঝি, চাকরানী দেখে গেছেন, তাদের আর পাবেন না। এখন কোনো কোনো বাড়িতে পরিচারিকা দেখবেন। তারা আর ঝি বা দাসী নয়। তাদের কাজের ঘন্টা বেঁধে দেয়া আছে। বেতন উল্লেখযোগ্য। আগের মতো তাদের গায়ে হাত দেওয়া দূরের কথা, গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী তাদের উপর জোর খাটাতে পারেন না। এটা দেশে গার্মেন্টিস শিল্পের প্রসারতার ফল। এটাকেই আমরা বাংলাদেশের শিল্প-বিপ্লব বলি। এই বিপ্লবের ফলে গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরিগুলোতে এখন

হাজার হাজার নারী শ্রমিক। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নেতৃত্বও এখন নারীদের হাতে। রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা। নারী আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বেগম সুফিয়া কামাল। সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছেন বেগম জাহানারা ইমাম। দেশে যৌতুক ও পণপথার বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন হচ্ছে। স্বামীকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণে বাধা দেয়া হচ্ছে। পেশাজীবি নারীরা (নার্স, কেরানী প্রমুখ) পেশাভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলনে নামছেন। দেশময় নারীদের এখন রমরমা অবস্থা।

বন্ধুর পর্যবেক্ষণের সাথে আমি একমত হতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। তাতে তিনি উৎসাহিত হলেন। ভাবলেন, তার সঙ্গে আমি একমত হয়েছি। খুশি হয়ে বললেন, 'দেশে নারীদের যে রাজত্ব দেখছেন, সে সম্পর্কে আপনাকে একটা 'জোক্' বলি। ঢাকার এক বাড়িতে ক'জন পুরুষ বন্ধু বসেছেন আড্ডা মারতে। কথায় কথায় দেশের রাজনীতি, সমাজনীতির কথা এসে গেল। এক বন্ধু বললেন, "ভাই, চার মহিলার যন্ত্রণায় দেশে আর থাকা যাবে না।" আরেক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "এই চার মহিলার পরিচয় কি?" আগের বন্ধু বললেন, "প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। দ্বিতীয় মহিলা বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা। তৃতীয় মহিলা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেত্রী বেগম জাহানারা ইমাম এবং চতুর্থ মহিলা আমার স্ত্রী।"

'জোক্টা' শুনে আমরা সকলেই হেসে উঠলাম। বন্ধু তাতে আরও খুশি হলেন। বললেন, এটাতো পুরনো হয়ে গেছে। আরও নতুন নতুন জোক্ বেরিয়েছে। এখন তা থাক্। আপনাদের কথা শুনি।

সেদিনের আড্ডা থেকে ফিরেও আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশে সময়ের অগ্রগতি ও পরিবর্তনের সাথে নারী সমাজের অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তন কতটা গুণগত, এখন তাই প্রশ্ন। ঢাকা শহরে বাস, ট্যাক্সি, টেম্পো, স্কুটার, রিকশার সংখ্যাধিক্য দেখে যেমন গ্রাম বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি কল্পনা করা নিরর্থক, ঢাকার লঞ্চ টার্মিনাল এবং বৃহত্তর বরিশালের মল্লিকপুর বাজারের লঞ্চঘাটের অবস্থার তারতম্য যেমন দুই শতাব্দীর; তেমনি ঢাকার শহুরে সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর বর্তমান অবস্থা দেখে গ্রামের নারীদের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করতে যাওয়া নিরর্থক। যদিও সময়ের পরিবর্তনে গ্রামের নারীদেরও অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে বৈকি। এখানে দু'টি চিত্র তুলে ধরছি।

ঢাকার অভিজাত শহরতলী উত্তরায় এক বন্ধুর বাড়িতে গেছি। যথারীতি তিনি আমাকে ডাইনিং টেবিলে আমন্ত্রণ জানালেন। শুক্রবারে ভোরের চা নাশ্তা। তাই একটু দেরি করে এই আয়োজন। আমার সঙ্গে টেবিলে বসলেন বন্ধু, তার স্ত্রী এবং

তাদের পনর ষোল বছর বয়সের একটি মেয়ে। ঢাকা শহরে এখন শাড়ির বদলে শালোয়ার কামিজের প্রাধান্যই বেশি মনে হল। এই মেয়েটির বেশবাসও তাই। যে মেয়েটি খাবার পরিবেশন করতে শুরু করল, তার বয়স উনিশ কুড়ি। তার পরনেও শালোয়ার কামিজ। পায়ে স্যান্ডেল। আমার মনে হল, বড় বোন। তাই ডেকে বললাম, তুমিও কেন আমাদের সঙ্গে খেতে বসছো না? আমরা নিজেরাই খাবার নিতে পারবো।

মেয়েটি মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, না, না, কি বলছেন, এটাই তো আমার কাজ।

বন্ধুপত্নী আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেনঃ ও আমাদের কাজের মেয়ে। হাউস মেইড বলতে পারেন।

এবার আমার চমকানোর পালা। বুঝলাম, ঝি চাকরানী কথাটা উঠে গেছে। এখন যারা এই পেশায় নতুন এসেছে, তাদের চেহারা, সাজপোশাকও পাল্টে গেছে। কুড়ি বছর আগে ঢাকায় হাউস মেইড বলতে যাদের চেহারা আমার চোখে ভাসে, তারা খালি পা, ছেঁড়া এবং ময়লা তাঁতের শাড়ি পরা যুবতী অথবা প্রৌঢ়া। ছেঁড়া এবং ময়লা ফ্রক পরা আন্ডার এজ অথবা টিন এজার কাজের ছুঁকড়িও ছিল। তারা কেউ পেটে ভাতে, কেউ বা মাসে পাঁচ টাকা, দশ টাকা বেতনে কাজ করতো। সকাল ছ'টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত তাদের কাজের কোনো বিরাম ছিল না। কলতলা থেকে কল্‌সির পর কল্‌সি ভরে পানি টানা, হলুদ মরিচ বাটা, ঘর ধোয়া মোছা, রান্না করা— এক কথায় ঘরের সব কাজ তাদের করতে হতো। সেই সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর অনবরত শাসানি, গৃহকর্তার দু'একটা চড়চাপড় (বয়স অনুপাতে) উপুরি পাওনা ছিল। সেই ঢাকায় সতেরো বছর পর ফিরে এসে পরিচ্ছন্ন শালোয়ার কামিজ পরা, স্যান্ডেল পায়ে তরুণী হাউস মেইড দেখে আমার অবস্থা অনেকটা রিপভ্যান উইংকলের মতো। ভাবলাম, এটা কি বাংলাদেশে নারী সমাজের উন্নতি ও প্রগতির লক্ষণ?

চা নাশতার পর ড্রয়িংরুমে একটু নিরিবিলি বসে খবরের কাগজ পড়ছি। দেখি কাজের মেয়েটি কাঁধে একটি কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে দরোজার দিকে যাচ্ছে। তাকে কাছে ডাকলাম। সে কাছে আসতেই বুঝলাম, তার বেশবাস আরেকটু পরিপাটি হয়েছে। মাথার চুল চূড়ো করে নতুন স্টাইলে বাঁধা। কপালে খয়েরি টিপ; ঠোঁটে ঈষৎ লিপস্টিক।

বললাম, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

ঃ আমার এখন ছুটি। মেয়েটি বলল।

ঃ সে কি, আজ আর কাজ করবে না?

সে হাসল। বলল, আমার পার্টটাইম কাজ। সকালে আসি। দুপুর হওয়ার আগেই চলে যাই। বিকেলে অন্য একটা কাজে যাই।

ঃ অন্য বাসায় কাজ করো?

ঃ না, বিউটি পার্লারে কাজ করি।

চুপ করে রইলাম। বিউটি পার্লারে তার কাজটা কি, জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না।

মেয়েটি এবার নিজেই বললঃ আগে গার্মেন্টিস্ ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম। আমাদের ফ্যাক্টরিটা হঠাৎ উঠে গেল। তখন বাসার এই পার্টটাইম কাজটা ধরি। আরেকটা ফ্যাক্টরিতে কাজের কথা হচ্ছিল, সেখানে আয় বেশি।

ঃ তোমার স্বামী নেই?

ঃ ছিল। আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। আমি কাজ ধরতেই সে আর কাজকর্ম করতো না। ঘরে বসে গাঁজা বিড়ি সিগারেট ফুঁকতো, মদের টাকা চাইতো। রাজনৈতিক দলে মাস্তানী করে বেড়াতো। তাতে টাকা যা পেতো, তার চাইতে মাথা ফাটতো বেশি। এই মারামারি, রক্তারক্তি আমার সহ্য হয়নি।

বন্ধু এবং বন্ধুপত্নী এসে ঘরে ঢুকলেন। মেয়েটিও বিদায় নিয়ে চলে গেল।

দ্বিতীয় গল্পটি গ্রামের। মেট্রোপলিটান ঢাকা থেকে পঞ্চাশ কি ষাট মাইল দূরে এই গ্রামটি। সেখানে আমার এক বন্ধু থাকেন। তার বাবা পাকিস্তান আমলে ঢাকার সদরঘাটে ফুটপাতে বসে লুঙ্গি গেঞ্জি বিক্রি করতেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে তিনি কি করে যেন করাচীতে পান সাপ্লাই করার একটা কোটা পেয়ে যান। তার ভাগ্য ফিরতে শুরু করে। মোনায়েম খাঁর আমলে তার বড় ছেলে হয় কন্ট্রাক্টর। ছোট ছেলে ছাত্রনেতা। মুক্তিযুদ্ধের সময় বড় ভাই রাজাকার। ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা। দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিযোদ্ধা ছোট ভাইয়ের সুবাদে বড় ভাই সামান্য কিছুদিন জেল খেটে মুক্তি পান। তার প্রচুর টাকা পয়সা জমেছিল। নিজে রাজনীতিতে না নেমে ছোট ভাইকে রাজনীতি করার জন্য আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিতে থাকেন। ছোট ভাই প্রথমে আওয়ামী লীগ করতেন। কিছুকাল পর তার বিরুদ্ধে তেজগাঁ শিল্প এলাকায় অবৈধভাবে অর্থ আদায় এবং কয়েকটি পেট্রোল পাম্প লুটের অভিযোগ উঠতেই তিনি প্রথমে জাসদে (অবিভক্ত), তারপর ভাসানী ন্যাপে যোগ দেন। তার বিপ্লবী বক্তৃতা—বিবৃতি ছিল চমকপ্রদ। তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার আলাপ। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কিছুকাল পর তিনি জেনারেল জিয়ার দলে যোগ দেন। এরশাদের দলেও সম্ভবত কিছুকাল ছিলেন। এখনও আবার ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে। এবার ঢাকায় তার সঙ্গে আকস্মিকভাবে দেখা

হতেই তিনি হেসে বললেন, গাফ্ফার ভাই, আপনার দল যদি কখনো ক্ষমতায় যায়, তাহলে সেই দলেও আমাকে দেখবেন।

বললাম, আমার কোন দল নেই। সুতরাং আমার দলে যোগ দেয়া ইহজীবনে তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

তিনি বললেন, আমার রাজনীতি হচ্ছে বড় ভাইয়ের বিজনেস টিকিয়ে রাখা। আর বড় ভাইয়ের দায়িত্ব হচ্ছে, আমার এবং আমার রাজনীতির খরচ জুগিয়ে যাওয়া। এটাকে আপনি এনলাইটেন্ড সেল্ফ্ ইন্টারেস্ট বলতে পারেন। দেশের সকল দলের সকল নব্য রাজনীতিকেরই লক্ষ্য এখন এই সেল্ফ্ ইন্টারেস্ট।

এই 'ছোট ভাই' (সঙ্গত কারণেই তার নামটা উল্লেখ করলাম না) চেপে ধরলেন, তার গ্রামের বাড়িতে এক ঘন্টার জন্য হলেও আমাকে যেতে হবে। বললেন, জানি, আপনি অল্পদিনের জন্য দেশে এসেছেন, হাতে মোটেও সময় নেই। তবু সকালে হোক, বিকেলে হোক একটা ঘন্টা আমাকে অবশ্যই দিতে হবে। আমি আপনাকে গাড়িতে আমার গ্রামে নিয়ে যাব এবং এক ঘন্টা পর ঢাকা শহরে নিয়ে আসবো। আমি শুধু আমার ভাইয়ের একটা কৃষি খামারের প্রোজেক্ট আপনাকে দেখাতে চাই। এখনো শুরু হয় নি। শিগ্গিরই শুরু হবে।

আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কৃষি খামারের প্রোজেক্ট?

: হ্যাঁ, কৃষি খামারের প্রোজেক্ট। আপনিতো দেশে এসে শুধু খারাপ দিকটাই দেখছেন এবং খারাপ দিকটার কথাই হয়তো লিখবেন। কিন্তু দেশের ভালো দিকও অনেক আছে। স্বাধীনতার পর গত কুড়ি বছরে দেশে ছোট ছোট ম্যানুফেকচারিং শিল্প অনেক গড়ে উঠেছে। হালে তার কোয়ালিটিও বেশ উন্নত হয়েছে। আমরা এখন ছোটখাটো বহু জিনিসের ব্যাপারেই নিজেদের উপর নির্ভর করতে পারি। কোনো কোনো এলাকায় শহর থেকে শিক্ষিত লোক গ্রামে গিয়ে কৃষি ফার্ম গড়ার কাজে হাত দিয়েছেন। এক ভদ্রলোকের কথা শুনেছি, তিনি শুধু পেঁপের চাষ করছেন। বছরে লাখ লাখ টাকার পেঁপে বিক্রি করেন। আমার ভাই তার প্রোজেক্টের ফার্স্ট স্টেপ হিসেবে মাছ চাষ শুরু করেছেন। গত বছর একটি দীঘি থেকেই আমরা দেড় লাখ টাকার মাছ বিক্রি করেছি।

বললাম, তথাস্তু। আজই তোমার গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছি। কিন্তু দু'তিন ঘন্টার মধ্যে আমাকে ঢাকা শহরে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি সানন্দে রাজি হলেন এবং সেদিনই তার সঙ্গে গেলাম তার গ্রামের বাড়িতে। গ্রামটি উন্নত। মাটির দেয়াল এবং ছনের ছাওয়া ঘরের চাইতে ইটের দেয়াল এবং টিনের চালের ঘরের সংখ্যা আমার কাছে বেশি মনে হল। প্রিন্টেড টী

শার্ট এবং ট্রাউজার পরা বহু যুবকের আড্ডা দেখলাম গ্রামের বাজারে। 'ছোট ভাইয়ের বাড়িতেও চার ভিটিতে চারটি টিনের ঘর। কাচারী ঘরের সামনে ঢেঁকিঘর এবং বিরাট উঠান। তাতে হোগ্লার পাটিতে ধান শুকাতে দেয়া হয়েছে এবং দশ বারোজন বিভিন্ন বয়সের নারী পা দিয়ে ধান ছড়িয়ে দিচ্ছে। কয়েকজন মেয়ে ছালা ভর্তি করে শুকনো ধান নিয়ে যাচ্ছে ঢেঁকি ঘরে।

'ছোট ভাই' জানাল, এ পর্যন্ত তারা পঁচিশটির মতো ঢেঁকি বসিয়েছেন। মেয়েরা সেখানে পালা করে ধান ভানে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আজকাল গ্রামে গ্রামে ধানের কল বসেছে। ঢাকার এত কাছে তোমরা মান্ধাতার আমলের ঢেঁকি বসিয়েছো কেন?

'ছোট ভাই' বললেন, এটা বড় ভাইয়ের নয়, আমার আইডিয়া। প্রথম কথা ঢাকার ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের উপর আমার একদম আস্থা নেই। শহরেই লোড শেডিংয়ের অবস্থা আপনি দেখে এসেছেন। ধানের কল আনলে নিজেদের জেনারেটর বসাতে হয়। আমার বিশ্বাস, তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোতে এত বাড়তি জনশক্তি রয়েছে যে, তাতে বিদ্যুৎ শক্তির বদলে আমাদের উচিত বেশি করে জনশক্তি ব্যবহার করা। আমরা এখানে পঁচিশটি গ্রামের মেয়েকে কাজ দিয়ে পেরেছি। তাতে পঁচিশটি পরিবার আর অভাবে নেই। গ্রামেরও উন্নতি হচ্ছে, আমরা আশপাশের সব গ্রাম থেকে ধান কিনি। ধান মাড়াই। তারপর বড় বড় আড়তে সাপ্লাই দেই। এছাড়া বড় ভাইয়ের রয়েছে মাছের চাষ এবং একটি কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার প্রোজেক্ট। আমরা সরকারী সাহায্য ছাড়াই এসব করতে চাই। হয়তো ব্যাংক থেকে সামান্য লোন নিতে হবে।

ঠাট্টা করে বললাম, তোমরাই দেখছি এদেশে আসল মাওবাদী। 'ছোট ভাই' বললেন, মাওবাদ কি তা জানি না; কিন্তু কিসে নিজেদের উন্নতি হবে তা জানি।

হঠাৎ কৌতূহলি হয়ে বললাম, আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। তুমিতো দেখছি বেশ কিছু গ্রামের মেয়ে এনে কাজ দিয়েছো। এদের কেউ কেউ বৃদ্ধা। দু'এক বছর পর কাজে অক্ষম হয়ে পড়বে। যারা তরুণী, তারা বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে চলে যাবে। তাছাড়া শহরে এখন অনেক গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরি, বিউটি পার্লার। বেশ মোটা বেতন। এদের অনেকে হয়তো তার আকর্ষণে শহরে চলে যেতে চাইবে। তখন তোমাকে কি আবার নতুন করে মেয়ে খুঁজতে হবে না?

'ছোট ভাই' হেসে মাথা নাড়লেন । বললেন, না, গ্রামে মেয়ের অভাব অন্তত আরও কিছুকাল হবে না। তাছাড়া আমাদের এখানে যে মেয়েদের দেখছেন, তারা কখনো শহরে যেতে চাইবে না। কেন চাইবে না জানেন? ওই যে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়েটিকে দেখছেন ওর নাম নূরজাহান। ওকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন শহরে যেতে চাইবে না?

'ছোট ভাই' নূরজাহানকে ডাকলেন। গ্রামের মেয়ে হলেও কোনো আড়ষ্টতা নেই তার চলনে বলনে। তার মাথায় ঘোমটা নেই। ববছাঁটা চুল। দেখে একটু বিস্মিত হলাম। পরনে শাড়ি। আঁচলটা কোমরে গোঁজা। খালি পা। মুখে লাজুক নয়, বিষণ্ন হাসি।

'ছোট ভাই' তাকে বললেন, নূরজাহান, ইনি আমার বড় ভাইয়ের মতো। একজন সাংবাদিক। লজ্জা কোর না। এর কাছে তোমার সব কথা খুলে বলতে পারো। উনি সেসব কথা লিখবেন। তাতে দেশের আরও অনেক মেয়ের উপকার হবে।

নূরজাহান ঈষৎ ঘাড় নাড়ল। মনে হল, আমার সাথে কথা বলতে তার আপত্তি নেই।

চার

রবীন্দ্রনাথ তার 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় সকাতর অনুরোধ জানিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রকে। "পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎ বাবু, নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প।" ঢাকা থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে নূরজাহান নামে গ্রামের এক অতি সাধারণ মেয়ের কাহিনী শোনার পর আমার ইচ্ছে হল, ঢাকায় আমার যারা প্রিয় ঔপন্যাসিক, তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে, যেমন রাবেয়া খাতুন, সেলিনা হোসেন অথবা রশীদ হায়দারকে ডেকে বলি, ভাই, তোমাদের পায়ে পড়ি, ঢাকায় মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের স্টক ক্যারেক্টার, স্টক সিচ্যুয়েশন নিয়ে অনেক গল্প লেখা হয়েছে, তোমরা রাজধানীর মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরের নূরজাহান নামে একটি সাধারণ মেয়েকে নিয়ে একটি গল্প লেখো। বাংলাদেশে নূরজাহান এখন একজন নয়। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে নূরজাহান। খবরের কাগজে প্রতিদিনই তারা খবর। কিন্তু খবরের বেশি কিছু নয়। এক ভোরের কাগজ যেমন পরদিন ভোরে বাসি হয়ে যায়, তেমনি নূরজাহানেরাও বাসি হয়ে যায় পরদিনই এবং তারা বাসি খবরে পরিণত হচ্ছে প্রতিদিন।

আমার কাহিনীর নূরজাহানের বয়স এখন পঁচিশ কি ছাব্বিশ। কিন্তু তার জীবনে দুঃস্বপ্নের রাত শুরু সেই ষোল বছর বয়সেই। গ্রামের মেয়ে। বাবা দরিদ্র চাষী। কিন্তু মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর শখ ছিল। নূরজাহান গ্রামের স্কুলে ক্লাশ নাইন পর্যন্ত পড়েছে। এই ঢাকা শহরে এক আত্মীয়-বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সে অপহৃত হয়। অপহরণকারীরা সংঘবদ্ধ দল। পরে সে বুঝতে পারে, নারী পাচার তাদের ব্যবসা। প্রথমে তাদের যশোরের একটি গ্রামে নিয়ে রাখা হয়। তাদের দলে ছিল দশটি

মেয়ে। ষোল বছরের কুমারী থেকে ত্রিশ বছরের বিবাহিতা নারীও ছিল সে দলে। অপহরণকারীরা প্রতি রাতেই তাদের কাউকে না কাউকে ধর্ষণ করতো। নূরজাহানকে অন্তত পাঁচজন পুরুষ ধর্ষণ করে। সেখান থেকে সীমান্ত পার করে তাদের চালান করা হয় কলকাতায়। কলকাতা থেকে বোম্বে। বোম্বে থেকে তাকে চালান করা হয় করাচীতে। এক পাকিস্তানী প্রৌঢ় ব্যবসায়ী তাকে দাসী হিসেবে কিনে নেন। তার সঙ্গের দুটি মেয়ে চালান হয় কোনো আরব দেশে। অন্যান্য মেয়ের খবর সে জানে না।

নূরজাহান তিন বছর ছিল পাকিস্তানে। কয়েকবার সে হাতবদল হয়েছে। করাচীর সিন্ধি ব্যবসায়ী তাকে বিক্রি করে দেন মুলতানের এক পাঞ্জাবী জমিদারের কাছে। ভদ্রলোকের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু তার হারেমের তিনটি মেয়েই সুন্দরী এবং কিশোরী। প্রথম মেয়েটি 'আজাদ' কাশ্মীরের, দ্বিতীয় মেয়েটি সোয়াত রাজ্যের, তৃতীয় মেয়েটি কুর্দী। এই বৃদ্ধ পাঞ্জাবী জমিদারের বহুদিনের সখ তিনি এক বাঙাল আওরতের স্বাদ গ্রহণ করবেন। একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় তার এই সখ বহুদিন পূর্ণ হয়নি। এবার নূরজাহানকে পেয়ে তিনি সেই সখ মেটালেন।

এই পাঞ্জাবী জমিদারই নূরজাহানকে লাহোরের হীরামুণ্ডিতে তার এককালের রক্ষিতা এক বাঈজীকে উপঢৌকন দেন। এই বাঈজীরও বয়স হয়েছে। তার কাছে যেসব ধনী ক্লায়েন্ট আসতো; তারা মোটা টাকার বিনিময়ে উপুরি হিসেবে পেতো 'বেঙ্গল বিউটি' নূরজাহানকে। তার চুল ববছাঁটা করে এই বাঈজী। কিছু হিন্দী-উর্দু নাচগানও শেখায়। হীরামুণ্ডি থেকে নূরজাহান এক শিখ যুবকের সাথে পালায় ভারতে। সেখানে পুলিশের হাতে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ধরা পড়ে শিখ যুবক। তাকেও শিখ যুবতী ভেবে পুলিশ প্রথমে জেলে নিয়ে গিয়েছিল। পরে তাকে বাঙালী বুঝতে পেরে 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারি' অভিযোগে আটক করে একদল বাঙালীর সঙ্গে রেখে দেয়। পরে জেল থেকে মুক্ত হয়ে নানা ঘাটের পানি খেয়ে নূরজাহান বাংলাদেশে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। এসে দেখে তার বাবার মৃত্যু হয়েছে। মা আরও দুটি সন্তান নিয়ে কায়ক্লেশে বেঁচে আছেন। সেই থেকে নূরজাহান গ্রামের এই ধান ভানার খামারে কাজ করছে। সে অতীতের দুঃস্বপ্নের দিনগুলোকে ভুলে গিয়ে নতুন জীবন, স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চায়। শহরে আর ফিরে যেতে চায় না।

নূরজাহানের কাছে তার বিষাদ সিন্ধুর দুঃখগাঁথা শুনতে গিয়ে এমন কিছু তথ্য জানতে পারলাম, তা বাংলাদেশে এখন আর কোনো নতুন খবর না হলেও আমার কাছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হল। যেমন পাকিস্তানের বড় বড় শহরগুলোতে— করাচী, লাহোর, মুলতান রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদে বড়লোকদের বাড়িতে চাকর

এবং চাকরানী বলতে অধিকাংশই এখন বাংলাদেশের বাঙালী। এদের অনেকেই কলেজে পড়া—এমন কি গ্রাজুয়েট। এদের অনেকে আদম ব্যবসায়ীদের পাল্লায় পড়ে অথবা নিজেরাই ভালো চাকরির প্রলোভনে পড়ে পাকিস্তানে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বড়লোকদের বাড়িতে চাকর চাকরানী হয়েছে। নূরজাহানের মতো অসংখ্য বাঙালী মেয়ে আছে পাকিস্তানী বড়লোকদের ঘরে ক্রীতদাসী হিসেবে। পতিতাপাড়াতেও তাদের সংখ্যা কম নয়। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে বাঙালী মেয়েদের বিরাট 'বাজার'। বোম্বে, করাচী ইসলামাবাদ এই বাঙালী নারীপণ্য পাচারের বড় কেন্দ্র। ভারত, পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশেও অসংখ্য বাঙালী বহিরাগত জেলে পচছে। সরকারী পর্যায়ে তাদের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা হয়; কিন্তু সহজে দুর্ভাগ্যের অবসান হয় না।

নূরজাহান এক বাঙালী যুবকের কথা বলল। লাহোরে তার সঙ্গে নূরজাহানের পরিচয়। সে এক পাঞ্জাবী খানের গৃহভৃত্য। বিএ পড়ার সময় ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পুলিশের সঙ্গে গণ্ডগোলে দেশ ছেড়ে পালায়। পাকিস্তানে 'অবৈধ অনুপ্রবেশের' পর এই খান সাহেবের কৃপায় বৈধভাবে বসবাস করছে। খানের জুতো পালিশ করা থেকে শুরু করে সব কাজই তাকে করতে হয়। খান তাকে মাঝে মাঝে রেগে গেলে 'বঙাল কুত্তা' বলে গালি দেন। পাকিস্তান ভাঙার জন্য "বেঈমান বাঙাল জাতিকে" দায়ী করে তাদের একমাত্র প্রতিভূ হিসেবে এই বাঙালী যুবককেই নানা বিশেষণে বিশেষিত করেন। তবে বেতনটা তিনি ভালোই দেন, যা বাংলাদেশের একজন ছোটখাটো অফিসারও সৎ উপায়ে পান না। এই বাঙালী যুবকের কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স হচ্ছে, মাঝখানে সে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করে এসেছে। মফঃস্বল শহরের বনেদী অভিজাত ঘরের সুন্দরী কলেজে পড় য়া মেয়ে। স্ত্রীকে সে নিয়মিত চিঠি লেখে এবং টাকা পাঠায়। স্ত্রী এবং তার বাবা মা জানে সে পাকিস্তানে এক ব্যবসায়ী ফার্মে ভালো চাকুরিয়া। শিগগিরই সে দেশে ফিরে আসবে নিজেই ব্যবসায়ে নামার জন্য।

ঢাকায় ফেরার পথে গাড়িতে বসে 'ছোট ভাইকে' বললাম, তোমাদের টেকিশাল দেখার চাইতেও নূরজাহানের সঙ্গে আলাপ আমার কাছে বেশি লাভ মনে হচ্ছে।

'ছোট ভাই' বলল, নূরজাহানের মতো আর তিনটি মেয়ে আমাদের এখানে কাজ করছে। তারা বিদেশে পাচার হয় নি, কিন্তু পতিতাপাড়ায় বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা গ্রাম ও শহর থেকে যে বিপুল সংখ্যক নারী বিদেশে পাচার হয় বা পতিতাপাড়ায় বিক্রি হয়, তাদের মধ্যে কত পার্সেন্ট উদ্ধার হয় বা সমাজ জীবনে পুনর্বাসিত হয়?

'ছোট ভাই' বলল, খুব কম পার্সেন্ট। একেবারেই নগন্য সংখ্যক বলতে

পারেন। খুব কম মেয়েই স্বেচ্ছায় বিদেশে কিংবা পতিতাপাড়ায় যায়। বেশিরভাগ যায় অভাবে পড়ে, স্বামী, শ্বাশুড়ি বা পরিবারের অত্যাচারে এবং শহরে বা বিদেশে চাকুরি পাওয়ার প্রলোভনে ও মিথ্যা আশ্বাসে ভুলে। অনেককে বিয়ে করে বা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও ঘর থেকে বের করে আনা হয়। এদের মধ্যে খুব কম মেয়েকেই পুলিশ উদ্ধার করতে পারে অথবা করে। এই ব্যাপারে সরকারেরও সদিচ্ছা ও সংস্থানের অভাব রয়েছে। যেসব মেয়ে উদ্ধার হয়, তাদের মধ্যেও বেশিরভাগই সামাজিক গঞ্জনা, পারিবারিক লাঞ্ছনা ও প্রত্যাখ্যানের ভয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না। আবার পতিতা জীবনে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

আমাদের গাড়ি তখন ঢাকায় চলে এসেছে। আমরা মানিক মিয়া এভিনিউ ধরে এগুচ্ছি। 'ছোট ভাই' বলল, আপনি হয়তো নারীমুক্তি নিয়ে বড় বড় তত্ত্বকথা লিখতে চান অথবা লিখবেন। আমি সহজ কথায় বুঝি, বাংলাদেশ থেকে নারী পাচার এখন বন্ধ করা যাবে না। আমাদের এক্সপোর্ট প্রোমোশনের একটা বড় আইটেম বা কমোডিটি এখন নারী। মিডল-ইস্টে, ফার ইস্টে এখন আমাদের কত বড় মার্কেট! আপনি কি করে এটা বন্ধ করবেন? আগে আমাদের রফতানী পণ্য ছিল মসলিন, নীল, পাট, চা, তামাক, মসল্লা, কার্পাস কত কিছু! একে একে সব গেছে। এখন আমাদের রফতানী আয়ের ৪৫ পার্সেন্টি আসে গার্মেন্টিস শিল্প থেকে। দশ থেকে কুড়ি পার্সেন্টি হয়তো অন্যান্য পণ্য এবং ছোটখাটো ম্যানুফেকচারিং শিল্প থেকে। বাকি অঘোষিত এবং বৃহত্তম অংশই আদম ব্যবসা এবং নারী ব্যবসা থেকে। নারী এখন আমাদের আনডিক্লেয়ার্ড এক্সপোর্ট কমোডিটি। সরকার যারা চালান, তাদেরও বহু মাথা এই ব্যবসায়ে জড়িত। গার্মেন্টিস শিল্পের বর্তমান রফতানী আয়ও অনিশ্চিত। আমেরিকা যদি কোটা কমাতে থাকে বা বন্ধ করে, তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের নারীর এখনও বিশ্ববাজারে স্থিতিশীল চাহিদা এবং দামও কমপিটিটিভ। আপনি এই ব্যবসা বন্ধ করতে পারবেন? পারবেন না। বড় বড় প্রবন্ধ লিখতে পারবেন।

পাঁচ

আমার মেয়ে বিনীতা এবার (১৯৯৩) আমার সঙ্গে ঢাকায় বেড়াতে গিয়েছিল। ১৯৭৭ সালে লন্ডনে আসার পর সেও আর দেশে যায়নি। এদেশেই সে বড় হয়েছে। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখেছে। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর এখন সেন্ট্রাল লন্ডনে চাকরি করছে। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো তার খুব শখ। একবার ছোট বোনকে এবং আরেকবার বড় বোনকে সঙ্গে নিয়ে তারা একা একাই নিউইয়র্ক,

এথেন্স ঘুরে এসেছে। ঢাকায় গিয়ে তার শখ ছিল সে একা একাই সারা শহর ঘুরে দেখবে। নিজের দেশ। সে বাঙালী মেয়ে। তার উপর দিনের বেলা সে ঘুরবে। তার ভয়টা কি? আমার আত্মীয়স্বজনেরা আৎকে উঠলেন, না, না, তা হয় না। গাড়ি আছে, ড্রাইভার আছে। সঙ্গে একজন পুরুষ আত্মীয় যাবে।

পুরুষ আত্মীয় যাবে? আমি মনে মনে চমকে উঠলাম। আমার মেয়েরা নব্বুইয়ের দশকের নারীবাদী চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। একজন পুরুষ আত্মীয় সঙ্গে যাবে বলা হলেই হয়তো ভাববে, বাবা ঢাকায় এসে সুযোগ পেয়ে মেয়ের উপর বাপ হিসেবে তার মেল ডমিনেন্স খাটাতে চাচ্ছেন। একজন পুরুষ পাহারাদার সঙ্গে দিতে চাচ্ছেন। মেয়েকে এখনো অবলা ভাবছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ সে করবে।

মনের শঙ্কা মেয়েকে বুঝাতে পারবো না। এই শঙ্কা পুরুষ হিসেবে নয়। বাপ হিসেবে। তার মায়েরও এই একই শঙ্কা। কারণ, দু'জনেই আমরা ঢাকার কাগজ নিয়মিত পড়ি। প্রত্যেকদিন কাগজে গড়পরতা দশটা থেকে পনেরটা নারী নির্যাতনের খবর পড়ি। তাতে থাকে কিশোরী মেয়ের চোখে মুখে এসিড মারা, স্কুলে যাওয়ার বা আসার পথে অপহরণ, ধান খেতে নিয়ে উপর্যুপরি ধর্ষণের পর মেয়েটিকে হত্যা, অপহৃতা নারীকে পতিতা পাড়ায় বিক্রি বা বিদেশে পাচার ইত্যাদি। তার উপর প্রায় প্রত্যেকদিনই রহস্যজনক মৃত্যু বা আত্মহত্যার খবর। বাপ যৌতুকের প্রতিশ্রুত টাকা দিতে না পারায় স্বামী বা শ্বাশুড়ির নির্যাতনে নববধুর মৃত্যুতো এখন বাংলাদেশে একটি গা-সহা ব্যাপার।

বিনীতাকে অবশ্য এসব শংকার কথা বলতে হল না। তার আগেই সমস্যাটির সহজ সমাধান হয়ে গেল। দেখা গেল, ছোট কার নয়, একটা বড় পিক-আপ পাওয়া গেছে। আমার কয়েকজন আত্মীয়ের ছেলেমেয়ে আবদার ধরেছে, তারাও শহরের লালবাগ দুর্গ, জাদুঘর, মায় সোনারগাঁও শহর পর্যন্ত ঘুরে আসবে। তাদের দেখাশোনার জন্য সঙ্গে একজন বয়স্ক পুরুষ আত্মীয় যাবেন। আমার মেয়ের তাতে আপত্তি হল না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বাংলাদেশে—এমনকি ঢাকা শহরেও নারী শিক্ষা এবং নারীর জীবিকা অর্জনের সবচাইতে বড় বাধা তার নিরাপত্তাহীনতা। বাঙালী নারীর এই নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কে মালেকা বেগম, সেলিনা আখতার জাহান প্রমুখ তাদের বিভিন্ন প্রবন্ধে যেসব কথা বলেছেন তা এতটুকু অত্যুক্তি নয়। কয়েকদিন ঢাকায় অবস্থানের পর বুঝলাম, আমার এক বন্ধুপত্নী তারানা যে বলেছেন, 'এই রাজধানী ঢাকা শহরে আমরা একটি নারীও আজ নিরাপদ নই, 'তা বাড়িয়ে বলা কথা নয়। আমি কয়েকদিন আমার এক আত্মীয় খালেদের স্বামীবাগের বাসায় ছিলাম। তার মেয়ে শর্মির বয়স এগার কি বার। এই

পরিবারটিকে ঢাকার এলিট এবং অভিজাত মধ্যবিত্ত পরিবার হিসেবে অনায়াসে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রোজ শর্মি মোটরে চড়ে পুরনো বিশ্বস্ত ড্রাইভারের সঙ্গে স্কুলে যায় এবং ঘরে ফেরে। তবু বাবা-মায়ের স্বস্তি নেই। অতি ব্যস্ত ব্যবসায়ী খালেদের সকাল এবং বিকেলের একটা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, মেয়ের সঙ্গে স্কুলে যাওয়া এবং আবার তাকে ঘরে নিয়ে আসার কাজে। শুধু খালেদ নয়, ঢাকার স্কুল ও কলেজগামী সকল মেয়ের বাবা-মায়ের দিনের একটা বড় কাজই দেখলাম, মেয়েকে পাহারা দিয়ে স্কুলে বা কলেজে নিয়ে যাওয়া এবং বিকেলে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। যাদের গাড়ি আছে তারা গাড়িতে, যাদের গাড়ি নেই তারা স্কুটারে, রিকশায়, এমনকি অনেকে গাড়ি ভাড়া জোগাতে না পেরে পায়ে হেঁটে হলেও মেয়েকে পাহারা দেওয়ার জন্য স্কুলে যাতায়াত করে। একটা স্কুলে ছুটির সময় গিয়েছিলাম। গেটে ছাত্রীদের চেয়েও উদ্বিগ্ন বাপ মা ও অভিভাবকের সংখ্যা বেশি। বন্ধু পত্নী তারানা আমাকে বলেছেন, গাফ্‌ফার ভাই, আপনি ভেবে দেখুন। আমি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধু। স্বামীর আয় উপার্জনে সংসার চলে না। নিজেও পার্ট টাইম একটা কাজ করি। আজকাল ঝি-চাকরানীর যুগ নেই। সস্তায় কাজের মেয়ে পাওয়া যায় না। নিজে চাকরি করে এসে ঘরের সব কাজ করতে হয়। তার উপর আপনার বন্ধুকে অথবা আমাকে যদি রোজ দু'বেলা কুড়ি পঁচিশ টাকা খরচ করে, সময় নষ্ট করে স্কুলে মেয়েকে আনা নেওয়া করতে হয়, তাহলে আমরা বাঁচি কিভাবে?

এই সমস্যাটি এখন ঢাকার ধনী গরীব সকল পরিবারের। অথচ আঠারো বছর আগেও আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতার সমস্যা এতটা প্রকট ছিল না। আমার বড় মেয়ে তনিমা ঢাকার কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রী ছিল। নীচের ক্লাশে থাকা অব্দি তাকে গাড়িতে করে স্কুলে নিয়ে গেছি এবং বাসায় ফিরিয়ে এনেছি। কিন্তু ক্লাশ এইট বা নাইনে পড়ার সময় সে নিজেই কখনো গাড়িতে ড্রাইভারের সঙ্গে অথবা একা রিকশায় স্কুলে যাতায়াত করেছে। কখনো বড় বিপদাশঙ্কা মনে জাগে নি। সেই ঢাকা শহরে আজ এ কী অবস্থা!

আমি যখন ঢাকায়, তখন চট্টগ্রামের হালিশহরের ঘটনায় সারাদেশ বিক্ষুব্ধ। নারী ধর্ষণের মতো একটি জঘন্য কাজের পর কিছু উচ্ছৃংখল নৌসেনা প্রকাশ্যে হত্যা ও গণনির্যাতনের যে তাণ্ডব চালায়, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। আরও অবিশ্বাস্য, বিশ শতকের এই শেষ দশকে মৌলবী বাজারের কমলগঞ্জ থানার এক গ্রামে এক লম্পট ইমামের ফতোয়ায় নূরজাহান নামে এক তরুণীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার খবর। লন্ডনে ফিরে এসে ঢাকার কাগজে পড়েছি আরও একটি মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। খবরটি ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) মাসের মাঝামাঝি সময়ের। ঘটেছে

চট্টগ্রামে। অর্চনা ও বিউটি বড়ুয়া নামে দুই বোন। কাজ করে ইয়াং ওয়াং গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে। রাতে কাজ শেষ করে তারা ফ্যাক্টরির স্টাফ বাসে বাসায় ফিরে যাচ্ছিল। মাঝপথে সঙ্গের যাত্রীরা একে একে নেমে যায়। তখন বাসে শুধু দুই বোন এবং স্টাফ বাসের কর্মচারীরা। তারা দু'বোনকে ধর্ষণের জন্য হামলা চালায়। আত্মরক্ষার জন্য দু'বোন চলন্ত বাস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাস্তায়। বাসের চাকার তলে পড়ে যাওয়ায় মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে অর্চনার। বিউটি মরে নি, আহত হয়েছে। ঢাকার সাপ্তাহিক 'খবরের কাগজ' পত্রিকায় কলামিস্ট সঞ্জীব চৌধুরী তার 'একান্ত ভাবনা' কলামে (২ মার্চ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৪০) খবরটি উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন "এই ঘটনার পরবর্তী খবর আর কোনো পত্রিকায় আমার চোখে পড়ে নি।" চোখে পড়ার কথাও নয়। এই ঘাতক বাস-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হয়তো কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। একটি গরীব বৌদ্ধ মেয়ের এই মর্মান্তিক মৃত্যু আমাদের সমাজপতি অথবা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তাদের কাছে সম্ভবত কোনো বড় অপরাধ মনে হয় নি। অথবা লোক দেখানো ভাবে এই অপরাধী বাস কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও তারা খবরটি বাসি না হতেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হয়তো সকল শাস্তি এড়িয়ে সমাজে আবার স্থান করে নিচ্ছে। আমার কাহিনীর নূরজাহানের মতোই অর্চনার মৃত্যুর খবর পরদিনই হয়ে গেছে বাসি খবর। সুতরাং সঞ্জীব চৌধুরী কি করে এই ঘটনার 'পরবর্তী খবর' পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন?

মৌলবী বাজারের নূরজাহান, চট্টগ্রামের অর্চনা তো মরে গিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু আমার কাহিনীর সেই নূরজাহান, যে পতিত জীবন থেকে ফিরে এসে লোকচক্ষুর আড়ালে গ্রামে ঢেঁকি পাড় দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে অথবা প্রকাশ্যে যারা 'ইনোসেন্ট' কুমারী কন্যা অথবা সতী গৃহবধূ, কিন্তু অন্তরালে বহু ভোগ্য নারীপণ্য, তাদের সংখ্যা যেমন কম নয়, তেমনি জীবনও কম বিড়ম্বিত নয়। সামাজিক সংস্কারের রক্তচক্ষুর ভয়ে তাদের নিয়ে লেখাজোকাও নিরাপদ নয়। শিক্ষিত মার্জিত এবং সমাজে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন স্বামী যখন চাকুরিতে দ্রুত প্রোমোশন বা বেতন ও স্ট্যাটাস বাড়ানোর জন্য ঘরের সুন্দরী শিক্ষিত বৌকে তার আপত্তি সত্ত্বেও বসের কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠান, অথবা সংসারের সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য কোনো বাপ-মা যখন তাদের কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মেয়ের বড় বড় হোটেলে মাঝে মাঝে বিদেশী ট্যুরিস্টদের সঙ্গে নিশিযাপনের দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকেন, তখন অনেকেই বড় সামাজিক ধস বা বিপর্যয় বলে এটাকে মনে করেন না। হঠাৎ ধরা পড়ে না গেলে এই ব্যাপারে কোনো নিন্দা নেই, শাস্তি নেই। এটা যেন একটা অঘোষিত সমাজগ্রাহ্য ব্যবস্থা। সকলেই ব্যাপারটা জানেন, তবে না জানার ভান করাই হচ্ছে রীতি। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জেনেছি, বিমান বন্দর, নৌ বন্দর কিংবা

সীমান্তে কাস্টমস-এর বিশেষ বিশেষ ঘাঁটিতে কোনো কোনো উচ্চপদ ত্রিশ চল্লিশ এমনকি পঞ্চাশ লাখ টাকায় বিক্রি হয়। অর্থাৎ এই পরিমাণ টাকা ওই পদে ট্রান্সফার, প্রোমোশন ও বহাল থাকার জন্য উপরঅলা সিন্ডিকেটকে দিতে হয়। সেই সঙ্গে সুন্দরী বৌ, মেয়ে অথবা সংগ্রহ করে আনা আকর্ষণীয় কিশোরী ও তরুণীও উপঢৌকনের সামগ্রী। ব্যাংকের চাকুরিতে ফরেইন পোস্টিং লাভের ক্ষেত্রেও একই ধরনের কাহিনী শুনেছি, সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের সময় পাইনি।

বারিধারার একটি বাড়িতে এক উচ্চপদস্থ সিভিল অফিসারের বাসায় আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আমার চাইতে বয়সে বছর দশেকের ছোট হবেন। আমি যখন ঢাকায় সাংবাদিক, তখন তার সাথে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। তখন তিনি থাকতেন আজিমপুর কলোনীতে। তারপর মাত্র দেড়যুগের ব্যবধানে কি করে বারিধারার চমক লাগানো বাড়িতে তার উত্তরণ ঘটল, সে কাহিনী জানি না। পুরনো ঘনিষ্ঠতার সুবাদে তিনি স্বয়ং আমার সঙ্গে দেখা করে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। চোখের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললেন, ফারাক্কার জন্য যদিও দেশটা ডেজার্ট হতে চলেছে কিন্তু আমরা মানুষগুলো এখনো ড্রাই হয়ে যাই নি। লন্ডনে থাকেন, আপনাকে টিচার খাইয়ে বিদায় দেব না। সিভাজ রিগ্যাল, না রয়াল স্যালুট কোন্‌টা চলবে? আপনার আমার বেশ কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধবকেই আসতে বলেছি।

বললাম, আমাকে কেবল ডাবের পানি দিলেই চলবে। বহুকাল গাছ থেকে সদ্য পেড়ে আনা ডাবের পানি খাই না।

বন্ধু বললেন, ডাবের পানির সঙ্গে একটু একটু স্কচ মিশিয়ে দিতে পারি, মন্দ লাগবে না।

বললাম, গরীব দেশ। শুনেছি বহু লাইফ সেভিং মেডিসিন দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু মদ দুষ্প্রাপ্য নয়।

বন্ধু আমার খোঁচাটা সহ্য করতে পারলেন না। বলে উঠলেন, এটা কি আপনাদের আমলের ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ পেয়েছেন? ঘোড়দৌড় বন্ধ, জুয়া বন্ধ, এমন কি হোটেলে বসে কোনো মুসলমান বাঙালীর জন্য মদ খাওয়াও নিষিদ্ধ। জিয়া এসে আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করলেন। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এসব কেতাবী কথা ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেন। দেশে আবার ইসলাম ফিরিয়ে আনলেন। বড় বড় হোটেলে আবার বার চালু হল। আমরাও ঘরে বাইরের বসে গলা ভেজাবার একটু সুযোগ পেলাম। এরশাদ সাহেব এসেতো ইসলামকে একেবারে রাষ্ট্রধর্মই করে দিলেন। আর তখন থেকেই ঢাকায় যে নাইট লাইফ শুরু হয়েছে সেই নাইট লাইফের কথা আপনি লন্ডনে প্যারিসে বসেও আন্দাজ করতে পারবেন না। আপনাদের সময়তো ঢাকা শহরে সন্ধ্যা আটটা না বাজতেই রাত নেমে আসতো। এখন তিনটাতেও রাত শেষ হয় না। শেখ মুজিব তো আমাদের

একেবারে চাষাবাদের যুগে নিয়ে যাচ্ছিলেন। জেনারেল জিয়া এসে আমাদের সিভিলাইজেশনে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন।

আমাদের সমাজতাত্ত্বিকেরা কি ভাবেন জানি না, আমার একটা ধারণা, জেনারেল জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের আইয়ুব, ইয়াহিয়ার মতো একজন মিলিটারি ডিক্টেটর হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের এলিট ও নব্যধনী শ্রেণীর (নব্য ধনীদের অনুগৃহীত বুদ্ধিজীবীসহ) একটা বড় অংশের মধ্যে যে জনপ্রিয়, তার একটা কারণ হয়তো এই যে, এরা মনে করেন, শেখ মুজিবের ব্যাংক, কলকারখানা রাষ্ট্রীয়করণ, বিভিন্ন পেশার সমীকরণ (ব্যারিস্টার ও উকিলদের মধ্যে বিভেদ লোপ, প্রুফ রিডারদেরও সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি দান ইত্যাদি পদক্ষেপ), ওয়েস্টার্ন কলোনিয়াল কালচারের প্রতি বিমুখতা এবং খাঁটি বাঙালীয়ানা তাদের শ্রেণীগত অস্তিত্ব এবং সামাজিক আভিজাত্য অর্জনের ও বিকাশের বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। জেনারেল জিয়া ক্ষমতা দখল করার পর ইসলাম ধর্মের সাইনবোর্ডের আড়ালে এসব বাধা দূর করেন এবং বাঙালী নব্যধনী শ্রেণী আবার তাদের শ্রেণীগত অস্তিত্ব ও সামাজিক আভিজাত্যের নিরাপত্তার গ্যারান্টি ফিরে পান। আমাদের নব্যমধ্যবিত্ত ও নতুন এলিটক্লাশ যে ভারতের বা পশ্চিমবঙ্গের বনেদী মধ্যবিত্তদের চাইতে পাকিস্তানের মধ্যবিত্তদের বেশি পছন্দ করেন, বেশি আত্মীয় মনে করেন, তার মূল কারণও ধর্মীয় বন্ধন নয়, একই নিও কলোনিয়াল কালচারের প্রভাবে তারা পরস্পরের বেশি কাছাকাছি। ভারতে গণতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এবং নেহেরুর হাতে ভারতে মাল্টি কালচারাল সোসাইটি মডার্নাইজেশন ও বিকাশের পথে দ্রুত এগুবার ফলে সেখানে নিও কলোনিয়াল কালচারের প্রভাব এবং তার ভালগারিটিও একটা বিশেষ স্তরে সীমাবদ্ধ। ভারতের শাসক শ্রেণী অথবা বনেদী মধ্যবিত্তের গায়ে গলাবন্ধ কোট, তার ব্যবহারের জন্য ইন্ডিয়া মেড সেকেলে মডেলের এম্বাসাডার গাড়ি, সেদেশের মজবুত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির যতটা পরিচয়ই বহন করুক না কেন, ঢাকার নব্য মধ্যবিত্তদের তা চোখ ভরায় না। একেবারে সর্বাধুনিক জাপানী, জার্মান বা সুইডিশ কার, তাইওয়ান বা সিঙ্গাপুর ডিজাইন বা মেড স্যুট টাই, পাকিস্তানী বা গুজরাটি স্টাইলে সালোয়ার-কামিজ বা শাড়ি এখন ঢাকার চোখ ধাঁধানো আকর্ষণ। ঢাকার সমাজকে আমরা এখন কি বলবো? পোস্ট কলোনিয়াল সোসাইটি? আমাদের দেশের এই পোস্ট কলোনিয়াল আমলে দীর্ঘসময় স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে সমাজের প্রগতিশীল আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিকাশ রুদ্ধ থাকায় এবং প্রয়োজনীয় এগরেরিয়ান রিফর্মস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডভান্সমেন্টের অভাবে নতুন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেমন ইমপোর্ট নির্ভর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছে, তেমনি প্রয়োজনীয় মডার্নাইজেশনের অনুপস্থিতিতে বাঙালীয়ানাকে পশ্চাৎপদতা ও গ্রাম্যতা ভেবে ইমপোর্টেড কালচার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছে। এটা খাঁটি ওয়েস্টার্ন কালচার নয়। নব্য ঔপনিবেশিক প্রভু ও বাজার অর্থনীতির মুরুব্বীদের স্বার্থরক্ষার জন্য তৈরী এই নিও কলোনিয়াল কালচার তাইওয়ান, হংকং, ব্যাংকক, পিণ্ডি প্রভৃতি

শক্তিশালী উপকেন্দ্র হয়ে ঢাকার বা বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এসে অনুপ্রবেশ করেছে। এই নিও কলোনিয়াল কালচারের সকল প্রকার ভালগারিটি আমাদের সচেতন, গতিশীল, দেশ ও গণমুখী মূল্যবোধকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করছে। এই ভালগারিটির দগদগে ঘা এখন সমাজের সর্বাঙ্গে ফুটে বেরুচ্ছে। ধর্মান্ধতার প্রলেপ দিয়ে এই ঘা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন সমাজপতি ও শাসকশ্রেণী। মৌলবাদী (মোল্লাবাদী) ও সাম্প্রদায়িক কুপমণ্ডুকতা ও সন্ত্রাসের সঙ্গে তাই তাদের এত সহজ আপোষ ও সহযোগিতা।

সম্ভবত শেখ মুজিবের স্বল্লায়ু শাসনামলেই তাঁর কোনো কোনো নীতি ও পদক্ষেপের দরুন বাংলাদেশের নব্য ধনী, নতুন মধ্যবিত্ত ও শহুরে এলিট ক্লাশের স্বার্থ এবং তাদের নিও কলোনিয়াল কালচার হুমকির সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের মধ্যে শেখ মুজিব দ্রুত সমর্থন হারায় এবং নিও কলোনিয়াল স্বার্থ ও কালচারের জনপ্রিয় প্রোটেক্টর হিসেবে জেনারেল জিয়া মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ পান। লক্ষ্য করার বিষয়, বাংলাদেশের ডান, বাম, মধ্যবাম, মধ্যডান অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকের বিকাশ নব্য মধ্যবিত্ত ও এলিট শ্রেণী থেকে হওয়াতে এবং তাদের সামাজিক অবস্থানও এক হওয়াতে নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান হুমকির সম্মুখীন হলে তারা ডান বাম মতপার্থক্য ভুলে প্রায় অভিন্ন ভূমিকা গ্রহণে দ্বিধা করেন না। এজন্যই শেখ মুজিব ও তার শাসনকাল যেমন কট্টর ডানপন্থীর আক্রমণের টার্গেট, তেমনি কট্টর বামপন্থী তাত্ত্বিকেরও হিংস্র নখরাঘাত থেকে মুক্ত নয়। সর্বোপরি ফ্যাসিবাদী মোল্লাপন্থীদের হামলাতো রয়েছেই। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই চতুর্মুখী হামলা ও সমালোচনার মুখেও শেখ মুজিবের রাজনীতির গণসমর্থনের আসল ভিত্তিটি কিন্তু এখনো অটুট, অভগ্ন। পত্র পত্রিকা, পুঁথি পুস্তক, রেডিও টেলিভিশন থেকে তাঁর নাম দীর্ঘকালের জন্য মুছে ফেলা সত্ত্বেও তাঁর জনপ্রিয়তার গণভিত্তি ধীরে ধীরে হলেও সম্প্রসারিত হচ্ছে, সংকুচিত হচ্ছে না। বাংলাদেশের নির্বাচিত বি এস পি সরকারকে যারা গণতান্ত্রিক সরকার আখ্যা দিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার নামে সরকারকে গদীতে রাখার জন্য ঢাক পেটান, তারা এই নিও কলোনিয়াল কালচারের উপাসক নব্যধনী, শহুরে এলিট এবং তাদের অনুগৃহীত বুদ্ধিজীবীর দল। এদের কাছে শেখ মুজিব এখনো নিন্দা ও সমালোচনার টার্গেট। শেখ মুজিবের স্বল্লায়ু গণ-শাসনামলকেই এরা অগণতান্ত্রিক শাসন এবং পরবর্তী জঙ্গী একনায়কত্ববাদী একাধিক শাসনামলকে বহুদলীয়(?) গণতান্ত্রিক শাসন বলে প্রচার চালান। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা থেকেও বাংলাদেশের এই অবস্থার একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা যায়। রাশিয়ায় সোভিয়েত মডেলের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতনের পর ইয়েলৎসিনের শাসনামলকে জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক শাসন বলে এতকাল লন্ডনের যে 'টাইমস' পত্রিকা ঢোল পিটিয়েছেন, সে পত্রিকার ভাষ্যকার মস্কো থেকে তার এক রাশিয়ান বন্ধুর মন্তব্য উদ্ধৃত করে

এখন 'টাইমস' পত্রিকাতেই লিখেছেন, "Under Brezhnev, it was the intellectuals who criticised the state, while ordinary people tended to defend it, even if they grumbled about details. Today, it's the reverse, intellectuals may defend democracy, but most ordinary people think it has brought nothing but harm." (The Times. Monday March 8, 1993, Page 10.)

এর সরলার্থ ঃ ব্রেজনেভের আমলে বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রের সমালোচনা করতেন, সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রকে সমর্থন জানাতো। যদিও খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাদের অসন্তোষ ছিল। বর্তমানে অবস্থা বিপরীত। বুদ্ধিজীবীরা গণতন্ত্রকে সমর্থন জানাচ্ছেন, আর অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ভাবছে, বর্তমান ব্যবস্থা তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করে নি।"

উপরের মন্তব্যে ব্রেজনেভের নামটি সরিয়ে সেখানে শেখ মুজিবের নাম বসিয়ে যদি গোটা উদ্ধৃতি পাঠ করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের বর্তমান তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 'সুফলভোগী' সমর্থক কারা, তা কি আমার পাঠকদের বলে দেওয়ার আর কোনো প্রয়োজন আছে?

আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বারিধারার বন্ধুর আমন্ত্রণে সহজেই রাজি হলাম। ঢাকার নব্যধনীদের নাইট লাইফ বা নৈশজীবন সম্পর্কে বিদেশে বসে অনেক গল্প শুনেছি, তা কতটা সত্য, তা জানার সুযোগ হাতছাড়া করার ইচ্ছে হল না।

ছয়

আমার একটা ধারণা; যে কোনো বিগ সিটির আরবান এলিট ক্লাশের নাইট লাইফ বা নৈশ জীবন থেকে সেই শ্রেণীর এবং সামগ্রিকভাবে সেই শহরটির বাসিন্দাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের একটি তুলনামূলক ছবি পাওয়া যেতে পারে। ঢাকা এখনো লন্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও, এমনকি কলকাতার মতোও বড় শহর নয়; কিন্তু ইউরোপের বহু দেশের রাজধানী শহরের মতো অবশ্যই বড় শহরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বড় শহর হলেও ঢাকা এখনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল কিম্বা কসমোপলিটান শহর হয়ে ওঠেনি। ঢাকার সম্প্রসারিত ও উন্নত উপশহরগুলোতে বাড়িঘর নির্মাণে যে আধুনিক স্থাপত্যের ছাপ, সেই বাড়িঘরের বাসিন্দাদের জীবনে কসমোপলিটান সমাজের সংস্কারমুক্ত আধুনিকতার ছাপ এখনো তেমন পড়েনি। আধুনিকতার নামে নিও কলোনিয়াল কালচারের আয়াসলব্ধ অনুকরণটাই বেশি চোখে পড়ে। বাঙালীয়ানা বা বাঙালী সংস্কৃতি সম্পর্কেও অধিকাংশ নব্য মধ্যবিত্ত বা নব্য এলিট শ্রেণীর বাঙালীর ধারণা সীমাবদ্ধ। তাই বাংলা ভাষা, রবীন্দ্রসঙ্গীত, একুশে ফেব্রুয়ারী, পয়লা বৈশাখ ইত্যাদির প্রতি ঘটা করে আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রকাশকেই তারা স্বাদেশিকতার প্রতি তাদের নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে দেখাতে চান। দেশজ সংস্কৃতির

অন্তরঙ্গ ছাপ ঢাকার নব্য মধ্যবিত্তের অধিকাংশের জীবনযাত্রায় এখনো অনুপস্থিত।

প্রায় দুই দশক আগে আমি যখন ঢাকা থেকে বিদেশে চলে আসি, তখনো ঢাকা ছিল একটি বড় গ্রাম। এখন তাকে বলা চলে একটি বড় শহর; আধুনিক সংজ্ঞায় তাকে নগর বলাও সম্ভবত সঙ্গত নয়। লন্ডন থেকে দু'শ' তিনশ' মাইল দূরের একটি গ্রামেও আজকাল নগর জীবনের যেসব উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা রয়েছে, ঢাকা শহরে এখনও তা সুলভ নয়। এমন কি ভারতের একটি প্রাদেশিক শহর কলকাতার মাল্টি রেসিয়ালিজম ও মাল্টি কালচারালিজমের ছাপও ঢাকা শহরে নেই। ঢাকায় অসংখ্য চায়নিজ রেস্তোরা, কিন্তু লন্ডনের সোহো বা কলকাতার চীনা পল্লীর মতো সেখানে কোনো চীনাপল্লী নেই। কলকাতার চীৎপুর রোডের আশপাশে যে উর্দুভাষী জনবসতি, নাখোদা মসজিদ পর্যন্ত যার বিস্তার, তাকে মুসলমান পাড়া বলা হয়। ঢাকায় তেমন হিন্দু বা বৌদ্ধ পাড়া নেই। পুরনো ঢাকা শহরেরও পাড়া বিভক্তি নবাবী যুগের পেশাভিত্তিক; রেসভিত্তিক নয়। একমাত্র আরমানিটোলা (আরমেনিয়ানদের নাম অনুসারে) ছাড়া অধিকাংশ এলাকাই মাহুতটুলি, তাঁতী বাজার, শাঁখারী বাজার, কায়েতটুলি ইত্যাদি পেশাভিত্তিক জনবসতি হিসেবে চিহ্নিত ছিল এবং এখনো আছে। পাকিস্তান আমলে মোহাম্মদপুর থেকে মীরপুর এলাকা বিহারী বা মোহাজের প্রধান এলাকা হয়ে উঠলেও বিহারীপাড়া বা মোহাজের পাড়ার ছাপ তাতে তেমন পড়ে নি।

পাকিস্তানের লাহোর শহরের সঙ্গেও ঢাকার তুলনা করা চলে না। অথচ দুটিই মোগল আমলের পুরোন শহর। বৃটিশ আমলেই লাহোর ও ঢাকার পুরনো শহরের পাশাপাশি নতুন শহরের সম্প্রসারণ শুরু। কিন্তু লাহোরের মতো ঢাকার সামাজিক ও আর্থিক জীবনের বিকাশ ঘটে নি। তার কারণ সম্ভবত এই যে, লাহোর গোটা বৃটিশ আমলেও ছিল পাঞ্জাবের রাজধানী। পাঞ্জাবের মুসলিম ফিউডালরাও বনেদী এবং বিগ ফিউডাল। অন্যদিকে সেই মোগল আমলেই ঢাকা থেকে সুবে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় এবং বৃটিশ আমলে বঙ্গভঙ্গের স্বল্প কয়েক বছর ছাড়া প্রায় পুরো দু'শ বছর ঢাকা ছিল একটি অবজ্ঞাত জেলা শহর। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা ছিল সর্বপ্রকার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের স্পর্শবঞ্চিত। বৃটিশ আমলের বাংলাদেশে বিগ মুসলিম ফিউডাল বলতে ছিলেন মুষ্টিমেয় অবাঙালী ও উর্দুভাষী নবাব, মীর্জা ও সৈয়দ পরিবার। যেমন ঢাকার নবাব, মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার প্রমুখ। এই বহিরাগত ফিউডাল কালচার সাধারণ বাঙালীর জীবনে ছায়া ফেলেছে, কিন্তু তাকে প্রভাবিত করতে পারে নি। সাধারণ বাঙালী মুসলমানের জীবন দেশজ, গ্রামীন কালচার দ্বারাই বেশি প্রভাবিত

হয়েছে এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় রীতি-নীতি, প্রথা ও সংস্কার।

লাহোরে আগের ফিউডাল কালচার এবং নতুন কলোনিয়াল কালচার একে অন্যকে গ্রাস করে নি; সহাবস্থান করছে। এর বড় কারণ সম্ভবত বৃটিশ রাজশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতি সাবেক ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের মতো বিগ ফিউডাল শ্রেণীরও দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রদর্শন এবং বিনিময়ে বৃটিশ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ। অন্যদিকে পাঞ্জাব বা সিন্ধুর মুসলমান উঠতি বুর্জোয়া ও শিল্পপতিরাও সাবেক ভারতের অন্যান্য এলাকার মুসলমান বিগ বিজনেসের মতো বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহ ও প্রোটেকসন দান নীতির আওতায় অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে, তাদের চাইতে বৃহৎ ও প্রতিষ্ঠিত অমুসলিম ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য, মুসলিম বিগ ফিউডাল স্বার্থের দিকে একাত্মতার ও আত্মীয়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মুসলিম বিগ ফিউডাল স্বার্থের সঙ্গে উঠতি মুসলিম পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থের সমীকরণেরই ফল ভারত ভেঙে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি। এই দাবির মধ্যে একদিকে ভারতের মুসলিম সামন্ত শক্তির হারানো বাদশাহী ফিরে পাওয়া এবং অন্যদিকে বৃহৎ অমুসলিম পুঁজিপতিদের অসম প্রতিযোগিতার থাবা থেকে মুক্ত হয়ে মুসলিম উঠ্তি পুঁজিপতিদের প্রতিযোগিতাবিহীন অবাধ লুটপাটের প্রোটেকটেড মার্কেট লাভের স্বপ্ন একাত্ম হয়ে যায়। ফলে জিন্নার মতো এক আধা মুসলিম খোজা পরিবারের নতুন আইন ব্যবসায়ী, যিনি ইসলামের বিধিবিধান কিছুই জানেন না এবং মানেনও না এবং যিনি অমুসলিম প্রথায় (সিভিল ম্যারেজ) বিয়ে করেছেন, ভারতে 'ইসলামী হুকুমাত' কায়েমের জন্য সেই জিন্নার নেতৃত্বই বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেন মাহমুদাবাদের রাজা থেকে পাঞ্জাবের দৌলতানা পরিবার পর্যন্ত অধিকাংশ বিগ ফিউডাল পরিবার এবং অন্যদিকে মুসলমান উঠতি পুঁজিপতির দল। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় জিন্না ছিলেন ওয়েস্টার্ন স্টাইলের নিখুঁত অনুসারী। পরিণত বয়সেও দিনে তিন থেকে চার বার স্যুট টাই বদলাতেন। লিঙ্কন্‌স্ ইনের সাহেব ব্যারিস্টারদের কায়দায় ইংরেজি উচ্চারণ করতেন। তাতে ইংরেজি শিক্ষিত এবং নিও কলোনিয়াল কালচারের অনুরাগী মুসলমান নতুন মধ্যবিত্ত ও উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে জিন্না-নেতৃত্বের আকর্ষণ বেড়ে যায়। মুসলমান বিগ্ ফিউডাল শ্রেণীর অতীতমুখী ধর্মীয় জাত্যাভিমান যাতে আহত না হয়, সেজন্য জিন্না এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করলেন। তিনি তার ওয়েষ্টার্ন ড্রেস-স্যুট ও টাইয়ের সঙ্গে মাথায় এক টুপি চাপিয়ে নিজেকে "মুসলিম ভারতের অবিসম্বাদিত জাতীয় নেতায়" রূপান্তরিত করলেন। বৃটিশ আমলে অবিভক্ত ভারতের বিরাট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোর কাছে জাতীয় নেতা হওয়ার জন্য গান্ধীকে বিলেতে থাকতেই স্যুট টাই ত্যাগ করতে হয়েছিল; ভারতে ফিরে এসে তিনি হয়েছিলেন নেকেড ফকির;

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে তার প্যারিসে ধোয়া ওয়েস্টার্ন ড্রেস পুড়িয়ে ফলে ধূতি চাদর গ্রহণ করতে হয়েছিল; অরবিন্দকে আইসিএস হওয়ার তক্‌মা ছুঁড়ে ফেলে আশ্রমের ঋষি সাজতে হয়েছিল; আর করাচীর খোজা পরিবারের এক আইনজীবি, কেবল তার জিন্না নামের আগে মোহাম্মদ আলী লাগিয়ে এবং স্যুট টাইয়ের উপর টুপি চাপিয়ে রাতারাতি হলেন ভারতের মুসলমানদের "কায়েদে আজম"।

অবিভক্ত ভারতের রাজনীতিতে মুসলিম বিগ ফিউডাল স্বার্থ এবং উঠ্‌তি পুঁজিপতিদের স্বার্থের যে সহঅবস্থান ও একাত্মতা, তার প্রতিফলন তাদের 'কালচারের' ক্ষেত্রে দেখা গেছে। লাহোরের মতো শহরে একদিকে হীরামণ্ডিতে নৃত্য ও সঙ্গীতবিশারদ রূপসী বাইজী এবং তাদের মোগল আমলের ঘরানা আসর যেমন এখনও শহরের নৈশ জীবনের প্রধান আকর্ষণ; তেমনি বৃটিশ আমলের ওয়েষ্টার্ণ কলোনিয়াল কালচারের অনুকরণে নাইট ক্লাব, বড় বড় হোটেলে ক্যাবারে বেলি ডান্স এবং ফাঁকে ফাঁকে ডায়নারদের ডিনার ডান্স লাহোরের নাইট লাইফে বহুকালের বৈশিষ্ট্য। ত্রিশ বছর আগের কথা বলছি। তখন পাকিস্তান অবিভক্ত এবং 'ইসলামী জমহুরিয়াতের' দারুণ রমরমা অবস্থা। সম্ভবত ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। পাকিস্তান এয়ার লাইন্সের ঢাকা-লাহোর রুটে প্রথম বোয়িং বিমান চালু করা হয়েছে। উদ্বোধনী ফ্লাইটে বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে আমিও আমন্ত্রিত হলাম। ঢাকা থেকে লাহোর পৌছে গেলাম দু'ঘন্টা পঁতয়াল্লিশ মিনিটে। আমাদের রাখা হল আপার মলে পার্ক লাক্সারি হোটেলে। পেল্লায় বিরাট ভবন। ঢাকার হাইকোর্ট ভবনের চাইতেও অনেক বড় হবে। পুরনো স্থাপত্য। কিন্তু আধুনিক হোটেলের সব সুযোগ সুবিধা রয়েছে। শোনা যায়, শেখ আবদুল্লার শ্বশুরের সম্পত্তি ছিল এই ভবন। সামনে পেছনে অনেক জমি। এই প্রথম আমার লাহোর গমন। দুপুরে শহরে পৌছে আনারকলি, শালিমার গার্ডেন, লাহোর দূর্গ, জুম্মা মসজিদ, শিখদের গুরুদ্বার, কবি ইকবাল ও স্যার সেকান্দার হায়াত খানের মাজার প্রভৃতি ঘুরে শেষ বিকেলে হোটেলে ফিরে এসে দেখি আমাদের জন্য আরও বিগ এন্টারটেইনমেন্ট অপেক্ষা করছে। তা'হল হোটেলে ডিনারের পর ক্যাবারে এবং টার্কিশ নর্তকীর বেলি ডান্স উপভোগের ব্যবস্থা।

ঢাকার মতো লাহোর শহরও দু'ভাগে বিভক্ত। মোগল আমলের পুরনো লাহোর এবং ইংরেজ আমলের নতুন শহর। পুরনো শহরে রয়েছে মোগল আমলের সব স্থাপত্য কীর্তি, সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের সমাধি, শালিমার গার্ডেন, জুম্মা মসজিদ, লাহোর দূর্গ, হযরত দাতাগন্‌জ বখশের মাজার ইত্যাদি। নতুন শহরে গভর্ণর হাউস থেকে সিভিল সার্ভিস একাডেমি, অফিস আদালত, নতুন শপিং সেন্টার প্রভৃতি। আমাদের পার্ক লাক্সারি হোটেলও আপার মলে— নতুন

শহরে। তার নাইট লাইফও পশ্চিমা ধরনের। রাত্রে হোটেলের ডিনার ডান্সের সময় এক পাঞ্জাবী যুবককে স্লিভলেস টপ ও স্কার্টপরা এক এ্যাংলো তরুণীকে বাহুলগ্ন করে নাচতে দেখলাম। ওয়েস্টার্ন মিউজিকের তালে তারা নাচছিলেন। যুবকের নিখুঁত ওয়েস্টার্ন ড্রেস। কিন্তু মাথায় একটা দোতলা পাগড়ি। পরে শুনেছি তিনি তিওয়ানা পরিবারের ছেলে। তার চাচা স্যার মালিক খিজির হায়াত খান তিওয়ানা বৃটিশ আমলে দীর্ঘকাল অবিভক্ত পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার দলের নাম ছিল ইউনিউনিস্ট পার্টি। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় তিনি মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে পাঞ্জাবের যে কোনো নির্বাচনকেন্দ্র থেকে তার সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছিলেন। জিন্না এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস দেখান নি। নির্বাচনে পাঞ্জাবে ইউনিউনিস্ট দলের কাছে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির পেছনে অবিভক্ত ভারতের বিগ ফিউডাল মুসলিম স্বার্থ এবং উঠতি পুঁজি স্বার্থের সমীকরণ সত্ত্বেও এই দুই স্বার্থের আভ্যন্তরীণ স্বার্থের দ্বন্দ্বও অনেক সময় প্রকট হতে দেখা গেছে। এই দ্বন্দ্বে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠালাভ পর্যন্ত মুসলিম লীগ ও জিন্না নেতৃত্বকে কখনো জয়ী হতে দেখা যায় নি। তৎকালীন বৃটিশ শাসকদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মুসলিম লীগ ও জিন্না নেতৃত্বের টিকে থাকা, এমনকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেওয়াও সম্ভব হতো কিনা, তা আজ আর গবেষণার বিষয় নয়। বর্তমান পাকিস্তান বা বৃটিশ আমলের গোটা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান সমাজ ছিল বিগ ফিউডাল বা বড় ভূস্বামী প্রভাবিত সমাজ। ব্যতিক্রম ছিল সাবেক অবিভক্ত বাংলাদেশ। এখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ত্রিশ বছর আগেই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও মহাজনী প্রথা বাতিল করার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে কৃষক প্রজা পার্টি শক্তিশালী দল রূপে আবির্ভূত হয়। এই কৃষক প্রজা পার্টির কাছেও মুসলিম লীগ বৃটিশ আমলের এক সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়।

১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরের পার্ক লাক্সারি হোটেলে সে রাতের 'ডিনার ডান্সে' কয়েকজন পাঞ্জাবী মুসলমান তরুণীকেও আমি নাচতে দেখেছি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একজন মাত্র মেয়ে সে রাতের নাচে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ঢাকার এক পরিচিত এ্যাংলো পরিবারের মেয়ে এবং পাকিস্তান এয়ার লাইন্সের এয়ার হোস্টেস ছিলেন। এ নাচের আসরে যেচে গিয়ে যুবক তিওয়ানার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। তার মাথার দোতলা পাগড়ি আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল। তিনি বললেন, এটা তাদের ফিউডাল আভিজাত্য ও বংশ মর্যাদার প্রতীক। তার বাবা-চাচা সকলেই এটা মাথায় পরেছেন। স্যার সেকান্দার হায়াত খান যখন পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তিনিও এটা পরতেন। এমনকি পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান

কোনো অভিজাত ঘরের সন্তান না হওয়া সত্ত্বেও দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাঠানদের জির্গার উৎসবে গিয়ে এই পাগড়ি মাথায় দিতেন। আমার ধারণা, এই জির্গা প্রথা সম্ভবত ঢাকার পুরনো বাসিন্দাদের এককালের সর্দারি প্রথার মতো।

তিত্তয়ানা বয়সে আমার চাইতে বছর দু'য়েকের বড় হবেন। তিনি ক্যামব্রিজের গ্রাজুয়েট। তবু আমার প্রতি সহৃদয়তা দেখাতে তিনি কার্পণ্য করলেন না। পরেও কয়েকবারই লাহোরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি তখন ভূসম্পত্তি দেখাশোনা ছাড়াও ব্যবসায়ে নেমেছেন। একবার বললেন, ব্যবসায়ে না নেমে উপায় নেই। ফিউডালিজমের যুগ শেষ হয়ে আসছে। তাছাড়া তিনি নিজেও এই ব্যবস্থা পছন্দ করেন না। একদিন আমাকে বললেন, চৌধুরী, আপনি তো সাংবাদিক। পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তন সম্পর্কে আপনি যা বলেন, তাতে মনে হয় এর পেছনে সামরিক ও রাজনৈতিক কারণটাকেই আপনি বড় করে দেখেন। আপনার ধারণা, আমেরিকার সামরিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থ এবং পাকিস্তানের গণবিরোধী সিভিল-আর্মি ব্যুরোক্রাসি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ এক হওয়ার ফলে তা স্থায়ী করার জন্য এই সামরিক শাসনের পাহারা খাড়া করা হয়েছে। এটা হয়তো আংশিক সত্য। এই সামরিক শাসন প্রবর্তনের পেছনে একটা সামাজিক কারণও রয়েছে।

ঃ সেটা কি? জিজ্ঞাসা করলাম।

তিওয়ানা বললেন, আমাদের এই ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থাটাকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভাঙতে পারছিলেন না। কারণ, এই রাজনৈতিক নেতৃত্বও ফিউডালদের কব্জায়। লিয়াকত আলী উত্তর প্রদেশের এবং খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকার নবাব পরিবারের লোক। আমাদের আর্মি ও সিভিল ব্যুরোক্রাসি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তারা সমাজের মডার্নাইজেসন চায়। উঠ্তি শিক্ষিত পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরাও তাই চায়। তারা সমাজকে ভাঙতে চায় না। কিন্তু চায় একটু লিবারেটেড হোক; মেয়েরা একেবারে হেরেমে বন্দী না থেকে একটু বেরিয়ে আসুক। সমাজ একটু মুক্ত ও গতিশীল হোক। তারা একটু পশ্চিমা কায়দায় জীবনের স্বাদ— আনন্দ উপভোগ করতে চায়।

বললাম, সেজন্য কি একেবারে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রয়োজন ছিল?

তিত্তয়ানা বললেন, ছিল। আপনি পূর্ব পাকিস্তানের লোক হিসেবে ব্যাপারটা বিবেচনা করবেন না। পূর্ব পাকিস্তানে একটা শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে; একটি রাজনীতি সচেতন ছাত্র সমাজ আছে। আমি দু'একবার ঢাকায় গেছি। আমার মনে হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশ, পশ্চিম পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যের অংশ। পশ্চিম পাকিস্তানের সমাজ বিগ্ ফিউডাল শাসিত। শিক্ষিত

রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেই বললেই চলে। আমাদের এলিট ক্লাশ বলতে সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রাসি। তারাও বিগ্ ফিউডাল পরিবারের লোক অথবা তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক। পূর্ব পাকিস্তানে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে মধ্যবিত্ত এলিট ক্লাশ অথবা সচেতন ছাত্র সমাজ অগ্রপথিকের ভূমিকা গ্রহণ করে। পশ্চিম পকিস্তানে সেটি হবার জো নেই। এখানে ফিউডাল প্রথার এই বিরাট জগদ্দল পাথর কিছুটা জবরদস্তি ছাড়া সরাবার উপায় নেই। সেজন্য আর্মির এগিয়ে আসা প্রয়োজন ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেই এটা ঘটেছে। আর্মির ইয়ং এলিট ক্লাশকে সেজন্যে এগিয়ে আসতে হয়েছে।

বললাম, আইয়ুবসহ কয়েকজন জেনারেলের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সামরিক ক্যুদেতাকে আপনি কি পশ্চিম পাকিস্তানে সামাজিক পরিবর্তন ও অগ্রগতির সহায়ক মনে করেন?

তিওয়ানা বললেন, না, আমি তা মনে করি না। আমাদের আর্মির কলোনিয়াল চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রধান। ফলে ইজিপ্ট বা ইরাকের আর্মির ইয়ং এলিট গ্রুপের মত তারা কোনো রেভ্যুল্যুশনারি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। যেমন আইয়ুব ক্ষমতা দখলের পর ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান নাম বদল করে শুধু রিপাবলিক অব পাকিস্তান করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর্মি ও সিভিল ব্যুরোক্রাসির রক্ষণশীল অংশের চাপের মুখে পিছু হটে আবার ইসলামিক কথাটা যোগ করতে বাধ্য হন। এটা সত্য, পাকিস্তানের আর্মি জুন্টা আমেরিকার পেন্টাগনের হুকুমের বাইরে এক পা বাড়াতে পারে নি। তা সত্ত্বেও বলবো, পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে ফিউডালদের একচ্ছত্র আধিপত্য হ্রাস করার প্রথম পদক্ষেপ তাদের। এটা আমাদের সমাজের মডার্নাইজেসনের সহায়ক হয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থানকে বিপ্লব নাম দেওয়ায়, কিছু কিছু সমাজ সংস্কারের পদক্ষেপও তারা নেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন বড় মজুতদার ও ব্যবসায়ী, চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, লোক দেখানো ভাবে হলেও কিছু কিছু ভূমি সংস্কার, বহু বিবাহ বন্ধ করে পরিবার আইন সংস্কারের পদক্ষেপ, দেশের সাংবাদিক সাহিত্যিকদের মজুরি ও মর্যাদা বাড়ানোর ব্যবস্থা ইত্যাদিকে সমাজ প্রগতির পথে আয়ুবের আর্মি জুন্টার সীমাবদ্ধ রিফর্মিস্ট ভূমিকা বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিওয়ানার সাথে আমার যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়। দু'দশকেরও বেশি সময়ের পর ঢাকায় বসে হঠাৎ তার কথা আমার মনে পড়ল বারিধারায় আমার বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতির মুখে। আজ যদি তিওয়ানার আবার দেখা পেতাম, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান ও হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখলকে তিনি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন? অবিভক্ত

পাকিস্তানে আইয়ুবের ক্ষমতা দখলের সঙ্গে তাদের ক্ষমতা দখলের চরিত্রগত পার্থক্য কোথায়? পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানের মিলিটারি জুন্টার খুবই সীমিত যে আধুনিক ও অগ্রসর চিন্তার ভূমিকা ছিল, সত্তরের ও আশির দশকে বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান ও এরশাদের ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ায় তার কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা গেল না কেন? জিয়াউর রহমান ও এরশাদের অভ্যুত্থান কেন সম্পূর্ণ প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র গ্রহণ করে দেশটাকে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং অতীতমুখী সমাজ ও সংস্কারের দিকে ঠেলে দিল? মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তবুদ্ধির চেতনাকে হনন করতে চেষ্টিত হল? দেশপ্রেম বর্জিত স্বাধীনতার শত্রুদের সমাজে ও রাজনীতিতে আবার পুনর্বাসিত করলো?

লক্ষ্য করেছি, জিয়াউর রহমানের নিষ্ঠুর ও উদগ্র ক্ষমতালিপ্সা এবং এরশাদের সীমাহীন লোভ, দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতার ছাপ বাংলাদেশের সমাজের উপরতলায় বেশ ভালোভাবেই পড়েছে এবং এখনো রয়ে গেছে। বারিধারায় আমার বন্ধুর বাড়ির নৈশ আসরেও তার প্রমাণ পেলাম।

সাত

বারিধারায় যাওয়ার পথে ঢাকার আকাশে একখণ্ড চাঁদ দেখলাম। লন্ডন থেকে ঢাকায় আসা অব্দি আকাশের দিকে চোখ তুলবার অবকাশ পাইনি। লন্ডনের আকাশে তো কালে ভদ্রে চাঁদ দেখি। সে চাঁদ তুহিন দেশের তুষার শুভ্র চাঁদ। আমাদের দেশের মতো এমন নরম, স্বপ্নিল, সোনালী আভা মাখা নয়। ইংরেজি কবিতায় তাই চাঁদের অনেক রকম স্তুতি ও বর্ণনা আছে; কিন্তু 'মহিনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় আশ্বিনের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে' এমন কবিতার লাইন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কৈশোরে গ্রামের স্কুলের মাঠে ঘাসের উপর শুয়ে রাতের নির্মেঘ আকাশে ক্ষীণাঙ্গী কিম্বা পূর্ণ যৌবনা পূর্নিমার চাঁদ দেখা ছিল আমার একটি প্রিয় অভ্যাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালেও জ্যোৎস্না রাতে ফজলুল হক হল থেকে হেঁটে রমনার রেসকোর্সে (এখন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) গিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে চাঁদ দেখতাম। কখনো দেখতাম নির্মেঘ নীল আকাশের চাঁদ। কখনো দেখতাম খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের আড়ালে চাঁদের ডুব সাতারের খেলা। দু'একজন মনের মতো সঙ্গী নিতাম সাথে। তখন রমনা গ্রীন সত্যি ছিল সবুজ রমনা। 'শ্যামলে শ্যামল আর নীলিমায় নীল'। সতেরো বছর পর দেশে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে মনে হলো, আমার যৌবনের দেখা রমনা নামের সেই সবুজ শ্যামাঙ্গী মেয়েটিকে

যেন প্রসাধন মাখিয়ে শহুরে সুন্দরী করা হয়েছে। কিন্তু তার শরীরে সেই স্নিগ্ধ সবুজাভা, মনোরম শ্যামশোভা আর নেই। রমনা এখন যেন এক পরিণত বয়স্কা শহুরে রমণী। তার সৌন্দর্য এখন আর দেহে নয়, প্রসাধনে।

কিন্তু সেই প্রসাধনও ধূলি মলিন। শুধু রমনা নয়, সারা ঢাকা শহরটাই যেন এখন ধূলা আর ধূলায় ঢাকা। একাত্তরের কলকাতায় দেখেছিলাম এই এত ধূলো, ময়লা আর আবর্জনা। ডালহৌসি স্কোয়ার পর্যন্ত ভরে থাকতো আবর্জনার স্তূপে। গন্ধে নাকে রুমাল চেপে হাঁটতে হতো। সন্ধ্যায় কলকাতার আকাশ ঢাকে ধোঁয়ায়। শহরের লোকেরা নাম দিয়েছে ধোঁয়াশা। এই ধোঁয়াশার জ্বালায় গড়ের মাঠে বসেও অনেকদিন ভালো করে চাঁদ দেখার শখ মেটাতে পারি নি। এবার ঢাকায় এসে মনে হলো, ঢাকার আকাশেও হয়তো ধূলোর আস্তরণে চাঁদ মলিন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মহিনের ঘোড়াগুলো ঘাস খেতে আশ্বিনের জ্যোৎস্নার প্রান্তর আর খুঁজে পাবে না।

আমার বড় মেয়ে তনিমা যখন খুব ছোট, তিন কি চার বছর বয়স, তখন আমাদের সকলের সঙ্গে গিয়েছিল বরিশালে তার নানার গ্রামের বাড়িতে। গ্রামের নামটা বেশ মজার, 'ঘোষের টিকি কাটা'। এই নামের কিংবদন্তী হল, বহু আগে এই গ্রামে ঘোষ বংশে এক অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রজারা একদিন তাকে ধরে মাথার টিকি কেটে দেয়। সেই থেকে গ্রামের নাম ঘোষের টিকি কাটা। তনিমাকে কোলে নিয়ে এক জ্যোৎস্না রাতে এই গ্রামের বাড়ির উঠোনে বসেছিলাম। তনিমা সোনার থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিল। কয়েকদিন পর ঢাকায় ফিরে এলাম। এক রাতে বাসার বারান্দায় বসে আছি। তনিমা ছুটে এসে কোলে উঠল, আব্বা, চাঁদটা কত ভালো দেখেছো। বরিশাল থেকে আমাদের সঙ্গে ঢাকায় চলে এসেছে।

আকাশে সত্যি সত্যি তখন চাঁদ উঠেছে। হেসে বললাম, চাঁদটা তোমাকে খুব ভালবাসে। তাই বরিশাল থেকে একেবারে ঢাকায় চলে এসেছে।

বারিধারায় যাবার পথে দীর্ঘকাল পরে তনিমার সেই শৈশবের চাঁদ দেখার কথা মনে পড়লো। এবার আমার সঙ্গে লন্ডন থেকে ঢাকায় সে আসে নি। যদি আসতো, তাহলে ঢাকার আকাশের এই চাঁদ দেখিয়ে তাকে ঠাট্টা করে বলতে পারতাম, দ্যাখো মা, চাঁদটা কত ভালো, তোমার সঙ্গে এবার চলে এসেছে একেবারে লন্ডন থেকে ঢাকায়।

বারিধারায় বন্ধুর বাড়িতে ঢুকে কল্পলোক থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। একটা উদগত দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকে চেপে নিজেকেই নিজে বললাম, এটা তোমার সত্তরের চেনা ঢাকা শহর নয়। এটা নব্বুইয়ের অচেনা ঢাকা শহর। নতুন ঢাকা এখনও চরিত্রে লাহোর কিম্বা কলকাতা নয়। কোনোদিনই হয়তো হবে না লাহোর কিম্বা কলকাতা।

এখন তার বয়ঃসন্ধির কাল। যদি আরও কিছুকাল আমরা সউদী রাজার অর্থে চালিত মোল্লাবাদী রাজনীতির পাহারায় আমেরিকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বলয়ে থাকতে পারি, তাহলে পরিণামে ঢাকা হয়তো হবে ব্যাংকক কিম্বা হংকংয়ের মতো তিলোত্তমা নগরী।

পাকিস্তান আমলে ঢাকায় হোটেল বলতে মাত্র দুটো প্রথম শ্রেণীর হোটেল, হোটেল ইন্টারকন এবং পূর্বাণী। ঢাকার প্রথম অভিজাত হোটেল শাহবাগ কিছুকাল চালু থাকার পরেই পিজি হাসপাতালে রূপান্তর হয়। হোটেল ইন্টারকন এখন হোটেল শেরাটন। পাকিস্তান আমলেও হোটেল ইন্টারকনে সুরা সাকী সবই ছিল, নাচের ব্যবস্থা ছিল না। ক্যাবারে, বেলি ড্যান্সতো ছিল অশ্রুতপূর্ব। কালেভদ্রে বিদেশী নর্তকীদের এনে নৃত্য রজনীর ব্যবস্থা হতো। আইয়ুবী জমানার একেবারে শেষদিকে শুনেছি, ঢাকায় বসবাসরত আগাখানি কমিউনিটির এক চতুর ব্যবসা সফল যুবক থাই, মালয়েশিয়ান বা সিঙ্গাপুরি পেশাজীবী সুন্দরী তরুণীদের প্লেনে চাপিয়ে উইকএন্ডের নৈশ পার্টির জন্য ঢাকায় নিয়ে আসতেন। গুলশান, বনানীতে কোনো ধনী ব্যবসায়ী, আমলা বা রাজনীতিকের ভ্যাকান্ট বাড়িতে বসতো এসব পার্টি। মুসলিম লীগের কোনো কোনো মন্ত্রী, বড় ব্যবসায়ী বা সাংবাদিক মাথায় টুপি চাপিয়ে এসব বাড়িতে ঢুকতেন; টুপি নামিয়ে পার্টি উপভোগ করতেন। বড় বড় ব্যবসায়ের লেনদেনের কথাও নাকি তখনোই হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নব্য ঢাকার এই উঠ্‌তি বয়সের সৌখিনতায় একটু ভাঁটা পড়ে। জিয়াউর রহমান ও এরশাদের আমলে আবার জোয়ার দেখা দেয়। এরশাদের আমলে ঢাকার এক নব্যধনী ব্যবসায়ী হলিডে উপভোগের জন্য সপরিবারে যাচ্ছিলেন ইউরোপে। প্রথম যাত্রাবিরতি লন্ডনে। উঠেছেন এক ফাইভ স্টার হোটেলে। তার বড় ছেলের বয়স তখন আঠারো হয়নি। পরিচয় হওয়ার দু'দিনের মধ্যে, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আঙ্কল, এখানে আশপাশে আন্ডার এইটিন ছেলেমেয়েদের কোনো ডান্স ক্লাব আছে?

বললাম, নিশ্চয়ই আছে। 'টাইম আউট' অথবা 'হোয়েয়ার টু গো' ম্যাগাজিন কিনে দেখে নিতে পারো।

ছেলেটি সংগে সংগে কাগজ দুটির নাম টুকে নিল। কৌতূহল হল। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কি ঢাকাতেও নাচো?

ছেলেটি বলল, মাঝে মাঝে স্যাটার ডে নাইটে নাচি। কোনো ক্লাব নেই। আমরা বাড়িতেই ডান্সের ব্যবস্থা করি।

ছেলেটির কাছ থেকে আস্তে আস্তে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। ঢাকার গুলশান, বনানীর মতো অভিজাত পাড়াগুলোতে নতুন ইয়ং জেনারেশন গড়ে

উঠছে। তাদের অনেকেই পশ্চিমা বিদেশী দূতাবাসের অফিসারদের ছেলেমেয়ের জন্য পরিচালিত স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে। অথবা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তাদের লেখাপড়া শেখানো হয়েছে ইংল্যান্ডের ও' লেভেল, এ' লেভেল স্ট্যান্ডার্ডের ও কারিকুলামের প্রাইভেট স্কুলে। তারা পশ্চিমা কায়দায় জীবনযাপন করতে চায়। কিন্তু ঢাকায় এখনো সে পরিবেশ গড়ে ওঠে নি। ফলে কোনো কোনো বাবা মা ইচ্ছে করে কোনো স্যাটার ডে নাইটে বাড়ি খালি করে চলে যান কোনো বড় হোটেলে বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ির পার্টিতে। সেই সুযোগে ছেলেরা নাচের আসর বসায়। পড়শিদের মেয়ে অথবা বড়জোর চাচাতো বোন, খালাতো বোন নাচের পার্টনার। ড্রিংকস হল ক্যান ভর্তি কোক, সেভেন আপ কিম্বা পেপসি কোলা, মিউজিক অবশ্য ওয়েস্টার্ন।

এটা এরশাদ আমলের কথা। এখন নতুন ঢাকার আরো বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে। গুলশান, বনানী, বারিধারার অনেক বাড়িতেই ঘন ঘন পার্টি হয়, ডান্স হয়। বিদেশ থেকে মাঝারি খ্যাতির সিঙ্গার ও ডান্সাররাও ঘন ঘন যান ঢাকায়। তাতে বড় বড় হোটেলের নাইট লাইফের বৈচিত্র্যও একটু বেড়েছে। বারিধারায় আমাদের বন্ধুর বাড়ির সেদিনের পার্টি অবশ্য একান্তই ঘরোয়া। তবু তাতেও নতুন ঢাকার উচ্চবিত্তদের জীবনধারার একটা নমুনা পেলাম।

গাড়ি থেকে নামতেই বন্ধু নয়, বন্ধুপত্নী এগিয়ে এসে সম্ভাষণ জানালেন। মধ্যবয়সী মহিলা। প্রায় কুড়ি বছর আগে তাকে যখন প্রথম দেখি, তখন তিনি তিন সন্তানের জননী নন। কৃশ তনু, লাজুক তরুণী। এখন তিনি বাকপটু এবং শরীরে আলস্য ও আরামের মেদভার। গায়ে হাতকাটা ব্লাউজ। বুকের মাঝখানে শাড়ির কারুকাজ করা পাড় দোপাট্টার মতো ভাঁজ করে রাখা। অনাবৃত নাভিমূল, তারপর শাড়ির বন্ধনী — অনেকটা গুজরাটি কিম্বা বোম্বের মহিলাদের শাড়ি পরার ফ্যাশান। শুনলাম, এই ফ্যাশানটাই এখন ঢাকায় জনপ্রিয়। যারা আরও আধুনিকা, তার শালোয়ার কামিজ পরেন। টিনএজ মেয়েরা ট্রাউজারের উপর শার্ট।

বন্ধুপত্নীই আসরের আমন্ত্রিতদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জনা চারেক সরকারী আমলা; দু'জন আমার পূর্ব পরিচিত। সঙ্গে তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। একজন জুনিয়র র‍্যাংকের অবসরভোগী আর্মি অফিসার, একজন ব্যাঙ্কার, দু'জন রাজনীতিক। পাজামা, লম্বা পাঞ্জাবী পরা একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোকের মাথায় গোলটুপি। তার পাশে গোলগাল এক মহিলা। ওয়াইনের গ্লাস হাতে ভদ্রলোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন। দু'জন স্কার্ট ও শার্ট পরা তরুণী। একজন আর্মি অফিসার ও অন্যজন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে গল্প করছেন। টিন এজারদের হাতে সফট ড্রিঙ্কস। বড়দের হাতে নিজ নিজ পছন্দমতো হুইস্কি, ওয়াইন বা অন্যকিছু। মাঝখানের গোল টেবিলে আইস কিউব, স্নাক্স, বাদাম, কাজুবাদাম,

চানাচুর। পরিচয়পর্ব শেষ হতেই বন্ধু পত্নী সরে গেলেন। বন্ধু এগিয়ে এলেন। বললেন, আপনার জন্য ডাবের পানির ব্যবস্থা আছে।

গোলটুপি মাথায় পরা ভদ্রলোক একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার হাতের গ্লাসটা টেবিলে রেখে বললেন, ড্রিঙ্কস সম্পর্কে আপনার প্রেজুডিস আছে নাকি! লন্ডনে থাকেন। স্ট্রেঞ্জ!

বললাম, প্রেজুডিস নেই। তবে ঢাকায় আসা অব্দি পেটের গোলমালে ভুগছি। তাই একটু সাবধান থাকছি।

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। বললেন, কিছু ভাববেন না। বহুদিন পর দেশে এসেছেন। প্রথম প্রথম সকলেরই একটু হজমের গোলমাল হয়। একটু সোডা মিশিয়ে হুইস্কি নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই দেখুন না, দু'দিন পরই টঙ্গিতে বিশ্ব এজতেমায় যাব। প্রতিবারই যাই। তাই বলে গ্লাস তো ছাড়িনি। আমার পাশে বসা এই মহিলাকে দেখছেন, উনি ঢাকার একজন নামকরা গাইনি। যদিও প্যারা মেডিক্যাল। কিন্তু বিলেত থেকে পাস করা গাইনিদেরও বাবা। ব্যাঙ্ককের একটা টপ আমেরিকান হাসপাতালে কাজ করেছেন দশ বছর। উনি কি বলেন জানেন? বলেন, পুরুষের অনেক রকম নেশা। টাকার নেশা, পাওয়ারের নেশা, জুয়ার নেশা, মেয়েমানুষের নেশা; তার মধ্যে সবচাইতে কম পাপ এবং কম অনিষ্টকর এই মদের নেশা।

কথাটা বলেই তিনি হো হো করে হাসতে শুরু করলেন। এই ফাঁকে আমার বন্ধু একটা কনুইয়ের গুঁতো মারলেন আমার কোমরে। বললেন, এই মহিলা সম্পর্কে আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে। পরে বলবো।

খাবার পরিবেশন করা হল। প্লেট হাতে সেই গাইনি মহিলা আমার পাশে এসে বসলেন। বললেন, আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন দেখা হয়নি। আপনিই তো সেই গানটা লিখেছেন, ফেব্রুয়ারী মাসে যেটা গাওয়া হয়, তাই না?

সবিনয়ে বললাম, জ্বি।

মহিলা বললেন, বহুদিন পর দেশে এলেন, কেমন লাগছে?

ঃ ভালো। নিজের দেশ কারো কাছে কোনোদিন খারাপ লাগে?

মহিলা বললেন, দেশের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমি তো ব্যাঙ্ককে, সিঙ্গাপুরে অনেকদিন ছিলাম। এই বারিধারার মতো একটা মডেল টাউন আপনি লন্ডনেও দেখেছেন কি?

এই বাড়িতে তর্ক জুড়তে আসিনি। তাই সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করলাম, না, দেখিনি।

মহিলা বললেন, অবশ্য আমাদের দেশে গরীব লোক অনেক। তা কোন্‌দেশে গরীব লোক নেই? আপনি নিশ্চয়ই আমেরিকায় গেছেন; অত বড় ধনী দেশ! নিউইয়র্কের স্লাম এরিয়া দেখেননি?

বললাম, দেখেছি।

মহিলা বললেন, তাহলে বলুন, দেশে গরীব আছে বলে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। উত্তরা, বনানী, গুলশান, বারিধারার মতো জায়গাও তো ঢাকায় রয়েছে।

আমি নিরুত্তর। গোলটুপি মাথায় পরা ব্যবসায়ী বললেন, তবু ভালো, দেশে আওয়ামী লীগের শাসন নেই, শেখ মুজিবের সমাজতন্ত্র নেই। থাকলে গোটা ঢাকা শহরটাই এখন থাকতো স্লাম সিটি। দেশে ধর্মকর্মও থাকতো না।

আমার আমন্ত্রণকর্তা বন্ধু ঠোঁটে তর্জনী চেপে ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে বললেন, সা-স্-স্, এসব কথা থাক। গাফ্‌ফার সাহেব শেখ মুজিবের খুব কাছের লোক ছিলেন। তার সামনে শেখ সাহেবের সমালোচনা না করাই ভাল।

বললাম, সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত হলে শুনতে আপত্তি নেই। কিন্তু এই আসরে এসব আলোচনা কি একেবারেই অবান্তর নয়?

উত্তর দিলেন অবসরভোগী আর্মি অফিসার। বললেন, অবান্তর হবে কেন? সত্যি কথা সব জায়গায় সব সময় বলা যায়। শেখ মুজিব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বড় নেতা ছিলেন। একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু রক্ষী বাহিনী গঠন করে তিনি আর্মিকে চটিয়েছিলেন। নইলে পঁচাত্তরের অমন মর্মান্তিক ঘটনা হয়তো ঘটতে পারতো না।

আমার চুপ থাকার যে উপায় নেই, তা বুঝলাম। বললাম, রক্ষী বাহিনীকে আর্মির প্যারালাল বাহিনী হিসেবে গঠন করা হয়নি। গঠন করা হয়েছিল অতিরিক্ত প্যারামিলিশিয়া হিসেবে। এটা বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব কোনো বাহিনী ছিল না। কিন্তু এরশাদ সাহেব তার নিরাপত্তার নামে সামরিক বাহিনীর মতো ক্ষমতাসম্পন্ন তার নিজস্ব বিশেষ বাহিনী কি গঠন করেন নি? এই বাহিনীকে বরং বলা চলতো আর্মির প্যারালাল বাহিনী। কই, তখনতো আপনারা আপত্তি করেন নি। শেখ সাহেব রক্ষী বাহিনী নামে যে প্যারামিলিশিয়া গঠন করেছিলেন, এ ধরনের প্যারা মিলিশিয়া অনেক দেশেই রয়েছে। বাংলাদেশের আর্মিকে এই রক্ষী বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে ভুল বোঝানো হয়েছিল।

আর্মি অফিসার বললেন, তর্কের খাতিরে না হয় মেনে নিলাম, রক্ষী বাহিনী গঠনের পেছনে শেখ সাহেবের কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু একথা কি সত্যি নয়, বাংলাদেশের আর্মি ভারত বা পাকিস্তানের মতো কেবলই একটি পেশাদার আর্মি নয়। ইজিপ্ট, ইরাক, আলজেরিয়ার মতো একটি লিবারেশন আর্মিও। শেখ

সাহেব বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই লিবারেশন আর্মিকে দেশ শাসনের অংশীদারিত্ব দেন নি। সব ক্ষমতাই তার নিজের দলের হাতে রেখেছিলেন। ইরাক, ইজিপ্ট, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশে এর উল্টোটা হয়েছে। লিবারেশন আর্মির নেতৃত্বেই রাজনৈতিক প্রশাসন গঠিত হয়েছে।

বললাম, আপনার এনালোজিতে একটু ভুল রয়েছে। ইজিপ্ট, ইরাক ও আলজেরিয়ার ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তুলনা করা উচিত নয়। ইজিপ্ট ও ইরাকে সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারেরা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে তাদের বিপ্লবী কম্যান্ডের অধীনে নতুন সরকার গঠন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে আলজেরিয়ায়। তারও নেতৃত্ব দিয়েছে আর্মি। এই আর্মির পলিটিক্যাল উইং পরে সরকার গঠন করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন সেই ১৯৫২ সাল থেকে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে অসামরিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭০ সালে একটা সাধারণ নির্বাচন হয়েছে। সেই নির্বাচনে বাংলাদেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলই জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করেছে। সেই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছে একটি সিভিলিয়ান সরকার বা মুজিব নগর সরকার। সেই সরকারের আনুগত্য মেনেই বাঙালী আর্মি, পুলিশ, ইপিআর, আনসার সকলেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী এবং নির্বাচন বিজয়ী রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন করেছে। সুতরাং ইজিপ্ট, ইরাক, আলজেরিয়ার উদাহরণ টানা এখানে কি অযৌক্তিক নয়?

আমাদের তর্ক থামালেন গাইনি ভদ্রমহিলা। আর্মি অফিসারের দিকে চেয়ে বললেন, আমরা অযথা রাজনৈতিক তর্ক তুলে এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করছি।

বললাম, এটা কেবল ঢাকাতেই দেখছি। কলকাতা, লাহোর, দিল্লীর এমনকি লন্ডনের কোনো বাড়ির ঘরোয়া পার্টিতেও কাউকে রাজনীতি নিয়ে তর্ক জুড়তে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। বরং দেখেছি, দুই বিপরীত মেরুর রাজনীতিকরাও একই টেবিলে বসে ড্রিঙ্ক করছেন, উদ্দাম হাসির তুফান তুলছেন। কেবল এই ঢাকাতেই দেখছি, বিয়ের আসরেও রাজনীতি এবং তর্কাতর্কি। এটা কি আমাদের রাজনীতি সচেতনতার, না আমাদের পিছিয়ে থাকা সমাজ জীবনের প্রতিফলন?

এবার কেউ আমার কথার জবাব দিলেন না। কেবল গাইনি ভদ্রমহিলা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন, গাফ্ফার সাহেব ঠিক কথা বলেছেন, নো পলিটিকস। বাচ্চারা অধীর হয়ে রয়েছে। আমরা এবার এক রাউন্ড নাচতে পারি তো?

বলেই স্কার্ট পরা দুটি মেয়ের একটির দিকে চেয়ে বললেন, সুজি, মিউজিক অন করে দাও, আর ডিম লাইট জ্বেলে দাও। গোল টেবিলটা সরিয়ে নাচের জায়গা কর।

আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি আমাদের সঙ্গে ডান্সে যোগ দেবেন তো?

বললাম, সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই। হাঁটুর ব্যথায় ভুগছি। সুতরাং আমাকে দর্শকদের দলেই রাখুন।

ভদ্রমহিলা বললেন, সুজি আমার এসিস্ট্যান্ট। ওকে এনেছিলাম আপনার সঙ্গে নাচবে বলে। আপনি বিদেশ থেকে এসেছেন। আর মেয়েটা খুব ভালো নাচে।

বললাম, আমার কপাল খারাপ। সুজিকে বরং একজন ইয়ং পার্টনার জুটিয়ে দিন।

ভদ্রমহিলা বিরস মুখে উঠে দাঁড়ালেন। আমার আমন্ত্রণকর্তা বন্ধু এবার এগিয়ে এলেন। বললেন, আমারও নাচার শখ নেই। আপনার সঙ্গে একটু বসি। কতকাল পরে দেখা!

পরে কানের কাছে মুখ এনে বললেন, আপনাকে আজ একটা অনুরোধ জানাব। আপনাকে আমার এই অনুরোধ রাখতেই হবে।

আট

ঢাকায় ধানমণ্ডিতে আমার স্ত্রীর একখণ্ড জমি আছে। পশ্চিম ধানমণ্ডিতে রায়েরবাজার এলাকা সংলগ্ন জমি। সরকারী প্লট নয়। ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে কেনা। কেনার পর দলিল হাতে পাওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কোর্ট কাচারী বন্ধ। দলিল আর হাতে এলো না। তারপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু। দেশত্যাগ করে কলকাতায় পালালাম। পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে যখন ফিরে এলাম, তখন জমির আশা ছেড়ে দিয়েছি। হাতে দলিল দস্তাবেজ কিচ্ছু নেই; কি করে জমির দখল দাবি করবো?

এ সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। ১৯৭১ সালের গোড়ায় যখন ঢাকায় জমির দলিল রেজেস্ট্রি করি তখন ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার ছিলেন আমার এক আত্মীয়। তিনি হঠাৎ একদিন আমাকে টেলিফোন করে জানালেন, অসহযোগ আন্দোলনের সময় শেষবারের মতো অফিস ছাড়ার মুহূর্তে তিনি আমার দলিলটি সঙ্গে করে তার বাসায় নিয়ে গেছেন। সেটি এখনো তার কাছে আছে।

দলিলটি না হয় পেলাম। এখন সমস্যা বাড়ি তৈরি করবো, টাকা কোথায়? বছরখানেক চেষ্টা তদ্বির করার পর একটি ব্যাংক এবং হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ঋণ মঞ্জুর করবেন মনে হল। সেই আশায় স্ত্রীকে নিয়ে একদিন জমিতে গিয়ে একটা ইটও পুঁতে এলাম। তার ক'দিন পরেই আকস্মিকভাবে বিনা মেঘে

বজ্রপাত। আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তাররা বললেন, এসেন্ডিং প্যারালাইসিস; ৭২ ঘন্টা বাঁচতে পারেন। মেডিক্যাল বোর্ড বসল। তারা বললেন, বিদেশে যেতে হবে। প্রথমে গেলাম কলকাতায়, তারপর লন্ডনে।

দীর্ঘ সতেরো বছর। 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।' জমিজমা মাথায় রইল। বিদেশেই কাটল দেড় যুগের বেশি। মাঝখানে জমিটা মালিকবিহীন থাকায় বেহাত হতে চলছিল। অমার এক আত্মীয় সেখানে টিনের একচালা ঘর তুলে জমির দখল রক্ষা করলেন। টাকার অভাবে বাড়ি তৈরি করা আর হয়নি। এবার (জানুয়ারী '৯৩) আমরা ঢাকায় যাবো জেনে সেই আত্মীয় বাড়িতে পানির কল ও ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করেছেন। মাথার উপরে টিনের ছাদ। শীতকাল বলে গরম তেমন অনুভব করিনি। কিন্তু যে ক'দিন ঐ বাড়িতে ছিলাম ঢাকার মশা আমাদের শরীর থেকে টোল আদায় করেছে যতটা পারে।

ঢাকার মশার খ্যাতি আজকের নয়। পাকিস্তানের একেবারে গোড়ার যুগেও শুনেছি, ঢাকা শহরে দিনের বেলাতেও মশারী পেতে ঘরে বসতে হয়। মুসলিম লীগের নূরুল আমিন মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত কলামিস্ট ও সাহিত্যিক হাবিবুল্লাহ বাহার। তাঁকে ঠাট্টা করে তখনকার স্যাটায়ার মাসিক 'অগত্যা' পত্রিকায় একটি প্রশ্নোত্তর ছাপা হল এইভাবে; "আচ্ছা বলুনতো, ঢাকায় মশার এই ভয়াবহ উপদ্রব বন্ধ হবে কবে?"

উত্তর, "হামসে না পুছো, পুছো বাহার সে।" আমার বয়সী পাঠকেরা নিশ্চয়ই জানেন, এটি তখনকার একটি বিখ্যাত হিন্দি ছবির গানের লাইন। এই ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ হজম করতে না পেরেই কিনা জানি না, মন্ত্রী বাহার সাহেব এমনভাবে মশক নিধন অভিযান শুরু করেছিলেন যে, পঞ্চাশের দশকের গোড়ার কয়েকটা বছর ঢাকা একেবারে মশকবিহীন হয়ে পড়েছিল। নব্বুইয়ের দশকে বাহার সাহেবও নেই, 'অগত্যা' পত্রিকাও নেই। আছে বিএনপি সরকার। এই সরকারের মন্ত্রিদের সম্ভবত মশক দংশন অতীষ্ঠ করতে পারে না। কারণ তারা নির্বাচিত সরকার। নির্বাচিত সরকার যেখানে জনগণকেই তোয়াক্কা করে না, সেখানে আবার তুচ্ছ মশাকে কিসের ভয়?

ঢাকার মশকবধ পর্ব আপাতত থাক; ধানমণ্ডিতে আমাদের বাড়ির কথায় ফিরে যাই। এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গটি এখানে টেনে আনলাম এ জন্যে যে, বারিধারায় যে বন্ধু আমাকে তার বাড়িতে দাওয়াত করেছিলেন, তিনি কি করে যেন জেনে ফেলেছিলেন যে, ধানমণ্ডিতে আমার স্ত্রীর একখণ্ড জমি আছে। তিনি তার বাড়ির সেই রাতের আসরেই আমার কানে কানে বললেন, ধানমণ্ডিতে আপনার জমি আছে শুনলাম।

ঃ আমার নয়, আমার স্ত্রীর।

ঃ ওই এক কথাই হল। জমিটা ফেলে রেখেছেন কেন?

ঃ ফেলেতো রাখিনি। টিনের ঘর আছে। আমার আত্মীয়েরা থাকেন।

বন্ধু হেসে উঠলেন। বললেন, ওই টিনের খাপড়া একটা বাড়ি হল? এই বাড়ি আপনাকে মানায়? অন্তত ছ'তলা একটা বাড়ি করুন। একটা ফ্লোর নিজের জন্য রেখে বাকি সবটা ভাড়া দেবেন। মাসে ফেলে ছেড়ে হলেও এক লাখ দেড় লাখ ভাড়া পাবেন। এখন ঢাকার জমিতো জমি নয়, কাঁচা সোনা।

বললাম, তা বুঝেছি, কিন্তু ওই ছ'তলা বাড়ি করতে কত টাকা লাগবে জানেন? ব্যাংক থেকে ধার হয়তো পাবো। কিন্তু জীবনেও তা শোধ করা হবে না। তার চাইতে সুখে নেই, কিন্তু স্বস্তিতে আছি।

বন্ধু আমার কানের কাছে আবার মুখ নামালেন। বললেন, আপনাকে আগেই বলেছি, একটা অনুরোধ আপনাকে করবো, সেটা আপনাকে রাখতেই হবে। আমার অনুরোধটুকু আপনি রাখুন, বাড়ি করার টাকার অভাব আপনার হবে না।

রাতের আসর তখন জমজমাট। নীলাভ আলো। নাচের মিউজিক। জোড়া দেহের নৃত্য। আমার হঠাৎ মনে হল, এই নাচ গান পার্টি সবই বাহ্য। এর পেছনে একটি গুরু অভিসন্ধি রয়েছে। সেই অভিসন্ধির একজন টার্গেট হয়তো আমিও।

বঙ্গবন্ধু হাসি ঠাট্টার মুডে থাকলে বলতেন, "গরীবের বৌ যদি সুন্দরী হয়, তাহলে সকলেই ভাউজ (ভাবী) ডাকে।" আজ বঙ্গবন্ধু নেই, মাঝে মাঝে মনে হয় কথাটা আমার বেলাতেও সত্য। আমার সৌন্দর্য নেই, আছে লেখার সামান্য ক্ষমতা। যখনই এ সামান্য ক্ষমতা নিয়ে দু'একছত্র সত্য কথা লিখতে চাই, তখনই সামনে খাড়া হয় ভীতি, না হয় প্রলোভন। প্রলোভনটাই আগে আসে। কারণ সকলেই ভাবেন, একজন গরীব সাংবাদিকের মাথার দাম আর কত হতে পারে। তাছাড়া আমাদের দেশের মতো দেশে উত্তরা বা বারিধারায় একটা জমির প্লট, বাড়ি বানানোর টাকা, দু'একটা লাইসেন্স পারমিট বা বিদেশে একটি চাকরির অফারের বিনিময়ে সাংবাদিকের সতীত্ব বিসর্জনের উদাহরণতো খুব খুঁজে বেড়াতে হয় না। সুতরাং প্রলোভন যারা দেখান বা সকল সাংবাদিককেই যারা একই মানদণ্ডে মাপতে চান, তাদের দোষ দেই না।

প্রয়াত চিত্র পরিচালক এবং সাহিত্যিক জহির রায়হান ছিল বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার সহপাঠী এবং বন্ধু। সে মাঝে সাজে আমার হাত নেড়ে বলতো অন্য কথা। বলতো, আপনি মকর রাশির লোক, আপনার কপালে অনেক গেঞ্জাম আছে।

জিজ্ঞাসা করতাম, জহির সত্যি সত্যি তুমি হাত দেখতে জানো?

তার বন্ধু মহলের সবাই জানতো জহির হাত দেখতে জানে। সে জ্যোতিষশাস্ত্র

চর্চা করে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে হেসে বলতো, দূর হাত দেখাটেকা কিছুই জানি না। সুন্দরী মেয়েদের হাত একটু ছুঁয়ে অথবা একটু ধরে রাখার জন্য যদি হাত দেখতে পারেন এটা প্রচার করা হয় তাহলে অধিকাংশ লোক বিশেষ করে মেয়েরা আপনার কাছে হাত মেলে ধরবেই। সকাতর অনুনয় জানাবে, আমার হাতটা একটু দেখে দিন না।

হেসে বলেছি, জহির তোমার পেটে পেটে এত বুদ্ধি।

জহির বলেছে, পেটে নয় বলুন মাথায় বুদ্ধি। নইলে গল্প লিখছি কিভাবে? তবে আপনাকে আমি সত্যি কথাই বলছি। আপনি মকর রাশির লোক। এই রাশির লোকেরা মোস্ট মিসআন্ডারস্টুড পারসন্‌স্। আপনি যা করবেন, যা বলবেন, লোকে তার অন্য অর্থ করবে; আর বিরুদ্ধবাদীরাতো কলংক ও দুর্নাম ছড়াবেই। আপনি যদি লেখক হিসেবে বাঁচতে চান তাহলে লোকের কথায় পরোয়া না করেই লিখে যেতে হবে।

জহির রায়হান আজ বেঁচে নেই। এবার ঢাকায় গিয়ে বার বার তার কথা মনে পড়েছে। মধ্য পঞ্চাশের দশকের সেই দিনগুলোতে ঢাকার প্রথম সিনে-মাসিক 'সিনেমা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ফজলুল হকের বাসা-কাম-অফিসে ছিল আমাদের একটা প্রধান আড্ডা। তার স্ত্রী রাবেয়া খাতুন। তখনকার তরুণ সাহিত্যিক সমাজের মক্ষীরাণী। জহির সেই বাড়িতেই আড্ডা জমাতো বেশি। রাবেয়া এখন লব্ধ প্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী। সেই সময় তার রান্না করা ভুনা খিচুরিই ছিল আমার প্রধান আকর্ষণ। তার কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীতও শুনেছি। এই রাবেয়া খাতুনের বাসায় বসেই জহির রায়হান একদিন আমার হাতটা উল্টেপাল্টে দেখে বলল, আপনার ভবিষ্যত নিয়ে আর কি বলবো? আপনার জীবনে নানা গেঞ্জাম। মকর রাশির লোক আপনি। লোকে আপনাকে সুস্থ থাকতে দেবে না। এ সম্পর্কে আপনাকে একটা গল্প বলি। গল্পটি সকলের জানা। আপনারও জানা। তবু বলছি। তাতে বুঝতে পারবেন, মকর রাশির লোকদের কি ধরনের গেঞ্জাম পোহাতে হয়।

জহিরের মুখে গল্প শুনতে ভালো লাগতো। বললাম, বলো।

জহির বলল, গ্রামের এক বাপবেটা একদিন গাধার পিঠে চড়ে বাজারে চলেছে। রাস্তায় লোকজন তাদের দেখেই বলতে শুরু করলেন, বাপবেটার আক্কেল দেখেছো। একটা ছোট্ট গাধার পিঠে দু'জনেই সওয়ার হয়েছে। একটু মায়া দয়াও কি দু'বেটার মনে নেই? বাপ কথাটা শুনে ছেলেকে নিয়ে গাধার পিঠ থেকে নামলেন এবং দু'জনেই হাঁটতে শুরু করলেন। তখন লোকজন বলতে শুরু করলেন, বাপবেটা কি গাধা দেখেছো? সঙ্গে জন্তুটা থাকতে বুড়ো বাপতো গাধার পিঠে চড়ে যেতে পারে। বাপ এবার তাই করলেন। কিছুদূর যেতেই শুনলেন

লোকে বলছে বুড়ো বাপের কাণ্ড দেখেছো? নিজে দিব্যি গাধার পিঠে চলেছেন। আর কচি ছেলেটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

বাপ তাদের কথা শুনে এবার ছেলেকে গাধার পিঠে চড়ালেন। নিজে হাঁটতে শুরু করলেন। তা দেখে লোকে বলতে লাগল, জোয়ান ছেলের কাণ্ড দেখো। বুড়ো বাপকে রাস্তায় হাঁটাচ্ছে, আর নিজে গাধার পিঠে চড়ে আরামে যাচ্ছে। বাপবেটা এবার রেগে গেলেন। তারা কেউ আর গাধার পিঠে চাপলেন না। গাধাটাকে নিজেদের কাঁধে চড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। তা দেখে রাস্তার লোক হেসে অস্থির। বলতে শুরু করল, একটা আসল গাধা আর দুটো মানুষ গাধা রাস্তা দিয়ে চলেছে। তোমরা দেখেছো?

জহির তার গল্প শেষ করল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার গল্পটার নীতিকথাটা কি বুঝেছেন?

সম্মতি জানিয়ে বললাম, বুঝেছি।

বর্তমানে ফিরে আসি। বারিধারার বন্ধু আমার কানের কাছে সে রাতে ফিসফিস করে ঢাকায় বাড়ি বানানোর অর্থ সংস্থানের কথাটা বলতেই জহির রায়হানের কাছে শোনা সেই গল্পটা বহুদিন পর মনে পড়ল। ভাবলাম, বন্ধু কি আমাকে ভুল ভাবছেন? আর সেই ভুল ভাবনা চিন্তা থেকে এসব কথা বলছেন?

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার অনুরোধটা কি?

ঃ সামান্য একটা তদ্বির।

ঃ এই সামান্য তদ্বিরে আমাকে জড়াতে চাচ্ছেন কেন?

ঃ উপর মহলের সঙ্গে আপনার বেশ ভাব আছে। এই সরকারের চার চারজন মন্ত্রী আপনার বন্ধু। একজনতো আপনার ক্লাস ফ্রেন্ড। সহপাঠী।

বললাম, মন্ত্রীদের কে কবে আমার সহপাঠী ছিলেন, সে পুরনো কথা বাদ দিন। বর্তমান বিএনপি সরকার আমাকে কি চোখে দেখেন, তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি তা আপনি জানেন?

বন্ধু চোখ টিপে রহস্যময় হাসি হাসলেন। বললেন, ওটাতো বাইরের সম্পর্ক। সব সাংবাদিককেই বাইরে সরকারের কড়া সমালোচনা করতে হয়। নইলে তাদের ক্রেডিবিলিটি থাকে না। আপনার মতো কলামিস্টের জন্য সেটাতো আরও সত্য। তবে আপনাদের ভেতরের সম্পর্কটা নিশ্চয়ই ঠিক আছে। আপনি একটা অনুরোধ করে দেখুন। এই সরকারের কোনো মন্ত্রী আপনার অনুরোধ ঠেলতে পারবে না। আপনি আমার অনুরোধটাই টেস্ট কেস হিসেবে বাজিয়ে দেখুন। আরে কোনো সরকারই কি চান কোনো সাংবাদিককে চটাতে? তার উপর আপনার মতোন কলামিস্ট...।

বন্ধু কথাটা শেষ করলেন না। দেখলাম, তিনি সেই গাইনি মহিলার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। কথা আর বাড়াতে চাইলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, বলুন, আপনার অনুরোধটা কি? কাকে সেই অনুরোধ জানাতে হবে?

সেই রাতের আসরে এক রাউন্ড নাচ তখন শেষ হয়েছে। পানপাত্র হাতে যে যার আসনে এসে বসলেন, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘড়ির কাঁটা রাত এগারোটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে।

নয়

'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি।' মধ্যদিনে নয়, মধ্যরাতেরও অনেক পরে বারিধারার বাড়িতে নাচের আসর শেষ হল। আরও কিছুক্ষণ হাল্কা কথাবার্তার পর পুরুষেরা গায়ে জ্যাকেট চাপালেন। মেয়ে ও মহিলারা মুখের প্রসাধন মেরামত করলেন। একে একে অনেকেই কাছে এসে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। সেই গাইনি মহিলাও বিদায় চাইতে এলেন। সঙ্গে সেই নাচের তরুণী। সুজি। মেয়েটি সত্যি সুন্দর। অনেকটা ইনগ্রিড বার্গম্যানের যুবতী বয়সের চেহারা। তবে কোঁকড়ানো কালো চুল। চোখ আয়ত। ভাষাময়। আমার দিকে তাকিয়ে একটু লাজুক হাসি হাসলো। গাইনি মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি হাঁটুর ব্যথার জন্য কোনো ওষুধ খাচ্ছেন না?

ঃ খাচ্ছি। একটি জমকালো নামের ওষুধ। ন্যাপরোসিন।

ঃ একটু ফিজিওথেরাপি করালে পারতেন।

ঃ প্রথম প্রথম তাও করিয়েছি। এখন ডাক্তারের পরামর্শ মতো ঘরে বসে একটু হাল্কা এক্সারসাইজ করি। ডাক্তার বলেন, ওয়েট কমাতে। সেটাই পারি না। আমি খুব পেটুক লোক।

সুজি হেসে উঠল। গাইনি মহিলা বললেন, আপনি আর ক'দিন ঢাকায় আছেন জানি না। যদি আরো সপ্তাহ দুই থাকেন, তাহলে আমার সার্জারিতে আসতে পারেন। সুজি ভালো ফিজিওথেরাপিস্টও। আপনার হাঁটুতে ক'দিন ম্যাসাজ করলে ওর হাতের গুণ আপনি বুঝতে পারবেন।

লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু মাথা নেড়ে না বলতে হল। বললাম, রোজ আপনার সার্জারিতে এসে হাঁটু ম্যাসাজ করানোর সময় আমার হবে না। বহুদিন পর দেশে এসেছি। এখনো বহু আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বাকি। তবে একদিন সাভারে যাবো ভাবছি।

ঃ সাভারে কেন? মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

ঃ সেখানে একজন নামকরা কবিরাজ ছিলেন। বিশ বছর আগে আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন তার চিকিৎসা লাভের জন্য বহু দূরদূরান্তর থেকে তার কাছে রোগী আসতো। এমনি ছিল তার হাতযশ। তার পাচন আর বড়ি খেয়ে অনেকের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বাতের ব্যথা সেরেছে বলে শুনেছি।

সুজি এবার হেসে বলল, কবিরাজি ওষুধ খেতে হলে আপনাকে তুলসি পাতার রস, খাঁটি মধু, গন্ধব পাতা, হরিতকি, তালের মিছরি ইত্যাদি নানা জিনিস জোগাড় করতে হবে। তা কি আর এখন এদেশে পাবেন?

আমি কিছু বলার আগেই আমার আমন্ত্রণকারী গৃহকর্তা বন্ধু বললেন, সাভারের এক কবিরাজ চ্যাবনপ্রাস নামে এক ওষুধ দিতেন বলে শুনেছি। তাতে সর্দি কাশিসহ এক সঙ্গে অনেক অসুখ সেরে যেতো। তবে ইম্পোটেন্সির চিকিৎসায় তিনি খুবই নাম করেছিলেন। ত্রিশটা বড়ি ত্রিশ দিন খলেতে মধু মিশিয়ে খেলে নাকি মরা দেহেও যৌবনের বান ডাকতো। এখন এসব কবিরাজ আর বেঁচে আছেন কি না জানি না।

বললাম, আমি কলকাতার বিখ্যাত কবিরাজ শিবকালী বাবুর বিস্ময়কর চিকিৎসা দেখেছি। বাতে সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে গেছে, এমন অনেক রোগীকেও তিনি ভালো করেছেন। ছোট বেলায় গ্রামে থাকতে হাজারের উপর কুইনিনের বড়ি আমাকে খাওয়ানো হয়েছে। আমার ম্যালেরিয়া ভালো হয়নি। শেষ পর্যন্ত কবিরাজের পাচন খেয়ে ভালো হয়েছে।

বন্ধু বললেন, সাভারে এখন আর এসব কবিরাজের দেখা পাবেন মনে হয় না। চৌষট্টি সালের দাঙ্গা এবং পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর অনেকেই দেশ ছেড়েছেন। বাকি যারা ছিলেন এবং ভেবেছিলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তাদের ভাগ্য ফিরবে, তারা যখন দেখলেন, স্বাধীনতার পরেও তাদের দুর্ভাগ্যের অবসান হয়নি, তারা তখন একে একে ঘরবাড়ি বিক্রি করে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন।

হঠাৎ কিছু পুরনো কথা মনে হওয়ায় আমি একটা উদ্‌গত নিঃশ্বাস চাপলাম। সুজিকে নিয়ে গাইনি মহিলা বিদায় নিলেন। বন্ধুপত্নী তখনো অতিথিদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে ব্যস্ত। বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি হঠাৎ আনমনা হয়ে গেলেন যে।

বললাম, কিছু পুরনো ইতিহাস মনে পড়ায়। ঢাকায় এসে দেখছি অনেকেই আওয়ামী লীগের অনেক ব্যর্থতার সমালোচনা করেন। কিন্তু তাদের আসল ব্যর্থতার কথাটা কেউ উচ্চারণ করেন না।

বন্ধু বললেন, সেই ব্যর্থতাটা কি?

বললাম, পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে, বিশেষ করে সত্তরের নির্বাচনে

আওয়ামী লীগের শ্লোগান ছিল সোনার বাংলা শ্মশান কেন? এই জিজ্ঞাসার কিছু ভাসা ভাসা জবাব আওয়ামী নেতারা নিজেরাও দিয়েছেন। পোস্টারে প্রচারপত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। কিন্তু আসল জবাব, আসল তথ্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে তারা পারেন নি। এই জবাব জনসাধারণকে ভালোভাবে অবহিত করানোর দায়িত্ব ছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতিবিদদের, গবেষকদের। তারা সে দায়িত্ব পালন করেন নি। ফলে দেশ স্বাধীন হবার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় আওয়ামী লীগ সরকার যখন শ্মশান বাংলাকে রাতারাতি সোনার বাংলায় রূপান্তর করতে পারলেন না এবং যা অত অল্প সময়ে পারা সম্ভবও ছিল না, তখন দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে অভিসম্পাত দিল। এই অভিসম্পাত থেকে আজও আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি।

বন্ধু একটু বিস্মিত হলেন। বললেন, সাভারের কবিরাজের দেশত্যাগের কথা শুনে সোনার বাংলা শ্মশান হবার পুরনো প্রসঙ্গ আপনার মনে পড়ল কেন, তা আমি বুঝতে পারছি না।

বললাম, মাঝ রাতে আপনার বাড়ির দোরপোড়ায় দাঁড়িয়ে এমন পরনো কথা তোলা হাস্যকর।

বন্ধু বললেন, আমার ড্রাইভার একটা পরিবারকে তাদের বাসায় পৌছিয়ে দিতে গেছে। ফিরতে আরও দশ মিনিট লাগবে। ততক্ষণে আপনার কথাটা শুনি। আপনাকে আমিই আপনার বাসায় পৌছিয়ে দিতে যাব। সুতরাং আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

বললাম, তথাস্তু। সোনার বাংলা এখনো কেন শ্মশান, সে সম্পর্কে আমার একটা অভিমত আছে। আপনার মতের সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে।

'তবু বলুন।

'আপনি কি বিশ্বাস করবেন, আঠারো শতকের শেষ দিকে অর্থাৎ বাংলাদেশে স্বাধীন নবাবদের শাসনামলে দেশটি শিল্পবিপ্লবের দুয়ারে গিয়ে দাড়িয়েছিল? বৃটিশ বেনিয়ারা সেই শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা অমানুষিক বর্বরতা দ্বারা রুদ্ধ করে, বাঙালীর সকল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোটেন্সিকে ধ্বংস করে এই বহুল জনবসতিপূর্ণ দেশে তাদের নিকৃষ্ট পণ্যের একচেটিয়া বাজার তৈরি করার জন্য ঔপনিবেশিক রাজত্ব স্থাপন করেছিল? যে শিল্পবিপ্লব হবার কথা ছিল বাংলাদেশে, এবং এই উপমহাদেশে; তা ঘটানো হয় সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে ইংল্যান্ডে, এই দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং এই দেশের শিল্প সম্ভাবনাকে ধ্বংস করেই।

বন্ধু বললেন, ইংরেজদের শোষণের কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু

বাংলাদেশের মতো একটি কৃষিপ্রধান দেশে সেই আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কি করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলিউশন ঘটতে যাচ্ছিল, তা আমার বোধগম্য নয়।

বললাম, আপনাকে তা বোঝাতে গেলে আজ সারা রাত লাগবে। আপনি কি দয়া করে ১৮৪০ সালে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান তৎকালীন বৃটিশ পার্লামেন্টারী ইনকোয়ারি কমিটির সামনে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তার বিবরণ, অথবা সেকালের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ মন্টোগোমারি মার্টিনের তৎকালীন ঢাকা সম্পর্কে একই তদন্ত কমিটিকে দেয়া রিপোর্ট সংগ্রহ করে একবার পাঠ করে দেখবেন? বাংলাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের গোড়ায় বৃটিশ শাসকেরা দেশটির ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোটেন্সি ধ্বংস করার জন্য যে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে, তার কাছে হাজার হাজার তাঁতীর আঙ্গুল কেটে দেয়া, নীল চাষীদের সর্বস্বান্ত করা, পাট, চা, রেশম ও কার্পাস সম্পদ লুণ্ঠন করা নস্যিমাত্র।

বন্ধু চুপ করে রইলেন, জবাব দিলেন না। মনে হল, এসব ব্যাপারে আলোচনায় তার তেমন আগ্রহ নেই। তবু বললাম, পাকিস্তানী আমলে একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। শুধু ঔপনিবেশিক শাসনের রূপান্তর ঘটেছে নব্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়। পাকিস্তানী শাসকেরাও চেয়েছেন, বাংলাদেশের স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপূরক দেশী ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলোকে ধ্বংস করে, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের নিকৃষ্ট এবং চাহিদাবিহীন পণ্যের একচেটিয়া বাজার তৈরি করতে। এজন্য বহিরাগত অবাঙালীদের একটা বড় অংশকে ব্যবহার করে দু দু'টা বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো হয়েছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। একটি ১৯৫০ সালে এবং অন্যটি ১৯৬৪ সালে। উদ্দেশ্য ছিল, উচ্চবিত্ত অমুসলিম বাঙালী সংখ্যালঘুরা তো আগেই দেশত্যাগ করেছে, এখন বাংলাদেশের স্বনির্ভর অর্থনীতির তৃণমূল পর্যায়ের আসল শেকড়--তাঁতী, জোলা, কামার, কুমোর, নাপিত, জেলে, বেদে, পটুয়া, কলু, মৃৎশিল্পী প্রভৃতি পেশাজীবী অমুসলমান সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগে বাধ্য করে তাদের জীবিকা নির্বাহের জায়গাটি পশ্চিম পাকিস্তানের নিকৃষ্ট পণ্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করা। সাভারের যে কবিরাজেরা সারা ভারতে বিখ্যাত ছিলেন, তাদের অধিকাংশ যে দেশত্যাগে বাধ্য হলেন, তা এই সংখ্যালঘু বিতাড়নের পরিকল্পনা বা চক্রান্তেরই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া।

বন্ধু একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, আপনার এসব কথার কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন?

বললাম, কেন পারব না? আগে বাংলাদেশে খাঁটি সর্ষে তেল ছিল সুলভ এবং সস্তা। রান্না বান্না থেকে গায়ে মাখা পর্যন্ত সকল কাজে বাঙালী এই তেল ব্যবহার করতো। চাষীরা সর্ষের চাষ করতো। গ্রামে গ্রামে কলুরা সেই সর্ষে কিনে তাদের ঘানিতে তেল উৎপাদন করতো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ে এই কলুরা দেশত্যাগী হলে

সর্ষের তেলের উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এমনকি এক সময় রেশনে এই তেল দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই সর্ষের তেলের অভাব পূরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বারো আনা পশুর চর্বি মিশ্রিত ডালডা বা ভেজাল বনস্পতি ঘি আমদানী করে। ডালডায় পূর্ব পাকিস্তানের বাজার ছেয়ে ফেলা হয়। তারপর বিড়ি শিল্পের কথায় আসুন। ভারত ভাগের সময়েই পূর্ব পাকিস্তানে দশ লক্ষ লোকের উপর ছিল বিড়ি শ্রমিক। কোটি কোটি গরীব বাঙালীর প্রিয় ছিল এই বিড়ি। ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক ঝগড়ার নামে পাকিস্তানের শাসকেরা এই বিড়ি তৈরির টেণ্ডুপাতা ভারত থেকে আমদানি করা বন্ধ করে দেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে বোকা বানানোর জন্য প্রথমে কিছুদিন বলা হল, বিড়ি তৈরির জন্য টেণ্ডুপাতার চেয়েও উৎকৃষ্ট কুম্ভিপাতা পূর্বপাকিস্তানে পাওয়া গেছে। কিন্তু এই কুম্ভিপাতার চাষ বা এই পাতা পরিশোধনের কোনো ব্যবস্থা হল না। বরং বাজারে বিড়ির বদলে 'বগা' সিগারেটের প্রচলন বাড়ছে দেখা গেল। তারপর ধানমণ্ডির পাশে এই রায়ের বাজারের কথায় আসুন। এটা ছিল একটা বিখ্যাত কুমোর পাড়া। সারা উপমহাদেশ খ্যাত ছিল এই কুমোরেরা। মাটির হাঁড়ি পাতিল, ঘটি বাটি, বাসন কোসন তৈরি করা ছিল তাদের পেশা। সারা উপমহাদেশে তাদের তৈরি জিনিসের কোনো জুড়ি ছিল না। ভারত বিভাগের আগে এবং পরেও নৌকার পর নৌকা বোঝাই করে এই হাঁড়ি পাতিল, বাসন কোসন রায়ের বাজার থেকে পাঠানো হতো দেশের এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন বাজারে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরীতে প্রায়ই দেখা যেত এই নৌকার বহর। যেন প্রাচীন যুগের চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরী। ষাটের গোড়ায় আমি যখন 'দৈনিক আজাদের' সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত, তখন সেই কাগজে 'বিচিত্র জীবন' নামে একটি সচিত্র ফিচার প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করতাম। ফিচারটি লিখতাম আমি। ফটোগ্রাফার ছিলেন আমার সহকর্মী ফিরোজ। একদিন খবর পেলাম, আমাদের এই 'বিচিত্র জীবন' ফিচারের চমৎকার উপাদান আছে রায়ের বাজারে। ফিরোজকে নিয়ে ছুটলাম। এই উপাদান কুমোর পাড়ার একটি অন্ধ মেয়ে। বয়স আঠারোর বেশি নয়। অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু দু'টি চোখের একটিরও পাতা নড়ে না। চোখের দুটো মণিই শাদা মার্বেলের মতো। কাদামাটি নিয়ে মেয়েটি ছাঁচঘরে বসা ছিল। চোখে দেখে না। কিন্তু দু'টি হাত অনবরত কাজ করে চলছে। শুধু হাঁড়ি পাতিল নয়, তার তৈরি কয়েকটা চমৎকার মূর্তি দেখলাম। মৃৎশিল্পী একেই বলে। প্রত্যেকটি মাটির পাত্রে তার হাতের নিপুণ কারুকাজ। ফিরোজ চটপট তার কয়েকটি ছবি তুলল। এই মেয়ের ছবি নিয়ে আমার লেখা 'বিচিত্র জীবনের' ফিচার 'আজাদে' বেরুলো। 'আজাদের' তৎকালীন ম্যানেজিং ডিরেক্টর কামরুল আনাম খান আমাকে ডেকে বললেন, এই লেখাটার প্রশংসা করে

অনেকেই টেলিফোন করছেন। আমি ক্যাশিয়ারকে বলেছি আপনাকে কিছু টাকা দেয়ার জন্য। এটা পুরস্কার নয়। আপনার কাজের সামান্য স্বীকৃতি।

আমার কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম। দেখলাম বন্ধু উসখুশ করছেন। বললেন, ড্রাইভার সম্ভবত এসে গেছে। চলুন, গাড়ির দিকে এগোই।

আমি তার সঙ্গে এগুলাম। আগের কথার জের টেনে বললাম, ১৯৬৪ সালে মোনায়েম খান ঢাকায় যে দাঙ্গা বাঁধান, তাতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই রায়ের বাজার। কুমোরদের সব খড়ের ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আর সারাদেশ থেকে এই মাটির শিল্পের উচ্ছেদের পর বিদেশ থেকে নিকৃষ্টমানের কাঁচ ও চীনামাটির বাসন, পেয়ালা, এলমুনিয়ামের ডেকচি, পাতিল এনে বাজার ভরে ফেলা হয়। এই আমদানি ব্যবসায়ে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ী এবং তাদের পূর্ব পাকিস্তানী সাব এজেন্টরা দু'হাতে মুনাফা লুটেছেন। আর সেই মুনাফা জোগাতে হয়েছে গরীব বাঙালী ক্রেতাকে।

বন্ধু উচ্চবাচ্য করলেন না। বুঝলাম, এই আলোচনা তার পছন্দ নয়। তার স্ত্রীও এ সময় আমাদের সঙ্গে এসে জুটলেন। বন্ধু তাকে বললেন, অনেক রাত হয়েছে, ড্রাইভারকে যেতে দাও। আমিই গাফ্‌ফার সাহেবকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবো।

বন্ধুপত্নী বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। ওর সঙ্গে আমাদের আসল কথাটা নিশ্চয়ই এখনো শেষ হয়নি। তোমরা কেবল রাজনীতির কচকচি চালাচ্ছো বলে মনে হল।

বন্ধু বললেন, বেশ, তুমি তাহলে পেছনের সীটে বসো। গাফ্‌ফার সাহেব— আমার পাশে সামনে বসুন।

তিনি ড্রাইভিং সীটে বসলেন। আমাকে বললেন, কোথায় যাবো? পশ্চিম ধানমণ্ডিতে আপনার সেই চালা ঘরে, না স্বামীবাগে আপনার আত্মীয়ের বাসায়?

বললাম, আমি এখনো ধানমণ্ডির চালাঘরেই আছি। সেখানেই পৌঁছে দিন। দু'একদিন পর আমরা স্বামীবাগের বাসায় যাবো।

বন্ধু গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, আপনার ধানমণ্ডির বাসার পাশেই রায়ের বাজার। মোনায়েম খানদের দলের যতই নিন্দা করুন, তারা উদ্যোগ না নিলে রায়ের বাজার এখনো থাকতো কুমোরদের বস্তিপাড়া। কোনো ভদ্রলোক সেখানে ঢুকতে পারতো না। আপনিও এখানে জমি কেনার কথা ভাবতেন না। এখন রায়ের বাজারে গিয়ে দেখুন। চিনতে পারবেন না। কত সুন্দর রাস্তাঘাট, বাড়িঘর হয়েছে। আর মাটির হাঁড়িকুড়ির কথা ভেবে দুঃখ পাচ্ছেন কেন? আমাদের এলুমিনিয়ামের ডেকচি, পাতিল, কাঁচের বাসন, পেয়ালা খারাপ ছিল কি? এখন তো প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসও বাজারে এসেছে।

বললাম, পাকিস্তান আমলে এসব ছিল নিকৃষ্টমানের। হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কারখানার, নয় বিদেশ থেকে সস্তায় আমদানি করা জিনিস। আমাদের বেশি দাম দিয়ে কিনতে হতো। একচেটিয়া মুনাফা। তা যেতো পশ্চিম পাকিস্তানে।

বন্ধুপত্নী স্বামীকে তাড়া দিলেন, তোমরা রাজনীতির কচকচি বন্ধ করবে? ওই ডাক্তার মহিলার ব্যাপারটা গাফ্ফার ভাইকে বলো।

আমি গাড়ির কাঁচের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। বারিধারায় আসার পথে একখণ্ড যে চাঁদ দেখেছিলাম, সেটা আর দেখলাম না আকাশে। ভাবলাম, হয়তো মেঘের আড়ালে ডুব দিয়েছে, অথবা অস্ত গেছে। আমাদের সারাজীবনটাই যেন এই খণ্ড, বক্র এবং কখনো পূর্ণ চাঁদের মতো। কখনো নীলাকাশে উদ্ভাসিত এবং কখনো মেঘের আড়ালে নিমজ্জিত।

বন্ধু তার গাড়িতে একটা গানের ক্যাসেট অন করলেন। বললেন, আপনি তো রবীন্দ্র সঙ্গীত ভালবাসেন।

ঃ তা বাসি।

ঃ ঢাকায় কার রবীন্দ্র সঙ্গীত আপনার বেশি পছন্দ?

ঃ রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার।

ঃ তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

ঃ আছে।

ঃ ঢাকায় তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ঃ না, দেখা হয়নি। তবে টেলিফোনে কথা হয়েছে। বলল, তার বাবা অসুস্থ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রয়েছেন। আর সেও চলে যাচ্ছে কলকাতায়। তাই দেখা হয়নি।

বন্ধু বললেন, আমি দুঃখিত, আমার কাছে বন্যার কোনো গানের ক্যাসেট নেই। পাপিয়া সারোয়ারের একটা ক্যাসেট বাজাচ্ছি, আপনার ভালো লাগবে।

লো ভল্যুমে গান বেজে উঠল। বন্ধু বললেন, আপনাকে আমি একটা অনুরোধ করবো বলেছিলাম। ওই গাইনি ভদ্রমহিলা সম্পর্কে। তিনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু। তিনি বিপদে পড়েছেন।

ঃ কি বিপদ।

ঃ তিনি পাস করা গাইনি নন। কিন্তু ব্যাংকক ও ম্যানিলায় টপ আমেরিকান হাসপাতালে দশ বছরের বেশি কাজ করেছেন। যে কোনো পাস করা ডাক্তারের চাইতে তিনি দক্ষ। জেনারেল এরশাদের এক বান্ধবীর সাথে তার পরিচয় ছিল, সেই সূত্রে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং সার্জারি খোলেন। একটা তিনতলা বাড়িতে তার

সার্জারি। সেখানেই থাকেন। পাঁচ বছরের উপর ওই বাড়িতে আছেন। বাড়ির মালিক বাড়িটা বেচতে চান বলে তাকে আগাম বারো আনা টাকা দিয়ে দিয়েছেন। তারপরেই দেশে রাজনৈতিক গণ্ডগোল। এরশাদ সাহেবের পতন। এখন সেই বাড়ির মালিক তাকে বাড়ি থেকে উঠে যেতে বলছেন। টাকা নেয়ার কথা বেমালুম অস্বীকার করছেন। মাস্তান দিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন। ওদিকে মাস্তানরাও সুযোগ পেয়ে তার নামে রটাচ্ছে, তিনি এরশাদের লোক। তার বাড়িতে নানা অসামাজিক কার্যকলাপ হতো। এক শ্রেণীর বড়লোকের মেয়ের ইলিগ্যাল এবোর্সনের ব্যবসা তার আসল পেশা। এই ব্যবসায় তিনি মাসে লাখ লাখ টাকা কামান। ইত্যাদি নানা কথা রটিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে রোজ তার কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা নিচ্ছে। থানা পুলিশ নিষ্ক্রিয়। তিনিও মাস্তানদের ভয়ে প্রকাশ্যে কোনো অভিযোগ জানাতে পারছেন না।

গাইনি ভদ্র মহিলার আসল বিপদ কি এতক্ষণে তা বুঝতে পারলাম। বুঝলাম এরশাদের আমলে তার যে প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল তা এখন নেই। ফলে শত্রু মিত্র সকলেই সুযোগ নিতে চাচ্ছেন।

প্রকাশ্যে বললাম, এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি?

বন্ধু বললেন, সরকারের কোনো প্রভাবশালী লোক বা মন্ত্রীকে বলে যদি ভদ্রমহিলাকে হাঙ্গামা থেকে বাঁচাতে পারেন, তাহলে খুশি হব। পুলিশ কড়া হলে মাস্তানরা বেশি বাড়াবাড়ি করতে সাহস পাবে না। বাড়ির মালিকও তাকে উঠিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাতে পারবে না। আপনি শুধু এই ব্যবস্থাটুকু করুন। বাকি ব্যবস্থা ভদ্রমহিলা নিজেই করবেন। তার টাকার জোর আছে।

বললাম, আমি কিছু করতে পারবো, এমন আশা করছেন কেন?

ঃ আপনি একজন অতি পরিচিত সাংবাদিক। সরকারী দলের অনেক নেতা আপনার বন্ধু। তারা আপনার অনুরোধ ঠেলতে পারবেন না।

গাড়ি তখন আবাহনী ক্লাবের মাঠ পেরিয়েছে এবং বাড়ির গলির মুখে এসে গেছে।

বললাম, আমার মনে হয় না সরকারী দলের কেউ এ ব্যাপারে আমার অনুরোধ রাখবেন। আমার পরামর্শ হচ্ছে, মহিলা যেন নিজেই সরকারী দলের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমাকে যে টাকা তিনি দিতে চান, সেটা যেন সরকারী দলের কোনো ফান্ডে দেন। তাতে কাজ হতে পারে।

বন্ধু নিশ্চুপ রইলেন। বুঝতে পারলাম, তিনি নিরাশ হয়েছেন। শুধু নিরাশ হওয়া নয়, হয়তো কিছুটা ক্রুদ্ধও হয়েছেন।

দশ

১৯৯৩ সালের গোটা জানুয়ারী মাসটা বাংলাদেশে অবস্থান করে আমার একটা কথাই বার বার মনে হয়েছে, বাংলাদেশে একটা নীরব সামাজিক বিপ্লব খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। আর এই বিপ্লবে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই নেতৃত্ব দিচ্ছে গ্রামীণ সমাজ-জীবন ভেঙে পড়ায় ঘর, পর্দা, পরিবার ও সমাজ থেকে বেরিয়ে আসা হাজার হাজার গৃহবধু ও গৃহকন্যা — যারা এখন শহরে বন্দরে দক্ষ অথবা অদক্ষ নারী শ্রমিক। এবং স্কুল ও কলেজ থেকে লেখাপড়া শেষ করে বেরিয়ে আসা মেয়েদের একটা সচেতন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত ও রাগী অংশ। না, এই বিপ্লবে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, কিংবা জাহানারা ইমাম কেউ নেতৃত্ব দেবেন না। নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন বাঙালী জোয়ান অব আর্কেরও প্রয়োজন হবে না। এই বিপ্লব শুরু হয়েছে সকলের অলক্ষ্যে; অজ্ঞাত-পরিচয়, নাম না জানা হাজার হাজার ঘরহীন, পরিবারহীন, সমাজ বন্ধনহীন নারীর নেতৃত্বে। এই নীরব বিপ্লবের ফলে এরই মধ্যে গ্রামে শহরে সর্বত্র আমাদের এত যুগের সযত্ন পালিত মধ্যবিত্ত-মানসিকতা ও মূল্যবোধগুলোও ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। পুরনো মূল্যবোধের জায়গায় নতুন কোনো মূল্যবোধ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সমাজে, বিশেষ করে শহুরে সমাজে নিও কলোনিয়াল পলিটিক্যাল ও সোস্যাল কালচারের প্রভাবেব ফলে নানা বিকৃতিরই প্রাধান্য বাড়ছে। তবু বলবো, এই সর্বনাশা ভাঙনের মধ্য দিয়েও একটি নতুন ভবিষ্যতের অস্পষ্ট এবং ধূসর উপকূল রেখাও যেন ক্রমশ দেখা দেবে বলে আমার মনে হয়েছে।

নজরুল বলেছেন, "ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর, ধ্বংস নতুন সৃজন-বেদন"। নব্বইয়ের দশকের ঢাকার এক জনাকীর্ণ শীতের দুপুরে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে দাঁড়িয়ে, রাস্তা দিয়ে যে যুবতী গৃহবধু মোটর বাইকের পেছনে বসে, স্বামীকে দু বাহুতে জড়িয়ে অফিসের দিকে যাচ্ছে, তার ঘোমটাবিহীন মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশে যে নীরব সমাজ বিপ্লবের অলক্ষ্য ধারাটির কথা বলেছি, তা যেন ক্রমেই স্পষ্ট হতে চলেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় প্রথম বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ ও অর্থনীতির সনাতন কাঠামোটি ভেঙে পড়ে। সামন্ত যুগীয় মূল্যবোধ, আচার, আচরণ ধসে পড়ে। আর্থিক অনটনের প্রচণ্ড চাপে গ্রামের ঘোমটা ঢাকা, নোলকপরা গৃহবধু, এমন কি মধ্যবিত্ত পরিবারের পর্দানশীন বধু ও কন্যাও সমাজ পরিবারের পাহাড়া ভেঙে রাস্তায় বেরুতে বাধ্য হয়। ইউরোপেও মহাযুদ্ধের ধাক্কায় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও

মূল্যবোধে ভাঙন ধরে। কিন্তু শিল্পোন্নত সমাজে সেই ভাঙনের চেহারা অন্যরকম। ইউরোপে এই ভাঙন ও পরিবর্তনের খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় আলবার্তো মোরাবিয়ার 'টু উওমেন' উপন্যাসে। স্টেইনবেক, হেমিংওয়ে, ইলিয়া এরেনবুর্গের কাহিনীতে। অবিভক্ত বাংলাদেশেও কোনো সমাজ -বিজ্ঞানীর লেখায় নয়, প্রথমে আমাদের গল্পে, উপন্যাসেই এই ভাঙন, ধস ও পরিবর্তনের ছবি ধরা পড়ে। চল্লিশের দশকের শেষ দি.ক. প্রকাশিত গ্রামবাংলার মুসলমান নারী সমাজ নিয়ে লেখা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'যতন বিবি', শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'শাহের বানু' গল্পগ্রন্থ, বিশেষ করে এই গ্রন্থের 'ভাঙন' গল্পটি; তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' উপন্যাস, একই সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস "কালো ঘোড়া" (লেখকের নামটি মনে পড়ছে না) প্রভৃতি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজ জীবনে ভাঙন ও পরিবর্তনের প্রামান্য দলিল।

এই ভাঙন ও পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করেছে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ। দেশভাগ ও দাঙ্গার ফলে হাজার হাজার পরিবার উদ্বাস্তু হয়েছে। পুরনো সামাজিক ধ্যান-ধারণা, আচরণ এবং পাপ পুণ্য বোধকে তারা আঁকড়ে থাকতে পারে নি। পারা সম্ভব ছিল না। জীবিকার তাগিদে, জীবন রক্ষার তাগিদে জীবনের নানা অলিগলি, অন্ধকার পথে তাদের হাঁটতে হয়েছে। সেখানে সমাজ ও পরিবারের পুরনো বন্ধন নেই; নীতি নিয়ম আপ্তবাক্য মাত্র। এই ভাঙন ও পরিবর্তনকে পূর্ণতা দিয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গ্রামীন আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় আরও বিপর্যয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী শুধু শহর বন্দরগুলোতে নয়, সুদূর গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত হানা দিয়েছে এবং হত্যা, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং নির্বিচার নারী ধর্ষণ চালিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেমন ইউরোপে সমাজ ও পরিবারের অবশিষ্ট বাঁধন ও সংস্কারগুলোকে ভেঙে নারী সমাজকে একেবারে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেয়, বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর তাণ্ডব শুধু গ্রাম, শহর, বন্দর ধ্বংস করে নি, শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত পরিবার ও সমাজের বন্ধন, নীতিমালা, আচরণবিধি, পাপ পুণ্য বোধকে ধ্বংস করে দিয়ে গ্রামের নারী সমাজকেও জীবিকার ধাক্কায় পুরুষের পাশে লংমার্চ করার উম্মুক্ত সড়কে আবরণহীনভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও চরিত্র বদলে দিয়েছে। তাদের বহু রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামি হ্রাস পেয়েছে; ভেতো ও ভীরু বাঙালীর অপবাদ ঘুচিয়ে তারা অস্ত্রধারী হয়েছে।

এই অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এখন অপরাধ প্রবণতা ও বিকৃত মানসিকতার প্রভাবই বেশি লক্ষ্য করা যায়। তার মূল কারণ, মুক্তিযুদ্ধের স্বল্প কিছুকাল পরেই দেশে এক নতুন শাসক শক্তির প্রতিবিপ্লবী পন্থায় ক্ষমতা দখল করা এবং মুক্তিযুদ্ধের

চেতনা ও মূল্যবোধগুলোকে মুছে ফেলার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ফলে এক সময় যে অস্ত্রের ব্যবহার দেশপ্রেম এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্বপ্ন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, এখন সেই দেশপ্রেম ও স্বপ্ন সম্ভাবনার অনুপস্থিতিতে তা নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব ও ধ্বংসলীলা ইউরোপের মনমানসিকতায় রাতারাতি যে নীরব অথচ ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল, সে সম্পর্কে একটি চমৎকার ফরাসী গল্প পড়েছি বহু আগে। গল্পটি এই রকম। প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি ছোট্ট মধ্যবিত্ত পরিবার। পরিবারে বেঁচে আছেন মধ্যবয়সী মা এবং তার তরুণী মেয়ে। মা ও মেয়ে ধর্মভীরু। তারা প্রতি রবিবারে গীর্জায় যান; মায়ের বয়স যদিও পঁয়তাল্লিশের মতো; কিন্তু তিনি আর পুরুষ বন্ধু গ্রহণ করে নি। কারণ, বিবাহের বাইরে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো তিনি পাপ মনে করেন। আবার মেয়েটিকে একলা ছেড়ে এই বয়সে বিয়েও করতে চান না। মেয়েটিও মায়ের সব সংস্কার ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত এবং পাড়ায় একজন 'আদর্শ মেয়ে' হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। মেয়েটির বয়ফ্রেন্ডও তখনকার প্রচলিত ধ্যান ধারণায় অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী একজন 'সচ্চরিত্র' যুবক। সপ্তাহে দু'বার সে মেয়েটির কাছে আসে। তাকে নিয়ে বেড়াতে যায়, ছবি দেখে, রেস্টুরেন্টে খায় এবং সন্ধ্যে হলে মেয়েটিকে বাড়ি পৌছে দিয়ে চলে যায়। কখনো তার সঙ্গে রাত্রে থাকে না। দু'জনেই বিশ্বাস করে, বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক পাপ। মেয়েটা বয়ফ্রেন্ডকে আশ্বাস দিয়েছে সে তার কুড়িটি বসন্তের সমস্ত সম্ভার ধরে রেখেছে, তাকে বিয়ের মধুরজনীতে একান্তে উপহার দেবে বলে। এই সম্ভার শুধু তার একারই প্রাপ্য। সবই ঠিকঠাক চলছিল, এমন সময় শুরু হল যুদ্ধ। জার্মান সৈন্যরা প্যারিস দখল করে। শহরের চারদিকে ধ্বংস আর তাণ্ডব। মা মেয়ে গ্রামের দিকে পালাতে চেয়েছিলেন। পারলেন না। চারপাশ হিটলারের সৈন্যরা অবরোধ করে ফেলেছে। এক রাতে তারা হানা দিল ওই বাড়িতে। মা ও মেয়েকে এক সঙ্গে একই কামরায় মুখ বেঁধে ধর্ষণ করল। উপর্যুপরি ধর্ষণ। তারপর অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল।

মা বেশি আহত হন নি। দিনের আলোয় জ্ঞান ফিরতেই তিনি চোখ মেলে তাকালেন। পাশে রক্তাক্ত, নগ্নদেহ তার কুমারী মেয়ের দিকে। এখন আর সে কুমারী নয়। কয়েকদিনের সেবা যত্নে তাকে সারিয়ে তুললেন। নিজেও সুস্থ হলেন। মা ও মেয়ে এরপর ওই রাতের ঘটনা নিয়ে একবারও আলাপ করেন নি। প্রসঙ্গটি তারা দু'জনেই সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। মেয়েটির বয়ফ্রেন্ডেরও আর পাত্তা নেই। সে রেজিস্টেন্স ফোর্সে যোগ দিয়ে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। মা ও মেয়ের জীবিকা নির্বাহের কোনো উপায় নেই। তারা চাকরি নিলেন জার্মানদের অধীনে ক্যাম্প

হাসপাতালে নার্স হিসেবে। সেখানে আহত জার্মান সৈন্যদের চিকিৎসা হয়। হাসপাতালে ডিউটি সেরে মা ও মেয়ে দু'জনেই কখনো মাঝ রাতে, কখনো শেষ রাতে বাড়ি ফেরেন। তাদের ডিউটির সময় আলাদা। সুতরাং একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে পারেন না। তবু দু'জন দু'জনের দিকে লক্ষ্য রাখেন। সেই দুর্ঘটনার রাতের পর থেকে একজনও সে সম্পর্কে আরেকজনের কাছে মুখ খোলেন নি। তবু মা ও মেয়ে দু'জনেই জানেন তারা বদলে গেছেন এবং আরও বদলে যাচ্ছেন। আগের ধ্যান ধা-রণা, সংস্কার বিশ্বাস সবই তাদের লোপ পাচ্ছে।

মা একজন বয়স্ক জার্মান সৈন্যকে তার প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রথমে বাধ্য হয়েছিলেন তাকে দেহ দান করতে। তারপর তাকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু প্রেমিককে তিনি কখনো বাড়িতে আনেন না। মা চান, তার যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়ের সারাজীবন সামনে। তার যেন নতুন করে আর সর্বনাশ না হয়। মেয়েকে রক্ষা করতেই হবে এবং সে দায়িত্ব তার। তাই তার দিকে নজর রাখেন।

একরাতে মায়ের হাসপাতালে ডিউটি। তার বাড়ি ফেরার কথা নয়। কিন্তু শরীর অসুস্থ হওয়ায় ছুটি নিয়ে শেষ রাতে বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখেন, মেয়ের ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। বাজনা বাজছে। বেশ কটি পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মা তার নিজের ঘরের দরোজা খুলতেই দু'জন জার্মান যুবক মাতালের মতো টলতে টলতে তার মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের গায়ে তখনো ইউনিফর্ম। নেশা জড়ানো কণ্ঠ। তাদের বিদায় দিতে প্রায় বিবস্ত্র বেশে মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই মেয়ের দিকে মা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তার গলা দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। মেয়ে তার কাছে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, মাদার, তুমি এতো ভেঙে পড়ছো কেন? আমি জানি তুমি কি করছো, তুমিও এখন জানলে আমি কি করছি। আমরা দু'জনেই এখন বয়স্ক রমনী। তোমার মতো আমিও এখন এডাল্ট। সুতরাং তোমার এত ভয় পাওয়ার কি আছে? বেঁচে থাকার জন্য এছাড়া আমাদের আর অন্য উপায় কি?

গল্পটির শেষ এখানেই। মুক্তিযুদ্ধের পর দেখেছি, বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে এ ধরনের অসংখ্য কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। সে সময় ঢাকার উপকণ্ঠেই ছিল 'ব্রাহ্মণচিরণ' নামে একটি গ্রাম। ছিল বললাম এ জন্য যে, এখন হয়তো সে গ্রামটি শহর সম্প্রসারণের সামুদ্রিক বাহু বিস্তারে লুপ্ত হয়ে গেছে। এই ব্রাহ্মনচিরণ গ্রামে মধ্যবিত্ত ঘরের এক মা ও মেয়ে একই সঙ্গে ধর্ষিতা হয়েছে পাকিস্তানের সৈন্যদের দ্বারা। তারপর তাদের উপর আর নতুন অত্যাচার হয় নি। মা ও মেয়ে দু'জন পাকিস্তানী সৈন্যের রক্ষিতা হয়েছেন, প্রতিরাতে নতুন নতুন সৈন্যদের হাতে ধর্ষিতা হওয়া থেকে বাঁচার আশায়। পরিবারের মধ্যবয়সী কর্তা এবং তার দু'টি কিশোর

ছেলেও রক্ষা পায় পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচার থেকে। মুক্তিযুদ্ধের শেষে এই পরিবারটিকে যখন দেখতে যাই, তখন মা অর্ধপাগল এবং মেয়েটি সন্তান সম্ভবা অবস্থায় আত্মহত্যা করেছে।

স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়ের সামাজিক বিপর্যয় এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ধাক্কায় বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জ থেকে ঘর ছাড়া, ঘরহারা যে বিশাল নারী সমাজ বেরিয়ে আসে এবং শহরে বন্দরেও এই বিপর্যয়ের ধাক্কায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত যে নারী সমাজের এত যুগের সযত্নপালিত বিশ্বাসে চিড় ধরে, জীবন-যাপন বদলে যায়; তারা এখনো কোনো নতুন সমাজ গড়তে পারে নি, কিন্তু পুরনো সমাজের ভিত্তিটাকেও আস্ত রাখে নি। নতুন সমাজ গড়ার দিক্‌নির্দেশনা পায় নি বলেই তাদের একটা নব্যশিক্ষিত শহুরে অংশের মধ্যে এত অস্থিরতা এবং চারদিকে এত নৈরাজ্যের প্রভাব।

মাত্র একমাস বাংলাদেশে (জানুয়ারী, ১৯৯৩) ছিলাম। সতেরো বছর বিদেশে বাস করে মনে একটা ভয় জন্মেছিল, দেশে গিয়ে হয়তো দেখবো, দেশটা মোল্লা আর মাস্তানদের খপ্পড়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। আমার এই আশংকা পুরোপুরি সত্য হয়নি। বাংলাদেশে মাস্তানদের এখন প্রচণ্ড দাপট একথা সত্য; কিন্তু মোল্লাবাদী জামাত ও শিবির সমাজের গভীরে শিকড় বিস্তার করতে পারে নি। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে জামাত শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং পার্লামেন্টেও বেশ ক'টি আসন দখল করেছে। কিন্তু তথ্যানুসন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালে দেখা যাবে, জামাতের এই প্রভাব ও শক্তি সম্পূর্ণ সাময়িক এবং অগভীর। জনসমর্থনের ভিত্তি শক্ত নয় বলেই জামাতকে রগকাটা, হাতকাটা সন্ত্রাসী রাজনীতির আশ্রয় নিতে হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না, এমন দলকে সরকারী ক্ষমতায় বসিয়ে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনীতি করতে হয়; এমন কি ঘাতক ও দালাল নির্মূল কমিটির নিরস্ত্র ও অহিংস জনসমুদ্রের মোকাবিলায় পুলিশ বাহিনীর পাহারায় মারদাঙ্গা করতে হয়। অর্থের জোরে, অস্ত্রের জোরে জামাত বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামেগঞ্জে মসজিদের ইমামের পদটি দখল করেছে, অধিকাংশ মাদ্রাসায় প্রভাব বিস্তার করেছে। তারপরও দেখা যায়, বাংলাদেশে জামাতের রাজনৈতিক প্রভাব সীমিত, সামাজিক প্রভাব প্রায় শূন্যের কোঠায়। ইউরোপে একসময় আধুনিক ও সেকুলার সমাজবাদী চেতনার বিকাশ ও অগ্রযাত্রাকে ঠেকানোর জন্য প্রচুর অর্থবৃষ্টি করে 'মুভমেন্ট ফর মরাল রিআরমামেন্ট' (নৈতিকতা পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন) নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। সে সময় মনে হয়েছিল, এই সংগঠন সারা ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু কিছুই হয় নি। সমাজ প্রগতির স্বাভাবিক ও নতুন ধারাকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইউরোপের ধনবাদী শাসকেরা তাদের যুব সমাজের একটা

বড় অংশকে নৈরাজ্য, অবক্ষয়, সন্ত্রাস, স্বেচ্ছাচার ও সহিংসতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন মাত্র।

বাংলাদেশে 'রুলিং এস্টাবলিশমেন্টের' প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় জামাত ও সমশ্রেণীর মোল্লাবাদীরা সাময়িক শক্তির মহড়া দেখাতে পারে, রাজনৈতিক দাপট বাড়াতে পারে, কিন্তু এদেশের সমাজ জীবনে তারা কোনোদিন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, তা আমার মনে হয় না। বাংলাদেশে ঘুরে এসে আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। যুদ্ধ, মন্বন্তর, বন্যা, সাইক্লোন, মুক্তিসংগ্রাম ইত্যাদি পৌনঃপুনিক বিপর্যয়ের ধাক্কায় যে লক্ষ লক্ষ নারী জীবিকার ধান্ধায় গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরে এসেছে; শুধু ঘোমটা নয়, সমাজ ও পরিবারের অনেক বাঁধন যাদের খসে গেছে; এবং শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের যে নারীরা গৃহবধু ও গৃহকন্যার পর্দা ঘেরা গণ্ডির বাইরে এসে জীবিকার যুদ্ধে অফিসে, আদালতে, দোকানপাটে পুরুষের সহযোগী ও প্রতিযোগী সাজতে বাধ্য হয়েছে, তারা আর কোনো প্রলোভনেই অতীতের বন্দীশালায় ঘোমটা ঢাকা দুঃসহ জীবন যাপনে, দাসীবৃত্তিতে ফিরে যাবে, একথা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়। ধর্মীয় অনুশাসনের নামে মোল্লাবাদীদের হাতে মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজের যে পচা ও দূষিত ব্যবস্থার আমন্ত্রণ রয়েছে, বাংলাদেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে অধিকাংশ নারীর বর্তমান নগর-চেতনা, আত্মচেতনার কাছে তা প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য। আমার ধারণা, মোল্লাবাদের প্রভাব বিস্তারের পথে সবচাইতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে এই নীরব নারী জাগরণ। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন যত বাড়ছে, নারীর আত্মরক্ষার তাগিদ এবং প্রতিবাদের শক্তিও তত বেড়ে চলেছে। হয়তো এই প্রতিবাদ এখনো তেমন সংঘবদ্ধ নয়; কিংবা স্বাধীন পেশাজীবী নারী সমাজের একটা অংশ হয়তো বিপথগামী ও বিভ্রান্ত; নিও কলোনিয়াল কালচারের প্রভাবে ঢাকা শহর কিছুকালের জন্য হংকং অথবা ব্যাংককও হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বস্তাপচা অতীতে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের নারী সমাজের একটা বড় অংশের অবস্থান একটি নীরব সামাজিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে আসছে বলে আমি আলোচনার গোড়াতেই বলেছি। কিন্তু এই বিপ্লবের একটা সরব দিকও রয়েছে। শহরের নতুন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা এখন নতুন নগর-চেতনা দ্বারা আরও বেশি উদ্দীপ্ত এবং পুরনো সমাজের প্রথা ও বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাদের সামনে রয়েছে এলিট ও নব্যধনী পরিবারের মেয়েরাও। যারা পশ্চিমের ফ্যামিনিস্ট মুভমেন্টের সত্তরের ও আশির দশকের ধারার অনুকরণে একটি পুরুষতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনও গড়ে তুলতে ইচ্ছুক।

এগারো

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পর্দামুক্ত, ঘোমটামুক্ত নারী সমাজের যে ব্যাপক আত্মপ্রকাশ, তা দেখে রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কয়েকটা পংক্তি আমার বারবার মনে পড়ে। "ঘরের মুখে আর কি রে/কোনদিন সে যাবে ফিরে? যাবে না, যাবে না, ঘরের দেয়াল তার গেল টুটে।" আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নতুন নারী সমাজেরও আর পুরনো বিশ্বাস, আচার ও প্রথার নিগড়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর এখানেই ঘটবে মোল্লাবাদীদের, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীদের এবং তাদের সহযোগী সাম্প্রদায়িক পুলিশী রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের চরম পরাজয়। মধ্যযুগীয় কূপমণ্ডুকতাকে কিছুটা আধুনিক সংস্কাবের আলখেল্লা পরিয়ে ধর্মীয় অনুশাসনের সেই পরিমার্জিত কাঠামোকে নতুন মৌলবাদী সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ার ভিত্তি করতে চাইলে তার সীমিত রাজনৈতিক আবেদন সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু কোনো স্থায়ী সামাজিক আবেদন সৃষ্টি করতে তা অপারগ। বাংলাদেশেও বর্তমানের বিভ্রান্তির ঘোর কাটলে এই সহজ সত্যটি সহসাই অনেকের চোখে ধরা পড়বে। বাংলাদেশে নীরব সমাজ বিপ্লবের সম্ভাবনার অগ্রদূত যে নারী সমাজ, তাদের শহুরে মধ্যবিত্ত অংশের উগ্র ও সাহসী কণ্ঠই সম্ভবত তসলিমা নাসরিন। সম্ভবত এখানেই তার লেখার বিপুল জনপ্রিয়তার রহস্য। সন্দেহ নেই, তিনি তাসের দেশে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। তাকে এবং তার লেখা নিয়ে সর্বত্রই এখন আলোচনা। আমি ঢাকার এক ঘরোয়া আসরে বলেছিলাম, তসলিমার লেখা সহজ, স্পষ্ট এবং তথ্যসমৃদ্ধ। তার সঙ্গে উগ্রতাটুকু না থাকলে সম্ভবত ভালো হ'ত। উগ্রতা অনেক সময় কাউন্টার প্রোডাকটিভ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রতিবাদ করলেন। তিনি বয়সে তরুণ। বললেন, আমাদের সমাজ এখনো পুরনো আচার বিশ্বাসের জগদ্দল পাথরে বন্দী। এই জগদ্দল পাথর সহজে ভাঙবে না। একে সমস্ত শক্তি, উগ্রতা নিয়ে আঘাত করতে হবে। তসলিমার লেখার উগ্রতা তাই আরো কিছু সময়ের জন্য আমাদের প্রয়োজন।

সম্ভবত তসলিমা নাসরিনের লেখার এই উগ্রতাই আমাদের তাসের দেশের কর্তাদের বিব্রত ও শংকিত করে তুলেছে। ফলে সহজ পন্থা হিসেবে তারা তার পাশপোর্টটি হরণ করে তার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছেন। এবং সবচাইতে বড় ভুলটি এখানেই তারা করেছেন। কোনো মুক্তবুদ্ধি, প্রত্যয়ী লেখককে কায়িক সাজা দিয়ে বা বন্দী করে তার লেখার প্রচার ও গতি রুদ্ধ করা যায় না। তসলিমা নাসরিনের বেলাতেও যে একথাটি সত্য হয়ে উঠছে, তার প্রমাণ পেয়েছি সুদূর শিকাগো শহরে গিয়েও। পরের কথাটা আগে বলছি।

ঢাকা থেকে ফিরে এসে মাস দেড়েক পরেই (এপ্রিল, ১৯৯৩) ছুটেছি শিকাগো শহরে। সেখানে 'প্রথম উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে' যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ। শিকাগোতে গিয়ে দেখা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক হারুন-উর-রশিদ এবং সাহিত্যিক, সমাজতাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে। বোরহান শুধু আমার কলেজ-জীবনের সহপাঠী নয়, বহুদিনের সুখদুঃখের সাথী। রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও আমাদের মধ্যে অমিলের চাইতে মিল বেশি। তারা এসেছেন ঢাকা থেকে। আমি লন্ডন থেকে। বোরহানই আমাকে ডঃ ক্লিনটন সীলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ডঃ সীলি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ'-এর প্রধান অধ্যাপক। বয়সে যুবক, এক মুখ ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। এই লম্বা সুদর্শন মানুষটিকে প্রথম দেখাতেই ভালো লাগলো। বিস্মিত হলাম, যখন তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আমি আসলে একজন চাষী। চাষাও বলতে পারেন।"

ঃ এমন চমৎকার বাংলা আপনি কোথায় শিখলেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

ঃ বাংলাদেশে। বাংলা শেখার জন্য বরিশালেও গিয়েছিলাম।

বরিশাল আমার নিজের জেলা। তাই একটু চমৎকৃত হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, বরিশালে খৃষ্টান মিশনারীদের কেন্দ্র পাদ্রী শিবপুরে বাংলা ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে গিয়েছিলেন?

ডঃ সীলি বললেন, হয়তো গিয়েছি। জায়গাটার নাম আমার মনে নেই। আমি আমেরিকান পীস কোরের সদস্য হয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম।

কথাটা শুনে শংকিত হলাম। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডীর আমলে প্রথম আ-মেরিকান পীস কো'র গঠন করা হয়। তখনকার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই পীস কোরের ভূমিকার খুব একটা সুনাম নেই। কোনো কোনো দেশ তখন তাদের গ্রহণ করে নি।

ডঃ ক্লিনটন সীলি আমাকে চুপ থাকতে দেখে হয়তো আমার মনের ভাব আঁচ করলেন। তাই মৃদু স্বরে বললেন, বিশ্বাস করুন, আমি দেশ দেখার জন্যই সেই তরুণ বয়সে পীস কোরে যোগ দিয়েছিলাম। আমার মতো অনেক আমেরিকান তরুণ যোগ দিয়েছেন। আমাদের কোনো খারাপ ভূমিকা ছিল না। আর এখনতো আমি অধ্যাপনা করছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কি বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা আছে?

ঃ নিশ্চয়ই আছে। আমিও বাংলা পড়াই। আমাদের বিভাগে এখন বাংলা শেখার তেরোজন ছাত্র আছে।

হেসে বললাম, আনলাকি থারটিন।

ডঃ সীলি বললেন, আমার জন্য এই তেরোজন লাকি। কারণ, ওরা না থাকলে আমার চাকরি থাকতো না।

আমাদের আলাপের এক ফাঁকে বোরহান বলে উঠল, তোমাদের পরিচয়ের শুরুতেই ক্লিনটন কেন নিজেকে চাষী বলেছেন, তা তুমি জানো না।

ঃ না জানি না।

ঃ ক্লিনটন একটা কৃষি খামারের মালিক। বেশ বড়সরো খামার।

বললাম, তাতে বিস্ময়ের কি রয়েছে! আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারতো ছিলেন বাদাম চাষী। তার বাদামের বস্তা এরোপ্লেনে চাপিয়ে বিদেশে রপ্তানী হয়।

আমাদের আলাপ চলছিল শিকাগোর ম্যাককরমিক হোটেল এন্ড কনভেনশন সেন্টারের লাউঞ্জে বসে। এই হোটেলেরই বিরাট এক হল ঘরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন চলছে। প্রথম দিনের সকালের অধিবেশনে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ছিল। বক্তৃতা পর্ব এবং দুপুরের ভোজ শেষ করে আমরা লাউঞ্জে বসে গল্প করছিলাম। বিকেল গড়িয়ে এল। সন্ধ্যার পর আবার অধিবেশন বসবে। সেই ফাঁকে হোটেলের বারে গিয়ে একটু বিয়ার পানের প্রস্তাব দিলেন ডঃ সীলি। ততক্ষণে তার সঙ্গে আমার সম্বোধন মিস্টার থেকে প্রথম নামে নেমে এসেছে। তিনি আমাকে ডাকছেন গাফ্ফার। আমি তাকে ডাকছি ক্লিনটন।

আমি, বোরহান ও ক্লিনটন বারে গিয়ে বসলাম। সেদিন শিকাগোতে চমৎকার দিন। বিকেলের রোদের সেই সোনাঝরানো আকাশের দিকে তাকিয়েই কিনা জানি না, বোরহান একবার প্রস্তাব দিল, চলো, মিসিগান লেকের পারটা ঘুরে আসি। ক্লিনটন আর আমি তখন গল্পে মশগুল। বেশি উৎসাহ দেখালাম না। আমার উৎসাহ না দেখানোর আরও একটা কারণ ছিল। শিকাগোর বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমাকে শিকাগোর যে বাড়িটাতে নিয়ে তুলেছিলেন, সেটা আমারই এক আত্মীয়ের বাড়ি। আত্মীয়ের নাম ডঃ মনজুরুল হক। শিকাগোর এক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন। বয়সে একেবারে তরুণ। বিয়ে করেছেন, আমার এক আত্মীয়ের মেয়েকে (ঢাকায় একটি পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত বাহাউদ্দিন চৌধুরীর ছোট বোন)। মনজুর আর তার বৌ রাংগা বাইশ তলার একটা বেশ বড়সরো ফ্লাটে থাকে। গোটা বাড়িটা সম্ভবত আরও কয়েকতলা উঁচু হবে। শিকাগোতে মিসিগান লেকের তীর ঘেঁষে এক অভিজাত পাড়ার শেরিডান রোডে এই ধরনের বেশ কয়েকটি বহুতল বাড়ি। ওরা বলে, কনডোমিনিয়াম। সংক্ষেপে কনডো। এই কনডোর বাইশতলার 'ই' ব্লকে আমাকে যে কক্ষটি দেওয়া হল, তার কাঁচের

জানালার ওপাশেই মিসিগান লেক। আমি প্রথমদিন এই কক্ষে পা দিয়েই স্তব্ধ বিস্ময়ে এর সৌন্দর্য উপভোগ করেছি। অস্ফুটকণ্ঠে বলেছি, 'এতো দেখছি সমুদ্র।' রাংগা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না চাচা, এটা লেক। পৃথিবীর কয়েকটা বিশাল লেকের একটি।'

মনজুরের সঙ্গে আগে আমার পরিচয় ছিল না। সতেরো আঠারো বছর আগে ঢাকায় থাকতে যখন রাংগাকে দেখেছি, তখন সে কিশোরী। দীর্ঘকালের অদর্শনে তার কথাও মনে ছিল না। শিকাগোতে এসে ওদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হল। মনজুরদের ডাইনিং এবং ড্রয়িং রুমে বসলেও চোখে পড়ে মিসিগান লেকের দূরবিস্তৃত জলরাশি। সুতরাং বোরহানদের সঙ্গে সেদিন আবার হোটেল থেকে বেরিয়ে মিসিগান লেন দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে আর হল না। বোরহান আমার মনের ভাব বুঝে আর চাপাচাপিও করেনি। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, তোমাকে একটা সুখবর দেই গাফ্ফার। ক্লিনটন এবার কলকাতার 'পুরস্কার' পেয়েছেন।

ক্লিনটনের কর মর্দন করে বললাম, কনগ্রাচুলেশনস্।

ক্লিনটন হেসে বললেন, ধন্যবাদ।

বোরহান বলল, ক্লিনটন জীবনানন্দ দাশের কবিতার উপর গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছেন। তার এই গবেষণা গ্রন্থের জন্যই আনন্দ পুরস্কার।

ক্লিনটনকে আরেকবার অভিনন্দন জানালাম। তিনি একটু লজ্জা পেয়েই সম্ভবত কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। পরে বললেন, আমি শুনেছি, এর আগের বছর কলকাতার এই সাহিত্য পুরস্কারটি আপনাদের বাংলাদেশের এক লেখক পেয়েছেন।

বললাম, ঠিকই শুনেছেন, তার নাম তসলিমা নাসরিন। যে বইয়ের জন্য পেয়েছেন তার নাম 'নির্বাচিত কলাম'। বইটি খুবই বিতর্কিত। তসলিমা উগ্র নারীবাদী লেখক হিসেবে পরিচিত। তার বইয়ের খুব কাটতি এবং তার শত্রু মিত্রের সংখ্যাও অগুণতি।

ক্লিনটন বললেন, কি আশ্চর্য, আমি তার কোনো বই পড়ি নি।

বললাম, হয়তো তার কোনো বই এখনো শিকাগোতে আসে নি।

ক্লিনটন বললেন, তা হতে পারে না। শিকাগো ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীতে আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যে, কলকাতা ও ঢাকার নামকরা লেখকদের বই বেরুনো মাত্র, তা কিনে লাইব্রেরীতে রাখতে হবে।

হেসে বললাম, শিকাগো লাইব্রেরীতে যদি তসলিমার কোনো বই না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি নামকরা লেখক নন।

ক্লিনটন বললেন, আমি তা বলছি না। এমন হতে পারে ভুলে তার বই কেনা

হয়নি। আপনি আমাকে তার নামটা লিখে দিন, আমি আগামীকালই লাইব্রেরীতে তার বই খোঁজ করবো।

আমি ক্লিনটনকে একটা কাগজে তসলিমার নাম লিখে দিলাম।

পরদিন ম্যাককরমিক হোটেলের সম্মেলন কক্ষে আবার ক্লিনটন ও বোরহানের সঙ্গে দেখা। দুপুরে আমাদের বক্তৃতার পালা শেষ হল। রাত্রে সলিল চৌধুরী, তার স্ত্রী সবিতা চৌধুরী এবং মেয়ে অন্তরা চৌধুরীর গান। গান শুরু হওয়ার আগে ক্লিনটন বললেন, গাফ্ফার, আমি শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে আসার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। আগামী তেরো তারিখ মঙ্গলবারে। বোরহান আসবেন। তাছাড়া অধ্যাপক হারুন এবং ডঃ মনিরুজ্জামানকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তারা রাজি হয়েছেন। আমাদের ডিপার্টমেন্টটা দেখবেন, তাছাড়া দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবেনও।

সানন্দে রাজি হলাম। এবং নির্ধারিত মঙ্গলবারে দুপুরে গিয়ে হাজির হলাম শিকাগো ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে। মনজুরই তার গাড়িতে হারুন, মনিরুজ্জামান এবং আমাকে পৌছে দিয়েছিল ক্লিনটনের কাছে। ক্লিনটন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হাসি মুখে আমাদের তিনজনকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর সকলকে বিস্মিত করে আমার নাকের কাছে একটা চটি বই তুলে ধরে বললেন, গাফ্ফার পেয়েছি।

ঃ কি পেয়েছেন?

ঃ তসলিমা নাসরিনের বই। আমি বলিনি, বাংলার নামকরা লেখকদের বই আমাদের লাইব্রেরীতে থাকতেই হবে।

বইটা হাতে তুলে নিলাম। 'নির্বাচিত কলাম' নয়, তসলিমার একটি চটি কবিতার বই। ক্লিনটন বললেন, 'নির্বাচিত কলাম' বইটি অবিলম্বে আনার জন্য আমি লাইব্রেরীর কর্তাকে বলে দিয়েছি।

আমরা ভার্সিটি ক্যান্টিনে গেলাম। বোরহান আগেই এসেছে এবং সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানে সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের আরও দু'জন অধ্যাপক। একজন উর্দু ভাষার। কিছুক্ষণ বাংলা ও উর্দু ভাষা এবং সাহিত্য নিয়ে আ-লোচনা। খাবার পরিবেশনের কিছুপরেই তসলিমার প্রসঙ্গটি আবার কি করে উঠল মনে পড়ছে না।

ক্লিনটন বললেন, আমি শুনেছি, তসলিমা নাসরিনের পাশপোর্ট আটক করা হয়েছে।

বললাম, ঠিকই শুনেছেন। এতদিনে সেটা ফেরৎ দেওয়া হয়েছে কিনা আমি জানি না। কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেখাচ্ছেন, তসলিমা সরকারী কর্মচারী। সুতরাং সরকারের

অনুমতি না নিয়ে তিনি বিদেশে যেতে পারেন না। তসলিমা কলকাতার কবি মেলায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। তখন তার পাশপোর্ট আটক করা হয়। তাকে কলকাতায় যেতে দেওয়া হয়নি।

উর্দুর অধ্যাপক বললেন, এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

বললাম, কোনো সরকারী কর্মচারী যদি সরকারী বিধি অমান্য করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়ম নীতি সরকারী কেতাবেই রয়েছে। সেই ব্যবস্থা গ্রহণের বদলে কোনো নাগরিকের পাশপোর্ট আটক করা তার নাগরিক অধিকার হরণ করার সামিল। একটা কলোনিয়াল সরকার তার শাসিত জনসাধারণের সাথে এ ধরণের ব্যবহার করতে পারেন। একটি নির্বাচিত, গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে এ ধরণের আচরণ আশা করা যায় না।

ক্লিনটন বললেন, তাহলে আপনার ধারণা, তসলিমা সরকারী কর্মচারী হয়েও কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলেন বলে তার পাশপোর্ট আটক করা হয়েছে, এটা অজুহাত। আসলে তার মতবাদের জন্য তাকে হয়রান করাই কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য?

বললাম, আমার তাই ধারণা। সন্দেহ নেই, তসলিমা নাসরিনের লেখা বাংলাদেশের সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক সকল এস্টাবলিশমেন্টকে ভীত, শংকিত এবং ক্রুদ্ধ করে তুলেছে।

ওই মঙ্গলবারের রাতেই শিকাগোর এক ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে আমাদের আমন্ত্রণ। রেস্টুরেন্টে হাজির হয়ে দেখি, শিকাগোর এশিয়ান টেলিভিশনের একদল কলাকুশলীও ক্যামরাসহ উপস্থিত। তারা সলিল চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নেবেন। আমাদের পরিচয় জানার পর আমরাও ক্যামেরাবন্দী হলাম। সাক্ষাৎকারও দিতে হল। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক হারুন-উর-রশীদতো তার সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় আবেগাতিশয্যে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানের দু'চরণ গেয়ে উঠলেন। (হারুন গান গাইতে জানেন আমার জানা ছিল না।) তার সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন নীনা হামিদও। নীনাও শিকাগো সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা থেকে এসেছেন।

রাত বারোটার দিকে যার যার বাড়ি ফেরার পালা। রেস্টুরেন্টের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছি, এক তরুণী সসংকোচে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভাবলাম, কোনো অটোগ্রাফ-শিকারী। সম্মেলনের দু'দিন বহুজনকেই নিজের সই উপহার দিতে হয়েছে। তরুণীও হয়তো তাই চাইবেন। প্রথমেই পরিচয় দিলেন, তিনি নিউ মেক্সিকো স্টেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। বাংলাদেশ থেকে বছরখানেক হয় এসেছেন। আমার কাছে তিনি একটি কথা জানতে চান।

বললাম, সংকোচ করবেন না, বলুন কি জানতে চান।

তরুণী অটোগ্রাফ চাইলেন না। বললেন, শিকাগোর সাহিত্য সম্মেলনে এবার বাংলা বই বিক্রির স্টল খোলা হয়েছিল। তাতে বাংলা একাডেমি থেকে বহু বই দেওয়া হয়েছে দেখলাম। তার ভেতর তসলিমা নাসরিনের বই নেই। তার বই কেনার খুব ইচ্ছা ছিল আমার।

বললাম, বাংলা একাডেমির বইগুলো একাডেমির মহাপরিচালক নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। একাডেমিতো তসলিমার বইয়ের প্রকাশক নয়, সেজন্য তার বই আসে নি। আপনি ইচ্ছে করলে ঢাকায় বা লন্ডনের বাংলা বইয়ের দোকানে চিঠি লিখে তার বই আনাতে পারেন। সম্ভবত নিউইয়র্কে খোঁজ করলেও পাবেন।

তরুণী বললেন, আমাকে লণ্ডনের একটা বাংলা বইয়ের দোকানের ঠিকানা দয়া করে লিখে দেবেন?

আমি সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো কাগজে লন্ডনের ব্রিকলেনের "সঙ্গীতা" র ঠিকানা লিখে তরুণীকে দিলাম।

তরুণী একপ্রস্থ কৃতজ্ঞতা জনিয়ে বিদায় নিলেন। তার গমন পথের দিকে চেয়ে থেকে মনে মনে ভাবলাম, বাংলাদেশের এই বয়সের শিক্ষিত মেয়েরা, দেশে-বিদেশে যে যেখানেই থাকুন, তাদের অধিকাংশের কাছে তসলিমা নাসরিনের কণ্ঠ পৌছে গেছে। আর এই বিশ্বব্যাপী কমুনিকেশনের বিপ্লবের যুগে রক্তচক্ষু একদল শাসক কিনা ভাবছেন, লেখকের পায়ে বেড়ি পরিয়ে তার কণ্ঠরোধ করা যাবে। আঠারো ও উনিশ শতকের কলোনিয়াল শাসকদের মনোভাব ও আইন দ্বারা যে এ যুগের রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করা যায় না, এই শিক্ষাটি তারা অর্জন করতে পারেন নি। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বের বহু দেশেই তাই জনগণ ভোটাধিকার অর্জন করেছে, তাদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় বসছে, কিন্তু গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। কুয়োর ব্যাঙের মতো এই নির্বাচিত সরকারগুলোও বার বার কলোনিয়াল ব্যবস্থার পচা অতীতের কুয়োয় ফিরে যাচ্ছে।

শিকাগো থেকে এবার ঢাকায় ফিরে যাই। আমার ধারণা, স্বাধীনতাযুদ্ধের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় এবং বহু শতকের প্রাচীন সমাজ কাঠামো, আচার ব্যবস্থার ধসের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নারী সমাজ সহসা যে অবরোধ ভাঙা অবস্থানে এসে পৌঁছেছে; বাইরের জগতের যে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও আলো বাতাস এসে তাকে স্পর্শ করছে, তাতে তসলিমা নাসরিনের মতো একজন লেখকের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ঢাকায় যে একমাস ছিলাম, তখনো দেখেছি, বিভিন্ন ঘরোয়া পার্টি এবং বৈঠকেও তসলিমার লেখা নিয়ে অনেকেই উদ্দাম তর্ক জুড়েছেন। তারপর সম্বিত ফিরে পেতেই কেউ কেউ গলা নামিয়ে বলেছেন, "না,

না, তসলিমার লেখা এমন আহামরি কিছু নয়, যে তা নিয়ে এত আলোচনা করতে হবে। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।" আমার মনে হয়েছে, বিষয়টি তসলিমা কিম্বা তসলিমার লেখা নয়; বিষয়টি বাংলাদেশের নারী সমাজের বর্তমান অবস্থান। সেই অবস্থানে তাদের নীরব বিদ্রোহে তসলিমা ভাষা জুগিয়েছেন, ভাঙার গান গেয়েছেন। এখানেই তার একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা। তিনি এই ভূমিকাটি শুধু সাহস নয়, দুঃসাহসের সঙ্গে পালন করে গেছেন। এই দুঃসাহসই তাকে রাষ্ট্র ও সমাজের রক্তচক্ষু শাসকদের সামনে বার বার এনে দাঁড় করাচ্ছে। তার লেখার সাহিত্য মূল্য কতটা, তা বিচার করার পাণ্ডিত্য ও ইচ্ছা কোনোটাই আমার নেই। তসলিমা 'কালের পুতুল' নন, তিনি 'কালের ফসল।' সমকালের বাংলাদেশের সমাজ ও সাহিত্য-এমন কি রাজনীতি নিয়ে আলোচনাতেও তসলিমার লেখার যুগসন্ধির ভূমিকা, দ্রোহী স্বকালপ্রবণতা এবং তর্ক সৃষ্টির প্রোভোকেটিভ যুক্তির কথা তাই বার বার ঘুরে ফিরে আসে। আমার লেখাতেও আসছে। এটা এড়াবার উপায় নেই।

গত যুগের বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত এবং এ যুগের তসলিমা নাসরিনের ভূমিকার মধ্যে একটা আপাত সাদৃশ্য রয়েছে; যেটা অনেকেই উল্লেখ করেন। এবং বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। সে যুগে বেগম রোকেয়া নিঃসন্দেহে একটি বড় বিপ্লব; কিন্তু তিনি নিজে বিদ্রোহী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংস্কারক। তার সবচাইতে বড় পরিচয়, তিনি যথার্থ অর্থেই নারী শিক্ষার অগ্রদূত ও সমাজ সংস্কারক। তিনি বাঙালী নারীর শরীরকে পর্দা প্রথার অবরোধ ও বন্দীশালা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, তার মনকে আধুনিক শিক্ষার আলোয় উন্নত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি তাদের সমাজ, ধর্ম, নীতিকথা এবং গোটা পুরুষ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরামর্শ দেন নি। নারী জীবনের চারদিকের সকল অদৃশ্য অবরোধ ভাঙ্গারও ডাক দেননি। বরং ব্যক্তিগত জীবনেও বেগম রোকেয়া সামাজিক প্রথাগুলো মেনে চলেছেন। তিনি অকালে বিধবা হওয়ার পরেও দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ করেন নি। ধর্মীয় অনুশাসনের অপব্যাখ্যার তিনি প্রতিবাদ করেছেন; কিন্তু মৌলনীতির বিরোধিতা করেন নি। এ যুগে তসলিমার ভূমিকা সর্বাত্মক বিদ্রোহের। সংস্কারের নয়, এই ভূমিকা ভাঙার। পুরুষ শাসিত সমাজের সকল ব্যবস্থা, তা সামাজিক হোক কিংবা ধর্মের ঐশীবিধান হোক, যা পুরুষের অত্যাচারী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সহায়ক, তার সবকিছু ধ্বংস করার উগ্র দাবদাহ রয়েছে তার লেখায়। এখানেই সমাজপতিদের ভীষণ ভীতি ও শঙ্কা।

বারো

এস ওয়াজেদ আলী (বিএ কান্টাব, বার এ্যাট ল') এই নামটির সঙ্গে পরিচিত নন, আমার বয়সী এমন পাঠক বাংলাদেশে সম্ভবত খুব কমই আছেন। অবিভক্ত বাংলায় এমন অসাম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধির লেখকের সংখ্যা হাতে গোনা যেতো। তাঁর সমসাময়িক আরেকজন লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (বাঁশদহ, খুলনা) ছিলেন যুক্তিবাদী, জাতীয়তাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক মনের লোক। ফলে পরবর্তীকালে এই দু'টি নামকে অনেক পাঠক গুলিয়ে ফেলে অভিন্ন ব্যক্তি বলে ভাবতেন। কারণ, দু'জনেই ছিলেন জিন্নার টু নেশন থিয়োরির ঘোর বিরোধী। এস ওয়াজেদ আলীর লেখায় ছিল বুদ্ধি, বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যের ছাপ এবং মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর লেখায় ছিল যুক্তি, মননশীলতা ও সংবেদনশীলতার ছোঁয়া। এঁরা দু'জনেই এখন প্রয়াত এবং দুই বাংলাতেই বিস্মৃতপ্রায় (বিস্মৃত বলা হলেই সম্ভবত সত্য কথা বলা হয়)। অথচ এঁদের সমকক্ষ শক্তিশালী প্রাবন্ধিক এখনো দুই বাংলাতেই আঙুলে গোনা যাবে। কোনো সভা সমিতি, সাহিত্য আলোচনাতেও এঁদের নাম উচ্চারিত হতে শুনি না। সকলেই বর্তমানের জয়ধ্বনি উচ্চারণে ব্যস্ত। এমন যে কলকাতার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি দুই বাংলাকে নিয়ে 'পূর্ব পশ্চিম' নামে ঢাউস একটি উপন্যাস লি-খেছেন এবং যাতে আমা-হেন ব্যক্তিরও চরিত্র রয়েছে, তাতেও পূর্ব পশ্চিম এই দুই দিগন্তেরই এককালের মার্তণ্ড এস ওয়াজেদ আলী কিম্বা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর নামোল্লেখও নেই।

এবার ঢাকায় গিয়ে এস ওয়াজেদ আলীকে কেন মনে পড়ল, তা বলি। অবিভক্ত বাংলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য যে বাংলা পাঠ্যবই ছিল, তাতে বহু বছর দু'টি লেখা মৌরসীপাট্টা জুড়ে বসেছিল। একটি জসীমউদ্দিনের কবিতা "কবর" এবং অন্যটি এস ওয়াজেদ আলীর গল্প "ভারতবর্ষ"। লেখক চল্লিশ বছর আগে তার গ্রামে দেখে এসেছিলেন মাথায় টাক, নাকের উপর ঝুলে পরা চশমা, মহাভারত পাঠরত গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক কাম মুদি দোকানের মালিককে। তার মুদি দোকানেই পাঠশালাটি বসতো। চল্লিশ বছর পর গ্রামে ফিরে লেখক দেখলেন সেই একই দৃশ্য। মাথা ভর্তি টাক, কাচে দড়ি বাঁধা চশমা নাকের ডগায় ঝুলে পড়েছে, প্রৌঢ় দোকানদার দোকানে বসে মহাভারত পড়ছেন। একই সঙ্গে তিনি খরিদ্দার সামলাচ্ছেন এবং ছাত্রদের নামতা বলে দিচ্ছেন। চল্লিশ বছর পরেও গ্রামে একই অপরিবর্তনীয় দৃশ্য দেখে লেখক বিস্মিত হলেন এবং প্রশ্ন করতেই প্রৌঢ় দোকানদার কাম পাঠশালার শিক্ষক বললেন, 'চল্লিশ বছর আগে

আপনি আমাকে নয়, আমার বাবাকে দেখেছিলেন।'

পাঠক, আমিও এই গল্পটি পাঠের তেতাল্লিশ বছর পর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে তার সারমর্মটি লিখলাম। সুতরাং কোথাও ভুলচুক হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। এই গল্পটির সারকথা ছিল, ভারতবর্ষের অপরিবর্তনীয় সমাজচিত্র। দীর্ঘ সতেরো বছর পর লন্ডন থেকে ঢাকায় ফেরার সময়েও আমার মনের গহনে সম্ভবত এমন একটি গোপন বাসনা ছিল যে, এমন একটি মানুষ অথবা এমন একটি ছবি আমি ঢাকায় গিয়ে খুঁজে পাব, যা গত দেড়যুগেও বদলায় নি; এস ওয়াজেদ আলীর গল্পের ওই চরিত্র ও দোকান কাম পাঠশালার মতো অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে। জানুয়ারী মাসের অপরাহ্নে ঢাকার নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে মনে হল, আমার সেই প্রত্যাশা ও গোপন বাসনা বুঝি ব্যর্থ হতে চলেছে। এই বিমান বন্দরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বিমানের ক্যাপ্টেন যদি বলতেন, আপনাকে ঢাকায় নয়, ডাকারের বিমান বন্দরে নামিয়ে দিয়েছি, তাহলেও প্রথমে তা বুঝবার উপায় আমার থাকতো না। এটা সতেরো বছর আগে ফেলে যাওয়া ঢাকা বিমানবন্দর নয়। চারদিকেও পুরনো কোনো চিহ্ন নেই। কেবল নতুনের সমারোহ। মনে মনে ভাবলাম, এস ওয়াজেদ আলী যদি আজ বেঁচেও থাকতেন, তাহলে এই ঢাকা শহর নিয়ে কোনো গল্প লিখতে পারতেন না।

আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা বিমান বন্দরে এসেছিলেন। তাদেরও অনেকেই বদলে গেছেন। যে শ্যালিকাকে রেখে গিয়েছিলাম অবিবাহিত, সে এখন শুধু গিন্নিবান্নি নয়, দুই সন্তানের জননী। আমার হাঁটুর বয়সী রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফার জহিরুল হক, তাকে দেখে আমার ভির্মি খাওয়ার যোগাড় এককালের শার্ট প্যান্ট পরা যুবক এখন আলহজ্ব জহিরুল হক। মাথায় গোলটুপি। মুখে কাঁচাপাকা লম্বা দাড়ি। পরনে বিরাট আলখেল্লা। এককালে ক্যামেরা- শিল্পী হিসেবে যার জুড়ি ছিল না, সেই কামরুল হুদা কাছে এসে বলল, "গাফ্ফার ভাই, যে চোখ দিয়ে ছবি তুলি, সেই চোখের অসুখেই বহু বছর ধরে ভুগছি।" সতেরো বছর আগে যখন ঢাকার পুরনো বিমানবন্দর থেকে লন্ডনে রওয়ানা হই, তখন বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছিল বাংলাদেশ বিমানের গণসংযোগ বিভাগের তরুণ অফিসার মান্নান। বলেছিল, "গাফ্ফার ভাই, ভালোয় ভালোয় তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।" আমাদের তত্ত্বতালাশ করেছিলেন ওই গণসংযোগ বিভাগেরই প্রধান মতিউর রহমান। সবসময় হাসি মুখ। এক সময় ছিল অবজারভারের (ঢাকা) রিপোর্টার। আমার চাইতে বয়সে দশ বারো বছরের ছোট। চুয়াত্তর সালে যতবার লণ্ডন থেকে ঢাকায় গিয়েছি, প্লেন থেকে নেমেই দেখেছি মতিউর রহমান একমুখ হাসি নিয়ে উপস্থিত। আমার জ্যাকেটের কোণা চেপে ধরে বলতো, "আমার সঙ্গে এক কাপ কফি না খেয়ে

আপনি বাড়িমুখো হতে পারবেন না।" বলতাম, মতি, কেবল চুটিয়ে প্রেম করে বেড়াচ্ছো বলে শুনছি। এবার বিয়েটা সেরে ফেল। মতি বলতো, "এখন যে মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করছি, তাকে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, বাঙালী মেয়েরা কত সুন্দর হতে পারে। কফি খেতে খেতে সেই মেয়ের কথাই আপনাকে বলবো।" ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসের এক অপরাহ্নে ঢাকার নতুন বিমানবন্দরের মাটিতে পা রেখে প্রথমেই মনে পড়ল, মতিউর আর মান্নান আজ আমাকে স্বাগত জানাতে আসবে না। মতি এককাপ কফি খাওয়ার জন্য চেপে ধরবে না । নতুন নতুন মেয়ে বন্ধুর গল্প শোনাবে না। বহু বছর হয় তারাও প্রয়াত। দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে দু'জনেরই জীবনের বাতি নিভে গেছে।

তবু এস ওয়াজেদ আলী সত্য হলেন। ঢাকার মাটিতে পা দিয়ে এমন ক'জন মানুষের দেখা পেয়েছি, যারা সত্যি সত্যি আবহমান ঢাকা এবং তার চিরচেনা সমাজচিত্রের প্রতিচ্ছবি। সতেরো বছর আগে তাদের যেমন দেখেছিলাম, তারা তেমনি আছেন। ভাবভঙ্গি, চালচলন, কথাবার্তা কিছুই তাদের বদলায়নি। এমনকি বয়সও বাড়েনি। তাদের একজনের কথাই আগে বলি। তিনি নূরুল ইসলাম। ঢাকা বিমান বন্দরে নেমে দেখি, অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তিনিও আমার জন্য অপেক্ষমান। বিস্মিত হলাম। সকলেই অল্পবিস্তর বদলেছেন। কেই কেউ এমন বদলে গেছেন যে, চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু নূরুল ইসলাম বদলাননি। দু'দশক আগে দেখা মানুষটি সেই একই চেহারায় বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেই লম্বা পাঞ্জাবি, পায়জামা, গায়ে মুজিব কোট। মুখে হাসি। মাথায় চুলের স্বল্পতা কিছুটা প্রকট। কিন্তু চেহারায় বয়স বাড়ার ছাপ নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল এস ওয়াজেদ আলীর সেই গল্পের কথা।

নূরুল ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় থাকবেন?

ঃ পশ্চিম ধানমণ্ডিতে। সেখানে প্রথমে সপ্তাহখানেক থাকবো।

নূরুল ইসলাম উল্লাস প্রকাশ করলেন, বললেন, ওহ্ আমি পেছনেই রায়ের বাজারে থাকি। তাহলে রোজ আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

আমি গাড়িতে চাপলাম। নূরুল ইসলাম বললেন, এখই বিদায় নিচ্ছি না। আমি সেলিনাদের (লেখিকা সেলিনা আখতার জাহান) গাড়িতে আপনার বাসায় আসছি।

বাসায় পৌছে একটু নিরিবিলি হতেই নূরুল ইসলাম কাছে এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, নূরুল ইসলাম ভাই, আজকাল কি করছেন?

ঃ সেই পুরনো চাকরি, সাধারণ জীবন বীমাতেই আছি।

বললাম, আপনি অতি দুর্দিনেও আওয়ামী লীগকে ছেড়ে যাননি।

নূরুল ইসলাম বললেন, ছাড়বো কেন? আওয়ামী লীগতো আমার রক্তে-মাংসে জড়িত। আগে মুজিব ভাইয়ের পেছনে ছিলাম। এখন তার মেয়ে শেখ হাসিনার

পেছনে আছি।

বলেই আবার সেই স্মিত হাসি। কথাটা কি তিনি আনন্দের সঙ্গে বললেন, না তাতে কোন ক্ষোভ ও হতাশা জড়িত, তা সেই হাসি দেখে বোঝার উপায় নেই।

নূরুল ইসলাম আমার চাইতে বয়সে হয়তো কিছুটা ছোট হবেন। কিন্তু মনের দিক থেকে অনেক বড়। তার ত্যাগ ও একনিষ্ঠতার কোন তুলনা নেই। রাজনীতি করে যে যুগে অনেক তিলও তাল হয়েছে, রাতারাতি গাড়ি-বাড়ি, ব্যবসায়ের মালিক হয়েছে, সেই যুগে নূরুল ইসলাম রায়ের বাজারের বহুকাল আগের একটা বাড়িতে পড়ে আছেন এবং আঁকড়ে ধরে আছেন জীবন বীমা অফিসের একটি সামান্য চাকরি। অথচ দীর্ঘকাল এই নূরুল ইসলাম ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অত্যন্ত কাছের লোক। বলতে গেলে ছায়া সহচর। কর্মী থেকে তিনি আর দলের নেতা হয়ে উঠলেন না। তাই বলে তার মনে দুঃখ বা অনুযোগ নেই।

দীর্ঘ দুই যুগের মতো বিদেশে বসবাসের ফলে ঢাকার অনেকের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু নূরুল ইসলামের সঙ্গে হয়নি। তিনি কোথা থেকে, কেমন করে আমার লন্ডনের ঠিকানা যোগাড় করেছেন এবং প্রায়ই চিঠিপত্র লিখেছেন। মুজিব হত্যার পরপরই সেই দুঃসহ দুর্দিনেও তিনি লোক মারফত আমাকে চিঠি পাঠিয়েছেন, মনের ক্ষোভ, হতাশা প্রকাশ করেছেন। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে একফোঁটা আলোর দিশা পাওয়া যায় কিনা, তার সন্ধান করেছেন।

আমি কুঁড়ের রাজা। স্রেফ আলস্যবশত তার একটা চিঠিরও জবাব দেয়া হয়নি। কোন চিঠি পাবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেলে ভেবেছি, নূরুল ইসলাম চিঠির জবাব না পেয়ে এবার নিশ্চয়ই রাগ করেছেন। আর চিঠি লিখবেন না। কিন্তু মাস না ঘুরতেই দেখেছি, ঢাকার বিভিন্ন কাগজের বিভিন্ন খবর ও মন্তব্যের এক বস্তা কাটিং আমার নামে ডাকে এসেছে। পাঠিয়েছেন নূরুল ইসলাম। সঙ্গে চিঠি। লিখেছেন, "গাফ্ফার ভাই, দেশের অবস্থা কি, এই কাটিংগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন। চারদিকে বড় বেশি অন্ধকার। আপনি লিখুন। কিছু লিখুন। আমাদের মনে কিছু আশার বাতি জ্বালান।"

আমার লেখায় তার মনে আশার বাতি জ্বলেছে কিনা জানি না, কিন্তু নূরুল ইসলাম চিঠির জবাব না পেয়েও আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখেছেন। যখনই পেরেছেন ঢাকার কাগজ, কাগজের কাটিং পাঠিয়েছেন। খবরের পেছনে যে নেপথ্য খবর থাকে, তাও জানিয়েছেন। নূরুল ইসলামের সঙ্গে যদি আমার যোগাযোগ না থাকতো, তাহলে হয়তো একটা সময় দেশের সঙ্গে এমনই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম যে, দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা জানা এবং তা নিয়ে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

নূরুল ইসলামের মনের ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব এখানেই যে, তিনি কখনো আমার নীরবতাকে তার প্রতি উপেক্ষা বলে মনে করেননি। একবার মাস ছয়েক ধরে তার চিঠিপত্র না পেয়ে ভাবলাম, এতদিনে হয়তো নূরুল ইসলাম সত্যি সত্যি রাগ করেছেন, ভাবছেন, আমাকে আর চিঠিপত্র লিখে লাভ নেই। ঠিক এই সময় বাসায় এক হাঁড়ি নলেনগুড়ের সন্দেশ এসে হাজির। সঙ্গে চিঠি। ঢাকা থেকে প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা দেওয়ান ফরিদ গাজী লন্ডনে এসেছেন। তিনিই ওই সন্দেশগুলো পাঠিয়েছেন। চিঠি থেকে টেলিফোন নম্বর নিয়ে দেওয়ান ফরিদ গাজীকে তার লন্ডনের বাসায় যোগাযোগ করলাম, গাজী ভাই, ঢাকা থেকে এত মিষ্টি টেনে নিয়ে আসার কি কোন দরকার ছিল?

ফরিদ গাজীর হাসির শব্দ ভেসে এলো টেলিফোনে ঃ না ভাই, ওই সন্দেশ আমি আনিনি। আমাকে বাহক বলতে পারেন। ঢাকা থেকে নূরুল ইসলাম পাঠিয়েছেন এই মিষ্টি। আমার উপর শুধু আপনাকে পৌঁছে দেয়ার ভার। এই মিষ্টি ছাড়াও আপনাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার কাছে আরেকটি বস্তা রয়েছে। সেটিও দু'একদিনের মধ্যে পাঠাবো।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তাতে কি আছে গাজী ভাই?

ঃ ঢাকার এক গাদা ম্যাগাজিন, পত্রিকা এবং বই।

এই বই এবং পত্রিকার বস্তা যখন পেলাম, তখন তার মধ্যে একটি চিঠিও পেলাম। নূরুল ইসলাম লিখেছেন, "দেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কিভাবে এবং কি হারে বিকৃত করা হচ্ছে, সঙ্গের বইপত্রগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। আপনি কি একবার দেশে আসতে পারেন না? আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জানানোর দায়িত্ব আপনাদের উপর। দেশের লেখকদের উপর। আপনারা যদি সে দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে দেশ ও জাতি আপনাদের ক্ষমা করবে না। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ যারা সঠিকভাবে জানেন এবং তা নিয়ে লিখতে পারেন, তাদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। আপনার বয়সও কমছে না। বাড়ছে। একবার দেশে আসুন গাফ্ফার ভাই।"

লন্ডনে বসে নূরুল ইসলামের চিঠিটা পড়তে পড়তে ভেবেছি, জীবনে অনেক অসামান্য লোককে নিয়ে পাতার পর পাতা লিখেছি। যদি কখনো সুযোগ হয়, তাহলে নূরুল ইসলামের মতো একজন সামান্য মানুষের অসামান্য কাহিনী নিয়ে লিখতে আর দ্বিধা সংকোচ করবো না।

নূরুল ইসলামের সঙ্গে আমার পরিচয় ও সখ্য প্রায় ত্রিশ বছর ধরে। সেই ছ'দফা আন্দোলনের কিছু আগে আওয়ামী লীগের তখনকার সদর দফতর ১৫ পুরানা পল্টনে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। মোহাম্মদ উল্লা সাহেব (সাবেক রাষ্ট্রপতি)

তখন আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক। বঙ্গবন্ধু তখন প্রায়ই আসতেন অফিসে। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অফিসে বসতেন তাজউদ্দিন আহমদ। নূরুল ইসলাম তখন বঙ্গবন্ধুর একেবারে ছায়া সহচর। গায়ে খদ্দরের লম্বা পাঞ্জাবি, তার উপরে কালো রঙের মুজিব কোট, সবসময় বঙ্গবন্ধুর হুকুম পালনে এক পায়ে খাড়া। ঐতিহাসিক ছ'দফা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা যখন জেলে, অসংখ্য কর্মী পুলিশের নির্যাতনের ভয়ে আত্মগোপন করেছে, তখন যে ক'জন মুষ্টিমেয় কর্মী আওয়ামী লীগ অফিসে বাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন, তাদের মধ্যে নূরুল ইসলাম একজন। আমার একদিনের কথা মনে আছে। বঙ্গবন্ধুকে তখন "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়" জড়িয়ে ঢাকা জেল থেকে কুর্মিটোলায় সেনানিবাসের বিশেষ বন্দীশালায় নেয়া হয়েছে। চারদিকে গুজব, শেখ মুজিবকে ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও দেশদ্রোহিতার দায়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হবে। চলছে নিরাপত্তা আইনে নির্বিচার গ্রেফতার, নিপীড়ন এবং সন্ত্রাস। ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না। আমি তখন পুরনো ঢাকার নারিন্দা লেনের একটা বাসায় থাকি। বিকেলে বাসায় এসে হাজির নূরুল ইসলাম। সঙ্গে আমেনা বেগম। আমেনা বেগম তখন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক। নূরুল ইসলাম বললেন, জানেন, আজ সারাদিন আপাকে নিয়ে টো টো করে সারা শহর ঘুরেছি। কখনো হেঁটে, কখনো রিকশায়। একটা গাড়ির পর্যন্ত ব্যবস্থা করতে পারিনি। মুজিব ভাইয়ের প্রকাশ্য বিচারের দাবিতে একটি বিবৃতি প্রচার করা হবে। তার মুসাবিদা করারও লোক পাচ্ছি না।

বললাম, কেন বাহাউদ্দিন চৌধুরী ও গাজী গোলাম মোস্তফা কোথায়? (বাহাউদ্দিন চৌধুরী তখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত)।

নূরুল ইসলাম বললেন, তারাও আন্ডারগ্রাউন্ডে গেছেন। শেখ মনিও যদি এইসময় জেলের বাইরে থাকতেন, তাহলে আমাদের এমন অসুবিধা হতো না।

ঃ সালাম খান এবং জহিরুদ্দিন সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন?

এবার আমেনা বেগম মুখ খুললেন। বললেন, ওদের কথা আর বলবেন না ভাই। তারা বলছেন, এখন বিবৃতি টিবৃতি না দিয়ে চুপ থাকো। নইলে তোমাদেরও ধরে নিয়ে যাবে। আমরাও বিপদে পড়বো।

নূরুল ইসলাম বললেন, আমরা আতাউর রহমান খানের কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি যুক্ত বিবৃতিতে সই দেয়া দূরের কথা, ইংরেজিতে বিবৃতির একটা খসড়া করে দিতেও রাজি হননি।

বললাম, সুতরাং ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। অর্থাৎ আমাকে এই বিবৃতির খসড়া করে দিতে হবে। আমি না হয় বাংলায় লিখলাম। ইংরেজি করবে কে?

আমেনা বেগম বললেন, সে লোক আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

নূরুল ইসলাম বললেন, আপনি বুঝতে পারছেন না গাফ্ফার ভাই, আমরা যদি এখন চুপ থাকি তাহলে মুজিব ভাইকে ওরা গোপন ট্রাইব্যুনালে দেশদ্রোহিতার নামে বিচার করে ফাঁসি দেবে। লাহোর কোর্টে আইয়ুব খান নওয়াব ভিকারুল মূলক-এর নাতিকে কিভাবে হত্যা করেছে, জানেন তো?

ঃ বিবৃতিতে কি বলা হবে? জিজ্ঞাসা করলাম।

আমেনা বেগম বললেন, আমাদের দাবি, শেখ মুজিব ও তার সহবন্দীদের অসামরিক আদালতে প্রকাশ্যে বিচার করা হোক এবং তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দেয়া হোক। তাছাড়া সামরিক কাস্টোডি থেকে তাদের সিভিল জেলে স্থানান্তর করা হোক। এই দাবি শুধু আওয়ামী লীগের তরফ থেকে করা হলে গুরুত্ব পাবে না। এই বিবৃতিতে দেশের সকল রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের সই সংগ্রহ করতে চাই। তাই যুক্ত বিবৃতির একটা ইংরেজি খসড়াও দরকার।

সেদিনই যুক্ত বিবৃতির খসড়া তৈরি করলাম। এখন ইংরেজি অনুবাদ কে করবেন? আমার শ্বশুর সরকারী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। কিন্তু জামাইয়ের অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না। তিনি ইংরেজির খসড়াটা করে দিলেন।

সারা ঢাকা শহর দু'দিন যাবত ঘুরেও আমেনা বেগম ও নূরুল ইসলাম কোন রাজনৈতিক নেতা, এমনকি তখনকার কোনো সাহসী বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে যুক্ত বিবৃতিতে সই সংগ্রহ করতে পারেননি। কেউ কেউ প্রকাশ্যেই বলেছেন "আগে অন্যেরা সই দিন, তারপর আমি দেব।" এখন বিড়ালের গলায় কে আগে ঘন্টা বাঁধে?

ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াও তখন হয় ঢাকা জেলে অথবা পুলিশ হাসপাতালে বন্দী। 'ইত্তেফাকের' প্রকাশনা নিষিদ্ধ। প্রেস তালাবদ্ধ। চারদিকে হতাশার "নিবিড় তিমির আঁকা"। এই সময় ইতিহাসের সবচাইতে সাহসী মানুষের ভূমিকাটি গ্রহণ করলেন একজন নির্বিরোধ, অরাজনৈতিক সাহিত্যিক এবং অবসরভোগী সরকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদ বরকতউল্লা।

শেখ মুজিব ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল বন্দীর প্রকাশ্য বিচারের দাবিতে ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের প্রথম যুক্ত বিবৃতিতে মোহাম্মদ বরকতউল্লা প্রথমে সই করলেন।

তেরো

ছয়ই জানুয়ারী বুধবার সকাল। সতেরো বছর পর ঢাকায় এই আমার প্রথম

কাক ডাকা ভোর। সতেরো বছর পর এই আমার প্রথম ঘুম ভাঙল মুয়াজ্জিনের মধুর আজানে। আর তখনই মনে পড়ল, আমি লন্ডনে নই, ঢাকায় রয়েছি। এটা মেথিউন রোডের বাড়ির দোতলার শোবার ঘর নয়, এটা পশ্চিম ধানমণ্ডির একটা গলিতে একটা টিনের ছাদঅলা ঘর। আমার বিছানায় মশারি পাতা, সতেরো বছর যে মশারি ব্যবহার না করে তার নামই ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়ল, শিশুকালে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে প্রায় চৌদ্দ বছর সকালে আমার ঘুম ভেঙেছে এই আজান শুনে। এই আজান দিতেন আমাদের গ্রামের মসজিদের মুয়াজ্জিন খলিল মুনশিজী। একমুখ মেহেদী রাঙানো দাঁড়ি, মাথায় গোলটুপি; আমার যখন শৈশব, তিনি তখন প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন; কিন্তু তার গলার আওয়াজটি ছিল যেন বাঁশির সুরে শানানো। মানুষের গলার স্বর এমন মাধুর্য্যভরা হতে পারে, খলিল মুনশিজীর আজান না শুনলে তা বিশ্বাস করতে পারতাম না। জীবনে অনেক দেশ আমি ঘুরেছি। দিল্লী, লাহোর, বাহরাইন, আলজিয়ার্সে সেরা মসজিদগুলোতে ঢুকেছি। কিন্তু শৈশবে বাংলাদেশের উলানিয়া নামে এক গ্রামের জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন খলিল মুনশিজীর কণ্ঠে যে আজান শুনেছি, তেমন মধুক্ষরা আজান আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

শৈশবে খলিল মুনশিজীর কণ্ঠে এই ফজরের আজান শুনেই আমি বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠতাম। মসজিদে ছুটতাম জামাতে নামাজ পড়ার জন্য। মসজিদের সামনেই পুকুর। সান বাঁধানো ঘাট। তাতে ওজু করতাম। খেজুর গাছের ডাল দিয়ে তৈরি দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে মুনশিজী আমাকে দেখে খুশি হতেন। বলতেন, "তুমি নামাজ পড়তে এসেছো। আমি খুব খুশি হয়েছি। এত অল্প বয়স থেকে নামাজ পড়া শুরু করেছো, আল্লাহ তোমার ভালো করবেন।" আমি মসজিদে কেন ছুটে এসেছি, সেই আসল কথাটা তাকে বলতাম না। ফজরের নামাজের জামাত শেষ হলে তিনি যখন মসজিদের সাদা-কালো মার্বেল পাথরের মেঝেতে বসে কাঠের রেহেলে রাখা কোরান শরীফ সুর করে পড়তেন, তখন তা শোনার জন্য বসে থাকতাম। মাঝে মাঝে দেখতাম তিনি কোরান শরীফ পড়তে পড়তে কাঁদছেন। তার কণ্ঠে সুর আর কান্না এক সঙ্গে মিশে গেছে। তিনি কোরানের যে আয়াত তখন পড়ছেন, তার এক বর্ণ অর্থও আমি বুঝতে পারতাম না। কিন্তু তার সুর আর কান্নার তন্ময়তায় আমার চোখেও পানি আসতো।

পঁয়ত্রিশ বছর পর এই গ্রামে ফিরে প্রথমেই গেছি খলিল মুনশিজীর কবর জেয়ারত করতে। তার পাশেই আরেকটি কবর। মৌলভী আহমদ সাহেবের। খলিল মুনশিজী যখন উলানিয়া জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন, তখন মৌলভী আহমদ ছিলেন মসজিদের ইমাম। তাছাড়া তিনি গ্রামের মাদ্রাসায় আমার শিক্ষকও ছিলেন। গণ্ডগ্রামে বাস করেও তিনি দেশের তখনকার রাজনীতির হাল হকিকতের সঙ্গে পরিচিত

থাকতেন। যৌবনের প্রারম্ভেই আরব দেশে হজ্জ্ব করতে গিয়ে তিনি ওয়াহাবী তাত্ত্বিকদের সংস্পর্শে আসেন। ফলে ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমানদের জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াহার ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব তাকে সম্ভবত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তখন ছোট ছিলাম। অনেক কিছুই বুঝতে পারতাম না। কিন্তু আজ যখন প্রৌঢ়ত্বের শেষপ্রান্তে পৌছে মাঝে মাঝে সময়ের অতীতের জানালাটা খুলে তাকাই, তখন অল্প বয়সের অনেক না বোঝা কথা এবং ঘটনার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে দেরি হয় না। তখন শৈশবে বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারি, মৌলভী আহমদ শুধু তার বিশ্বাসে নয়, তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাপনেও ছিলেন একজন ওয়াহাবী।

শৈশবে মৌলভী আহমদের মতো একজন শিক্ষকের কাছে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করার সুযোগ হওয়াতেই সম্ভবত যৌবনের শুরু থেকে নিজেকে একজন বাঙালী এবং সেই সঙ্গে ধর্ম-পরিচয়ে একজন মুসলমান ভাবতে কখনো আমার কষ্ট হয়নি। আমাদের মাদ্রাসাটি ছিল জুনিয়র মাদ্রাসা। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত লেখাপড়া করে জুনিয়র মাদ্রাসার ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হতো। আমিও তাই দিয়েছি। তারপর ক্লাস সেভেনে উঠে ভর্তি হয়েছি হাইস্কুলে। কিন্তু সেই শৈশবের সোনালী উষার উত্তাপ মাখা ছ'টি বছরে মৌলভী আহমদ স্বদেশ ও ধর্ম সম্পর্কে আমার মনে যে চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন, সম্ভবত সেই চেতনাই সারাজীবন আমাকে প্রভাবিত করেছে। মওদুদী জামাতের ইসলাম যে প্রকৃত ইসলাম নয়, বরং ধর্মের আবরণে উগ্র ফ্যাসিবাদ, এই প্রত্যয় আমার মনে সৃষ্টি হয়েছিল সেই পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই—যখন জামায়াতে ইসলামী নামক দলটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সবেমাত্র ডানা মেলতে শুরু করেছে। ১৯৪৮ কি ১৯৪৯ সালে এই দলের প্রথম অঘোষিত বাংলা মুখপত্র বরিশাল থেকে বের হয়। নাম ছিল 'তানজিম'। মওলানা আবদুর রহিম ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। তিনিও তখন বরিশালে থাকতেন। আমি স্কুলের অষ্টম কি নবম শ্রেণীর ছাত্র। বরিশালের সাপ্তাহিক 'নকীব' পত্রিকায় গল্প প্রবন্ধ লিখতাম। ঢাকায় আলাউদ্দিন আল আজাদ তখন কলেজের ছাত্র। কিন্তু ওই বয়সেই নন্দিত গল্প লেখক। তার সঙ্গে আমার পত্রমিতালী গড়ে উঠেছিল। আমরা নতুন গল্প লেখক। নিজেদের লেখায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য আমাদের মনে দারুণ উৎসাহ। আমাদের কণ্ঠে তখন একটি পরিচিত শ্লোগান —'আর্টস্ ফর লাইফস্ সেক। শিল্প জীবনের জন্য। মওলানা আব্দুর রহিম তার 'তানজিম' পত্রিকায় আমার একটি লেখার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালালেন। তার শ্লোগান 'আর্টস ফর আল্লাহ্'স্ সেক।' শিল্প আল্লাহর জন্য। আমি মাদ্রাসায় ছাত্র থাকাকালে মৌলভী আহমদের কাছে শেখা ইসলাম

সম্পর্কিত আমার সামান্য জ্ঞান ও যুক্তিকে সম্বল করে মওলানা আবদুর রহিমের এই আক্রমণের কড়া জবাব দিয়েছিলাম 'নকীব' কাগজেই।

মৌলভী আহমদ মাদ্রাসায় আমাদের আরবী পড়াতেন। সেই সঙ্গে দ্বীনিয়াত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর দ্বীনিয়াত ক্লাসে তিনি শুধু দ্বীনিয়াত নয়, কোরান ও হাদীসের অনেক কথা আমাদের ব্যাখ্যা করে বলতেন। বলতেন চমৎকার সব গল্প। তার কাছেই আমি শিখেছি 'হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান।' স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। তিনি বলতেন, 'তুমি যদি নিজের দেশকে ভালো না বাসো, তাহলে তোমার ঈমান পূর্ণতা পাবে না।' তিনি বলতেন, 'রসুলুল্লাহ্ (দঃ) নিজের পরিচয় কিভাবে দিতে বেশি ভালবাসতেন, তা জানো? তিনি ভালবাসতেন 'আল আরাবী, আল মাক্কী' নামে পরিচিত হতে। অর্থাৎ তিনি শুধু একজন আরব নন, তিনি মক্কার মানুষও। তিনি সারাবিশ্বের মানুষের জন্য ইসলাম ধর্ম প্রচার করার পাশাপাশি তার নিজের দেশের বেদুইন গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা 'কওমে' রূপান্তর করে যান। যে যাযাবর গোত্রগুলোর প্রধান পেশা ছিল দস্যুবৃত্তি, তাদের তিনি কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী জাতি' হিসেবে গড়ে তোলেন। সাম্রাজ্য নয়, খেলাফত (প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা) গঠন করেন। দেড় হাজার বছর আগে প্রথম সরকারী পরিচালনায় বায়তুল মাল (গণকোষাগার) গড়ে তোলেন, যা থেকে বেকার ও অভাবী লোকদেরও সাহায্য জোগানো হত।'

মৌলভী আহমদের কাছেই প্রথম শিখেছি, আমরা বাঙালী এবং বাংলাদেশকে ভালবাসা আমাদের ঈমানের অঙ্গ। আমরা প্রথমে বাঙালী। তারপর মুসলমান। যে কথাটা আরও অনেক পরে শুনেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ছাত্র থাকাকালে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মুখে। মৌলভী আহমদের ছাত্র হওয়াতেই কওম, মিল্লাত, উম্মাহ কথাগুলোর অর্থ, তাৎপর্য ও পার্থক্য বুঝতে আজ আর আমার অসুবিধা হয় না। ঢাকার এক শ্রেণীর পত্রপত্রিকায় আজকাল যখন দেখি, উম্মাহ, ইসলামী উম্মাহ ও মুসলিম উম্মাহ কথার যথেচ্ছ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার; তখন বুঝতে কষ্ট হয় না, উগ্র ও ফ্যাসিবাদী ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মীয় জাতীয়তার খোলস পরানোর জন্য কি চতুর অপচেষ্টা না বাংলাদেশে চালানো হচ্ছে।

বৃটিশ আমলের বাংলাদেশের গ্রামের মাদ্রাসায় একজন সাধারণ শিক্ষক। কিন্তু তার কাছেই হয়েছিল মানবতাবাদী চেতনায় আমার প্রথম দীক্ষাগ্রহণ। মৌলভী আহমদ বলতেন, "মানুষ হিসেবে এবং মুসলমান হিসেবেও তোমরা আল্লাহ এবং তার বান্দা উভয়ের কাছেই দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতার নাম হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল এবাদ। হক্কুল্লাহর অর্থ আল্লাহর হক, তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রাপ্য। হক্কুল এবাদের অর্থ বান্দার হক বা তোমাদের কাছে মানুষের অর্থাৎ তোমার স্বজন, সমাজ ও

প্রতিবেশীর প্রাপ্য। আল্লাহর হক তুমি যদি পরিশোধ না কর, অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত সম্পর্কে উদাসীন থাকো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করলেও করতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক অর্থাৎ মানুষের প্রতি তোমার কর্তব্য না করলে, মানুষের প্রাপ্য পরিশোধ না করলে আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ বা যতদিন ওই মানুষ তোমাকে ক্ষমা না করে। আর তোমার কাছে মানুষের এই প্রাপ্য বলতে বোঝায়, সদাচার ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ, অন্যায় ও উৎপীড়ন না করা, সত্য কথা বলা। অভাবী ও উৎপীড়িতকে অবশ্যই সাহায্য করা, মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য না করা। মৌলভী আহমদ বলতেন, "মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মের আবির্ভাব। মনুষ্যত্বকে হত্যা করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না।" কোরানের আয়াতও তিনি সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করতেন, "লা ইকরাহা ফিদ্বীন, কাত্তাবাইয়ানার রুশদু মিনাল গাই,"— অর্থ, "ধর্মে কোনো জোর জুলুম নেই। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত।"

১৯৪৬ সালের কথা। তখন ভারত বিভাগ হয়নি। বৃটিশ শাসকেরা ভারত ত্যাগ করেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তুঙ্গে। এই সময় আগস্ট মাসের ষোল তারিখে মুসলিম লীগের ডাকে ডাইরেক্ট য়্যাকসন ডে বা প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস পালন করতে গিয়ে কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা হল। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলায়। আমাদের জেলা শহর বরিশালও তার তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আমি তখন ক্লাশ সিক্স-এর ছাত্র। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জন্য শহরের স্কুল কলেজে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য ছাত্রের মতো আমিও গ্রামের বাড়িতে চলে গেলাম। গ্রামে গিয়ে দেখি, সেখানেও একই উত্তেজনা। উলানিয়া মুসলমান প্রধান গ্রাম। জমিদার পরিবারও মুসলমান। তবে তখন ছিল বহু শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী হিন্দুর বসবাস। উলানিয়া বাজারে চন্দ্র বণিক, মধুসূদন পাল এবং আরও বিত্তশালী হিন্দু মহাজন ছিলেন। ছিল দূর্গাপূজার মণ্ডপ ও কালীমন্দির। তারা তাদের জীবন, সম্পত্তি ও মন্দিরের নিরাপত্তার জন্য শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বাজারে তখন নিত্য নতুন নতুন গুজব ঃ প্রতিবেশী হিন্দু জমিদারের এলাকায় মুসলমান প্রজাদের হত্যা করা হচ্ছে, মুসলমান নারীদের ধর্ষণ এবং শিশুদের দ্বিখণ্ডিত দেহ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে। অপবিত্র করা হয়েছে বহু মসজিদ। বিহার, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশে মুসলিম নিধনের বহু প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া গেল গ্রামে। এরা ঢাকা, কলকাতা, হাওড়ায় কলে কারখানায় কাজ করতেন। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা না কমা পর্যন্ত গ্রামে থাকার জন্য চলে এসেছেন। এরা জীবনে কখনো বিহার, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশে যাননি। কিন্তু কি করে সেসব এলাকায় মুসলমান-নিধনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে এলেন, সে সম্পর্কে কেউ কোনো

প্রশ্ন তুললেন না।

উলানিয়া গ্রামে এবং আশপাশে যখন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রায় চরমে, তখন এই উত্তেজনা দুর করা এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি পূনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে এলেন গ্রামের জমিদার পরিবারের আরিফ চৌধুরী। তিনি তখন মুসলিম লীগের একজন সদ্য নির্বাচিত এম এল এ (অবিভক্ত বাংলার আইনসভার সদস্য)। কিন্তু কর্মে, চিন্তায় ও আচরণে তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। নিজে গান লিখতেন। তাতে সুর দিতেন। নিজেই সভা সমিতিতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতেন। নিজের ভাইপো আজম চৌধুরীকে তিনি এসব গান শিখিয়েছিলেন। অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ ছিল এই আজম চৌধুরীরও। পরিবারের এই কণ্ঠ মাধুর্যের কিছুটা হয়তো উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে আরিফ চৌধুরীর একমাত্র ছেলে কবি আসাদ চৌধুরী। সে ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে কর্মরত।

চল্লিশের দশকের মধ্যভাগে অবিভক্ত বাংলায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ-নেতৃত্ব ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। জিন্নার অনুগত এবং রক্ষণশীল গ্রুপের নেতা ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন। তার দলে ছিলেন 'আজাদ' পত্রিকার মওলানা আকরম খানও। প্রগতিশীল এবং ইসলামী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী গ্রুপের নেতা ছিলেন আবুল হাশিম। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও প্রথমে এই গ্রুপে ছিলেন। পরবর্তীকালে এই দুই গ্রপের ধারায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগও দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারার ছাত্রলীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শাহ আজিজুর রহমান এবং প্রগতিশীল ও সমাজতন্ত্রমনা গ্রুপের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার সমমনা বন্ধুরা। ঢাকায় আরিফ চৌধুরীর তাঁতী বাজারের বাসাতেই শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তখনো তিনি ছাত্রনেতা। লম্বা ছিপছিপে যুবক। তার দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু জালাল এবং হামিদ (মোলা জালালউদ্দিন এবং আবদুল হামিদ)। একটি সাইকেল তার বাহন এবং অধিকাংশ সময়ের অনুগত পার্শ্বচর গাজী গোলাম মোস্তফা।

সম্ভবত আবুল হাশিমের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং তাঁর উদার ও প্রগতিশীল মতামত দ্বারাই আরিফ চৌধুরী বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে মুসলিম লীগের একজন পরিষদ সদস্য হয়েও নিজের গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তার নিজের দল ও পরিবারের উগ্রপন্থী এবং কাঠমোল্লাদের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। তিনি হিন্দুদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে তাদের শক্তি ও সাহস জোগাতে থাকেন। শান্তিরক্ষা এবং বহিরাগতদের হটানোর জন্য শান্তি রক্ষা কমিটি গড়ে তোলেন এবং সব শেষে উলানিয়া জামে মসজিদের প্রাঙ্গণে গ্রামের ছেলেবুড়ো সকলকে নিয়ে এক শান্তি বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মৌলভী আহমদ।

এই সভায় কোনো জ্বালাময়ী বক্তৃতা নয়, কোনো উপদেশ নয়, মৌলভী আহমদ ছোট্ট একটি গল্প বলেছিলেন। এই গল্পটি চিরকালের জন্য আমার মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এই সেদিন আবার যখন হিন্দুর জীবন, সম্পত্তি ও মন্দিরের উপর হামলা হয়েছিল (ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিক্রিয়া নাম দিয়ে) তখন এই গল্পটি নতুন করে আমার মনে পড়েছে। আবার মনে পড়েছে আমার গ্রামের মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলভী আহমদের কথা।

চৌদ্দ

আজ থেকে সাতচল্লিশ বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন বারো। ইংরেজি উনিশশ' ছেচল্লিশ সালের মধ্যভাগ। সারা বাংলাদেশে (অবিভক্ত) সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ করে। ঠিক সেই সময় বাংলাদেশের এক অজগ্রামের এক মসজিদের ইমামের মুখে শুনলাম একটি গল্প। গল্পটি এই বয়সেও আমার মনে রয়েছে। সম্ভবত তখনকার সেই ভয়ানক উত্তেজনার দিনে এই গল্পটি না শুনলে এত দীর্ঘকাল গল্পটি আমার মনে থাকার কারণ ঘটতো না।

আমাদের গ্রামের জামে মসজিদের সামনেই সভা। বৈঠকটি সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার। প্রথমেই সে কথাটি স্পষ্টভাবে বললেন, প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য (এমএলএ) আরিফ চৌধুরী। গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেও বক্তৃতা দিলেন। সবশেষে সভাপতির বক্তব্য। ইমাম মৌলভী আহমদ উঠে দাঁড়ালেন।

দীর্ঘদেহী মানুষ। বয়সের ভাবে কুঁজো হননি। গায়ে হাঁটু ঢাকা লম্বা পিরহান। মাথায় সাদা গোল টুপি। মৌলভী আহমদ মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। মৃদুস্বরে বললেন, আমি আপনাদের মসজিদের ইমাম এবং মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। আমি বক্তৃতা করতে জানি না। আজ দেশের চারদিকে হিন্দু-মুসলমানে যে অশান্তি ও হানাহানি, তাতে বাধ্য হলাম আপনাদের সামনে দু'চার কথা বলতে। এই কথা হল, খবরদার, প্রতিবেশী হিন্দুর গায়ে হাত দেবেন না। তাদের সম্পত্তি লুট করবেন না। মন্দির ধ্বংস করবেন না। কেউ যদি বলে, হিন্দুরা মুসলমানের মসজিদ ধ্বংস করেছে, তাহলেও মন্দির ভাঙতে যাবেন না। খবরদার, তাহলে আপনারা মুসলমান বলে দাবি করতে পারবেন না। রোজ কেয়ামতের দিন রসুলুল্লাহর (দঃ) সাফায়াত পাবেন না। আমি আজ আপনাদের কাছে এই রসুলুল্লাহর জীবনেরই একটি কাহিনী বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো।

আমি তখন সাংবাদিক নই। ডায়েরি লেখাও শুরু করিনি। কারো বক্তৃতা বিবৃতির নোটও রাখি না। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, সাতচল্লিশ বছর আগে শোনা মৌলভী আহমদের সেই বক্তৃতা আজও আমি যেন হুবহু উচ্চারণ করতে পারি, এমনিভাবে আমার মনে তা মুদ্রিত হয়ে আছে।

অপরাহ্নের আলো তখন নারকেল গাছের পাতায় ছলকাচ্ছে। সবুজ ঘাসের জাজিমে বসে বক্তৃতা শুনছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। একটু দূরে রাস্তার ওপারে গণমান্য হিন্দুরা এসে জড়ো হয়েছেন। মৌলভী আহমদ বললেন, আমার হিন্দু ভাইয়েরাও এই গল্পটি শুনুন।

রসুলুল্লাহ্ তখন মদীনায় বাস করছেন। কোরেশদের শত্রুতা শেষ হলেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের চক্রান্ত তখনো শেষ হয়নি। তারা নিত্যনতুন ফন্দি আঁটে কি করে নতুন ধর্ম ইসলামকে আঘাত হানা যায়। একদিন সন্ধ্যায় রসুলুল্লাহ সাহাবাদের নিয়ে মসজিদে বসে আছেন, এমন সময় একদল ইহুদী এসে বলল, হে মুসলমানদের নবী, আমরা মদীনার লোক নই। বহু দূরের বাসিন্দা। নানা কারণে আজ আমরা মদীনা ছেড়ে চলে যেতে পারিনি। আমাদের এতগুলো লোকের একটা রাত্রি কাটানোর কোনো জায়গাও নেই। আপনি কি এই মসজিদে একটা রাত আমাদের মাথা গুঁজবার অনুমতি দেবেন? আমরা খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিজেদের শহরের দিকে যাত্রা করবো।

রসুল বললেন, তোমরা সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়েছো। আজকের রাতটা এই মসজিদেই অবস্থান কর। আমার এবং সাহাবাদের খেজুরের ভাগও তোমরা পাবে। তোমরা কোনো চিন্তা করো না। এই মসজিদেই রাতটা কাটাও।

রাত্রে এশার নামাজের শেষে রসুলুল্লাহ্ এবং তার সাহাবার মসজিদ থেকে চলে যাওয়ার আগে ইহুদীদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে গেলেন। ইহুদীদের মনে ছিল দুষ্টবুদ্ধি। তারা আশ্রয় লাভের জন্য আসেনি। এসেছিল মসজিদটির ক্ষতিসাধন করতে। শেষ রাতে মসজিদটি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে তার ভেতরে তারা মলমূত্রত্যাগ করল এবং নানা ক্ষতি সাধন করল।

ভোরের আগে ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে এসে রসুলুল্লাহ্ এবং সাহাবারা দেখেন ইহুদীরা কেউ নেই। মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত এবং মলমূত্রে ভরা। ইহুদীরা মসজিদ অপবিত্র করায় সাহাবারা ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তারা ইহুদীদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, আমরা এখনই তাদের পশ্চাৎধাবন করবো এবং তলোয়ারের এক আঘাতে তাদের প্রত্যেকের শির ধূলায় লোটাবো।

সাহাবারা তাই করতেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ তাদের নিবৃত্ত করলেন। কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন, না, তোমরা কোথাও যাবে না। এই মসজিদ ইহুদীদের কাছে পবিত্র

স্থান নয়। তোমাদের কাছে, মুসলমানদের কাছে পবিত্র স্থান। সেই কারণেই ইহুদীরা মসজিদকে এভাবে নোংরা করতে পেরেছে। তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া ঠিক হবে না। আল্লাহর ঘরের সম্মান ও পবিত্রতা আল্লাহই রক্ষা করবেন। তোমরা অযথা উত্তেজিত হয়ো না।

মৌলভী আহমদ থামলেন। বললেন, রসুলুল্লাহ্‌র জীবন থেকে এই কাহিনীটি বলার উদ্দেশ্য আশা করি আপনারা সকলেই বুঝতে পেরেছেন। আমি আর ব্যাখ্যা করে কিছু বলতে চাই না। শুধু মনে রাখবেন, তিনিই প্রকৃত মুসলমান, যার হাত থেকে শুধু তার মুসলমান প্রতিবেশী নয়, তার অমুসলমান প্রতিবেশীও নিরাপদ।

মৌলভী আহমদের কাছে শোনা আরেক দিনের কাহিনী। ১৯৫০ সালে আমি মেট্রিক পরীক্ষায় পাস করি। পরীক্ষা দেওয়ার পর দু'তিন মাস রেজাল্ট জানার জন্য অপেক্ষা। এই সময়টা গ্রামের বাড়িতেই ছিলাম। এক শুক্রবারে গ্রামের জামে মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে গেছি। এই নামাজে মৌলভী আহমদ খোত্‌বা পাঠ করতেন। শুধু কিতাব থেকে আরবীতে খোতবা পাঠ করেই তিনি দায়িত্ব শেষ করতেন না। বাংলাতেও সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে দু'চার কথা বলতেন। সেদিন বললেন, আমি আপনাদের আখেরি জমানা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। এই আখেরি জমানা হল রোজ কিয়ামতের আগের যুগ। এই জমানার আলামত বা নিদর্শন সম্পর্কে স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ বলে গেছেন, "এই জমানার একটি নিদর্শন হল, শয়তান আলেমের বেশ ধরে এসে আপনাদের 'অছ্‌ওয়াছা' (কুমন্ত্রণা) দেবে। আল্লাহ্‌র বাণী ও আমার কথার বিকৃত ব্যাখ্যা শোনাবে। আমার উম্মতদের পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করবে। তাদের বেশ হবে আলেমের, কথাবার্তা বলবে ধর্মের। কিন্তু ব্যাখ্যা হবে মিথ্যা ও বিকৃত। মোমিনদের গোমরাহ্ (পথভ্রষ্ট) করাই হবে তাদের প্রধান কাজ। এই 'আলেম বেশধারীদের' সম্পর্কে প্রকৃত মোমিন মুসলমানেরা সাবধান, সাবধান।"

মৌলভী আহমদের মুখে শোনা এই সাবধান বাণীটিও আমার মনে পড়েছে, বছর কয়েক আগে লন্ডনের ইস্ট এন্ডে এক 'ওয়াজের জল্‌সায়' গিয়ে। বহুদিন ধরে শুনে আসছি, 'মওলানা" দেলোয়ার হোসেন সাঈদী নামে এক ভদ্রলোক জবরদস্ত বক্তা। যেমন তার কণ্ঠ, তেমনি তার যুক্তি ও বাক চাতুর্য্য। আরও বড় কথা, তিনি একজন আলেম। তার বক্তৃতা শ্রোতারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে। তার 'ওয়াজের' ক্যাসেট শ'য়ে শ'য়ে বিক্রি হয়। আমি আর কৌতূহল চাপতে পারলাম না। তিনি ঐদিন লন্ডনের ইস্ট এন্ডের এক সভায় বক্তৃতা করবেন শুনে যথাসময়ে সেই সভায় গিয়ে হাজির হলাম। কিছুক্ষণ তার বক্তৃতা শুনেই বুঝলাম, এটি ধর্মসভার আবরণে একটি রাজনৈতিক সভা। এবং ভদ্রলোক জামাতে

ইসলামীর 'গোয়েবল্‌স্‌'। তার কণ্ঠ আকর্ষণীয়, বক্তব্য শাণিত। কিন্তু অসত্য, অর্ধসত্য ও ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় ভরপুর। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে আমার যা সামান্য জ্ঞান, তাতে আমার বুঝতে বাকি রইল না, মনগড়া ও বিকৃত ব্যাখ্যাই যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থিত করা ভদ্রলোকের বাহাদুরি। ইসলাম প্রচার তার উদ্দেশ্য নয়, জামাত-শিবিরের রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডাই তার সভার মূল উদ্দেশ্য। তার বক্তৃতা শুনতে শুনতে হঠাৎ স্মরণ হয়েছিল, কৈশোরে মৌলভী আহমদের মুখে শোনা সেই সাবধান বাণী।

আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে ভাবি, ইসলামের প্রথম যুগে মক্কার কোরেশদের সঙ্গে অসংখ্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর রসুল এবং তার সাহাবাদের নেতৃত্বে মুসলমানেরা যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করেন এবং মক্কা দখল করেন; এই সময় এই বিজয়ী মুসলমানদের নেতৃত্ব যদি বাংলাদেশের বর্তমান জামায়াত-শিবির দলের নেতাদের হাতে থাকতো, তাহলে কি ঘটতে পারতো? পাশ্চাত্যের চরম ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেছেন, কোরেশদের বারম্বার হত্যা চক্রান্তের দরুন রসুলকে গোপনে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যেতে হয়েছে, আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে, সেই যুদ্ধে তিনি নিজেও আহত হয়েছেন; তথাপি মক্কা দখলের পর মুসলমানেরা কোরেশদের সঙ্গে যে শান্তিচুক্তি করেছে, তা অভাবনীয়। মক্কা দখলের পরেতো দূরের কথা, কোরেশদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়েও শত্রুর একটি ঘর মুসলমানেরা লুণ্ঠন করেনি, যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া কাউকে হত্যা করেনি, শত্রুপক্ষের কোনো নারীকে অপহরণ ও ধর্ষণ করেনি। প্রথম যুগের মুসলমানদের এই চরিত্রবল ও সংযম দেখেই মুসলমানদের দ্বারা জেরুসালেম অধিকৃত হওয়ার পর নগরীর পরাজিত খৃস্টানেরা মুসলমানদের তখনকার খলিফা হজরত ওমরকে (রাঃ) গিয়ে বলেছিল, আপনি আপনার সৈন্য বাহিনী নিয়ে আমাদের গির্জায় অবস্থান করতে পারেন। বাইরে তাঁবু খাটিয়ে কয়েকদিন নগরীতে থাকার পরিবর্তে আমাদের গির্জাতেই থাকা আপনাদের জন্য নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যকর হবে। হজরত ওমর উত্তর দিয়েছিলেন, জেরুসালেমে আমরা যে ক'দিন থাকবো, মাঠে তাঁবু খাটিয়েই মুসলমান সৈন্যদের নিয়ে থাকবো। আমরা যদি আপনাদের গির্জা এক রাতের জন্যও ব্যবহার করি এবং এখানে নামাজ পড়ি, তাহলে মুসলমানেরা হয়তো এই গির্জাকে মসজিদ করার চেষ্টা চালাতে পারেন।

ইসলামের প্রথম যুগের নেতাদের পরিবর্তে সেদিন যদি বর্তমান যুগের বাংলাদেশের জামায়াত ও শিবিরচক্রের হাতে আরবের মুসলমানদের নেতৃত্ব থাকতো, তাহলে কোরেশদের সঙ্গে যুদ্ধ বা মক্কা বিজয়ের সময় সেখানকার অবস্থা কি দাঁড়াতো, তা ভাবতেও আমি শিউরে উঠি। হয়তো ধর্মের নামে চলতো নির্বিচার-

হত্যাকাণ্ড, হাত কাটা, রগ কাটার মতো উন্মত্ত তাণ্ডব, নারী অপহরণ ও ধর্ষণে সাহায্যদান এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ের ক্ষতিসাধন অথবা তাকে মসজিদে রূপান্তর করা। যে বর্বরতা আমরা পরবর্তীকালে আব্বাসীয় ও উমাইয়াদের মধ্যে বিরোধের সময় লক্ষ্য করি। আব্বাসীয় ও উমাইয়ারা একই মুসলমান, একই জাতি ও একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও একে অন্যকে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন, একে অন্যের সম্পত্তি দখল করেছেন, নারী লুট করেছেন, এমন কি কবর থেকে প্রতিপক্ষের লাশ তুলে বিচারের নামে তার উপর অত্যাচার করেছেন। "ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হর কারবালাকে বাদ"—প্রতিটি কারবালার পরে ইসলাম আরো জীবিত হয়ে ওঠে—এই কথাটি আমরা যতই বলি না কেন, সেই সঙ্গে এই কথাটিও কি স্মর্তব্য নয় যে, কারবালার কাণ্ডটি (নবী বংশের ধ্বংস সাধন) ঘটেছিল মুসলমানদের হাতেই; অমুসলমানদের হাতে নয়।

প্রথম যুগের মুসলমানেরা যেসব দেশে ইসলাম প্রচার করেছেন, সেসব দেশে ইসলাম দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং তা জাতিভেদ লোপ করে সামাজিক সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। সেসব দেশে তারা ধর্ম প্রচার করেছেন, কিন্তু ধর্ম, কালচার ও রাজনীতিকে (প্রশাসন নীতি) আলাদা রেখেছেন। ফলে সেসব দেশে ইসলামের অভ্যুদয় কোনো সংঘাত সৃষ্টি করেনি, বরং সমঝোতা সৃষ্টি করেছে। প্রথম যুগের আরব মুসলমানেরা ধর্ম ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে (রাজনীতি) কতটা আলাদা চোখে দেখতেন, তার প্রমাণ, রসুলুল্লাহ্‌র সময়ে অমুসলমানদের সঙ্গে সম্পাদিত মদীনা চার্টার বা মদীনা সনদ নামে পরিচিত চুক্তির শর্তাবলী। পরবর্তী সময়ে পারশ্য বিজয়ের পর আরব মুসলমানেরা পারশ্যবাসীদের ভাষা, কালচার ও অগ্নিপূজার যুগের জাতীয় বীরদের ঐতিহ্যকেও ধ্বংস করে ইসলামী 'তমদ্দুনের' নামে তাদের উপর আরবের কালচার ও ইতিহাস চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। ফলে পারশ্যবাসীরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আরবের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য কোনো কিছুই গ্রহণ করেননি। তারা এখনো আরবের জাতীয় বীরদের "ইসলামের বীর" নাম দিয়ে নিজেদের জাতীয় বীর হিসেবে স্বীকার করেন না। অগ্নিপূজার যুগের অমুসলিম সোহ্‌রাব-রুস্তম এখনো তাদের জাতীয় বীর। সে যুগের নওরোজ (নববর্ষ) এখনও তাদের জাতীয় উৎসব। পারশ্যে (ইরানে) সেই পুরনো যুগ থেকে আজ পর্যন্ত (খোমেনীর ইসলামী বিপ্লবের পরেও) অগ্নিপূজারীসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো ধর্মীয় বিবাদ ও সংঘাতের খবর পাওয়া যায় না।

যেসব দেশে ইসলাম তার ইনসানিয়াত, ইবাদাত ও ইনসাফের (মানবতা, উপাসনা, সেবা ও ন্যায় বিচার) বাণী নিয়ে প্রবেশ করেছে, সেসব দেশে

মুসলমানেরা সত্যি সত্যি সামাজিক সাম্য, সমঝোতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। রাজশক্তি হিসেবে পতনের পরও বহু দেশে ইসলাম সমাদৃত ধর্ম হিসেবে টিকে রয়েছে এবং এখনো প্রসার লাভ করছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বার্মার মতো বহু গোত্র, জাতি, উপজাতি ও কালচারের দেশেও ইসলাম সমন্বয় ও সমঝোতার ধর্ম, সংঘাতের ধর্ম নয়। বছর দু'য়েক আগে চীনের এক প্রৌঢ় মুসলমান দম্পতি মক্কায় হজ্জ পালন করে লন্ডন হয়ে চীনে ফিরে যাচ্ছিলেন। পরিচয় হতেই গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আমি চায়নিজ।' তিনি যে মুসলমান তা তাকে মুখ ফুটে বলতে হয়নি। তার গায়ে লম্বা কুর্তা, মাথায় গোল টুপি এবং হাতে তসবিহ্‌ই তার প্রমাণ দিচ্ছিল। তার আরবী নামের সঙ্গেও চীনা নাম মিশ্রিত। কথায় কথায় বললেন, "আমি কমিউনিস্ট শাসনের আগেও মুসলমান ছিলাম, কমিউনিস্ট শাসনেও মুসলমান আছি। ভবিষ্যতেও থাকবো। ধর্ম আমার মনে, আমার বুকের ভেতরে। এই বিশ্বাসের ভিত্তি কে ভাঙতে পারে?" তার কথা শুনে ইকবালের কবিতার দু'টি লাইন আমার মনে পড়েছিল, "তওহিদ কি আমানত সিঁনু মে হায় হামারে/আশা নেহি মিটানা নাম নিশাঁ হামারা।"

প্রকৃত মুসলমানেরা নয়, যখনই এবং যে যুগেই বাংলাদেশের জামায়াতীদের মতো ধর্ম ব্যবসায়ীরা অথবা কোনো রাজ্যলোলুপ মুসলমান শাসক নিজেদের স্বার্থে কিংবা রাজ্য বিস্তারের জন্য ইসলামকে ব্যবহার করেছেন, তখনই শান্তি, সম্প্রীতি ও সমঝোতার বদলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে সংঘাত ও হানাহানি দেখা দিয়েছে এবং ইসলামের ক্ষতি হয়েছে। যেসব দেশে মুসলমানেরা ধর্ম প্রচার নয়, রাজ্য বিস্তারের জন্য ঢুকেছেন এবং বিজিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালিয়েছেন, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও উপাসনালয়ের উপর আঘাত হেনেছেন, সেসব দেশেই কালের আবর্তনে আজ নিরীহ ও নির্দোষ মুসলমানেরা নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হচ্ছেন।

সম্ভবত কথাটি মোতাহার হোসেন চৌধুরীর। হাতের কাছে তার বইটি নেই বলে স্মৃতি থেকে লিখতে হচ্ছে। ফলে তার কথা তার ভাষায় হুবহু লিখতে পারলাম না। এই বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভারতবর্ষে (অবিভক্ত উপমহাদেশে) ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার লাভের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদ, তাদের শ্রেণীভেদ প্রথা, অচ্ছুৎ নীতি অবশ্যই দায়ী। কিন্তু সেই সঙ্গে রাজ্য ও সম্পদলোভী মুসলমান বহিরাগত শাসকদের ভূমিকাও ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান সম্প্রদায়ের একজন ছাত্র যখন ইতিহাসে পাঠ করেন, বহিরাগত সুলতান মাহমুদ সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন ও সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করে সকল সোনা ও সম্পদ লুট করেন এবং দেবমূর্তিগুলো ধ্বংস করেন; কিংবা তারা যখন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ দেখেন যে, দিল্লীর পাঠান বা মোগল শাসক প্রতিবেশী অমুসলিম রাজ্য (হিন্দু,

রাজপুত প্রভৃতি) আক্রমণ করার পর সেই রাজ্যের রাজার স্ত্রী, কণ্যা ও অন্যান্য মহিলারা মুসলমান শাসকের হেরেমে বন্দী হয়ে রক্ষিতা হওয়ার ভয়ে 'জুহর ব্রত' (বিষপানে) পালন করে একযোগে মৃত্যুবরণ করেছেন, অথবা তারা যখন দেখেন যে এ যুগে তাদের স্বজাতি মুসলমানেরা এই অত্যাচারী বহিরাগতদের নিজেদের 'জাতীয় বীর' বলে অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তখন তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, কি মনোভাব জাগ্রত হয়, তা আমরা একবারও ভেবে দেখতে চাই কি?

আমার আশংকা, এই নব্বুইয়ের দশকে জামায়াত ও শিবিরের নেতারা বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো উপকার ও হিতসাধন করছেন না। বরং সারা বাংলাদেশের জন্য তারা যে সর্বনাশ ডেকে আনছেন, তা আমরা এখনও উপলব্ধি করতে পারছি না।

পনর

অতীত থেকে আবার বর্তমানে ফিরে আসি।

ছয়ই জানুয়ারী বুধবারের সেই সকালে হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বারান্দায় বেরুতেই দেখি, কিছু চেনা অচেনা মুখের সঙ্গে নূরুল ইসলামও সেখানে বসে আছেন। তার পোশাকের পরিবর্তন হয়নি, সেই পাজামা পাঞ্জাবি, মুজিব কোট।

ইচ্ছে ছিল সকালে ঘুম থেকে উঠে ঢাকায় শীতের আকাশে সূর্যের রক্তিম বসন খসানো দেখবো। দেখবো, কেমন করে শীতের শিশির টুপটাপ ঝরতে থাকে গাছের সবুজ পাতা থেকে। শুনবো মোরগের ডাক, কাকের কা কা। দেখবো রাস্তার কলতলায় কলসী নিয়ে নারী পুরুষের ভিড়। শুনবো শিশুদের কলহাস্য, রাস্তায় ফেরিঅলার হাঁক। কতকাল এসব দেখি না, এসব চীৎকার শুনি না। কতকাল দেখি না আকাশে উড়ন্ত চিল, কালো ডানার। মনে মনে আবৃত্তি করিনি, 'ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল।' দেড় যুগেরও বেশি একটানা বিদেশে বাস করে এখন দেশে ফিরে এক কালের সেই অসহ্য কাকের চীৎকার, ফেরিঅলার হাঁক, রাস্তার ধুলো বালি, কলতলার ঝগড়া, রাস্তায় নগ্ন ও নোংরা শিশুদের ভিড় আমার কাছে বড় আপন মনে হল। মনে হল এইতো আমি আমার আপন ভুবনে আবার ফিরে এসেছি। ইচ্ছে হচ্ছিল গলা ছেড়ে দিয়ে গান গাই, 'বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও, ফিরায়োনা জননী...'

আমাকে আমার নিজের ভুবনে বেশিক্ষণ মগ্ন থাকতে দিলেন না নূরুল

ইসলাম। বললেন, কাল রাতে যখন বিদায় নেই, তখন কি কথা হয়েছিল মনে আছে আপনার? সকালে ঘুম থেকে উঠেই বত্রিশ নম্বরে যাবেন।

বত্রিশ নম্বর মানে বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর রাস্তার বাড়ি। শুনেছি, এই রাস্তার নম্বরটিও নাকি বদলানো হয়েছে কিম্বা হচ্ছে। বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডি নতুন নম্বর দ্বারা চিহ্নিত হবে, এটা ভাবতেও আমার মন মুষড়ে পড়ে। 'একুশে' বললে যেমন বাংলাদেশে একটি তারিখকেই বুঝায়—একুশে ফেব্রুয়ারী, তেমনি বত্রিশ নম্বর বললেও ঢাকার একটি রাস্তা, একটি বাড়িকেই বুঝায়। এটি একটি ঐতিহাসিক নম্বর। ধানমণ্ডির সকল রাস্তার নম্বর বদলানো হলেও ঐতিহাসিক কারণেই এই নম্বরটি বদলানো যায় না। বদলানো হবে অবিবেকী তাতার দস্যুর নিষ্ঠুরতার মতো। লন্ডনে সাতশ' বছর আগে স্পেনিয়ার্ড জলদস্যুরা এসে হ্যামস্টেড ভিলায় এক পানশালা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই পানশালাটি এখনো আছে। সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। লন্ডনে বেড়াতে এসে এই পানশালাতে গিয়ে একপাত্র মদ্য পান না করলে নাকি লন্ডনে বেড়ানো সার্থক এবং সফল কোনোটাই নয়। লন্ডনের রাস্তাঘাট উন্নয়নের সময় এই জরাজীর্ণ পানশালাটি ভেঙে রাস্তা চওড়া করার প্রস্তাব উঠেছিল। তাতে কেউ রাজি হয়নি। রাস্তা এখানে বেঁকে গেছে। সংকীর্ণ হয়েছে। তবু পানশালাটি রক্ষা করা হয়েছে। লন্ডনের মল এলাকায় একটি পুরনো এবং অভিজাত ক্লাব আছে। তাতে নিয়মিত আসতেন ডিউক অব ওয়েলিংটন। তিনি খোঁড়া ছিলেন। তাই ঘোড়া থেকে নামার সময় একটি পাথরের উপর পা রেখে মাটিতে নামতেন, তারপর ক্লাবে ঢুকতেন। এই পাথরাটি সযত্নে ক্লাব ঘরের সামনেই রাখা আছে। চলাচলের অসুবিধের নামে সারানো হয়নি।

পৃথিবীর সব দেশে মানুষ স্মৃতি সংরক্ষণ করে। আমরা ভাঙি। আমরা বাঙালীরা যেন আমাদের সব অতীত, ঐতিহ্য, স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলেই খুশি হই। আফ্রিকার উত্তর রোডেশিয়ার মানুষ তাদের শতাব্দী প্রাচীন জিম্বাবুয়ে নাম উদ্ধার করে আবার চালু করে, আর আমরা বাঙালীরা স্বাধীনতা ঘোষণার স্মৃতিপূত মাঠে স্বাধীনতার স্মৃতিফলক ভেঙে শিশু উদ্যান বানাই। যে বত্রিশ নম্বর ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচাইতে বড় ঘাঁটি, তার নম্বর বদলিয়ে অপরিচয়ের ধূসরতায় তাকে মুছে ফেলতে চাই। ব্যক্তি মুজিব অনেকের পছন্দের মানুষ না হতে পারেন, তার রাজনীতির সাথে অনেকে একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু তার জীবনের যে অংশ, তার সংগ্রামের যে পর্যায় দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে আমাদের জাতীয় সত্তা, স্বাধীনতা ও ইতিহাসের অংশ, তাকে আমরা মুছে ফেলতে চাই কিভাবে? তাহলে কি আমরা আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব, ঐতিহ্য ও ইতিহাসই মুছে ফেলার চেষ্টা করছি না? আমি মাঝে মাঝে লন্ডনের হাইগেটে কার্লমার্কসের সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত তার মূর্তিটি দেখতে যাই।

তার ডীন স্ট্রীট, ক্যানটিস টাউনের বাড়ি ঘুরে আসি। মার্কস্ মেমোরিয়ালে গিয়ে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখি। ধনতান্ত্রিক বৃটেন, তার রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সরকার কার্লমার্ক্সকে তাদের সবচাইতে বড় শত্রু বলে গণ্য করেছেন, এখনো করেন। কিন্তু বৃটেনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত মার্ক্সের স্মৃতিকে তারা মুছে ফেলেননি। ধরে রেখেছেন। সযত্নে রক্ষা করছেন। একজন শত্রুর প্রতিও যেখানে একটি সভ্য দেশ ও সরকারের এই মনোভাব, সেখানে আমরা আমাদের ইতিহাসের এই যুগের স্রস্টাকেই ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চাই। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, "ওরে ভাই কার নিন্দা করো তুমি, মাথা করো নত, এ আমার এ তোমার পাপ।"

নূরুল ইসলাম আমাকে বেশিক্ষণ আত্মমগ্ন থাকতে দিলেন না। বললেন, কই কথা বলছেন না যে? বত্রিশ নম্বরে যাবেন না? আপনার গাড়ি দরকার। তাই সেলিনা ও তার স্বামী গাড়ি নিয়ে এসেছেন।

সেলিনা মানে সেলিনা আখতার জাহান। নূরুল ইসলামের তাগাদায় তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। যারা দেখা করতে এসেছিলেন, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমাদের সঙ্গী হল আরও দু'টি শিশু। আমার শ্যালিকার মেয়ে শমি এবং ছেলে সাবেত। সাবেতের বয়স আট কি নয়, কিন্তু বাক্যে একেবারে মুজতবা আলি। গাড়িতে উঠেই বলে উঠল, খালু, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাবেন, সঙ্গে ফুল নেবেন না?

বললাম, নিশ্চয়ই নেবো। শুনেছি, ঢাকায় এখন অসংখ্য ফুলের দোকান। সকালে বিকেলে যখন তখন ফুল কিনতে পাওয়া যায়। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফুল কিনে নেব।

সেলিনা বললেন, আমরা একট ভালো ফুলের দোকান চিনি।

গাড়ির জানালার কাঁচ নামিয়ে বহুকাল পর ঢাকার চেনা পথঘাট দেখবো ভাবছিলাম। কিন্তু কিছুই চিনতে পারছিলাম না। রিপভ্যান উইংকলের মতো চারদিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে শুধু নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছিলাম, এই কি আমার দেশ? এই কি আমার স্বদেশ?

জানালার কাঁচ নামাতেই সাবেত হা হা করে উঠল, শিগ্‌গির কাঁচ নামান, শিগ্‌গির নামান।

ঃ কেন সাবেত?

সাবেত বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বলল, দেখছেন না, রাজ্যের ধুলো গাড়িতে ঢুকছে। আপনার এলার্জি দেখা দিতে পারে।

হেসে ফেললাম, এই শিশুর মুখে বিজ্ঞ, বয়স্কের মতো সাবধান বাণী শুনে।

সাবেত বলল, হাসবেন না। আপনার আরও ভয় আছে?

ঃ সে ভয়টা কিসের?

ঃ আপনাকে দেখেই বুঝা যায়, আপনি নতুন এসেছেন ঢাকায়। রাস্তায় ভিখিরি দেখছেন? ওরা ঠিক আপনাকে চিনে ফেলবে। একবার যদি খোলা জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আপনাকে চেপে ধরে, তাহলে আপনি আজ আর এখান থেকে নড়তে পারবেন না।

এই আশংকাটির কথা আগে মনে পড়েনি। বুঝলাম, সাবেত শিশু হলেও অভিজ্ঞ। তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলাম। দেখলাম, রাস্তায় সত্যি সত্যি বেশ কিছু ভিখিরি ঘোরাফেরা করছে।

সাবেত এবার আরও বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলল, ঢাকার অবস্থা দেখেছেন? পৌরসভা থেকে এক ফোঁটা পানি ছিটানো হয় না রাস্তায়। মশার যন্ত্রণায় রাত্রে পড়তে বসতে পারি না। চারদিকে শুধু চুরি ডাকাতি খুন। এই জন্যেইতো আমি আম্মাকে রোজ বলি...

শমি এবার মুখে হাত চেপে খুক খুক করে হেসে উঠল।

সাবেত ফুঁসে উঠল, এই তুমি হাসবে না, ভালো হবে না বলছি।

আমি তাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, কি হল?

সাবেত বলল, দেখছেন না, সে আমাকে নিয়ে হাসছে। ওরা কেউ আমাকে দেখতে পারে না, আব্বা, আম্মা, শমি আপা কেউ না। তাই তো আমি আম্মাকে বলি, আমি যদি তোমাদের এতই ভার হয়ে থাকি, তাহলে শুধু লন্ডনের একটা টিকেট কেটে দাও। আমি খালুর কাছে চলে যাই। সেখানে গিয়েই লেখাপড়া করি।

ঢাকায় এসে এই প্রথম আমি শুনলাম, একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুর কণ্ঠেও দেশত্যাগের ইচ্ছার কথা। সাবেত এরপর কি বলেছে, তা আর আমার কানে ঢোকেনি। একমাস আমি ঢাকায় ছিলাম। সাবেতের চেয়ে বয়সে বড় প্রতিটি কিশোর ও যুবকের কণ্ঠে শুনেছি, এই দেশত্যাগের আকুল ইচ্ছার কথা। আমার বেকার শিক্ষিত ভাগ্নে এসে বলেছে, "মামা আরতো পারি না। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা কি করে সংসার চালাচ্ছেন আমি জানি। তার কষ্ট আর চোখে দেখতে পারি না। আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।" আমার এক দূর সম্পর্কের বোনের একমাত্র ছেলে; সুদর্শন, ফিল্মের নায়কের মতো চেহারা। এম এ পাশ করে ঘরে বসে আছে। দেখা করতে এসে হাত জড়িয়ে ধরল। বলল, "আপনার কাছে আমি একটা ভিক্ষা চাইছি। আমাকে বিলেতে কিম্বা আমেরিকায় যাবার একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার এম এ ডিগ্রীর কথা ভুলে যান। আমি লন্ডনে গিয়ে রেস্টুরেন্টের ওয়েটার হতে রাজি আছি, ধাঙ্গরের কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছি।" আমার এক

আত্মীয়ের মেয়ে। উচ্চ শিক্ষিত। বছর দুই হয় বিয়ে হয়েছে। কোলে একটি মেয়ে আছে। সেই মেয়েকে আয়ার কাছে রেখে চাকরি করতে যায়। তার স্বামীও উচ্চ শিক্ষিত। এক সময় ভালো চাকরি করতেন। এখন ছ'মাস ধরে বেকার। নিজের রাজনৈতিক মতও তার চাকরি পাওয়ার অন্তরায়। সরকারী প্রশাসনের সর্বত্র এখন চলছে দলীয়করণ। এই মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রথমেই বলল, চাচা, আপনি কি আমার স্বামীকে বিদেশে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

ঃ স্থায়ীভাবে, না অস্থায়ীভাবে? জিজ্ঞাসা করলাম।

ঃ স্থায়ীভাবে। এদেশে তার কোনো চাকরি বাকরি হবে না।

ঃ তোমার কি হবে? তুমিও কি চাকরি বাকরি ছেড়ে তার সঙ্গে যাবে?

ঃ না, আমি এখন যাব না। আগে সে যাক্।

ঃ তুমি অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্বামীকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

ঃ থাকতেই হবে। এটাই হচ্ছে জীবনের রিয়ালিটি চাচা। সারাদিন ঘরে বসে থেকে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সামান্য কথায় রেগে যায়। সারাক্ষণ আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি লেগে থাকে। আমি এই অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি চাই। দেশে ওর কিছু হবে না, বিদেশে চলে যাক্।

আমার এক চাচাতো ভাই। আমারই সমান বয়সী। আমি ঢাকায় এসেছি শুনে লঞ্চে চেপে গ্রাম থেকে শহরে এসে হাজির। এককালের অবস্থাপন্ন মানুষ। এখন অসহায়ের মতো আমার সামনে বসে পড়ে বললেন, চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে। খাওয়া-ই জোটাতে পারি না, স্কুল কলেজের খরচ জোটাবো কোথেকে? আচ্ছা ভাই, আমি তো এখনও চলাফেরা করতে পারি। আর বিলাতে শুনেছি, বুড়ো লোকেরাও কাজ করে। আমার কি বিলাতে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো না?

সবচাইতে বিস্মিত হয়েছি একদিনের জন্যে নিজের গ্রামে গিয়ে। এককালে আমাদের বাড়ি ছিল গ্রামের জমিদার বাড়ি। এই বাড়ির লাঠিয়াল ছিলেন আরব আলী সর্দার। ছেলেবেলায় আমাকেও কোলে পিঠে করেছেন। এবার গ্রামে গিয়ে শুনলাম, তিনি এখনো বেঁচে আছেন। বয়স নব্বুইয়ের কাছাকাছি। চোখে ভালো করে দেখেন না। লাঠি ভর দিয়ে কষ্টে হাঁটা চলা করেন। এই মানুষটি বেঁচে আছেন শুনে খুশি হলাম। ঠিক করলাম, তাকে দেখতে যাব।

কিন্তু আমি যাবার আগেই তিনি আমার কাছে এসে হাজির হলেন। এক হাতে লাঠি, অন্য হাত যুবক ছেলের কাঁধে রেখে বহু কষ্টে হেঁটে এসেছেন। তাড়াতাড়ি তাকে বসতে দিলাম। বললাম, আপনি এত কষ্ট করে এলেন কেন? আমিতো আপনার কাছে যেতাম।

আরব আলী বললেন, তোমার যদি সময় না হয় বাবা। শুনেছি, আজই তুমি ঢাকায় ফিরে যাবে। তাই ছেলেকে নিয়ে ছুটে এলাম। আমার এই ছেলেকে তুমি তার ছোট বেলায় দেখেছো।

আরব আলীর ছেলেকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে তার বাপের যুবা বয়সের প্রতিবিম্ব। তেমনি শক্ত সুঠাম চেহারা। আরব আলী বললেন, এই ছেলের কোনো আয় উপার্জন নেই। ঘরে বসে থাকতে থাকতে একদিন ডাকাত কিম্বা হাইজ্যাকার হয়ে যাবে। তখন তোমাদের সকলেরই লজ্জা। আমার আর কয়দিন? আজ আছি, কাল নেই। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। তুমি ওকে বিদেশে যাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও। পারলে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি তোমাকে ছোটবেলায় কোলে পিঠে চড়িয়ে বড়ো করেছি। তুমি আমার এই কথাটা রাখো বাবা। আমি তোমাকে দোয়া করবো। কবরে শুয়েও দোয়া করবো। তুমি আরও বড় হবে। তোমার মুখ আরও উজ্জ্বল হবে।

আজকাল সহজে আমার চোখে পানি আসে না। কিন্তু এই নব্বুই বছরের বৃদ্ধ আরব আলীর কথায় সেদিন আমার চোখে পানি এসেছিল। নিজের অসহায়ত্ব আমি মর্মে মর্মে সেদিন উপলব্ধি করেছি। দেশের মানুষের, আত্মীয়স্বজনের কত প্রত্যাশা আমার কাছে। কিন্তু তারা জানে না, তাদের প্রত্যাশা পূরণে আমি কত অক্ষম! কত অসহায়! বিলেতে এলেই যে সবলোক ধনী হয় না। প্রভাবশালী হয় না, এই সত্যটা কাউকে বোঝাতে পারি না। দেশে তবু ছিলাম সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। বিলেতে এসে যে ওয়ার্কি ক্লাশে নেমে এসেছি, অথবা উঠে এসেছি, এই রুঢ় বাস্তবটাও কেউ বুঝতে চান না অথবা পারেন না। তাছাড়া বিদেশে আসার কত হাঙ্গামা। আজকাল ইমিগ্রেশন আইন কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছে, রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেসন বাড়ছে। ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া বিদেশীদের চাকরি পাওয়ার উপায় নেই। তাছাড়া এই নিদারুণ অর্থনৈতিক মন্দার যুগে কোনো দেশই চায়না, অন্য দেশের বাড়তি বেকারের এক বিরাট সংখ্যার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। ফলে সেদিন শুধু আরব আলী সর্দার নয়, সকল বন্ধুবান্ধবের অনুরোধের সামনেই শুধু বিব্রতভাবে মাথা নেড়ে বলেছি. চেষ্টা করবো। এই আশ্বাস যে কত অসার, কত ফাঁকা, আমি তখনই তা জানতাম। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারিনি, যত সাধ আছে, সাধ্যি ততটা নেই।

বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেও চিঠি পাচ্ছি। পরিচিত এবং অপরিচিত লোকেরও। চিঠিতে সেই একই আর্তি, "আপনি এত নামকরা সাংবাদিক, লেখক, বিলাতে এতকাল আছেন, আমার ছেলের (অথবা ভাইয়ের কি ভাগ্নের) কি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না? আপনি এত মানুষের সুখদুঃখ নিয়ে লেখেন; আর আমাদের সুখদুঃখের কথা কি একবারও আপনার হৃদয় স্পর্শ করে না?'

সব চিঠিই হৃদয় স্পর্শ করে। সব দুঃখেই কাতর হই। সেই সঙ্গে আমি কত অসহায় সেই পরম সত্যটা উপলব্ধি করি। মাঝে মাঝে ভাবি, আমি যদি হ্যামিলনের বংশীবাদক হতাম। তাহলে আমার বাঁশিরও দরকার হতো না। কেবল যদি বলতাম, আমার পেছনে দাঁড়ালেই তোমরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশে যেতে পারবে, তাহলে বাংলাদেশের বারো কোটি লোকের মধ্যে দশ কোটি লোকই হয়তো আমার পেছনে কাতারবন্দি হতো।

আবার তন্ময়তা ভাঙল। সেলিনা বললো, গাফ্‌ফার ভাই, আমরা ফুলের দোকানে এসে গেছি।

ষোল

আমি যখন ঢাকায় থাকতাম, তখন ঢাকা ছিল ফুলের শহর। কিন্তু ফুল কেনার দোকান ছিল না। ফুল কিনতে হলে যেতে হতো একটা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে পুরনো হাইকোর্ট ভবনের সামনে। ফুল-গাছের চারা সংগ্রহের একটাই কেন্দ্র ছিল, কার্জন হলের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি বিভাগের ছোট্ট বাগানটি। রোজ গার্ডেনে তখন আর গোলাপ নেই। বলধা গার্ডেনের ফুলের বাগানও প্রায় বিনষ্ট। বিয়ে বা অন্য কোনো উৎসবে ফুলের দরকার হলে ওই পুরনো হাইকোর্ট ভবনের সামনে গিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়ানো ফুল বিক্রেতাদের কাছে দু'এক সপ্তাহ আগে অর্ডার দিতে হতো, অথবা চেনাজানা বন্ধুবান্ধবের ছোটখাট ফুলের বাগান থাকলে তার কাছে ধর্না দিতে হতো।

কিন্তু ঢাকা শহরটা ছিল ফুলে ফুলময়, শ্যামলে শ্যামল আর নীলিমায় নীল। সারা ফাল্গুন মাস জুড়ে যেন আগুনের রঙে লাল হয়ে যেত সারা রমনা জুড়ে কৃষ্ণচূড়ার ডালগুলো। শাদা ফুলের পাশাপাশি রক্তপলাশ ফুটতো থোকায় থোকায়। আর সেই রঙের সঙ্গে রঙ মেশানো শাড়ি পরে যখন তখনকার চামেলি হাউস (বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হল) থেকে দলে দলে ছাত্রী আসতেন এখনকার মেডিক্যাল কলেজ–তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনের দিকে, তখন সত্যি মনে হতো রমনায় বসন্তের বান ডেকেছে।

তখন আমি কবিতা লিখতাম (এখনও অবশ্য মাঝেমধ্যে লিখি)। মনে আছে, পল এলুয়ারের একটি কবিতা বাংলায় ভাবানুবাদ (ইংরেজি থেকে) করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম তখন এমনি এক বসন্তের বান ডাকা দিনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে গাছের ছায়ায়, ঘাসের উপর বসে।

"তোমার ঠোঁট যখন
লাল গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত হয়
তোমার শরীর ঘিরে থাকে
শরতের শিশির ভেজা —
ফুলের পাপড়ির মতো বেশবাস —
তোমার বুকে যখন বসন্তের উপত্যকার মতো
শিহরিত হয়, ছলকে পড়ে
দু'পাশের দুই পূর্ণ কুম্ভ চাঁদের
মায়াময় স্বর্ণাভ জ্যোৎস্না।
আমি জানি তখন আমার বিষাদমগ্ন
পৃথিবীতে
বসন্ত এসেছে। এবং তখন আমি
ভালোবাসার তরবারি হাতে
দস্যু হয়ে যেতে চাই।"

সত্তরের দশকে ঢাকা ছেড়েছি। নব্বুইয়ের দশকে সেই ঢাকায় ফিরে এসে দেখি সেই ফুলের শহর আর নেই। নেই সেই রমনীয় রমনা। সেই রক্তপলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার সারি নিহত। এক তাতার জেনারেলের নির্দয় ইচ্ছে হত্যা করেছে তাদের। তবু মন্দের ভালো। ঢাকায় এখন ফুলের দোকান সারি সারি কলকাতার মতোন। যখন তখন ফুল কিনতে পারা যায়। সকালের দিকে রাস্তাতেও দাঁড়িয়ে থাকে ফুলবিক্রেতা, ফুল আর ফুলের মালা হাতে।

সেলিনা আখতার জাহান একটা বড়ো ফুলের দোকানে নিয়ে গেল। বলল, কেবল বত্রিশ নম্বরের জন্য ফুল কিনবেন, না বনানী গোরস্তানের জন্যও?

বললাম, বনানীর জন্যও।

ফুল কেনা হলো। স্তবক, গুচ্ছ এবং মালাও। সাবেত এবং শমির তত্ত্বাবধানে তা রাখা হলো।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করবে, এই সময় নূরুল ইসলাম বলে উঠলেন, বত্রিশ নম্বরে যাওয়ার আগে মিন্টো রোড হয়ে গেলে ভালো হতো না? শেখ হাসিনা আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন।

বললাম, চলুন।

হাতঘড়ি দেখলাম, তখন সকাল সওয়া আটটার মতো। রাস্তার পাশে ছোট ছোট দোকানপাট বসতে শুরু করেছে। ঢাকার আকাশ তখনও ধুলোর আস্তরণের আড়ালে

ঢাকা পড়েনি। কিন্তু এরই মধ্যে রাস্তায় যানবাহনের ভিড়। যানজট প্রায় শুরু হয় হয়।

শেখ হাসিনাকে আমি দেখে আসছি তার সেই শৈশব থেকে। তাকে দেখেছি, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক পরিবারের মেয়ে হিসেবে, একজন বিজ্ঞানমনা অরাজনৈতিক ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে, একজন তরুণী মা হিসেবে; বাপ মা ভাই স্বজন হারানোর শোকে ভেঙে পড়া একজন নারী হিসেবে। কিন্তু এই শেখ হাসিনা একদিন সব হারানোর দুঃখ অতিক্রম করে, সকল ভয় ও শঙ্কাকে তুচ্ছ করে, বাংলাদেশের সবচাইতে বড় রাজনৈতিক দলটির নেতা হয়ে বসবেন এই সম্ভাবনাটি আমার মনে কোনো দিন উদয় হয়নি। রাজনৈতিক দলের নেতা হওয়ার পর তাকে আরো কাছে থেকে দেখার এবং জানার সুযোগ আমার হয়েছে।

শেখ হাসিনাকে কাছে থেকে দেখার এবং জানার সুযোগ হওয়াতেই তার রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে; শেখ মুজিব ছিলেন রাজনীতিতে মিশনারী এবং ভিশনারী দুইই। কিন্তু শেখ হাসিনা কেবল মিশনারী। ভিশনারী তিনি নন। দুইয়ের মিশ্রণে যে প্রয়োগবাদ (প্রাগমেটিজম) গড়ে ওঠে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এককালে তার অভাব ছিল না; বর্তমানে ডান এবং বাম দুই রাজনীতিতেই অস্থির পরিবর্তনশীলতার মুখে এই প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বড় বিরল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়ে হিসেবে রাজনীতিতে এবং সামজিক অবস্থানে শেখ হাসিনার যেমন সুবিধা রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রচুর অসুবিধাও। শেখ মুজিবের মেয়ে হিসেবে তার কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। মানুষ তার মধ্যে শেখ মুজিবের 'ক্যারিজমা' দেখতে চায়। পেতে চায় সেই সাহস, আপোষহীনতা ও দূরদর্শিতার পরিচয়। এই প্রত্যাশায় একটু ঘাটতি দেখা দিলেই তারা হাসিনার সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে, তার নেতৃত্ব সম্পর্কে হতাশ হয়। এর সঙ্গে শত্রুপক্ষের একটানা অপপ্রচারতো রয়েছেই।

আমারতো মনে হয়, শেখ মুজিবের চাইতেও তার মেয়ে শেখ হাসিনার রাজনীতির ব্যাপ্তি, জটিলতা এবং অসুবিধা অনেক বেশি। শেখ মুজিব ষাটের ও সত্তরের দশকের সীমাবদ্ধ জাতীয় রাজনীতির চত্বরেই বেশি বিচরণ করেছেন। তখন বাংলাদেশের চিহ্নিত জাতীয় শত্রু ছিল একটিই—বিদেশী সামরিক জুন্টা এবং তার দেশী অনুচরবৃন্দ। চিহ্নিত জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি প্রায় সকলের সমর্থন পেয়েছেন। মৌলবাদ অথবা মোল্লাবাদ তখন বিদেশী হানাদারশক্তির সহযোগী বিধায় জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত। প্রতিপক্ষের একটি ধারা হানাদার

শক্তির মিত্র চীনের অন্ধ আনুগত্যের ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জমান এবং অন্য ধারাটি তার জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী স্রোতের সঙ্গে মিলিত। ফলে সত্তরের নির্বাচনে জয়ী হতে শেখ মুজিবের বড় রকমের অসুবিধা হয়নি। তেমনি অসুবিধা হয়নি কারাপ্রকোষ্ঠে বসেও স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়ী হতে। কিন্তু এই নব্বুইয়ের দশকে কারাপ্রকোষ্ঠের বাইরে থেকেও শেখ হাসিনা ও তার দলের পক্ষে একটি নির্বাচন জেতাও সহজ নয়। কারণ, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সময়ের বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবল ও শক্তিশালী ধারাটি এখন প্রায় লুপ্ত। শত্রু এখন বিদেশী নয় এবং চিহ্নিতও নয়। শত্রু বহুরূপী এবং মুখোশধারী।

জাতীয় শত্রু, গণশত্রু এবং সহিংস ও প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদ এখন সংঘবদ্ধ। তারা একটি রণাঙ্গন নয়, বহু রণাঙ্গন তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন বেশে যুদ্ধ করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে অপ্রকাশ্য আসল সরকার (invisible Government)। তাদের পেছনে রয়েছে শক্তিশালী প্রেস মাফিয়া, বিদেশী অর্থ এবং অস্ত্র। রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র উৎখাত হওয়ার পর বাংলাদেশের বামপন্থীরা এখন আরও বিভ্রান্ত, বিভক্ত এবং বিপর্যস্ত। কিন্তু তাদেরও একটা অংশের বিরোধিতার মূল টার্গেট আওয়ামী লীগ। সম্ভবত তাদের ধারণা, দেশের রাজনীতির মূল মঞ্চ থেকে গণতন্ত্র ও সেক্যুলারিজমের সবচাইতে বড় দল হিসেবে আওয়ামী লীগের অবস্থানকে দুর্বল না করা পর্যন্ত তাদের সবল হওয়ার বা প্রধান দল হওয়ার কোনো উপায় নেই। তাদের এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এই দারুণ বিপদের দিনে গণতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য ও শক্তি বাড়ার বদলে শক্তি ও সংহতি বাড়ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিরোধী ঘাতক ও দালাল শিবিরের। আওয়ামী লীগের নাক কেটে তার যাত্রা ভঙ্গ করতে গিয়ে বাহুতে শক্তি যোগানো হচ্ছে সহিংস ও সশস্ত্র মৌলবাদী শিবিরের।

সবচাইতে মজার কথা, দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির সুস্থ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা এবং রাজনীতিকে কালো টাকা ও অস্ত্রের প্রভাব মুক্ত করার পদক্ষেপের নামে ডঃ কামাল হোসেন যে 'গণতান্ত্রিক ফোরাম' পকেটে নিয়ে নতুন দল গঠনে মাঠে নেমেছেন; এই দল গঠনেরও প্রধান ও আসল লক্ষ্য একটি নির্বাচিত স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটানো নয়, কিম্বা সন্ত্রাসী মৌলবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ঐক্যপ্রক্রিয়াকে জোরদার করা নয়। তার আসল টার্গেট আওয়ামী লীগ এবং হাসিনা-নেতৃত্ব। এই নতুন দল গঠনের পাঁয়তারার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাবকে খর্ব করা, হাসিনাকে জব্দ, শায়েস্তা করা এবং ভবিষ্যতের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটে ভাগ বসিয়ে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের সম্ভাবনা নস্যাৎ করা। প্রকারান্তরে বিএনপি-জামাত অক্ষশক্তিকেই ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য

করা। কোনো সভা সমিতিতে মুখ খুললেই ডঃ কামাল হোসেন প্রথমে সমালোচনা করেন, কখনো পরোক্ষ এবং কখনো প্রত্যক্ষভাবে আওয়ামী লীগের এবং এই দলের নেতৃত্বের, অর্থাৎ শেখ হাসিনার। কিন্তু কখনো তিনি বলেন না, আওয়ামী দল থেকেই গুণ্ডা হিসেবে বহিষ্কৃত অথবা অকর্মণ্যতা, নীতিহীনতা ও সুবিধাবাদিতার জন্য পরিত্যাক্ত লোকদের সঙ্গে নিয়ে কি করে দেশে সৎ ও দূর্নীতিমুক্ত রাজনীতির গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গড়ে তুলবেন?

ডঃ কামাল হোসেনের মতো একজন অক্সফোর্ড-ফেরত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইন ও রাজনীতিবিশারদ প্রবীণ নেতা যে শেখ হাসিনার মতো তার চাইতে অনেক কম বয়সী, কম অভিজ্ঞ এবং কম বিদ্যা ও কম ডিগ্রীধারী একজন দলনেতাকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বেছে নিয়েছেন, এখানেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বগুণ, শক্তি ও ম্যাচ্যুরিটির বড় প্রমাণ। প্রাচীন পারসিক উপকথায় আছে, বালক বীর সোহরাবের বীরত্ব ও শক্তিমত্তায় শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে যখন পারস্যের বীরশ্রেষ্ঠ রুস্তম তার সঙ্গে দৈহিক শক্তি পরীক্ষার জন্য সোহ্‌রাবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, তখন সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং রুস্তমের মুখোমুখি হয়ে সোহরাব বলেছিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হব কিনা জানি না; কিন্তু আপনি যে আমাকে এই শক্তি পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এবং মাঠে আমার মুখোমুখি হয়েছেন, তাতেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বয়সে বালক হলেও বীরত্বে আমি আপনার সমকক্ষ বীরশ্রেষ্ঠ।" শেখ হাসিনাও রাজনীতিতে ডঃ কামাল হোসেনের হঠকারী চ্যালেঞ্জের সামনে পিছু হটেন নি; বরং সাহসের সঙ্গে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেও তিনি ডঃ কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রথমেই গ্রহণ করেন নি, বা নিজে তার সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য উচ্চারণ করেননি। তিনি ডঃ কামাল হোসেনের জন্যই তার নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নেয়ার পথ উন্মুক্ত রেখেছেন। এখানেই রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও বিচারবুদ্ধিতে হাসিনার ম্যাচ্যুরিটির প্রমাণ মেলে। ডঃ কামাল হোসেন বয়স এবং ডিগ্রিতে হাসিনার চাইতে বড় হতে পারেন, কিন্তু রাজনৈতিক বিদ্যাবুদ্ধি এবং ম্যাচ্যুরিটিতে যে তার চাইতে নিজেকে বড় বলে প্রমাণ করতে পারেন নি, সাধারণ লোকের কাছে তা এখনো স্পষ্ট হয়ে ধরা না পড়লেও যতই দিন যাবে, ততই তা ধরা পড়তে থাকবে।

জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশে থাকার সময় অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছেন, "আপনি ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে দেখা করুন। তাকে দল না ছাড়ার জন্য বুঝিয়ে বলুন, অনুরোধ উপরোধ করুন। কারণ, ডঃ হোসেন আওয়ামী লীগের জন্য এসেট, তার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা ও মেধার প্রয়োজন আওয়ামী লীগের রয়েছে।

কিন্তু তিনি যদি দল ছেড়ে নতুন দল গঠন করেন, তাহলে সেই দলের জন্য তিনি হবে লায়াবিলিটি। কারণ. একটি দল চালানোর বা নেতৃত্বদানের ক্যারিজমা, ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও ডিসিসিভ্‌নেস তার মধ্যে নেই। সর্বোপরি তার সাহস বড় কম। অনবরত বিদেশ গমনও তার দলনেতা হওয়ার পথে বড় বাধা।"

ঢাকায় অবস্থানকালে আমি দু'দু'বার ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেছি। তার বাড়িতে গেছি। দেখা হয়নি। দু'দুবারই তিনি বিদেশে ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন পেট্রো-ডলার রাজনীতির সঙ্গে ডঃ কামাল হোসেনের একটা সুসম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কটি আইন ব্যবসায়ের নির্দোষ মোড়কে ঢাকা। তাই তাকে অনবরত বিদেশে ছুটতে হয়। এই রাজনীতির ইঙ্গিতেই তাকে আওয়ামী লীগ ভাঙা এবং তাদের ক্ষমতায় যাওয়া ঠেকিয়ে রাখার দুরূহ দায়িত্বটি গ্রহণ করতে হয়েছে। এই অভিযোগ কতটা সত্য, তা আমি জানি না। আমি যেটা বুঝি, তা হল ডঃ কামাল হোসেনের চরিত্রে ভারতের কামরাজ নাদার এবং বিলেতের ডঃ ডেভিড ওয়েনের চরিত্রের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যের বিস্ময়কর সংমিশ্রণ ঘটেছে। কেবল কামরাজের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতা তার মধ্যে নেই, কিন্তু ডেভিড ওয়েনের ক্ষমতালিপ্সা ও সুবিধাবাদিতা তার মধ্যে ষোলআনা রয়েছে।

ভারতে নেহরু–পরবর্তী কংগ্রেস রাজনীতিতে কামরাজ একসময় 'কিং মেকার' হয়ে উঠেছিলেন। পরে তার মধ্যে নিজেই কিং হওয়ার বাসনা আগেছিলো। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদটি দখল করার জন্য তিনি সুকৌশলে এগিয়ে ছিলেন। তার গায়ে 'নেহরু ডায়নাস্টির' ছাপ ছিল না। তাই প্রথমে ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়ে তিনি এই "অল্পবয়সী মেয়েটির" শক্তিধর অভিভাবক হবেন এবং পরে সুবিধামতো মেয়েটিটকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই প্রধানমন্ত্রীর পদে বসবেন, এমন একটা রাজনৈতিক ইচ্ছা ও কৌশল তার ছিল বলে ভারতের তৎকালীন রাজনীতির অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী যে তার সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী পদে বসে তার মাথাতেও টেক্কা মারতে পারবেন, এটা কামরাজ বুঝতে পারেননি। যখন বুঝতে পারলেন, তখন তিনি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে সুকৌশলে এবং সসম্মানে ধীরে ধীরে সরে গেছেন, ইন্দিরা রাজনীতির পথের কাঁটা হতে চাননি।

এক সময়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত আওয়ামী লীগে শেখ হাসিনাকে নেত্রীপদে বসানোর ব্যাপারে ডঃ কামাল হোসেনের ভূমিকা ছিল ভারতের কামরাজের মতো। হয়তো কামরাজের মতো তার মনেও গোপন বাসনা ছিল। কিন্তু বাসনা পূরণ না হওয়ায় কামরাজ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা হারান নি ব্যক্তিগত এগো (ego) ও আক্রোশ চরিতার্থ করতে চান নি। যে আক্রোশে অন্ধ হয়ে ডঃ কামাল হোসেন এখন বৃটেনের লেবার পার্টির এককালের প্রথম সারির নেতা ডঃ ডেভিড ওয়েনের পথ

অনুসরণ করছেন বলে আমি বহুদিন ধরে আশঙ্কা করছি। ডেভিড ওয়েন লেবার পার্টির কিছু দলছুট নেতার সঙ্গে মিলে নতুন দল (সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি বা এসডিপি) গঠন করেছিলেন, লিবারেল পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এলায়েন্সও গড়ে তুলেছিলেন। বৃটেনের রাজনীতিতে শক্তিশালী 'তৃতীয় ধারা' গড়ে তোলার দম্ভও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বৃটেনের রাজনীতিতে 'তৃতীয় ধারা' গড়ে তোলা দূরের কথা, তিনি তার দলের অস্তিত্ব এবং নিজের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। যা পেরেছেন, তা হল লেবার পার্টিকে ভেঙে, তার ভোটে ভাগ বসিয়ে তিনটি নির্বাচনে লেবার পার্টির নির্বাচন জেতা নস্যাৎ করা এবং টোরি দলকে প্রায় দেড়যুগের কাছাকাছি ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করা। এর পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। নিজের দল লুপ্ত হওয়ার পর কথা উঠেছিল, তিনি টোরি দলেই যোগ দেবেন। কিন্তু টোরি সরকার বুদ্ধিমান। তারা বড় চাকরি দিয়ে ডঃ ডেভিড ওয়েনকে বিদেশে পাঠিয়েছেন।

বাংলাদেশের ছোট ছোট নামসর্বস্ব বামপন্থী দলের কোনো কোনোটি ডঃ কামাল হোসেনের ছাতার তলে মাথা গুঁজে বাঁচতে চান। তার অর্থ আমি বুঝি। শুধু বুঝতে পারি না, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশের (সিপিবি) মতো একটি ঐতিহ্যবাহী বড় দল একই নাম রেখে ভাগ হওয়ার পর, দলের একটি ভাগ কি করে ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে যূথবদ্ধ হতে চান এবং কার্ল মার্কসের বদলে কামাল হোসেনের মধ্যে নতুন নীতি ও নেতৃত্বের সন্ধান পান? সেই পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সিপিবি'র ভূমিকা সম্পর্কে কেউ কেউ তর্ক তুলতে পারেন, কিন্তু একথা তর্কাতীত যে, দেশের রাজনীতিকে ফিউডাল ধর্মাচ্ছন্নতা থেকে গণতান্ত্রিক ও সেক্যুলার চেতনায় মোড় ফেরানো, সেক্যুলার গণসংস্কৃতির চেতনায় তার মানসকে উজ্জীবিত করায়, সর্বোপরি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এই দলের ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। পাকিস্তান আমলের প্রায় অধিকাংশ সময়ে সরকারী নিষেধাজ্ঞার দরুন প্রকাশ্য রাজনীতিতে থাকতে না পেরেও দেশের প্রকাশ্য রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে এই কমিউনিস্ট দল। দেশে সামন্তবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত চেতনা ও আন্দোলন গড়ে তুলেছে এই পার্টি। আজ সেই পার্টির একটা অংশ রাশিয়ায় বা পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা উৎখাত হওয়ায় কার্ল মার্কসের তত্ত্ব ও তাত্ত্বিকতা থেকে সরে আসতে পারেন, তাই বলে কার্ল মার্কসের বদলে বাংলাদেশের ডঃ কামাল হোসেনের মধ্যে নতুন নীতি ও নেতৃত্বের সম্ভাবনা খুঁজবেন, তার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির মোড় ফেরাতে চাইবেন, এটা আমার কাছে এক দারুণ বিস্ময়।

বাংলাদেশে একমাস ছিলাম। এই সময় দেশের এলিট ক্লাশ এবং সাধারণ

মানুষের মধ্যেও ডঃ কামাল হোসেনের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে যে মনোভাব লক্ষ্য করেছি, তাতে তার রাজনীতি ও নতুন দল গঠনের উদ্যোগ সম্পর্কে খুব একটা আশা পোষণের কোনো সঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাই না। এই একমাস আমি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা, কৌশল এবং স্ট্রাটেজিও দেশে বসে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছি। আমি আগেই বলেছি, তাকে আমার মনে হয়েছে মিশনারী। ভিশনারী তিনি এখনো হতে পারেন নি। কনভেনশনাল এবং পার্লামেন্টারি পাওয়ার পলিটিক্সের ছকেই তিনি এখন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রয়েছেন। পঁচাত্তরের প্রতিবিপ্লবের পর দেশে আরেকটি গণতান্ত্রিক এবং সেক্যুলার বিপ্লব ঘটানোর যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব আওয়ামী লীগের কাঁধে, তার সম্ভাবনা ও বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি কতটা সচেতন, তা আমি জানি না।

ছয়ই জানুয়ারী (১৯৯৩) বুধবার সকালে মিন্টো রোডে বসে শেখ হাসিনার সঙ্গে আলাপে তার নেতৃত্ব ও দায়িত্বের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকটিই আমি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। বুঝতে চেয়েছি, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আরেকটি সেক্যুলার গণতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়া কি সম্ভব?

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন নিঃসন্দেহে এই বিপ্লবের পথে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। এই বিপ্লবের সামগ্রিক ও সম্মিলিত রূপরেখা নয়।

সতেরো

দীর্ঘ সতেরো বছর পর জানুয়ারী মাসের এক সকালে আবার ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, দীর্ঘকাল পর বঙ্গবন্ধুবিহীন এই বাড়ি দেখে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে যাব। তা হলাম না। কিন্তু স্মৃতির কুহেলি ধীরে ধীরে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলো। এই সেই বাড়ি—যে বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়েছেন।

এই সেই বাড়ি—যে বাড়ি থেকে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রথম অঘোষিত স্বাধীন সরকার দেশ পরিচালনা করেছেন।

এই সেই বাড়ি—যে বাড়ি ছিল বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান দূর্গ।

এই সেই বাড়ি—যে বাড়িতে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল নক্শা প্রণীত হয়েছে এবং সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে।

এই সেই বাড়ি—যে বাড়ি থেকে বাংলার স্বাধীনতার প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

টেলিবার্তা হয়ে প্রেরিত হয়েছে চট্টগ্রামে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে।

এই সেই বাড়ি—যে বাড়িতে নব্যবাংলার স্থপতি বাস করেছেন।

এই সেই বাড়ি—যে বাড়িতে বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখার জন্য, তার কথা শোনার জন্য বার বার উত্তাল জনসমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে।

এই সেই বাড়ি—যে বাড়িতে দেশ-বিদেশের বড় বড় নেতারা এসেছেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের জন্য।

এই সেই বাড়ি—যে বাড়িতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী প্রথম গুলিবর্ষণ শুরু করে। শহীদ হন এই বাড়ির রাস্তায় প্রহরারত বাংলার নওজোয়ান কয়েকজন পুলিশ।

এই সেই বাড়ি—যে বাড়িতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাত্রে হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে, তারপর তাঁকে স্থানান্তর করে বাংলার মাটি থেকে বহুদূরে মিয়াওয়ালি জেলে।

এই সেই বাড়ি—যে বাড়িতে বসে উদ্ভাবিত, পরিকল্পিত ও আলোচিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান। তৈরি করা হয়েছে শোষিতের গণতন্ত্রের রূপকল্প। নেয়া হয়েছে দ্বিতীয় বিপ্লব অনুষ্ঠানের কর্মসূচী।

এই সেই বাড়ি—যে বাড়িতে বাংলাদেশের এ শতকের ইতিহাসের সবচাইতে মর্মন্তুদ ট্রাজেডি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাত্রে এই বাড়িতেই দেশদ্রোহী বর্বর ঘাতকের দল সপরিবারে হত্যা করে স্বাধীন বাংলার স্থপতিকে। স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও চেতনার দৃপ্ত দীপশিখাগুলো নেভানোর পালা শুরু সেই অভিশপ্ত রাতটি থেকেই।

স্মৃতির কুহেলির পর্দায় বারবার ফুটে উঠছিল নানা ছবি। টুকরো টুকরো ছবি। ওইতো সেই বারান্দা, যে বারান্দায় বঙ্গবন্ধু পাইপ ঠোঁটে বেতের চেয়ারে ঘরোয়া সমাবেশে বসতেন। ওইতো তাঁর সেই প্রিয় লাইব্রেরি কক্ষটি, যে কক্ষে তিনি অবসর সময়ে পড়াশোনা করতেন। কতদিন ওই কক্ষে বসে তিনি আমাকে দিয়েছেন তার বিবৃতির খসড়ার অথবা আত্মজীবনীর ডিকটেসান। মধ্যপ্রাচ্য থেকে যে সোনালী কারুকার্যখচিত কোরান শরীফটি তিনি উপহার পেয়েছিলেন, সেটি আজও সেখানে যত্ন করে রাখা। ওই লাইব্রেরি কক্ষের দেয়ালেও গুলির দাগ। ড্রয়িং রুমটি এলোমেলো। দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ির নীচে, যে ঘরে শেখ শহিদুল ইসলাম থাকতেন, তার দেওয়ালেও গুলির চিহ্ন।

আচ্ছন্নের মতো দোতলার সিঁড়িতে পা রাখলাম। সঙ্গে নূরুল ইসলাম, সেলিনা আখতার জাহান, তার স্বামী, শমি এবং সাবেত। কয়েক ধাপ উঠলেই সিঁড়িতে

রক্তের চাপ চাপ দাগ। শুকিয়ে ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে। সিঁড়ির দেয়ালেও গুলি এবং রক্তের দাগ। কার রক্ত? বঙ্গবন্ধুর? তাঁর পত্নীর? কামাল, জামালের? তাদের দুই নববধুর? শেখ নাসেরের? নাকি শিশু রাসেলের? নাকি সকলেরই সম্মিলিত, সংমিশ্রিত রক্তস্রোত? বাংলার ত্রিশ লাখ শহীদ মুক্তিযোদ্ধার রক্তের সঙ্গে যে রক্ত মিশে গেছে।

সিঁড়ির এই রক্তের দাগ কাঁচ দিয়ে আবৃত। বঙ্গবন্ধুর লাশ যেখানে পড়েছিল, সে স্থানটিও চিহ্নিত এবং আবৃত। মনে পড়ল, সতেরো বছর আগে, লন্ডনে ফেরার সময় এ বাড়িতে যেদিন শেষবারের মতো এসেছিলাম, বঙ্গবন্ধু আমাকে তেতলার ছাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছাদে সারি সারি টবে নিজে মরিচের চাষ করেছেন দেখালেন। বললেন, আমি সারাদেশে সবুজ বিপ্লব ছড়াতে চাই। তাই নিজের বাড়িতে নিজের হাতে মরিচের চাষ শুরু করেছি। আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে বলবো, যার যতটুকু পতিত জায়গা আছে, তাতে যা সম্ভব, পেঁপে, লাউ, কুমড়ো, শশা, মরিচ চাষ করুন। দেখবেন আপনাদের অনেক অভাব দূর হবে। সবুজ বিপ্লব ছাড়া বাংলার মানুষের অভাব ও দারিদ্র্য ঘুচবে না।

ছাদের উপর ঘুরতে ঘুরতে তিনি আরও বলেছিলেন, ছোটবেলায় আমি কি দেখেছি জানো? আমার বাবা টুংগিপাড়ায় নিজের জায়গা জমিতে তো গাছ লাগাতেনই, আবার অন্যের জায়গায়, সরকারী রাস্তার দু'পাশে আম, জাম, কাঁঠাল গাছের চারা লাগাতেন। বলতেন, এগুলো বড় হলে মানুষ এর ফল খাবে, পথিকেরা এর ছায়া পাবে। আর সময়মতো মওসুমের বৃষ্টি হবে।

বঙ্গবন্ধু আরও বললেন, আমাদের দেশে তাই আগে ফলমূল, তরিতরকারির অভাব ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমাদের এই স্বনির্ভর গ্রাম ভেঙে গেছে। গ্রামের অর্থনীতি ধ্বংস হয়েছে। মানুষ পাগলের মতো ছুটছে জীবিকার ধান্ধায় শহরের দিকে। গ্রামে এখন কেউ আর নিজের জমিতেও গাছপালা লাগায় না। পুকুরে মাছের চাষ করে না। তাই গ্রামের ঘরে ঘরে এখন অভাব, দারিদ্র্য। মওসুমী বৃষ্টিপাত কমে গেছে। কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো অতিবৃষ্টি। এই অবস্থা বদলাতে হবে চৌধুরী। মানুষকে আবার গ্রামমুখি করতে হবে, স্বনির্ভর গ্রামীন অর্থনীতি চাঙা করে তুলতে হবে। গ্রামের মানুষ যাতে রাত্রে শান্তিতে ঘুমাতে পারে, রোগে চিকিৎসা পায়, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখানোর সুযোগ পায়, কৃষি পণ্যের ন্যায্য দাম পায়, সরকারকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থা করা গেলে দেশের নব্বুই ভাগ লোক বাঁচবে। দেশ বাঁচবে। নইলে বাংলাদেশের সামান্য কয়েকটা শহরের মানুষকে রেশনে সস্তায় চাল, চিনি দিয়ে খুশি রেখে, সরকারী আমলাদের ক্ষমতা আর বেতন বাড়িয়েশহরের রাজপথে টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে বৃক্ষরোপন উৎসব করে দেশ বাঁচানো যাবে না।

আমরা ছাদ থেকে চিলেকোঠায় এসে বসলাম। বঙ্গবন্ধু বললেন, চৌধুরী, আমাকে ভুল বুঝো না। আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য, একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা নয়; বরং পশ্চিমা গণতন্ত্রের ভড়ংয়ে যুগ যুগ ধরে এদেশে শহরবাসী আমলা পৈলা, ব্যবসায়ী, ফড়িয়া, উকিল, মোক্তার, সামরিক কর্মচারী, পুলিশ, রাজনীতিক, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতি একদল শিক্ষিত মানুষের মাধ্যমে যে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চলছে, তার ভিত্তি ও কাঠামো ভাঙা। তা ভাঙতে না পারলে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না। তোমাদের শেখ মুজিবও সেই পরিবর্তন আনতে পারবে না। তখন এই স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে।

বঙ্গবন্ধুকে সেদিন একটু আবেগতাড়িত মনে হচ্ছিল। বললেন, আমি দেশের মানুষের হাতে, গ্রামের মানুষের হাতে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন ও ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দিয়ে যেতে চাই। আমি বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করেছি। এখন দেশের একশ্রেণীর শহরবাসী শিক্ষিত লোক ও এলিট ক্লাসের শাসন ও শোষণ থেকেও বাংলার চাষী মজুর সাধারণ মানুষকে মুক্ত করতে চাই। তাই জেলায় জেলায় নির্বাচিত গভর্ণরের ব্যবস্থা করেছি। আইয়ুবের তথাকথিত বেসিক ডেমোক্রাসির মতো সিও ডেভ (সার্কেল অফিসার, ডেভলপমেন্ট) ও আমলাদের হাতে আসল ক্ষমতা দেইনি। এই ক্ষমতা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি।

বঙ্গবন্ধু আবার পাইপ ধরালেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, এবার যে পদক্ষেপ নিয়েছি, তা পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চাইতে অনেক বেশি বিপজ্জনক। কয়েকশ' বছরের পুরনো পচা শাসন ও শোষণের ব্যবস্থা ভাঙার কাজে হাত দিয়েছি। কায়েমী স্বার্থের আসল ভিত্তি ভাঙার ব্যবস্থা করেছি। তারা চুপ থাকবে ভেবেছো? তারা কেউ খুশি নয়। আমলাতন্ত্র থেকে শুরু করে এতদিনের সুবিধাভোগী তোমাদের শহুরে শিক্ষিত শ্রেণীর বারোআনা মানুষ আমার উপর খুশি নয়। তারা মনে মনে গর্জাচ্ছে। সুযোগ পেলেই গোখরা সাপের মতো ছোবল মারবে। চৌধুরী, তোমার হাতে কলম আছে। তাই তোমাকে বলছি, এখনো সময় আছে। তোমরা যারা বিবেকবান সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সৎ শিক্ষিত লোক, তারা এক হও। যে আঘাত আসছে, সে সম্পর্কে সচেতন হও, সাবধান হও। নইলে আমার কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমারতো পাকিস্তানী কারাগারেই মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। তাই বলছি, আমার যা হওয়ার হোক। তোমরা বাঁচো। দেশটাকে বাঁচাও। দেশের মানুষকে বাঁচাও। কয়েক লক্ষ লোক রক্ত দিয়ে যে স্বাধীনতা এনেছে, সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা কর।

বঙ্গবন্ধু হয়তো আরও কিছু বলতেন। এমন সময় খবর এলো, টাঙ্গাইল থেকে

কাদের সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছেন। কাদের সিদ্দিকীর তখন টাঙ্গাইলের গভর্ণর হওয়ার কথা চলছে। বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমাদের টাইগার এসেছে। চলো নীচে যাই।

বললাম, আমি আজ আপনার কাছে বিদায় চাই। পরশু আমার লন্ডনের ফ্লাইট। আগামীকাল নতুন গণভবনে এসে একবার দেখা করে যাব।

বঙ্গবন্ধু পাইপে টান দিয়ে বললেন, অবশ্যই এসো। নইলে আর দেখা নাও হতে পারে।

বলেই তিনি রহস্যময় হাসি হাসলেন। ভাবলাম, তিনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। সেদিন ভাবতেও পারিনি, এটা ঠাট্টা নয়। এটা তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসা প্রাচীন গ্রীসের অরাকল (oracle)।

দোতলা থেকে নেমে আসার সিঁড়ির যে ধাপটিতে এখন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিজনের রক্ত শুকিয়ে ফ্যাকাসে রঙ ধারণ করে আছে, সতেরো বছর আগে সেই রাতে সেখানে এসে দাঁড়াতেই দেখি বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী উপরের দিকে উঠে আসছেন। আমাকে দেখে বললেন, এ কি ভাই, চলে যাচ্ছেন যে, চা খাবেন না?

বললাম, না ভাবী। আজ যাই। লন্ডন থেকে ফিরে এসে আরেকদিন আপনার হাতের চা খাবো।

তিনি বললেন, এটা একটা কথা হল। লন্ডনের হাসপাতালে বৌ কেমন আছে?

বৌ মানে আমার স্ত্রী। বললাম, এখন একটু ভালো।

ঃ তাকে আমার দোয়া দেবেন। আর বৌ সুস্থ হলেই তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসবেন।

বঙ্গবন্ধুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, দেখছেন না, এই বুড়াকে নিয়ে আমি আর একা পারছি না। সারাদিন শুধু কাজ কাজ আর রাজনীতি। বলছি, এতবড় অপারেশনটা হয়ে গেল, এখন একটু বিশ্রাম নাও। আমার কথা শুনলেতো। আপনারা এসে একটু বুঝান।

বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতে বললেন, এই বুড়াকে তোমাদের আর বেশিদিন সামলাতে হবে না।

ভাবী সেদিন তাঁর এই কথার কি অর্থ বুঝেছিলেন, তা আমি জানি না। তিনি আমাকে খোদা হাফেজ বলে উপরে উঠে গেলেন। বঙ্গবন্ধু নীচে নেমে এলেন।

সেই সিঁড়ি। সতেরো বছর আগে যেখানে দেখেছিলাম বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর স্ত্রীকে এক সঙ্গে দাঁড়াতে। সেখানে এখন তাদের রক্ত। রক্ত কি কথা বলে? মনে হল, সেই অস্পষ্ট শুকনো রক্তের দাগ যেন বলছে, কি ভাই, এতদিন পর ফিরে এলেন?

মনে হল, এ কণ্ঠ বেগম মুজিবের। জাতির জনকের স্ত্রীর।

জীবনে অনেক মহীয়সী মহিলার জীবনী পড়েছি। কিন্তু চাক্ষুষ যাদের দেখেছি, তাদের মধ্যে বেগম মুজিব অতুলনীয়। লেখাপড়া বেশি শেখেন নি, অতি অল্প বয়সে বৌ হয়ে বঙ্গবন্ধুর পরিবারে ঢুকেছেন। সেই থেকে তিনি শুধু শেখ মুজিবের সংসারের হাল ধরেন নি, পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর রাজনীতির হাল ধরেছেন। অনেকেই জানেন, শেখ মুজিব ছিলেন আপসহীন নেতা। বজ্রকঠিন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব : কিন্তু অনেকেই জানেন না, এই বজ্রের চৌদ্দআনা বারুদই ছিলেন বেগম মুজিব। তাঁর সমর্থন, সাহায্য ও ষোলআনা একাত্মতা ছাড়া শেখ মুজিব আপসহীন নেতা হতে পারতেন না। বঙ্গবন্ধু হতে পারতেন না। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এই নেতৃত্বকে সাহস, শক্তি এবং সকল দুঃখ ও নির্যাতন বরণের ধৈর্য ও প্রেরণা জুগিয়েছেন এই নারী। এই নারী যদি আত্মসর্বস্ব হতেন, সংসার সর্বস্ব হতেন, ছেলেমেয়ে, স্বামী নিয়ে সুখে ঘর সংসার করতে চাইতেন, তাহলে শেখ মুজিবের সাধ্য হতো না বছরের পর বছর কারাগারে থাকা, স্বাধীনতার সংগ্রামের দুঃসাহসী পথে যাত্রা করা, তাতে নেতৃত্ব দেয়া। বাংলার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নামে কোনো নেতার অভ্যুদয় হতো না; বাংলার আকাশ এত শীঘ্রই স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের আভায় রঙিন হয়ে উঠতো না।

এতক্ষণ পর আমার সম্বিত ফেরালেন নূরুল ইসলাম। বললেন, গাফ্‌ফার ভাই, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এত কি ভাবছেন? চলুন, আমাদেরতো বনানী গোরস্থানেও যেতে হবে।

মনে পড়ল, ছেলে, ছেলের বৌ অন্যান্য আত্মীয়স্বজনসহ বেগম মুজিব-বাংলার এই মহীয়সী নারী বনানীতে সমাহিত রয়েছেন।

আঠারো

জানুয়ারীর সেই শিশির ভেজা সকাল। সত্যি, ঢাকায় সেদিন আমার ছুটোছুটির অন্ত ছিল না। বঙ্গবন্ধুর বত্রিশ নম্বর বাড়ি থেকে ছুটতে হবে বনানী গোরস্থানে। সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের সম্মেলনে। সেখান থেকে নিজের অসুস্থ শয্যাশায়ী মাকে দেখতে কলাবাগানে। সন্ধ্যায় ঢু মারবো 'বাংলার বাণী' অফিসে। হাতে সময় কোথায়?

তবু বত্রিশ নম্বর বাড়ি থেকে আমার পা নড়ছিল না। নূরুল ইসলামের বারম্বার তাগাদা সত্ত্বেও না। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতে আমি তাঁর নিত্যদিনের সহচর ছিলাম বা খুবই কাছের লোক ছিলাম, এমন দাবি করি না। বরং কোনো কোনো সময় তাঁর রাজনৈতিক মত ও পথকে সমর্থন জানাতে না পেরে দূরে সরে গেছি, তাঁর তীব্র

সমালোচনাও করেছি লেখায়। সে জন্য তিনি কখনো কখনো বিরূপ হননি তা নয়, কিন্তু বত্রিশ নম্বর বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনো নষ্ট হয়নি। বঙ্গবন্ধুর সুদিনেও নয়, দুর্দিনেও নয়।

বত্রিশ নম্বরের প্রতিটি ইট কাঠই যেন আমার চেনা। কারণ, এই বাড়িটি আমার চোখের সামনে গড়ে উঠেছে। এই বাড়ির প্রাঙ্গণে যদি হেঁটে বেড়াই, একটু খুঁজে বেড়াই, তাহলে সম্ভবত এখনো বলে দিতে পারবো এই বাড়ির কোন্ গাছটি বঙ্গবন্ধু নিজে এবং কোন্ গাছটি বেগম মুজিব রোপন করেছেন। এই বাড়ির জমিটি প্রথমে বরাদ্দ হয়েছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে। পরে তাঁর নামে গুলশানেও একখণ্ড জমি বরাদ্দ হয়েছিল। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ধানমণ্ডির জমি তাঁর প্রিয় শিষ্য শেখ মুজিবকে দিয়ে দেন বাড়ি করার জন্য। গুলশানের জমি রাখা হয়েছিল তাঁর আরেক শিষ্য 'দৈনিক ইত্তেফাকের' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার তত্ত্বাবধানে।

এক মাসে বা এক বছরে নয়, বত্রিশ নম্বরের বাড়ি বহু বছরে ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে। একেক সময়ে টাকা জোগার হয়েছে, তারপর বাড়িটির কক্ষ ও তলা বাড়ানো হয়েছে। এই টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে আমার সঙ্গী নূরুল ইসলাম বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমাকে অনেক কথা বলেছেন; কিন্তু বত্রিশ নম্বর বাড়ির ব্যাপারে তার নিজের ছোট্ট ভূমিকাটির কথা কখনো বলেননি। তার এই ভূমিকার কথা আমি জেনেছি লন্ডনে বসে শেখ রেহানার কাছে।

নূরুল ইসলাম তার কৈশোর থেকেই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ভক্ত। বঙ্গবন্ধুও তাকে অপরিসীম স্নেহ করতেন। একবার নূরুল ইসলাম যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। যক্ষা তখন রাজরোগ। একবার হলে রোগীকে বাঁচানো কষ্ট। বঙ্গবন্ধু নিজে নূরুল ইসলামের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন; এমনকি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে ঢাকার মিটফোর্ডের যক্ষা ওয়ার্ডে ভর্তি করে দিলেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর নূরুল ইসলাম ভালো হয়ে এসে আবার বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সময় নূরুল ইসলামের প্রিয় হবি ছিল তখনকার দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় 'গেট এ ওয়ার্ড' খেলা। কোনোবারই তিনি পুরস্কার পান না। একবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। নূরুল ইসলাম এক সঙ্গে আট হাজার টাকা পেয়ে গেলেন। তখনকার দিনের আট হাজার টাকা, এখনকার আশি হাজার টাকার সমান। নূরুল ইসলাম টাকাটা নিয়ে সোজা বঙ্গবন্ধুর কাছে হাজির। বললেন, 'মুজিব ভাই, আপনার কাছে আমার একটি আবদার আছে।' বঙ্গবন্ধু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আবদারটা কি?' নূরুল ইসলাম বললেন, 'আমি আট হাজার টাকা পেয়েছি। আমার এখন টাকাটা লাগবে না। আপনার বাড়ির ফাউন্ডেশন এখনো তৈরি হয়নি। আরো টাকা দরকার। আপনি দয়া

করে আমার এই টাকাটা নিন। তারপর সময় হলে আমি আপনার কাছ থেকে আবার চেয়ে নেব।' বঙ্গবন্ধু কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমার এখন টাকার দরকার। বেশ, দে তোর টাকা। কিন্তু পরে সুদে আসলে ফেরত নিতে হবে।' নূরুল ইসলাম পরে সুদে আসলেই টাকাটা ফেরত পেয়েছিলেন। সুদ বলতে এখানে আসল সুদ নয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একবার এই বাড়ির ড্রয়িং রূমে বসে বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা আপনার খোকা(বঙ্গবন্ধুর ডাক নাম)যে এতবড় নেতা হবেন। বাংলাদেশ স্বাধীন করবেন এটা কি কখনো বুঝতে পেরেছিলেন? লুৎফর রহমান মাথা নেড়ে বললেন, না বাবা, এতটা বুঝতে পারিনি। তবে ওর ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি, আর দশটা ছেলের চাইতে সে স্বতন্ত্র। তার মধ্যে গোয়ার্তুমি ছিল। কিন্তু তা ভালো কাজের গোয়ার্তুমি। আমরা-আমি আর তার মা তার কোনো কাজে তাই বেশি বাধা দিতাম না।

একই সময়ে এই বাড়িতেই বঙ্গবন্ধুর মাকে ধরেছিলাম, আমাকে আপনার খোকার সম্পর্কে একটা গল্প বলুন। শেখ ফজলুল হক মনি আমার সঙ্গে ছিল। সে রসিকতা করে বলল, 'গাফ্ফার ভাই ভালো গল্প লেখেন। তুমি একটা ভালো গল্প শুনিয়ে দাও। উনি লিখবেন।' বঙ্গবন্ধুর মা তার কথায় কি বুঝলেন জানি না। ফোক্‌লা মুখে হেসে বললেন, 'কত গল্পইতো বাবা জানি। এখন বলতে গিয়ে কিছু মনে পড়ছে না। তবে খোকার আর বৌমার সম্পর্কে একটা ঘটনা বলি।' সোফার উপর পা এলিয়ে দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বলেছিলেন গল্পটি।

বঙ্গবন্ধু তখন কলকাতায় লেখাপড়া করছেন। সামনে তাঁর পরীক্ষা (কি পরীক্ষা মায়ের তা মনে নেই)। ছুটিতে টুঙ্গিপাড়ায় এসে মাকে বললেন, 'এবার আমি তোমাদের বৌকে সঙ্গে নিয়ে যাব। কলকাতায় হোস্টেলে আর থাকবো না। একটা বাসার ব্যবস্থা করেছি। বাবা লুৎফর রহমান সব শুনে বললেন, 'না, তা হবে না। সামনে ছেলের পরীক্ষা। এখন সঙ্গে বৌ নিয়ে গিয়ে হুড় হাঙ্গামা করে দরকার নেই। পরীক্ষা শেষ হলেতো সে গ্রামেই ফিরে আসবে। এখন বৌ শহরে নেয়ার দরকারটা কি?' কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আবদার, তিনি বৌ সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। মা মহাসমস্যায় পড়লেন। একদিকে স্বামীর আপত্তি, অন্যদিকে ছেলের জেদ। শেষ পর্যন্ত তিনি ছেলেকে বললেন, 'তুই কলকাতায় একাই চলে যা। আমি পরে একটা বুদ্ধি করে বৌকে তোর কাছে পাঠিয়ে দেব।' ছেলে বললেন, 'কি বুদ্ধি তুমি করবে মা?' মা বললেন, 'তা কি এখন আর তোকে বলবো? তুই নিশ্চিন্ত মনে কলকাতায় যা। আমি বৌকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।' বঙ্গবন্ধু কলকাতায় চলে গেলেন। দিন দশেক না যেতেই শেখ লুৎফর রহমানকে তার স্ত্রী বললেন, 'খোকার সামনে

পরীক্ষা। এদিকে পেটের অসুখতো কিছুতেই সারছে না।' লুৎফর রহমান উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কেন, 'চিকিৎসা করাচ্ছে না?' স্ত্রী বললেন, 'চিকিৎসা করিয়ে কি হবে? ক্রমাগত হোটেল আর মেসের খাওয়া খেলে কারো পেট ভালো থাকতে পারে?' লুৎফর রহমান অসহায়ভাবে বললেন, 'তাহলে কি করা যায়?' তার স্ত্রী বললেন, 'বৌকে খোকার কাছে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? অন্তত সে একটু বাছবিচার করে ছেলেকে খাওয়ালে তার পেটটা ভালো থাকবে, সুস্থ শরীরে পরীক্ষাটা দিতে পারবে।' লুৎফর রহমান স্ত্রীর বিবেচনা ও বুদ্ধির তারিফ করলেন। বললেন, 'তাই করো। বৌমাকে খোকার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

গল্প শেষ করে বঙ্গবন্ধুর মা ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন। আমি এবং মনিও হেসে ফেললাম। এই সময় বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শ্বাশুড়ির খোঁজ নিতে সেখানে এসে হাজির। আমাদের হাসতে দেখে বললেন, 'কি আপনারা খুব হাসছেন যে?' বললাম, 'ভাবী, আপনার শ্বাশুড়ির গল্প শুনে হাসছি। আপনাকে কিভাবে তিনি কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, সেই গল্প।' আমার কথা শুনে তার মুখে একটু লজ্জিত হাসি ফুটে উঠল। অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'বুড়ির পেটে পেটে অনেক বুদ্ধি!'

দোতলার সিঁড়ি থেকে নেমে শেখ আকরম হোসেন যে কক্ষটিতে থাকেন, সেই কক্ষে এসে বসলাম। শেখ আকরম এই পরিবারেরই লোক। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত পাঠকক্ষের পেছনেই এই কক্ষটি। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর শেখ হাসিনা স্বদেশে ফিরে এসে বত্রিশ নম্বরের এই কক্ষটিতেই কিছুদিন বাস টটট করেছেন। এই কক্ষটির সঙ্গেও আমার অনেক স্মৃতি জড়িত। ড্রয়িং রুমে ও লাইব্রেরী কক্ষে বেশি লোকের ভিড় হয়ে গেলে মাঝে মাঝে বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত কথা বলার থাকলে আমাকে টেনে নিয়ে আসতেন এই কক্ষটিতে অথবা সামনের গেস্টরুমে। একবার ছয়দফা আন্দোলনের প্রাক্কালে এই কক্ষে বসেই তিনি আমাকে বলেছেন, 'বাঙালি জাতিকে আমি মুক্ত করবোই। আইয়ুব-মোনায়েমের এই দুঃশাসন আর সহ্য হয় না। আমি ক্ষমতার রাজনীতি করছিনা। যদি বাঙালীকে মুক্ত করতে না পারি, তাহলে পরিবারের সকলকে নিয়ে আত্মাহুতি দেব।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর কথা রেখেছেন। দেশকে মুক্ত করার পরেও দেশের জন্য তিনি পরিবারের প্রায় সকলকে নিয়েই আত্মাহুতি দিয়েছেন।

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে বঙ্গবন্ধু নিউ মার্কেটের সামনে একটি স্টেশনারী দোকান দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই এই দোকানটির নাম রেখেছিলেন 'পূর্বাণী'। 'পূর্বাণী', 'পূর্বাচল' এই নামগুলোর প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ আকর্ষণ। আমি একবার ঢাকা থেকে' একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করতেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, পত্রিকাটির নাম রেখো 'পূর্বাণী'। আমার দ্বারা এই পত্রিকা বের করা আর

হয়নি। পরে 'ইত্তেফাকের' গ্রুপ প্রকাশনা থেকে 'পূর্বাণী' নামে একটি সিনে সাপ্তাহিক প্রকাশ করা হয়।

নিউ মার্কেটের 'পূর্বাণী' দোকানটি করার কারণ কি তা বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাদের মতো দেশে রাজনীতিকদের সৎ থাকার এবং সৎ রাজনীতি করার বড় বাধাই হচ্ছে আর্থিক সমস্যা। এই আর্থিক সমস্যায় আমাদের অনেক ভালো ভালো রাজনীতিক নষ্ট হয়ে গেলেন। শাসকশক্তি সবসময় রাজনীতিকদের মাথা কিনতে চান এবং কেনেন। আমি এই মাথা বেচতে চাই না। এই দোকানটি তাই দিয়েছি। দু'চার পয়সা যদি আসে, সমস্যা কিছুটা ঘুচবে।

'পূর্বাণী' দোকান চালানোর ভার বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন তাঁর এক অনুগামী বন্ধুকে। তার নাম কবি জুলফিকার। বাড়ি বরিশালে, আমাদেরই থানা মেহেন্দিগঞ্জের পাশে হিজলায়। কৈশোর থেকে কবি নজরুলের ভাবশিষ্য। তার যৌবনে দেখেছি, কবি নজরুলের মতোই বাবড়ি চুল এবং বেশবাস। কলকাতায় থাকাকালে নজরুলের সঙ্গেই ছায়ার মতো ঘুরতেন। কলকাতাতেই একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন, 'নওজোয়ান'। একটা যুব সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন, নাম নওজোয়ান পার্টি। ১৯৪৬ সালে বিভাগ পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে, মুসলিম লীগের সেই জয়জয়কারের দিনে এই জুলফিকার দুঃসাহসে ভর করে মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে তার নির্বাচনী এলাকায় নওজোয়ান পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন। তখন মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রতীক 'হ্যারিকেনের' বিপুল জনপ্রিয়তার যুগ। নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে নৌকার নাম তখন অখ্যাত অথবা উপেক্ষিত। ১৯৪৬ সালে তখনকার প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনে জুলফিকারই প্রথম নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেন নৌকা। আমি তখন স্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, জুলফিকারের বিরাট নির্বাচনী পোষ্টারে নৌকার ছবির নীচে ছাপানো ছিল কবি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত একটি কবিতার কয়েক পঙক্তি। "আবু বকর ওসমান ওমর আলী হায়দার/কাণ্ডারী এ তরীর নাই ওরে নাই ডর/কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা/দাড়ি মুখে সারিগান লা' শরিক আল্লা।"

সেই নির্বাচনে জুলফিকার জয়ী হন নি। যদিও বিদ্রোহী মনোভাব ও বিপ্লবী মতবাদের জন্য শিক্ষিত তরুণদের একাংশের মধ্যে তার বেশ জনপ্রিয়তা তখন ছিল। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম লীগের সেই জোয়ারের যুগে তিনি হ্যারিকেনের সামনে তার নৌকা টিকিয়ে রাখতে পারেননি। কলকাতা থেকে বাংলাভাগের পর ঢাকায় এসে পঞ্চাশের দশকে জুলফিকার হন শেখ মুজিবের অনুসারী। তাকে সম্পাদক করেই শেখ মুজিব পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা থেকে একটি সাপ্তৃটহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নাম 'নতুন দিন'।

যতদূর মনে পড়ে, ঢাকার পাটুয়াটুলির কাছাকাছি একটি গলিতে তখনকার ঢাকায় একটি নামকরা উন্নত প্রেসে 'নতুন দিন' ছাপা হতো। তখন মনোটাইপ কম্পোজের যুগ। ট্যাবলয়েড সাইজের 'নতুন দিন' ছিল ষোল পৃষ্ঠার কাগজ। কাগজটির বিশেষত্ব ছিল অধিকাংশ খবর ও খবর ভাষ্যের হেডিং নজরুলের কবিতার লাইন দিয়ে করা হতো। পত্রিকাটি অল্প দিনেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর এই পত্রিকাটির প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

এই 'নতুন দিন' পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু অল্প কিছুকাল সাংবাদিকতাও করেছেন। আমি তখন 'দৈনিক ইত্তিফাকে' কাজ করি। ইত্তেফাক তখনো নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয় নি। নয় নম্বর হাটখোলা রোডে প্যারামাউন্ট প্রেসের অফিসেই ছিল 'ইত্তেফাকের' অফিস। প্যারামাউন্ট প্রেসেই 'ইত্তেফাক' ছাপা হতো। একদিন এই অফিসে বঙ্গবন্ধু নিজে গাড়ি চালিয়ে এসে হাজির। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তখন অফিসেই ছিলেন। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, মনসুর ভাই (আবুল মনসুর আহমদ) এখন ঢাকায় নেই। মানিক ভাই বলছেন, লেখাটা নিয়ে তোমার সঙ্গে বসতে। আমি সারাদিন চুঙা ফুকিয়ে বক্তৃতা করি। কলম চর্চা কখনো করি নি। এখন শুরু করেছি। সুতরাং লেখাটা তুমি একবার দেখে দাও।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি নিয়ে লিখেছেন?

বঙ্গবন্ধু বললেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের টু ইকোনমি (দুই অর্থনীতি) নিয়ে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপক এ নিয়ে আগে কিছু কথাবার্তা বলেছেন। আমি এখন ফ্যাক্টস ফিগার দিয়ে এই লেখায় দেখিয়েছি, কেন পাকিস্তানের দুই অংশে এক অর্থনীতি চালু হতে পারে না এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রয়োজন। এটা আমার বিবৃতি নয়, একটি নিবন্ধ। 'নতুন দিনে' ধারাবাহিকভাবে ছাপা হবে।

বললাম, লেখাটা জুলফিকারকে দেখালে পারতেন।

বঙ্গবন্ধু বললেন, জুলফিকার কবি। তার মাথায় অর্থনীতির বিষয় টিষয় বেশি ঢুকবে না।

লেখাটা ধীরে সুস্থে দেখে দু'দিন পর ফেরত দেব বলে বঙ্গবন্ধুকে কথা দিলাম। বঙ্গবন্ধু আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, যুদ্ধ মাত্র শুরু করেছি। তোমাদের মতো আরও অনেক কমরেড চাই।

বঙ্গবন্ধুর সেই অর্থনীতি বিষয়ক লেখাটার অধিকাংশ কথাই এখন আর আমার মনে নেই। কিন্তু একটা বর্ণিত তথ্য এখনো আমার মনে আছে। বঙ্গবন্ধু

লিখেছিলেন, "পাকিস্তান হওয়ার পর মিঃ জিন্নার জীবিতকালেই একজন জার্মান অর্থনীতিবিদ (বঙ্গবন্ধু তার নামটাও উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু আমার এখন আর মনে নেই) পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে লিয়াকত সরকারকে তার জরিপের যে রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তান যেহেতু ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল এবং এখানে দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ আবাদযোগ্য জমি বেশি পাওয়া যাবে না, সেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়নের (industrialisation) উপর জোর দেয়া উচিৎ। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে লোকসংখ্যা কম, কিন্তু এলাকাটি বিরাট এবং আবাদ করার মতো জমিও পাওয়া যাবে প্রচুর। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার বদলে সেখানে কৃষি উন্নয়নের উপর জোর দেয়া দরকার। লিয়াকত সরকার জার্মান অর্থনীতিবিদের এই সুপারিশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানকেই দ্রুত শিল্পায়িত করার পদক্ষেপ নেন। পূর্ব পাকিস্তানে ভূমিসংস্কার ও কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণেও গড়িমসি শুরু করেন।"

বঙ্গবন্ধুর প্রবন্ধে, যতদুর মনে পড়ে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন, অর্থ ও কাঁচামাল পাচার, পাটশিল্প ধ্বংস করার পেছনে অবাঙালী ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত, কোরিয়া যুদ্ধের 'বুম পিরিয়ডে' ভারতের সঙ্গে মুদ্রামান হ্রাস নিয়ে হঠকারী ঝগড়া ও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বনাশ সাধন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা ছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষা ছিল সরল। 'দু'একটি বানান, দাড়ি, কমা পাল্টানো ছাড়া আমাকে তেমন হাত দিতে হয়নি।

সম্ভবত নতুন দিনেই প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ইত্তেফাকে' প্রকাশিত হয়েছিল তার সারমর্ম। দীর্ঘ কয়েক দশক পরে বঙ্গবন্ধুর বত্রিশ নম্বর বাড়িতে বসে মনে পড়ল সেই শালপ্রাংশুদেহ মানুষটির কথা। তাঁর বজ্রকণ্ঠের আওয়াজের কথা। তাঁর 'পূর্বাণী' দোকান, 'নতুন দিন' পত্রিকা, 'নতুন দিনের' সম্পাদক কবি জুলফিকারের কথা। মনে পড়ল বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বাতন্ত্র্য স্বনির্ভরতার প্রয়োজন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সেই নিবন্ধের কথা। সবই যেন আজ শুধু স্মৃতি, স্মৃতিপটে আঁকা ছবি। মনে মনে বললাম, 'নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।' বাংলার মানুষের এই ঠাঁই থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্বাসন নেই।

উনিশ

'একজন নারী ইচ্ছে করলে আমার জীবনটা পাল্টে দিতে পারতেন।"

আর তিনি যদি আপনার জীবন পাল্টে দিতেন, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসও সেদিন পাল্টে যেতো।

উপরের প্রথম কথাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের। দ্বিতীয় কথাটি আমার।

আমরা কথা বলছিলাম বত্রিশ ধানমণ্ডির বাসায়। বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরি কক্ষে বসে। বঙ্গবন্ধু তার আত্মজীবনীর ডিকটেসন দেয়ার ফাঁকে চা পানের বিরতির সময় কথা বলছিলেন। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের এক বিকেল। কয়েকদিন আগেই মাত্র বঙ্গবন্ধু আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে ঢাকায় ফিরে এসেছেন। বিমানে বসে কথা হচ্ছিল তার আত্মজীবনী লেখার। বিদেশে শেখ মুজিব তখন একটি নাম নয়। কিংবদন্তী। সকলেই তার সম্পর্কে জানতে চান। এমন কি বড় বড় রাষ্ট্রনায়কেরাও। ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধুর আলজিয়ার্সে যাওয়ার মুখে তাড়াহুড়া করে তাঁর উপর একটি ছোট্ট পুস্তিকা বের করেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা বিভাগ। মাত্র সাতদিনের মধ্যে এমন একটি সুন্দর ও শোভন বই বের করার সকল কৃতিত্ব তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয়ের তখনকার ভারপ্রাপ্ত সচিব বাহাউদ্দিন চৌধুরী' প্রকাশনা বিভাগের মহিউদ্দিন আহমদ (এখন প্রয়াত, 'রমনা' পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক) এবং শিল্পী কালাম মাহমুদের। বইটি লেখার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। সাংবাদিক হাসানুজ্জামান খান আমার লেখা ইংরেজিতে তরজমা করেন। ফলে ইংরেজি এবং বাংলা দু'ভাষাতেই বইটি বের হয়। আলজিয়ার্সে আমরা ইংরেজি বইটি নিয়ে যাই। কাম্পুচিয়ার (তখন কম্বোডিয়া) প্রিন্স সিংহানুক যখন আলজিয়ার্সে বঙ্গবন্ধুর ভিলায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন আমিই তাকে এই বইটি উপহার দেই। প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্টের ইয়াসির আরাফাতও সেবার আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে এসেছিলেন। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ইয়াসির আরাফাতকে বঙ্গবন্ধুর ছোট জীবনী পুস্তিকা উপহার দিতেই তিনি হেসে বলেছিলেন, 'এত ছোট বই। আমি বাঙালী শেখের উপর আরো বড় বই চাই।' জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি বড় বই দিয়ে কি করবেন? আরাফাত বলেছিলেন, 'হাইকেল (মিসরের দৈনিক 'আল আহরাম' পত্রিকার এককালের সম্পাদক এবং বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক। মোহাম্মদ হাইকেল মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুর নাসেরের জীবনী লেখকও) আমাকে বলেন, 'প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রামে নাসের আমার আদর্শ হওয়া উচিৎ। নাসের আরব জাতীয়তাবাদের উদগাতা হলেও ছিলেন একজন সামরিক অফিসার। সামরিক বাহিনীর শক্তির জোরে তিনি অপদার্থ রাজা ফারুককে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেন। পালেস্টাইনের মুক্তিসংগ্রামে সাফল্য অর্জন অতটা সহজ কাজ নয়। এদিক থেকে শেখ মুজিব আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারেন। তিনি বাঙালী জাতীয়তাবাদের উদগাতা। আবার একজন নিরস্ত্র রাজনীতিক হয়েও কেবল নিজের জনগণকে

সংঘবদ্ধ করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মতো একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে হটিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের জানা দরকার, ইসরাইলের মতো আমেরিকার মদদপুষ্ট একটি দুর্ধর্ষ শত্রুকে হটিয়ে কিভাবে নিজেদের দেশ মুক্ত করা এবং স্বাধীন ও সেক্যুলার প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। শেখ মুজিবের জীবন ও কর্মপন্থা সম্পর্কে তাই আরও বিশদভাবে আমাদের জানা দরকার।'

ঢাকায় ফেরার পথে বিমানে বসে বঙ্গবন্ধুকে জানিয়েছিলাম ইয়াসির আরাফাতের কথা। বঙ্গবন্ধু অবশ্য আলজিয়ার্সে যাওয়ার আগে থেকেই আত্মজীবনী লেখার কথা ভাবছিলেন। বলেছিলেন, "ওরা আমাকে সময় দেবেনা (ওরা বলতে তিনি একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং তাদের ভেতরের ও বাইরের সাহায্যদাতাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন)। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেখা শুরু করা দরকার। ঠিক আমার আত্মজীবনী নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন ও সংগ্রামের একটা সঠিক ইতিহাস। তাতে আমার লক্ষ্য, আদর্শ ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কথাও বলে যেতে চাই। নইলে ওদের ষড়যন্ত্র যদি সফল হয়, তাহলে ইতিহাস বিকৃতির পালা শুরু হবে। আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষকে ভুল বোঝানো শুরু হবে।"

ওই সেপ্টেম্বর (১৯৭৩) মাসেই আরম্ভ হয়েছিল এই আত্মজীবনী লেখা। এই লেখার কাজে বঙ্গবন্ধুকে সাহায্যকারী ছিলাম আমরা মাত্র দু'জন। আমি এবং তোয়াব খান। কখনো পুরনো গণভবনে দুপুরের খাওয়ার পর, কখনো বত্রিশ নম্বরের লাইব্রেরি কক্ষে বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন ঘণ্টা দুই ডিকটেসন দিতেন। গণভবনে হলে তোয়াব আমার সঙ্গে ডিকটেশন গ্রহণে যোগ দিতেন। বত্রিশ নম্বরে হলে আমাকে একাই বঙ্গবন্ধুর ডিকটেসন নিতে হতো। বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি ছিল বঙ্গবন্ধুর। হাতের কাছে ডায়েরি নেই (নিয়মিত ডায়েরি তিনি লেখেননি)। তবু সন তারিখ, স্থান মিলিয়ে সকল ঘটনা নির্ভুলভাবে বলে যেতে পারতেন। পরে মিলিয়ে দেখেছি, তাঁর বলা সন তারিখ অভ্রান্ত একদিন তিনি রসিকতা করে আমাকে বললেন, চৌধুরী, তুমি ভাবছো আমার কোনো ডায়েরি নেই। কেবল স্মৃতি থেকে এসব কথা বলছি। তোমার ধারণা ঠিক নয়। আমার সারা জীবনের জীবন্ত ডায়েরি আছে। তুমি দেখতে চাও?

আমি কিছু বলার আগেই কলিং বেল টিপলেন। লোক আসতেই ভাবীকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ভাবী এসে দাঁড়ালেন। তাঁর স্ত্রী। বেগম ফজিলাতুন্নেসা। পান খেয়ে দুই ঠোঁট লাল। মাথায় কাপড় টানা। বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে দেখিয়ে বললেন, এই আমার জীবন্ত ডায়েরি। তাকে জিজ্ঞাসা কর। আমার চাইতেও নির্ভুল বিবরণ পাবে। আমার চাইতেও তার

স্মৃতিশক্তি ভালো। তোমাকে ডিকটেসন দেয়ার আগে এই জীবন্ত ডায়েরির সঙ্গে অনেক কথা মিলিয়ে নিয়ে তবে এখানে আসি।

লেখার ফাঁকে ফাঁকে ভাবীকে ছাড়াও বঙ্গবন্ধু আরও একজনকে ডাকতেন। তিনি নূরুদ্দিন। গ্রীন এন্ড হোয়াইটের (একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) নূরুদ্দিন নামে পরে বেশি পরিচিত হয়েছেন। নূরুদ্দিন এককালের ডাকসাইটে ছাত্রনেতা ছিলেন। কলেজ জীবনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন তার সহকর্মী ও বন্ধু। এই বন্ধুত্বে কখনো চিড় ধরে নি।

গণভবনে (পুরনো) নয়, বত্রিশ নম্বরে বসে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর ডিকটেসন নেওয়া আমি পছন্দ করতাম। দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রামের সময়টাই ছিল বঙ্গবন্ধুর ডিকটেসন দেওয়ার প্রাত্যহিক টাইম। কিন্তু বিশ্রাম তাঁর কপালে ছিল না। ওই বিশ্রামের সময়েও গণভবনে তাঁর শয়নকক্ষে এসে লোকজন ঢুকতেন। ফলে আমার শ্রুত লিখনের কাজে প্রায়ই বাধা পড়তো। দুপুরের এই সময়টিতে কখনো এসে হাজির হতেন জেনারেল ওসমানী, কখনো কোনো যুব ছাত্রনেতা, আসতেন মোহাম্মদ মনসুর আলী ও ফনিভূষণ মজুমদার এবং আরো অনেকে। প্রায়ই আসতেন কালো চশমায় চোখ ঢেকে জেনারেল জিয়াউর রহমান (তখন সম্ভবত মেজর জেনারেল হন নি)। মাঝে মাঝে আমাকে একান্তে পেলে তিনি বলতেন, "শুনেছি, বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনী লিখছেন। আপনি সাহায্য করছেন। তাঁকে দয়া করে আমার কথাটা মনে করিয়ে দেবেন। বলবেন, চাটগাঁ বেতারে আমিই তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলাম। আমার কথাটা বঙ্গবন্ধু যেন তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন।"

কয়েকবার অনুরুদ্ধ হয়ে আমি একদিন তার উপর ক্ষেপে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, দেখুন জিয়া সাহেব, এই আত্মজীবনী আমার নয়, বঙ্গবন্ধুর। তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন, কার নাম তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করবেন, কার নাম করবেন না। আপনি যদি নিজের নাম সেখানে দেখতে চান, তাহলে নিজেই বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধটা জানান না কেন?

আমার জবাব শুনে জিয়াউর রহমানের কারো চেহারা আরও কালো বর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

বত্রিশ নম্বরে বসে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর ডিকটেসন নেওয়ার ব্যাপারে আমার বেশি আগ্রহের আরও কারণ ছিল। বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বল্পাহারী। গণভবনে লেখার ফাঁকে ফাঁকে একবার কি দু'বার তাঁর জন্য চা আসতো। চায়ের সঙ্গে বিস্কিট ফিস্কিট বড় একটা আসতো না। কিন্তু বত্রিশ নম্বরে হলে ভাবী প্রায়ই চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেন। তিনি জানতেন আমি পেটুক। তাই বঙ্গবন্ধুর জন্য শুধু চা এলেও আমার জন্য সঙ্গে থাকতো তার হাতে বানানো মিষ্টি, বিস্কিট, কখনো একটু পুডিং বা এক টুকরো কেক। একদিন বত্রিশ নম্বরের এই লাইব্রেরি কক্ষে বসেই বঙ্গবন্ধু ভাবীকে দেখিয়ে

বলেছিলেন, "একজন নারী ইচ্ছে করলে আমার জীবনটা পাল্টে দিতে পারতেন।" আর জবাবে আমি বলেছিলাম, তিনি যদি আপনার জীবন পাল্টে দিতেন, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসও সেদিন পাল্টে যেতো।

আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে একদিন যেমন শেখ মুজিবের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে, তেমনি হবে মুজিব-পত্নী বেগম ফজিলাতুন্নেসারও। তাকে ছাড়া বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস রবে অসম্পূর্ণ। বলতে গেলে একেবারে শৈশবে, বিয়ে হওয়ার বয়স হওয়ার বহু আগে তিনি শেখ মুজিবের সহধর্মিনী হয়েছিলেন। বেশি লেখাপড়া না করা সত্ত্বেও তিনি প্রমাণ করেছিলেন, শেখ মুজিবের তিনি যোগ্য সহকর্মী এবং সহযোদ্ধাও। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধের মাঠেই তারা এক সঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

বেগম মুজিব চাইলে একজন সাধারণ ধনী গৃহবধু হতে পারতেন। সুখ শান্তি সচ্ছলতার মধ্যে জীবন কাটাতে পারতেন। বাংলাদেশের অনেক ব্যক্তিত্বের কথা আমি জানি, যারা যৌবনে, বিবাহপূর্ব জীবনে ছিলেন অগ্নিপুরুষ। মনে হতো, কেউ কেউ সকল দুঃখ ও নির্যাতনের আগুনে পুড়ে এত নিরেট সোনা হয়ে গেছেন যে, সেই সোনায় আর ভেজাল মেশানো সম্ভব নয়। কিন্তু সুন্দরী গৃহবধুর গৃহে আগমনের কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেছে, অগ্নিপুরুষ ধীরে ধীরে রাজনীতির মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন; তার আগুন ছাই হয়ে যাচ্ছে। আগে যিনি ছিলেন ঘরের বাঁধনহীন বিপ্লবী রাজনীতিক; এখন তিনি সুবোধ শান্ত সংসারী মানুষ। ঘড়ি ধরে চলেন, মেপে কথা বলেন, কমরেড থেকে ক্রিমিনাল হয়েছেন, বিপ্লবী থেকে কালোবাজারী হয়েছেন, এমন অনেক রাজনীতিকের নাম আমি জানি। তারা সকলেই বৌয়ের চাপে বা ঘরের চাপে পরিবর্তিত হয়েছিলেন এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু তাদের অনেকের জীবনেই যে স্ত্রীর প্রভাব বেশি কার্যকর হয়েছে একথা সত্য। স্ত্রী কাউকেই চোর বা কালোবাজারী হতে বলেন নি। চেয়েছেন, স্বামী রাজনীতির বিপজ্জনক পথ ছেড়ে ঘরে স্থিত হোন, ভালো আয় উপার্জন করুন। আর দশজনার মতো তিনিও স্বামী, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরকন্না করবেন। কিন্তু স্ত্রীকে খুশি করতে গিয়ে ধানমণ্ডি বা গুলশানে বাড়ি বানাতে চেয়ে, নতুন ইম্পোর্ট করা গাড়িতে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে চড়ানোর শখ পূরণ করতে গিয়ে অনেকেই আদর্শের কথা ভুলে গেছেন এবং সহজেই প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

বেগম মুজিব যদি চাইতেন, তাহলে ধানমণ্ডিতে তার শুধু একটি বাড়ি নয়; বনানী গুলশানেও থাকতো তার একাধিক বাড়ি। টুঙ্গিপাড়ায় একটি একতলা ইটের বাড়ি নয়, থাকতো পাঁচতলা প্রাসাদ। তার স্বামী হতে পারতেন মোনায়েম খাঁকে সরিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর। ৭০ সালের নির্বাচনের পর তিনি হতে

পারতেন একজন সামরিক প্রেসিডেন্টের অধীনে অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। অর্থ চাইলে তাঁকে ছয়দফার বিনিময়ে ব্ল্যাংক চেক দিতে রাজি ছিলেন জেনারেল আইয়ুব। ব্যবসায়ী হতে চাইলে ইউসুফ হারুন আর মমতাজ দৌলতানা হাত বাড়িয়েই ছিলেন। মুজিব হতে পারতেন আইয়ুব পরিবার কর্তৃক ক্রীত জেনারেল মোটরস কোম্পানীর (পরিবর্তিত নাম গান্ধারা ইন্ডাস্ট্রিজ) ৪৯ পার্সেন্টের মালিক এবং পূর্ব পাকিস্তানের সোল এজেন্ট।

কিন্তু শেখ মুজিব এর কিছুই হলেন না। হলেন রাজদ্রোহী, হলেন রাজনৈতিক বন্দী, ষড়যন্ত্র মামলার নায়ক, ফাঁসি কাষ্ঠের আসামী। জেলেই কাটালেন বছরের পর বছর। বেগম মুজিব যদি তখন বেঁকে দাঁড়াতেন, হতে চাইতেন সুখী ও সচ্ছল গৃহবধূ; চাইতেন গাড়ি বাড়ি, ছেলেমেয়ের নিশ্চিত ও আয়েশী ভবিষ্যৎ, তাহলে যতবড় বীরই হোন, শেখ মুজিব কি পারতেন ঘরের এই বাধা কাটিয়ে উঠতে? সকল প্রলোভন এড়াতে? সকল গোপন ও প্রকাশ্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে? হয়তো ব্যবসায়ী তিনি হতেন না। সুখের গৃহকোণে আশ্রয় নিতেন না। রাজনীতি ছাড়তেন না। কিন্তু সংগ্রামের রাজনীতি ছেড়ে, আপোষের রাজনীতিতে আশ্রয় নিয়ে তিনিতো বাংলাদেশের আরেকজন ধনী, মডারেট রাজনৈতিক নেতাও বনে যেতে পারতেন।

শেখ মুজিব যে তা হননি, তার একটা কারণ নিজের চরিত্রবল তো বটেই, কিন্তু বড় কারণ, তার দূর্গের মতো বাড়ি এবং এই দূর্গের কর্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা। তার মনটি ছিল সাধারণ বাঙালী মায়ের চাইতেও কোমল। চরিত্র, স্বামীর চাইতেও কঠিন ও অনমনীয়। জীবনে অসহ দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করেছেন। কিন্তু স্বামীকে প্রলোভনের কাছে মাথা বিক্রি করতে দেননি। অলি আহাদ এখন বাংলাদেশের একজন প্রবীণ রাজনীতিক। পঞ্চাশের দশকের একটা সময়ে তিনি রাজনীতিতে ছিলেন শেখ মুজিবের সহযোগী। পরে হয়েছিলেন প্রতিযোগী। তার মুখেই এই গল্প আমার শোনা।

বেগম মুজিব তখন সন্তান সম্ভবা। রেহানা তাঁর গর্ভে। শেখ মুজিব নিরাপত্তা আইনে বন্দী হলেন। বেগম মুজিব শুধু অন্তঃসত্ত্বা নন, অসুস্থও ছিলেন। তিনি রক্তহীনতায় ভুগছিলেন। শেখ মুজিবকে প্যারোলেও মুক্তি দেওয়া হল না। টাকা পয়সার দারুণ টানাটানি। তবু স্বামীকে জেলে নেওয়ার সময় তিনি বললেন, তুমি যাও আমার জন্য ভেবো না। অলি আহাদ সেদিন সেখানে। শেখ মুজিব তাকে বললেন, 'হাসুর (হাসিনার) মায়ের দিকে একটু লক্ষ্য রেখো অলি আহাদ।' বেগম মুজিব প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে পড়লে অলি আহাদই তাকে রিকশা ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন মিডফোর্ড হাসপাতালে। রেহানার জন্মের পর বেগম মুজিবের জীবন রক্ষার জন্য রক্ত দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছিল। রক্ত কেনার টাকা ছিল না। রক্ত

দিয়েছিলেন স্বজন ও রাজনৈতিক বন্ধুরা।

দ্বিতীয় গল্পটি ফজলুল কাদের চৌধুরীর কাছে শোনা। তিনি ছিলেন শেখ মুজিবের ঘোর রাজনৈতিক শত্রু প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের মন্ত্রী। ঢাকায় এলে তিনি থাকতেন নয় নম্বর দিলু রোডে (নাকি ইস্কাটন রোড?)। সাংবাদিক হিসেবে তিনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন। চাটগাঁ বা পিন্ডি থেকে ঢাকায় এলে তিনি আমাকে ডাকতেন। আমার জন্য নিয়ে আসতেন পতেঙ্গার তরমুজ। আইয়ুবের মন্ত্রিসভায় তার বাঙালী মন্ত্রীদের মধ্যে দলাদলি ছিল। একদিকে ছিলেন মোনেম খাঁ, সবুর খান প্রমুখ। অন্যদিকে ছিলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী, ওয়াহেদুজ্জামান (ঠাণ্ডা মিয়া), কাজী কাদের এবং আরও কেউ কেউ। ফজলুল কাদের চৌধুরীর নয় নম্বর দিলু রোডের বাড়িতেই কনভেনশন লীগের বিদ্রোহী গ্রুপের গোপন বৈঠক হতো। সবুর-মোনায়েম খাঁ গ্রুপের সঙ্গে এই গ্রুপ শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেন নি। সে আরেক কাহিনী।

এই ফজলুল কাদের চৌধুরীই একদিন তার ঢাকার বাসায় বসে আমাকে বলেছেন বেগম মুজিব সংক্রান্ত গল্পটি। ছয়দফা আন্দোলন যখন শুরু হতে যাচ্ছে, ফজলুল কাদের চৌধুরী তখনো আইয়ুব খানের মন্ত্রী। আইয়ুব ছিলেন ধুরন্ধর লোক। কাউকে নির্যাতন দ্বারা দমন করার আগে প্রলোভন দেখিয়ে বশীভূত করতে চাইতেন। তিনি একটা কথা গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলেন, কোনো শক্তি প্রয়োগ দ্বারা ছয়দফার আন্দোলন রোখা যাবে না। — রোখা যাবে যদি শেখ মুজিবকে টাকা পয়সা অথবা উচ্চ পদ ঘুষ দিয়ে বশীভূত করা যায়। দায়িত্বটি পড়ল ফজলুল কাদের চৌধুরীর উপর। আইয়ুব বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, আপনি আমার কাছ থেকে ব্ল্যাঙ্ক চেক সই করিয়ে নিয়ে যান। টাকা কোটির অঙ্কের হলেও আমার আপত্তি নেই। একটাই শর্ত, ছয়দফার দাবি ছেড়ে দিতে হবে।' ফজলুল কাদের চৌধুরী বললেন, 'মুজিবকে আমি চিনি। এক সময় আমরা দু'জনেই শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর চেলা ছিলাম। টাকা পয়সা দেখিয়ে তাকে বাগ মানানো যাবে না। অন্য কোনো অফার?' আইয়ুব বললেন, 'মন্ত্রী হওয়ার অফার তিনি বহু আগেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে একটা কথা তাকে বলে দেখতে পারেন, আমি মোনায়েম খাঁকে এই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদ থেকে সরিয়ে তাকে গভর্নর পদে বসাতে রাজি আছি। তিনি নিজের লোক নিয়ে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। আমরা কেন্দ্র থেকে তার সিভিল প্রশাসনে বড় একটা হস্তক্ষেপ করবো না। এছাড়াও আমি আমার বেয়াই জেনারেল হবিবুল্লা এবং ছেলে গওহর আইয়ুবকে রাজি করিয়ে গান্ধারা ইন্ডাস্ট্রিজের ফরটি নাইন পার্সেন্ট শেয়ার মুজিব বা তার মনোনীত ব্যক্তির নামে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করবো। তার শেয়ার কেনার টাকার ব্যবস্থাও করবো আমি।'

ফজলুল কাদের চৌধুরী এসব প্রস্তাব নিয়ে ঢাকায় আসেন। যথাসময়ে শেখ মুজিবকে তা জানান। শেখ মুজিব মুচকি হেসে বললেন, 'দেখি হাসুর মায়ের সঙ্গে একটু আলাপ করে।' ফজলুল কাদের চৌধুরী ভাবলেন, হাতী কলা অর্ধেক গিলেছে। বাকিটাও গিলবে। তিনি সে রাতেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে টেলিফোনে জানালেন, 'আলাপ এগুচ্ছে।' দু'দিন পরও শেখ মুজিবের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি নিজেই মাঝরাতে গোপনে ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর রাস্তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। শেখ মুজিব তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। তাকে সঙ্গে করে দোতলায় বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। শেখ মুজিবকে একা পেয়ে ফজলুল কাদের চৌধুরী তার প্রস্তাবগুলোর প্রসঙ্গ তুলতে যাবেন, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন বেগম মুজিব। তার হাতে চা নাশতার ট্রে। সেটি ফজলুল কাদের চৌধুরীর সামনে টেবিলে রেখে তিনি বিনীত কণ্ঠে বললেন,' ভাই, আপনাকে একটা অনুরোধ জানাব। শেখ মুজিবকে আইয়ুব খান আবারো জেলে ভরতে চান আমার আপত্তি নেই। আমাদের এই বাড়িঘর দখল করতে চান, তাতেও দুঃখ পাব না। আপনাদের কাছে আমাদের দু'জনেরই অনুরোধ, আমাদের মাথা কিনতে চাইবেন না। শেখ মুজিবকে মোনায়েম খাঁ বানাবার চেষ্টা করবেন না।'

পুরো কাহিনী আমাকে বলার পর ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেছিলেন, আমি আইয়ুবকে দেখেছি, তিনি কত বড় বড় রাজনীতিকের মাথা কিনছেন। এক হাটে কিনে আবার অন্য হাটে বিক্রি করে দিচ্ছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ওই একটি মাত্র লোক শেখ মুজিবুর রহমান। বার বার চেষ্টা করেও তিনি তাঁকে বাগ মানাতে পারেন নি।

বেগম মুজিব সম্পর্কে তৃতীয় গল্পটি শুনেছি বঙ্গবন্ধুর মুখেই।

কুড়ি

"দেখিয়া এলেম আমি আরবার
কারবালার আর্ত আহাজারি —
— আশরাফ সিদ্দিকী

কবিতাটির দু'টি লাইন সঠিকভাবে উদ্ধৃত করতে পেরেছি কিনা জানি না। কয়েক দশক আগে লেখা আশরাফ সিদ্দিকীর কবিতা। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে (বাংলা ১৩৫৩ সালে) সম্ভবত অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং কাজী মোহাম্মদ ইদরিস কর্তৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' পত্রিকার

ঈদ সংখ্যায়। কবিতাটির ক'টি লাইন বহুকাল আমার কণ্ঠস্থ ছিল। এখন তা দুই লাইনে এসে ঠেকেছে। তাও এখন সঠিকভাবে উদ্ধৃত করতে পেরেছি কিনা জানি না। বিদেশে আমার হাতের কাছে আশরাফ সিদ্দিকীর সেই কবিতার বইও নেই, যে বইয়ে এই কবিতাটি সংযোজিত হয়েছে।

কবিতাটি বিহারের দাঙ্গার উপরে রচিত। ছে'চল্লিশ সালের দাঙ্গা। সূত্রপাত কলকাতায় ষোলই আগস্ট তারিখে জিন্নার ডাইরেক্ট এ্যাকসন ডে বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে। ভারতে তখন 'বৃটিশ খেদাও আন্দোলন' তুঙ্গে। বোম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহ, সারা ভারতে ডাক্তার ধর্মঘট, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসারদের বিচার, রশীদ আলী ডে ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমানসহ সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব ঐক্যের জোয়ার বইছে। ঠিক এই সময় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্না ষোলই আগস্ট তারিখে ভারতের মুসলমানদের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের আহ্বান জানালেন। এই সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দখল করার পর, যে জিন্না একবার ভুলেও বৃটিশবিরোধী কোনো আন্দোলনে যোগ দেননি, কোনো আন্দোলনের ডাক দেননি, তিনি হঠাৎ কাকে বা কাদের টার্গেট করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন, তা বুঝা গেল না। এই ডাকে মুষ্টিমেয় কিছু মুসলিম লীগ নেতা বৃটিশ রাজের কাছ থেকে পাওয়া খানবাহাদুর, খানসাহেব উপাধি লোক দেখানো ভাবে ত্যাগ করলেন। কিন্তু বৃটিশবিরোধী সর্বভারতীয় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে চিড় ধরল। ষোলই আগস্ট (১৯৪৬) থেকে উপর্যুপরি কয়েক সপ্তাহ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। দাঙ্গা দমনে সেনাবাহিনী তলব করতে হয়। কলকাতার দাঙ্গা দ্রুত অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে বিহারে, তারপর তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন স্থান—বিশেষ করে নোয়াখালীতে। বিহারের দাঙ্গাই সবচাইতে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। হাজার হাজার নরনারী ও শিশু নিহত হয়। কয়েক লাখ লোক উদ্বাস্তু হয়। উদ্বাস্তু বিহারীরা (পরে মোহাজের নামে চিহ্নিত) প্রতিবেশী বাংলার সীমান্তে এসে জড়ো হতে শুরু করে। তাদের জন্য আশ্রয় শিবির তৈরি করা হয়। দাঙ্গা উপদ্রুত বিহারীদের জন্য গঠিত ত্রাণ তহবিলে তখন বাঙালিরাই অর্থ ও সাহায্য জুগিয়েছে সবচাইতে বেশি। মহাত্মা গান্ধী বিহারে প্রথম যান নি। তিনি নোয়াখালীতে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছিলেন। সর্বভারতীয় মুসলমান নেতাদের মধ্যে একমাত্র শেরে বাংলা ফজলুল হক গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নির্যাতিত বিহারীদের পাশে। মিঃ জিন্না তার বোম্বাইয়ের মালাবার হিল প্রাসাদ থেকে বিহারীদের জন্য প্রথমে সহানুভূতির বাণী পাঠিয়েই "কায়েদে আজম" হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সমাধা করেছিলেন।

দাঙ্গা প্রশমিত হল। প্রশ্ন দেখা দিল, বিহারের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে ভারতের

কোন্ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পুনর্বাসন করা যায়? বাংলা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ
প্রদেশ। সুতরাং এখানে বিহারীদের পুনর্বাসনের প্রশ্নই ওঠেনা। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত
প্রদেশে প্রচুর অনাবাদী জায়গা-জমি রয়েছে। তার উপর বিহারীরাও উর্দু ভাষী। উর্দু
এই তিনটি প্রদেশের ভাষা না হলেও লিঙ্গাফ্রাংকা বা সকলের বোধগম্য সংযোগ
ভাষা। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তিনটি প্রদেশের একটিও বিহারী মোহাজেরদের
পুনর্বাসনে রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত সব দায়িত্ব বর্তাল বাংলার উপর। শহীদ
সোহ্‌রাওয়ার্দী কলকাতার ময়দানের সভায় বক্তৃতা দিয়ে বললেন, "দরকার হলে
কলকাতার বুক থেকে রাইটার্স বিল্ডিং (প্রাদেশিক সরকারের প্রধান দফতর) তুলে
দিয়ে আমি বাংলায় বিহারী মোহাজেরদের পুনর্বাসন করবো।" শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর
এই সভায় একজন উর্দু ভাষী নেতার আবির্ভাব ঘটে। তিনি মওলানা রাগীব আহসান।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং মোহাজের নেতা
সেজে বসেন। পূর্ব পাকিস্তানে পুনর্বাসিত বিহারীরাও এই সময় থেকে মোহাজের এই
আলাদা নামে পরিচিত হতে শুরু করে এবং পাকিস্তানী শাসকদের প্রশ্রয়ে ও
পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পাকিস্তানে 'মোহাজের রাজনীতির' সাইন বোর্ডের আড়ালে
বাঙালী-বিহারী বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করার চক্রান্ত শুরু হয়। সে চক্রান্তের মর্মান্তিক
জের বহমান চলেছি। সে কাহিনী এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

অবিভক্ত ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ বিহারের
ছিন্নমূল মুসলমান উদ্বাস্তুদের গ্রহণে অসম্মতি জানানোর ফলে জিন্না এবং মুসলিম লীগ
নেতারা বিপাকে পড়েন। তাদের অতি সাধের ধর্মীয় দ্বিজাতি তত্ত্বের থিয়োরি তখনই
প্রায় বানচাল হওয়ার উপক্রম। কংগ্রেসের একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা
(সম্ভবত সাইফুদ্দিন আহমদ কিচলু) প্রকাশ্যেই বলে বসলেন, মিঃ জিন্না ভারতের দশ
কোটি মুসলমানের জন্য জাতীয় আবাস ভূমি (National Homeland) প্রতিষ্ঠা
করতে চান। তাঁর মতে, ভারতের দশ কোটি মুসলমানের সকলেই এক জাতি। যদি
তা-ই হবে, তাহলে সেই জাতীয় আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তার
কোনো কোনো অংশে বিহারের কয়েক লক্ষ দুর্গত মুসলমানকে আশ্রয় দিতে এই
অসম্মতির অর্থ কি দাঁড়ায়? ভাগ্যিস, এই কংগ্রেসী মুসলমান নেতা এখন জীবিত
নেই। তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানী নাগরিক
হিসেবে স্বীকৃত আটকেপড়া বিহারীদের অবর্ণনীয় দুর্দশা; তাদের ফিরিয়ে নিতে
পাকিস্তানের গড়িমসি, খোদ পাকিস্তানের করাচী তথা সিন্দুতে 'কওমী মোহাজের'
রাজনীতির নামে স্থানীয় বনাম বিহারীদের মধ্যে দাঙ্গা ও রক্তারক্তি কাণ্ড প্রত্যক্ষ করে
তিনি হয়তো জিন্নার ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের থিয়োরির 'মহিমা' নতুনভাবে বিশ্লেষণ
করতে পারতেন।

যা হোক বিহারের দাঙ্গায় ছিন্নমূল কয়েক লক্ষ নরনারীকে আশ্রয় দিতে একমাত্র বাংলা প্রদেশ রাজি হয় এবং প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে (বর্তমান বাংলাদেশ) অধিকাংশ বিহারী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়। এই পর্যন্ত ইতিহাস। এরপর আবার স্মৃতিচারণায় ফিরে যাই। ছে'চল্লিশ সালে শেখ মুজিব ছিলেন কলকাতায়। তিনি তখন ছাত্র। একদিকে তিনি মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের নেতা আবুল হাশিমের মন্ত্রশিষ্য, অন্যদিকে ছাত্র রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর দক্ষিণ হস্ত। নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ভাগ না হলেও নাজিমউদ্দিন সমর্থক গ্রুপ ও হাশিম-সোহ্‌রাওয়ার্দী সমর্থক গ্রুপে ভাগ হওয়ার পথে। নাজিমউদ্দিন সমর্থক ছাত্রলীগ প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপ নামে পরিচিত এবং এই গ্রুপের নেতা ছিলেন শাহ্ আজিজুর রহমান। অন্যদিকে হাশিম-সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপ পরিচিত ছিল ছাত্রলীগের প্রগতিশীল গ্রুপ হিসেবে এবং এই গ্রপের নেতা ছিলেন আনোয়ার হোসেন (ল্যাংড়া আনোয়ার নামে পরিচিত), নূরুদ্দিন, শেখ মুজিব প্রমুখ। 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে পরিচিত কলকাতার ছে'চল্লিশ সালের ভয়াবহ দাঙ্গায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের ভূমিকাও ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। শাহ্ আজিজের নেতৃত্বাধীন গ্রুপের ভূমিকা ছিল সাম্প্রদায়িক এবং মানবতাবিরোধী; অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অপর গ্রুপটি কলকাতায় সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষার জন্য, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে থাকেন। এই সময়ের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করার মতো। কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের (বর্তমানে বিধান সরণী) উপর ছিল ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাড়ি। এই বাড়িটি একদিন একদল দাঙ্গাকারী ঘেরাও করে ফেলে। এই বিখ্যাত চিকিৎসক এবং রাজনীতিকের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছার আগেই শেখ মুজিব তার ভলান্টিয়ার কোর নিয়ে হাজির হন এবং দাঙ্গাবাজদের প্রতিহত করেন। আরেকটি ঘটনা বাংলা ছবির বিখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। ছবি বিশ্বাস চল্লিশের দশকে কলকাতার মুসলমান পাড়া পার্ক সার্কার্সে বাস করতেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন। কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হওয়ার গোড়াতে তিনি ভাবতে পারেননি যে, তার উপর হিন্দু হিসেবে কোনো হামলা হতে পারে। ফলে নিশ্চিন্ত মনে পার্ক সার্কাসের বাড়িতে তালা লাগিয়ে তিনি কয়েকদিনের জন্য সপরিবারে কলকাতার বাইরে বেড়াতে যান। বেড়ানো শেষে ফিরে এসে দেখেন, তার বাড়ি লুট হয়ে গেছে। আসবাবপত্র, গয়নাগাঁটিতো গেছেই, কাপড়চোপড়ও নেই। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বুঝতে পারলেন, পার্ক সার্কাসের বাড়িতে থাকাও তার পক্ষে নিরাপদ নয়। কিন্তু মুসলমান প্রধান পাড়া থেকে বেরুবেন কি করে? তাছাড়া হঠাৎ এক বস্ত্রে কোথায় গিয়ে উঠবেন? অনেক

চিন্তাভাবনার পর তিনি পুলিশ ডাকার বদলে টেলিফোন করলেন শেখ মুজিবুর রহমানকে। ছাত্রনেতা হিসেবে শেখ মুজিবকে তিনি চিনতেন এবং কিছুটা স্নেহও করতেন। শেখ মুজিব তার ডাকে দলবল নিয়ে এলেন। বললেন, 'দাদা, আপনারা যে বেঁচে আছেন, তাতেই আমরা খুশি। এখন কি করতে হবে বলুন? এই বাড়ি থেকে কোথাও নড়বেন না। শহীদ সাহেবকে সব জানিয়েছি। আপনার বাড়িতে পুলিশ পাহারাতো বসবেই, তাছাড়া আমাদের ছেলেরাও পালা করে পাহারা দেবে।' ছবি বিশ্বাস বললেন, 'পাহারা তো দেবে বুঝলাম। কিন্তু এই বাড়ি থেকে আমার মালপত্র লুট হয়ে গেছে। এখন এক বস্ত্রে পরিবারের সকলেই কি মাটিতে শুয়ে দিন কাটাব?" শেখ মুজিব মাথা চুলকে একটু ভেবে বললেন, 'ছবিদা, আমাকে দু'টো দিন সময় দিন। কি করতে পারি, ভেবে দেখি!'

শেখ মুজিব সেদিনই গিয়ে হাজির হলেন মিনা পেরেশয়ারির আড্ডায়। কলকাতায় মিনা তখন একটি ত্রাস সৃষ্টিকারী নাম। পেশায় পেশোয়ার থেকে আসা ফল বিক্রেতা: কিন্তু সেই সঙ্গে কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ডের এক দুর্ধর্ষ নেতা। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সে খুব অনুগত ছিল। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও তাকে বড় কোন মামলায় ফেঁসে গেলে সাহায্য করতেন, গ্রেফতার হলে লালবাজার থানাকে বলে জামিনে ছাড়িয়ে আনতেন। শহীদ সাহেবের সুবাদে শেখ মুজিবকেও মিনা পেশোয়ারি একটু সমীহের চোখে দেখতো। শেখ মুজিব তাকেই পাকড়ালেন, বললেন, 'হিন্দু না মুসলমান গুণ্ডা, কারা ছবি বিশ্বাসের বাড়ি লুট করেছে তা জানি না। কিন্তু এই মাল ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।' মিনা পেশোয়ারি বলল, 'আমার চেনাশোনা কোনো দল হলে নিশ্চয়ই মাল ফেরত যাবে।'

দু'দিন পর পার্ক সার্কাসে ছবি বিশ্বাসের বাড়িতে যেতেই তিনি শেখ মুজিবকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আমার সব মাল ফেরত পেয়েছি। এমন কি পরিবারের মেয়েদের গয়নাগাঁটিও। তোমাকে কি বলে আশীর্বাদ করবো, তা বুঝতে পারছি না। আমি একজন অভিনেতা। আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি এই দেশের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা হবে। মানুষকে তুমি ভালবাসো। মানুষও তোমাকে ভালবাসবে।' বহু বছর হয় বাংলা ফিল্মের কিংবদন্তীর নায়ক ছবি বিশ্বাস মারা গেছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে কলকাতার এক পত্রিকায় নিজের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ছে'চল্লিশের দাঙ্গার সময়ের এই ঘটনাটির কথা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

শুধু বিধান রায় এবং ছবি বিশ্বাসের নয়, কলকাতার বহু মুসলমান পরিবারের জীবন রক্ষার জন্য শেখ মুজিব নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন। এই সময় তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন অসুস্থ। মাত্র দেড় বছর আগে (১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর

মাসে) তাঁদের প্রথম ছেলের জন্ম হয়। ছেলেটি বাঁচে নি। প্রথম ছেলে হারানোর আঘাতে বেগম মুজিবের শরীর এবং মন দুইই ভেঙে পড়েছিল। তিনি আশা করছিলেন, স্বামী এই সময় তার কাছে কিছুদিন থাকবেন। তাঁর এই আশা পূর্ণ হয় নি। শেখ মুজিবও একথা জেনে মনে মনে গ্লানিবোধ করছিলেন এবং স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, দাঙ্গাটা থেমে গেলেই তিনি স্ত্রীর কাছে গিয়ে কিছুদিনের জন্য ঘর সংসারী হবেন।

কলকাতার দাঙ্গা থামল। দাঙ্গা শুরু হল বিহারে, তারপর নোয়াখালীতে। বিহারের কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুকে বাংলায় এনে পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। কেবল সরকারী ব্যবস্থাপনায় সবকিছু হওয়া সম্ভব নয়। তিনি ডাকলেন শেখ মুজিবকে তাঁর থিয়েটার রোডের বাড়িতে বললেন, 'বিহারের শরণার্থীদের প্রথম ব্যাচকে সীমান্ত থেকে এনে কিছুদিন আশ্রয় শিবিরে রাখতে হবে। আশ্রয় শিবির তৈরি হয়ে গেছে। তাদের জন্য লঙ্গরখানারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম ব্যাচ বাংলাদেশে ঢুকলেই পরবর্তী ব্যাচগুলো আসতে শুরু করবে। আমি কেবল সরকারী কর্মচারীদের তদারকির উপর ভরসা করতে পারছি না। তাই ভাবছিলাম, তুমি যদি ছাত্রলীগ এবং মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের একটা ভলান্টিয়ার কোর গঠন করে বর্ডারে যাও এবং শরণার্থীদের প্রথম ব্যাচটির নিরাপদে চলে আসা এবং আশ্রয় শিবিরে পৌঁছার তদারক কর, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি।'

বলেই শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী দ্বিধাগ্রস্তভাবে শেখ মুজিবের দিকে তাকালেন। শেখ মুজিব কিছু বলার আগেই বললেন, 'আমি জানি রেনুর (বেগম মুজিবের ডাক নাম) শরীর ভালো নয়। তার উপর সে বাচ্চা হারিয়েছে। তোমার উচিৎ তার সঙ্গে কিছুদিন থাকা। সুতরাং আমি তোমাকে চাপ দিচ্ছিনা। বাংলাদেশে বিহারীদের প্রথম ব্যাচের আসার এখনো দিন দশেক বাকি। তুমি সবদিক ভেবে দেখো। তোমার পক্ষে এখন বিহারে যাওয়া সম্ভব না হলে আর কারও নাম সাজেস্ট করতে পারো।'

শেখ মুজিব বললেন, 'আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিন লীডার।'

কিন্তু দশদিন না ফুরোতেই শেখ মুজিব বোচকাবুচকি নিয়ে থিয়েটার রোডের বাড়িতে হাজির। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে বললেন, 'আমি আমার ভলান্টিয়ার বাহিনী নিয়ে বিহারে যেতে প্রস্তুত।' শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুমি এ ব্যাপারে রেনুর সঙ্গে পরামর্শ করেছো?' শেখ মুজিব বললেন, 'আমি তার চিঠি পেয়েছি লীডার। সে লিখেছে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বিহারে যাও, আমার জন্য ভেবো না।'

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন একটু কড়া মেজাজের লোক। ভাবাবেগ প্রকাশ করতেন না। কিন্তু সেদিন শেখ মুজিবের কাছে এসে বললেন, Mujib, She is

a very precious gift to you from God. Don't, neglect her please. (মুজিব, সে তোমার জন্য খোদার দেওয়া অমূল্য দান। তাকে 'অবহেলা কোর না।)

বেগম মুজিব সম্পর্কে এই কাহিনী আমি বঙ্গবন্ধুর নিজের মুখ থেকে শুনেছি ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তখন রোজই তাঁর সঙ্গে আমাকে বসতে হতো, তাঁর আত্মজীবনীর ডিকটেসন নেওয়ার জন্য। একদিন বঙ্গবন্ধু আমার হাতে একটি চিঠি তুলে দিলেন। বিবর্ণ কাগজ, লেখাগুলোও মুছে যাওয়ার পথে। কষ্ট করে পড়তে হয়। বঙ্গবন্ধু লজ্জিত হাসি হেসে বললেন, 'তোমার ভাবীর চিঠি' সাতাশ আঠাশ বছর আগের লেখা। কি করে দু'একটা চিঠি আমার কাছে রয়ে গেছে, তা জানি না। প্রথম যৌবনের কালে আমাদের লেখা চিঠি। কাউকে দেখাই না। আত্মজীবনী লেখার কাজে লাগবে বলে অনেক খুঁজে বের করেছি। শুধু তোমাকেই দেখালাম।

বললাম, আমি পড়তে পারি?

বঙ্গবন্ধু বললেন, নিশ্চয়ই পড়বে। সেজন্যই তো দিলাম। বিহারের দাঙ্গার পর উদ্বাস্তুদের আনার জন্য সেখানে যাব কিনা জানতে চেয়েছিলাম তোমার ভাবীর কাছে। তারই জবাবে এই চিঠি।

একটু থেমে বঙ্গবন্ধু বললেন, হাসিনার আম্মা তখন গ্রামের অল্পবয়সী মেয়ে। ভাষার অনেক ভুল আছে। আছে অনেক ছেলেমানুষী আবেগ। তুমি আবার চিঠিটা পড়ে হেসো না।

আমি চিঠি পড়লাম। হাতের লেখা খুব সুশ্রী নয়। বানান, বাক্য গঠনও সব জায়গায় নির্ভুল নয়। কিন্তু চিঠিটা পড়ে আমার মনে হল না, এটা কোনা গ্রামের অল্পবয়সী মেয়ের চিঠি। মনে হল, স্বামীর কাছে লেখা কোনো বিদুষী মহিলার চিঠি। বেগম মুজিব স্বামীকে লিখেছেন, "আপনি শুধু আমার স্বামী হওয়ার জন্য জন্ম নেননি, দেশের কাজ করার জন্যও জন্ম নিয়েছেন। দেশের কাজই আপনার সবচাইতে বড় কাজ। আপনি নিশ্চিন্ত মনে সেই কাজে যান। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আল্লার উপর আমার ভার ছেড়ে দিন।"

দেশের কাজ করার জন্যও জন্ম নিয়েছেন। দেশের কাজই আপনার সবচাইতে বড় কাজ। আপনি নিশ্চিন্ত মনে সেই কাজে যান। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আল্লার উপর আমার ভার ছেড়ে দিন।"

একুশ

"এত রক্ত মধ্যযুগ দেখেছে কখনো ?"

প্রশ্নটি কবি জীবনানন্দ দাশের। উত্তরটি আমার, না কখনো দেখে নি। জীবনানন্দ যদি সত্তরের দশকে বেঁচে থাকতেন, ঘুরে বেড়াতেন একাত্তর থেকে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত বাংলার পথে প্রান্তরে, পঁচাত্তরের পনেরই আগস্টের পর এসে দাঁড়াতেন ঢাকার ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর রাস্তার এই বাড়িটিতে, তাহলে তিনিও হয়তো নতুনভাবে এ কবিতাটি লিখতেন।

বত্রিশ নম্বরের বাড়ির দেয়ালে, সিঁড়িতে বিবর্ণ রক্তজবার মতো যে রক্তের ছাপ, তাতে মিশে আছে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের রক্তও। এই বাড়িতে বসে তাঁর কথা বেশি মনে পড়ার কারণ, তিনিই ছিলেন এই বাড়ির আসল প্রাণ। তাঁকে আমি এই বাড়িতে দেখেছি বিভিন্ন ভূমিকায়। স্বামীঅন্ত প্রাণ স্ত্রী, সন্তান স্নেহে ভরপুর মা, রাজনীতিবিদ স্বামীর সাহসী সহকর্মী ও সহযোদ্ধা, রাজনৈতিক দুর্যোগ ও দারুণ দুর্দিনে আপোষহীন নারী—ইত্যাদি নানা ভূমিকায়। বঙ্গবন্ধু মাসের পর মাস জেলে; কিন্তু তাঁর সংসার এবং রাজনীতি দুইয়েরই হাল সাহস এবং যোগ্যতার সঙ্গে ধরে রেখেছেন এই মহিলা। মাথায় গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে বহুদিনের আত্মগোপনকারী ছাত্রনেতা কিম্বা রাজনৈতিক কর্মী, অভুক্ত অস্নাত অবস্থায় মাঝরাতে এসে ঢুকেছেন বত্রিশের বাড়িতে, তাঁকে সেই রাতে নিজের হাতে রেঁধে মায়ের স্নেহে, বোনের মমতায় পাশে বসে খাওয়াচ্ছেন বেগম মুজিব। এই দৃশ্য একবার নয়, কতবার দেখেছি!

বেগম মুজিব যদি অসম সাহসী এবং দৃঢ়চেতা না হতেন, তাহলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কি 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'র গুরুতর অভিযোগ মাথায় নিয়ে আইয়ুবের সেই আধা সামরিক ফ্যাসিবাদী শাসনামলে ছয়দফার মতো দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামা সম্ভব হতো? পঁয়ষট্টি সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বাঙালী অর্থনীতিবিদ ও সরকারী অফিসার ছয় দফার কয়েকটি দফা তৈরি করেন। তারা সকলেই ছিলেন শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত বন্ধু। তাঁরই অনুরোধে রচিত ছয় দফার (তখন মাত্র চার দফা এবং ছয় দফা নামকরণও হয় নি) খসড়াটি তাঁকে দেখানো হয়। বঙ্গবন্ধু ছয় দফার অন্যতম প্রণেতা, তার বন্ধু তখনকার সিএসপি অফিসার রুহুল কুদ্দুসকে হেসে বলেছিলেন, 'কুদ্দুস, এই খসড়া দাবিতে সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের আখের তোমরা গুছিয়ে নিয়েছো। বলেছো, কারেন্সি, ডিফেন্স ও ফরেইন পলিসি ছাড়া আর সবই প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক

সরকারের হাতে আসবে। ভালো কথা। সিভিল সার্ভিসের লোকদের পোয়াবারো। বৈদেশিক বাণিজ্য আঞ্চলিক সরকারের হাতে আসবে। তাতে বাঙালী ব্যবসায়ীরাও হাত তুলে আমাদের দোয়া করবে। কিন্তু যে সেক্টরে বাঙালী সবচাইতে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়েছে, বিরাট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা একভাগও যেখানে বাঙালী পায় নি, সেই ডিফেন্সের সবটাই কেন্দ্রের হাতে তুলে দিলে কি করে চলবে? আর্মির বাঙালি অফিসার ও জওয়ানেরা কেন আমাদের আন্দোলনে সমর্থন দেবে?

রুহুল কুদ্দুস বঙ্গবন্ধুর কথা শুনে একটু ভীত হলেন। বললেন, ডিফেন্সের বাজেটের ব্যাপারটা খুবই ডেলিকেট। ওটা নিয়ে প্রথমেই কথা তুললে পাকিস্তানী আর্মি শাসকদের কাছ থেকে কোনো দাবি আদায় করা যাবে না।

বঙ্গবন্ধু বললেন, পাকিস্তানের আর্মি তোমাকে কোনো দাবিই ভিক্ষে দেবেনা। আন্দোলন করে আদায় করে নিতে হবে। আমাদের এই খসড়া দাবিতে বাঙলাদেশের জন্য আলাদা প্যারামিলিশিয়ার কথাটাও যোগ করতে হবে। তাছাড়া বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। সেই ১৯৫০ সাল থেকেই তো আমরা পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য দুই অর্থনীতির কথা বলে আসছি। এখন তার পরিপূরক দাবি হিসেবে সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থার ((Easy Convertible Currency) কথা বলা দরকার।

রুহুল কুদ্দুস ভীত হয়ে বললেন, আমরা অলরেডি যে চারটা দাবির খসড়া করেছি, তাতেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ভয়ানক ক্রুদ্ধ হবেন, তার উপর আপনি যেসব দাবি যোগ করতে চাচ্ছেন, তাতো রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণার সামিল হয়ে যাবে। যারা এই দাবি জানাবেন, তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, বিচ্ছিন্নতাবাদের গুরুতর অভিযোগ উঠতে পারে; এই অভিযোগে ফাঁসির কাষ্ঠের মামলায় আসামীও তাদের করা হতে পারে।

বঙ্গবন্ধু বললেন, তোমরাতো এই দাবিগুলো পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক নেতার কাছে আগে গোপনে পেশ করতে যাচ্ছো। তারা সকলেই যদি আইয়ুবের কাছে সম্মিলিতভাবে এই দাবিগুলো জানান, তাহলে কাকে তিনি শাস্তি দেবেন? পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাকে তো তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী বলতে পারবেন না।

রুহুল কুদ্দুস বললেন, যদি আইয়ুবের কাছে এই দাবি সম্মিলিতভাবে পেশ করতে সকল রাজনৈতিক নেতা রাজি না হন?

বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতে বললেন, তাহলে একাই আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

কয়েকদিন পর 'দৈনিক ইত্তেফাকের' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার ধানমণ্ডির বাসা 'মাজেদা ভিলায়' তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দাবি নিয়ে মধ্যরাতের গোপন বৈঠক বসে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তখন কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা সফরে আসবেন। পঁয়ষট্টি সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সতেরো দিনের যুদ্ধ এবং তাসখন্দ চুক্তির পর এই তার প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফর। পশ্চিম পাকিস্তানে তখন তাসখন্দ-চুক্তি বিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরাও সতেরো দিনের যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর দেশরক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর ব্যবস্থার দাবি জানাতে শুরু করেছেন। আইয়ুব জানতেন, তার ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশেই যদি এক সঙ্গে আন্দোলন শুরু হয়, তাহলে তার ভরাডুবি সুনিশ্চিত। তাই প্রথমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের ঠাণ্ডা করার জন্য ঢাকা সফরে এসে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। এই সুযোগে তার কাছে বাঙালীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি খসড়া প্রস্তাব (পরে ছয়দফা নামে খ্যাত) পেশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এই উদ্যোগেরই ফল মানিক মিয়ার ধানমণ্ডির বাড়িতে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের গোপন বৈঠক। কারণ, ছয় দফার কয়েকটি প্রস্তাব কোনো কোনো নেতার কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে গণ্য হচ্ছিল। বিশেষ করে স্বতন্ত্র মুদ্রা, স্বতন্ত্র প্যারামিলিশিয়া ও বৈদেশিক বাণিজ্য আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের বিষয় তিনটি। তারা বললেন, এই দাবিগুলোকে আইয়ুব সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ আখ্যা দিয়ে সহজেই কঠোর দমননীতি গ্রহণ করতে পারবেন। তার চাইতে নরম এবং কম বিতর্কমূলক দাবিদাওয়া নিয়ে এগুনো উচিত।

সে রাতে 'মাজেদা ভিলার' বৈঠকে যারা হাজির ছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, সাবেক মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, যশোরের মশিউর রহমান, আবদুস সালাম খান, ইউসুফ আলি চৌধুরী, মোহন মিয়া, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী থেকে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর একমাত্র মেয়ে বেগম আখতার সোলায়মানও এই গোপন বৈঠকে যোগ দেন। যেসব বাঙালী অর্থনীতিবিদ ও সিভিল ব্যুরোক্রাট ছয় দফা প্রণয়নে নেপথ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন, তারা নেপথ্যেই রয়ে গেলেন। এ সভায় তারা হাজির ছিলেন না।

'মাজেদা ভিলার' বৈঠকে ছয় দফা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়। তর্কাতর্কি এক সময় উত্তপ্তও হয়ে ওঠে। ছয় দফা প্রস্তাবে সবচাইতে অখুশি হন সোহ্‌রাওয়ার্দীর

মেয়ে বেগম আখতার সোলায়মান। শেখ মুজিব ছয় দফা প্রস্তাব বৈঠকে ঘরোয়াভাবে উত্থাপন করায় তিনি তার বিরুদ্ধে কটুভাষা পর্যন্ত প্রয়োগ করেন (শেখ মুজিব পরবর্তীকালে লাহোরে জেনারেল আজম খানের বাসভবনে সর্বদলীয় রাজনৈতিক নেতাদের সম্মেলনে ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঘোষণা করেন, 'আমি অস্ত্রের ভাষায় এই দাবি প্রতিহত করবো')। ছয় দফা নিয়ে বেগম আখতার সোলায়মানের সঙ্গে শেখ মুজিবের তর্কাতর্কি এক সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, বেগম সোলায়মান শেখ সাহেবকে শাসিয়ে বলেন, 'আওয়ামী লীগ তার বাবা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ছয় দফার মতো 'রাষ্ট্রদ্রোহী' প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার শেখ মুজিবকে কে দিয়েছে ?

মানিক মিয়ার হস্তক্ষেপে বেগম আখতার সোলায়মান শেষ পর্যন্ত তর্কযুদ্ধ থেকে বিরত হন। বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা শেষে দেখা গেল, প্রবীণ নেতাদের অধিকাংশই প্রস্তাবটির সকল দফা সম্পর্কে একমত নন এবং দফাগুলো আইয়ুব খানের কাছে পেশ করা নিরাপদ ও সময়োচিত বলে মনে করেন না। নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, নান্না মিয়া, মোহন মিয়া দাবিগুলোর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন। আতাউর রহমানও দাবিগুলো এই মুহূর্তে পেশ করা ঠিক নয় বলে মতপ্রকাশ করলেন। আবুল মনসুর আহমদও দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলনে নামার বিপক্ষে মতপ্রকাশ করেন। মানিক মিয়া বললেন, তিনি দাবিগুলো যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, তবে সকলে একমত না হলে কোনো দলের পক্ষে একা এই দাবিগুলো নিয়ে মাঠে নামা ঠিক হবে না। মাঠে নামা দারুণ বিপজ্জনক হবে।

এই ঘরোয়া বৈঠকে এক চরম হতাশার মুহূর্তে শেখ মুজিব খসড়া প্রস্তাব আকারে দাবিগুলো যে কাগজে লেখা হয়েছিল, সেটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, এই দাবিগুলো হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী জনগণের ম্যাগনাকার্টা। এই দাবির সঙ্গে আমরা—অন্তত আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। যদি আপনারা কেউ রাজি না হন, তাহলে আমাকে একাই এই দাবি পেশ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং আর কোনো দল না চাইলেও আওয়ামী লীগকে নিয়েই আমাকে আন্দোলনে নামতে হবে।

বৈঠক শেষ হল। অন্যান্য নেতারা যে যার বাড়িতে গেলেন। সকলের শেষে যাবেন শেখ মুজিব ও বেগম আখতার সোলায়মান। মানিক মিয়ার ইচ্ছা ছিল, শেখ মুজিব ও বেগম সোলায়মানের মধ্যে মনান্তর মিটিয়ে দেবেন। এদের দু'জনের কৈশোর কাল থেকে ভাই ও বোনের সম্পর্ক। এখন রাজনৈতিক মত ও পথের জন্য তা ভেঙ্গে যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু মানিক মিয়া কোনো কথা বলার আগেই বেগম সোলায়মান বলে উঠলেন, আমার বাবা (সোহ্‌রাওয়ার্দী) যুক্তবাংলার আন্দোলন করে ভুল করেছিলেন। সে জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানেরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিশ্বাস

করে নি। পখতুনিস্থান আন্দোলনের নেতা গাফ্ফার খান এখনো জেলে। মুজিব তুমিও এইসব দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমো না। এই দাবি বিচ্ছিন্নতার দাবি, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি।

শেখ মুজিব বললেন, যুক্তবাংলার আন্দোলনের জন্য নয়, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অপরাধ, তিনি বাঙালী ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন ও সমান সুযোগ সুবিধা দাবি করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারি জুন্টা সেই স্বায়ত্তশাসনও আমাদের দিতে চায় না। যদি তাই হয়, স্বায়ত্তশাসনের দাবিটুকুও যদি আইয়ুব সরকার পূরণ না করেন, তাহলে স্বাধীনতার দাবি জানানো ছাড়া বাঙালীদের সামনে আর কি উপায় থাকবে?

আখতার সোলায়মান বললেন, পাগলামি কোর না। তুমি সারা জীবন গাফ্ফার খানের মতো জেলে থাকতে চাও, পচো গিয়ে। কিন্তু আওয়ামী লীগকে তোমার পাগলামির সঙ্গে জড়িয়ো না।

শেখ মুজিব বললেন, আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল। তারা যদি আন্দোলনে নামতে চায় তাহলে আমি বা আপনি বাধা দেওয়ার কে ?

মানিক মিয়া দু'জনের কথা কাটাকাটি বন্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। আখতার সোলায়মান ভারী শরীরের মহিলা ছিলেন। এক সময় সোফা থেকে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে রেগে গিয়ে বললেন, মুজিব, তুমি এসব দাবিটাবি নিয়ে আর বাড়াবাড়ি কোর না। যদি কর, তাহলে আওয়ামী লীগের নেতা করার জন্য নতুন লোকের সন্ধান করতে হবে।

শেখ মুজিব হেসে বললেন, আওয়ামী লীগ কি ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে, আপনি তার নেতা বানাবেন? আওয়ামী লীগের সদস্যরাই তাদের নেতা নির্বাচন করবে।

আখতার সোলায়মান তার কথা কানে তুললেন না। বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানে তোমারই মতো লম্বা, সুদর্শন এক সাহসী যুবকের আবির্ভাব হয়েছে। তোমার চাইতেও তার বয়স কম। দরকার হলে তাকেই আমরা আওয়ামী লীগের নেতা করার জন্য বেছে নেব।

শেখ মুজিব আগের মতোই হেসে বললেন, আপনার এই লম্বা, সুদর্শন সাহসী যুবকটি কে?

অঅখতার সোলায়মান বিনা দ্বিধায় বললেন, বাকি বালুচ।

মানিক মিয়া কথাবার্তার এই পর্যায়ে আর চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি একটু কঠোর স্বরে বললেন, বেবী, (আখতার সোলায়মানের ডাক নাম) কথা হচ্ছিল পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি দাবি নিয়ে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতার প্রশ্নটি

কোথা থেকে আসে? সারা পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতিতো এখনো নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান। তিনি থাকতে বাকি বালুচের নাম কি করে তোলা যায়?

আখতার সোলায়মান বুঝলেন, তিনি উত্তেজনার মাথায় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। সুতরাং সেদিনের মতো চুপ হয়ে গেলেন। একবার নয়, আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে আপোস করতে না চাওয়ায় বার বার শেখ মুজিবকে এ ধরনের হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে খোন্দকার মোশতাক একবার আওয়ামী 'মুসলিম লীগের' সাইনবোর্ড চুরি করেছিলেন। আইয়ুবের বেসিক ডেমোক্রাসির পার্লামেন্টের আমলে শাহ্ আজিজুর রহমানকে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি দলের ডেপুটি নেতা বানিয়ে ধীরে ধীরে শেখ মুজিবের জায়গায় দলের নেতৃস্থানীয় পদে বসানোর নেপথ্য ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ছয় দফার আন্দোলনের সময় সালাম খান, মশিউর রহমান, জহিরুদ্দিন প্রমুখ প্রবীণ নেতারা আওয়ামী লীগ থেকে শেখ মুজিবকে বহিষ্কারের ঘোষণা প্রচার করে পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগ গঠন করেছিলেন। অন্যদিকে সোহ্‌রাওয়ার্দী তনয়া আখতার সোলায়মান আওয়ামী লীগে শেখ মুজিবের বিকল্প নেতা হিসেবে বাকি বালুচকে খাড়া করার জন্য প্রকাশ্যে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগ গঠন প্রহসনে পরিণত হয় এবং বাকি বালুচকে নেতা বানানোর চেষ্টা আখতার সোলায়মানের জন্য এক চরম পারিবারিক স্ক্যাণ্ডাল ও কেলেংকারী হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে এবং গবেষকদের জন্য এই কাহিনীও আমার উল্লেখ করা উচিৎ। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী পরিবারের প্রতি ব্যক্তিগত সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের জন্য আমি তা থেকে বিরত রইলাম। বলাবাহুল্য, এই নব্বইয়ের দশকেও শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে 'মধ্যরাতের চক্রান্তের যে দীর্ঘ ছুরিকার' সম্মুখীন হচ্ছেন, তার পিতা এবং পূর্বসূরী শেখ মুজিবকেও বার বার সেই একই ছুরির মোকাবিলা করতে হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে খোন্দকার মোশতাকের সাইন বোর্ড চুরি থেকে শুরু করে সত্তরের দশকের আগস্ট-হত্যাকাণ্ড এবং সর্বশেষে নব্বুইয়ের দশকে ডঃ কামাল হোসেনের একই আগস্ট মাসে গণফোরামের সাইনবোর্ড তোলার মধ্যে ব্যবধান শুধু সময়ের, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যবধান খুবই কম।

ষাটের দশকের মধ্যভাগে এক রাতে মানিক মিয়ার 'মাজেদা ভিলার' বাসায় যে ঘরোয়া বৈঠক হয়েছিল, তার বিবরণ মানিক মিয়ার মুখে একাধিকাবার আমি শুনেছি। ছয় দফার আন্দোলনে দীর্ঘ কারাবাসের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং রুগ্নদেহে মাজেদা ভিলাতেই বাস করতে থাকেন। 'ইত্তেফাকের' প্রকাশনা তখনো নিষিদ্ধ।" সুতরাং প্রায় প্রতিদিন ধানমণ্ডিতে তাঁর বাসায় যেতে হতো, কখনো টেলিফোনে তার ডাকে, কখনো বিনা ডাকেই। পেছনের বারান্দায় একটি ইজি চেয়ারে শুয়ে তিনি

ঘন্টার পর ঘন্টা আমার সঙ্গে গল্প করতেন। মাঝে মাঝে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরাও আসতেন। এই সময় মানিক মিয়া সিদ্ধান্ত নেন, তিনি কলম হাতে নিয়ে লিখতে অভ্যস্ত নন বলে টেপ মেশিনে তার জীবন কাহিনী বলতে শুরু করবেন। তার ভয় ছিল, অসুস্থতার দরুন তিনি আকস্মিকভাবে মারা যেতে পারেন। তাঁর ছোট ছেলে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এই টেপ রেকর্ডের ব্যবস্থা করেন। তাঁর কিছু কথার শ্রুতলিখনও হয়েছে বলে আমার জানা। পরবর্তীকালে (মানিক মিয়ার মৃত্যুর পর) 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর নামে' তাঁর এই বক্তব্য সম্বলিত একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনের বহু দুর্যোগময় মুহূর্তের বহু নেপথ্য ঘটনা, যা তিনি তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চের' একাধিক লেখায় উল্লেখ করেছেন, বা টেপে বাণীবদ্ধ করেছেন, তার অনেক কাহিনী কেন বাছাই করে আজ পর্যন্ত বই হিসেবে বের হয় নি, তা আমার জানা নেই। এসব লেখা বই হিসেবে বের হলে তা হবে আমাদের সংবাদ-সাহিত্যের এবং ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ।

শেখ মুজিবের ছয় দফা আন্দোলন সম্পর্কে মানিক মিয়ার মনে প্রথম দিকে একটা ক্ষোভ ছিল এই যে, তাঁকে ঘরোয়া বৈঠকে এই দাবিগুলোর কথা জানানো হলেও জনসাধারণের কাছে কর্মসূচী হিসেবে পেশ করার আগে তাঁর সাথে আলোচনা করা হয় নি। তিনি 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর' বইয়ে লিখেছেন, "৬ দফার কোনো কোনো দফা আমি সমর্থন করি না সত্য, কিন্তু ৬ দফা ভালো কি মন্দ, সেই প্রশ্ন মুলতুবি রাখিয়াও আমি বলিতে চাই যে, এই কর্মসূচী সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার পূর্বে আমার সাথে কেহ কোনো পরামর্শ করে নাই। ...... আমি এখনো বিশ্বাস করি, ৬ দফা একটি রাজনৈতিক প্রোগ্রাম মাত্র এবং রাজনৈতিক পর্যায়েই ইহার মীমাংসা হওয়া উচিৎ। ...... প্রবীণেরা যেখানে হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন, নবীনেরা সেখানে নির্যাতন-নিপীড়নের মুখে বেপরোয়া হইয়া ওঠেন। ইহাই তারুণ্যের স্বভাব- ধর্ম। পূর্ব পাকিস্তানী তরুণদের মধ্যে এই বেপরোয়া মনোভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।" (পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৮)।

মানিক মিয়া সেই স্বেচ্ছাগৃহবন্দী জীবনেও উপলব্ধি করেছিলেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি প্রবীন ও তরুণদের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পোলারাইজেসনের দিকে যাচ্ছে। প্রবীনেরা তখনো জোড়াতালির ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তরুণেরা এমন এক রেডিক্যাল পথে এগুতে চান, যে পথ প্রবীনদের পথের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ছয় দফা তার বিকল্প। কিন্তু ডান ও বামের, এমনকি স্বদলেও একটা প্রবল প্রবীন অংশের ক্রমাগত বিরোধিতার মুখে কেবল 'এডভেনচারিস্ট' (মানিক মিয়ার ভাষায়) তরুণদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে শেখ মুজিব কতটা

এগুতে পারবেন, তা নিয়ে মানিক মিয়ার মনে গভীর সন্দেহ ছিল। তিনি ভয় করতেন এই আন্দোলনের রক্তাক্ত এবং বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটতে পারে।

ষাটের দশকের শেখ মুজিবের মনেও এই সংশয় ও শঙ্কা যে একেবারে ছিল না তা নয়। আর এখানেই আসে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের নেপথ্য ভূমিকার কথা। শুধু ছয় দফার কর্মসূচী ঘোষণার ব্যাপারে নয়, আন্দোলন চলার সময়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলার সেই রুদ্ধবাক দিনগুলোতে, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে, প্যারোলে শেখ মুজিবের মুক্তির প্রস্তাব জানানো হলে, বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে স্বাধীন বাংলার পতাকা প্রথম তোলার আগে, মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়ংকর অনিশ্চিত মাসগুলোতে ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের নেপথ্য ভূমিকা কিভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার তথ্য ও বিবরণ ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস থাকবে অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত। আমি সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, নিজে যতটুকু জানি, তা এখানে উল্লেখ করবো।

বাইশ

"Facts do not cease to exist
because they are ignored."
— Aldous Huxley

কত বছর আগে কথাটা বলেছিলেন অলডাস হাক্সলি, কিন্তু আজও মনে হয় কথাটা কত সত্য; বিশেষ করে বাংলাদেশ, শেখ মুজিব এবং বেগম মুজিব সম্পর্কে। নিরন্তর প্রয়াস চলছে তাদের নাম মুছে ফেলতে। কিন্তু সেই অকথিত, অবজ্ঞাত সত্য মুছে ফেলা যাচ্ছে না। বরং নিজের প্রভায় তার অস্তিত্ব দীপ্যমান মুছে ফেলা ইতিহাসের পাতাতেও।

১৯৬৬ সালের গোড়ার কথা। তখনো ছয় দফার আন্দোলন শুরু হয় নি। এমন কি ছয় দফা কর্মসূচীও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় নি। বঙ্গবন্ধু তখন ঢাকার গুলিস্তান সিনেমার কাছে তখনকার 'আলফা ইনস্যুরেন্সে'র ভবনে নিয়মিত বসেন। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে আমি বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

একদিন দুপুরে দেখি বঙ্গবন্ধু আলফায় তাঁর নিজের কামরায় একাকী বসে আছেন। তাঁর মুখ খুব গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো খারাপ খবর? তিনি জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, একটা মুভমেন্ট শুরু করতে চাচ্ছি। এই মুভমেন্ট ছাড়া বাংলার মানুষের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বললাম, সেজন্যই কি আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে?

বঙ্গবন্ধু বললেন, না, আমার চিন্তার কারণ ভিন্ন। মুভমেন্ট তো শুরু করতে চাই, কিন্তু জোরালো সমর্থন পাচ্ছি না অনেকের কাছ থেকে। 'ইত্তেফাকের' মানিক মিয়া দ্বিধাগ্রস্ত, আমার দলের প্রবীন নেতারা ভীত। অথচ দলের তরুণ ও ছাত্রদের মধ্যে অদম্য উৎসাহ। তাদের ইচ্ছা আমি এগিয়ে যাই।

বললাম, তাহলে তো আপনাকে এগিয়ে যেতেই হবে।

ঃ আমি গ্রীন সিগন্যালের অপেক্ষায় রয়েছি। বঙ্গবন্ধু বললেন।

ঃ আপনাকে আবার গ্রীন সিগন্যাল কে দেবেন?

ঃ তোমাদের ভাবী। বঙ্গবন্ধু পাইপে টোবাকো পুরলেন। বললেন, এবার যে আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছি, তা খুবই বিপজ্জনক। আন্দোলনে জয়ী হতে না পারলে কেবল জেল জুলুমেই সব শেষ হবে না। হয়তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলানোরও ব্যবস্থা হতে পারে। এত বড় ঝুঁকি নেওয়ার আগে তোমাদের ভাবীর সঙ্গে একটা খোলাখুলি আলোচনা দরকার।

ঃ যদি তিনি অনুমতি না দেন? আপনাকে এত বড় ঝুঁকি নিতে বারণ করেন?

বঙ্গবন্ধু বললেন, সে কথা ভেবেও আমি চিন্তিত। আমি আর কারো বিরোধিতাকে ভয় করি না। কিন্তু হাসিনার মা বেঁকে দাঁড়ালে অমার পক্ষে মুভমেন্টে নামা কষ্ট হবে।

বললাম, আওয়ামী লীগের প্রবীন নেতারা তো এমনিতেই বেঁকে বসে আছেন বললেন।

বঙ্গবন্ধু বললেন, প্রবীন নেতাদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। প্রবীনেরা সকল কাজেই বিরাট বাধা। আন্দোলন শুরু হলে তারা নিজেরাই ঝরে পড়বেন। আমার বল ভরসা দলের তরুণ নেতা ও কর্মীরা। বিভিন্ন জেলা থেকে তারা উঠে আসতেও শুরু করেছে। তাজউদ্দিন তো আমার সঙ্গে আছেই। পাবনা থেকে আসছে মনসুর আলী। রাজশাহী থেকে কামরুজ্জামান, ময়মনসিংহ থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এরা সকলেই পুরোপুরি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে উঠে এলে আওয়ামী লীগের চেহারা ফিরে যাবে। দলের শক্তি, সাহস, গতিও বাড়বে। তখন আমাকে কোনো কিছু নিয়ে বার বার বাধা পেতে হবে না।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাক্লিষ্ট ভাব অনেকটা কেটে গেল। ততক্ষণে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর কামরার বাইরে বহু লোক অপেক্ষা করছেন। সুতরাং সেদিনের মতো বিদায় নিলাম।

কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যায় বত্রিশ ধানমণ্ডির বাসায় গিয়ে দেখি, দোতলার সামনের ঘরে বসে বেগম মুজিব তার পানের থালায় পান সাজাচ্ছেন। আমাকে

দেখে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললেন, কি ভাই, আজকাল যে এদিকে বড় একটা দেখি না। আল্ফাতেই বসে বুঝি সব পরামর্শ করা হয়।

বললাম, না ভাবী, জানেন তো আমি এখন একটা সান্ধ্য দৈনিক বের করছি। এত ব্যস্ত থাকি যে, সবসময়ে এত দূরে আসতে পারি না।

ভাবী বললেন, এবার আপনারা বাঘের পিঠে সওয়ার হতে যাচ্ছেন। হয় বাঘ আপনাদের বশ করতে হবে, নয় বাঘই আপনাদের খাবে।

মনে হল, বঙ্গবন্ধু তার আন্দোলন সম্পর্কে হয়তো তাঁকে কোনোকিছু আভাস দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, মুজিব ভাই কি আপনার সঙ্গে কোনো কথা আলোচনা করেছেন? বেগম মুজিব হেসে ফেললেন। মুখে পান পুরে বললেন, আলোচনা করবেন কি, আমি সব টের পাই। তাকে আমি বলেছি, বুড়াদের নিয়ে আপনি এত ঘাবড়ান কেন? আপনার রয়েছে হাজার হাজার তরুণ কর্মী, ছাত্র, যুবক। তারা আপনার ডাক শুনলে হাসিমুখে আন্দোলনে ঝাঁপ দেবে। আমি শেখ মুজিবের স্ত্রী, এই পরিচয় নিয়ে মরলেও খুশি হব। ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর বড় সাহেবের বিবি এই পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য আমি বছরের পর বছর ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্ট করি নাই।

আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, আমি সেদিন খুবই বিস্মিত হয়ে বেগম মুজিবের দিকে তাকিয়েছিলাম। যাকে আমি সব সময় ভেবেছি, একজন সাধারণ বাঙালী মহিলা, রাজনীতি থেকে বহু দূরে তার অবস্থান এবং শেখ মুজিবের ঘরের কর্ত্রী হয়েই তিনি খুশি, তার মুখে এই কথা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সেদিন আমি প্রথম উপলব্ধি করি, এই সাদাসিধে শাড়ি পরা, মুখে পান, একেবারেই সাধারণ দেখতে মহিলা মোটেই সাধারণ নন। তাঁর মধ্যে এমন কিছু অসাধারণত্ব লুকিয়ে আছে, যা আমরা সহজ চোখে দেখতে পাই না। শেখ মুজিবের জীবনে, তার সকল রাজনীতিতে এই মহিলা আজ তাই সত্য সত্যই সবুজ সঙ্কেত দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

কয়েকদিন পর এক রবিবারের দুপুরে গেলাম আবার ধানমণ্ডিতে। বঙ্গবন্ধুর কাছে নয়, তাঁর বাসার পেছনে বেগম বদরুন্নেসার (বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি শিক্ষামন্ত্রকের মন্ত্রী হয়েছিলেন। লণ্ডনে ক্যান্সার রোগে তিনি মারা যান) বাসায়। তার স্বামী সরকারী বন বিভাগের কর্তা ছিলেন। এই বন বিভাগ সংক্রান্ত একটা খবরের ব্যাপারেই সম্ভবত বেগম বদরুন্নেসার বাসায় গিয়েছিলাম। আলাপ আলোচনা শেষে চা খেতে বসেছি, বঙ্গবন্ধু এসে হাজির। পরনে লুঙ্গি, গায়ে হাতকাটা হাওয়াই শার্ট, মুখে পাইপ। হাঁক দিয়ে বললেন, কই হে নূরুদ্দিন (বদরুন্নেসার স্বামী), গাফ্ফার চৌধুরীকে ডেকে এনে খুব চা খাওয়াচ্ছো, আমার চা কই?

নূরুদ্দিন আহমদকে কিছু বলতে হল না। বেগম বদরুন্নেসা আবার ট্রেতে চা-কেক সাজিয়ে ড্রয়িং রুমে এলেন। বললেন, আপনি আজ বাসায় আছেন জানতাম না।

বঙ্গবন্ধু তাঁর হাতের বইটা দেখিয়ে বললেন, ঘরে বসে বসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ছিলাম। কোন্ কবিতাটা জানো? বলেই ভরাট গলায় আবৃত্তি করলেন,

"মা কাঁদিছে পিছে
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে,
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে,
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল,
যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল
এসেছে আদেশ
বন্দরের কাল হল শেষ।"

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি আমারও খুব প্রিয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভরাট গলায় সেদিন এই কবিতার আবৃত্তি আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন অর্থবোধক মনে হল। চা পান শেষে বড় রাস্তায় না গিয়ে দুই বাড়ির মাঝখানের ভাঙা পাঁচিলের পায়ে চলা পথ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে ঢুকলাম। বঙ্গবন্ধুকে আজ খুব হাল্কা, হাসিখুশি মনে হচ্ছিল। বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে পাইপে আগুন ধরালেন। বললেন, চৌধুরী, গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে গেছি। এখন তোমাদের মুজিব ভাইকে আর ঠেকায় কে?

দারুণ উত্তেজনা অনুভব করলাম মনে। বললাম, তাহলে আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছেন? বঙ্গবন্ধু রহস্যময় হাসি হাসলেন। বললেন, এখনই নয়। লাহোরে সর্বদলীয় সম্মেলনে যাচ্ছি। সেখানেই ঘোষণা করবো বাংলার মানুষের পক্ষ হয়ে আমার দাবিনামা। এই দাবি না মানলে আন্দোলন। লড়াই।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার এই দাবিগুলো কি?

বঙ্গবন্ধু ঠোঁটে পাইপ চেপে বললেন, এখন বলবো না। সরকার আগে টের পেলে দাবি ঘোষণা করার আগেই আমাকে গ্রেফতার করে জেলে পুরবে। তাই লাহোরে যাত্রা করার আগে তোমাদের দু'একজনের কাছে বলবো। আমি লাহোরে পৌঁছে সম্মেলনে দাবিগুলো পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তা ঢাকায় প্রকাশ করবে। সুতরাং প্রস্তুত থেকো, আমি যে কোনো দিন তোমাকে এবং সিরাজকে (শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন) আলফার অফিসে ডেকে পাঠাতে পারি।

বলেই তিনি গুণ গুণ করে গান গাইতে শুরু করলেন, "জয় হবে জয় হবে হবে জয়/মানবের তরে মাটির এ পৃথিবী, দানবের তরে নয়।"

ষাটের দশকেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে নিজের চোখে দেখা একদিনের ঘটনা। আমি তখন একটি দৈনিক কাগজের সহকারী সম্পাদক। রিপোর্টার নই। ফলে বিশেষ আদালতে মামলার আসামী হিসেবে শেখ মুজিবসহ সকল বন্দীকে যখন কাঠগাড়ায় আনা হতো, তখন মামলার প্রতি তারিখেই আদালতে যেতে পারতাম না। মাঝে মাঝে যেতাম। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী তখন যথাযথভাবে, সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করতেন মাত্র দু'টি দৈনিক পত্রিকা—পাকিস্তান অবজারভার (বর্তমানে বাংলাদেশ অবজারভার) এবং আজাদ (ইত্তেফাকের প্রকাশনা তখন নিষিদ্ধ)। এই রিপোর্টিংয়ের ব্যাপারে দৈনিক 'আজাদে'র চীফ রিপোর্টার ফয়েজ আহমদ কখনো কখনো অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শেখ মুজিব তাকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি যখন কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতেন তখন চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাকাতেন। পরিচিতি জনের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। আমরা অনেক সময় তাঁর সঙ্গে সহজভাবে খোলামেলা কথা বলতে ভয় পেতাম। যদি সরকারী গোয়েন্দারা নজর রাখেন এবং রিপোর্ট করেন যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র পন্থায় বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী শেখ মুজিবের সঙ্গে আমাদের কারো গোপন যোগযোগ আছে, তাহলে সর্বনাশ। নতুন আসামী হয়ে ওই কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার আগে গোপন টর্চার চেম্বারে স্বীকারোক্তি আদায়ের নিষ্ঠুর অত্যাচারে দেহে প্রাণটা থাকবে কিনা সন্দেহ। এই ভয়ে শেখ মুজিব আদালতে এসে আমাদের খোঁজখবর নিলেও অনেক সাংবাদিকই তাঁর সঙ্গে সহজ কথাবার্তা বলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। একদিন ফয়েজ আহমদও সম্ভবত আনমনা হয়ে কথা বলেন নি। শেখ মুজিব উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে, ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বাংলার মাটিতে বসে সাংবাদিকতা করতে হলে তোকে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলতেই হবে। ফয়েজ, আমাকে এড়িয়ে তোরা চলতে পারবি?

বিশেষ আদালতে এই মামলা চলার দিনটিতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বেগম মুজিব একবারও স্বামীর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতেন না। তিনি অন্যান্য বন্দীর স্ত্রীর কাছে বসে থাকতেন। ধীর স্থির মূর্তি। হাতে পানের বাটা। মামলার তরুণ আসামীদের অনেক তরুণী স্ত্রী মাঝে মাঝে হতাশায় ভেঙে পড়তেন। কেউ কেউ কেঁদে ফেলতেন। তখন তারা ভাবতেন, এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র মামলা থেকে তাদের স্বামীদের রেহাই নেই। তারা সাজা পাবেন। কঠোর সাজা। হয় প্রাণদণ্ড, নয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ভাগ্য খুবই প্রসন্ন না হলে কারো মুক্তিলাভের আশা নেই। মামলা চলার আগে আসামীদের কারো কারো ওপর চলেছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কঠোর নির্যাতন।

তাদের কেউ কেউ মামলার দিন আদালতে এসে হঠাৎ কেঁদে ফেলতেন। বেগম মুজিব তখন তাদের পাশে গিয়ে বসতেন। কারো চোখের পানি মুছিয়ে দিতেন, কারো মুখে খাবার তুলে দিতেন। নিজের চোখের পানি, নিজের বুকের বেদনা গোপন করে অকম্প কণ্ঠে তাকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা ভেঙে পড়ো না বোন। আল্লার উপর বিশ্বাস রাখো। আইয়ুব-মোনেম খাঁর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। এই মামলায় আমরা জিতবোই। তোমাদের স্বামীর কোনো অন্যায় শাস্তি হলে, শেখ মুজিবকে ফাঁসি দিতে চাইলে বাংলার মানুষ তা সহ্য করবে না, মেনে নেবে না। নিশ্চয় মেনে নেবে না।'

বেগম মুজিবের কথায় কি জাদু থাকতো জানি না, আশ্চর্য হয়ে দেখেছি, তাকে আদালতে দেখলে অনেক অভিযুকোতর হতাশায় ভেঙেপড়া স্ত্রী বা আত্মীয়স্বজন — এমন কি অভিযুক্ত নিজেও খুশি হয়ে উঠতেন। নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। মামলার শুনানী শেষে যখন স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন অভিযুক্তদের সঙ্গে দেখা করার সামান্য সময় পেতেন, তখন তারা আগে কে যাবেন তা নিয়ে তাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি লেগে যেতো। বেগম মুজিবকে সকলেই সসম্মানে আগে যাওয়ার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতেন। তিনি সকলের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেন। হাসিমুখে বলতেন, তোমরা যুবতীরা আগে যাও। তোমাদের তো যুবক স্বামী। আমার বুড়ার কাছে পরে গেলেও চলবে।

তার কথায় সকলেই হাসতেন। সকল দুঃখ কষ্ট ও শঙ্কার কথা ভুলে সকলেই আবার সহজ হয়ে উঠতেন। আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হতো এটা কোনো আদালত ভবন নয়, বরং একটি পারিবারিক মেলা। আর এই পারিবারিক মেলার একমাত্র কর্ত্রী হলেন বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।

তেইশ

উনসত্তরের অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। শেখ মুজিব তখনো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে বন্দী। চারদিকে আন্দোলন, রক্তপাত, ঘেরাও আন্দোলন, জনতা-পুলিশ লড়াই বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্যান্টনমেন্ট শহরগুলোতে মাঝে মাঝে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে চলছে জঙ্গী জনতার ছোটখাটো সংঘর্ষ। রাজধানী ঢাকায় জনতা কারফিউ ভঙ্গ করেছে একাধিকবার। সেনাবাহিনীকে জঙ্গী জনতার সামনে হটে যেতে হয়েছে।

ফেব্রুয়ারী মাস এগিয়ে এলো। বাঙালীর স্বাধিকার আন্দোলন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল। ভীত আইয়ুব রাওয়ালপিণ্ডিতে তার কনভেনশন মুসলিম লীগের সভায় বলে বসলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে'। 'দৈনিক ইত্তেফাক' আবার নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হয়ে প্রকাশিত হল। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তার প্রেস, প্রেসভবন ও পত্রিকা ফেরত পেলেন। আমি আবার ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলাম। এই সময় একদিন খবর প্রকাশিত হল, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য রাওয়ালপিণ্ডিতে সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছেন। তাতে শেখ মুজিবুর রহমানকেও যোগ দিতে দেয়া হবে। কিন্তু শেখ মুজিব যেহেতু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে কারাবন্দী, সেজন্য তাকে প্যারোলে বা সাময়িকভাবে মুক্তি দিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে নেওয়া হবে।

আওয়ামী লীগের অধিকাংশ প্রবীন নেতা ছিলেন শেখ মুজিবের প্যারোলে ছাড়া পেয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পক্ষে। কিন্তু যুব ও ছাত্রনেতারা ছিলেন বিপক্ষে। ইত্তেফাকের মানিক মিয়াও 'দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার স্বার্থে' শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তি নিয়ে পিণ্ডিতে যান—এই পরামর্শ দিলেন। তিনি যুব ও ছাত্রনেতাদের ডেকে এনে বুঝালেন, দেশে আরও রক্তপাত হলে সর্বনাশ হবে। সুতরাং ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবনে আইয়ুব সম্মত হলে একটা আপোষ মীমাংসা করে ফেলাই ভালো। তাতে আর কিছু না হোক, পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরে আসবে। আর আইয়ুবের সঙ্গে শেখ মুজিবের একটা রাজনৈতিক আপোষ হয়ে গেলে প্রেসিডেন্ট তার বিশেষ ক্ষমতাবলে ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিয়ে শেখ মুজিবসহ সকল বন্দীকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করেও দিতে পারেন। সুতরাং আর ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।

গোলটেবিল বৈঠকের দিন ধার্য হয়ে গেল। পাকিস্তানের দুই অংশের সকল নেতাকে এই বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হল। নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ নেতারা দাওয়াত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করাচীতে রওয়ানা হলেন। চট্টগ্রামের মওলবী ফরিদ আহমদ পাকিস্তানে চুন্দ্রীগর মন্ত্রিসভার আমলে কয়েকমাসের জন্য যোগাযোগমন্ত্রী ছিলেন। তার রাজনৈতিক দল ছিল নেজামে ইসলাম। তিনি করাচীতে বসে আইয়ুব সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারীভাবে ঢাকার আওয়ামী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে লাগলেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করাচী গেলেন তাজউদ্দিন আহমদ। তিনি রোজ দুপুরে করাচী থেকে ইত্তেফাক অফিসে টেলিফোন করে মানিক মিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আমি মানিক মিয়ার অদূরে বসে তাদের কথাবার্তা শুনতাম। এসব কথাবার্তা শুনে মনে হল, শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তি নিয়ে করাচিতে যাবেন, সেখান থেকে রাওয়ালপিণ্ডিতে। তাজউদ্দীন

করাচী থেকে তার সঙ্গী হবেন। এখন সেখানে বসে তিনি শেখ মুজিবের পশ্চিম পাকিস্তান সফরের আয়োজন আগাম তদারক করছেন।

গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক। ঢাকা বিমান বন্দরে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটা বোয়িং চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত রাখা হল, শেখ মুজিবকে নিয়ে করাচীতে উড়াল দেওয়ার জন্য। ঢাকায় একদিন জোর গুজব শোনা গেল, শেখ মুজিব আজ পিণ্ডি যাচ্ছেন। তাকে কুর্মিটোলা সেনানিবাসের বন্দীশালা থেকে সরাসরি বিমান বন্দরে নেওয়া হবে। সেখান থেকে সোজা রাওয়ালপিন্ডিতে। গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধীরা বা শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তিলাভ যারা চান না, তারা যাতে শেখ মুজিবের বিমান বন্দরে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে না পারেন বা বিক্ষোভ দেখাতে না পারেন, সেজন্য তার যাত্রার সময় কঠোরভাবে গোপন রাখা হল। আমরা অনুমান করলাম, কোনো এক মাঝরাতে আকস্মিকভাবে তিনি পিণ্ডিতে চলে যাবেন।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন। ঢাকা বিমান বন্দরে অপেক্ষমান পিআইএ'র বোয়িং বিমানটি আর নড়ে না; ওড়াতো দূরের কথা। তাহলে কি হল? শেখ মুজিব কি রাওয়ালপিণ্ডির গোলটেবিল বৈঠকে যাচ্ছেন না? ঢাকার ডেপুটি কমিশনার তখন ছিলেন মোহাম্মদ খোরশেদ আনোয়ার (এম কে আনোয়ার নামে পরিচিত এবং বর্তমানে বিএনপি নেতা। তিনি একদিন আমাকে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন, শেখ মুজিব কবে পিণ্ডি যাচ্ছেন এবং কোন্ রুটে যাচ্ছেন? বুঝলাম পাকিস্তানের মিলিটারি ইনটেলিজেন্স পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল অথরিটির কাছেও শেখ মুজিবের রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রার দিনক্ষণ গোপন রেখেছেন। ইত্তেফাক অফিস তখন আওয়ামী লীগ রাজনীতির একটি দূর্গ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সেই দূর্গে বসে আমিও যে শেখ মুজিবের রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়া সম্পর্কে আসল খবর রাখি না, সে কথা এম কে আনোয়ারের কাছে আমাকে কবুল করতে হল।

একদিন দুপুরের দিকে (এই ডামাডোলের দিনগুলোতে) ইত্তেফাকের তখনকার প্রধান সম্পাদকীয় কক্ষে (মানিক মিয়ার কক্ষ) বসে সেদিনের সম্পাদকীয় লিখছি, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। করাচীর টেলিফোন। তাজউদ্দিন কথা বলতে চান মানিক মিয়ার সঙ্গে। মানিক মিয়া তখনো অফিসে আসেনি। সেকথা তাজউদ্দিনকে জানাতেই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, লীডার কি গোলটেবিলে আসছেন গাফ্ফার?

বিস্মিত হয়ে বললাম, আপনি সে কথা আমার মতো চুনোপুটির কাছে জানতে চান তাজউদ্দিন ভাই?

তাজউদ্দিন বললেন, আমি পরস্পর বিরোধী খবর পাচ্ছি। মানিক মিয়া বলছেন, মুজিব ভাই আসছেন। আবার আওয়ামী লীগের অন্যসুত্রে থেকে জানতে পারছি, তিনি আসছেন না। তিনি যদি নাই আসেন, তাহলে আমি করাচীতে বসে বসে কি করবো? মানিক মিয়াকে বলবেন, আমাকে টেলিফোন করতে। আমি ঢাকায় চলে আসবো কিনা জানতে চাই।

তাজউদ্দিন টেলিফোন ছেড়ে দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে মানিক মিয়া এসে গেলেন। তাকে তাজউদ্দিনের টেলিফোনের কথা বলতেই বিমর্ষভাবে তিনি বললেন, আমি চেষ্টার অসাধ্য কাজ করেছি। কয়েকবারইতো শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেছি। তাকে প্যারোলে অবিলম্বে পিণ্ডি রওয়ানা হওয়ার গুরুত্ব বুঝিয়েছি। তাকে দোমনা মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নেবেন আমি জানি না। এই আলাপ-আলোচনা ভেঙে গেলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে তা আমি ভাবতেও পারছি না।

বলে অনেকটা যেন হতাশায় ভেঙে পড়েছেন, এমনভাবে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। বললেন, আজ আর মঞ্চ (রাজনৈতিক মঞ্চ) লিখতে ইচ্ছে করছেনা। আপনি একটা সাবজেক্ট বেছে নিয়ে আপনার 'দশদিগন্তে' কলামটা লিখে ফেলুন।

ওইদিন বিকেলেই মানিক মিয়ার ছোট ছেলে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং তখনকার ছাত্রনেতা আবদুল কুদ্দুস মাখনের সঙ্গে 'ইত্তেফাক' অফিসে দেখা হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে আ স ম আবদুর রব। সেও তখন ছাত্র লীগের প্রভাবশালী নেতা। ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যে এই রবের সঙ্গেই ছিল আমার সবচাইতে বেশি ঘনিষ্ঠতা। ছয় দফার আন্দোলনে আমি তার সঙ্গে করটিয়া, ময়মনসিংহ, জামালপুর, সরিষাবাড়ি প্রভৃতি বহু জায়গা এক সময় ঘুরে বেড়িয়েছি। রবকে আমার ভালো লাগতো। তাকে আমার তখন মনে হতো আগুনের ফুলকি। গরীবের ছেলে। সুবিধাবাদী না হয়ে সংগ্রামের পথে নেমে এসেছিল। শেখ মুজিব তাকে খুবই স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে লেখাপড়ার খরচ জোগাতেন। আর রবও কণ্ঠস্বরে, বাচনভঙ্গীতে, কথাবার্তায়, বক্তৃতায় শেখ মুজিবের হুবহু অনুকরণ করার চেষ্টা করতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই আ স ম রবের পদস্খলন ও অধঃপতন আমাকে বিস্মিত করেছে। এখন তার মধ্যে ষাটের দশকের আগুন আর নেই। শুধু ভস্ম পড়ে আছে।

উনসত্তরের ফেব্রুয়ারী মাসের এক বিকেলে 'ইত্তেফাক' অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আ স ম আবদুর রব প্রথম আমাকে জানালেন, শেখ মুজিবের গোলটেবিলে যোগদানের ব্যাপারে কয়েকটি পূর্বশর্ত আইয়ুব সরকারকে জানানো হয়েছে। শর্তগুলো হলো (ক) শেখ মুজিব বন্দী হিসেবে সম্মেলনে যাবেন না। তিনি মুক্ত নেতা

হিসেবে যাবেন। (খ) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এখনই প্রত্যাহার করতে হবে এবং সকল অভিযুক্তকে মুক্তি দিতে হবে। (গ) ছয় দফা, এগারো দফা এবং অন্যান্য আন্দোলনে বন্দী সকল দলের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। ছাত্র ও শ্রমিক নেতাদের উপর থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা, হুলিয়া, মিথ্যা মামলা তুলে নিতে হবে। সামরিক আইনের প্রয়োগ সম্পূর্ণ বাতিল এবং সভা সমিতি করা ও বাকস্বাধীনতার গ্যারান্টি দিতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই শর্তগুলো কার নির্দেশে তৈরি করা হয়েছে?

রবঃ লীডারের নির্দেশেই।

বললাম, কিন্তু তার উপরতো আওয়ামী লীগের প্রবীন নেতাদের চাপ রয়েছে তিনি যাতে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে গোলটেবিলে যান।

রব বলল, তিনি যাতে এই চাপের কাছে নত না হন, তার ওষুধতো বত্রিশ নম্বরেই রয়েছে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কে, ভাবী? তিনিও কি চান না, তার স্বামী অবিলম্বে মুক্তি পান?

রব বলল, তিনি স্বামীর মুক্তি চান। তবে প্যারোলে নয়।

পরদিন ঢাকায় জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ল, শেখ মুজিব আজ রাওয়ালপিণ্ডি যাচ্ছেন। তিনি প্যারোলেই যাচ্ছেন। কারণ, দেশের সকল প্রবীন নেতা—এমন কি পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতারাও তাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার এই সুবর্ণ সুযোগ তিনি যেন হাতছাড়া না করেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, গতকাল 'ইত্তেফাক' অফিসে বসে আ স ম আবদুর রবের কাছে যে কথা শুনেছি, তা কি তাহলে মিথ্যে হয়ে গেল?

বিকেলে কৌতূহলের বশে এয়ারপোর্ট ঘুরে এলাম। পিআইএ'র দৈত্যকায় বোয়িংটা তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন জানি না, হঠাৎ ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বরে যাওয়ার ইচ্ছে হল। একটা স্কুটার ডেকে বত্রিশ নম্বরে গিয়ে পৌছলাম। তারপর সরাসরি ভাবীর কাছে। তিনি মৃদু হেসে বললেন, হঠাৎ ভাবীর কথা মনে পড়ল যে, উদ্দেশ্য কি? খবর জোগার করা?

ভূমিকা করতে ইচ্ছে হল না। বললাম, মুজিব ভাই কি আজ রাওয়ালপিণ্ডি যাচ্ছেন ভাবী?

বেগম মুজিব নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, না যাচ্ছেন না।

ঃ তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন না?

ঃ দেবেন, তবে আগরতলা মামলা তুলে নেওয়া হলে, তাকে সকল বন্দীসহ

মুক্তি দেওয়া হলে।

ঃ আপনাকে তিনি সেকথা জানিয়েছেন?

ঃ তিনি জানাবেন কেন, আমিই তাকে জানিয়েছি। দেখা করতে গিয়ে মুখে বলেছি। আর ওই যে টিফিন কেরিয়ারটা দেখছেন, যেটা ভর্তি করে রোজ তার খাবার পাঠাই, তাতে ছোট্ট চিঠি লিখে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

ভীষণ কৌতূহল হল। বললাম, ভাবী, চিঠিতে কি লিখেছেন?

বেগম মুজিবের চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই। বললেন, লিখেছি, আপনি যদি প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আইয়ুবের গোলটেবিলে যান, তাহলে বত্রিশ নম্বরে আর ফিরবেন না।

এই চিঠির আসল বিবরণ আমি অরও পরে জেনেছি মানিক মিয়ার মাধ্যমে। তাঁকে এই চিঠির একটা কপি দেখিযেছিলেন তখনকার গোয়েন্দা বিভাগের এক বাঙালি প্রধান।

সেদিন বেগম মুজিবের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারিনি, তিনি সত্যি সত্যি চিঠিতে এ কথাগুলো লিখেছেন, না আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?

পরদিন মানিক মিয়ার কাছেই শুনলাম, শেখ মুজিব আইয়ুব সরকারকে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি প্যারোলে মুক্তি নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি যাচ্ছেন না।

তাহলে?

এই তাহলে'র উত্তর পাওয়া গেল উনসত্তরের এক ঐতিহাসিক দিন বাইশে ফেব্রুয়ারি তারিখে। শেখ মুজিব মুক্ত মানুষ হয়ে কারাপ্রাচীরের আড়াল থেকে ষড়যন্ত্র মামলার সকল বন্দীসহ বেরিয়ে এলেন। সারা ঢাকায় সেদিন উত্তাল জনজোয়ার। জনজোয়ারে শুধুমাত্র একটি গর্জন—জেলের তালা ভেঙেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি।

আমি সেদিন এই মিছিলের দিকে তাকিয়ে কেবল একটি মানুষের কথা ভেবেছি, তিনি বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। যিনি সত্য সত্যই জেলের তালা ভেঙেছেন এবং স্বামীকে মুক্ত মানুষ, মুক্ত নেতা হিসেবে আবার বত্রিশ নম্বরে ফিরিয়ে এনেছেন।

আমার সন্দেহ নেই, বেগম মুজিবকে ছাড়া বাংলার ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হতো।

চব্বিশ

"এই বাড়িটির মালিক কে?
একজন সম্রাট।
কিন্তু তিনি কৃষক ও নিঃস্ব প্রজাপুঞ্জের সম্রাট।
তিনি শাসন করেন না, জনসাধারনকে
পরিচালনা করেন।
তাকে পরিচালনা করেন একজন নারী —
সমস্ত শস্যের ভার তার আনত স্কন্ধে
গোধূলির লালিমা ছড়ানো চোখে মুখে,
তার হাতের মুদ্রায় বরাভয়
চোখে অমর্ত্য লোকের নক্ষত্র-শিখা
তিনি সম্রাজ্ঞী নন, একজন নারী।"
— ব্লেইজ স্যাঁদরার।

বেগম মুজিবের জন্য একজন বিদেশী বিখ্যাত কবির এই কবিতার উপমাটি খাটে কি? আমার তো মনে হয় খাটে। আমি এর চাইতে ভালোভাবে তার কোন তুলনা আর আঁকতে পারি না। একাত্তরের বাইশে মার্চের রাত। ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বরে জড়ো হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রবীন ও নবীন নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীরা। তাদের চোখে মুখে আকুল উদ্বেগ। আগামীকাল তেইশে মার্চ। পাকিস্তান দিবস। ১৯৪০ সালে এই দিনটিতে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে প্রথম পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। তার দীর্ঘ ষোল বছর পর ১৯৫৬ সালের এই তেইশে মার্চ তারিখেই পাকিস্তানের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক। আবার ১৯৫৬ সালের ২৩ শে মার্চ তাঁর উদ্যোগে ও নেতৃত্বেই পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। অদৃষ্টের পরিহাস, এই পাকিস্তানেরই জীবদ্দশায় ফজলুল হক সবচাইতে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন, এমনকি 'ট্রেইটর আখ্যাও লাভ করেছিলেন। ঢাকার একটি কাগজে আমার এক বন্ধু-কলামিষ্ট লিখেছেন, ফজলুল হককে শেরে বাংলা খেতাবটি সম্ভবত মোহাম্মদ আলী জিন্না দিয়েছেন। কথাটি ঠিক নয়। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ফজলুল হক একটু দেরি করে পৌঁছেন। এই সময় জিন্না মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ফজলুল হক তার বক্তৃতার মাঝখানে সভামঞ্চে এসে পৌছলে সমবেত জনতা জিন্নার বক্তৃতায় কান না

দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গগন বিদারি কণ্ঠে শ্লোগান দিতে শুরু করে 'শেরে বাংলা জিন্দাবাদ।' শেরে বাংলা খেতাবটি জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হক সাহেবকে উপহার দেয়। সেই বিপুল জনতার শ্লোগানের মধ্যে জিন্নার বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "শের যখন এসে গেছেন, তখন মেষের পক্ষে জায়গা ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন।" বলে জিন্না যখন তার চেয়ারে বসতে যাচ্ছিলেন, তখন ফজলুল হক তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বলেন, 'আপনি আমাদের রাহবার (পথপ্রদর্শক)'। ১৯৪০ সালের পর থেকে প্রতিবছর ২৩শে মার্চ অবিভক্ত ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘুরা দিনটিকে পাকিস্তান দিবস হিসেবে পালন করেছে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান পার্লামেন্টে গৃহীত হওয়ার পর পাকিস্তানে এই দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবস (Republic day) হিসেবে পালন শুরু করেছিল।

১৯৭১ সালের ২২শে মার্চ রাত্রে পরদিন পাকিস্তান দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা নিয়েই ছিল ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে সমবেত আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। সে সময় মুজিব, ইয়াহিয়া ও ভূট্টোর মধ্যে যতই ঘনঘন বৈঠক বসুক না কেন, দেশের মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এখন অপ্রতিরোধ্য এবং অনিবার্য। মার্চ মাসের শুরু থেকেই ঢাকায়বিভিন্ন স্থানে একটি নতুন পতাকার আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেল। সবুজের বুকে লাল সূর্য, তার বুকে বাঙলাদেশের হলুদ রঙা মানচিত্র। এমনকি একদিন জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকের জন্য ঢাকায় তখনকার প্রেসিডেন্ট ভবেন যাওয়ার সময় শেখ মুজিবের সাদা টয়োটা গাড়িতে দেখা গেল, সেই নতুন পতাকা উড়ছে। কেউ মুখ ফুটে না বললেও অনেকেরই বুঝতে বাকি রইল না, বাংলাদেশ যদি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে, তাহলে এই পতাকাই হবে স্বাধীন বাংলার নতুন জাতীয় পতাকা।

একাত্তরের সেই বাইশে মার্চের মধ্যেই ঢাকার রাজনৈতিক মহলে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল যে, মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বৈঠক হয়তো সফল হতে যাচ্ছে না। শেখ মুজিবের সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্পে আলোচনায় এসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শুধু কালহরণের কৌশল গ্রহণ করেছেন এবং সেই সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গোপনে প্লেন ভর্তি সৈন্য ও অস্ত্র আমদানি করছেন পূর্ব পাকিস্তানে। এই পরিস্থিতির মুখেই আওয়ামী লীগের যুব নেতা ও কর্মীরা, বিশেষ করে ছাত্রলীগের রেডিক্যাল গ্রুপের নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তেইশে মার্চ তারিখে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে তারা ঘরে ঘরে, দোকানপাটে নতুন পতাকা তুলবেন। তেইশ মার্চ ভোরে বঙ্গবন্ধু নিজেও তাঁর বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে এই পতাকা তুলবেন।

আওয়ামী লীগের প্রবীন নেতাদের ভয় ও উদ্বেগ ছিল এখানেই। বাইশে মার্চের সেই রাত্রিতে তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কর্নেল (পরে জেনারেল)

ওসমানীসহ আওয়ামী লীগের তৎকালীন বহু নেতা উপস্থিত ছিলেন বত্রিশ নম্বরে। কয়েকজন প্রবীণ নেতার অভিমত ছিল, বঙ্গবন্ধুর নিজের হাতে পতাকা ওড়ানো ঠিক হবে না। পাকিস্তানের মিলিটারি জুন্টার মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে না, তারা নির্বাচনের রায় মেনে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে নতুন সরকার গঠন করতে দেবেন এবং ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের নতুন সংবিধান রচনায় সম্মত হবেন। তারা সুযোগ খুঁজছেন কিভাবে বাঙালীদের উপর দমন নীতি চালানো যায়। এ জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গোপনে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সৈন্য আমদানি অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে তাঁর বাড়িতে পতাকা উড়ালেই সামরিক জুন্টা এটাকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ আখ্যা দেবেন এবং বিশ্ববাসীকে বোঝাবেন, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে আপোস আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি ছিলেন। কিন্তু এই দলটি পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়ায় জুন্টা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগে বাধ্য হয়েছেন।

যুব নেতারা যুক্তি দেখালেন, সামরিক জুন্টা শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল তখন নিষিদ্ধ থাকায় কলম্বো হয়ে পাকিস্তানী বিমানে এই সেনা আমদানী চলছে। যেকোনো সময় হামলা শুরু হতে পারে। সুতরাং জনগণের কাছেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ও আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত আর অস্পষ্ট রাখা উচিত নয়। কূটনৈতিক চালের ও বোলচালের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন তেইশে মার্চ ভোরে পাকিস্তানী পতাকার বদলে নতুন পতাকা দেখলেই দেশের মানুষ বুঝতে পারবে, তাদের নেতা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নইলে পাকিস্তানী হামলা শুরু হলে জনসাধারণও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে। নেতা তাদের কোন পথে যেতে বলছেন, তা তারা বুঝতে পারবে না। জনসাধারণকে সে কথা জানানোর সুযোগ হয়তো নেতার থাকবে না।

এই বিতর্ক চলল মাঝ রাত্রি পর্যন্ত। বঙ্গবন্ধু দু'পক্ষের বক্তব্যই শুনছেন, কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন না। কিছুক্ষণের জন্য সভা মূলতুবি রেখে তিনি বাড়ির ভেতরে গেলেন খাওয়ার জন্য। নেতা ও কর্মীদের খাবার দেওয়া হল। বত্রিশ নম্বরের গেটের বাইরে, চারপাশে সেই মধ্যরাতেও হাজার হাজার জনতা। তাদের মুখে একটি মাত্র শ্লোগান, "আপোসের মুখে লাথি মারো, স্বাধীনতা ঘোষণা কর।" খেতে বসেও বঙ্গবন্ধুকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে বেগম মুজিব জিজ্ঞাসা করলেন, পতাকা ওড়ানোর ব্যাপারে আপনি কি কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন? বঙ্গবন্ধু বললেন, 'না নিতে পারি নি। আমি পতাকা ওড়াতে চাই। একটাই ভয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখনো ঢাকায়। পাকিস্তানীরা বলবে, আলোচনা চলা অবস্থাতেই শেখ মুজিব নতুন পতাকা উড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এই অজুহাত তুলেই তারা নিরস্ত্র বাঙালীর উপর সামরিক হামলা চালাবে।'

বেগম মুজিব বললেন, সেই সাতই মার্চের অবস্থা আবার? স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে বিপদ। আবার না দিলেও চলে না। তাই ৭ই মার্চের ঘোষণায় স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আপনাকে বলতেই হয়েছিল। এখনো সেরকম একটা কিছু করুন। যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে।

বঙ্গবন্ধু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, রেনু, তুমিই বলো, আমি কি করবো? সাতই মার্চ তারিখে তো তুমিই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলে।

বেগম মুজিব বললেন, আপনি ছাত্রনেতাদের বলুন, আপনার হাতে পতাকা তুলে দিতে। আপনি সেই পতাকা বত্রিশ নম্বরে ওড়ান। কথা উঠলে আপনি বলতে পারবেন, আপনি ছাত্র-জনতার দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আর একটি কথাও বললেন না। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের জানালেন, তিনি আগামীকাল বত্রিশ নম্বরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াবেন। জয় বাংলা শ্লোগানে সেই মাঝরাতে বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডি মুখর হয়ে উঠেছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর ডিকটেসন নিতে গিয়ে একাত্তর সালের বাইশে মার্চের রাতের এই ঘটনাটির কথা বঙ্গবন্ধুর মুখেই প্রথম শুনি। তাঁর মুখেই শুনেছি, পনর দিন আগের অর্থাৎ সাতই মার্চের ঘটনাও। রমনার জনসভায় যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুকে বাইশে মার্চ তারিখের রাতের মতো একই বিপদে পড়তে হয়েছিল। আওয়ামী লীগের রেডিক্যাল অংশ বিশেষ করে যুব ও ছাত্র নেতারা চাচ্ছিলেন, বঙ্গবন্ধু ওইদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। দলের বেশ কয়েকজন প্রবীন নেতা তার বিরোধিতা করেন। তাদের যুক্তি ছিল, পাকিস্তানের মিলিটারি জুন্টা এটাকে ইউডিআই (Unilateral declaration of Independence) বা একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা' বলে প্রচার চালাবে এবং এই বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনের নামে বাংলাদেশে রক্তগঙ্গা বহাবে। বিশ্ববাসীর তখন আর কিছু বলার থাকবে না। এ বিতর্কে সেদিনও বেগম মুজিব স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, "আপনার মন কি চায়?" বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাই। আজ সেই ঘোষণা না দিলে আর হয়তো তার সুযোগ পাব না। আর আমি বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা না করলে আর কোনো নেতা হয়তো এই কাজটি করতে সাহস পাবেন না। ফলে দেশের মানুষ বিভ্রান্ত হবে। তার সুযোগ নেবে পাকিস্তানী শাসকেরা।" বেগম মুজিব বললেন, "আপনার মন এবং বিবেক যা চায়, আজ তাই করুন। ভয়ে পিছিয়ে যাবেন না।" বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমি স্বাধীনতার ঘোষণা দেব। তবে সোজা ঘোষণা নয়। ঘুরিয়ে বলবো। যাতে ইয়াহিয়া-ভুট্টো ইউডিআই'র অভিযোগ তুলতে না পারে, অপ্রস্তুত ও নিরস্ত্র বাঙালীর

উপর হামলা চালানোর অজুহাত না পায়।"

বেগম মুজিবের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর এই আলাপ আলোচনাই হচ্ছে ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের পটভূমি। যে ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

একাত্তরের সাতই মার্চের সকাল থেকে ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন সাহসী বাঙালী অফিসার গোপনে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের তৎপরতার বিভিন্ন খবর জানাচ্ছিলেন। তার মধ্যে একটা খবর ছিল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাঞ্জাব ও বালুচ রেজিমেন্টের একটি ক্রাক ইউনিট তৈরি রাখা হয়েছে। রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সময় তারা মাঠের অদূরেই শান্তি রক্ষার নামে মোতায়েন হবে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তারা জনসভার উপর গুলি চালাবে এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল নেতাকে গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাদের পাতা ফাঁদে পা দিলেন না। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণাটি ভাষার এমন আবরণে পুরে দিলেন যে, সভার লক্ষ লক্ষ জনতা তার অর্থগ্রহণে দেরি করে নি। কিন্তু ওয়েয়ারলেস হাতে পাকিস্তানী অফিসারেরা বহুক্ষণ ধরে বুঝতে পারেন নি, বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আসল তাৎপর্য কি? সাতই মার্চ তারিখে এইভাবে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর শেষ চালটিও ব্যর্থ হয়ে যায়।

একাত্তরের তেইশে মার্চের কথায় ফিরে যাই। এই দিন সকালে ঘুম থেকে জেগে ঢাকার রাস্তায় বেরিয়ে নিজেকেই নিজের কাছে রিপভ্যান উইঙ্কেলের মতো মনে হল। মনে হল, এ কোন্ নতুন দেশ? কাল রাতেও তো এদেশে আমি ছিলাম না। ঢাকা শহরের সকল বাড়ির ছাদে, দোকানপাটে, এমন কি কোনো কোনো অফিস আদালতে নতুন পতাকা উড়ছে। কোথাও পাকিস্তানী পতাকার চিহ্ন নেই। পাকিস্তানের তাহরিকে ইসতেকলাল পার্টির নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান এ সময় ঢাকায় ছিলেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে সাংবাদিকদের কাছে বলেন, "২৩শে মার্চ ঢাকা শহরে একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া আমি আর কোথাও পাকিস্তানী পতাকা দেখি নি। মনে হচ্ছিল সারা বাংলাদেশে ওই ক্যান্টনমেন্টই হচ্ছে পাকিস্তানের সামান্য ভূখণ্ড।"

সেদিন রিকশায় চাপতে আর ইচ্ছে হয় নি। অভয় দাস লেন থেকে নতুন পতাকা শোভিত রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে গিয়ে শুনি নতুন খবর। পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে ২৩শে মার্চ তারিখে ঢাকার বিদেশী দূতাবাসগুলো তাদের ভবনে পাকিস্তানী পতাকা ওড়ায়। এবার আমেরিকান দূতাবাসে পাকিস্তানী পতাকা তোলা হয় নি। অন্যদিকে বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশন অফিসে জনতা গিয়ে হাজির হতেই স্বাধীন বাংলার নতুন পতাকা তারা

তাদের ভবনে তুলেছেন। আগে তারাও পাকিস্তানী পতাকা তোলেন নি। একমাত্র চীনা দূতাবাস পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়েছে। হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতার দাবির মুখেও তারা সেই পতাকা নামাতে রাজি হয় নি। ফলে দূতাবাস আক্রান্ত হয়েছে। জনতা চীন এবং পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। দূতাবাসের চীনা কর্মচারীদের সঙ্গে জনতার ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতি হয়েছে।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য সাংবাদিকেরা বত্রিশ নম্বরে ছুটছিলেন। আমিও তাদের সঙ্গ নিলাম। বত্রিশ নম্বরে পৌঁছে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। আমি সোজা উপরে চলে গেছি। বেগম মুজিব চা খাচ্ছিলেন। আমাকে এক কাপ দিলেন। দেখলাম, তাঁর চোখে মুখেও উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার চাপ। মৃদু কণ্ঠে বললেন, "এবার শত্রু আর মিত্র চিনতে পারলেন তো?"

বললাম, কাদের কথা বলছেন ভাবী?

"কেন, চীনা দূতাবাসের ঘটনা জানেন না?" বেগম মুজিব জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম জানি। বেগম মুজিব আর কোনো মন্তব্য করলেন না। আর কোনো মন্তব্য করার সেদিন দরকারও ছিল না।

পঁচিশ

বঙ্গবন্ধুর ছায়া-সহচর নূরুল ইসলামকে ঢাকা বিমান বন্দরে দেখে আমার মনে পড়েছিল এস ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' গল্পের কাহিনী। কিন্তু এরকম আরেকটি বিস্ময় যে আমার জন্য বত্রিশ ধানমণ্ডিতে অপেক্ষা করছিল, তা আমি ভাবতেও পারি নি। তীর্থ দর্শনের মতো বত্রিশ নম্বরের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখা শেষ করে নূরুল ইসলামকে বললাম, চলুন এবার যাই। আমাদেরতো আবার বনানী গোরস্থানে যেতে হবে। সেখানে শুয়ে আছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তিনজন অবিস্মরণীয় নেতা-তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ মনসুর আলী। চতুর্থ নেতা কামরুজ্জামানের মৃতদেহ তাঁর জেলার বাড়িতে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। এছাড়াও বনানীতে শুয়ে আছেন বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, আবদুর রব সেরনিয়াবত, শেখ ফজলুল হক মনি, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, নববধু সুলতানা ও রোজি এবং আরও অনেক শিশু যুবা শহীদ। পঁচাত্তরের পনরই আগস্ট রাত্রে যাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে নরপশুরা; খোন্দকার মোশতাকের "সূর্য সন্তানেরা।"

শেখ আকরম যে ঘরটিতে বাস করেন, তাতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, এমন সময় ঘটল সেই বিস্ময়কর ব্যাপারটি। হঠাৎ বত্রিশ নম্বরের কোনো ঘরে টেলিফোন

বেজে উঠলো। কে একজন ছুটে এসে আমাকে জানালেন, আপনার টেলিফোন। বিস্মিত হলাম। আমি মাত্র গতকাল লন্ডন থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছেছি। পশ্চিম ধা-নমণ্ডির যে বাসায় উঠেছি, তাতে টেলিফোন নেই। তার উপর সকালে যে বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডিতে আসবো, তা কেউ জানে না। সুতরাং কে আমাকে এই সাত সকালে বত্রিশ নম্বরে টেলিফোন করবেন?

শেখ আকরাম জানালেন, বত্রিশ নম্বরের একটা ঘর বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের সাময়িক অফিস হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ঘরে টেলিফোন। টেলিফোন ধরার জন্যে আমাকে সেখানে যেতে হবে। ঘরটিতে ঢুকে বুঝলাম, এটি আমার বহু পরিচিত ঘর। এই ঘরে ছাত্র জীবনে শেখ শহীদুল ইসলাম (এরশাদের জাতীয় পার্টির অন্যতম নেতা) থাকতেন। শেখ শহীদ যখন ছাত্রলীগের নেতা, তখন বহুদিন এই ঘরে বসে তার সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্র-রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

এই ঘরের দেয়ালেও গুলির চিহ্ন। রক্তের ছাপ। নরপশুরা পঁচাত্তর সালের পনরই আগস্টের রাত্রে কি ধরনের বর্বরতার অনুষ্ঠান ঘটিয়েছিল এই বাড়িটাতে, সতেরো বছর পরেও তার পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠতে হয়। এই নরপশুদের কেউ কেউ এখন বাংলাদেশে সন্ত্রাসী রাজনৈতিক দলের নেতা। বুক ফুলিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য জনসভা ডেকে গর্ব প্রকাশ করে। কেউ কেউ উচ্চ কূটনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত। তারা শাস্তি পায়নি। পুরস্কৃত হয়েছে। সংবিধানে তাদের শাস্তি না দেওয়া বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। বিএনপির নির্বাচিত সরকারও সেই বিধি (ইনডেমনিটি) বাতিলে খুব আগ্রহী নন। ভিয়েনায় জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব এবং অস্ট্রিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট কুর্ট ওয়াল্ডহাম আমার মুখে এই ইনডেমনিটি আইনের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, "কোনো সভ্য ও স্বাধীন দেশে বর্তমান যুগে এই ধরনের আইন থাকতে পারে এবং কোনো সভ্য সরকার এই ধরনের জংলি আইন বাতিলে গড়িমসি করতে পারেন, তা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।"

স্মৃতি যেন আলোছায়া। ক্রমাগত মনে আসে আর যায়। একা একা কথা বলে। তার সম্মোহন বড় অদ্ভুত জাদু। বত্রিশ নম্বরের সারা বাড়িটাতে যেন স্মৃতির সেই জাদুর জাল ছড়ানো। সকালের রোদের কনাও যার সূক্ষ্ম তন্ত্রী ভেদ করতে অক্ষম। তবু সেই সম্মোহন থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম। টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলাম হাতে। বললাম, হ্যালো, কে বলছেন?

একটি ভরাট গলা বিনীতভাবে বললেন, আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না।

গলাটি পরিচিত মনে হলো। কিন্তু ধরতে পারলাম না। বললাম, আপনাকে চিনি মনে হচ্ছে, কিন্তু...

ঃ চিনেও চিনতে পারছেন না এই তো। আমি কোনো বিখ্যাত লোক নই। ভরাট গলা বললেন।

বললাম, আমি যে বত্রিশ নম্বরে এসেছি, তা আপনি জানলেন কি করে?

ঃ আমি একজন সাংবাদিক। আমাকে সব খবরই রাখতে হয়। বলেই ভরাট গলা হঠাৎ হেসে ফেললেন। আর সেই হাসি থেকে সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে চিনে ফেললাম। বললাম, খালেকদা! আপনি এখনো বেঁচে আছেন? কি বিস্ময়।

খালেকদা বললেন, বেঁচে না থাকলে তোমার সঙ্গে কথা বলছি কি করে? তোমার আজকের প্রোগ্রাম কি?

বললাম, বত্রিশ নম্বর থেকে প্রথমে যাব বনানী গোরস্থানে। সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে ছাত্রলীগের সম্মেলনে। সেখান থেকে কতক্ষণে ছুটি পাব জানি না।

খালেকদা বললেন, তাহলে আজ নয়, কাল তোমার কাছে আসতে হয়। কতকাল তোমাকে দেখি না।

ঃ আপনাকেও আমি কতকাল দেখি না।

খালেকদা বললেন, তাহলে সেই কথাই রইল। আমি আগামীকাল ভোরে তোমার ধানমণ্ডির বাসায় আসছি। তুমি অন্য প্রোগ্রাম রেখো না। বলে খালেকদা টেলিফোন রেখে দিলেন।

বত্রিশ নম্বরে বসে খালেকদার আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত টেলিফোন পেয়ে যেমন বিস্মিত হয়েছি, পরদিন বিস্মিত হয়েছি ধানমণ্ডির বাসায় তাকে দেখেও। এস ওয়াজেদ আলীর 'ভারতবর্ষ' গল্পের আরেক চরিত্র যেন খালেকদা। সতেরো বছর আগে তাকে ঢাকায় যেমন দেখে গিয়েছিলাম, তেমনি আছেন তিনি। বয়স একটুও বাড়েনি। অন্তত চেহারায় তার ছাপ নেই। ঠিক একই ভঙ্গির হাসি, তেমনি একটু দুলে দুলে হাঁটা, মাথায় অবিন্যস্ত চুল। ঢিলে ঢালা পোশাক।

খালেকদার পুরো নাম আবদুল খালেক খান। বাড়ি বরিশাল। তার বাবা ছিলেন নামকরা ভেটেরিন্যারি চিকিৎসক। তার বাসার সামনে একটা বড় সাইন বোর্ড ছিল। তাতে লেখা ছিল, বরিশাল (অথবা আলেকান্দা) মনিমেলা। এটা চল্লিশের দশকের কথা। তখনো পাকিস্তান হয়নি। খালেকদা বরিশাল শহরের আলেকান্দা পাড়ায় তার বাবার বাসায় থাকতেন। এখন আলেকান্দা হয়তো অনেক পাল্টে গেছে। তখন পুলিশ হাসপাতালের পেছনেই ছিল বাসাটি। আমিও স্কুলের নীচের ক্লাসের ছাত্র। ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে মনিমেলার সাইন বোর্ডটি আমাকে আকর্ষণ করতো। কারণ, আমিও ছিলাম মনিমেলার সভ্য। মনিমেলা মানে কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ছোটদের বিভাগ আনন্দ মেলা। বিভাগটি চালাতেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিমল

ঘোষ—মৌমাছি এই ছদ্মনামে। সারা অবিভক্ত বাংলায় তিনি মনিমেলা নামে শক্তিশালী শিশু সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকার' এই আনন্দ মেলার (শিশুদের জন্য প্রতি সপ্তাহে একটি বিশেষ পাতা) অনুকরণেই কলকাতার দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় 'মুকুলের মহফিল' নামে শিশুদের পাতা চালু করা হয়। মনিমেলার মতোই সারা বাংলাদেশে গড়ে ওঠে শিশু সংগঠন 'মুকুল ফৌজ'। 'মুকুলের মহফিল' পরিচালনা করতেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের। তার ছদ্মনাম ছিল বাগবান। পরে শুনেছি 'মুকুলের মহফিল' এবং বাগবান এই দু'টি নামই কাজী নজরুল ইসলামের দেয়া। আমি এই মুকুল মহফিলেরও সভ্য ছিলাম। আমার সভ্য নম্বরটি এখনো মনে আছে, ৮৮০১। ১৯৪৬-৪৭ সালে কলকাতায় 'আজাদের' মুকুলের মহফিলের পাতায় কিশোর লেখক হিসেবে আমার 'আষাঢ়ে' কবিতা, 'বার্নার্ড শ'র কলম' গল্প ছাপা হয়।

লেখায় নামের সঙ্গে সভ্য নম্বরটিও ছাপা হতো। চল্লিশের দশকের গোড়ায় কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদনা করতেন দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা। এই পত্রিকাটিও কলকাতা থেকে বেরুতো। ছোটদের বিভাগের নাম ছিল 'আগুনের ফুলকি'। পরিচালনা করতেন 'আতশবাজ'। এই দু'টি নামও কবি নজরুলের দেওয়া। 'আগুনের ফুলকি'তে আমার সভ্য নম্বর ছিল ১৩১। 'আগুনের ফুলকি' থেকেও একটি শিশু-কিশোর সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল, নাম ফুলকি আসর। ১৯৪৫ সালে আমি যখন গ্রামের স্কুলের ছাত্র, তখন এই 'আগুনের ফুলকিতে' আমার প্রথম লেখা ছাপা হয়। লেখাটি 'পান্থশালা' নামে একটি ছোট নাটিকা।

'আনন্দ মেলা' 'মুকুলের মহফিল' 'আগুনের ফুলকি' ইত্যাদি বিভিন্ন দৈনিকের বিভিন্ন ছোটদের বিভাগের সভ্য্য হবার আরেকটা আকর্ষণ ছিল বহু রঙের সভ্যকার্ড (Membership card)। 'আগুনের ফুলকি' এবং 'মুকুলের মহফিলের' কার্ডে কবি নজরুলের কবিতা ছিল। দু'টি কার্ডের দুই কবিতারই কিছু কিছু পঙক্তি এখনো আমার মনে আছে। 'আগুনের ফুলকি'র কার্ডের কবিতার দু'টি পঙক্তি;

'আগুনের ফুলকি ছোটে ফুলকি ছোটে ছোটে আজ ফুলকি যারা
না দেখা অগ্নিগিরির ভাই তাহারা ভগ্নি তারা'।

আর 'মুকুলের মহফিলে'র কার্ডের কবিতার ক'টি পঙক্তি হল,

"গোলামীর চেয়ে শহীদী দরজা অনেক উর্ধ্বে জেনো
চাপরাশির ওই তকমার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো,
আল্লাহর কাছে কখনো চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিষ কিছু।
আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কভু শির করিয়ো না নীচু।"

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর সম্ভবত শিশু সাহিত্যিক রোকনউজ্জামান খানই তখনকার বিভক্ত বাংলাদেশের পূর্বাংশে বা পূর্ব পাকিস্তানে সবচাইতে শক্তিশালী শিশু ও কিশোর সংগঠন গড়ে তোলেন, কচিকাঁচার মেলা। 'দৈনিক ইত্তেফাকে' দাদাভাই নাম নিয়ে ছোটদের পাতা সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি এই বিরাট সংগঠনটি গড়ে তোলেন। পঞ্চাশের দশকে এই সংগঠনের শুরু। দৈনিক 'বাংলার বাণী'র ছোটদের বিভাগকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শাপলা কুঁড়ির আসরও বাংলাদেশে এখন একটি বিরাট ও শক্তিশালী শিশু সংগঠন।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বরিশাল শহরের আলেকান্দা পাড়ায় মনিমেলা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন খালেকদা। মনিমেলার পাশাপাশি শক্তিশালী মুকুল ফৌজও ছিল বরিশালে। তার প্রধান আস্তানা ছিল চকবাজারে। নেতা ছিলেন এস আলী মোহাম্মদ। একটা লাইব্রেরীতে চাকরি করতেন। কিন্তু সর্বক্ষণের নেশা ছিল সাহিত্য। 'প্রতিভা' নাম দিয়ে তিনি হাতে লেখা একটা ম্যাগাজিনও বের করেছিলেন। পরে তার দু'টি সংখ্যা ছেপেও বের হয়। খালেকদা শুধু মনিমেলা করতেন না। তিনি একটি মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন—রেভ্যুলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি বা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আরএসপি)। আজ খালেকদা 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার একজন সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু চল্লিশের দশকে যে তিনটি নাম ছিল বরিশাল শহরের হিন্দু-মুসলমান তাবৎ নরনারী, বিশেষ করে তরুণ তরুণীদের কাছে অতি পরিচিত, সেই তিনটি নাম হল, শামসুদ্দিনদা, মোজাম্মেলদা ও খালেকদা। শামসুদ্দিনদা—বিখ্যাত কথাশিল্পী শামসুদ্দিন আবুল কালাম। মোজাম্মেলদা—সাংবাদিক মোজাম্মেল হক, (পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত 'দৈনিক পাকিস্তানের' বার্তা সম্পাদক থাকাকালে কায়রোতে (১৯৬৫) বিমান দুর্ঘটনায় আরও অনেক সাংবাদিকের সঙ্গে নিহত হন)। তারপর খালেকদা— প্রবীন সাংবাদিক আবদুল খালেক খান।

এই তিনজনেই বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র ছিলেন, আর ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। রাজনৈতিক মতাদর্শেও তখন অভিন্ন। দু'জন-মোজাম্মেল হক ও আবদুল খালেক খান ছিলেন আরএসপি'র সার্বক্ষণিক কর্মী। শামসুদ্দিন আবুল কালাম ছিলেন এই দলের একটিভিস্ট নন, সমর্থক। আরএসপি'র তরুণ কর্মীরা তাদের দাদা ডাকতো। সংক্ষেপে নামের সঙ্গে মিশিয়ে দা, সেই নামেই তারা আমাদের কাছেও পরিচিত হয়ে ওঠেন। চল্লিশের দশকের গোড়াতেই কলকাতা থেকে শামসুদ্দিন আবুল কালামের সাড়া জাগানো প্রথম গল্পগ্রন্থ 'শাহের বানু' প্রকাশিত হয়। এই বইটি তিনি মোজাম্মেল হক ও আবদুল খালেক খানকে উৎসর্গ করেন।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বরিশালের স্কুলে ছাত্র থাকাকালে হাফ্‌প্যান্ট পরা অবস্থায় যখন আলেকান্দা পাড়ায় মনিমেলার সাইন বোর্ডের সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতাম, তখনো খালেকদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। আরএসপি'র নাম জানতাম। বরিশালে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের পরেই তখন কমিউনিস্ট পার্টি ও আরএসপি'র নামডাক। তবে তখনকার বামপন্থী মুসলমান যুবকদের ঝোঁক বেশি ছিল কমিউনিস্ট পার্টির চাইতেও আরএসপি'র দিকে। আরএসপি'র সংশ্রবে এসেই নোয়াখালীর ছাত্রনেতা রুহুল আমিন কায়সার, বরিশালের দেহেরগতির আকরম এবং আরও অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের একেবারে শুরুতে ঢাকায় আরএসপি'র কোনো ছাত্র সম্মেলনে এসেই সাংবাদিক এবিএম মুসার সঙ্গেও আমার প্রথম পরিচয়। মুসা তখন সাংবাদিক নন, ছাত্র। পায়ের রঙ কালো। মাথায় ব্যাকব্রাশ করা চুল। যেমন সুদর্শন, তেমনি স্মার্ট ছিলেন মুসা। যতদূর মনে পড়ে জাস্টিস বদরুল হায়দার চৌধুরীও ছিলেন তখন আরএসপি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। তখন তিনি ব্যারিস্টার হিসেবে আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত—পরে স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

খালেকদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বরিশাল শহরে নয়, আমার নিজের গ্রাম উলানিয়ায় এবং তাও সম্পূর্ণ অভাবিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে। সম্ভবত ১৯৪৭ সাল। আমি তখন বরিশাল শহরের আসমত আলী খান ইন্সটিটিউটের (এ কে স্কুল) সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। রোজার ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। তখন প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম এল এ) ছিলেন আমাদের পরিবারের চৌধুরী মোহাম্মদ আরিফ (কবি আসাদ চৌধুরীর বাবা)। তিনি একাধারে ছিলেন রাজনীতিক, কবি, গীতিকার ও সুরকার। নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানও গাইতেন। আমার সঙ্গে তার বয়সের একটা বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনিও তখন কলকাতা থেকে উলানিয়ায় এসে অবকাশ ভোগ করছেন। রোজ সকালে তার কাছে গিয়ে জুটতাম। তার ডিবা ভর্তি পান থাকতো। তা খেতেন আর রাজনীতির গল্প করতেন। তার বলার ভঙ্গি ছিল অসাধারণ। তার তন্ময় ও মুগ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে ছিলাম আমিও একজন। মাঝে মাঝে আমরা লুডো খেলতাম। আসাদ তখন খুব ছোট। তার মামা সৈয়দ আমির আলি চৌধুরী ছিল আমার সহপাঠী। সেও এসে জুটতো। আসাদকেও খেলার সঙ্গী করা হতো। সে তখন ভালো করে ছক্কাও চিনতো কিনা আমার স্মরণ নেই। এই খেলা চলতো দুপুর পর্যন্ত। আসাদের আম্মা যখন ভাত রেঁধে আমাদের সকলকে খাওয়ার জন্যে ডাকতেন, তখন এই খেলা ভাঙতো।

এ সময় মাঝে মাঝেই উলানিয়ায় বরিশাল থেকে, কখনো কলকাতা থেকে

রাজনৈতিক নেতা, কর্মী বা সাংবাদিক এসে আরিফ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতেন। তিনি একদিকে মুসলিম লীগের একজন নেতা এবং অন্যদিকে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য। প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথাও ছিল অনেকের জানা। সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ' তখন সারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা মুখপত্র। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য ছিলেন 'জনযুদ্ধে'র কিশোরদের পাতার সম্পাদক। এই 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার একজন রিপোর্টার (এবং কমিউনিস্ট কর্মী) এলেন উলানিয়ায়। সেদিন আমাদের আর লুডো খেলা হল না। সারাটা সকাল 'জনযুদ্ধের' রিপোর্টার আরিফ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি তখন তাদের আগের নীতি পাল্টে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন দিতে শুরু করেছেন। ইংরেজিতে ও বাংলায় ডঃ গঙ্গাধর অধিকারীর বই বেরিয়েছে " পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য"।

দু'তিন সপ্তাহ পর 'জনযুদ্ধে'র প্রথম পাতায় আরিফ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার বেরুলো। তিনি বলেছেন, "পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী রাষ্ট্র হবে না। হবে ভারতের সকল নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমানাধিকার ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।" এই সাক্ষাৎকারে তিনি কংগ্রেস নেতাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, "কংগ্রেস নেতারা রাজি হলে মুসলিম লীগের বহু নেতা ও কর্মী সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত রয়েছে।" আমার মনে হয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এই সূচনালগ্নেই আরিফ চৌধুরী মনে মনে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তার ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিনের মধ্যে তিনি মুসলিম লীগ থেকে ধীরে ধীরে সরে আসেন এবং মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে মিলে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করতে শুরু করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার আগে গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরেরও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-নেতা।

উলানিয়া গ্রামে আরিফ চৌধুরীর কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নিয়ে 'জনযুদ্ধে'র রিপোর্টার কলকাতায় চলে যাওয়ার অল্প কয়েকদিন পরেই ঘটল আমার এই কাহিনীর অভাবিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি। কি কারণে সেদিন লুডো খেলা অর্ধ সমাপ্ত রেখে আরিফ চৌধুরীর মজলিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম মনে নেই। উলানিয়ায় আরিফ চৌধুরীর বাড়িটিকে আমরা বলতাম মাঝের বাড়ি। সেই বাড়ির ভাঙা সিংহ দরোজা পেরুলেই এক চিলতে পায়ে হাঁটা পথ। বাঁ পাশে একটি পুকুর। একটু হেঁটে সামনে গেলেই বিরাট লাল দালান। উপরে চিলে কোঠা। আরিফ চৌধুরীদের কাচারি ঘর (এখন ধ্বংসাবশেষও নেই)।

আমি পুকুর পারের রাস্তা দিয়ে সেই লাল দালানের দিকে হাঁটছি, হঠাৎ দেখি

দু'জন লোক আমার দিকে আসছেন। একজনের পোশাক হচ্ছে ঢিলে খদ্দরের শার্ট এবং পায়জামা। কিন্তু এত ময়লা যে, চিমটি কাটলে ময়লা উঠে আসবে। একটি হাত বেঁকিয়ে, শরীর দুলিয়ে হাঁটেন। অন্যজনের কথা আমার মনে নেই। আমাকে দেখে সেই খদ্দরপরা ভদ্রলোক ডাক দিলেন—এই খোকা। একটু শুনবে।

আমি তখন খোকা সম্বোধিত হবার বয়স পেরিয়ে এসেছি। তাই বিরক্ত হয়ে বললাম, কি চান বলুন।

ভদ্রলোক বললেন, এখানে আরিফ চৌধুরী সাহেবের বাড়ি কোনটা বলতে পারো?

বললাম, পারি। আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন?

ভদ্রলোক বললেন, বরিশাল থেকে আমরা এসেছি। আমার নাম আবদুল খালেক খান।

ছাব্বিশ

আমার বাবা আমৃত্যু ছিলেন খদ্দরধারী। সেই যে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে গান্ধীর ডাকে বিদেশী কাপড়ে তৈরি দামী পোশাক পুড়িয়ে ফেলে খদ্দর ধরেছিলেন, আর তা ছাড়েন নি। তার পায়জামা, কুর্তা এমনকি মাথার টুপিও তৈরি হতো 'প্রবর্তক কুটির শিল্প' থেকে কেনা খদ্দরের কাপড়ে। তিনি রাজনীতি করতেন। ফলে সেই বালক বয়স থেকে খদ্দরধারী কাউকে দেখলে আমি ধরে নেই, ইনি রাজনীতিক অথবা রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত কেউ হবেন। আমার একেবারে কিশোর বয়সে উলানিয়া গ্রামে খদ্দর পরিহিত আবদুল খালেক খানকে দেখেও আমি ধরে নিয়েছিলাম, তিনি একজন রাজনীতিক হবেন। তাছাড়া তিনি এসেছেনও আমাদের এলাকার একজন সেরা রাজনীতিক এবং আইন সভার সদস্য আরিফ চৌধুরীর সাথে দেখা করতে। মনে আছে, সেদিনের সকালটি ছিল আকাশ উজাড় করা রৌদ্রময় সকাল। পুকুর পারে সবুজ ঘাসে কাঠ ফড়িঙ্গের মেলা। পুকুরের শাপলা পাতার নীচে মাছের পুচ্ছ তাড়নায় মাঝে মাঝে শব্দের শিহরণ। অদূরে জমিদারদের জয়েন্ট এস্টেটের দালান বাড়িতে ঘণ্টাধ্বনি হল সকাল দশটা বাজার। খালেক খানকে জানালাম, আরিফ চৌধুরী এখন তার বাড়িতেই আছেন এবং এটাই তার বাড়ি।

খালেক খান বললেন, তুমি কি তার কাছে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে?

বললাম, নিশ্চয় পারব। আমিতো এই মাত্র সেখান থেকেই এলাম।

ধরে নিলাম, আবদুল খালেক খান এবং তার সঙ্গী কোনো রাজনৈতিক কারণেই আরিফ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সুতরাং তাদের দেখা করার উদ্দেশ্য জানতে চাইলাম না। খালেক খান জানতে চাইলেন, আমি গ্রামের স্কুলের ছাত্র কিনা? বললাম, আমি বরিশাল শহরে লেখাপড়া করি। ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে এসেছি। শিগগিরই আবার শহরে ফিরে যাব। সেখানে আলেকান্দাপাড়ায় পুলিশ হাসপাতালের উল্টোদিকে পোদ্দার রোডে এক আত্মীয়ের বাসায় থাকি।

খালেক খান সোৎসাহে বললেন, বল কি। আমিও তো আলেকান্দায় থাকি।

তারপর তিনি তার বাসার যে অবস্থান জানালেন, তাতে আমার বুঝতে বাকি রইল না, তিনি আমার বহুবার দেখা মনিমেলার সাইনবোর্ড টানানো বাড়িটাতে থাকেন। তার প্রতি এতক্ষণে আমার শ্রদ্ধা ও আগ্রহ বাড়ল। বললাম, আপনি তাহলে মনিমেলার লোক।

খালেক খান বললেন, আমার এখন আর মনিমেলা করার বয়স নেই, তবু মেলার সঙ্গে যুক্ত আছি। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি মনিমেলার পক্ষ থেকে আরিফ চৌধুরীর সাথে দেখা করতে এসেছেন? খালেক খান বললেন, না, না। আমরা একটা রাজনৈতিক দল করি। সেই দলের পক্ষ থেকেই আমরা গ্রামে এসেছি। আমাদের দলের নাম বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল। সংক্ষেপে আরএসপি।

একটু থেমে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এই দলের নাম শুনেছো? বললাম, শুনেছি। বরিশালের সদর রোডের উপরেই আর্ট ভিলা নামে একটি নামকরা ফটোগ্রাফির দোকান। তার দোতলাতেই আরএসপি নামের সাইনবোর্ড টানানো দেখেছি।

খালেক খান খুবই উৎসাহিত হলেন। বললেন, তাহলে শহরে ফিরে যাওয়ার পর তুমি একদিন আমাদের অফিসে এসো। তোমাকে অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, অনেক বইপত্র পড়তে দেবো।

এইভাবে আবদুল খালেক খান—পরবর্তীতে যিনি হলেন আমার খালেকদা, তার সঙ্গে আমার পরিচয়। সেদিন উলানিয়া গ্রামে পরিচয় আর বেশি দূর এগোয়নি। খালেকদা এবং তার সঙ্গীকে আরিফ চৌধুরীর কাছে পৌছে দিয়ে আমি বিদায় নিয়েছিলাম।

শহরে ফিরে গিয়ে আমি খালেকদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কলকাতার ন্যাশনাল বুক এজেন্সির 'ছোটদের রাজনীতি', 'ছোটদের অর্থনীতি', 'মার্কবাদের অ আ ক খ' ইত্যাদি বই পড়ে আমি তখন মার্কসবাদের দিকে একটু একটু ঝুঁকছি।

সেই কিশোর বয়সে যে বই আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল, সেটি নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত ম্যাকসিম গোর্কির 'মা' উপন্যাস। লেনিন, স্ট্যালিন ও টিটোর জীবনী তখন আমার পাঠ্য বইয়ের ফাঁকে। কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছিল ছাত্র ফেডারেশন। একদিন এই সংগঠনের মিছিলে লালটুপি মাথায়, লাল ঝাণ্ডা হাতে সামিল হয়েছি। শ্লোগান দিয়েছি, 'মন্দির মসজিদ এক আওয়াজ, খতম কর বৃটিশ রাজ', 'শহীদ লাখো ভাই কেয়া পুকার-ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

বরিশালের ছাত্র ফেডারেশনে তখন যারা যুক্ত ছিলেন, তাদের অনেকেই এখন নানা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। কেউ কেউ মারা গেছেন। তাদের একজন ডঃ স্বদেশ বসু, লেখাপড়া শেষ করে আর রাজনীতি করেননি। বিশ্ব ব্যাংকে চাকুরি নিয়ে ওয়াশিংটনে চলে গেছেন। গত বছর (১৯৯২) আগস্ট মাসে আমেরিকায় ওয়াশিংটনে এক সন্ধ্যা তার বাসায় কাটিয়েছি। তার স্ত্রী নূরজাহান বসুর রান্না খেয়ে তবে ওয়াশিংটন ছাড়তে পেরেছি।

চল্লিশের দশকে বরিশাল শহরে স্বদেশ বসু ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির এক নামকরা তরুণ একটিভিস্ট। তিনি তখন কলেজের ছাত্র, আমি স্কুলের। তবু সখ্য গড়ে উঠেছিল। ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' 'স্বাধীনতা' নাম নিয়ে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়েছে। চার পৃষ্ঠার কাগজ। এক আনা (তখনকার চার পয়সা) দাম। বরিশালে স্টীমার ঘাটে কোনো কোনো সন্ধ্যায় স্বদেশ বসুর সঙ্গী হতাম 'স্বাধীনতা' কাগজ বিক্রির জন্য। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে নিয়ে যেতেন শহরের এক প্রান্তে একটি বাড়িতে। এটি নাকি এককালে বর্ধমানের রাজার বাড়ি ছিল। সম্ভবত সেই পরিবারের কেউ ঘোর কমিউনিস্ট ছিলেন। তারই বদান্যতায় হয়তো বাড়িটি হয়ে উঠেছিল বরিশালের কমিউনিস্ট পার্টির আড্ডা। এই বাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মীদের জন্য রান্নাবান্না হতো। তাদের রাত কাটানোরও ব্যবস্থা ছিল। বরিশালের কমিউনিস্টদের তখন নেতা ছিলেন মহারাজ। এই নামেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত। আসল নাম আমার আজ মনে নেই। এই বাড়িতে প্রতি মাসেই ক্লাস বসতো কমিউনিজম সম্পর্কে। মাঝে মাঝে মহারাজও ক্লাস নিতেন। আমি স্বদেশ বসুর সাথে কখনো কখনো যেতাম।

এই সময় আমার মনে যে জিজ্ঞাসাটা বড় হয়ে উঠে তা হল, বেয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কেন বিরোধিতার ভূমিকা নিল? তারা কেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হল? সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ আখ্যা দিল? আমি তখন স্কুলের ছাত্র। এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে নেয়ার বিদ্যাবুদ্ধি তখন আমার ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক পত্রপত্রিকা পড়ে প্রশ্নগুলো আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল।

এই প্রশ্নগুলো নিয়ে স্বদেশ বসু এবং আরো কয়েকজন কমিউনিস্ট বন্ধুর সঙ্গে আমার প্রায়ই তর্ক হতো। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কী সদুত্তর পেয়েছি, তা এখন মনে পড়ে না।

এই সময় হঠাৎ একদিন জানলাম, পটুয়াখালি শহরের অদূরে কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সংগঠন কৃষক সভার প্রাদেশিক সম্মেলন হচ্ছে। পটুয়াখালি তখন বরিশাল জেলার ভিতরে একটি মহকুমা শহর। স্বদেশ বসু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, গাফ্ফার, আপনি কি এই কৃষক সম্মেলনে আমাদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যেতে চান? সম্মেলনে কলকাতা থেকে কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ আসবেন।

মুজাফ্ফর আহমদ মানে ভারতের কমিউনিস্টদের বিখ্যাত কাকাবাবু। এককালের চাঞ্চল্যকর সন্দ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলার আসামী। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যুদ্ধ ফেরত হাবিলদার কবি নজরুল ইসলামের প্রথম পৃষ্ঠপোষক। বহু সাহিত্য সাময়িকী ও সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা। কিংবদন্তীর মতো তার নাম সকলের মুখে মুখে ছড়ানো। আমার কাছে কৃষক সভার আকর্ষণ ছিল না। আকর্ষণ ছিলেন কমরেড মোজাফ্ফর। সুতরাং পটুয়াখালি যেতে রাজি হলাম।

কোনো রকমে পটুয়াখালি যাবার স্টীমারের ভাড়া যোগাড় করলাম। রাত একটায় স্টীমার ছাড়ল। পরদিন সকালে গিয়ে পটুয়াখালি পৌছাবে। স্টীমারে উঠে আমার চোখ ছানাবড়া। থার্ড ক্লাসে কোথাও পা রাখি এমন জায়গা নেই। বসাতো দূরের কথা। যাত্রীরা গাদাগাদি করে যে যতটুকু জায়গা পেয়েছে দখল করে শুয়ে বসে আছে। হাঁটতে হাঁটতে স্টীমারের পিছনের দিকে গেলাম। সেখানে একটা বড় এলাকা লাল পতাকা দিয়ে ঘিরে একদল নরনারী বসে আছে। তাদেরও গাদাগাদি অবস্থা। তাদের কাছে গিয়ে একটু বসার চেষ্টা করতেই তারা হা হা করে উঠলেন, এখানে নয়, এখানে নয়, এটা আমাদের জায়গা। আমাদের আরো দু'চারজন লোক আসবেন।

বুঝলাম, এরা কমিউনিস্ট পার্টির লোক। কিন্তু দলে স্বদেশ বসু বা চেনা কাউকে দেখলাম না। দু'জন মহিলা রেলিংয়ের কাছ ঘেঁষে বসেছিলেন। তাদের একজনের পরনে সাদা শাড়ি। বিধবার বেশ। আরেকজনের অল্প বয়স। আমার দূরবস্থা দেখে বয়স্ক মহিলার সম্ভবত দয়া হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই তুমি কোথায় যাচ্ছো?

ঃ পটুয়াখালি।

ঃ বেড়াতে যাচ্ছো?

ঃ না। তারপর একটু থেমে তাদের জানানোর জন্য ইচ্ছা করেই জোরে বললাম, সেখানে কৃষক সম্মেলনে যাচ্ছি।

সকলেই আমার কথাটা শুনলেন। অনেকেই নড়েচড়ে বসলেন। সহসা আমার বসার জায়গাও হয়ে গেল। একজন সেই মহিলার দিকে চেয়ে বললেন, কমরেড

দিদি, এর নাম কি? আমাদের তালিকায়তো এর নাম নেই।

দিদি কিছু বলার আগে আমিই জবাব দিলাম–আমি আপনাদের প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে যাচ্ছি না। স্বদেশ বসু আমাকে এই সম্মেলনের কথা বলেছেন। আমি কাকাবাবুকে দেখতে নিজের খরচে পটুয়াখালি যাচ্ছি।

এবার দিদি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি থাকবে কোথায়?

বললাম, মিঠাপুকুর লেনে আমার এক আত্মীয় থাকেন, তার বাসায় উঠবো।

দিদি হঠাৎ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, অনেক রাত হয়েছে ভাই। তুমি ছেলে মানুষ। বসে রাত কাটাতে পারবে না। তুমি এখানেই শুয়ে পড়ো।

সসঙ্কোচে বললাম, আপনি কোথায় শোবেন?

দিদি আবার আমার মাথায় হাত বুলালেন। অল্প বয়সীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা দু'বোন তোমার পাশেই একটু জায়গা করে নেব। সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

স্টীমারের কাঠের ফ্লোরে পাতলা সতরঞ্চি পেতে, কাপড়ের পুটলিটায় মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। তারপর তোফা ঘুম। সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন স্টীমার পটুয়াখালির প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। নদীর ঢেউয়ের উপর ঝাঁক বেঁধে সাদা বক উড়ছে। নদীর পারে সুপারি নারিকেল গাছের ফাঁকে ছোট ছোট কুঁড়েঘর দেখা যায়। দেখা যায়, ঘোমটা মাথায় কাঁখে কলসী অল্প বয়সী বউ, ন্যাংটা ছেলেমেয়ে, হাঁসমুরগী। কোথাও বা দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। তাতে গরুর পাল বসে জাবর কাটছে। দিদি আর তার বোন আমার অনেক আগেই হয়তো উঠেছেন। এখন কলাপাতার ঠোঙ্গায় মুচমুচে চিঁড়ে, গুড়, আর মাটির ছোট ছোট ভাঁড়ে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দিচ্ছেন। আমি সকালে স্টীমারে কিছু কিনে খাব তার ইচ্ছে ছিল না। কারণ, পয়সা বাঁচাতে হবে। বরিশালে ফেরত যাবার স্টীমার ভাড়াটুকু শুধু সঙ্গে আছে। দিদি আমার সামনেও চিঁড়ে গুড় এবং চা ভর্তি মাটির ভাঁড় রাখলেন। বললাম, দিদি, আমি খাব না।

দিদি হাসলেন। সেই সকাল বেলার রোদের মতো মিষ্টি হাসি। স্নেহার্ত হাসি। বললেন, কেন, পয়সা নেই? না, খিদে নেই? বলেই আমার জবাবের অপেক্ষা না করে বললেন, এসব খাবার, এমনকি চা-ও আমার ঘরে তৈরি। তোমাকে দাম দিতে হবে না ভাই।

চার দশকেরও বেশি আগে, সেই কৈশোরে পটুয়াখালিগামী স্টীমারে বসে আমার উপলব্ধি হয়েছিল, যার সঙ্গে আত্মীয়তা হয়, তা এক ঘণ্টার পরিচয়েও হয়; যার সঙ্গে হবার নয়, তা এক যুগের পরিচয়েও হয় না। সেই মাত্র একটি দিন

কমরেড দিদিকে দেখেছিলাম, তার আসল নামও আমার জানা হয়নি, শুধু জেনেছিলাম সকলেই তাকে কমরেড দিদি ডাকেন; আজও তার কথা আমি ভুলতে পারিনি। স্টীমার থেকে পটুয়াখালিতে নামার সময় তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন, সুস্থ থেকো, দীর্ঘজীবী হও ভাই। এক রাতের দিদিকে যেন ভুলে যেও না।

পটুয়াখালি শহরের অদূরে কৃষক সম্মেলনে কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদকে দেখলাম। তার বক্তৃতা শুনলাম। খুব কাছে থেকে দেখে মনে হল, শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার মতো ব্যক্তিত্বই তিনি। একেবারে সাধারণ বেশবাস। কিন্তু আভিজাত্যমণ্ডিত তার ব্যক্তিত্বের আভা।

সম্মেলন শেষে শহরে ফিরে আমার আত্মীয়ের সঙ্গে শহরে তখনকার একমাত্র সিনেমা হলে (নাম সম্ভবত ছবিঘর) ছবি দেখতে গেলাম। নাম 'জজ সাহেবের নাতনী'। জহর গাঙ্গুলী, রেনুকা, ছবি বিশ্বাস অভিনীত ছবি। আমার আত্মীয় কথায় কথায় জানালেন, পটুয়াখালিতে তখন রয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তিনি মুনসেফ এবং মুনসেফ কোয়ার্টারেই থাকেন। শুনে লাফ দিয়ে উঠলাম। স্কুলে ছাত্রজীবনেই অচিন্ত্যকুমারের ভক্ত পাঠক হয়েছিলাম। মাত্র কিছুদিন আগে পড়েছি, তার গল্পের বই 'যতন বিবি'। এই গল্পের অধিকাংশ পাত্রপাত্রী মুসলমান। আমার আত্মীয়কে ধরে বসলাম, আমি অচিন্ত্যকুমারকে দেখতে চাই। তিনি বললেন চেষ্টা করবেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে দেখার জন্য আরও দু'দিন পটুয়াখালিতে থাকতে হল। তারপর এক বিকেলে মুনসেফ কোয়ার্টারে তার দেখা পেলাম। অচিন্ত্যকুমার তখনো প্রৌঢ়ত্বে পা দেন নি। তিনি আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি এত অল্প বয়সেই গল্প উপন্যাস পড়া শুরু করছো? নিশ্চয় তোমার লেখার শখ আছে।

লজ্জিত মুখে ঈষৎ ঘাড় নেড়ে বললাম, আছে।

অচিন্ত্যকুমার বললেন, আমার কোন্ বইটি তুমি সম্প্রতি পড়েছো?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, যতন বিবি।

অচিন্ত্য কুমার খুশি হলেন। আমার জন্য বেয়ারাকে চা আর মিষ্টি আনার নির্দেশ দিয়ে বললেন, তুমি বরিশালের আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে চেনো?

বললাম, ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, তবে নাম জানি এবং তার গল্পও পড়েছি।

অচিন্ত্যকুমার বললেন, আমি তাকে খুব লাইক করি। তার লেখাও। তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। ওরা সম্প্রতি বরিশাল থেকে একটি সাহিত্য সাময়িকী বের করেছেন। নাম 'সাত সতেরো'। ব্রজমোহন কলেজের বাংলার শিক্ষক সুধাংশু চৌধুরীও আছেন এই সাময়িকীর সঙ্গে। তুমি বরিশালে ফিরে ওদের সঙ্গে অবশ্যই দেখা কর। ওরা তোমাকে তোমার সাহিত্যচর্চায় নিশ্চয় উৎসাহ দেবেন।

আমি তার টেবিলে রাখা 'সাত সতেরো' সাময়িকীটি হাতে নিয়ে পাতা উল্টালাম। প্রথমেই সুধাংশু চৌধুরীর একটা লেখা। তারপর আবুল কালাম শামসুদ্দিনের কবিতা। (এখানে বলা দরকার, আবুল কালাম শামসুদ্দিন এই নামেই বরিশালের এই প্রখ্যাত কথাশিল্পী প্রথমে লেখা শুরু করেন। তার 'শাহের বানু' গল্পগ্রন্থও এই নামেই প্রথম কোলকাতা থেকে বেরোয়। পরে 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের সঙ্গে নাম বিভ্রাট এড়ানোর জন্য তিনি নিজের নামটাকে ঘুরিয়ে শামসুদ্দিন আবুল কালাম করে নেন। দীর্ঘদিনন তিনি রোমে প্রবাসী জীবনযাপন করেছেন।) এ কবিতার প্রথম দু'টি লাইন হচ্ছে,

'কমরেড, আর কতদূর
সেই রাঙ্গা বিহানের রোদ্দূর?'

শামসুদ্দিন আবুল কালামের এই কবিতাটি পড়তে পড়তে হঠাৎ আমার মনে পড়ল আবদুল খালেক খান, উলানিয়া গ্রামে যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সেই খালেকদার কথা। সম্ভবত তার সঙ্গে যোগাযোগ হলেই শামসুদ্দিন আবুল কালামের সঙ্গেও পরিচয় হওয়ার সুযোগ হবে।

ঠিক করলাম, বরিশাল গিয়েই খালেকদার আলেকান্দার বাসায় ঢুঁ মারবো

সাতাশ

কবি নজরুল বলেছেন, "বরিশাল বাংলার ভেনিস।" চল্লিশের দশকের বরিশাল রূপে গুণে, প্রতিভার ছটায় সত্যই ছিল বাংলার ভেনিস। এই দশকেরই গোড়ায় বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন জীবনানন্দ দাশ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (বর্তমানে বলা হয় ডেপুটি কমিশনার) ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। মহকুমা শহর পটুয়াখালীতে ছিলেন মুন্সেফ হিসেবে চাকরিরত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বরিশালে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, "বরিশাল হিতৈষী।" সম্পাদক ছিলেন শ্রী দূর্গামোহন সেন। সেই চল্লিশের দশকের গোড়াতেই পত্রিকাটির বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয় এবং একটি 'সুবর্ণ জুবিলী সংখ্যা' প্রকাশ করা হয়। আরেকটি পত্রিকা ছিল "কাশীপুর নিবাসী"। এটিও সাপ্তাহিক, তবে নীলাম ইস্তাহার। পত্রিকা বলতে বোঝাতো "বরিশাল হিতৈষী"কে। দূর্গামোহন বাবু তখনকার সারা বাংলা খ্যাত একজন সম্পাদক। কংগ্রেস রাজনীতির সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। বৃটিশ আমলে তার পত্রিকার প্রকাশ একাধিকবার বন্ধ করা হয়েছে। তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু সাহসী সাংবাদিকতা থেকে তাকে নিবৃত্ত করা যায় নি। কংগ্রেসী রাজনীতির সূত্রে দূর্গামোহন বাবু ছিলেন আমার বাবার

বন্ধু। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে দু'জনে এক সঙ্গে জেল খেটেছেন। আমি তাকে ডাকতাম কাকাবাবু। আমার বাবা বেঁচে থাকতে বহুবার তিনি আমাদের গ্রামের বাড়ি উলানিয়ায় এসেছেন। এমন অসাম্প্রদায়িক, উদার মনের মানুষ সে যুগে ক'জন ছিলেন আমি জানি না।

আমাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়মিত আসতো "বরিশাল হিতৈষী"। আর মাঝে মাঝে আসতেন সম্পাদক শ্রী দূর্গামোহন সেন—আমাদের কাকাবাবু নিজে। একবার এই দূর্গামোহন সেনের উপস্থিতিতে আমাদের গ্রামে এক মজার কাণ্ড ঘটল। উলানিয়া গ্রামের দীঘিটি বেশ বড় এবং নামকরা দীঘি। তখন এর উত্তর পারে ঘন জংগল। দক্ষিণ পারে বাজার। পশ্চিম পারে একটি জুনিয়ার মাদ্রাসা এবং পুব পারে হাই স্কুল—যার নাম উলানিয়া করোনেসন হাই ইংলিশ স্কুল। এই স্কুলে প্রতি বছর বাৎসরিক পরীক্ষা শেষে ধুমধাম করে পুরস্কার বিতরণী উৎসব হতো। তাতে বরিশাল শহর কখনো কলকাতা থেকে নামকরা সব লোক আসতেন প্রধান অতিথি হয়ে। সম্ভবত ১৯৪৫ সাল। সে বছর উলানিয়া স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী দূর্গামোহন সেন। আমি ক্লাস ফাইভের ছাত্র। স্কুলের মাস্টার ছিলেন শ্রী প্রতাপচন্দ্র গুহ এম এস সি বি এল। একদিকে তার ছিল সায়েন্সের সর্বোচ্চ ডিগ্রি, অন্যদিকে ছিল ওকালতি করার সনদ। কিন্তু শহরে উচ্চ পদ ও পেশার আকর্ষণ ত্যাগ করে তিনি গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। উলানিয়া স্কুলকে সারা জেলায় একটি উন্নতমানের আদর্শ স্কুল হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তার জীবনের ব্রত। আমাদের পরিবারের আরিফ চৌধুরীর কথা আগেই বলেছি। তিনি তখন মুসলিম লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনের লোক। কিন্তু এখন আমার ধারণা হয়, তিনি রাজনৈতিক চিন্তায় হয়তো তখন জামালুদ্দিন আফগানির প্যান ইসলামিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার আরেক বন্ধু ছিলেন কে এম শমসের আলী। বরিশাল শহরের এক নামকরা উকিল। এরা দু'জনেই ছিলেন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী এবং জামালুদ্দিন আফগানির অনুরাগী। ইরানের খোমেনীর আমেরিকান বিরোধিতার মতো, সেকালে জামালুদ্দিন আফগানির প্যান ইসলামী আন্দোলনেরও ভিত্তি ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা। ফলে কোনো এক দেশে তিনি বেশিদিন তিষ্টাতে পারেন নি। খোমেনীকে যেমন ফ্রান্সে চৌদ্দ বছর নির্বাসনে কাটাতে হয়েছে; জামালুদ্দিন আফগানিকে তেমনি গুপ্তঘাতকের ছোরা এবং মধ্যপ্রাচ্যের তখনকার বৃটিশ তাঁবেদার রাজা বাদশাহদের গ্রেফতার ও বহিষ্কারাদেশ মাথায় নিয়ে দেশে দেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। আরিফ চৌধুরী এবং কে এম শমসের আলীর কাছেই প্রথম আমি জামালুদ্দিন আফগানির বিপ্লবী জীবন ও কর্মতৎপরতার কথা জানতে পারি এবং

নিজেও মনে মনে এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যক্তিত্বময় পুরুষটির প্রতি শৈশবের আবেগমাখা আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আরিফ চৌধুরী ও প্রতাপচন্দ্র গুহ ছিলেন ছাত্রজীবনে সহপাঠী। দু'জনেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ক্লাসের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানটি তারাই দখল করে রাখতেন। ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন পরস্পরের প্রগাঢ় বন্ধু, কিন্তু ছাত্র হিসেবে ছিলেন পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতাপচন্দ্র গুহ যখন উলানিয়া স্কুলের হেডমাস্টার, তখনো তাদের নিবিড় বন্ধুত্ব অটুট ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল রাজনৈতিক মতান্তর। সে বৎসর উলানিয়া স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্য নির্বাচন করা হল একটি গান। গানটির শুরু এইভাবে ঃ

"ভারত জননীর আমরা সবাই বীর
চল্‌রে চল্‌রে চল্
বল সবে হরদম
বন্দে মাতরম
বল্‌রে বল্‌রে বল্।"

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম" গান সম্পর্কে ভারতের মুসলমানদের তীব্র বিরোধিতার কথা তখন সর্বজনবিদিত। পাকিস্তান আন্দোলনও দানা বেঁধে উঠেছে এবং এর আগে মুসলমানদের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে কংগ্রেস নেতাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের গানটি ঈষৎ ছাঁটাই করে পরিমার্জিত রূপ দিয়েছিলেন। তিনি "ত্বংহি দূর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী/বাহুতে তুমি মা শক্তি? হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি/তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—এই কথাগুলো গান থেকে বাদ দেন। তারপরও মুসলমানদের আপত্তি যায় নি। গোড়া মুসলমানেরা বলতে শুরু করলেন, কোনো মুসলমানের পক্ষে বন্দে মাতরম বলা সম্ভব নয়। বন্দে মাতরম কথার অর্থ—মা, তোমার বন্দনা বা পূজা করি। মুসলমানের পক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দনা বা পূজা করা সম্ভব নয়। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে কংগ্রেস কর্মীরা খদ্দরেন তৈরি যে গান্ধী টুপি মাথায় চাপিয়েছিলেন, তার একদিকে লেখা ছিল বন্দে মাতরম, অন্যদিকে আল্লাহু আকবর।

১৯৪৫ সালে উলানিয়া স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভার উদ্বোধন সঙ্গীত নির্বাচন নিয়েও বিতর্ক উঠল। গানটি যেসব শিক্ষক নির্বাচন করেছিলেন, তারা যুক্তি দেখালেন, 'বন্দে মাতরম' গানের যে অংশে দেশমাতাকে দূর্গার সঙ্গে তুলনা করে তার মূর্তি গড়ার কথা বলা হয়েছে, সেই অংশটুকু নিয়েই মুসলমানদের আপত্তি। বন্দে মাতরম শ্লোগান নিয়ে তাদের আপত্তি নয়। কিন্তু স্কুলের গভর্নিং বডির মুসলমান সদস্য ও শিক্ষকেরা বললেন, বন্দে মাতরম শ্লোগান নিয়েও মুসলমানদের

আপত্তি রয়েছে এবং স্কুলের উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে পছন্দ করা গানটিতে বন্দে মাতরম কথাটি আছে।

এই বিতর্ক যখন তুঙ্গে তখন আরিফ চৌধুরী সমস্যা সমাধানের একটা প্রস্তাব দিলেন। তিনি জানালেন, মুসলমান তরুণদের জন্য তিনি একটি উদ্দীপনামূলক গান লিখেছেন এবং তাতে সুরারোপও করেছেন। এই গানটিও পুরস্কার বিতরণী সভায় গাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। আরিফ চৌধুরী শুধু নিজে নন, তার ভাইয়ের ছেলে আজম চৌধুরীও ছিলেন সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী। বিভিন্ন সভা সমিতিতে তারা দু'জনেই অনেক সময় গান গাইতেন। এবারের গানটি আজম চৌধুরী সকলকে গেয়ে শোনালেন। গানের কথা যাই হোক, তাতে অপূর্ব সুরযোজনা করেছিলেন আরিফ চৌধুরী।

"ডাক পড়েছে বিশ্বে আজি
জাগরে মুসলিম নওজোয়ান
ও তোর মুক্তিপথে ছুটতে হবে
ভাঙি এবার ঘুমের বান।।
ডাক পড়েছে উম্মতে আজ
বিশ্ব শ্রেষ্ঠ নূরনবীর
চাইনা রে আর বাক্যবাগীশ
চাই শুধু আজ কর্মবীর।
চাই শুধু আজ শক্তি সাধক
সত্য সেবক পাহলওয়ান।।
তপ্ততাজা তরুণ খুনে
উঠুক রে ঢেউ সিন্ধুপ্রায়
ভীম আলোড়ন ফুটুক তাহে
কালবোশেখীর ঝঞ্ঝাবায়
ও তোর সিংহ তোরা ঘুমিয়ে আছিস্
শৃগাল করে জাতির মান।।"

এই গানটির একটি লাইন নিয়ে তর্ক দেখা দিল। একজন বললেন, মুসলমান তরুণেরা জেগে উঠুক, তাতে আমাদের আপত্তি নেই, বরং আনন্দিত হওয়ারই কথা। কিন্তু এই গানে মুসলমানদের সিংহ আখ্যা দিয়ে কাদের শৃগাল বলা হয়েছে? অমুসলমান—বিশেষ করে হিন্দুদের নয়তো? আরিফ চৌধুরীকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হল না। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভার প্রধান অতিথি শ্রী দূর্গামোহন সেন তখন

বরিশাল শহর থেকে উলানিয়ায় এসে গেছেন। তিনি রায় দিলেন, এই গানে শৃগাল বলা হয়েছে বৃটিশ রাজশক্তিকে। এই গানটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গান। গানে বিশেষভাবে মুসলমান তরুণদের জাগতে বলা হলেও এই আহ্বানের একটি সার্বজনীন সুর আছে। সুতরাং গানটি গাওয়া চলে। দূর্গামোহন বাবুর এই রায়ের ফলে সভায় দুটি গানই গাওয়া হল এবং অত্যন্ত ধূমধামের সঙ্গে উলানিয়া স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা শেষ হয়েছিল।

পিতৃবন্ধু শ্রীদূর্গামোহন সেনের কাছেই সাংবাদিকতায় আমার হাতে খড়ি। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বাবা গ্রামের বাড়িতেই মারা গেলেন। আমারও গ্রামের বাড়ির পাট চুকলো। বাবার মৃত্যুর একমাস পরেই বরিশালে গিয়ে শহরের স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। দূর্গামোহন সেন পরম স্নেহে আমাকে বুকে টেনে নিলেন। সেই ছোট বেলাতেই গল্প কবিতা লেখার দিকে আমার ঝোঁক দেখে তিনি একদিন বললেন, তুমি বরিশাল হিতৈষীর জন্য শহরের বিভিন্ন ঘটনার ছোট ছোট রিপোর্ট লিখতে শুরু কর।

ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, আমি কি পারবো?

কাকাবাবু বললেন, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব।

স্কুলের ছাত্র থাকাকালেই শুরু হল আমার সাংবাদিকতার জীবন। স্কুল ছুটির পর ছুটতাম কোথায় কোন্ মিটিং হচ্ছে, কোথায় কোন্ ঘটনা ঘটছে, তার রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য। দূর্গামোহন বাবু আমার লেখা সেই রিপোর্ট যত্ন করে দেখতেন, সংশোধন করতেন। তারপর 'বরিশাল হিতৈষী'তে ছাপাতেন। আমার এই সংবাদ ফিচারের নাম ছিল "সমাচার সন্দেশ"। কোনো ছদ্মনাম নয়, আমার নামই তাতে ছাপা হতো।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দেশ ভাগ হল। বরিশালে পাকিস্তানের পতাকা উড়ল। কিছু কিছু গণ্যমান্য হিন্দু সদ্যগঠিত পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলেন। দূর্গামোহনবাবু বরিশাল ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। বরিশাল হিতৈষী এবং তার ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি বরিশালেই পড়ে রইলেন। কিন্তু মুসলিম লীগের শাসনে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তার কাগজে সরকারী প্রশাসনের কোনো সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতির গঠনমূলক সমালোচনা করা হলেও তাকে হুমকি দেওয়া শুরু হল। কাগজ অফিসে কয়েকদফা হামলা হল। আজ যখন নিজেও পরিণত বয়সে অতীতের সেই কৈশোরের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাই, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতার নামে, গণতন্ত্রের নামে, ইসলামের নামে মুসলিম লীগের শাসকেরা বাংলাদেশে কি ভয়াবহ ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও

অর্থনৈতিক অবস্থার একটা নিরপেক্ষ মূল্যায়ন হলে দেখা যাবে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভেরউড শাসনামলের চাইতে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা আদৌ উন্নত ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের মতো পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের জন্যও একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৫০ সালে বরিশালে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হল যে, কলকাতায় শেরে বাংলা ফজলুল হক ও তার আত্মীয় উজির আলীকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হত্যা করেছে। এই খবরের সত্যাসত্য নির্ণিত হওয়ার আগেই বরিশালে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল। এটাকে দাঙ্গা না বলে একতরফা হত্যাকাণ্ড বলা চলে। যে হত্যাকাণ্ডের পরিণতিতে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ব্যাপকহারে সংখ্যালঘুদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে শরণার্থী হিসেবে সরিয়ে নেওয়া হয়।

পাকিস্তান হওয়ার পরেও যে দূর্গামোহন সেন বরিশালের মাটি কামড়ে থাকবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ১৯৫০ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার পর সে প্রতিজ্ঞা আর রাখতে পারলেন না। বরিশালের আমানতগঞ্জে ছিল তার বাড়ি এবং হিতৈষী প্রেস। সব ছেড়েছুঁড়ে তিনি সপরিবারে শরণার্থীদের দলে জুটলেন। তখন তার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। যে রোদন ধ্বণির মধ্যে সেদিন তারা বরিশাল স্টীমার স্টেশনে খুলনাগামী স্টীমারে উঠেছিলেন (সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায়), সেই রোদন ধ্বণি এখনো আমার কানে মাঝে মাঝে বেজে ওঠে।

শ্রীদূর্গামোহন সেন—আমার কাকাবাবুর প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ হলে ভালো হতো। কিন্তু আমাকে সারাজীবন তা বিবেক দংশনের যন্ত্রণায় অস্থির করবে বলেই হয়তো প্রসঙ্গটি সেদিন সেখানেই শেষ হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি নিজেও উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় পাড়ি দেই। কলকাতায় পৌঁছার পর একদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে বসে আড্ডা মারছি, হঠাৎ বরিশালের এক পুরনো কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে দেখা। তিনিও ১৯৫০ সালেই বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। আমাকে দেখে তিনি কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকেই খুঁজছি। কুড়ি বছর আগে আপনাকে বরিশালে দেখেছি। তখন আপনি কিশোর। এখন বয়স বেড়েছে, রীতিমতো মোটাসোটা হয়েছেন, তাই চিনতে পারিনি প্রথমে।

বললাম, আপনাকেও আমি প্রথমে চিনতে পারি নি। এখন চিনতে পেরেছি। আপনি বরিশাল অশ্বিনীকুমার দত্ত টাউন হলের পাঠাগার ও পাঠকক্ষের চার্জে ছিলেন।

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক ধরেছেন। আচ্ছা বরিশালের টাউন হলের নাম কি এখনো অশ্বিনী কুমার টাউন হল আছে?

বললাম, নিশ্চয়ই আছে। আইয়ুব খাঁর আমলে অশ্বিনীকুমার নামের আদ্যাক্ষর এ কে কথাটিকে আইয়ুব খাঁন বানিয়ে হলটির নাম আইয়ুব খাঁন হল করার চেষ্টা

হয়েছিল। কিন্তু বরিশালের মানুষ সেই চেষ্টা সফল হতে দেয়নি। টাউন হলের নাম অশ্বিনী কুমার হলই বহাল রয়েছে।

ভদ্রলোক বললেন, আমি যে কারণে আপনাকে খুঁজছি, সে কথাটা আগে বলি। 'আনন্দবাজারে' আপনার লেখা পড়ে দূর্গামোহন বাবু দারুণ উত্তেজিত। দূর্গামোহন বাবুর কথা আপনার মনে আছে তো? বরিশাল হিতৈষীর সেই সম্পাদক..........।

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলাম—কাকাবাবু এখনো বেঁচে আছেন? তিনি কোথায়?

ঃ তিনি কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে একটা কলোনীতে থাকেন। বয়স নব্বুইয়ের কাছাকাছি। হাঁটাচলা করতে পারেন না। কানে কম শোনেন। চোখেও ভালো করে দেখেন না। তার ছেলেদের মুখে আনন্দবাজারে আপনার লেখার কথা এবং আপনি কলকাতায় এসেছেন শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলেছেন, ওকে খবর দাও, ওকে আমি একবার দেখতে চাই। আমি সেজন্যই আপনাকে খুঁজছিলাম।

বললাম, আমারও তাকে দেখার তর সইছে না। আমার বাবার বন্ধু। বাবা মারা গেছেন পঁচিশ বছর হয়। কাকাবাবু এখনো বেঁচে আছেন। চলুন, আগামী রোববারেই তাকে দেখতে যাই। আপনি দুপুরের দিকে আনন্দবাজার অফিসে চলে আসুন। এখান থেকেই আপনার সঙ্গে কাকাবাবুকে দেখতে যাব।

ভদ্রলোক বললেন, বেশ তাই হবে।

কিন্তু পরের রবিবার দূর্গামোহন বাবুকে দেখতে যাওয়া হল না। কাজের চাপ, না আলস্যের জন্য যাই নি, তা আজ মনে পড়ছে না। সেই কংগ্রেস কর্মী ভদ্রলোকের সঙ্গে তিন চারদিন পরের আরেকটা তারিখ ঠিক করলাম দূর্গামোহন সেনকে দেখতে যাওয়ার জন্য।

এই তারিখটিতে আর গড়িমসি করলাম না। সময়মতো আনন্দবাজার অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। দেখি, ভদ্রলোক কথামতো আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে দৌড়ে কাছে এলেন। ভিজে বিষণ্ন গলায় বললেন, গাফ্ফার সাহেব, দূর্গামোহন বাবুকে দেখার জন্য আপনাকে আর যেতে হবে না।

দারুণ উদ্বেগ বুকে চেপে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? কেন একথা বলছেন?

ভদ্রলোক মৃদুকণ্ঠে বললেন, তিনি গতকাল মারা গেছেন।

আটাশ

এখনো চোখের পাতা বন্ধ করলে চল্লিশের দশকের বরিশাল শহর তার সব রূপ লাবণ্য নিয়ে আমার মনে ভেসে ওঠে। কালো পীচ ঢালা পথ ছিলনা বরিশাল শহরে; সব লাল সুর্কি ঢালা পথ। কেবল জেলা স্কুল ভবনের পর থেকে গোটা সদর রোড, সদর হাসপাতাল পেরিয়ে আমানতগঞ্জে যাওয়ার ব্রিজ পর্যন্ত ছিল পাকা সিমেন্টের রাস্তা। এক থেকে চার নম্বর পর্যন্ত ছিল চারটি পেল্লায় স্টীমার ঘাট। তার সামনে ছোট ছোট পার্ক। সামনেই দোতলা লাল রঙের বিল্ডিং—টিকিট ঘর এবং ওয়েটিং রুম। রাতে স্টীমারগুলো ঘাট ছাড়ার আগে অথবা ঘাটে ভেড়ার সময় যখন ভোঁ দিতো অথবা আকাশে তার সার্চলাইটের আলো খেলা করতো, তখন আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই ভোঁ শুনতাম, আকাশে সেই আলোর খেলা দেখতাম। স্টীমার স্টেশনের সামনে দিয়ে কিছুটা সিমেন্টের রাস্তা তারপর কীর্তনখোলা নদীর পার ঘেঁষে লাল সুর্কি ঢালা পথ চলে গেছে ভাঁটার খাল, হেমায়েতউদ্দিন প্লে গ্রাউন্ড, চাঁদমারির খাল, ব্যাপটিস্ট গির্জা, বেলস পার্ক হয়ে জর্ডান কোয়ার্টারের কোল ঘেঁষে বহু দূর দূরান্তরে। রাস্তার দু'পাশে ছিল দীর্ঘ ঋজুদেহ ঝাউ গাছের সারি। ভাঁটার খাল পেরিয়ে ডান দিকের রাস্তায় চলে গেলেই ছিল ইউরোপিয়ান ক্লাব। সবুজ ঘাসের মখমল বিছানো বিরাট বেলস পার্ক ছিল একদিকে বেড়ানোর পার্ক, অন্যদিকে খেলার মাঠ। রাস্তার পাশে ঝাউ গাছের সারির নীচে ছিল সারি সারি কাঠের বেঞ্চি। বুড়োরা সান্ধ্য ভ্রমণে নদীর পারে এসে এই বেঞ্চিতে বসে গল্প জুড়তেন। শুনেছি বরিশালে থাকার সময় এই বেলস পার্কের পাশে নদী পারের রাস্তায় ঝাউয়ের সারির নীচে বেঞ্চিতে এসে বসা জীবনানন্দ দাসের নিত্যদিনের একটি অভ্যাস ছিল। বহু কবিতা লিখেছেন তিনি এই বেঞ্চিতে বসে। এই বেঞ্চিতে বসে গল্পের নানা প্লট ভেবেছেন কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তার একটি উপন্যাসে (সম্ভবত 'স্বার্নসীতা') বরিশাল শহরের এই নদী পারের চমৎকার বর্ণনা আছে। তখনকার স্টীমার কোম্পানীর (আরএসএন কোম্পানী) একটা ঢাউস সাইনবোর্ড টানানো ছিল নদীর অপর পারের। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণনায় তারও উল্লেখ আছে। কবি নজরুল ইসলাম বরিশাল শহরের এই নদীপারের সৌন্দর্য দেখে তার 'মৃত্যুক্ষুধা" উপন্যাসে লিখেছেন "বরিশাল বাংলার ভেনিস"। শামসুদ্দিন আবুল কালামের বহু গল্প, উপন্যাসে রয়েছে বরিশালের খাল, বিল, নদীনালা, গ্রাম ও জনপদের জীবন্ত বর্ণনা। কবি আহসান হাবীবের মুখে গল্প শুনেছি, তিনি কৈশোরে বরিশালের এই ঝাউ সারি ঢাকা নদী-পারের বেঞ্চিতে বসে কবিতা লেখা রপ্ত করতেন, ভবিষ্যতে কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তার এক বন্ধু ছিলেন তার চাইতে

বয়সে একটু বড় সৈয়দ আবদুল মান্নান। তিনি প্রবন্ধ কবিতা দুইই লিখতেন। পরে ইকবালের কবিতার খ্যাতিমান অনুবাদক হয়েছিলেন। চল্লিশের দশকের একেবারে গোড়ায় এই দুই বন্ধু আর সব সহপাঠীদের নিয়ে প্রায়ই বিকেলে বরিশালের নদীপারের বেঞ্চিতে সাহিত্য সভা বসাতেন। আহসান হাবীব তখন শুধু হাবীব নামে পরিচিত ছিলেন। বরিশাল থেকে কলকাতায় যাওয়ার পর নামের সঙ্গে আহসান কথাটি যোগ করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের কিছু আগে বরিশালেই তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, পণ্ডিত বিজয় লক্ষী পণ্ডিত, বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহের নেতাকে দেখতে পাই। তখন বরিশালের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যে বিভা ও ঔজ্জ্বল্য ছিল, এখন সারা বাংলাদেশেও তা খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা আমি জানি না। ১৯৪৭ সালের গোড়ায় বরিশালে দু'টি প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন হয়। একটি কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত সারা ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বাংলা প্রদেশ শাখার। অন্যটি কংগ্রেস প্রভাবিত নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেসের (মির্জাপুর স্ট্রীট) প্রাদেশিক সম্মেলন। ছাত্র ফেডারেশনের সভার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন মানিক বন্দোপাধ্যায় এবং ছাত্র কংগ্রেসের সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়। পণ্ডিত বিজয়লক্ষী এবং হুমায়ুন কবিরও এসেছিলেন ছাত্র কংগ্রেসের সম্মেলনে। হুমায়ুন কবিরের একটি গান তখন বাংলাদেশে বৃটিশ-খেদাও-আন্দোলনের ডান বাম সকল রাজনৈতিক কর্মীদের মুখে মুখে ফিরতোঃ

"খেতে দাও না হয় চলে যাও,
গোলায় গোলায় ছিল সোনা
ক্ষেতে ছিল ধান যে বোনা
শ্বেত ইঁদুরে করলো সাবাড়
এবারে এই ইঁদুর তাড়াও।
খেতে দাও না হয় চলে যাও।।"

স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র হলেও আমি তখন তারাশংকরের কবি, ধাত্রীদেবতা দু'টি উপন্যাসই পড়ে ফেলেছি। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ছোট গল্পগুলো আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার 'অতসী মামী' এবং 'নেকী' গল্প আমি যে কতবার পড়েছি, তার কোনো হিসেব নেই। আরও বড় হয়ে আমার মনে হয়েছে, মানিক বন্দোপাধ্যায় যদি শুধু ফ্রয়েডিয়ান মনস্তত্ত্ব নিয়ে গল্প লেখাতেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন, শেষের দিকে রাজনৈতিক চাপে জোর করে মার্কসবাদী গল্প

লেখক হতে না চাইতেন, তাহলে বাংলা কথা সাহিত্যের এই অপরাজেয় প্রতিভা হয়তো অকালে নিঃশেষ হতো না। নজরুল যদি থাকতেন বিদ্রোহী কবি, গজল, গীতি ও কীর্তনের অপূর্ব স্রষ্টা, তাহলে তার দানের ভাণ্ডার হয়তো আরও বিস্তৃত হতো। 'সাম্যবাদী'র কবি হতে গিয়ে তিনি কি নিজের উপর নিজে অবিচার করেন নি ?

পটুয়াখালীর কৃষক সমাবেশের পর বরিশাল শহরে ফিরে এলাম। দেখতে গিয়েছিলাম কমরেড মুজাফ্ফর আহমদকে। সেই সঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে দেখার এবং কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। এটা আমার কাছে বিরল সৌভাগ্য মনে হল। বরিশালে ফিরে এসেই ঠিক করলাম শামসুদ্দিন আবুল কালামের সঙ্গে পরিচিত হবো। আর সে জন্য হবো আবদুল খালেক খানের সাহায্যপ্রার্থী। ততদিনে জেনে গেছি, তিনি শামসুদ্দিন আবুল কালামের একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধু।

যেমন ভাবা তেমনই কাজ। এক সকালে আলেকান্দার পোদ্দার রোডের বাসা থেকে বেরিয়ে পুলিশ লাইনের রাস্তায় মনিমেলার সাইনবোর্ড টানানো বাড়িতে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম। খালেকদা বেরিয়ে এলেন। আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হলেন। বললেন, আমিও ভাবছিলাম, তুমি এতদিনে নিশ্চয়ই উলানিয়া থেকে ফিরে এসেছো! তোমার স্কুলতো খুলে গেছে।

বললাম, উলানিয়া থেকে এসেছি অনেকদিন হয়। আপনার কাছে রোজই ভেবেছি আসবো। আজ সুযোগ হয়ে গেল।

সেদিন খালেকদার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক ধরে কি আলাপ করেছিলাম, তা আজ আর মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, তার কাছে সেদিনই শামসুদ্দিন আবুল কালামের কাছে যাওয়ার কথা বলতে পারিনি। তিনি আমাকে সাপ্তাহিক 'গণবার্তা' পত্রিকার বেশ ক'টি সংখ্যা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি গণবার্তা'র সব লেখার সব অর্থ হয়তো বুঝবে না। যে লেখাগুলো ভালো লাগে পড়ে দেখতে পারো।

আমি উৎসাহের সঙ্গে কাগজগুলো নিলাম। 'গণবার্তা' ছিল আরএসপি'র মুখপত্র। পাতায় পাতায় কমিউনিস্ট পার্টির ভুলভ্রান্তির ঠাসা সমালোচনা। ছোটবেলা থেকেই রাজনৈতিক বিতর্কমূলক লেখা আমার খুব প্রিয়। সুতরাং মনে হল, 'গণবার্তা'র মতামত যাই হোক, লেখাগুলো পড়তে আমার ভালো লাগবে।

খালেকদা আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় বললেন, তুমি বরং একদিন বিকেলে সদরঘাটের আর্ট ভিলার উপরতলায় আরএসপি'র অফিসে এসো। তোমাকে আরও অনেক বই পড়তে দেবো।

এই আরএসপি অফিসে যাতায়াত করতে গিয়েই ধীরে ধীরে পরিচিত হলাম

অগ্নিযুগের বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, তার ভাইপো দেবকুমার ঘোষ (মনা দা), মোজাম্মেল হক (পরে 'দৈনিক পাকিস্তানে'র বার্তা সম্পাদক। কায়রো বিমান দুর্ঘটনায় নিহত), জাহাঙ্গীর (তখনকার বেঙ্গল ট্রেডার্সের মালিক), অরবিন্দ গুহ, কল্যাণ দাশগুপ্ত (পরবর্তীকালে দু'জনেই কবি হিসেবে নাম করেন), দিলীপ গুহ ঠাকুরতা, নারায়ণ দাস শর্মা, নির্মল সেন (বর্তমানে শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের নেতা) এবং আরও অনেকের সঙ্গে। এরা অনেকেই ছিলেন আরএসপি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, কেউ কেউ কেবল সমর্থক। বরিশাল জেলা ছাত্র কংগ্রেসও (মির্জাপুর স্ট্রীট) ছিল আরএসপি'র নিয়ন্ত্রণে।

এই দলের মধ্যে নারায়ণ দাস শর্মার সঙ্গেই আমার বেশি ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। আমি স্কুলের ছাত্র, নারায়ণ দাস শর্মা কলেজের। তাতে কি? নারায়ণ কবিতা লিখতেন। চমৎকার আধুনিক কবিতা। তার সংস্পর্শে এসেই আমি প্রথম আধুনিক কবিতার পাঠ নেই। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হই। এর আগে কবিতা পাঠক হিসেবে আমার দৌড় ছিল রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসিমউদ্দিন, গোলাম মোস্তফা পর্যন্ত। নারায়ণ দাস অপূর্ব ভরাট গলায় কখনো জীবনানন্দ, কখনো সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কখনো প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে শোনাতেন। সব কবিতার অর্থ আমি বুঝতাম, তা নয়। কিন্তু তার ঝংকার আমার মনে গেঁথে যেতো। নারায়ণ দাস শর্মা যখন পড়তেন, 'ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল', তখন ভাবতাম, রৌদ্রের আবার গন্ধ আছে নাকি? কিম্বা যখন পড়তেন নিজের কবিতা থেকে, "ব্যজজীবী কাল/এনেছে আমার ঘরে ধূর্ত এক কুটিল সকাল", তখন হতাশ হয়ে বলতাম, নারায়ণদা, আমি আপনার কবিতার অর্থ বুঝি না। নারায়ণ শর্মা হতাশ হতেন না। তিনি শিক্ষকের মতো নয়, বন্ধুর মতো আধুনিক কবিতার প্রতীক, বর্ণনা, রূপাভাস আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন।

নারায়ণ দাস শর্মা যদি কলেজ জীবনেই কবিতা লেখার চর্চা ছেড়ে না দিতেন, তাহলে তিনি যে পরবর্তীকালে অরবিন্দ গুহ এবং কল্যাণ কুমার দাশগুপ্তের মতো বড় আধুনিক কবি হতেন, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ছাত্র জীবনে নারায়ণ ছিলেন কিছুটা ঢিলে ঢালা, বোহেমিয়ান টাইপের তরুণ। লম্বা কালো চেহারা সব সময় হাসিখুশি মুখ। বগলে ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের সাহিত্য বিষয়ক কিম্বা ত্রিদিব চৌধুরীর বাম রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ। অনেকটা তার টানেই আমি প্রতিদিন বিকেলে আরএসপি অফিসে যেতে শুরু করেছিলাম।

কিন্তু আরএসপি অফিসের এই সাহিত্য ও রাজনীতির আড্ডা স্থায়ী হলনা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হল। ১৯৫০ সালে বরিশালে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হল। প্রথমে

দেশ ছেড়ে চলে গেলেন অরবিন্দ গুহ, কল্যাণ দাশগুপ্ত। তারপর একে একে দিলীপ গুহঠাকুরতা এবং অন্যান্য বন্ধু। শেষ পর্যন্ত নারায়ণ দাস শর্মাও। শুধু বরিশালের মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলেন এই গ্রুপের একমাত্র ও শেষ সদস্য নির্মল সেন।

বরিশালের এই আরএসপি অফিসে বসেই একদিন আবদুল খালেক খান বললেন, গাফ্ফার আগামী রবিবার তুমি কি করছো?

বললাম, কিছুই না। ঘরে বসে গল্পের বই পড়বো।

খালেকদা বললেন, তাহলে বিকেলের দিকে আমার বাসায় চলে এসো। ভাবছি শামসুদ্দিনের বাসায় যাবো। তুমি আমার সঙ্গে যেতো পারো।

লাফ দিয়ে উঠলাম। বললাম, বিকেল চারটের আগেই আপনার বাসায় এসে হাজির হবো।

মনে আছে সেই রবিবারের আগেই শামসুদ্দিন আবুল কালামের কয়েকটি গল্প দ্রুত পড়ে নিলাম। যদি তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি আমার কোন্ কোন্ গল্প পড়েছো? এবং আমি যদি উত্তর দিতে না পারি, তাহলে বড়ই বিব্রত হবো। তখন কলকাতার নামকরা কাগজগুলোর এমন কোনো শারদীয় সংখ্যা ছিল না, যাতে শামসুদ্দিন আবুল কালামের গল্প না বেরুতো। আমি দু'টি সাম্প্রতিক গল্পও পড়ে নিলাম—'একটি নিদারুণ দুর্ঘটনা' এবং 'মফঃস্বল সংবাদ'। কলকাতার দেব সাহিত্য কুটির থেকে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ' নামে ছোটদের জন্য রহস্য রোমাঞ্চের বই বেরুতো প্রতিমাসে। শামসুদ্দিন আবুল কালাম সেই সিরিজেও একটা বই লিখেছিলেন, 'রাতের অতিথি'। তাকে তাক লাগাবার জন্য সেই বইটিও কিনে নিয়ে এসে পড়ে নিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে খালেকদার কাছে হাজির হলাম। তারপর দু'জনে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম বগুড়া রোডে। এই রাস্তায় একটা দোতলা টিনের ঘরে শামসুদ্দিন আবুল কালাম থাকেন। তার বাবা আদালতের পেশকার। এটা তার বাড়ি। তিনি স্ত্রী ও অন্যান্য সন্তান নিয়ে নীচের ঘরে বাস করেন। ঘরের বাইরেই আলাদাভাবে দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই শামসুদ্দিন আবুল কালামের ঘর।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই তিনি নিজে দরজা খুলে দিলেন। লম্বা ফর্সা সুদর্শন যুবক তিনি তখন। ঠোঁটের উপর ঘন কালো গোঁফ। মাথায় ব্যাকব্রাশ করা চুল। যৌবনে শামসুদ্দিন আবুল কালাম ছিলেন সত্যই আকর্ষণীয় চেহারা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ। খালেকদা আমাকে দেখিয়ে বললেন, এর নাম গাফ্ফার চৌধুরী। তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। তাই সঙ্গে নিয়ে এলাম।

শামসুদ্দিন আবুল কালাম হাসি মুখে বললেন, খুবই ভালো করেছো খালেক। তারপর আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, তোমার লেখা আমি পড়েছি। কোথায় জানো? শিশু সওগাতে– নাম 'যুগধর্ম'।

উনত্রিশ

শামসুদ্দিন আবুল কালামের সঙ্গে পরিচয় আমার জীবনে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটাল। ছোটবেলা থেকে লিখতাম বেশির ভাগ কবিতা। এবার গল্প লিখতে শুরু করলাম। আমার প্রথম দিকের এসব গল্প শামসুদ্দিন আবুল কালামের 'শাহেরবানু'র অনুকরণে লেখা। 'শাহেরবানু'র ভাঙন গল্পটি আমার খুবই ভালো লেগেছিল। বাংলাদেশের উপর তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, বেয়াল্লিশের (বাংলা ১৩৫০) দুর্ভিক্ষ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর তার মহাধ্বংসের স্বাক্ষর রেখে গেছে। বাংলার নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে এই ধ্বংসের অন্তহীন ট্রাজেডি নিয়ে লেখা এই 'ভাঙ্গন' এবং পরবর্তী 'ঝড়' গল্প। আমি এই 'ভাঙন' গল্পের অনুকরণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলার গ্রাম জীবনের ধস নিয়ে নিজেই একটা গল্প লিখে ফেললাম, নাম দিলাম 'স্বাক্ষর'। গল্পটি পড়ে শামসুদ্দিন আবুল কালাম খুশি হলেন। আসলে এই গল্পের চরিত্র, আখ্যান ভাগ, ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গি সবই ছিল তার কাছ থেকে ধার করা। তিনি গল্পটি নিজের কাছে রেখে দিলেন। বললেন, "আমি আগামী সপ্তাহে কলকাতায় যাচ্ছি। 'সওগাতে'র মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন সাহেবকে তোমার গল্পটি দেব। তিনি নিশ্চয়ই ছাপবেন।" সম্ভবত সেটা ১৯৪৮ কি ১৯৪৯ সাল। মাসিক 'সওগাত' তখনো কলকাতার ওয়েলেসলি স্ট্রীট থেকে প্রকাশ হয়। আমার 'স্বাক্ষর' গল্পটি সে সময় 'সওগাতে' ছাপা হল।

আবদুল খালেক খানের মাধ্যমে সেই ১৯৪৭ সালেই মোজাম্মেল হকের সঙ্গেও আমার পরিচয়। মোজাম্মেল হক তখন সাংবাদিক নন, রেভ্যুলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টির (আরএসপি) সার্বক্ষণিক কর্মী। বরিশালের সদর রোডে পার্টি অফিসেই তাকে সর্বক্ষণ পাওয়া যায়। তিনি আমাকে ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন থেকে ছাত্র কংগ্রেসের দিকে টানতে শুরু করেন। বেয়াল্লিশের কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে এমনিতেই আমার মনে সংশয় ও সন্দেহ ছিল; এবার তার সঙ্গে একটি নতুন প্রশ্নের যোগ হল, ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির আসল মনোভাব ও নীতি কি? এই ব্যাপারে আরএসপি'র নীতি ছিল অত্যন্ত খোলামেলা। তারা

ভারতকে ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ করার তীব্র বিরোধী ছিল। আরএসপি ভারতের সকল ধর্ম ও গোত্রের শ্রমজীবী মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রী ফেডারেল ভারত গড়ার পক্ষে ছিল এবং বিশ্বাস করতো, সাম্রাজ্যবাদীরা চায় ভারত ভাগ করে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী ভারত গড়ার বিপ্লবকে নস্যাৎ করে দিতে। এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফাঁদে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের আপোসবাদী বুর্জোয়া নেতারা সহজেই পা দিয়েছেন।

অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি বৃটিশ কেবিনেট মিশন ভারতের মাটিতে পা দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের দাবি যাতে কংগ্রেস নেতারা মেনে নেন, সেজন্য জনমত গঠনে তৎপর হয়ে ওঠেন। পাকিস্তানের দাবির মধ্যে তারা প্রগতিশীল জাতীয় ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করলেন। অনেকেই মনে করলেন, কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তাদের শক্ত ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির স্ববিরোধিতা ধরা পড়ল সিলেট জেলা ও সীমান্ত প্রদেশের গণভোট অনুষ্ঠানের সময়। সাবেক আসামের মুসলমান সংখ্যগরিষ্ঠ সিলেট জেলা এবং কংগ্রেস শাসিত মুসলমান অধ্যুষিত সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যোগ দেবে কিনা, সে সম্পর্কে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হল। এই গণভোটে কমিউনিস্ট পার্টি এক অদ্ভুত ফতোয়া জারি করলেন। তারা বললেন, "পাকিস্তানের তুলনায় ভারত একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র। সুতরাং সিলেট জেলা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনগণের উচিত ভারতে থাকার পক্ষে ভোট দেওয়া।" সিলেটে এই প্রচারণা চালাতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কিছু নেতা ও কর্মী মুসলিম লীগ ও ছাত্রলীগের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে মারধর খায়। এই ভাবে একদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সমর্থনদান এবং অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেট জেলা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে ভারতে রাখার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করেন।

১৯৪৭ সালের চৌদ্দই আগস্ট মধ্যরাতে পাকিস্তানের জন্মলগ্নে বরিশাল শহরে আরএসপি তার অফিসে পাকিস্তানের পতাকা ওড়াল না। বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে পাকিস্তানি পতাকা উড়ল। আমার কাছে তখন মনে হয়েছিল আরএসপি'র তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। অন্তত দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তারা মেনে চলছেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী তাত্ত্বিক শ্লোগান তুলে দেশের রাজনীতিতে বিভ্রান্তি বাড়ানোর দক্ষতা কমিউনিস্ট পার্টির চাইতে আর কারো বেশি নেই। দেশ তখন মাত্র ভাগ হয়েছে। খণ্ডিত বাংলার পূর্বাংশের নাম হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান। ঢাকা তার নতুন রাজধানী। মুসলিম লীগের নেতারা মাত্র ক্ষমতায় বসেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে তখন পাকিস্তান সম্পর্কিত ভাবাবেগ ও ইউফোবিয়া তুঙ্গে। ঠিক এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি নতুন তত্ত্ব ঘোষণা করলেন, 'দেশ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত'। তারা রাস্তায় মিছিল করে প্রকাশ্যে শ্লোগান দিলেন "ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়, লাখো ইনসান ভূখা হায়।"

এই আন্দোলনে কোনো জন সমর্থন ছিল না। সুতরাং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের উদ্বিগ্ন হওয়ারও কোনো কারণ ছিল না। তবু তারা বৃটিশ আমলের কলোনিয়াল প্রশাসনের দমন নীতির পথ ধরলেন। কঠোর এবং হিংস্র দমননীতি। আমার ধারণা, মুসলিম লীগ দলটির কখনোই কোনো গণতান্ত্রিক চরিত্র ছিল না। ছিল না কোনো গণআন্দোলনের অভিজ্ঞতা। জিন্না শুধু বড় বড় সভায় পাকিস্তান দাবির পক্ষে বক্তৃতা দিতেন এবং কংগ্রেস নেতাদের সমালোচনা করতেন। তার সমালোচনার ভাষাও ছিল অত্যন্ত অশালীন। গান্ধীকে তিনি মহাত্মা বলতেন না (যদিও গান্ধীই তাকে কায়েদে আজম টাইটেলটি দিয়েছিলেন)। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুকে তিনি বলতেন 'পিটার প্যান'। মওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো সকলের শ্রদ্ধাভাজন আলেম ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বলতেন 'শো বয় অব কংগ্রেস।' নিখিল ভারত কংগ্রেসকে জিন্না বলতেন, "গ্রান্ড ওল্ড ফ্যাসিস্ট এসেম্বলি"। অথচ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন গণআন্দোলন দমনে বৃটিশ প্রশাসনের কঠোর দমননীতির বিরুদ্ধে তিনি টু শব্দটি করতেন না। তাদের সমালোচনা করতেন না। নিখিল ভারত মুসলিম লীগে তার ডিকটেটর সুলভ একক নেতৃত্বের সুদীর্ঘ সময়টিতে তিনি পাকিস্তান দাবির পক্ষে কেবল বক্তৃতা বিবৃতি দেওয়া এবং কংগ্রেসের সমালোচনা করা ছাড়া রাজপথে কখনো কোনো আন্দোলনের ডাক দেননি; মুসলিম লীগের কোনো নেতা কখনো কোনো আন্দোলনে নেমে জেলে যাননি। এইভাবে জিন্নার জীবদ্দশাতেই মুসলিম লীগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গণস্পর্শ ও গণআন্দোলনের অভিজ্ঞতা-বর্জিত, বৃটিশ কলোনিয়াল শাসনের পোঁ ধরা একটি আধা ফ্যাসিস্ট সামন্ত চরিত্রের নেতৃত্ব। ভারত ভাগ করে ধুরন্ধর বৃটিশ রাজ যখন এদের হাতে কর্তিত ভারতের একাংশের শাসনভার অর্পণ করলেন, তখন তাদের গণবিরোধী চরিত্রটি আর ঢেকে রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ শাসকদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে যে কোনো গণদাবি ও গণআন্দোলনের মোকাবিলায় কঠোর দমননীতি প্রয়োগের অজুহাত তৈরির সুযোগটি করে দিলেন কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম।

কমিউনিস্ট পার্টির "ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়" আন্দোলন দমনে জেল, জুলুম, গুলি চালিয়েই মুসলিম লীগ নেতারা ক্ষান্ত হলেন না। তারা সুযোগ বুঝে অন্যান্য বামপন্থী, এমন কি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলকেও আখ্যা দিলেন, "হিন্দুস্তানের চর ও

পাকিস্তানের শত্রু" "শিশু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী," "কমিউনিস্ট ও সাবভারসিভ একটিভিটির হতো"। তারা সামান্য নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতাকেও, জনগণের দাবিদাওয়ার আন্দোলনকেও "সাবভারসিভ একটিভিটি" বা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সংজ্ঞাভুক্ত করে তথাকথিত পাবলিক সেফটি এ্যাক্টে (জননিরাপত্তা আইন) যে কোনো লোককে গ্রেফতার এবং অনির্দিষ্টকাল বিনাবিচারে আটক রাখার জন্য পুলিশকে ঢালাও ক্ষমতা দিলেন। ফলে বৃটিশ আমলেও যা হয়নি, তা হল পাকিস্তান আমলে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দু'তিন বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ তথাকথিত স্বাধীনতার সেই উষালগ্নেই হাজার হাজার রাজবন্দীতে (বিনাবিচারে আটক) পূর্বে পাকিস্তানের জেলখানাগুলো ভরে ওঠে।

বরিশালে এমনিতেই আরএসপি'র উপর পুলিশের চোখ ছিল। তারা ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্মদিনে পার্টি অফিসে পাকিস্তানি পতাকা তোলে নি। সুতরাং তাদের উপরেও সরকারী দমন নীতির খড়গ নেমে এলো। বরিশালে আরএসপি যদিও তখন বড় একটি বামপন্থী দল, কিন্তু দলের ভেতর নেতৃত্ব পরিবর্তনের একটি দোদুল্যমান অবস্থা বিরাজ করছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা এবং এই পার্টি ছিল নিখিল ভারত কংগ্রেসের এফিলিয়েটেড একটি দল। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রাক্কালে আরো অনেক ছোট বড় দলের সঙ্গে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিও কংগ্রেসের প্লাটফরম থেকে বেরিয়ে আসে। জয়প্রকাশ বামঘেঁষা আরও দু'একটি দলের সঙ্গে নিজের দলকে একত্রিত করে নতুন দল হিসেবে নিখিল ভারত সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন। আরএসপি'র তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের একটি প্রবীন অংশের ইচ্ছা ছিল তাদের দলটিকে এই সোস্যালিস্ট পার্টিতে মার্জ করে দেওয়া। কিন্তু আরএসপি'র তরুণ কর্মী ও একটিভিস্টরা তাতে রাজি হলেন না। ফলে প্রবীন নেতারা দল ছেড়ে চলে গেলেন সোস্যালিস্ট পার্টিতে। বরিশালেও তার ধাক্কা লাগল। বর্ষীয়ান বিপ্লবী নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, তার ভাইপো দেবকুমার ঘোষ (মনাদা) আরএসপি ছেড়ে জয়প্রকাশের দলে যোগ দিলেন। মোজাম্মেল হক, আবদুল খালেক খান কিছুদিন বরিশাল আরএসপি'র হাল ধরে রইলেন। তারপর তাদের সহযোগী হয়ে এলেন অনিল দাসগুপ্ত নামে এক অপেক্ষাকৃত যুবা বয়সী নেতা। ছাত্র কংগ্রেসের পূর্ব পাকিস্তান অংশের নাম পাল্টে গেল। তার নাম হল পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশন।

বরিশালে এই সময় খাদ্য সংকট দেখা দেয়। অনিল বাবু ও মোজাম্মেল হক ঠিক করলেন, আরএসপি'র পক্ষ থেকে বরিশাল শহরে একটি মিছিল বের করবেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের (পরে নাম হয় ডেপুটি কমিশনার) অফিসের সামনে খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাবেন। সামান্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু এই বিক্ষোভ

মিছিলের পরপরই অনিল দাশগুপ্ত, মোজাম্মেল হক, আবদুল খালেক খান, নির্মল সেন গ্রেফতার হলেন। তাদের বিরুদ্ধে শিশু রাষ্ট্র-বিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হল এবং বেশ কয়েক বছরের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হল। একটি সদ্য স্বাধীন দেশে, গণতান্ত্রিক বলে কথিত একটি প্রশাসনের অধীনে খাদ্যের দাবিতে মিছিল করার অপরাধে এত দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড হতে পারে, তা আজ ভাবতেও আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়।

দীর্ঘ কারাদণ্ড ভুগে অনিল দাশগুপ্ত ও মোজাম্মেল হক জেল থেকে বেরিয়ে আরএসপি'র শ্রমিক ফ্রন্টের রাজনীতিতে যোগ দেন। আবদুল খালেক খান ঢাকায় চলে যান। নির্মল সেনের ভাগ্যে সহসা কারামুক্তি ঘটেনি। সম্ভবত তাকে পাঁচ ছয় বছর জেলে কাটাতে হয়েছিল। মোজাম্মেল হক নারায়ণগঞ্জ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম সাপ্তাহিক মুখপত্র বের করেন। পত্রিকার নাম "সংগ্রাম"। এই নামটিই পরে হাইজ্যাক করে মওদুদী জামায়াতের লোকেরা ঢাকা থেকে দৈনিক সংগ্রাম' বের করে।

১৯৫০ সালে বরিশাল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশের পর ঢাকায় এসে আবার দীর্ঘকাল পর খালেকদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে। খালেকদা তখন থাকেন ইকবাল হলে। বর্তমানে যার নাম জহুরুল হক হল। তখন এটি ছিল নামেই হল। আসলে সান বাঁধানো ভিটির উপর সারি সারি ছাপড়ার ঘর। ঘরগুলোর শুরু সলিমুল্লাহ হলের পাশ থেকে; শেষ হয়েছে নীলক্ষেতে গিয়ে। সামনেই লম্বা ইট বিছানো রাস্তা শেষ হয়েছে পলাশী ব্যারাকের রেলক্রসিংয়ে পৌছে। সেখানে মূল গেটের ভেতরে দু'টি টিনের খাপড়ার ছোট হোটেল। একটির নাম ছিল মুনশির দোকান। অন্যটির নাম মনে নেই। এই ইকবাল হলের ছাপড়ার ঘরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তখন থাকতেন অগত্যা গ্রুপ খ্যাত মুসতাফা নূরউল ইসলাম, তাসিকুল আলম খাঁ। সম্ভবত বর্তমানের প্রবীন সাংবাদিক কে জি মোস্তাফাও তখন ইকবাল হলে থাকতেন। মুসতাফা নূরউল ইসলাম সে সময় ভান্টু উবাচ নামে 'অগত্যা' পত্রিকায় একটি কলাম লিখতেন। এই কলামটি ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয়। মুনশির দোকানে সকালে বিকেলে চায়ের আড্ডা বসতো। এই আড্ডায় জমায়েত হতেন মুসতাফা নূরউল ইসলাম, ফজলে লোহানী, তাসিকুল আলম খাঁ, মাহবুব জামাল জাহেদী, এস এম আলী আলী কবির, কে জি মোস্তাফা এবং আরো অনেকে। আমি পাশে বসে নিবিষ্ট মনে তাদের কথাবার্তা শুনতাম এবং তাদের অনেকের সঙ্গে ধীরে ধীরে আমার পরিচয় গড়ে ওঠে।

এই ইকবাল হলে একেবারে পেছনের দিকের একটি ছাপড়ায় খালেকদা থাকতেন। তার ঘরের নম্বর ছিল সাত বাই পাঁচ (৭/৫)। অর্থাৎ সাত নম্বর ছাপড়ার

ঘর, পাঁচ নম্বর রুম। তিন শয্যার ঘর। খালেকদার এক রুম মেট ছিলেন নজরুল হক। তার বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া আর কারো ইকবাল হলে বৈধভাবে থাকার অনুমতি ছিল না। আমি বরিশাল থেকে এসে মাত্র ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছি। ঢাকা কলেজ তখন পুরনো শহরের সিদ্দিক বাজারে। বায়তুস সালাম নামে একটি দোতলা বিল্ডিং। চারপাশে টিনের ছাপড়া। বিল্ডিংয়ে সায়েন্স ক্লাস এবং টিনের ছাপড়াগুলোতে আর্টস সাবজেক্টের ক্লাস হয়। হোস্টেলগুলোও দুরে দুরে, যেমন একটি বেগমবাজারে নূরপুর ভিলায়, অন্যটি আরমানিটোলায় বান্ধব কুটিরে। এই হোস্টেলে সিট পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমিও ইন্টারমিডিয়েটের ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে পাই নি। কলেজেতো ভর্তি হলাম এখন থাকি কোথায়? হোস্টেলে সিট যদি পাওয়া যেতো তাহলেও তখন হোস্টেলে থাকার উপায় আমার ছিল না। কারণ, আমার টাকা নেই। কলেজে ভর্তি হওয়ার মতো টাকাটা কোনভাবে জোগাড় করেছি।

ঠিক এই সময় খালেকদার সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম, খালেকদা সেই আগের মতোই আছেন। ধুলি ধূসরিত স্যান্ডেল পায়ে, গায়ে ময়লা শার্ট, পায়জামা। দুলে দুলে হাঁটেন, ঈষৎ হেসে কথা বলেন। কিন্তু তখন তার চরম দূরবস্থা। রাজনীতি করার দায়ে পরিবার থেকে টাকা পয়সা পাওয়া বন্ধ। পুলিশের কালো খাতায় নাম লেখা রয়েছে। তাই চাকরি বাকরি পাচ্ছেন না। বিশ্বদ্যিালয়ের ক্লাসে যাওয়াও বন্ধ। ইকবাল হলের মুনশির দোকানের পাশের দোকানটিতে বাকিতে খাওয়ার সুযোগ তখনো বন্ধ করা হয়নি বলে তাকে অনাহারে থাকতে হয়নি। ঢাকায় আমার থাকার সমস্যার কথা শুনে খালেকদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তুমি আজই আমার রুমে চলে আসো।

আমি দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে বললাম, খালেকদা, এখন আপনার যা অবস্থা।

খালেকদা বললেন, সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। যতদিন কলেজের হোস্টেলে সিট না পাও, ততদিন তুমি আমার সঙ্গে থাকবে এবং আমার সঙ্গে ওই হোটেলে আমার গেস্ট হিসেবে খাওয়া দাওয়া করবে।

ত্রিশ

চল্লিশের দশকের বরিশালের সেই বিখ্যাত ত্রয়ী—শামসুদ্দীন আবুল কালাম, মোজাম্মেল হক এবং আবদুল খালেক খান আজ পরস্পরের কাছ থেকে বহুদুরে এবং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কথাশিল্পী শামসুদ্দিন আবুল কালাম বহু বছর যাবত রোমে স্বেচ্ছানির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। বাম রাজনীতিক মোজাম্মেল হক, পরে

হয়েছিলেন সাংবাদিক। ১৯৬৫ সালে কায়রোতে বিমান দুর্ঘটনায় আরও অনেক সাংবাদিকের সঙ্গে নিহত হন। কায়রোর অদূরে এক মরুভূমিতে তার মরদেহ শায়িত। আবদুল খালেক খান মোজাম্মেল হকের সঙ্গে পঞ্চাশের দশকেই সাংবাদিকতায় যোগ দেন এবং দৈনিক 'সংবাদ' দৈনিক 'আজাদ' ইত্যাদি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করার পর হন দৈনিক বাংলা'র সিনিয়র সাংবাদিক। বহুকাল আগে তিনি সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করে সংসারী হয়েছেন। কিন্তু মানুষটি বদলান নি। না চেহারায়, না মানসিকতায়। আঠারো বছর পর তার সঙ্গে দেখা হল ঢাকায় জানুয়ারীর (১৯৯৩) এক শীতার্ত সকালে। তিনি কথা রেখেছেন। আগের দিন বত্রিশ নম্বর বাসায় টেলিফোন করেছিলেন এবং পরের দিনই আমার বাসায় ছুটে এসেছেন। খালেকদার সঙ্গে সুখদুঃখের নানা গল্প করতে করতে ভাবলাম, আজ যদি "ভারতবর্ষ" গল্পের লেখক এস ওয়াজেদ আলী বেঁচে থাকতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে খালেকদাকে নিয়ে একটি অবিস্মরণীয় গল্প লিখতে পারতেন।

কথায় কথায় খালেকদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি বুঝি গতকাল বত্রিশ ধানমণ্ডি থেকে বনানীর গোরস্থানেও গিয়েছিলে?

বলেছি, গিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুর পরিবার এবং জাতীয় নেতাদের সমাধিতে ফুল দিয়েছি এবং জেয়ারত করেছি।

ঃ তুমি কি টুঙ্গিপাড়াতেও যাবে?

ঃ হ্যাঁ। দু'চারদিনের মধ্যেই যাব।

খালেকদাকে সেদিন শুধু বলি নি, বনানী গোরস্থানে দাঁড়িয়ে আমাকে যে অভাবিত আচ্ছন্নতায় পেয়ে বসেছিল, তার কথা। বনানী গোরস্থানে ঢুকতেই হাতের ডান পাশে জোড়া কবর—কবি আবদুল কাদির ও সাংবাদিক নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। গোরস্থানে যতই হাঁটছি শুধু পরিচিত ও এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের নামফলক দেখছি; এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, কবি আবুল হাসান আরও অসংখ্য নাম। কবরের নাম ফলকগুলো যেন পরিচিত চেহারা হয়ে উঠছে আর বলছে, 'আরে গাফ্ফার যে, তুমি এতদিন পর? এসো এসো, তুমি ছাড়া সেই পুরনো আড্ডাতো আর জমছে না।' অসংখ্য বন্ধু আর পরিচিত জনের কবরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল তারা সবাই যেন জীবিত। কেবল আমিই এক মৃতদেহ, জানুয়ারী মাসের এক প্রাক্-অপরাহ্নে গোরস্থানের মাঝে হেঁটে বেড়াচ্ছি ভূতের মতো।

মনে পড়ল হাসান হাফিজুর রহমানের কথা। 'সওগাতের' আড্ডায় দেখা হলেই যিনি বলে উঠতেন, গাফ্ফার, চলুন হ্যাপি রেস্টুরেন্টে এক কাপ চা খেয়ে আসি। কবি আবদুল কাদিরের সঙ্গে দেখা হলেই তাগাদা দিতেন, কই, 'মাহে

নও'-এর জন্য একটা গল্প দিলে না? আহসান হাবীব। পঞ্চাশের ও ষাটের সেই দূরন্ত তারুণ্যভরা দিনগুলোতে যার মাহুতটুলির বাসায় সপ্তাহে অন্তত একদিন ঢু না মারলে মনে শান্তি পেতাম না। তরুণ কবি আবুল হাসান। হৃদরোগে অকালে যার জীবন ঝরে গেছে। রাস্তায় দেখা হলেই বলতো, 'গাফ্‌ফার ভাই, দু'টো টাকা দিন। ওষুধ কিনবো। বেশিদিন বাঁচবো না।' জানতাম, সে ওষুধ কিনবে না। তবু টাকা দিতাম।

আমার সঙ্গে সেদিন সঙ্গী সাথী না থাকলে হয়তো আচ্ছন্নের মতো বনানী গোরস্থানেই অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াতাম। শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ালাম তিন জাতীয় নেতার সমাধির পাশে। তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ও মনসুর আলী। শুধু একজন মানুষের দেখা পেলাম না। তিনি কামরুজ্জামান। তার লাশ তার জেলার পারিবারিক গোরস্থানে নিয়ে দাফন করা হয়। শেষদিকে তার সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল বেশি। তার 'দৈনিক জনপদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। তিনি ছিলেন আওয়ামী সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী। কিছুকাল ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতিও। কিন্তু কোনোদিন 'জনপদের' সম্পাদক হিসেবে আমার লেখার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। এমনকি আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে লিখলেও কোনোদিন বলেন নি, এটা কেন লিখলেন? বনানীতে দাঁড়িয়ে বুকের দীর্ঘশ্বাসটি গোপন করলাম। হেনা ভাইয়ের সঙ্গে এ যাত্রায় আমার দেখা হল না। কামরুজ্জামানকে আমি ডাকতাম হেনা ভাই। অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন হেনা ভাই। এমন সরল, সদালাপী, প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা নিরহংকার মানুষ আমি কম দেখেছি।

রাজনীতিতে যে কামরুজ্জামান ছিলেন নির্ভীক ও সাহসী ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত জীবনে সেই মানুষটিই ছিলেন কোনো কোনো ব্যাপারে ভীষণ ভীতু। বিশেষ করে শরীরে ইঞ্জেকশন দেওয়ার কথা উঠলে তার মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে যেতো। একদিনের কথা বলি। কামরুজ্জামান তখন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট। বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি রাজনীতির প্রথা অনুযায়ী আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দিয়েছেন এবং শুধু প্রধানমন্ত্রী পদে রয়েছেন। আমি দৈনিক 'জনপদের' সম্পাদক। কি একটা কাজে হেনা ভাইয়ের কাছে গেছি। তিনি ড্রয়িং রুমে বসে আওয়ামী লীগের কিছু তরুণ বয়সী লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাকে দেখে কাছে ডেকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, আমাকে বাঁচান। আপনার ভাবী (হেনা ভাইয়ের স্ত্রী) টীকা দেওয়ার লোক ডেকে এনেছে।

ঢাকায় সম্ভবত তখন পেটের পীড়া জাতীয় কিছু রোগ এবং গুটি বসন্ত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। হেনা ভাইয়ের স্ত্রী তাই বাসায় সকলকে টীকা ও ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য টীকা দেওয়ার লোক ডেকে এনেছেন। টীকা দিতে এসেছেন একজন মহিলা ও একজন পুরুষ। বাসায় সকলের ইঞ্জেকশন ও টীকা নেওয়া হয়ে গেছে। এখন শুধু হেনা ভাইয়ের বাকি। তিনি নানা ওজর আপত্তি দেখাচ্ছেন।

আমি হেনা ভাইয়ের ইঞ্জেকশন-ভীতির কথা জানতাম। তাই সাহস দিয়ে বললাম, আপনি কিছু ঘাবড়াবেন না হেনা ভাই। আমি আপনার পাশে বসলাম। দেখবেন আপনি কিছু টেরও পাবেন না।

হেনা ভাই কিছুক্ষণ আমার দিকে অসহায়ের মতো চেয়ে রইলেন, ভাবখানা এই যে, দাউ টু ব্রুটাস। তারপর সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি একটু বাথরুম থেকে আসি।' তিনি সেই যে বাথরুমে যাওয়ার কথা বলে গেলেন, আর ফেরেন না। প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। হেনা ভাইয়ের পাত্তা নেই। ভাবী উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, কই, তিনিতো বাথরুমেও নেই। তার গাড়ি বাসার সামনেই দাঁড় করানো। ড্রাইভার বসে ঝিমুচ্ছে। তিনি বাইরেও যাননি। তাহলে?

অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল, তিনি তার বেডরুমে বেডের নীচে কার্পেটের উপর শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। অনেক টানাহ্যাঁচড়া করে তাকে বের করে আনা হল। টীকা দেওয়ার মহিলাটিতো মুখে কাপড় গুঁজে ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে শুরু করেছে। হেনা ভাইকে তার সামনে আনতেই হেনা ভাই একটা হাত তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, নাও যা খুশি কর। আমাকে তোমরা শান্তিতে থাকতে দেবে না, তা জানি।

১৯৭৫ সালের তেসরা নভেম্বরের সেই রাত্রে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে একদল নারীঘাতী, শিশুঘাতী বর্বর ঘাতকের উদ্যত বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে এই মানুষটি কি বলেছিলেন, তা আমার জানা নেই। শুধু তার অসহায় মুখটির কথা আমি স্মরণ করতে পারি। তার বেশি কিছু নয়।

তিন জাতীয় নেতা তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল এবং মনসুর আলীর সমাধিতে ফুল রেখে ফিরে এলাম বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সারিবাঁধা সমাধিতে। কোন্‌টি কার সমাধি জানি না। একটা ফলকে একগুচ্ছ রক্তজবার মত একগুচ্ছ নাম; বেগম ফজিলাতুন্নেসা থেকে শিশু রাসেল পর্যন্ত। সুলতানার নামটি তার সারল্যমাখা হাসিখুশি মুখটির মতোই বিভাময়। একটি নামে এসে আমার চোখ স্থির হয়ে গেল—শেখ ফজলুল হক মনি। বাংলার বাণীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা। অস্বীকার করবো না, তাঁর সঙ্গে আমার মতানৈক্য ছিল, গভীর মতবিরোধ ছিল। তবু, জানি না কেন, 'বাংলার বাণী' পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই মনি চাইতেন আমি যেন তার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকি। কিছুকাল আমি 'বাংলার বাণী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলামও।

শেখ মনি যুবনেতা, সুবক্তা, আকর্ষণীয় তার ব্যক্তিত্ব। দুর্জয় তার সাহস। সবই আমি জানতাম। শুধু তার একটি গুণের কথা আমি জানতাম না। সেটি আমার কাছে প্রকাশ পায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। ১৯৬৯ সালে ১লা জুন 'দৈনিক ইত্তেফাকের'

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া আকস্মিকভাবে মারা গেলেন। আমি তখন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্বে রয়েছি। আমরা ঠিক করলাম এখন কিছুদিন রোজ 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয়ের পাতায় মানিক মিয়ার উপর দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখা ছাপাবো। যেমন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, 'অবজার্ভারের' আবদুস সালাম, 'সংবাদের' জহুর হোসেন চৌধুরী, এয়ার মার্শাল আসগর খান, শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম আখতার সোলায়মান, অমিতাভ চৌধুরী এবং আরও অনেকের। সকলেই লেখা দিলেন। এমনকি এয়ার মার্শাল আসগর খানও। তার ইংরেজি লেখা আমি নিজে বাংলায় অনুবাদ করে ছাপলাম। সবশেষে লেখা দেওয়ার পালা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। বঙ্গবন্ধু সাধারণত লিখতেন না। ডিকটেশন দিতেন এবং প্রায়শ সেই ডিকটেশন নেওয়ার ভার পড়তো আমার উপর। সুতরাং এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই ধরে নিলাম। মানিক মিয়া সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর লেখাটির জন্য আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব ছিলাম। কারণ, দু'জনেই শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক শিষ্য। ব্যক্তিগত জীবনে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের সখ্য ও ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। তাই মানিক মিয়া সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণে অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছিলাম।

বঙ্গবন্ধুকে লেখার জন্য তাগাদা দিতে যেতেই তিনি বললেন, 'আগামী দু'দিনের মধ্যে তুমি লেখা পেয়ে যাবে।' আমি একটু বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে, তিনি আমাকে ডিকটেশন নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন না। শুধু বললেন, 'দু'দিনের মধ্যেই লেখাটা দেবেন। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি নিজেই এবার লিখবেন?

বঙ্গবন্ধু রহস্যময় কণ্ঠে বললেন, দেখি চৌধুরী, এবার নিজেই লিখে তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে পারি কিনা।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। সেদিনের মতো বিদায় নিলাম।

দু'দিন পর আমাকে আর বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতে হল না। বাহক মারফৎ 'ইত্তেফাক' অফিসে বঙ্গবন্ধুর লেখাটা এসে হাজির। সঙ্গে একটা চিরকুট— 'কথামতো লেখাটা পাঠালাম। আশা করি তোমাদের পছন্দ হবে।' মুজিব ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে লেখাটা পড়ে ফেললাম। বিস্ময়কর লেখা। যেমন সহজ স্বচ্ছন্দ সুন্দর ভাষা, তেমনি অনেক অন্তরঙ্গ অজানা তথ্য। একদিকে রাজনৈতিক তথ্যে সমৃদ্ধ নিবন্ধ, অন্যদিকে গল্পের মতো সরস বর্ণনা। মানিক মিয়ার প্রথম যুগের ভাঙা মোটর গাড়িটি, তার গাঁজাখোর বিহারী ড্রাইভারের কাহিনীও তাতে স্থান পেয়েছে।

আমার অহঙ্কারে একটু ঘা লাগল। আমার ধারণা ছিল, বঙ্গবন্ধুর এই অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথা আমি ছাড়া আর কেউ তাকে লিখতে সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু আমার এই ধারণা যে ভুল, তার চাক্ষুষ প্রমাণ এই লেখাটি এবং তা আমার হাতেই রয়েছে।

আমার সন্দেহ হল, বঙ্গবন্ধুর সহপাঠী এবং বন্ধু, 'ইত্তেফাকের' তৎকালীন বার্তা সম্পাদক সিরাজউদ্দিন হোসেন (পরবর্তীকালে শহীদ সিরাজউদ্দিন হোসেন) সম্ভবত বঙ্গবন্ধুকে এই লেখাটির ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তিনি উঁচুদরের সাংবাদিক, তার ভাষা সাহিত্যের নয়, এত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল নয়। তবু তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, না, গাফ্ফার, আমি এই লেখার ব্যাপারে কিছুই জানি না। শেখ মুজিব আমাকে কিছুই বলেন নি।

সিরাজউদ্দিন হোসেনও লেখাটি পড়লেন। তারিফ করে বললেন, চমৎকার লেখা। আজই ছেপে দাও।

লেখাটা প্রেসে পাঠিয়ে সোজা বত্রিশ নম্বরে গেলাম। বঙ্গবন্ধু বাইরে বেরুবার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। আমাকে দেখে প্রথমেই বলে উঠলেন, কি চৌধুরী, লেখা পেয়েছো? পছন্দ হয়েছে?

ইতস্তত না করে বললাম, লেখা পেয়েছি। প্রেসেও চলে গেছে। আমি একটা কথা জানতে চাই।

ঃ কি কথা জানতে চাও? বঙ্গবন্ধু পাইপে আগুন ধরালেন।

ঃ লেখাটা আপনি ডিকটেশন দিয়েছেন। কিন্তু ভাষা আপনার নয়। কে এটা লিখেছেন?

বঙ্গবন্ধু হাসলেন, তোমার পছন্দ হয়েছে?

বললাম, পছন্দ হয়েছে বললে কম বলা হবে। চমৎকার হয়েছে। আমি ধারণা করতে পারছি না, এটা কে লিখেছেন?

বঙ্গবন্ধু হাসতে লাগলেন, বললেন তুমি বিশ্বাস করবে না।

ঃ আপনি বললে বিশ্বাস করবো না এটা হতে পারে না। আমি বললাম।

ঃ তাহলে শোনো। এটা লিখেছেন আমার ভাগ্নে!

ঃ আপনার কোন্ ভাগ্নে?

ঃ শেখ ফজলুল হক মনি। বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে নামটা উচ্চারণ করলেন।

একত্রিশ

শেখ ফজলুল হক মনির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল লাভ এন্ড হেটের। কখনো তাকে দারুণভাবে পছন্দ করতাম; আবার কখনো কখনো করতাম দারুণভাবে না পছন্দ। বঙ্গবন্ধুও কথাটা জানতেন। তাই মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলতেন,' তোমার এবং মনির মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠলে ভালো হত।' এই ভালো সম্পর্ক মাঝে মাঝে গড়ে উঠতো, আবার তা ভেঙে যেতো। বিস্ময়ের কথা এই যে, সম্পর্কের এত টানাপোড়েনের মধ্যে মনি প্রায়ই ছুটে আসতেন আমার কাছে। নানাভাবে চাইতেন তার কাজের সঙ্গে আমাকে জড়াতে। আমার ভালো লাগতো তার দূরন্ত সাহস এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের শক্তিকে। এই বিশ্লেষণের সঙ্গে আমি অনেক সময় একমত হতাম না। কিন্তু আগ্রহের সঙ্গে তার বক্তব্য শুনতাম।

ষাটের দশকের শেষ দিকে মনি যখন প্রথম 'বাংলার বাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন, তখনও আমার কাছে এসেছেন, 'গাফ্ফার ভাই, আমরা একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি, নাম 'বাংলার বাণী'।

পত্রিকার নামটা শুনেই চমকে উঠেছি, বলেছি, অপূর্ব নাম। এই নাম যথার্থই একটা অর্থ বহন করে।

মনি বললেন, সেই অর্থ কি জানেন? বাংলার স্বাধীনতার বাণী। এই বাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি পত্রিকা দরকার। আপনি সাহায্য করবেন তো?

ঃ নিশ্চয়ই করবো। সোৎসাহে বললাম।

মনি বললেন, প্রথমেই একটি সাহায্য দরকার। পত্রিকা প্রকাশের জন্য ডেপুটি কমিশনারের অফিস থেকে একটি ডিক্লারেশন নিতে হয়। আইবি'র ইনেস্পেকশন এবং ভালো রিপোর্ট ছাড়া এই ডিক্লারেশন দেওয়া হয় না। আমার নামে সরকার পত্রিকা প্রকাশের ডিক্লারেশন দেবেন কিনা সন্দেহ। তাই একটু তদ্বির করতে হবে। আমাকে নিয়ে ডেপুটি কমিশনারের কাছে আপনাকে যেতে হবে।

ঢাকার ডেপুটি কমিশনার তখন ছিলেন এম কে আনোয়ার। মনি জানতেন তিনি আমার বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ফজলুল হক হল ছাত্র ইউনিয়নের একই কেবিনেটে আমরা সদস্য ছিলাম। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় আনোয়ার ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তা সত্ত্বেও এই আন্দোলনে তার এমন একটি নেপথ্য ভূমিকার কথা আমি জানি, যা ঢাকা শহরে একটি ভয়াবহ রক্তপাত এড়াতে সে সময় সাহায্য করেছে। এম কে আনোয়ার যদি পারেন, তাহলে আমাকে সাহায্য করবেন, এই বিশ্বাস আমার ছিল;

তাই মনির প্রস্তাবে রাজি হলাম, বললাম, আমি ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে একটা এপয়েন্টমেন্ট করছি। কবে যাবেন বলুন?

মনি বললেন, শুভস্য শীঘ্রম। আগামীকালই চলুন।

পরদিন সকালেই ডিসির সঙ্গে তার বাসায় দেখা করার ব্যবস্থা করলাম। মনিকে নিয়ে গেলাম ডিসি'র বাসায় তার ড্রায়িং রুমে। চা নাশতা এলো। শেখ মনি 'বাংলার বাণী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করতে চান শুনে ডিসি একটু ভেবে মনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিতো পত্রিকার সম্পাদক হবেন। প্রকাশক ও মুদ্রাকরও কি আপনি হতে চান।

মনি বলনে, কোনো অসুবিধা আছে?

ডিসি বললেন, পত্রিকার ডিক্লারেশন সাধারণত প্রিন্টার এবং পাবলিশারের নামে হয়। ডিক্লারেশন দেওয়ার আগে আইবি বা ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ভেরিফিকেশন লাগে। আপনি মাত্র জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমি ডিসি হলেও আমার জন্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মনি বললেন, আমি কি অন্য কাউকে প্রিন্টার এণ্ড পাবলিশার হিসেবে দেখিয়ে ডিক্লারেশন চাইবো?

খোরশেদ আনোয়ার বললেন, তাহলে ভালো হয়। খুবই তাড়াতাড়ি ডিক্লারেশন দিতে পারবো। আপনার নামে যদি চান তাহলেও দেবো। তবে দু'একটা দিন সময় দিতে হবে। সরকারী অফিসার হিসেবে সব দিক গুছিয়ে নিয়ে ডিক্লারেশন দেবো। যাতে কোনো সমস্যায় না পড়ি।

একটা পত্রিকা প্রকাশের ডিক্লারেশন পাওয়া তখন ছিল অসম্ভব ব্যাপার। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আইবি ভেরিফিকেশনের নামে ঘোরানো হতো; আবেদন নামঞ্জুর করা হতো। সুতরাং 'বাংলার বাণী'র ডিক্লারেশন দেওয়ার ব্যাপারে এম কে আনোয়ার সহজেই রাজি হওয়ায় শেখ মনি খুব খুশি হলেন। ডিসি'র বাসা থেকে বেরিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'চলুন, গাফ্‌ফার ভাই, আজ আপনাকে চায়নিজ খাওয়াবো।' মনি জানতেন, আমি চীনা রাজনীতি পছন্দ না করলেও চায়নিজ খাদ্যের নামে খুবই দুর্বল।

দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় পর আজও স্মরণ করতে পারি, গুলিস্তান বিল্ডিংয়ের দোতলা কি তেতলায় একটা চীনা রেস্তোরাঁয় আমরা বসেছিলাম। খেতে বসে মনিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি মনে হয়, ইয়াহিয়া খান সত্যি সত্যি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন?

মনি বললেন, এছাড়া পাকিস্তানের মিলিটারি জুন্টার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। তবে ভয়টা নির্বাচন নিয়ে নয়, ভয় অন্যত্র।

ঃ কোথায় ভয়?

মনি বললেন, নির্বাচনের আগে এবং পরে পর্দার আড়ালে যেসব খেলা হবে, তা নিয়েই আসল ভয়! আওয়ামী লীগে এখন আতাউর রহমান, সালাম খানদের দল নেই। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি বয়সের যেসব প্রবীন নেতা রয়েছেন, তাদেরও কেউ কেউ আপোসবাদী এবং নানা রকম খেলা খেলতে চান। আপনিতো জানেন, বঙ্গবন্ধুর দাবি, এক মাথা এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন এবং জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা অথবা সংশোধন এবং তাতে ছয় দফার অন্তর্ভূক্তি। কিন্তু 'ইত্তেফাকের' মানিক মিয়া বেঁচে থাকা পর্যন্ত চেয়েছেন '৫৬ সালের সংবিধানের পুনরুজ্জীবন। তাতে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়; কিন্তু প্যারিটি বা সংখ্যা সাম্যের ব্যবস্থা বহাল থেকে যায় এবং ছয় দফার অন্তর্ভূক্তির কোজে সুযোগই থাকে না। কিন্তু আওয়ামী লীগের কিছু প্রবীন নেতা তলে তলে 'ইত্তেফাকের' এই নীতিকে সমর্থন দিয়েছেন এবং এখন মানিক মিয়ার মৃত্যুর পরেও এই ব্যাপারে তার ছেলে ব্যারিস্টার মইনুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকে বার বার সতর্ক করে দিয়েও আমি কোনো ফল পাচ্ছি না। তিনি বলছেন, সবকিছু তিনি জানেন এবং কন্ট্রোল করতে পারবেন। আমার ভয়, এই গ্রুপটিকে হাত করতে পারলে ইয়াহিয়া খান অথবা ভুট্টো আবার কি নতুন চাল চালেন!

মনির এই বিশ্লেষণের সঙ্গে আমি একমত হলাম না। বললাম, আপনি রজ্জুতে সর্পভ্রম করছেন। ব্যারিস্টার মইনুল এখন 'ইত্তেফাকের' সম্পাদক হতে পারেন, কিন্তু তিনি আওয়ামী লীগে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন মানিক মিয়া বেঁচে থাকতেই। তিনি এখন দলীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের বাইরে যাবেন, তা মনে হয় না। মানিক মিয়া বেঁচে থাকতে অন্য কথা ছিল। তিনি নিজেই ছিলেন একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক স্ট্রাটেজি হিসেবে তিনি গণতন্ত্রের পথে প্রথম পদক্ষেপ রূপে '৫৬ সালের সংবিধানের পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন। এখন তাঁর মৃত্যুর পর এই ইস্যুটিরও মৃত্যু হয়েছে। এখন আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তই হবে অধিকাংশ বাঙালীর সিদ্ধান্ত, জনগণের জন্য নেতৃত্বের ইতিবাচক দিকনির্দেশ। এ সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের প্রতি মইনুল ও ইত্তেফাক সমর্থন দেবেনা আমার তা মনে হয় না। মানিক মিয়া তার বয়স, ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাবের জন্য যে স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সেই ভূমিকা গ্রহণ করার মতো বয়স, ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব কোনোটাই মইনুলের নেই। কেবল 'ইত্তেফাকের' প্রভাব ও জনপ্রিয়তার জোরে তিনি রাতারাতি দ্বিতীয় মানিক মিয়া হয়ে উঠবেন, এটা ভাবা তার পক্ষে চরম বোকামি হবে। আমার মনে হয় না, এই বোকামি তিনি করবেন। 'ইত্তেফাকের' ভূমিকা অবশ্যই আওয়ামী লীগের দলীয় মুখপত্রের ভূমিকা হবে না। কিন্তু এত বড় গণঅভ্যুত্থানের পর কোনো পপুলার গণদাবির বিরুদ্ধে

বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের বিপরীতে 'ইত্তেফাক' অবস্থান নেবে, তা ভাবতে কষ্ট হয়। মনি একটু বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বললেন, আপনি আপনার কল্পনা বিলাসে মত্ত থাকুন আমার আপত্তি নেই। তবে একটা কথা বলে রাখছি, মনে দুঃখ পাবেন না, আপনি 'ইত্তেফাকে' যদি বঙ্গবন্ধুর এক মাথা এক ভোট দাবির পক্ষে ক্রমাগত লিখতে থাকেন, তাহলে আপনার চাকরি থাকবে না।

আমি মনির কথা শুনে মনে মনে বেজায় চটে গেলাম। বললাম, আপনি সম্ভবত সেটাই চান। মানিক মিয়ার মৃত্যুর পরেও আমি 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করছি, এমন কি চার্জে রয়েছি, এটা হয়তো আপনি ভালো চোখে দেখছেন না।

শেখ মনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, গাফ্ফার ভাই, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি অনেক সময় অনেকের মুখের উপর চটপট অনেক কথা বলে ফেলি। ফলে অনেকেই আমাকে রূঢ় মনে করেন। 'ইত্তেফাক' থেকে আপনার চাকরি যাক, তা আমি কখনো কামনা করি না। বরং আমার আশংকা অমূলক প্রমাণিত হোক, আমি তাই মনেপ্রাণে কামনা করি।

মনির সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনারই কিছুদিন পরের কথা। বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে দৃঢ়ভাবে বললেন, আগামী নির্বাচনের আগে এক মাথা এক ভোটের ব্যবস্থা করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে দেওয়া না হলে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না। 'ইত্তেফাকে' বঙ্গবন্ধুর দাবিকে সমর্থন জানিয়ে একটা সম্পাদকীয় লিখে ফেললাম। বেশ জোরালো সম্পাদকীয় ব্যরিষ্টার মইনুলকেও সে কথা জানালাম। তিনি তখন সম্পাদকীয় বিভাগের তত্ত্বতদারকি করা শুরু করেছেন। সম্পাদকীয়ের বিষয়বস্তু শুনে তখন তিনি কিছুই বললেন না। সুতরাং মনে মনে স্বস্তি পেলাম। ভাবলাম, শেখ মনির আশংকা সত্যিই অমূলক।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে 'ইত্তেফাকে' প্রকাশিত নিজের লেখা সম্পাদকীয় পড়ে আমার চোখ চড়ক গাছে। নিখুঁত সার্জিক্যাল অপারেশনের ফলে আমার লেখাটি 'এক মাথা এক ভোটের' বদলে ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবনের দাবি হয়ে উঠেছে। আমি আগের দিন রাত দশটায় অফিস ছেড়েছি। তাহলে তারপরই এই অস্ত্রপ্রয়োগের কাজটি হয়েছে। কিন্তু কাকে দিয়ে কাজটি করানো হয়েছে? সম্পাদকীয় বিভাগে আমার সহকর্মী রাহাত খান, অথবা হাবিবুর রহমান মিলনকে দিয়ে কি? তারা বললেন, তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাহলে? শেষ পর্যন্ত প্রেসের ফোরম্যান বজলু মিয়া (বজলুল রহমান) জানালেন,

ব্যারিস্টার মইনুল মধ্যরাতে এসে বার্তা বিভাগ থেকে এহতেশাম হায়দার চৌধুরীকে ডেকে নেন। সম্পাদকীয়টি তখন কম্পোজ করা হয়ে গেছে। কিন্তু গ্যালি প্রুফের উপরেই কলম চালিয়ে এহতেশাম হায়দার চৌধুরী এ কাজটা করেছেন। তাকে নির্দেশ দিয়েছেন ব্যারিস্টার মইনুল।

দুঃখে আমার মনটা ভেঙে গেল। বলতে গেলে 'দৈনিক ইত্তেফাকের' প্রায় জন্মকাল থেকে আমি এই পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত। কখনো 'ইত্তেফাকে' কাজ করাকে আমি চাকরি মনে করি নি। মানিক মিয়া কোনো দিন আমার সঙ্গে এ ধরণের ব্যবহার করেন নি। আমি 'ইত্তেফাকের' বেতনভোগী সাংবাদিক; পত্রিকাটির মালিক কিংবা নীতিনির্ধারক নই। সুতরাং মইনুলের উচিৎ ছিল আমাকে খোলাখুলি বলা, তারা '৫৬ সালের সংবিধানের পুনরুজ্জীবন চান। তা না বলে গভীর রাতের এই সার্জিক্যাল অপারেশন আমার কাছে সম্মানজনক কাজ বলে মনে হল না।

কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম, আমার প্রতি ব্যারিস্টার মইনুলের ব্যবহার খুব ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। সম্পাদকীয় বিভাগেও তার খবরদারির মাত্রা বাড়ছে। একদিন আমাকে ডেকে নিয়ে মইনুল জানালেন, আমাকে তিনি 'ইত্তেফাক' প্রকাশনা গ্রুপের সিনে-সাপ্তাহিক 'পূর্বাণীর' প্রধান সম্পাদক করতে চান। পরে তার মতলব টের পেলাম। তিনি আমাকে শেখ মুজিবের রাজনীতির প্রতি বেশি অনুরাগী মনে করেন। তার ইচ্ছা, তাদের মতামতের প্রতি অধিক নমনীয় বার্তা সম্পাদক সিরাজউদ্দিন হোসেনকে এনে কার্যনির্বাহী সম্পাদক করা এবং খোন্দকার আবদুল হামিদকে কলামিস্ট হিসেবে 'ইত্তেফাকে' ফিরিয়ে আনা।

আমার তখন আর অন্য কাগজে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবু ভাবলাম, এই নিত্যবিড়ম্বনার চাইতে বেকারত্ব ভালো। আমি বহু দিনের সুখ-দুঃখ বিজড়িত, মানিক মিয়ার স্মৃতি-পূত 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগপত্র দাখিল করলাম। দু'দিন পরই মইনুলের স্বাক্ষরিত চিঠি এলো আমার হাতে। মইনুল 'ইত্তেফাকের' সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করে আমার প্রতি তার এবং তার পরিবারের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং সবশেষে লিখেছেন, 'আপনার পদত্যাগপত্র মঞ্জুর করা হলো।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরতেই মনে পড়ল শেখ মনির কথা। মাত্র কয়েকদিন আগে শোনা তার সেই সতর্কবাণী।

বত্রিশ

"আমরা যে য়ার পথে চলে যাই
থাকে শুধু স্মৃতি –
মধ্য বয়সের শেষে তাই যেন
অনুপম গীতি।
তার সব ছন্দ সুর অস্তাচলে লেখা
সব পাখি উড়ে যায় আমি শুধু একা।"

(ত্রিশের দশকের একটি ইংরেজি কবিতার কয়েক পংক্তির অনুবাদ)

শেখ ফজলুল হক মনি আজ বেঁচে নেই; কিন্তু বেঁচে আছে তিনটি ইনস্টিটিউশন। বাংলার বাণী প্রকাশনা গ্রুপ, বাংলাদেশ যুবলীগ এবং শিশুকিশোর সংগঠন শাপলা কুঁড়ির আসর। একজন ব্যক্তি যখন তার সব ভালো মন্দ নিয়ে ইনস্টিটিউশন হয়ে ওঠেন, তখন তার মৃত্যু হয় না। শেখ ফজলুল হক মনিরও তাই মৃত্যু নেই। আমরা অনেকে পছন্দ করি বা না করি, বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে, সাংবাদিকতা ও সংস্কৃতি থেকে শেখ ফজলুল হক মনি এই নামটি মুছে ফেলা যাবে না। শেখ মনি নামটি এখন আর শুধু একটি নাম নয়, একটি ইনস্টিটিউশন।

শেখ মনির সঙ্গে আমার বড় রকমের মতান্তর হয়েছিল দু'বার। বঙ্গবন্ধু তাঁর মন্ত্রিসভায় যখন বড় রকমের রদবদল ঘটিয়ে আবদুস সামাদ আজাদের স্থলে ডঃ কামাল হোসেনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন, তখন এই পরিবর্তনকে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পরিবর্তনের পূর্বাভাস বলে আশংকা প্রকাশ করে আমি "দৈনিক জনপদে" স্বনামে একটি উপসম্পাদকীয় লিখেছিলাম। ডঃ কামাল হোসেনের যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আমার তখনো সন্দেহ ছিল, এখনো আছে। কিন্তু তার রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কে আমার তখনো শ্রদ্ধা ছিল, সেই সন্দেহ প্রকাশে আমি কিছুমাত্র দ্বিধা করি নি। ঢাকায় লেখাপড়া শিখেও প্রথম দিকে তিনি বাংলা বলতে পারতেন না। বাঙালী সংস্কৃতি ও জাতীয়তা সম্পর্কেও তার মনে কোনো প্রকার অনুরাগ ও আনুগত্য আছে, তা কখনো আমার মনে হয়নি। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার জোয়ারের সময় তিনি যখন আওয়ামী লীগে যোগ দেন, তখনো আমার মনে হয়েছে, তিনি আইনের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য। রাজনৈতিক কেরিয়ার গঠনের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। তিনি কেরিয়াবিস্ট মুখে তিনি গণতন্ত্রের আপ্তবাক্যটি ধরে রাখবেন; কিন্তু কাজে চালাকি সুবিধাবাদী নীতি

অনুসরণ করবেন। শেখ মনি আমার সঙ্গে কোনো কোনো ব্যাপারে একমত হন নি। তিনি 'বাংলার বাণী'তে আমার বক্তব্যের জবাব লিখেছিলেন। এর আগেও কামাল হোসেন সংক্রান্ত আমার একটি লেখার উপর তার মত প্রকাশ করতে গিয়ে 'বাংলার বাণী'তে এক পৃষ্ঠাব্যাপী স্বনামে লেখা একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন শেখ মনি। তার শিরোনাম ছিল "গাফ্‌ফার ভাই, গোস্বা করবেন না।"

১৯৭৪ সালের শেষ দিকে শেখ মনির সঙ্গে আমার আবার মতান্তর। এবার ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, নীতি নিয়ে। এ সময় বাংলাদেশে নানা ধরণের সংকট চলছে। বঙ্গবন্ধু ঠিক করলেন, তিনি বেতারে ও টেলিভিশনে একটি নীতিনির্ধারণী ভাষণ দেবেন। যথাসময়ে 'গণভবনে' আমার ডাক পড়ল। বঙ্গবন্ধু একটা সাদা কাগজে তার বক্তব্যের মূল কথাগুলো নোট করেছিলেন। আমাকে বললেন, তুমি এই কথাগুলোই তোমার ভাষা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও।

আমি তাঁর সংক্ষিপ্ত নোট পড়ে দেখছি। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু বললেন, তোমার একটা মত আমি জানতে চাইছি। আমি বলেছি, আমার স্বপ্ন ও লক্ষ্য হচ্ছে, আমার জীবদ্দশায় বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে যাওয়া। বর্তমানে বাংলাদেশের যা অবস্থা, তাতে সরাসরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা কি সমীচীন হবে?

বঙ্গবন্ধু আমার কাছে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত জানতে চাইবেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তাই আমাকে কিছুক্ষণ ভাবতে হল। বললাম, গত বছর আলজেরিয়ায় ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গেতো আপনার দেখা হয়েছে। আপনার মনে আছে কিনা জানি না, তিনি আপনাকে একটা কথা বলেছিলেন। ক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত ক্যাস্ট্রো নিজেকে মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেন নি। তার আশংকা ছিল, তিনি সেই পরিচয় দিলে আমেরিকা প্রতিবেশী কিউবায় কমিউনিস্ট সাবভার্সন প্রতিরোধের নামে সশস্ত্র ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এগিয়ে আসতো।

বঙ্গবন্ধু বললেন, তাহলে কি তোমার ধারণা, সমাজতন্ত্র কথাটি আমার বক্তৃতায় এখন উহ্য রাখা উচিত?

বললাম, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশে এখন দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা সৃষ্টির একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। লণ্ডন, ওয়াশিংটনের বড় বড় কাগজগুলো পড়লে মনে হয়, তারা সারা উপমহাদেশে ডিএস্টেবিলাইজেশন সৃষ্টি করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। কেবিন রেপার্টির মতো সাংবাদিক 'ফিনান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকায় আপনার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। 'ইকোনোমিস্ট' বলছে, শেখ মুজিবের প্রশাসন অচল, অর্থনীতি ব্যর্থ। ডেইলি টেলিগ্রাফ, নিউইয়র্ক টাইমস অনবরত কুৎসা ছড়াচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে। এই সময় সরাসরি সমাজতন্ত্রের কথা বলে আমরিকা, বিশ্বব্যাংক এবং পশ্চিমা সাহায্যদাতা দেশগুলোকে আরো চটাবেন কিনা, আপনি ভেবে দেখুন। এর চাইতে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান

দেশগুলোর মতো ওয়েলফেয়ার স্টেট প্রতিষ্ঠাই আপাতত আপনার সরকারের লক্ষ্য, এটা বলা হলে কি সব কুল রক্ষা হয় না।

বঙ্গবন্ধু বললেন, তুমি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথাই এখন লেখো। আমি আরও একটু ভেবে দেখি। পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ লেখা শেষ করে রাত আটটার দিকে বাসায় ফিরে গেলাম। রাত দশটার দিকে তাজউদ্দিন সাহেবের টেলিফোন। তিনি জানালেন, এখনই বত্রিশ নম্বরে পৌঁছতে হবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে কিছু যোগ বিয়োগ ঘটাতে চান।

তাজউদ্দিন সাহেব গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। সেই গাড়িতে তার সঙ্গেই বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডিতে গেলাম। বঙ্গবন্ধু ছাদের চিলেকোঠায় ছিলেন। সঙ্গে আবদুর রব সেরনিয়াবত এবং শেখ ফজলুল হক মনি। তাজউদ্দিন সাহেব এবং আমি চিলেকোঠায় ঢুকলাম।

শেখ মনি আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, লীডারকে (বঙ্গবন্ধু) আমি বলেছি, তাঁর ভাষণে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে স্পষ্ট কমিটমেন্ট থাকা দরকার। নইলে আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও বুঝতে পারবে না, বঙ্গবন্ধুর আসল লক্ষ্য কি ছিল? তাদের বিভ্রান্ত করা হতে পারে। তাছাড়া আমাদের রাষ্ট্রীয় চার আদর্শের একটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এখন সমাজতন্ত্রের বদলে ওয়েলফেয়ার স্টেটের কথা বলা হলে বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে।

মনিকে বললাম, আমিও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এখন সমাজতন্ত্রের কথা বার বার বলা ঠিক হবে কিনা, এটাই আমার প্রশ্ন।

সেরনিয়াবত বললেন, কাউকে খুশি বা অখুশি করার জন্য আমরা সমাজতন্ত্রের নীতি গ্রহণ করি নি। এটা আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ। এ সম্পর্কে গোড়াতেই দুর্বলতা দেখানো ঠিক হবে না।

বললাম, তাহলে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র কথাটি কেটে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কথাটা বসিয়ে দেওয়া হোক। এটাতো যে কেউ করতে পারেন। এজন্য আমাকে ডেকে আনার কোনো দরকার ছিল না। এটা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। তিনি যা ভালো মনে করেন, তা বলবেন। এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার থাকতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু আমার কথায় কি বুঝলেন, তিনিই জানেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে শেখ মনির দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা, কথাটা এইভাবে বলা হলে কেমন হয়? আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। সেই লক্ষ্য অর্জনে আমরা এখন একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের পথে এগিয়ে যেতে চাই।

তাজউদ্দিন এবং আবদুর রব সেরনিয়াবত তাকে সমর্থন জানালেন। শেখ মনি চুপ করে রইলেন।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সংশোধিত হওয়ার পর যখন আমাদের বাড়ি ফেরার সময় হল, তখন শেখ মনি বললেন, গাফ্‌ফার ভাই আপনি কি তাজউদ্দিন ভাইয়ের গাড়িতে যাবেন, না আমি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেব?

বললাম, আমার গাড়ি যখন সঙ্গে নেই, তখন হয় তাজউদ্দিন ভাই অথবা আপনার গাড়িতে ফিরতে হবে।

শেষ পর্যন্ত মনির গাড়িতেই আমাকে চাপতে হল। আমার বাসা হাটখোলায় কে এম দাস লেনে। মনির মুক্তিযোদ্ধা ড্রাইভার আমার বাসা চেনে। তখন ঢাকার রাস্তা বর্তমানের মতো জনারণ্য নয়। মনির সঙ্গে পেছনের সীটে বসলাম। মনি বললেন, লন্ডনে নতুন গেছেন। তাই সেখানকার ওয়েলফেয়ার স্টেটের ব্যবস্থাগুলো আপনাকে সম্ভবত মুগ্ধ করেছে।

স্বীকার করলাম, তা করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বললাম, সমাজতন্ত্রের প্রতি আমার আস্থা তাতে কমে নি। আমি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথা ব্যবহার করা নিরাপদ মনে করি। উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে। নয়া চীন একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। দেশটির শাসক দলও কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু মাও ঝে দুং বিপ্লবের পর সরাসরি সমাজতন্ত্রে পৌঁছার কথা বলেন নি। বলেছেন, নিউ ডেমোক্রাসির কথা। নয়া চীনের গোড়ার দিকের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের বেশ মিল রয়েছে।

শেখ মনি বললেন, কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে নয়া চীনের একটা বড় অমিলের কথা আপনি ভেবে দেখেননি। বাংলাদেশ চিরকালই প্রায় কৃষি নির্ভর, পরাধীন উপনিবেশ ছিল। তার নিজস্ব সামন্ত শ্রেণী ও সামন্ততন্ত্রও কখনো ছিল না। এসবও ছিল বহিরাগত। সেদিক থেকে চীন একটি আদি সভ্যতার পীঠস্থান। তার সাম্রাজ্য ছিল, নিজস্ব সামন্ততন্ত্র ছিল, শক্তিশালী সামন্ত শ্রেণীও ছিল। চীনে জাতীয়তাবাদী গনতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে বহু আগে—সান ইয়াতসেনের নেতৃত্বে। তারপর সেই বিপ্লব পথভ্রষ্ট হয়েছে। চিয়াংকাই শেকের নেতৃত্বে কুয়োমিঙটাঙ দল প্রতিবিপ্লবী দলে পরিণত হয়। মাও ঝে দুং চিয়াং চক্রকে উৎখাত করে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটান। যদিও প্রথম অবস্থায় তিনি তার নাম দিয়েছেন নিউ ডেমোক্রেসি। সেদিক থেকে বাংলাদেশে একাত্তর সালের ঘটনা আসলে প্রথম গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী বিপ্লব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার জন্য চীনের মতোই বাংলাদেশে একটি প্রতিবিপ্লব ঘটতে পারে। বঙ্গবন্ধুর পর প্রতিবিপ্লবীদের হাতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা চলে যেতে পারে। সেটা ঠেকানোর জন্য বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব বা সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের জন্য অপেক্ষা না করে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেই তার ব্যক্তিত্ব, ক্যারিজমা ও নেতৃত্বের

শক্তিকে ভিত্তি করে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের দিকে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার দরকার। বাংলাদেশের রাজনীতির মাটি কাঁচা থাকতেই তাকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ দেওয়া দরকার। নইলে দেরি হয়ে যাবে। সুতরাং মাঝখানে নয়া গণতন্ত্র বা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধুয়া তুলে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের সতর্ক হওয়ার ও প্রস্তুতি গ্রহণের সময় দেওয়া উচিৎ হবে না।

শেখ মনির সঙ্গে সেদিন আমি একমত হইনি। কিন্তু বাসায় পৌঁছে তার কথাগুলো ডায়েরিতে টুকে রেখেছি।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসের এক দুপুরে বনানীতে, শেখ মনির দেহ যেখানে সমাহিত, সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে, সাংবাদিকতায় শেখ মনির আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ধূমকেতুর মতো। জ্বলে উঠেই তিনি নিভে গেলেন। কিন্তু তিনি লুপ্ত হয়ে যান নি। তিনি তার বিশ্বাস ও কর্মের আভার উজ্জ্বল প্রতিভাস, অনির্বাণ মশাল তৈরি করে রেখে গেছেন। এখানেই তার বিরাট সাফল্য।

শেখ ফজলুল হক মনির প্রকৃত মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি। একদিন আসবে। ব্যক্তি মনি, রাজনীতিক মনি এবং সাংবাদিক মনি—এই ত্রিধারার মিশ্রণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে নতুন ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে যাচ্ছিল, ভালোয় মন্দে, আলোয় আঁধারে তার প্রকৃত মূল্যায়ন একদিন হবেই।

বনানী গোরস্থানে দাঁড়িয়ে মনে হল, শেখ মনি আজ যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যভাবেও হয়তো লিখিত হতে পারতো। অন্ধকার এত ঘনীভূত মনে হতো না।

তেত্রিশ

আমরা যারা এখনো জীবিত আছি, তারা প্রতিবছর একবার করে নিজের অনাগত মৃত্যুদিবসটিকে অতিক্রম করি। কেবল তাকে জানি না বলেই ভয় করি না এবং স্মরণ করি না। জন্মদিনটি পুরনো মুদ্রার মতো অতি চেনা ও অতি ব্যবহৃত বলে তাকে প্রতিবছর মেঝে ঘঁষে উজ্জ্বল করে তুলি; সাড়ম্বরে পালন করি।

কথাগুলো মনে পড়ল ঢাকার আজিমপুরে নতুন গোরস্থানে দাঁড়িয়ে। আমারই মতো আমার স্ত্রীও সতেরো বছর পর ঢাকায় ফিরেছে। তার ইচ্ছে, আজিমপুরের গোরস্থানে তার বাবার কবরটি দেখতে যায়। এ বি মফিজউদ্দিন আহমদ ছিলেন ধানমণ্ডি ল্যাবরেটরি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। ১৯৬৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। তার কবরটি এখন বুনো ঘাস, নানা গাছা আগাছায় ভর্তি। কিন্তু

মৃত্যু তারিখসহ নাম ফলকটি এখনও অক্ষত। আমাদের দেশে বেশির ভাগ কবরে মৃত্যু তারিখ থাকে; জন্ম তারিখ থাকে না। আসলে অনেকের জন্ম তারিখ জানা থাকে না, অথবা সঠিক নয়। আমার এক বন্ধু তাই ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বাঙালী মুসলমানদের জীবনে একটি তারিখই মাত্র অভ্রান্ত, তা মৃত্যু তারিখ। আর সব তারিখই গোলমেলে। হয় আন্দাজ করা অথবা বানানো।

এই কথাটি অবশ্য এখন আর শহুরে মধ্যবিত্তদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। পাশ্চাত্যের অনুকরণে তাদের মধ্যে ব্যার্থ, ম্যারেজ, ডেথ সার্টিফিকেটের রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছে। গ্রাম বাংলায় সম্ভবত এখনো হয় নি। আমাদের সময়েও এসব রেওয়াজের কোনো বালাই ছিল না। আমার মা আমার জন্ম তারিখ বলতে পারতেন না। বলতেন, 'যেদিন সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ দেখা দিয়েছিল, সেদিন দুপুরের কিছু আগে তোমার জন্ম।' তার কাছ থেকে বহুকষ্টে জন্মের দিনটি এবং একটি বাংলা মাসের তারিখ বের করেছিলাম। সেটি ২৬ অগ্রহায়ণ শনিবার। বাংলা সনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল আমার জন্ম ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৪। কিন্তু ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় শিক্ষকেরা দয়া করে বয়স কিছু কমিয়ে দিলেন। তাদের ভয়, যথাসময়ে যদি মেট্রিক পাশ না করি, তাহলে তখনকার বিধান অনুযায়ী সরকারী চাকরি পাওয়ার বয়স আমার থাকবে না। ফলে স্কুলের রেজিস্ট্রি বইয়ে আমার জন্ম তারিখ কমিয়ে লেখা হলো। আমার পাসপোর্টেও এই তারিখটিই লেখা রয়েছে এবং এই প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত এই মিথ্যা জন্মতারিখের বোঝাটিই বহন করে চলেছি। এই মিথ্যা জন্মতারিখ আমার বয়সী অনেকেই হয়তো এখনো বহন করছেন, অবশ্য যারা বেঁচে আছেন। একই কারণে তাদেরও বয়স কমানো হয়েছিল।

আজিমপুর নতুন গোরস্থানে নাম ও মৃত্যু তারিখ লেখা সারি সারি কবর। কারো কারো কবরে জন্ম তারিখও রয়েছে। আমার শ্বশুরের কবরের কাছেই 'ইত্তেফাকের' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং তার স্ত্রীর কবর। কাছেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কৃতী অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কবর। এই কবরের কাছেই উল্টোদিকে একটি নতুন কবর। নামফলক শাহ আবদুল হালিম। খবরের কাগজে পড়েছিলাম, কয়েক বছর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় শাহ আবদুল হালিমের মৃত্যু হয়। হালিম আর আমি একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। সে ইতিহাসের; আমি বাংলার। রাজনীতিতেও আমরা ছিলাম বিপরীত দুই মেরুতে। সে ছিল মৌলবাদী ছাত্র শক্তির অন্যতম নেতা। আমি যুক্ত ছিলাম অসাম্প্রদায়িক ছাত্রলীগের সঙ্গে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আমরা ছিলাম পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভাষা আন্দোলনে একই সঙ্গে একমাস ঢাকা সেন্ট্রাল জেলেও ছিলাম।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞের

দু'দিন পর ঢাকা শহরে দিনের বেলায় ঘন্টা খানেকের জন্য কারফিউ শিথিল হতেই অভয়দাস লেনে (টিকাটুলি) আমার তখনকার ভাড়া করা বাসার দরোজায় করাঘাত পড়ল। আমার স্ত্রী তখন ঢাকায় নেই। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হতেই সে ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল বরিশালের গ্রামে তার বাবা মায়ের বাড়িতে। আমি একা ঢাকার বাসায়। দরোজায় কড় নাড়া শুনে প্রথমে একটু ভয় পেলাম। পাকিস্তানী চর কিম্বা সৈন্য নয় তো? তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু করাঘাত ও কড়া নাড়া বন্ধ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত দরোজা খুলতে হল। দেখি আমার বন্ধু শাহ আবদুল হালিম, পেছনে রোরুদ্যমান শিশু সন্তান কোলে তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে। হালিমের বাড়ি ফরিদপুর। বঙ্গবন্ধুর যৌবনের চেহারার সঙ্গে তার মিল ছিল। তেমনি লম্বা, মাথায় ব্যাক ব্রাশ করা চুল। ঠোঁটের উপর মোটা গোঁফের রেখা। আমাকে দরোজা খুলতে দেখে হালিম সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তোর বাসায় ক'দিনের জন্যে থাকতে এলাম। আমার বাসায় গুলি ঢুকেছে। জানালার কাঁচ ভেঙে সারা ঘর ছত্রখান।

শাহ হালিম আমার বাসার পেছনেই একটা বড় রাস্তার দোতলার ফ্লাটে থাকতো। সেই বাড়িতেও পাকিস্তানীরা গুলী ছুঁড়েছে শুনে ভীত হলাম। তাহলে পুরনো শহরের এই পাড়াও নিরাপদ নয়া! হালিম আমার প্রশ্নের জবাবে বলল, পাকিস্তানীরা ঠিক তার বাসা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েনি। তারা পাড়ার লোকদের ভয় দেখানোর জন্যে জীপে চেপে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে গেছে। সেই এলোপাতাড়ি গুলি এসে তার দোতলায় জানালার শার্সি ভেদ করেছে। তার বাসাটা বড় রাস্তার উপরে এমন জায়গাতে যে, সেখানে বাস করা আর নিরাপদ নয়।

শাহ হালিমকে দেখে আমিও মনে ভরসা পেয়েছিলাম। এই অবরুদ্ধ শহরে চারদিকে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের মাঝে আমাকে বাসায় একা বসে ভয়ে কাঁপতে হবে না। অন্তত একটি পরিবার সঙ্গে পেলাম। আমার স্ত্রী ঘরে বস্তা ভর্তি চাল, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, তরি-তরকারী, ডিম সবই রেখে গেছে। অন্তত সপ্তাহ খানেক কি তারও বেশি আমাদের উপোস করতে হবে না। সমস্যা ছিল রান্না করার। হালিমের স্ত্রী সেই দায়িত্ব নিলেন। তাকে আমাদের বড় বেডরুমটা ছেড়ে দিলাম। নিজে পাশের ঘরে সিঙ্গেল বেডে আশ্রয় নিলাম। আমার বাড়িওয়ালাই বাড়ির ছাদে একটা পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মূল গেটে উর্দুতে বড় করে লিখে ছিলেন, এটা মুসলমানের বাড়ি। শাহ হালিম তাতেও খুশি হল না। আমার বাসার পেছনটা তখন বস্তি আর জঙ্গল। সে তা দেখে খুশি হল। বলল, 'রাত্রে পাকিস্তানী সৈন্য যদি আসে, তাহলে সামনের বড় রাস্তা দিয়ে আসবে। দরোজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে চাইলে আমরা ততক্ষণে পেছনের দরোজা দিয়ে বেরিয়ে বস্তি পার হয়ে জঙ্গলে পালাতে পারবো।' হালিমের কথা শুনে আমার বাড়িওয়ালার স্ত্রী

জানালেন, তারাও কথাটা ভেবে রেখেছেন। তারা আমাদের মাথার উপরেই দোতলার ফ্লাটে থাকেন। পাকিস্তানী সৈন্য এলে তারা চট্ করে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে পালাতে পারবেন না। পাকিস্তানীদের চোখে পড়ে যাবেন। সেজন্য বাঁশের একটা লম্বা মই তারা সংগ্রহ করেছেন। বিপদ দেখলে পেছনের জানালা খুলে মই বেয়ে বস্তিতে নেমে আমাদেরই মতো জঙ্গলে পালাবেন।

শাহ আবদুল হালিম সম্ভবত দিন সাতেক আমার বাসায় ছিল। তারপর শহরে কারফিউ একটু শিথিল হতেই অন্যত্র চলে গেল। সে শ্রমিক রাজনীতি, সাংবাদিকতা, ব্যবসা ইত্যাদি নানা কাজে জড়িত ছিল। সুতরাং তার থাকার জায়গার অভাব ছিল না। দেশ স্বাধীন হবার পর তার সঙ্গে আমার বড় একটা যোগাযোগ ঘটেনি। লন্ডনে চলে আসার পরে তো সেই যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন। তারপর বছর কয়েক আগে খবরের কাগজে পড়লাম, সড়ক দুর্ঘটনায় শাহ আবদুল হালিমের মর্মান্তিক মৃত্যু। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে আজিমপুরের নতুন গোরস্থানে তার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক স্মৃতি ছবির মতো আমার চোখে ভেসে উঠতে লাগল।

আজিমপুরের নতুন এবং পুরনো দুই কবরস্থানেই আমি বহুবার এসেছি। আমার প্রথম ছেলে বাবুর কবর পুরনো কবরগাহে। তাকে নিজের হাতে আমি কবরের মাটিতে শুইয়ে দিয়েছি। সেদিন থেকে গোরস্থান আমার কাছে আর ভয়ের স্থান নয়। বরং কেমন একটা মাটির টান অনুভব করি। সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত কেমন একটা আচ্ছন্নতা আমাকে পেয়ে বসে। মনে মনে সেই ইংরেজি কবিতার লাইন দু'টো আওড়াই "Time marches on but memories stays/Torturing silently the rest of our days."

ষাটের দশকে যারা আজিমপুর পুরনো গোরস্থানে কবর খুঁড়তো, কবর খোঁড়াই ছিল যাদের জীবিকা-নির্বাহের একমাত্র উপায়, তাদের একজনকে দেখে আমার প্রথম একটি ফিচার লেখার আইডিয়া মাথায় আসে। আমি তখন 'দৈনিক আজাদে' কাজ করি। ঠিক করলাম, ঢাকার বিচিত্র পেশার মানুষের জীবন নিয়ে 'আজাদে' প্রতি সপ্তাহে একটি ফিচার লিখবো। নাম "বিচিত্র জীবন"। আমি লিখবো। ছবি তুলবেন 'আজাদের' তৎকালীন ফটোগ্রাফার ফিরোজ। কবরস্থানের কবর খোঁড়ার লোক নিয়ে আমার ফিচারটি শুরু হয়। লেখার আগে ফিরোজকে নিয়ে কবরস্থানে হাজির হলাম। জানতাম, কবর যারা খোঁড়েন, তাদের সেখানে পাবোই। তখন রোজ ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটি লাশ আসতো পুরনো গোরস্থানে। তাদের জন্যে আগেই কবর খুঁড়ে রাখা হতো। রোজই এই কবর খোঁড়ার কাজ ছিল মাটি কাটা মজুরদের। আমার ফিচার লেখার জন্যে তাদের একজনকে বেছে নিলাম। যুবা বয়সী লোক। তাগড়া চেহারা। আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো, তার ছবি তুলবো জেনে সে খন্তা কোদাল একপাশে

রেখে কবরের পাশেই বসে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কতদিন হয় এই কবর খোঁড়ার কাজ করছেন? সে বলল, তা মাস ছয়েকতো হবেই। আগে মাটিকাটা মজুর ছিলাম। ডেমরায় কাজ করতাম।

ঃ এই ছ'মাসে কত কবর খুঁড়েছেন?

ঃ দু'শ'র বেশি হবে।

এই কবর খোঁড়ার সময় আপনার মনে কি কোন ভয়ভীতি, শোক কিম্বা ব্যথা বেদনার ভাব দেখা দেয়?

ঃ না, তেমন কিছু দেখা দেয় না। তবে একবার দেখা দিয়েছিল।

ঃ কখন?

ঃ আমার বৌয়ের জন্যে যখন কবর খুঁড়ছিলাম। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে সে মারা যায়। বড় ভালবাসতাম তাকে। আমার নিজের হাতেই তারও কবর খুঁড়তে হয়েছে।

এই ফিচারটি 'আজাদে' ছাপা হব্যর পর নিন্দা-প্রশংসা দুইই কুড়িয়েছিলাম। কেউ কেউ বলেছিলেন, চমৎকার ফিচার। কেউ কেউ বলেছিলেন, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজে যদি গোরস্থানের ছবি আর খবর দেখতে হয়, তাহলে সেই কাগজ না পড়াই ভালো।

ত্রিশ বত্রিশ বছর আগের স্মৃতি। ছায়াছবির মতো মনে ভাসছে। আমার পঙ্গু স্ত্রী একটা পিক্ আপ গাড়িতে হুইল চেয়ারে বসা। সঙ্গে কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু। তারা তাড়া দিলেন, আর কত কবরস্থানে ঘুরবেন? সন্ধ্যা হয়ে এলো। বাসায় ফিরতে হবে।

মনে পড়ল, ষাটের দশকের একেবারে গোড়ায় আজিমপুরের গোরস্থানের একেবারে কাছেই চারতলা চায়নিজ বিল্ডিংয়ের পেছনে আমার বাসা ছিল। ভাড়া করা বাসা। খুব সকালে ছেলে অনুপমকে কোলে নিয়ে অথবা ট্রাই সাইকেলে চড়িয়ে দিয়ে মর্নিং ওয়াকে বেরুতাম। তখন এত ধূলিধূসর ছিল না আজিমপুর। এত ঘিঞ্জি বস্তি, দোকানপাট পর্যন্ত ছিল না। আকাশ ছিল চমৎকার নীল। বাতাস ছিল স্নিগ্ধ ও বিশুদ্ধ। এত গাড়ি ঘোড়া ছিল না রাস্তায়। মনে হতো মফঃস্বল শহর। লুঙ্গি পরে সকালে বিকেলে রাস্তায় বেরুতে পারতাম।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ছেলে আজিমুশশানের নামে এই আজিমপুর নাম। তিনি সেই আমলে ছিলেন সুবে বাঙলার নায়েবে নাযেম বা গভর্নর। মুরশিদ কুলি খাঁ ছিলেন রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নায়েব। ঢাকা ছিল সুবার রাজধানী। প্রাচীন ঢাকার ইতিহাস পড়ে জেনেছি, আজিমুশ্শান ও মুরশিদ কুলি খাঁর সম্পর্ক ভাল

ছিল না। আজিমুশশান চাইতেন, মুরশিদ কুলি খাঁকে সরিয়ে রাজস্ব আদায়ের ভারও নিজের হাতে নিতে। পিতা আওরঙ্গজেব তাতে রাজি হন নি। ফলে আজিমুশ্শান গুপ্ত ঘাতকের সাহায্যে মুরশিদ কুলি খাঁকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে ফেলার চক্রান্ত আঁটেন। একদিন মুরশদি কুলি খাঁ যখন তার পাল্কিতে চেপে দু'তিনজন দেহরক্ষী নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার উপর হামলা হয়। অল্পের জন্যে তিনি ঘাতকের ছুরি থেকে বেঁচে যান এবং সম্রাটের অনুমতি নিয়ে মুর্শিদাবাদে গিয়ে ঘাঁটি গাড়েন। তার নামেই জায়গাটির নাম হয় এবং সুবে বাঙলার রাজস্ব আদায়ের হেড কোয়ার্টার হয় মুর্শিদাবাদ। আজিমুশ্শানের পর মুরশিদ কুলি খাঁ যখন সুবে বাঙলায় রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন পরিচালনা দুইয়েরেই দায়িত্ব লাভ করে পুরোপুরি নাযেম হন, তখন সুবার রাজধানী ঢাকা থেকে তিনি সরিয়ে নেন মুর্শিদাবাদে। ঢাকা শহরের সৌভাগ্য শশী তখন আবার অস্তমিত হয়।

আমাদের গাড়ি আজিমপুর রেল ক্রসিং পার হল। বাঁদিকে সলিমুল্লাহ হল। আরেকটু এগিয়ে গেলে ইনজিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি, শহীদ মিনার, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। রাস্তায় ভয়াবহ যানজট। পুরনো শহর অগম্য। হাজার বছরের স্মৃতি উড়ছে ঢাকার বাতাসে, ভেসে বেড়াচ্ছে বুড়িগঙ্গার ঢেউয়ে। জব চার্নকের কলকাতার বয়স মাত্র তিনশ' বছর। তা নিয়ে লেখা হয়েছে কত মহত্তম ইতিকথা। আমরা কেউ পারিনি, ঢাকার হাজার বছরের অনেক বেশি বৈচিত্র ও সংঘাতপূর্ণ ইতিহাস নিয়ে কোনো কাব্য, গাঁথা কিম্বা কাহিনী রচনা করতে।

তবু বুড়িগঙ্গা এখনো বইছে। পলি জমছে তার বুকে। সেই নওয়াবি যুগের পানশি, বজরা তার বুকে ভাসে না। পাশেই আহসান মঞ্জিলের কক্ষে আর সহস্র বাতি নিশীথ রাতে জ্বলে ওঠে না। শোনা যায় না নর্তকীর নৃত্যপরা পায়ের নূপুর নিক্কন। সদরঘাটের সেই চন্দন ও সিঁন্দুর চর্চিত কালে জমজম আর সেখানে নেই। মিল ব্যারাক আর অকল্যান্ড বাঁধের উপর মাঝরাতে শোনা যায় না কাওয়ালের কণ্ঠ।

তবু বুড়িগঙ্গা এখনো বয়ে চলেছে। হাজার বছরের ইতিহাসের ঢেউ তার বুকে। ধীরে প্রবহমান সেই ইতিহাসের তরঙ্গ বুকে বুড়িগঙ্গা।

(প্রথম খণ্ড শেষ)

স্মৃতির বন্দরে ফিরে আসা

ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা-২

উৎসর্গ

'দৈনিক সংবাদ' -এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
খায়রুল কবির
অগ্রজপ্রতিমেষু—

লেখকের নিবেদন

'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর দু'বছর চলে গেছে। আমার আলস্য ও গড়িমসির জন্যই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে এতো দেরি হল। তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপিও অবশ্য এখন আমার হাতে রয়েছে। বইটির প্রথম খণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের এবং দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে তৃতীয় খণ্ডের ধারাবাহিকতাগত যোগসূত্র তেমন নেই। এগুলো আমার স্মৃতির খণ্ড খণ্ড ছবি। খণ্ড ছবিগুলোই মিলে মিশে একটা সামগ্রিকতা পেয়েছে। সেজন্য বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য একটা আলাদা নাম দিলাম। তৃতীয় খণ্ডেরও একটা আলাদা নাম থাকবে। তিনটি খণ্ড মিলে বইটির মূল নাম রইলো 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা।'

'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা' প্রায় দু'বছর ধরে ঢাকার 'দৈনিক বাংলার বাণীতে' প্রকাশিত হয়েছে। তখনই অনেক পাঠকের কাছ থেকে নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই পেয়েছি। কিন্তু পাঠকদের উভয় পক্ষই বলেছেন, লেখাগুলো তারা আগ্রহের সঙ্গে পড়েছেন। বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ হওয়ার পরও সমালোচিত যেমন হয়েছি, তেমন প্রশংসিতও। তাতে প্রশংসার ভাগটাই বেশি। সমালোচনা এবং প্রশংসা দুইয়ের জন্যই আমি পাঠকদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ব্যক্তিগত জীবনের ছবি যতই ব্যক্তিগত হোক, তা কিছুটা সমসাময়িক সমাজের ছবিও। শুধু সাধারণ মানুষের নয়, কিছু অসাধারণ মানুষের ছবিও আমার এই স্মৃতির এলবামে খুঁজে পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে প্রবহমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনার কিছু কিছু ধারা। তা আমার মতামত দ্বারা রঞ্জিত হতে পারে, কিন্তু কল্পকাহিনী নয়। কোনো কোনো কাহিনী কোনো কোনো পাঠকের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে। তাদের জন্য সেই ইংরেজি প্রবাদটি উল্লেখ করছি, "কোনো কোনো সময় ফ্যাক্ট্স্ ফিকসানের চাইতেও বিস্ময়কর।"

'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেই বলেছি, এ-বই আত্মজীবনী নয় ইতিহাসও নয়। এটা স্মৃতির বন্দরে আমার বারবার ফিরে আসা এবং সেই 'আসা যাওয়ার পথের ধারের' ছবি। ছবিগুলো খণ্ড খণ্ড। শুধু একটা ফ্রেমে সাজানো হয়েছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যে কথা বলেছি, সে কথা এই খণ্ডেও বলছি— 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা'তে ব্যক্ত আমার চিন্তাভাবনার সঙ্গে সকলেই একমত হবেন এমন অসম্ভব প্রত্যাশা আমি করি না। তবে অনেক ভুলে যাওয়া কথা, স্মৃতি ও চরিত্র অনেকের মনেই আনন্দ ও বেদনা দুই-ই জাগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার অগ্রজ প্রতিম সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবদুল মতিনের ক্রমাগত তাগাদা ও সাহায্য ছাড়া 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গার' দ্বিতীয় খণ্ড এ বছরও বইয়ের আকারে বাজারে বেরুতো কিনা আমার সন্দেহ আছে। শুধু তাগাদা দেওয়া নয়, বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরী করা ও সাজানোর ব্যাপারে তিনি নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করে আমাকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছেন, সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা সেই ঋণ শোধ করা যায় না। প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডের বইটি যদি পাঠকদের ভালো লাগে, তাহলে লেখকের আসল প্রাপ্য পেয়ে যাবো।

এজওয়ার, মিডেলসেক্স, ইংল্যাণ্ড।
১৬ ডিসেম্বর (বিজয় দিবস) ১৯৯৬

এক

১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস। আমি লন্ডন থেকে মাস খানেকের জন্য ঢাকায় এসেছি। জানুয়ারির এক শীতার্ত সন্ধ্যায় মনে হল, ঢাকায় এসে যদি কে. জি. মোস্তফার সঙ্গে দেখা না করি, তাহলে আমার সাংবাদিক-জীবনের প্রতিই আমি অবিচার করবো। আমার সাংবাদিক-জীবন গড়ে তোলার সেই প্রথম যুগের একজন কারিগর কে. জি. মোস্তফা। কে. জি'র পুরো নাম খোন্দকার গোলাম মোস্তফা। তার বড় ভাই খোন্দকার ইলিয়াসও একজন রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং গ্রন্থকার ছিলেন।

কে. জি. প্রায় সারাজীবন সাংবাদিকতা এবং বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কয়েক বছর বিদেশে (ইরাকে) কূটনীতিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কূটনীতিকের চাকরি ছেড়ে আবার সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন। কিন্তু ইরাকে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বভার ত্যাগ করে দেশে ফিরে তিনি যে বড় কাজটি করেছেন, তাহলো চট্টগ্রামে 'দৈনিক পূর্বকোণ' নামে একটি পত্রিকাকে প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেখানে কিছু দক্ষ তরুণ সাংবাদিক তৈরি করা। কে. জি. চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় চলে এসেছেন। কিন্তু তার কাছে ট্রেনিংপ্রাপ্ত তরুণ সাংবাদিকেরা এই পত্রিকাটির উন্নত মান এখনো বজায় রেখেছেন। চট্টগ্রামের জনপ্রিয় 'দৈনিক আজাদীর' সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের আমন্ত্রণে একদিনের জন্য গিয়েছিলাম চট্টগ্রামে। তখনো 'দৈনিক পূর্বকোণে'র তরুণ সাংবাদিকেরা কে. জি. মোস্তফার কাছে তাদের ঋণের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। জানুয়ারির সেই সন্ধ্যায় দৈনিক 'সংবাদের' নতুন ভবনে গিয়ে হাজির হলাম। আগে 'সংবাদ' ছিল পুরনো ঢাকা শহরের বংশাল রোডে। এই বাড়িটিও একটি ঐতিহাসিক ভবন। নূরুল আমিনের মন্ত্রিসভার আমলে সরকারী দখলে (রিকুইজিসন) আনা এই বাড়িটি থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম দৈনিক পত্রিকা 'জিন্দেগী' ('আজাদ' তখনো ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়নি) বের হয়। সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যিক কাজী আফসারউদ্দিন আহমদ এবং এস. এম. বজলুল হক। পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ায় কাজী আফসারউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় 'মৃত্তিকা' নামে অতি উন্নতমানের একটি সাহিত্য মাসিক প্রকাশিত হয়েছিল। ওয়ারির ভজহরি সাহা স্ট্রীটে ছিল তার অফিস। কাজী আফসারউদ্দিন

আহমদের স্ত্রী জেবুন্নেসা আহমদও ছিলেন একজন সাহিত্যিক। দীর্ঘকাল তিনি 'খেলাঘর' নামে শিশু-কিশোরদের একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সম্ভবতঃ ফয়েজ আহমদের 'হুল্লোড়ের' পরই 'খেলাঘর' ছিল পাকিস্তান আমলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত শিশু-কিশোরদের দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকা। কাজী আফসারউদ্দিন আহমদের 'চর ভাঙা চর' চল্লিশের দশকের একটি নামকরা উপন্যাস।

দৈনিক 'সংবাদ' ছিল প্রথম দিকে মুসলিম লীগের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের কাগজ। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির পর পত্রিকাটির মালিকানা এবং নীতি পরিবর্তিত হয়। মাওলানা ভাসানীর বাণী বক্ষে ধারণ করে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। আবু হোসেন সরকার যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, তখন কম্যুনিষ্ট সহ প্রদেশের সকল রাজনৈতিক বন্দীকে একযোগে ঢালাও মুক্তি দেয়া হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ওয়াদার একটি ছিল সকল রাজবন্দী ও নিরাপত্তা আইনে (বিনাবিচারে) আটক বন্দীদের মুক্তি দান। আবু হোসেন সরকার এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করায় বংশাল রোডে সংবাদের এই অফিসের ছাদে তাকে একটি সম্বর্ধনা দেয়া হয়। আমি তখন সংবাদের নিউজ ডেস্কের কর্মী। আবু হোসেন সরকার সারাক্ষণ পান খেতেন আর একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচতেন। 'সংবাদ' অফিসের ছাদে চেয়ারে বসে দাঁত খুঁচতে খুঁচতে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "মুসলিম লীগের আট বছরের শাসনে পূর্ব বাংলার জেলগুলোতে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। এই সংখ্যা জানলে ভিরমি খেতে হয়। (সম্ভবতঃ এই সংখ্যা তিনি ৩৫ হাজার বলে উল্লেখ করেছিলেন) এদের অধিকাংশই আবার বিনা বিচারে নিরাপত্তা আইনে বন্দী। শত শত বন্দী পাঁচ থেকে ছ'বছর ধরে জেলে পচেছেন। বরিশালের সতীন সেনের মতো বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বিনা চিকিৎসায় জেলেই মারা গেছেন। মুসলিম লীগের 'ইসলামী শাসনে' সারা পূর্ব বাংলাকে একটি জেলখানায় পরিণত করা হয়েছিল। আমরা সেই জেলখানার দরোজা খুলে দিয়েছি। এখন আপনাদের সহযোগিতা ও সাহায্য চাই, যাতে এই সোনার পূর্ব বাংলাকে আবার গণতন্ত্রের ও মানবতার শত্রুরা এসে 'শ্বাসরোধকারী জেলখানা'য় পরিণত করতে না পারে।"

বংশাল রোডে সংবাদের এই অফিসটিকেই ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছিল। গভীর রাতে আগুন লাগানোর ফলে এই অফিসেই ঘুমিয়ে থাকাকালে নির্মমভাবে পুড়ে মরেছেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদ সাবের। একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তিনি একজন। বংশাল রোডের ২৬৩ নম্বরের এই বাড়িটির সামনে দিয়ে হাটতে গেলে আমার মনে তাই বহু স্মৃতি ভীড় জমায়। ১৯৫১ সালে দৈনিক 'সংবাদ' বের করার প্রথম দিনটিতেই আমি এই পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত

হয়েছিলাম। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন খায়রুল কবির। আমি তাকে বলি 'এ ম্যান ফর অল সিজন'। সংগঠক, সাংবাদিক, সম্পাদক, সরকারী অফিসার, ব্যাংকার, রাজনীতিক হিসেবে জীবনের বিভিন্ন ভূমিকায়, বিভিন্ন পেশায় তিনি সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দিনে, পতনে-উত্থানে যে বিস্ময়কর ইতিহাস তৈরি করেছেন, তার খোঁজ আমরা অনেকেই রাখি না। তিনি তাঁর সমাজের কাছ থেকে তাঁর সাফল্য ও কৃতিত্বের প্রাপ্য স্বীকৃতি ও সম্মানটুকুও পাননি। বরং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে খোন্দকার মোশতাকের আড়াই-মাসের নবাবীর আমলে তার কপালে জুটেছিল কারা-লাঞ্ছনা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গোড়ায় খায়রুল কবির ছিলেন 'আজাদ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তারও আগে কলকাতায় 'আজাদ' পত্রিকায় সাংবাদিক। 'আজাদ' পত্রিকার অফিস কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের ব্যাপারে বারো আনা কৃতিত্ব খায়রুল কবিরের। 'আজাদের' অফিস নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহে ছুটাছুটি, ইট, কাঠ, সিমেন্ট জোগাড় করা, নতুন সাংবাদিক রিক্রুট ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ইত্যাদি দুরূহ প্রাথমিক দায়িত্ব খায়রুল কবির হাসি মুখে পালন না করলে ১৯৪৮ সালেও ঢাকায় 'আজাদের' প্রকাশনা শুরু করা যেতো কিনা তা সন্দেহের বিষয়। একথা অকপটে স্বীকার করেছেন 'আজাদের' তখনকার ঢাকা ব্যুরোর প্রধান এবং সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দিন তার আত্মজীবনীতে।

'আজাদ' তো কলকাতা থেকে ঢাকায় এলো। কিন্তু বার্তা-সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের সঙ্গে এলেন না। তিনি 'দৈনিক ইত্তেহাদে' চাকরি নিয়ে আপাততঃ কলকাতায় রয়ে গেলেন। কেবল কয়েকজন অভিজ্ঞ তরুণ সাংবাদিক (যারা তখন ছাত্র এবং সাংবাদিক দুইই) ঢাকায় চলে এলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সিরাজউদ্দিন হোসেন, কে. জি. মোস্তফাও। স্থানীয়ভাবে নতুন মুখ জোগাড় করে তাদের সাংবাদিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল খায়রুল কবিরকে। এই সময়ে তিনি তার সংগঠনী প্রতিভার যে বিস্ময়কর পরিচয় দেন, তা ছিল 'আজাদের' সাংবাদিকদের জন্য একটা সম্মানজনক ও ন্যায্য পে-স্কেল নির্ধারণে। এটা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ছিল একটি পত্রিকার সাংবাদিকদের জন্য সর্বপ্রথম বেসরকারীভাবে গৃহীত পে-স্কেল। 'আজাদে' মওলানা আকরাম খাঁ এবং তার ছেলে সদরুল আনাম খাঁর দ্বারা (তখন পত্রিকার ম্যানেজমেন্টের কর্তা) এই পে-স্কেল স্বীকার করানোর ব্যাপারে খায়রুল কবিরকে যে কঠিন ঝুঁকি নিতে হয়েছিল, তার গল্প অনেক পরে 'আজাদে' কাজ করার সময় সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের মুখে আমি শুনেছি। শামসুদ্দিন সাহেব আমাকে একদিন গল্পচ্ছলে বলেছেন, "ঢাকায় আসার আগ পর্যন্ত 'আজাদের' প্রধান সম্পাদক হিসেবে আমার বেতন কত ছিল জানেন? মাসে একশ' টাকা। অবশ্য সেজন্য আমার দুঃখ ছিল না। কলকাতায় এই বেতনে

কাজ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো সম্পাদক। একমাত্র 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা ছাড়া কলকাতার কোনো দৈনিক কাগজে সাংবাদিকদের ভালো বেতন ছিল না, পে-স্কেল থাকা তো দূরের কথা। বছরের পর বছর চাকরি করেও বেতন বাড়তো না। মালিকেরা খেয়াল খুশিমতো কখনো দশ-পাঁচ টাকা বেতন বাড়াতেন। ফলে ছেঁড়া শার্ট আর ছেঁড়া স্যান্ডেলই ছিল বাঙালি সাংবাদিকদের সারা জীবনের সম্বল। তখন মোটর গাড়ির স্বপ্ন দেখা দূরের কথা, অফিসে যাতায়াতের জন্য একটা সাইকেল জোটাতে পারলেই একজন সাংবাদিক নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

শামসুদ্দিন সাহেব বললেন, ঢাকায় আসার পর খায়রুল কবির এসে আমাকে বললেন, "আপনি 'আজাদের' প্রধান সম্পাদক। আপনি মাসে একশ' টাকায় কাজ করলে সেটা পত্রিকার জন্যও সম্মানজনক নয়। তাছাড়া সম্পাদকই যদি একশ' টাকায় খুশি থাকেন, তাহলে অন্য সাংবাদিকেরা কি করবেন? এখন জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। এই বেতনে কারো চলে না। তাই 'আজাদের' সকল সাংবাদিকের জন্য আমরা একটা পে-স্কেল করতে চাই। আপনার মিনিমাম বেতন হবে মাসে চারশ' টাকা। সেই সঙ্গে থাকবে ইয়ার্লি ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা।" তার কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠলো। একশ' টাকা থেকে একেবারে চারশ' টাকা? মওলানা সাহেব এত টাকা বেতন দিতে হবে শুনে যদি বলেন, 'শামসুদ্দিন সাহেবকে আমার দরকার নেই; তখন কি হবে? তাই খায়রুল কবিরকে বললাম, আমার জন্য একবারেই চারশ' টাকা দাবি না করে কিছু কমিয়ে সমিয়ে করুন। মওলানা সাহেবকে চাটিয়ে দিয়ে লাভ নেই।'

খায়রুল কবির বললেন, মওলানা সাহেব চটবেন কেন? আমি সাংবাদিক হলেও 'আজাদের' ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে সাময়িকভাবে জড়িয়ে গেছি। 'আজাদের' বর্তমান রেভিনিউ এবং নীট প্রোফিটের পরিমাণ আমি জানি। সাংবাদিকদের বেতন বাড়াতে মওলানা সাহেবকে পকেটে হাত ঢুকাতে হবে না। তাছাড়া প্রধান সম্পাদককেই যদি চারশ' টাকা বেতন দেয়া না হয়, তাহলে সহকারী সম্পাদক মুজিবর রহমান খাঁকে কত দেয়া হবে? দু'শ' টাকা? নিউজে সিরাজউদ্দিন হোসেনকে কত দেব, দেড়শ' টাকা? তাতে তাদের সংসার চলবে?" শামসুদ্দিন সাহেব তবু দ্বিধা দেখিয়ে বললেন, "কিন্তু মওলানা সাহেব, সদরু মিয়া, হাকিম খাঁ (ম্যানেজার) এরা কি এই স্কেল মানবেন?" খায়রুল কবির বললেন, যদি না মানেন, তাহলে মানাবার চেষ্টা করতে হবে। আপনার কাছে এসেছি, আপনি যেন আমাদের এই চেষ্টার পেছনে থাকেন, আমাদের সমর্থন দেন।" শামসুদ্দিন সাহেব বললেন, মাস দু'য়েক পরেই যেদিন শুনলাম, আমাদের বেতনের স্কেল স্বীকৃতি পেয়েছে এবং হাতে প্রথমবারের মতো চারশ' টাকা বেতন পেলাম, তখন নিজের চোখকেই সহসা বিশ্বাস করতে পারিনি।

প্রায় তিরিশ বছর যিনি ছিলেন দৈনিক 'আজাদে'র সম্পাদক সেই আবুল কালাম শামসুদ্দিনের এই কাহিনী যে মোটেই অতিরঞ্জিত নয়, তার প্রমাণ আমার সাংবাদিক জীবনেও আমি পেয়েছি। ১৯৫১ সালে আমি ঢাকা কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। 'সংবাদ' নামে একটি নতুন দৈনিক পত্রিকা বেরুবে জেনে তাতে বার্তা-বিভাগে কাজের জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেছি। ইন্টারভিউ নিচ্ছেন খায়রুল কবির। সঙ্গে সৈয়দ আবদুল মান্নান এবং সম্ভবতঃ সৈয়দ নূরুদ্দিন (সৈয়দ নূরুদ্দিন তখনো সংবাদে আসেননি; পাকিস্তান অবজারভারে ছিলেন)। ইন্টারভিউর শেষ পর্বে খায়রুল কবির জিজ্ঞাসা করলেন 'বেতন কি রকম আশা করো?' বললাম আমি 'দৈনিক ইনসাফে' প্রায় বছরখানেক চাকরি করেছি। বেতন ছিল পঁচাত্তর টাকা। আমি ছাত্র। ওটা পেলেই আমার পড়ার খরচ চলবে।' খায়রুল কবির বললেন, 'না, আমরা তোমাকে এবং তোমার বয়সী তরুণ রিক্রুটদের মাসে একশ' টাকা দেব। এক বছর পর চাকরি পাকা হবে এবং তখন থেকেই ইয়ার্লি ইনক্রিমেন্ট পাবে ত্রিশ টাকা করে।' এ যেন মেঘ না চাইতে জল। পুরো একশ' টাকা আমার মাসিক বেতন। সেকথা তখন আমার বিশ্বাস করতেও ভয় হচ্ছিল।

'সংবাদ' প্রথমে সরকারী দলের কাগজ ছিল না। 'আজাদের' রক্ষণশীলতা এবং সাম্প্রদায়িকতার নীতিতে বিরক্ত হয়ে খায়রুল কবির ঢাকা থেকে উন্নতমানের প্রথম শ্রেণীর একটি নিরপেক্ষ পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন এবং তার আত্মীয় ব্যবসায়ী গিয়াসউদ্দিন আহমদের মালিকানায় বংশাল রোডের ২৬৩ নম্বর বাড়ি থেকে পত্রিকাটি বের হয়।

গিয়াসউদ্দিন আহমদের ছোট ভাই নাসিরুদ্দিন আহমদ ছিলেন পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশক ও মুদ্রাকর। পত্রিকার নামকরণেও খায়রুল কবির সে আমলে বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একাধিক উর্দু নাম বাদ দিয়ে 'সংবাদ' এই নামটি বেছে নেন। ফলে 'আজাদ' এবং 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা এক যোগে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। বলা হয়, কাগজের মুসলমানি নাম (আজাদ, ইত্তেহাদের মত উর্দু নাম) বাদ দিয়ে "হিন্দুয়ানি ঘেঁষা বাংলায়" পত্রিকার নাম রাখা হয়েছে। এই প্রচারণার কড়া জবাব দিয়েছিলেন 'সংবাদের' পাতায় খায়রুল কবিরের তখনকার সহযোগী সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী। তিনি লিখেছিলেন, 'ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে 'মনিং নিউজের' মালিকের (তখন মর্নিং নিউজ পত্রিকার মালিক ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নূরুদ্দিন) নিয়মিত কুত্তার রেস খেলা যদি ইসলাম-বিরোধী কাজ না হয়, তাহলে 'সংবাদের' মতো একটি খাঁটি বাংলা নাম বাংলা কাগজের জন্য রাখায় ইসলাম কি খারিজ হয়ে গেল? আর 'আজাদের' মালিক মওলানা আকরম খাঁ তো প্রথম দৈনিক পত্রিকা বের করেছিলেন "সেবক" এই বাংলা নাম দিয়ে। তিনি কি তখন হিন্দুয়ানি বাংলা ভাষার সেবা-দাস ছিলেন?' জহুর

হোসেন চৌধুরীর এই পাল্টা আক্রমণের পর 'আজাদ' ও 'মর্নিং নিউজ' আর রা করেনি।

শুধু পত্রিকার নামকরণে নয়, তার সাংবাদিক সংগ্রহেও খায়রুল কবির প্রগতিশীল উদার নীতি ও সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তখনকার ঢাকায় মফঃস্বল সাংবাদিকতার বদলে অসাম্প্রদায়িক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এবং আধুনিক ও উন্নতমানের সাংবাদিকতার যুগ শুরু হওয়ার সেটাকেই সূচনা বলা হলে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। বার্তা-বিভাগে বিভিন্ন শিফটের ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন সৈয়দ আবদুল মান্নান, সরলানন্দ সেন (মাও ঝে দুংয়ের প্রথম বাংলা জীবনী গ্রন্থের লেখক) খোন্দকার আবু তালেব, শৈলেন রায়, মোহাম্মদ তোহা খান, কে.জি. মোস্তফা এবং সিরাজউদ্দিন হোসেন (তিনি বেশীদিন থাকেননি)। সাহিত্যের পাতা দেখাশুনার দায়িত্ব নেন সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল গনি হাজারী। ছোটদের পাতার দায়িত্ব নেন কবি হাবিবুর রহমান ও ফয়েজ আহমদ। মহিলাদের পাতা লায়লা সামাদ। সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপনে ছিলেন সরদার জয়েনউদ্দিন। লীডার-রাইটার হিসেবে যোগ দেন ফজলুল হক সেলবর্ষী, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, মুসতাফা নূরউল ইসলাম, আনিস চৌধুরী, ফজলে লোহানী। রিপোর্টিংয়ে ছিলেন তাসাদ্দুক আহমদ, সাহিত্যিক আবদুর রাজ্জাক এবং বর্তমানে লন্ডনে বসবাসকারী আবদুল মতিন। বার্তা-বিভাগে জুনিয়ার রিক্রুটদের মধ্যে ছিলাম আমি, দাউদ খান মজলিস, সানাউল্লা নূরী, সৈয়দ মোস্তফা হোসেন, হামেদ শফিউল ইসলাম, লুতফুল হায়দার চৌধুরী এবং আরও অনেকে। 'সংবাদের' জন্য তরুণ প্রবীণ সাংবাদিক সংগ্রহে খায়রুল কবির কারো রাজনৈতিক মতামতকে বিচারের মানদন্ড করেননি। বরং মুসলিম লীগ-আমলের 'ইসলামী ম্যাকার্থিজমের' সেই বিভীষিকা ও বাছবিচারের দিনেও উদার, মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক মনের লোকদের 'সংবাদে' শুধু চাকরি পাওয়া নয়, একটা শক্তিশালী দুর্গ গড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

এখানেই এই 'ম্যান অব অল সিজন্'-এর কাহিনী শেষ নয়।

দুই

সম্ভবতঃ সেটা ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি সময় অথবা শেষ দিক। দৈনিক 'সংবাদের' সম্পাদক হিসেবে খায়রুল কবিরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায়। ইন্দোনেশিয়া তখন সদ্য-স্বাধীন দেশ। তাদের 'মারদেকার' (স্বাধীনতা) যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এবং ডঃ আহমদ সুকার্ণোর নেতৃত্বে জাতীয় সরকার

গঠিত হয়েছে। নানা দেশ থেকে দলে দলে সাংবাদিকেরা যাচ্ছেন ডাচ হানাদারদের কবলমুক্ত স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায়। সে সময় বাংলাদেশ (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) থেকে ইন্দোনেশিয়ায় যে ক'জন পত্রিকা সম্পাদক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন খায়রুল কবির। একই সঙ্গে অথবা পরে গিয়েছিলেন 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনও। ইন্দোনেশিয়া থেকে ফিরে এসে খায়রুল কবির সংবাদ অফিসের আড্ডায় একদিন ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে তখনকার একটি অজানা তথ্য সকলকে জানালেন। 'সংবাদ' যদিও তখন মুসলিম লীগের নূরুল আমিন সরকারের কাগজ, কিন্তু সেই কাগজের সম্পাদক খায়রুল কবিরের কক্ষ ছিল ঢাকার মুক্তবুদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রধান আড্ডা। সেই আড্ডায় যোগ দেয়ার বয়স ও সিনিয়রিটি তখনো অর্জন করিনি বলে ধারেকাছে ঘোরাঘুরি করেই সেই আড্ডার কথাবার্তা মাঝে মাঝে উপভোগ করতাম। এই আড্ডায় প্রায়ই বসতেন সানাউল হক, আবুল এহসান, সিকান্দার আবু জাফর, আবু জাফর শামসুদ্দিন, সৈয়দ নূরুদ্দিন, শামসুদ্দিন আবুল কালাম, জহুর হোসেন চৌধুরী, আবদুল গণি হাজারী এবং কখনো কখনো শওকত ওসমান (শওকত ওসমান তখন শিক্ষকতার কাজে ঢাকার বাইরে থাকতেন)। ইন্দোনেশিয়া থেকে ফিরে এসে খায়রুল করিব একদিন এই আড্ডায় গল্পচ্ছলে বললেন, "ইন্দোনেশিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমান। কিন্তু তারা আরব বা ইরান তুরানের কালচারকে নিজেদের কালচার বলে গ্রহণ না করে পূর্বপুরুষদের কালচারকেই নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে ধারণ করে আছে। সে দেশে মুসলমান মেয়ের নাম কার্তিকেশ্বরী(প্রেসিডেন্ট আহমদ সুকার্ণোও তার এক মেয়ের নাম রেখেছিলেন কার্তিকেশ্বরী)। জাতীয় গ্রন্থ হচ্ছে রামায়ণ। জাতীয় বিমান সংস্থার নাম হচ্ছে রামায়ণে বর্ণিত গরুড় পাখির নামানুসারে 'গারুড়া'। হনুমান একজন বীর হিসেবে নন্দিত এবং 'ফ্লাওয়ার ভাস' থেকে শুরু করে কাঠের বহু আসবাবপত্রে তার মূর্তি আঁকা রয়েছে।" সানাউল হক ব্যাখ্যা দিলেন, একমাত্র বাঙালি মুসলমান ছাড়া আর কোনো দেশের মুসলমানেরা নিজেদের অতীত ঐতিহ্য ও কালচারকে বর্জন করে বিদেশী ও বহিরাগত কালচারকে ধর্মীয় ও জাতীয় কালচার হিসেবে ভাবার মস্ত বড় ভ্রমটা করেনি। পারসিকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু আরবের কালচারকে ইসলামী কালচার বলে স্বীকার করেনি, গ্রহণও করেনি। চীন, বার্মা, মালয়েশিয়াতেও প্রায় একই ধরনের উদাহরণ পাওয়া যাবে।

সেদিনের আড্ডায় আরও অনেক কথাবার্তা হয়েছিল, সবটা মনে নেই। এর কিছুদিন পরেই ফয়েজ আহমদ জানালেন, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের(কাজী মোতাহার হোসেন তখন এই সংসদের সভাপতি এবং ফয়েজ আহমদ সাধারণ

সম্পাদক) পক্ষ থেকে ফজলুল হক হলের কমনরুমে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। তাতে খায়রুল কবির তার ইন্দোনেশিয়া সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন।

খবরটা পেয়ে খুশি হলাম। সংবাদের চাকুরি-জীবনে খায়রুল কবিরের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে এসে মনে হয়, তাকে আমি কিছুটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদিতা কমবেশী আমাদের সকলের চরিত্রেই আছে; তারও আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলিম লীগের সেই কট্টর সাম্প্রদায়িক 'ইসলামী ম্যাকার্থিজমের' বর্বরতার যুগে তিনি ছিলেন বাঙালি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় আশ্রয় ও ভরসা। সরকারের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, সরকারী কাগজের প্রতাপশালী সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচার আচরণে তিনি যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধির মানুষ, তার পরিচয় আমি বহুবার পেয়েছি। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ভাষা আন্দোলনের সময় আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র এবং দৈনিক 'সংবাদের' নিউজ ডেস্কে রাত্রে কাজ করি। সংবাদ থেকে পাওয়া মাসে একশ' টাকা বেতনই ছিল আমার নিজের ও লেখাপড়ার খরচ চালাবার প্রধান সম্বল। 'সংবাদ' নূরুল আমিনের কাগজ জেনেও আমি ভাষা আন্দোলনে যোগ দেই এবং ২২ ফেব্রুয়ারী পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়ে কিছুদিন এখানে ওখানে থাকার পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হই। কারণ, পায়ের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। গোড়ালি ফুলে উঠেছিল। হাঁটতে পারতাম না। এক মাস ছিলাম হাসপাতালে। 'সংবাদ' থেকে ছুটি নেইনি, ছুটির দরখাস্তও করিনি। হাসপাতাল থেকে বের হয়েও 'সংবাদের' কাজে জয়েন করিনি। মনে মনে ভেবেছি, এত দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে আমার চাকুরিটি হয়তো নেই। তার উপর ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় প্রকাশ্যে ২২ তারিখের সংবাদের বান্ডিল হকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। এসব খবর নিশ্চয়ই সংবাদ কর্তৃপক্ষের কানে গেছে। তারা নিশ্চয়ই ছুটি না নিয়ে আমার এই কাজে অনুপস্থিত থাকাকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে আমার চাকুরি টার্মিনেট করে বসে আছেন। এই আশঙ্কায় আরও মাসখানেক সংবাদ অফিসের আশপাশ দিয়েও হাটলাম না। আমি তখন থাকি ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাস—আর্মানিটোলার বান্ধব কুটিরে। মাস শেষ হলে কোথা থেকে হোস্টেলের বাকি টাকা শোধ করবো, সেই চিন্তায় মন অস্থির। ঠিক এই সময় ডাকে বান্ধব কুটিরের ঠিকানায় আমার নামে একটি চিঠি এলো। খামের উপর 'সংবাদ' লেখা দেখে ভয় পেলাম। হয়তো আমার চাকরি টার্মিনেট করার নোটিশ। কিন্তু খাম খুলে চিঠি পড়ে বিস্মিত হলাম। চিঠিটা লিখেছেন সৈয়দ নূরুদ্দিন। তিনি তখন 'সংবাদের'

বার্তা-সম্পাদক। লিখেছেন, 'প্রিয় গাফ্‌ফার, তুমি প্রায় দু'মাস ধরে কাজে আসছো না। শুনেছি তুমি আহত ও অসুস্থ। হাসপাতালেও কিছুদিন ছিলে। এখন তুমি কি রকম? কাজে যোগ দেয়ার মতো শারীরিক অবস্থা হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে, কবে তক যোগ দেবে জানাও। ইতি-নিত্য শুভার্থী সৈয়দ নূরুদ্দিন।"

দু'মাস আড়াই মাস পরে আবার সংবাদের চাকুরিতে যোগ দিলাম। আরও মাস খানেক পর বেতনের টাকা হাতে পেয়ে দেখি, আমাকে তিন মাসের বেতন পুরোপুরি দেয়া হয়েছে। "সংবাদে" কাজ করার সময় প্রায়ই ছুটিছাটা নিয়েছি। আমার সবেতন ছুটি পাওনা ছিল না। ভাবলাম, একাউন্ট সেকশন ভুল করেছে। নাসিরউদ্দিন আহমদ তখন সংবাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রধান কর্মকর্তা। তার কাছে যেতেই তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'আমরা ভুল করিনি। খায়রুল কবির এবং সৈয়দ নূরুদ্দিনের নির্দেশ, তোমাকে দু'মাসের অনুপস্থিতির বেতনও দেয়া। আমি নির্দেশ পালন করেছি মাত্র।'

সে দিন নিউজ ডেস্কে ফিরে যাওয়ার সময় আমার মনে হয়েছিল, আজ যদি খায়রুল কবির সংবাদের সম্পাদক না হয়ে কর্তাভজা কোন লোক সম্পাদক হতেন? তাহলে কি হতো? যাদের কাগজ, তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিয়ে দু'মাস অফিস কামাই করেছি, সেই কামাই করা সময়ের বেতন হাতে পাওয়া দূরের কথা, হয়তো পুলিশের কাছে গোপন রিপোর্ট যেতো, আমার কপালে জুটতো নানা লাঞ্ছনা ও হয়রানি। একজন সাংবাদিকের কথা জানি, তিনি ছিলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিষ্ট পার্টির আন্ডার- গ্রাউন্ড কর্মী। তাকে খায়রুল কবির সংবাদ অফিসে চাকুরি দিয়ে রেখে গ্রেফতার, বিনাবিচারে আটক থাকা ও পুলিশের হয়রানি থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

আগের কথায় ফিরে যাই। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার কথা। খায়রুল কবির তখন প্রভাবশালী সম্পাদক। সদ্য বিবাহিত অথবা বিয়ে করবেন। ফজলুল হক হলের কমনরুমে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সভায় তিনি এলেন। তাঁর মুখে ইন্দোনেশিয়া সফরের অভিজ্ঞতার বিবরণ শোনার জন্য সভায় ছাত্র, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী বহুলোক জড়ো হয়েছিলেন। খায়রুল কবির ছোটখাটো মানুষ। কিন্তু তখন স্মার্ট ও সুদর্শন যুবক। পায়ে সাদা জুতো, পরনে সাদা পায়জামা, গায়ে সাদা শেরোয়ানি। তার মুখে ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনার জন্য আমরা সবাই উদগ্রীব। খায়রুল কবির মাত্র মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন; এমন সময় শ্রোতাদের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন গাজিউল হক। বর্তমানে তিনি প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। তখন সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ক্লাসের ছাত্র। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনের সামনের কাতারের নেতা; সেই সঙ্গে কট্টর বামপন্থী। খায়রুল

কবিরকে উদ্দেশ্য করে গাজিউল হক বললেন, আপনি বর্তমান সরকারের মুখপত্র 'সংবাদের' সম্পাদক। আপনার কাছ থেকে প্রথমেই আমরা জানতে চাই, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে আপনার মত কি?

খায়রুল কবিরের জীবনে এটা সম্ভবতঃ ছিল চরম অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত। যে কোনো অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ রাজনীতিকও সেদিনের সে ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে সরকারের সঙ্গে যুক্ত থেকে এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হলে নার্ভাস হয়ে পড়তেন। তার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের কমনরুমে সভাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সভায় বহু ছাত্র বক্তৃতা শুনতে এসেছেন।

কিন্তু খায়রুল কবির নার্ভাস হলেন না। তিনি হাসিমুখে গাজিউল হককে বললেন, বাংলাভাষা আমার মাতৃভাষা। এই ভাষার প্রতি আপনাদের সকলের মতো আমার দরদ, ভালবাসা ও সমর্থন রয়েছে। তবে এই সভায় আমাকে ডাকা হয়েছে ইন্দোনেশিয়া সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য, ভাষা সমস্যা বা ভাষার দাবি নিয়ে আলোচনার জন্য নয়। সুতরাং সে সম্পর্কে যদি আমার মতামত আপনারা জানতে চান, তাহলে আরেকটি সভা ডাকুন। আমি তাতে আসবো এবং আমার মতামত জানাবো। এ সভায় আমাকে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে বলতে দিন।

সভায় হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। একদল গাজিউল হককে সমর্থন জানিয়ে বললেন, খায়রুল কবিরকে আগে স্পষ্ট ভাষায় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মত জানাতে হবে। আরেক দল বলছেন, বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি তাঁর মত বলেছেন। এটা ভাষা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা সভা নয়। সুতরাং তাঁকে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে বলতে দেয়া হোক।

এই হৈ চৈ বেশিক্ষণ চলেনি। ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, সভার সকলেই ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে খায়রুল কবিরের বক্তব্য শুনতে উদগ্রীব। খায়রুল কবিরও মঞ্চে কথা বলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঠিক এ সময় ফজলে লোহানী সম্পূর্ণ অনাহূতভাবে মঞ্চে লাফ দিয়ে উঠলেন। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা যারা খায়রুল কবিরের ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে বক্তব্য শুনতে চান না, তারা দয়া করে সভা থেকে চলে যেতে পারেন।

সভায় যেন একটি বোমা ফাটলো। প্রচন্ড হৈ চৈ শুরু হলো আবার। সভার উদ্যোক্তা পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কর্মকর্তারা বিশেষ করে হাসান হাফিজুর রহমান, ফয়েজ আহমদ বিব্রত হয়ে পড়লেন। তারা তারা তাদের সাহিত্যিক বন্ধু ফজলে লোহানীর এই বিস্ময়কর ও আকস্মিক ভূমিকার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিছু ছাত্র এতই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো যে, তারা ফজলে লোহানীকে ধরে ফেলতে চাইলো। তাদের টার্গেট খায়রুল কবির নন; টার্গেট ফজলে লোহানী। সাহিত্য সংসদের

কর্মীরা বহু কষ্টে উত্তেজিত ছাত্রদের শান্ত করলেন। কিন্তু সভা আর হলো না। খায়রুল কবির সভার উদ্যোক্তা ও কয়েকজন ছাত্র নেতার সঙ্গে চা খেয়ে কথাবার্তা বলে বিদায় নিলেন।

খায়রুল কবিরকে একাধিকবার বিতর্কিত ভূমিকাতেও আমি দেখেছি। ১৯৫৪-৫৫ সাল তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এক মহা দুর্ভাগ্যের বছর। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয় এবং সে বছরই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে অবৈধ ও অগণতান্ত্রিকভাবে বরখাস্ত করা হয়। আদমজী মিলে বাধানো হয় ভয়াবহ বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা। ১৯৫৫ সালে সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম মহাপ্লাবন শুরু হয়। ঢাকার রাস্তাঘাটও সে বছরই প্রথম ডুবে যায়।

সেবার চারদিকে যখন চরম রাজনৈতিক হতাশা, অর্থনৈতিক সংকট এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে আধা-সামরিক শাসন (জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর এবং পাঞ্জাবী বুরোক্রাট এন.এম. খান চীফ সেক্রেটারী), তখন খায়রুল কবিরকে দেখা গেল, ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে জড়ো করে প্রদেশে প্রথম আর্টস কাউন্সিল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে। তার এই উদ্যোগ সম্পর্কে প্রথমে অনেকেই সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন; এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে, প্রদেশের জনগণের দৃষ্টি রাজনৈতিক সমস্যা ও আন্দোলন থেকে দূরে সরানোর জন্য আর্টস কাউন্সিল সরকারের একটি চতুর টোপ। খায়রুল কবিরকে সরকার ব্যবহার করছে। পরে দেখা গেল, মুদ্রার একপিঠ মাত্র আমরা দেখেছি। অপর পিঠ দেখিনি। শিল্প-সাহিত্য চর্চার নামে পশ্চিম পাকিস্তানে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে; এমন কি বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার বহু বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে করাচিতে উর্দু একাডেমী। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প-সাহিত্য ও খেলাধুলার খাতে পাকিস্তান সরকার এক পয়সাও খরচ করেনি। এন.এম. খাঁ বা নিয়াজ মোহাম্মদ খাঁ পাঞ্জাবী হলেও ঝুনো আই.সি.এস হিসেবে জীবনের বহু বছর কলকাতা এবং ঢাকায় কাটিয়েছেন। বহু বাঙালি রাজনীতিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঘনিষ্ঠতা ছিল খায়রুল কবিরের সঙ্গেও। খায়রুল কবির সেই ঘনিষ্ঠতাকে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার কাজে না লাগিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প-সাহিত্যচর্চা, খেলাধুলার মান উন্নয়নে সরকারী অনুদান আদায়ের কাজে লাগিয়েছিলেন। এন.এম. খান উদ্যোগী হওয়াতেই ঢাকা ষ্টেডিয়ামের নির্মাণ শেষ হয়। চট্টগ্রামেও একটি ষ্টেডিয়াম তৈরি হয়। যার নাম সম্ভবতঃ এখনো নিয়াজ মোহাম্মদ ষ্টেডিয়াম।

ঢাকায় এখন যেখানে জাতীয় প্রেসক্লাব, পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় সেটি ছিল প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীদের জন্য বরাদ্দ ভবন। এই ভবনে অর্থমন্ত্রী হিসেবে হামিদুল হক চৌধুরীকে এবং সমবায় ও কৃষিমন্ত্রী হিসেবে আফজাল সাহেবকে

বসবাস করতে দেখেছি। খায়রুল কবির 'সংবাদের' সম্পাদক থাকাকালে সরকারের সঙ্গে দেনদরবার করে এই বিল্ডিং প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য আদায় করেন। জাতীয় প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠাতেও তার নেপথ্য ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সংগঠক হিসেবে তার জুড়ি নেই। পরবর্তীকালে দেখা গেছে, সরকারী অফিসার, ব্যাংকার হিসেবেও তিনি অনন্য। সুদিনে যেমন তিনি নির্লিপ্ত, দুর্দিনেও তিনি সমান নির্বিকার। তার জীবনে বহু উত্থান-পতন এসেছে। কিন্তু তাকে দেখেছি সকল অবস্থাকে সমানভাবে গ্রহণ করতে। বিতর্কিত ভূমিকার নিন্দাবাদে তিনি দমে যাননি; আর কোনো বড় কাজে সাফল্যের দাবিতেও উচ্চকণ্ঠ হননি। তিনি প্রকাশ্যে প্রগতির ধ্বজা ওড়াননি, কিন্তু তার বহুকাজ, এমনকি বিতর্কিত ভূমিকাও এদেশে প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন, সংস্কৃতি চর্চা ও সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। আমার মতে, তিনি সত্যি সত্যি 'এ ম্যান ফর অল সিজন'।

তিন

লেখা শুরু করেছিলাম কে.জি. মোস্তফাকে নিয়ে। কিন্তু কলম ছুটলো খায়রুল কবিরের সন্ধানে। সম্ভবত একেই বলে কলমের স্বাধীনতা। অনেক সময়েই দেখেছি, বহু ভেবে চিন্তে যা নিয়ে লিখতে বসেছি তা আর লেখা হয়নি। কলম তার ইচ্ছেমতো এগিয়ে গেছে অন্যদিকে। লেখা শেষ করে দেখেছি, যা লিখতে চেয়েছি তার এক বর্ণও লেখা হয়নি। কলম আমার হয়ে যা লিখেছে, তা আমার সচেতন মনের চিন্তাভাবনার ধারে কাছেও ছিল না।

চুয়াত্তর সালে দেশ ছেড়েছিলাম। ফিরে এলাম তিরানব্বই সালের জানুয়ারীতে। তাও মাত্র একমাসের জন্য। ইচ্ছে ছিল করি অনেকের সঙ্গে দেখা করবো, অনেক জায়গায় যাবো। ইচ্ছে ছিল আহসান হাবীবের বাড়িতে যাব। তিনি নেই। কিন্তু তার স্ত্রী আছেন। আমাদের মমতাময়ী ভাবী, পঞ্চাশের ষাটের দশকের সেই 'হাওয়া মে উড়তা যায়ে' দিনগুলোতে যার বাড়িতে যখন-তখন গিয়ে হাজির হলেও সঙ্গে সঙ্গে শুধু চা নয়, টাও মিলতো। তাদের মেয়ে কেয়া তখন খুব ছোট; আমাকে ডাকতো 'ছোটলোক চাচা'। হাবীব ভাই শুধরে দিতেন, ছোটলোক চাচা নয়, ছোট চাচা। আহসান হাবীবই আমার প্রথম উপন্যাস 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' তার প্রকাশনা সংস্থা 'কথা বিতান' থেকে প্রকাশ করেছিলেন। তার ছেলে মঈনুল আহসান সাবের এখন জনপ্রিয় এবং প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী। ইচ্ছে ছিল ভাবীকে এবং মঈনকেও দেখতে যাবো। যাওয়া হয়নি। ইচ্ছে ছিল শিল্পী-বন্ধু কাইয়ুম চৌধুরীর বাসায় যাবো। কাইয়ুমের সঙ্গে সেই কৈশোর থেকে আমার কত সুখ-দুঃখ, রাগ-বিরাগের স্মৃতি

জড়িত। কাইয়ুম শুধু একজন উঁচুমানের শিল্পী নন, আমি তাকে বলি বাংলাদেশে (সেই পাকিস্তান আমল থেকে) বইয়ের আধুনিক প্রচ্ছদ শিল্পের পথিকৃত। কলকাতায় আধুনিক বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ শিল্পের ক্ষেত্রে সিগনেট প্রেস ও সত্যজিৎ রায়ের যে ভূমিকা, ঢাকায় সেই একক ভূমিকা কাইয়ুম চৌধুরীর। সত্যজিৎ রায়ের পেছনে ছিল সিগনেট প্রেসের মতো আধুনিক প্রকাশনা সংস্থা। কাইয়ুম চৌধুরীর পেছনে এমন কোনো প্রকাশনা সংস্থা ছিল না। ছোট ছোট প্রকাশক, উঠতি পত্রিকা ব্যবসায়ী এবং আমার মতো তখনকার নতুন লেখকদের পেছনে ঘুরে ঘুরে কাইয়ুমই রুচিসম্মত আধুনিক প্রচ্ছদসহ বই পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহ যোগাতো। তাতে টাকা যা জুটতো, তার তুলনায় পরিশ্রম ও ঘোরাঘুরি ছিল অনেক বেশী। অনেক সময় টাকাও আদায় হতো না। কাইয়ুম তবু অদম্য। এই কাইয়ুমের বাস এখন আজিমপুরে। তার স্ত্রীও শিল্পী। বরিশালের মেয়ে।

কাইয়ুমের আজিমপুরের বাসায় নয়, ইচ্ছে ছিল তাকে নিয়ে তার সিদ্ধেশ্বরীর পুরনো বাসায় যাবো। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকেও তার এই পৈত্রিক বাড়িতে যেতাম মাটির পথ ভেঙ্গে। বর্ষাকালে স্যান্ডেল হাতে নিতাম। ফিরে আসার পথে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের (তখন বড় রাস্তার মোড়েই ছিল টিনের চালের স্কুল ঘর) পুকুরে পা ধুয়ে আবার স্যান্ডেল পায়ে ঢুকাতাম। সিদ্ধেশ্বরীর এই রাস্তা এখন সুরম্য রাজপথ। তবু ইচ্ছে ছিল কাইয়ুমকে নিয়ে সেখানে যাবো। দেখবো সেই বুড়ো শিবের মন্দির আর দু'শ' বছরের পুরনো বটগাছটি আছে কি না? সময় হয়নি সেই মন্দির আর বটগাছ দেখতে যাওয়ার। কেবল এক সন্ধ্যায় দেখা হয়েছে কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে 'সচিত্র সন্ধানীর' গাজী শাহাবুদ্দিনের বাসায়।

আরও ইচ্ছে ছিল একবার কমলাপুর ঘুরে আসার। আমার ঢাকার বাস গুটিয়ে নেওয়ার বছরটিতে অর্থাৎ সত্তরের দশকের গোড়াতেও কমলাপুরের একটা বড় এলাকাই ছিল গ্রাম। বর্ষার সময় মতিঝিল থেকে ডিঙ্গিতে চেপে কমলাপুরে যেতে হতো। পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে এই কমলাপুরেই থাকতো তখনকার তরুণ বয়সের কবি ফজল শাহাবুদ্দিন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আমরা। তার বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল শামসুর রাহমানের সঙ্গে। সেই সুবাদে প্রায়ই আমন্ত্রণ পেতাম তার বাড়িতে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে আম, কাঁঠাল খাওয়ার দাওয়াতটা প্রতিবছর বাঁধা থাকতো। আমি, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান বর্ষাকালে নৌকা চেপে ফজলের বাড়িতে যেতাম। এটা ছিল তার বাবার বাড়ি। টিনের দোচালা ঘর। মাচা ভর্তি আম। ফজলদের আম বাগানে তখন হাজার হাজার আম ধরতো। কাঁচা, পাকা, আধ- পাকা আম। আমরা পেটপুরে খেতাম। তারপর আবার নৌকাযাত্রা। এই ফজলের হাত দিয়ে 'মৃদঙ্গের' মত মাসিক, 'বিচিত্রা'র মতো সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরিয়েছে, যা

আমাদের সংবাদ-সাহিত্যকে আধুনিকতার যুগে অগ্রবর্তী হওয়ার পথ দেখিয়েছে বলা চলে। এবার ঢাকায় গিয়ে ফজলের টিকিটিরও নাগাল পেলাম না। কমলাপুরে যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হওয়া দূরের কথা। বরং কোনো কোনো বন্ধু সাবধান করে দিয়েছেন, সাবধান, ফজলের সঙ্গে মেলামেশা করো না। সে এরশাদের কবি সভার এক রত্ন হয়েছিল, এখন জামাত-ঘেঁষা সাহিত্য শিবিরে। জবাব দিয়েছি, আমি কি পনের বছরের ছুকরি যে, কোনো পুরুষ হাত ধরলেই সতীত্ব যাবে? কোনো জামাতগন্ধী লোকের কাছে গেলেই যদি আমি আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, তাহলে সেটা কি ধরনের বিশ্বাস? ভারতের আসফ আলি ছিলেন নেহরু আমলে জাঁদরেল কংগ্রেস নেতা। তার স্ত্রী অরুণা আসফ আলি ছিলেন কংগ্রেসের ঘোর-বিরোধী প্রজা সোস্যালিষ্ট দলের নেত্রী। দিনে স্বামী-স্ত্রী বিভিন্ন জনসভায় একে অন্যের দলকে তূলোধুনো করতেন। তাই বলে রাতে তারা এক বিছানায় শুতে যেতেন না?

ইচ্ছে ছিল কথাশিল্পী রাবেয়া খাতুনের বাসায় যাবো। পঞ্চাশের দশকের ঢাকার তরুণ সাহিত্য সমাজে তার ভূমিকা ছিল মক্ষিরাণীর। তার হাত দিয়ে শুধু চমৎকার উপন্যাস আর ভ্রমণ কাহিনী বেরোয় না, সুস্বাদু ভূনা খিচূড়িও রান্না হয়। সেই সঙ্গে তার গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত। তার স্বামী ফজলুল হকও ছিলেন আমার বন্ধু। একাত্তর সালে কলকাতার বালু হাক্কাক লেনে মুজিবনগর সরকারের পত্রিকা 'জয় বাংলা' অফিস ছিল। এই অফিসের তত্ত্ব তদারকির ভার ছিল ফজলুল হকের উপর। হয়তো টেবিলে বসে 'জয় বাংলা'র সম্পাদকীয় লিখছি, ফজলুল হক এসে কাছে দাঁড়াতেন। বলতেন, কি টায়ার্ড লাগছে? এক কাপ চা আনিয়ে দেব? হ্যাঁ বললে তো চা আসতোই, না বললেও আসতো। চরম সংকটের সময়েও এমন দরাজ দিলে উচ্চকণ্ঠে হাসতে আমি আর কাউকে দেখিনি। ঢাকায় প্রথম সিনে-সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ থেকে শুরু করে শিশুদের নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ, এমন কি খাঁটি বাঙালি খাবারের দোকান প্রতিষ্ঠাতেও ফজলুল হক তার অতুলনীয় প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই মানুষটিও আজ আর নেই। অকালেই চলে গেলেন। এখন কলকাতার গোবরার গোরস্থানে তিনি সমাহিত। যেখানে আছে আমার এক বড় বোনেরও কবর।

রাবেয়া খাতুনের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না। তবে তার ছেলে সাগরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাপের মতোই সে লম্বা। তেমনি দিল দরাজ। তবে বাপের চাইতে ব্যবসা সফল। একাধিক ব্যবসায়ের মধ্যে একটা পত্রিকার অন্যতম মালিক। ঢাকায় যেদিন পৌঁছেছি, তার পরদিনই সাগর বাসায় এসে হাজির। তাদের পত্রিকায় লেখা দেওয়ার অনুরোধ জানাল। বলল, মায়ের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবেন। কিন্তু দেখা হয়নি রাবেয়া খাতুনের সঙ্গেও।

কে. জি. মোস্তফার সঙ্গেও তাই শেষ পর্যন্ত দেখা হবে কি না, তা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ ছিল। সময়ের অভাব আর সভা সমাবেশের ধাক্কায় 'সংবাদের' নতুন অফিসেও গিয়ে পৌঁছতে পারবো কি না, তা নিয়ে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। কিন্তু সুযোগ জুটে গেল। ফোটো সাংবাদিক জহিরুল হক (এখন যিনি আলহাজ্ব জহিরুল হক) এক সন্ধ্যায় আমাকে বলল, আজ আপনার কোনো প্রোগ্রাম নেই। চলুন, এই ফাঁকে আপনাকে সংবাদ অফিসে নিয়ে যাই। কে. জি. ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবেন। রাত তখন আটটার মতো হবে। সংবাদের নতুন অফিসে পৌঁছে দেখি কে. জি. মোস্তফা তখনো আসেননি। বাসায় টেলিফোন করতেই জানানো হলো, তিনি অফিসে রওয়ানা হয়েছেন। অফিসে পরিচিত তেমন কেউ তখন নেই। অর্ধ-পরিচিত; অপরিচিত সাংবাদিকদের সঙ্গে গল্প জুড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই কে. জি. মোস্তফা এসে গেলেন। তাকে চিনতে কিছুমাত্র কষ্ট হল না। শুধু মাথার চুল ধবধবে সাদা। নইলে চেহারায় বয়সের ছাপ তেমন পড়েনি। ছিলেন মাননীয় রাষ্ট্রদূত; এখন আবার সাংবাদিক। তাতে অতীতের বামপন্থী সাংবাদিক কে. জি. মোস্তফাকে চিনতে কোনো কষ্ট হয় না। মাঝখানের দীর্ঘ বিদেশ বাস এবং কূটনীতিকের জীবনের খোলসটা তিনি এত সহজে দূরে ছুঁড়ে ফেলে আবার সেই আগের কে. জি. হতে পেরেছেন দেখে বিস্মিত হলাম।

কে. জি. মোস্তফার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৫০ সালে। বরিশাল থেকে মেট্রিক পাস করে সে বছরেই মাত্র ঢাকায় এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছি। থাকি সাময়িকভাবে তখনকার ব্যারাক ছাত্রাবাস ইকবাল হলে (এখনকার সার্জেন্ট জহুরুল হক হল)। এই ব্যারাক ছাত্রাবাসের সামনে মুনশীর রেষ্টুরেন্টে তখনকার তরুণ নামকরা সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের (যারা ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) আড্ডা বসতো। এই আড্ডাতেই প্রথম কে. জি. মোস্তফাকে আমি দেখি। তিনি আমার বহু সিনিয়র। তাই সমীহ করে চলতাম। তরুণ সাংবাদিকদের মধ্যে কে. জি. মোস্তফার ছিল একটা দুর্দান্ত বামপন্থী রাজনীতিকের ভূমিকাও। তখন তার চুল পাকেনি। কথা বলতেন গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। হাঁটতেন এত দ্রুত যে, তার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে গেলে রীতিমতো দৌড়াতে হতো।

১৯৫০ সালে মুসলিম লীগ সরকারের বিভিন্ন গণবিরোধী কাজের সমালোচনা করার জন্য বংশালের বলিয়াদী প্রিন্টিং প্রেস থেকে 'দৈনিক ইনসাফ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। তখনকার প্রগতিশীল তরুণ সাংবাদিকদের প্রায় সকলেই এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের একটি সংবিধান রচনার মূলনীতির খসড়া তৈরির জন্য লিয়াকত সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন এবং এই কমিটি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। রিপোর্টটি পরিচিত হয়েছিল 'বেসিক প্রিন্সিপাল

কমিটিজ রিপোর্ট' বা মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট নামে। প্রস্তাবিত সংবিধানের এই খসড়া মূলনীতিতে তৎকালীন পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন অধিকার এমনভাবে খর্ব করা হয়েছিল যে, তাতে সারা প্রদেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। 'দৈনিক ইনসাফ' এই মূলনীতি কমিটির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। কে. জি. মোস্তফা এই কাগজের বার্তা বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। 'ইনসাফের' মাধ্যমে এই তরুণ সাংবাদিকদের জোরালো প্রচার কার্যের ফলে বিপিসি মুভমেন্ট ছাত্র ও যুব সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সরকার প্রমাদ গণেন। 'ইনসাফের' উপর নানা চাপ সৃষ্টি হয়। মালিক পক্ষ বলিয়াদীর জমিদার প্রগতিশীল তরুণ সাংবাদিকদের কাগজ থেকে বিদায় করে দেবার চেষ্টা-চরিত্তির শুরু করেন। শুরু হয় বেতন ও অন্যান্য দাবি দাওয়া নিয়ে মন কষাকষি। পরিণামে কে. জি. মোস্তফা, মুস্তফা নূরুল ইসলাম, বাহাউদ্দিন চৌধুরীসহ প্রায় সকল প্রগতিমনা সাংবাদিক ধর্মঘট করার নোটিশ দেন এবং মালিক পক্ষ সেই সুযোগে মোহাম্মদ মোদাব্বেরের সুপারিশে সিরাজুর রহমান নামে তখনকার এক তরুণ সাংবাদিককে পেছনের দরোজা দিয়ে এনে বার্তা-সম্পাদকের পদে বসান। সিরাজুর রহমান লন্ডনের বিবিসি বেতারে তার দীর্ঘকালের চাকুরি জীবনের শেষে অবসর নিয়েছেন। তখন তিনি ছিলেন প্রায় অপরিচিত এবং অনভিজ্ঞ তরুণ সাংবাদিক। কিন্তু রাতারাতি দৈববলে 'ইনসাফের' বার্তা-সম্পাদক পদে তার নিযুক্তি ঘটে এবং ইনসাফ পত্রিকাটিরও সরকার-বিরোধী, বিশেষ করে বিপিসি রিপোর্ট-বিরোধী ভূমিকার কার্যত অবসান হয়।

১৯৫১ সালে 'দৈনিক সংবাদ' বের হওয়ার পর কে. জি. মোস্তফা ছিলেন বার্তা বিভাগের অন্যতম শিফ্‌ট-ইনচার্জ। তিনি শুধু শিফ্‌ট-এর লোকদের হাতে তরজমার জন্য খবর ধরিয়ে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন না। নিজেও তরজমা করেন। তার অতি দ্রুত হাঁটার মতোই দ্রুত তরজমার গতি। কিন্তু নির্ভুল ও স্বচ্ছন্দ। তার ফাঁকে ফাঁকে আমার মতো নবিশ সাংবাদিকদেরও তিনি তালিম দিতেন। এই তালিম দেওয়ার মধ্যে কোনো গুরুগিরি থাকে না। থাকে সহৃদয় সহকর্মীর মতো সহমর্মিতা। সাংবাদিক হিসেবে কে. জি. মোস্তফার এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যই আমাকে আকর্ষণ করেছিল।

'সংবাদের' বার্তা কক্ষে একদিনের কথা আমার মনে আছে। পাকিস্তান ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে একটা বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে। খবরটা আমিই তরজমা করলাম। কে. জি. মোস্তফা ছিলেন শিফ্‌ট-ইনচার্জ। বললেন, গাফফার, তুমিতো এখন 'ডিপেন্ডেবল হ্যান্ড' হয়ে উঠছো। তোমার তরজমা করা খবরটার হেডিং তুমিই লিখে দাও। আমি আর চেক করবো না। হেডিং লিখে খবরটা অন্যান্য খবরের সঙ্গে 'কম্পোজ সেকশনে' পাঠিয়ে দাও।

আমি একটা বড় ভুল করে ফেললাম। অস্ট্রিয়ার জায়গায় হেডিংয়ে লিখলাম অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্য চুক্তি। কে. জি. মোস্তফা আমার লেখা খবর 'চেক' করলেন না। খবরগুলো চলে গেল 'কম্পোজ সেকশনে', তারপর যথারীতি ছাপা হয়ে পরদিন কাগজে বেরুলো। খবরটি প্রথম পাতার খবর। গুরুত্বপূর্ণ খবর। 'সংবাদ' তখন সরকারী পত্রিকা। সম্পাদক ও বার্তা-সম্পাদকের চোখ পড়লো ভুলের উপর। তারা প্রেসে এসে কপি তলব করলেন। ধরা পড়লা, ভুল আমার। ঠিক হল, এটা আমার প্রথম ভুল, সুতরাং মাফ করা হবে। কিন্তু একটা 'ওয়ার্নিং লেটার' আমাকে দেওয়া হবে। 'শিফ্‌ট ইনচার্জ' হিসেবে কে. জি. মোস্তফা রাজি হলেন না। বললেন, "এটা গাফফারের ভুল নয়, আমার ভুল। শিফ্‌ট ইনচার্জ হিসেবে আমি নিউজটা দেখে দিয়েছি (তিনি নিউজটা দেখেননি। আমাকে বাঁচানোর জন্য নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিয়েছেন), সুতরাং ভুল হলে দায়িত্ব আমার। 'ওয়ার্নিং লেটার' দিতে হলে আমাকে দেওয়া হোক।" এর পর অবশ্য কর্তৃপক্ষ আর উচ্চবাচ্য করেননি।

তিরানব্বই সালের সেই রাতে 'সংবাদ' অফিসের বার্তা বিভাগে কে. জি. মোস্তফার মুখোমুখি বসতেই সেই পুরনো দিনের মতো এক মুখ উজ্জ্বল হাসি আমাকে উপহার দিয়ে বললেন। আগে এক কাপ চা খাও গাফফার; তারপর কথা হবে।

চার

কে. জি. মোস্তফার সঙ্গে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে আমি একটা কথা শিখেছিলাম। জীবনে কোনো সত্যকে যদি ধ্রুব বলে মানি এবং তাকে রক্ষা করে চলতে চাই, তাহলে তার জন্য যেকোন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অহংবোধ দ্বারা চালিত হলে চলবে না। এই শিক্ষাটি আমাকে জীবনে বহুবার বহু পতন থেকে রক্ষা করেছে। কে. জি. মোস্তফাকেও দেখেছি, নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসটিকে পরম যত্নে লালন ও রক্ষা করার জন্য তিনি নিজের অহংবোধটিকে বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং সাংবাদিক জীবনে তার চাইতে বহু জুনিয়র ও অদক্ষ ব্যক্তিকে উচ্চ পদটি ছেড়ে দিয়ে তার নির্দেশে হাসি মুখে কাজ করে গেছেন। বাম রাজনীতিতে বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য পাকিস্তান আমলে 'বিপজ্জনক কালো তালিকাভুক্ত' ব্যক্তিদের একজন না হলে শুধু নিজের সিনিয়রিটি ও যোগ্যতার গুণেই কে. জি. বহু আগে একটি দৈনিক পত্রিকার শুধু বার্তা-সম্পাদক নন, প্রধান সম্পাদকও হতে পারতেন। নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসটি ত্যাগ করতে পারেননি বলেই তাকে বহুকাল নীরবে পেছনে পড়ে থাকতে হয়েছে।

পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে কে.জি. মোস্তফা পাঁড় কমিউনিস্ট সাংবাদিক বলে পরিচিত ছিলেন। বহুবার তাকে গ্রেফতারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে 'আন্ডার গ্রাউণ্ডে' পালিয়ে থাকতে হয়েছে। একবারতো 'আন্ডার গ্রাউন্ডে' পালিয়ে থাকার সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিনাচিকিৎসায় তার শরীরের একাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। তিনি ভালো হবেন কি না সন্দেহ ছিল। সম্ভবতঃ চিকিৎসার চাইতেও অসীম মনোবলই তাকে সম্পূর্ণ ভালো হতে সাহায্য করে। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি যখন মস্কো ও পিকিংপন্থী এই দু'নামে বিভক্ত হয়, তখন কে. জি'র সহানুভূতি ও সমর্থন যে পিকিংয়ের দিকে ছিল, তা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। তাতে আমি মনে মনে দুঃখ পেতাম। আমার ধারণা ছিল, যারা ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান মার্ক্সবাদী, তারাই মস্কোপন্থী বা মনি সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টিতে আছেন এবং অধিকাংশ সুযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাবাদী গিয়ে পিকিংপন্থী গ্রুপে জুটেছেন। কে. জি. মোস্তফাকে এই গ্রুপে আমি মেলাতে পারতাম না অথবা মেলাতে চাইতাম না। আমার এই মনের কথাটি আমি একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও বলেছিলাম। আমি জানতাম, কলকাতার ছাত্রজীবন থেকেই খোন্দকার মোস্তফা ও খোন্দকার ইলিয়াস এই দু'ভায়ের সঙ্গে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক মতপার্থক্য তাদের এই ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কোনোদিন নষ্ট করেনি।

ষাটের দশকে আমার মুখে কে. জি. মোস্তফা সম্পর্কে মন্তব্য শুনে বঙ্গবন্ধু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "কে. জি. মস্কোপন্থী হোক কিম্বা পিকিংপন্থী হোক, তার ইনটেগ্রিটিতে আমি বিশ্বাসী। সে কমিটেড বামপন্থী, তোমাদের হলিউডি বামপন্থী নয়। কে. জি'র মতোই আরেকজন সাংগঠনিককে আমি বিশ্বাস করি এবং সম্মান করি; তিনি সৈয়দ আলতাফ হোসেন।" বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম, তিনি তো 'মর্নিং নিউজে'র মতো পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। বঙ্গবন্ধু আমার কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়োনি?' উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে/ তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।' সৈয়দ আলতাফ আর কে. জি. উত্তম মানুষ বলেই অধমদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে ভয় পান না এবং তাতে তাদের গায়ে ময়লাও লাগে না।

বঙ্গবন্ধু যে সত্যি সত্যি সৈয়দ আলতাফ হোসেন এবং কে. জি. মোস্তফার রাজনৈতিক সততা ও নিষ্ঠায় বিশ্বাস করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই দু'জনের সঙ্গে রাজনৈতিক মতান্তর সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু তাঁর মন্ত্রিসভায় সৈয়দ আলতাফকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং কে. জি. মোস্তফাকে রাষ্টদূতের মর্যাদা দিয়ে কূটনৈতিক পদে নিয়োগ করেন। কে. জি. দীর্ঘ কয়েক বছর ইরাকে রাষ্ট্রদূতের পদে কাজ করেছেন। সামরিক শাসনামলে তার চাকরির মেয়াদ

আর বাড়ানো হয়নি। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে আসেননি। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তাকে ইরাকে কিছুকাল অবস্থানের অনুমতি দেন এবং কে. জি. বাগদাদের একটি প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিকের উপদেষ্টা হয়ে সেখানে কাজ করেন।

কে. জি'র বিয়েটাও পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এবং ঢাকার সাংবাদিক সমাজে তখন চমক সৃষ্টি করছিল। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ শোনা গেল কে. জি. হুট করে বিয়ে করেছেন সাবেরা খাতুনকে। কবি ও গীতিকার আবু হেনা মোস্তফা কামালের বড় বোন সাবেরা খাতুন (এখন সাবেরা মোস্তফা) । আবু হেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্স ক্লাসে আমার সহপাঠী, সাবেরা আপা বাংলাতেই আমাদের উপরের ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন। পড়াশোনায় তিনি যেমন ভালো, তেমনি অভিনয় প্রতিভা। ১৯৫৫ সালে আমার প্রযোজনায় এবং অধ্যাপক নূরুল মোমেনের পরিচালনায় ফজলুল হক হল ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' নাটকটি কার্জন হলে মঞ্চস্থ হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী-পুরুষের সহ-অভিনয় অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল। ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করতেন। সম্ভবতঃ আমার নাটকটিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় নাটক, যে নাটকে সকল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে কো এ্যকটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। 'শেষ রক্ষায়' বিভিন্ন নারী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মাসুদা চৌধুরী, জহরত আরা এবং সাবেরা খাতুন। এই নাটকে অভিনয় করেই সাবেরা খাতুন ও মাসুদা চৌধুরী তাদের অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন।

আবু হেনা মোস্তফা কামালের বড়বোন; তাই সাবেরা খাতুনকে আমিও সাবেরা আপা ডাকতাম। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে বসে আড্ডা দিচ্ছি, আবু হেনা এসে জানাল, তার বড় বোনের বিয়ে এবং তা সাংবাদিক খোন্দকার গোলাম মোস্তফার সঙ্গে। শুনে তো হা হয়ে গেলাম। আণ্ডারগ্রাউণ্ডবাসী বাম সাংবাদিক কে. জি. মোস্তফার সঙ্গে বিয়ে সাবেরা খাতুনের? এই স্বল্পভাষী, সংযত মহিলার সঙ্গে বাম রাজনীতির অন্ধ গলির কে. জি. মোস্তফার পরিচয় হল কখন? আর মন-দেয়া নেয়াই বা হল কিভাবে? আমার প্রশ্নের জবাবে আবু হেনা যা জানাল, তার সারমর্ম হল, 'সংবাদে'র মহিলা পাতার সম্পাদক সাবেরা আপার বান্ধবী। সেই সূত্রে সাবেরা আপার সংবাদ অফিসে যাতায়াত এবং কে. জি'র সঙ্গে পরিচয়। সেই পরিচয় ভালো করে প্রণয়ে পরিণত হওয়ার আগেই চট্‌জলদি এই পরিণয়ের ব্যবস্থা।

শুধু নিজের বিয়ের ব্যাপার নয়, অন্যের বিয়ের ঘটকালির ব্যাপারেও কে. জি. পারদর্শী। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। দ্রুত হবু বর ও কনেকে রাজি করাতে পারেন। সাপ্তাহিক ' বেগমের' সম্পাদক নূরজাহান বেগম (আমাদের নূরজাহান

আপা) এবং শিশু সাহিত্যিক (কচিকাঁচার আসরের দাদা ভাই) রোকনুজ্জামান খানের বিয়েতে কে. জি. মোস্তফার নেপথ্য ও চমক লাগানো ভূমিকা নিয়ে আমি রীতিমতো একটা উপন্যাস লিখতে পারি। আমাকেও তিনি একটা ফাঁদে প্রায় জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

মোস্তফা-সাবেরা নবদম্পতি তখন ঢাকার এক শহরতলির এক টিনের বাড়িতে বাস করতেন। আবু হেনার সঙ্গে সেই বাড়িতে প্রায়ই আমার যাওয়া আসা। কে. জি. তখনো সংসারে রীতিমত গুছিয়ে বসেননি। টেবিল চেয়ারের ঘাটতি বাড়িতে। তাই মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে খাওয়া দাওয়া চলে। একদিন দুপুরে ওই মাদুরে বসে কে. জি'র সঙ্গে ভাত খাচ্ছি, কে. জি. ভাই হঠাৎ বললেন, গাফ্‌ফার তুমি বিয়ে করে ফেলো।

আমি লজ্জা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলও হল, পাত্রীটা কে, যার সঙ্গে তিনি আমার বিয়ের কথা ভাবছেন। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, কাকে বিয়ে করবো?

কে. জি. এক মহিলার নাম বললেন। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ক্লাসে আমার সহপাঠী। এখন তিনি অধ্যাপক। নিশ্চয়ই তারও স্বামী সংসার রয়েছে। তাই নাম প্রকাশ করে তাকে এ বয়সে বিব্রত করতে চাই না। মহিলা (তখন তিনি তরুণী) ছোটখাটো এবং কালো রঙের। রূপের মধ্যে অপরূপ দুটি চোখ। আমার সহপাঠী বদরুল হাসান বলতো, 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।' তাকে তখন ক্লাসে কোনো ছেলের সঙ্গে কখানো কথা বলতে দেখিনি। শান্ত গোবেচারা চরিত্রের মেয়ে। এত নিঃশব্দে ক্লাসে আসা যাওয়া করতেন যে, তার উপস্থিতিই অনেক সময় আমরা অনুভব করতাম না। এই মহিলার দিকে একমাত্র সহপাঠী ছাড়া অন্য কোনো দৃষ্টিতে আমি কখনো তাকাইনি। সুতরাং কে. জি. মোস্তফার প্রস্তাবে বিস্মিত হয়েছিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার কি করে ধারণা হল, এই মহিলা আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবেন? কে. জি. বল্লেন, তুমি রাজি হলে আমি তাকে রাজি করাবো। আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি এই মহিলাকে বিয়ে করি আপনি তা চাচ্ছেন কেন ? কে. জি. বললেন, আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে তুমি সাংবাদিকতাই করবে। আমাদের সাংবাদিকদের জীবন স্থিতিহীন, অনিশ্চিত (তখন তা-ই ছিল)। এই অবস্থায় এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করা তোমার উচিত হবে না, যার সাংঘাতিক উচ্চাভিলাষ পুরাতে গিয়ে তোমাকে তোমার পেশা ও নীতির প্রতি 'কমিটমেন্ট' নষ্ট করতে হবে। এদিক থেকে এই মেয়েটি তোমার জন্য আদর্শ স্ত্রী হবে। তোমাকে সে সহজেই বুঝবে এবং সাহায্য করবে। সে শুধু স্ত্রী হবে না, বন্ধুও হবে। আমি নিজেও এসব কথা চিন্তা করেই সাবেরাকে বিয়ে করেছি।

এই কথাবার্তা আর এগোয়নি। সেই মহিলার সঙ্গেও আমার বিয়ে হয়নি। কিন্তু

এ কথাবার্তার কিছুদিন পর একদিন ক্লাসে ঢুকতে যেতেই সেই মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হল। আমার মনে হল, তিনি হঠাৎ লজ্জা পেয়ে যেন চোখ নামিয়ে নিলেন। ধারণা করলাম, এই বিয়ের ব্যাপারে আমার মতো এই মহিলাকেও হয়তো কে. জি. বাজিয়ে দেখেছেন।

তিরানব্বই সালের জানুয়ারি মাসের সেই রাতে ঢাকায় 'সংবাদের' নতুন অফিসে কে, জি মোস্তফার মুখোমুখি বসে মনে হল, 'সংবাদ' অফিসের সবকিছুই বদলেছে। কিন্তু কে. জি. বদলাননি। কিন্তু এই নতুন অফিসে, নতুন পরিবেশেও তিনি বেমানান নন। তার কাজে রয়েছে সেই আগের গতি; চেহারাতেও রয়েছে সেই আগের তারুণ্যের আভা। বললাম, কে. জি. ভাই, আপনিতো দীর্ঘকাল মধ্যপ্রাচ্যে কাটিয়ে এলেন। মধ্যপ্রাচ্যের বড় বড় রাষ্ট্রনায়কের বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আপনি বেশ কিছুকাল কাটিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এটা একটা সংকটময় ক্রান্তিকাল। দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটছে সেখানে। গালফ যুদ্ধ গোটা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক চেহারা পাল্টে দিতে চলেছে। এ সম্পর্কে পশ্চিমা সাংবাদিকদের একপেশে উদ্দেশ্যমূলক লেখা পড়তে পড়তে বিরক্ত হয়ে গেছি। আপনি কেন নির্যাতিত আরবদের দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান ঘটনাবলী নিয়ে একটা বড় বই লেখেন না? আমার মনে হয়, শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা উপমহাদেশেই মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে এই বই লেখার মতো এতটা অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আর কোনো সাংবাদিকের নেই।

কে. জি. হাসতে হাসতে বললেন, আমি সাংবাদিক, লেখক নই। বই লেখাতে চাও ইলিয়াসকে (তার বড় ভাই খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস) গিয়ে ধরো। সে মধ্যপ্রাচ্যের উপর 'ভাসানী যখন ইউরোপে', কিম্বা 'মুজিববাদের' চাইতেও বড় বই লিখে দেবে।

পাঁচ

তিরানব্বই সালের ঢাকায় নাটকের বিস্ময়কর বিকাশ দেখে অভিভূত হয়েছি। সম্ভবতঃ কবিতার পরেই নাটক বাংলাদেশে সবচাইতে উৎকর্ষতা লাভ করেছে এবং মডার্ণ ফর্ম, টেকনিক, বিষয়বস্তু ও অভিনয় গুণের দিক থেকে পশ্চিম বঙ্গের কলকাতার মঞ্চগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে চলেছে। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নেই। তবু ঢাকায় টিকেট কিনে নাটক দেখার নরনারীর ভিড় দেখে অনুমান করেছি, নাটক নিয়ে সত্যি আমাদের গৌরব করার সময় এসেছে। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও ঢাকার নাট্যগোষ্ঠীগুলো ছিল অনেকটা সখের থিয়েটার গ্রুপের মত। বেশির ভাগ

কলকাতার পুরনো নাটক অথবা অনুবাদ করা নাটক তারা শহরের এখানে-সেখানে মঞ্চস্থ করতেন এবং তাতে টিকেট কেনা দর্শকের চাইতে আমন্ত্রিত দর্শকের সংখ্যাই বেশী হতো। মাত্র ত্রিশ থেকে ছত্রিশ বছর আগে ঢাকায় ভালো নাটক লেখার লোকও ছিলেন হাতে গোনা দু'চারজন, যেমন নূরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ প্রমুখ। প্রকৃত পেশাদার নাট্যগোষ্ঠীও ঢাকায় ছিল না। মুনীর চৌধুরী এবং নূরুল মোমেন শুধু মৌলিক নাটক লিখে নয়, সেক্সপিয়র, শ, মলিয়ের প্রমুখ বিদেশী সাহিত্যিকদের নাটক বাংলায় ভাষান্তর ও রূপান্তর করেও বাংলাদেশে নাটক চর্চার উষালগ্নের সূচনা করেন বলা চলে।

এখন ভাবতেও অবাক লাগে, আমাদের ছাত্রজীবনে সেই পঞ্চাশের দশকেও ঢাকার মঞ্চে নারী চরিত্রে পুরুষকে অভিনয় করতে হতো। সাধারণ মঞ্চে দূরের কথা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক নাটক অনুষ্ঠানেও ছেলেদের মেয়ে সাজাতে হতো। আমাদের পরিবারের বাহাউদ্দিন চৌধুরী সেই চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকের ঢাকায় শুধু ছাত্র হিসেবে, বক্তা হিসেবে এবং তরুণ লেখক হিসেবেই খ্যাত ছিলেন না; নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্যও পরিচিত ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে অভিনীত সেক্সপিয়রের নাটকের নারী চরিত্রে অভিনয় করে তখনকার মুষ্টিমেয় ইংরেজ দর্শকের কাছ থেকেও প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

সম্ভবতঃ ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক নাটকে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে প্রথম নারী চরিত্রে নারীরাই অভিনয় করার সুযোগ পান। ১৯৫৫ সালে ফজলুল হক হল ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কার্জন হলে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা হয়। অধ্যাপক নূরুল মোমেন ছিলেন নাটকটির পরিচালনায় এবং আমি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ছিলাম প্রযোজনায়। আমরা দুঃসাহসে ভর করে সিদ্ধান্ত নিলাম, নারী চরিত্রে নারীদেরই অভিনয় করতে দেয়া হবে। কিন্তু নারী চরিত্রে অভিনয় করার মতো নারী কোথায় ফজলুল হক হলে? যে দু'একজনের অভিনয় করার প্রতিভা রয়েছে তারা সলিমুল্লাহ হলের সঙ্গে 'এটাচড' ছাত্রী। তাদের মধ্যে আছেন জহরত আরা (জহরত আরা পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একেবারে সূচনা পর্বের বাংলা ছবি 'মুখ ও মুখোশে' অভিনয় করেন), মাসুদা চৌধুরী (এখন আমেরিকায় আছেন) এবং সাবেরা খাতুন (বর্তমানে সাবেরা মোস্তফা)। ভদ্রঘরের মেয়েদের তখন স্কুল-কলেজের মঞ্চে নামাও ছিল নিন্দনীয়। শুধু নিন্দনীয় নয়, রীতিমত বিপজ্জনক। পঞ্চান্ন সালে কার্জন হলে ' শেষ রক্ষা' নাটক মঞ্চস্থ করার সময়ে আমরা শুনতে পেলাম, একদল রক্ষণশীল অভিভাবক গুন্ডা ভাড়া করেছেন অভিনয় চলাকালে কার্জন হলে হামলা চালানোর জন্য। এর আগে তারা চিঠি লিখে দাবি জানিয়েছিলেন, "নারী পুরুষের সহ অভিনয়ের মতো 'ইসলাম বিরোধী' এবং

'বেদাত' কাজে আমরা যেন লিপ্ত না হই। যদি হই, তাহলে প্রাপ্য শাস্তির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।" এই 'ওয়ার্নিং লেটার' পাওয়ার পর বেশ কিছু ছাত্র এগিয়ে এসেছিলেন ভলান্টিয়ার গ্রুপ গঠন করে কার্জন হলের চারদিকে পাহারা বসানোর জন্য।

১৯৫৪ সালে আমি রেসিডেন্ট স্টুডেন্ট হিসেবে ফজলুল হক হলে ঢোকার সুযোগ পাই। হলে তখন দু'ধরনের ছাত্রের খুব খাতির। স্পোর্টসম্যান বিশেষ করে ফুটবল খেলোয়াড় এবং নারী চরিত্রে অভিনয়ের মতো পুরুষ ছাত্র। ফজলুল হক হল এবং সলিমুল্লাহ হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দুটি ছাত্রাবাসেই তখন ছাত্রদের 'সীট' বরাদ্দ করার ব্যাপারে তাদের 'একাডেমিক এচিভমেন্ট' বিবেচনা করা হতো। অর্থাৎ 'থার্ড ডিভিশন' ও 'লোয়ার সেকেন্ড ডিভিশনে' পাশ করা ছাত্রেরা কোনো কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেও ছাত্রাবাসে থাকার সুবিধা লাভ করা তাদের পক্ষে খুবই দুরূহ ছিল। কিন্তু ফুটবল খেলোয়াড় এবং নারী চরিত্রে অভিনয়ে দক্ষ পুরুষ ছাত্রের জন্য এই কড়াকড়ি একেবারেই ছিল না। বরং তারা যাতে দয়া করে হলে থাকেন এবং হলের ফুটবল টীমের অথবা নাট্যানুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেন, সেজন্য তাদের রীতিমত খাতির-তোয়াজ করা হতো।

এই ধরনের এক বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় আবদুর রহিম। আবদুর রহিম কর্মজীবনে বেশ কিছুদিন ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য প্রচার ও জনসংযোগ দফতরের অধিকর্তা। দীর্ঘকাল সাংবাদিক হিসেবে বাংলাদেশ অবজার্ভারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরশাদের আমলে তার ভাগ্য খুলে যায়। তাকে লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেস মিনিস্টার করে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরশাদের পতন হওয়ার পর আমরাও আশংকা করেছিলাম আবদুর রহিমের ভাগ্যশশীও সম্ভবত অস্তমিত হল। না, আবদুর রহিমের ভাগ্যশশীতে অমাবস্যার যোগ লাগেনি। লন্ডন থেকে বেকার অবস্থায় দেশে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই তার আরও পদোন্নতি হয়।

ফজলুল হক হলে এই আবদুর রহিম এবং আমি প্রায় পাশাপাশি রুমে থাকতাম। আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। কিন্তু রাজনৈতিক মতামতে ছিলাম এপাড়া ওপাড়ার বাসিন্দা। আমি ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একজন কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগের তখনকার মুজিব গ্রুপের সমর্থক। রহিম ছিলেন অবিভক্ত ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য এবং কট্টর বামপন্থী। ছাত্র হিসেব তিনি ছিলেন আমার এক বছরের সিনিয়র। ফজলুল হক হলে আবদুর রহিমের প্রতিপত্তি ও খাতির তোয়াজ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, ফজলুল হক হলের বার্ষিক নাটক অনুষ্ঠানে নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আবদুর রহিম একজন অপরিহার্য ব্যক্তি। নারী চরিত্রে তার অভিনয়ও ছিল অনবদ্য।

১৯৫৫ সালে ফজলুল হক হলের বার্ষিক নাটক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ' শেষ রক্ষা' নির্বাচনের পর অধ্যাপক নূরুল মোমেন (তখন তিনি হলের হাউস টিউটর) আমাকে ডেকে বললেন, গাফফার, তোমার বন্ধু আবদুর রহিমকে নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য রাজি করাও।

বললাম,স্যার, মাত্র কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাকা) বার্ষিক নাটক অভিনীত হয়েছে। তাতে এই প্রথমবারের মতো নারীরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আমরাও কি একই ব্যবস্থা করতে পারি না?

নূরুল মোমেন বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক নিয়ে বহু গোলমাল হয়েছে। শুধু একদল অভিভাবক নন, কোন কোন অধ্যাপকও গুরুতর আপত্তি তুলেছিলেন। তোমাদের নাটকেও 'কো এ্যাক্টিং'-এর ব্যবস্থা করতে চাইলে এই অসুবিধা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া নারী চরিত্রে অভিনয় করার মতো মেয়ে কোথায় তোমাদের হলে? সাবেরা, মাসুদা, জহরত আরা এরা সবাইতো সলিমুল্লাহ হলের 'এটাচড' ছাত্রী।

বললাম, প্রথম অসুবিধাটা কাটিয়ে উঠতে পারলে দ্বিতীয় অসুবিধার জন্য চিন্তা করি না। সলিমুল্লাহ হল থেকেই সাবেরা আপাদের গেস্ট অভিনেতা করে নিয়ে আসবো। তাদের রাজি করানোর ভার আমার উপর ছেড়ে দিন।

নূরুল মোমেন বললেন, তুমি এই প্রস্তাব তোমাদের হল কেবিনেটে (ছাত্র ইউনিয়ন) পাশ করাতে পারবে?

বললাম ঃ চেষ্টা করে দেখি।

হল কেবিনেটে এ প্রস্তাব পাশ করানো একটু কষ্টকর ছিল। কেউ যে এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন তা নয়; কিন্তু সকলেই ভয় করছিলেন, বিরুদ্ধ সামাজিক পরিবেশে ভদ্রঘরের মেয়েদের স্টেজে উঠাতে গেলে বড় রকমের কোনো গোলমাল না হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত সমর্থন এলো হলের তখনকার প্রোভস্ট ডঃ মযহারুল হকের কাছ থেকে। তিনি হল ইউনিয়নেরও প্রেসিডেন্ট। ডঃ মযহারুল হক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। রাজনৈতিক বিশ্বাসে কিছুটা মুসলিম লীগপন্থী; কিন্তু সামাজিক চিন্তায় উদারনীতিক। তিনি আমাদের কাছে প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন, 'আমার স্ত্রীকে বোরখা ছাড়াতে আমার দশ বছর চেষ্টা করতে হয়েছে।' তিনি বললেন, তোমরা যদি গোলমাল ঠেকাতে পারো, তাহলে নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নারীদের নির্বাচন করাই আমি ভালো মনে করি। পুরুষ দিয়ে নারী চরিত্রে অভিনয় করানো আমার কাছে 'ভাল্‌গার' মনে হয়।

হল কেবিনেটের সভায় এ ব্যাপারে কিছুটা আপত্তি তুলেছিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনসুর আলী। তিনি তখন ল' ক্লাসের ছাত্র। কিছু খুঁতখুঁতে স্বভাবের

লোক (জিয়ার আমলে সম্ভবত বস্ত্রমন্ত্রী হয়েছিলেন)। কিন্তু তার আপত্তি ভেসে গেল হল ইউনিয়নের স্পীকার মোহাম্মদ খোরশেদ আনোয়ারের (বিএনপি আমলের মন্ত্রী) জোরালো সমর্থনে। কেবিনেটের সদস্য আবদুস সালাম তালুকদার, আবু হেনা মোস্তফা কামালও কো এ্যাক্টিংয়ের পক্ষে সমর্থন জানালেন। কেবিনেটের বাইরেও আমাদের প্রস্তাব সমর্থন করার শক্তিশালী লবী ছিল। জিল্লুর রহমান (বর্তমানে আওয়ামী লীগের নেতা) ছিলেন আমাদের আগের ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তাছাড়া প্রভাবশালী ছাত্র। তিনি এবং রফিকুল ইসলাম (পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক) ছাত্র হিসেবে ফজলুল হক হলের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দিতেন না। তারাও সহ অভিনয়ের পক্ষে জনমত গড়ে তুললেন। ফলে হল কেবিনেটে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটা পাশ হল। বাকি রইল সাবেরা খাতুন, জহরত আরা ও মাসুদা চৌধুরীকে অভিনয়ে রাজি করানো। এটাও একেবারে সহজ কাজ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেজে এই প্রথম মুসলমান ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে অভিনয় করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে চরিত্র হননমূলক অপপ্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমাদের নাটকে অভিনয়ে তাদের রাজি করানোর জন্য রফিকুল ইসলাম সাহায্য জোগাতে এগিয়ে এলেন। বললেন, সাবেরাকে আপনিই রাজি করাতে পারবেন। মাসুদাকে আমি বলবো। জহরত আরাকে অন্য কাউকে দিয়ে বলান। আমি তাকে বলতে চাই না।

জহরত আরা এখন বৃটেনে বাস করেন। বহু বছর আগে বিদেশী স্বামীর সঙ্গে দেশ ছেড়েছেন। ছেড়েছেন অভিনয়ের জগৎ। কিন্তু বাংলাদেশের সেই কট্টর রক্ষণশীল পাকিস্তানী আমলে সমাজের সকল বাধা বিপত্তি ও রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে যে ক'জন মুষ্টিমেয় তরুণী অভিনয় জগতে এসে ঢুকেছিলেন, তাদের মধ্যে জহরত আরা একজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেও দুঃসাহসী ও দুর্মুখ বলে তার খ্যাতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র একবার তার প্রেমে পড়েছিলেন। মুখ ফুটে জহরত আরাকে সে কথা বলতে না পেরে তিনি গোপনে তাকে চিঠি লিখেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন তখন বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের একটা অংশ জুড়ে ছিল। একদিন এই কলা ভবনের গেটে ছাত্রটি আকস্মিকভাবে জহরত আরার মুখোমুখি হয়ে গেলেন। জহরত আরা বান্ধবী পরিবেষ্টিত অবস্থায় গেটের বাইরে যাচ্ছিলেন। ছাত্রটিকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তাকে ডেকে উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'শুনুন, শুনুন। আপনার প্রেমপত্র পেয়েছি। সবই লিখেছেন। কিন্তু আমার প্রেমে পড়ার কি কি যোগ্যতা আপনার আছে, তাতো লেখেননি।' ছেলেটি সকলের সামনে ধরা পড়ে একেবারে কাঁচুমাচু। প্রথম প্রেমের ভীরু উচ্চারণ তার কণ্ঠ থেকে আর শব্দ হয়ে বের হল না। তিনি পালিয়ে বাঁচলেন। সম্ভবতঃ জহরত আরাকে আর কোনদিন চিঠি লেখার দুঃসাহস দেখাননি।

এই জহরত আরার কাছে আমাকে যেতে হবে। এ যেন অনেকটা বাঘের খাঁচায় ঢোকা। ওবায়েদ উল হক সরকার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী অভিনেতা। আমার সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তিনিও সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র। আমার হয়ে জহরত আরাকে অনুরোধ জানাতে তিনিও রাজি হলেন না। তখন একদিন দুঃসাহসে ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে আমতলায় তার শরণাপন্ন হলাম। 'শেষ রক্ষা' নাটকে তাকে অভিনয়ের আমন্ত্রণ জানাতেই আমাকে বিস্মিত করে এক কথায় তিনি রাজি হলেন। বললেন, কিন্তু আমি তো থাকি পুরনো ঢাকায় (তিনি তখন বাবা-মায়ের সঙ্গে কায়েতটুলিতে থাকেন)। নিশ্চয় আপনাদের নাটকের রিহার্সাল চলবে ভিকছুদিন এবং তা ফজলুল হক হলে অথবা কার্জন হলে। আমার যাওয়া আসার রিকশা ভাড়া পাবো তো?

তা পাবেন, বললাম।

জহরত আরা বললেন, তারপরও কথা আছে। নিশ্চয়ই বিকেলে আপনাদের রিহার্সাল শুরু হবে। আমি একাই তখন রিকশা চড়ে হলে যেতে পারবো। কিন্তু রিহার্সাল শেষ হতে সন্ধ্যা কিংবা রাত হবে। তখন আমি একা একা রিকশায় বাসায় ফিরি তা আমার বাবা-মা পছন্দ করবেন না। জানেন তো পুরনো ঢাকার অবস্থা। প্রতিবেশীরা নানা কথা রটাবে।

বললামঃ তা নিয়েও ভাববেন না। দরকার হলে হল থেকে কাউকে আপনার সঙ্গে বাড়ি পৌছে দিতে পাঠাবো।

ঃ চেনাজানা নেই এমন কাউকে নিয়ে আমি রিকশায় রাত বিরেতে বাসায় ফিরবো? জহরত আরা বলে উঠলেন।

তাকে অভয় দিলাম ঃ তাহলে আপনার সঙ্গে আমি থাকবো রিহার্সাল শেষে বাড়ি পৌছে দিতে।

জহরত আরা বললেন, তারপর রিকশার মধ্যে আমাকে একা পেয়ে প্রেম নিবেদন করবেন নাতো?

এ মুখরা মহিলার কথা শুনে সেদিন আমি কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। একবার ইচ্ছে হয়েছিল, নারী-পুরুষ সহঅভিনয়ের এ মহৎ প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে আবদুর রহিমের কাছেই আবার ফিরে যাই; তাকে বলি, এ বছরেও আপনাকে হলের নাটকের নারী চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। মনে আছে, বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করেছিলাম। হেসে বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে আমি রিকশায় চাপবো না। হল ইউনিয়নের বেয়ারা আলী হোসেনের একটা সাইকেল আছে। সাইকেলটা ইউনিয়নেরই। আমিই ওটায় চেপে সারা ঢাকায় ঘুরে বেড়াই। ওই সাইকেলে চেপে রিহার্সাল শেষে আপনার রিকশার পেছনে পেছনে যাব এবং আপনাকে বাসায় পৌছে দিয়ে ফিরে আসবো।

আমি জহরত আরাকে দেয়া এ প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। নাটকের রিহার্সালের শেষ দিকে তার অনুরোধেও রিকশায় তার পাশে গিয়ে আর বসিনি।

ছয়

আমার মতে, পঞ্চাশের দশকে ঢাকার সবচাইতে মঞ্চসফল নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পন'। সাংবাদিক ইউনিয়ন কার্জন হলে এ নাটকটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। নারী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নারীরাই। সকলের অভিনয়ের কথা মনে নেই, তবে সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমানের অভিনয়ের কথা মনে আছে। হৃদরোগে অকালে এ প্রতিভাবান সাংবাদিক ও অভিনেতা মারা যান। তিনি নাটক-পাগল ছিলেন। ঢাকা বেতারের নাটকে নিয়মিত অংশ নিতেন। তখন ঢাকায় সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক বছরে দু'একটার বেশি নাটক মঞ্চস্থ হত না। টেলিভিশন তো ছিলই না। নাটক বলতে বেতার-নাটকই। এই নাটক লিখতেন কবি শাহাদাত হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, শামসুদ্দিন আবুল কালাম, নাজির আহমদ, সাঈদ আহমদ, নূরুল মোমেন, কবির চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, আশরাফউজ্জামান (বড় জামান নামে পরিচিত), ফতেহ লোহানী,সাঈদ সিদ্দিকি (পরে ভয়েস অব আমেরিকায় যোগ দেন), আসকার ইবনে শাইখ এবং কাজী নুরুস সোবহান। আরও দু'চারজনের নাম আমি এখন স্মরণ করতে পারছি না। কবি ফররুখ আহমদও বেতার শিল্পীদের অনুরোধে একাধিক নাটক লিখেছেন।

বেতার-নাটকে অভিনয় করে তখন যারা নন্দিত ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন বলে আমার মনে পড়ে তাদের মধ্যে আছেন, কাজী নুরুস সোবহান পাঠক মুজিবুর রহমান, রণেন কুশারী, কাফী খান, শরফুল আলম, ফতেহ লোহানী, কাজী আবদুল খালেক এবং নুরুল আনাম খাঁ। নারীদের মধ্যে অভিনয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন লিলি চৌধুরী, লিলি খান, হোসনে আরা, মনিমুন্নেসা, নুরুন্নাহার, রোকেয়া কবির, মাধুরী চ্যাটার্জি, মিসেস করিম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই অপেশাদার অভিনেতা হিসেবে নাম করেন গোলাম মোস্তফা, রফিকুল ইসলাম, জিল্লুর রহমান খান, বজলুল করিম, মমতাজ উদ্দিন, আবিদ হুসেন, সাবেরা খাতুন, জহরত আরা এবং মাসুদা চৌধুরী।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আরও শক্তিশালী এবং আধুনিক নাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। শক্তিশালী নাট্যকার, অভিনেতা ও কলাকুশলীদের হাতে নাটকের বিষয়বস্তু, অভিনয় কৌশল, মঞ্চসজ্জা, টেকনিক সবকিছু বদলাতে শুরু করে। রামেন্দু

মজুমদার, ফেরদৌসী, আলি যাকের, সারা জাকের, আবদুল্লা আল মামুন, সেলিম আল দীন, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ প্রমুখ বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যশিল্পে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন বলা চলে। তিরানব্বুইয়ের জানুয়ারীতে একমাস ঢাকায় থাকার সময়ে থিয়েটার, ঢাকা থিয়েটার, নান্দনিক, আরণ্যক, ড্রামা সার্কেল, নাগরিক প্রভৃতি নাট্যসংস্থা এবং লিয়াকত আলী লাকির পরিচালনায় গঠিত লোক সংস্কৃতি গ্রুপের তৎপরতায় নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচিশীল সংস্কৃতিমনা অংশের উজ্জীবন ও বিকাশ লক্ষ্য করেছি। নিম্নরুচির নব্য শিক্ষিতের বাণিজ্যিক লোলুপতার পঙ্কে নিমজ্জিত যাত্রা, থিয়েটার,চলচ্চিত্রের পাশাপাশি সুস্থ লোক-সংস্কৃতির আত্মরক্ষা এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলাও আমাকে বিরাটভাবে আশাবাদী করেছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ফলে ঢাকার নাটক নতুন মাত্রা এবং গতিময়তা লাভ করে। সৈয়দ শামসুল হক একজন কবি এবং গল্প লেখক, সেই সঙ্গে একজন জনপ্রিয় নাট্যকারও। তিনি এক সময়ে টেলিভিশনে বহু ছোটগল্প নাটকের ফর্মে দর্শকের কাছে উপস্থাপন করে চমক সৃষ্টি করেছিলেন। আসাদুজ্জামান নূর, হুমায়ুন ফরিদি, সুবর্ণা মোস্তফা, রাইসুল ইসলাম আসাদ, আবুল হায়াত, বিপাশা হায়াত, শমী কায়সার, পীযুস বন্দোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতাদের নিয়ে আমাদের নাট্য-শিল্প এখন নিশ্চয়ই গৌরব করতে পারে। "একাত্তরের যীশু" নামক ছায়াছবির পরিচালক নাসিরউদ্দিন ইউসুফ নাটক পরিচালনাতেও সমধিক খ্যাত। লন্ডনে তার 'একাত্তরের যীশু' ছবিটি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। মনে হয়েছে শুধু নাটকে নয়, চলচ্চিত্রেও আমরা উন্নত আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি পৌঁছাতে শুরু করেছি। ছবিটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নয়, তার একটি বিশেষ মুহূর্ত, মেজাজ, ও আবেদনকে নিয়ে তৈরি। ঠিক এমনি একটি ছবি স্টেইনবেকের 'মুন ইজ ডাউন' উপন্যাস নিয়ে তৈরি ইংরেজি ছবি। নাৎসি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের একটি বিশেষ দিক, একটি বিশেষ চরিত্র নিয়ে লেখা 'মুন ইজ ডাউন'। 'একাত্তরের যীশু' দেখতে গিয়ে বার বার মনে পড়েছে 'মুন ইজ ডাউন' ছবির কথা। আমার তো মনে হয়েছে শিল্প কুশলতায় 'একাত্তরের যীশুর' আবেদন তুলনামূলকভাবে বেশি। বাংলাদেশে ছায়াছবির প্রতিভাবান ও প্রগতিশীল তরুণ পরিচালকদের কত বাধা বিপত্তি, সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়, ছক-বাঁধা পথে হাঁটতে হয়, সরকার ও সেন্সর বোর্ডের খামখেয়ালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এগুতে হয়, তা আমার জানা আছে বলেই 'একাত্তরের যীশু' সম্পর্কে এই মন্তব্যটি করতে কোনো দ্বিধা অনুভব করছি না।

আমার এই লেখা কোনো ইতিহাস নয়। বলা চলে, সতেরো বছর পর মাত্র একমাসের জন্য দেশে ফিরে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি, যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি,

তারই কিছু বিবরণ। সেই সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এসে মিশেছে অতীতের কিছু স্মৃতিকথাও। যে স্মৃতিকে এড়িয়ে বর্তমানকে দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই পঞ্চাশের দশকের কথায় আবারও ফিরে যাই।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় বেতার নাটকে যার কণ্ঠ এবং অভিনয় আমাকে সবচেয়ে বেশি দোলা দিতো, তিনি হোসনে আরা। তখনকার তরুণ এবং জনপ্রিয় কথাশিল্পী শামসুদ্দিন আবুল কালাম তখন বরিশালে থাকার পাট চুকিয়ে ঢাকায় চলে এসেছেন। যোগ দিয়েছেন ঢাকা বেতারে। আমিও মেট্রিক পাস করে ঢাকায় এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছি। বরিশালে শামসুদ্দিন আবুল কালাম আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন শামসুদ্দিনদা' (সে কাহিনী এই বইয়ের প্রথম পর্বে লিখেছি) নামে। তাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করেই কৈশোরে আমার গল্প লেখা শুরু। বরিশালে তার কাছে আমি নিয়মিত যেতাম। আমি তার ভক্ত ছিলাম। ঢাকায় এসেও তার সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় দেরি করিনি। শুনলাম, তিনি বিয়ে করেছেন এবং হোসনে আরাকেই। ভালোবাসার বিয়ে। শামসুদ্দিনদা'র বেতার নাটকে মাঝে মাঝে হোসনে আরার কণ্ঠ শুনতে পাই। তাতে আরও খুশি হয়ে উঠি।

শামুসুদ্দিনদা' বিয়ে করে আজিমপুর কলোনীর একটা ফ্লাটে উঠেছিলেন। একদিন বেতার ভবনে দেখা হতেই (ঢাকা বেতারের ভবন তখন ছিল পুরনো ঢাকায় নাজিমউদ্দিন রোডে) বললেন, গাফ্‌ফার তুমি একদিন আমার বাসায় এসো। আমার স্ত্রীকেও দেখে যাও। তুমি তো তারও অভিনয়ের ভক্ত বলে শুনছি।

বললাম, ঠিকই শুনেছেন শামসুদ্দিন দা। আমি রেডিওতে তার কণ্ঠস্বর শুনেই মনে মনে তার একটা ছবি তৈরি করে নিয়েছি।

শামসুদ্দিনদা' বললেন, বলোত সে দেখতে কি রকম?

বললাম, লম্বা, ছিমছাম, কোমর অব্দি ছাড়ানো কালো চুল, টানা চোখ।

শামসুদ্দিনদা' হেসে ফেললেন। বললেন, তোমার কল্পনাশক্তির সত্যি তারিফ করতে হয়। কিন্তু ওর গায়ের রঙটা একটু ময়লা।

বললাম, আমি গায়ের রঙ নিয়ে মাথা ঘামাই না। আপনার রেডিওতে 'ডে অফ' কবে বলুন আমি সেদিন আপনার বাসায় আসবো।

শামসুদ্দিনদা' একটা দিনের কথা বললেন। ঠিক হল, সেদিন সন্ধ্যায় তার বাসায় আমি যাব।

স্ত্রী সম্পর্কে কথা বলার সময় শামসুদ্দিনদা'র চোখে মুখে একটা উর্জ্জ্বল আভা আমি লক্ষ্য করেছি। বুঝতে বাকি রয়নি, স্ত্রীর প্রতি তার মনে অগাধ ভালবাসার যে উপস্থিতি এটা তারই প্রতিফলন।

আজিমপুর কলোনীতে শামসুদ্দিনদা'র ফ্লাটটি ছিল দোতলায়। নির্ধারিত দিনে

সন্ধ্যার দিকে গিয়ে হাজির হলাম। নীচে গেটের কাছেই শামসুদ্দিনদা'র দেখা মিললো। তিনি আমাকে দেখে বললেন, ওহ, তুমি এসেছো, চলো উপরে যাই।

উপরে উঠতে গিয়ে সিড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, গাফ্‌ফার, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। তুমি আমাকে শামসুদ্দিনদা' না ডেকে এখন থেকে কালাম ভাই ডেকো। ঢাকায় আমাকে তোমার বয়সী বন্ধুরা কালাম ভাই ডাকে।

বললাম, বরিশালে আমরা সকলে আপনাকে শামসুদ্দিনদা' ডাকতাম। এই নামে আমার মনে আপনার যে ইমেজ তৈরি হয়ে রয়েছে, কালাম ভাই নামে ডাকতে গেলে তা নষ্ট হয়ে যাবে।

শামসুদ্দিনদা' বললেন, তা যাক। বরিশালের সেই ইমেজ আমি বদলাতে চাই। সেই ইমেজে এখন আমার বিশ্বাস নেই।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, শামসুদ্দিনদা' তাই হবে। তবে এত বছরের অভ্যেস, পাল্টাতে একটু সময় লাগবে; আমাকে একটু সময় দেবেন।

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। হোসনে আরা বাসাতেই ছিলেন। পরিচয় হতেই তিনি খুশি হয়ে আমার জন্য চা নাশতা নিয়ে এলেন। শামসুদ্দিনদা সম্ভবত ক্লান্ত ছিলেন। তিনি জামাকাপড় বদলে এসে ড্রয়িংরুমে পাতা ছোট খাটটায় সোজা শুয়ে পড়লেন। হোসনে আরা তার পায়ের কাছে বসে পায়ের আঙ্গুল টেনে দিতে লাগলেন। আমার কাছে এ দৃশ্যটা মনে হল, তাদের একান্ত আপন ভুবনের। সেখানে আমার উপস্থিতি ছিল সত্যি সত্যি বেমানান।

হোসেনে আরার সঙ্গে তারপর বহুবার দেখা হয়েছে। তার অভিনয়ও দেখেছি। মনে মনে ভেবেছি, ঢাকায় ছায়াছবি তৈরি শুরু হলে হোসনে আরা নিশ্চয়ই হবেন এই নতুন চলচ্চিত্র শিল্পের চন্দ্রাবতী অথবা যমুনা। এই দু'জনেরই মতো তার সৌন্দর্য্য, ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠ-মাধুর্য। অভিনয় নৈপুন্যও চমৎকার। শামসুদ্দিন আবুল কালামের মতো শক্তিশালী কথাশিল্পী যদি হন ঢাকার ছবির কাহিনীকার, তাহলে হোসনে আরা হবেন সেই ছবির নায়িকা। কলকাতার সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায় ও নায়িকা বিনতা বসুর জুটির ('উদয়ের পথে' চলচ্চিত্রখ্যাত) মতো ঢাকার এই জুটিও আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পকে নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

তিরানব্বুইয়ের জানুয়ারীতে ঢাকায় এক বন্ধুর বাড়িতে ক্যাসেটে ধরে রাখা টেলিনাটকে সুবর্ণা মোস্তফার অভিনয় দেখতে গিয়ে আমার কৈশোর ও প্রাক যৌবনের এসব কল্পনা ও ফ্যান্টাসি আবার মনে ভেসে উঠেছে। মাঝে মাঝেই ভ্রম হয়েছে, হোসনে আরাই বুঝি যৌবনে ফিরে গিয়ে অভিনয় করছেন। হোসনে আরার মেয়ে সুবর্ণা। কিন্তু কে বেশি সুন্দরী? অভিনয় নৈপুণ্য বেশি কার? কেউ যদি আমাকে এ প্রশ্ন

করেন, আমি তার সঠিক জবাব দিতে পারবো না। কারণ, আমার চোখে অতীতের ঘোরটাই বেশি লেগে রয়েছে।

শামসুদ্দিন আবুল কালামের রেডিওর চাকরি বেশিদিন টেকেনি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি অথবা শেষদিকে তিনি রেডিও ছেড়ে দেন। চাকরি ছাড়ার পর তার সঙ্গে আকস্মিকভাবে একদিন দেখা ঢাকার ওসমানিয়া লাইব্রেরীর মালিক নূরুল ইসলামের বাসায়। নূরুল ইসলাম ছিলেন শামসুদ্দিনদা'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার বাসায় শামসুদ্দিনদা'কে দেখে আমার কষ্ট হল। কিছুটা বিব্রত ও বিভ্রান্ত চেহারা। বললেন, ঠিক করেছি, আর চাকরি করবো না। শুধু বই লিখে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবো। নূরুল ইসলাম আমার সবগুলো বই প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সত্যি সত্যি তিনি কেবল গল্প-উপন্যাস লিখে সেই দুর্দিনে এবং ঢাকার প্রকাশনা শিল্পের সেই শৈশবে টিকে থাকার চেষ্টা করেছেন। নূরুল ইসলাম নিজের কথা রেখেছেন। শামসুদ্দিন আবুল কালামের একটার পর একটা বই প্রকাশ করেছেন। তারপরও শামসুদ্দিনদা'কে দেশে রাখা গেল না। নূরুল ইসলামের কাছেই শুনলাম, হোসনে আরার সঙ্গে তার বেশ কিছুকাল আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে (কথাটা আমার জানা ছিল না) এবং শামসুদ্দিন আবুল কালাম দেশত্যাগের পরিকল্পনা করছেন।

শামসুদ্দিন আবুল কালামের দেশত্যাগের আগে তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা ওসমানিয়া লাইব্রেরীতে। তার রুক্ষ ও উদভ্রান্ত চেহারা দেখে তার হাত চেপে ধরে আমার একবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, শামসুদ্দিন দা' মাইকেল ও মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পরিণতি নিজের জীবনে টেনে আনবেন না। দোহাই আপনার, আপনি 'হাইলি ইমোশনাল' লোক। এই 'ইমোশন' সংযত করুন। বাংলাদেশ আপনার মতো শক্তিশালী কথাশিল্পীকে হারাতে পারে না।

কথাটা শেষ পর্যন্ত বলা হয়নি। বিদায় নেবার সময় শামসুদ্দিনদা' বললেন, আমি শিগগির ইউরোপে চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে বহুদিন হয়তো আর দেখা হবে না। আমার মেয়ে ক্যামেলিয়া হোসনে আরার কাছে রইলো। মোস্তফা ছেলেটি ভালো। আশা করি সে তার কোনো অযত্ন করবে না।

এই মোস্তফা হল অভিনেতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের ছাত্র গোলাম মোস্তফা। আমার সহপাঠী এবং বন্ধু। তারও বাড়ি বরিশালে। সম্ভবতঃ অভিনয়ের মঞ্চই হোসেন আরাকে তার দিকে টেনে এনেছে, সে তার দিকে এগিয়ে গেছে। ফজলুল হক হলে সে আমার পাশের রুমে এসে প্রায়ই রাত কাটাতো। তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা। এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তার সঙ্গে হোসনে আরার বিয়ে আমি মনে মনে প্রথম দিকে মেনে নিতে পারিনি। আমাদের

মধ্যে একটা অন্তরাল সৃষ্টি করে যেন দাঁড়িয়ে থাকতেন শামসুদ্দিনদা'। তারপর ধীরে ধীরে সেই অন্তরালটি দূর হলো। মনে মনে ভাবলাম, আমি যা চাই, তাই যে পৃথিবীতে সব সময় ঘটবে, এমনতো কোনো কথা নেই। সুতরাং যা ঘটবেই, যা অপ্রতিরোধ্য, তাকে মেনে নেওয়াটাই ভালো। মোস্তফাও একদিন বললো, গাফ্ফার তুই একদিন আমার বাসায় আয়। এত দূরে দূরে থাকিস কেন? আমি তো তোর বন্ধু।

মোস্তফা আর হোসনে আরা তখন নীড় বেঁধেছেন নতুন ঢাকার ভূতের গলির এক বাসায়। সম্ভবতঃ একতলা বাড়ি। সামনে লম্বা ঘাসে ঢাকা চত্বর। একদিন মোস্তফা সঙ্গে করে নিয়ে গেল সেই বাসায়। ক্যামেলিয়া তখন ছোট। সুবর্ণার কি জন্ম হয়েছে? হয়ে থাকলে সে তখন দোলনায়। হোসনে আরা আমাকে দেখে খুশি হয়েছেন মনে হল। সেই আজিমপুর ফ্লাটে দেখা হওয়ার মতো দৌড়ে গিয়ে চা বিস্কিট নিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন?

বললামঃ ভালো আছি। আপনি?

ঃ ভালো। হোসনে আরা বললেন।

ঃ অভিনয় করা কি ছেড়ে দিলেন? হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

হোসনে আরা তার সেই টানা আয়ত চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, কি জবাব দিয়েছিলেন, আজ আর মনে নেই।

লিখতে বসেছিলাম পঞ্চাশের দশকের নাটকের কথা। কলম টেনে নিয়ে গেল প্রায় তিন দশক আগের এক নাটকীয় জীবনের স্মৃতির গুহায়। সেক্সপিয়র তো বলেছেন, আমাদের জীবনও আসলে নাটকের মঞ্চ; আর আমরা তার 'পুত্তর প্লেয়ার'; হতভাগ্য অভিনেতা।

সাত

পঞ্চাশের দশকে ঢাকা শহরের এক প্রবাদসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন হবিবুলাহ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের শ্যালক এবং তার ব্যক্তিগত মুখ্য সচিব। এমন আমুদে, দিলদরিয়া মানুষ আমি কম দেখেছি। সারাদিন সরকারী কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সন্ধ্যার পর ঢাকা ক্লাবে গিয়ে হুইস্কির বোতল নিয়ে বসতেন। নিজে খেতেন, বন্ধুবান্ধবদেরও খাওয়াতেন। ঢাকার তখনকার বহু জাঁদরেল সম্পাদকের এবং কাগজের মালিকেরও মদ খাওয়ার পয়সা ছিল না। ঢাকা ক্লাবের সদস্য হওয়ার সাহস অথবা সামর্থ্যও ছিল না। তারা প্রায়ই ঢাকা ক্লাবে হবিবুল্লাহর 'গেস্ট' হতেন এবং তার পয়সায় আশ মিটিয়ে মদ খেতেন।

এই হবিবুল্লাহকে একদিন ধরলেন কাজী নুরুস সোবহান। নুরুস সোবহান তখন দেশে বাস করছেন এবং নাটক রচনা ও পরিচালনায় ব্যস্ত। ১৯৫৪ সালের গোড়ার কথা। তিনি ঠিক করলেন, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন এবং তাতে শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান পরিবারের মেয়েদের দ্বারা নারী চরিত্রে অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকবে। ঢাকায় 'আপওয়ার' (বর্তমানে মহিলা সমিতি) হলটি তখন সম্ভবত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা চলায় কার্জন হল পাওয়া গেল না। মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটের মঞ্চটি ছোট। নুরুস সোবহান ঠিক করলেন, সদর ঘাটের 'রূপমহল' সিনেমা হলে নাটকটি তারা অভিনয় করবেন। প্রথমেই গোল বাঁধলো মঞ্চ নিয়ে। 'রূপমহলে' ছবি দেখানোর স্ক্রিন খাটানোর স্টেজ ছিল, কিন্তু নাটক করার মতো সুপরিসর মঞ্চ ছিল না। স্ক্রিনের একটু পেছনেই একটি বড় ইটের দেয়াল। মঞ্চ বড় করতে হলে সেটি ভাঙতে হয়। কিন্তু সরকারী জায়গা বলে সেই দেয়াল ভাঙার অনুমতি পাওয়া সহজ নয়। তাছাড়া সদরঘাটের মতো এলাকায় পুরনো শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে নারী পুরুষের সহ অভিনয়ের ব্যবস্থা! একটা বড় রকমের গন্ডগোল না হয়। হলে তা কে ঠেকাবে?

অনেক ভেবেচিন্তে কাজী নুরুস সোবহান মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্যসচিব হবিবুল্লাহর শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু তার মনে ক্ষীণ আশা। হবিবুল্লাহ যতই দিল- দরাজ, মুক্ত মনের মানুষ হোন, তার 'বস' এবং আত্মীয় নুরুল আমিন কট্টর রক্ষণশীল। তার উপর মুসলিম লীগ সরকারের প্রধান। সামনে প্রদেশের সাধারণ নির্বাচন। তিনি গোঁড়া মুসলমান ভোটারদের চটাতে চাইবেন না। হবিবুল্লাহ কি পারবেন তাকে নরম করতে?

কাজী নুরুস সোবহানের কাছে সব কথা শুনে হবিবুল্লাহ প্রচন্ড শব্দ করে হেসে বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না; নাটকের রিহার্সাল শুরু করে দিন।

ঃ মুখ্যমন্ত্রীর কানে যদি কথাটা যায়? নুরুস সোহবান বল্লেন।

ঃ গেলে কি হবে? তার আবার একটা 'কিচেন কেবিনেট' আছে না? হবিবুল্লাহ আগের মতোই হাসতে হাসতে বললেন।

দেখা গেল, দু'দিনের মধ্যেই 'রূপমহল' সিনেমার স্টেজের পেছনের দেয়ালটি ভেঙে ফেলার অনুমতি জোগার হয়েছে। ফলে দ্রুত বড় মঞ্চ তৈরি করা সম্ভব হল। নাটক অভিনয়ের দিন হলের বাইরে লাঠিধারী দু'চারজন পুলিশকেও দেখা গেল ঘোরাঘুরি করতে। তাই শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আর দেখা দিল না। 'রূপমহল' হলের ভেতরে একেবারে সামনে রাখা আসনে সদলবলে বসে হবিবুল্লাহ অভিনয় উপভোগ করলেন।

বাংলা একাডেমির পুরনো ভবনটিই ছিল একসময় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের

সরকারী বাসভবন। সামনে গেটের কাছে ছিল একটি চৌকিঘর। নুরুল আমিনের সঙ্গে যেসব আর্থি-প্রার্থী দেখা করতে আসতেন, তারা এ চৌকি ঘরের 'রিসেপসন রুমে' আগে ঢুকতেন। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বেশ কিছুকাল পর আইয়ুবের ফৌজি জমানায় কুদরতুল্লা শেহাব ও আলতাফ গওহরের ব্রেইন-চাইল্ড রাইটার্স গিল্ডের অফিস ছিল এটা। এখন এই চৌকি ঘরটি নেই। নূরুল আমিনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে এই ঘর থেকে সেন্ট্রি ও রিসেপসনিস্টদের কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে দিয়ে হবিবুল্লাহ মাঝে মাঝে আড্ডা বসাতেন। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে আমাকেও দেখা করতে হয়েছে। তখনকার একজন অল্পবেতনের জুনিয়র সাংবাদিক হিসেবে তিনি আমাকে কখনো অবজ্ঞা বা উপেক্ষার ভাব দেখাননি।

পঞ্চাশের দশকের ঢাকায় কেবল যে পুরুষরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তা নয়; নারীরাও পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ১৯৫৪ সালের একেবারে গোড়ায় ঢাকায় 'ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক এন্ড ডান্স ফেস্টিভাল' অনুষ্ঠিত হয়। এই 'ফেস্টিভালের' অংশ হিসেবে অভিনিত হয় 'বেদের মেয়ে' নাটকটি। এটা ছিল পুরুষ বর্জিত অভিনয়। নারীরা নারী পুরুষ সকল চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যারা পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম মনে আছে। লায়লা আর্জুমান বানু, খালেদা ফ্যান্সি খানম (বর্তমানে খালেদা মনজুরে খুদা), জহরত আরা। বলাবাহুল্য, এই ফেস্টিভালের পেছনেও হবিবুল্লাহর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল।

আমার এই লেখা পড়ে কেউ যেন মনে না করেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেই ঢাকায় নাটক-থিয়েটারের যাত্রা শুরু এমন কথা আমি বলতে চাচ্ছি। আসলে বাংলা ভাগ হওয়ার আগে ঢাকার নাট্যমঞ্চও ছিল কলকাতার মতো প্রায় সমমান সম্পন্ন। তবে তার পৃষ্ঠপোষক হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তখন নারী পুরুষের সহঅভিনয়ও চালু ছিল। ভদ্র হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত মেয়েরা শেষদিকে অভিনয়ে অংশ নিতে শুরু করেছিলেন। তাদের আগে নাচেগানে অভিনয়ে পারদর্শী বাইজি এবং রক্ষিতা শ্রেণীর নারীরাই ঢাকার নাট্যমঞ্চ সজীব রেখেছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বড় অংশের দেশত্যাগের ফলে ঢাকায় এবং সারা পূর্ব বাংলাতেই নাটকচর্চায় প্রায় শূণ্যাবস্থা দেখা দেয়। তবে পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে এই শূন্যাবস্থা কাটতে থাকে এবং এই শূণ্যাবস্থা পূর্ণ করতে উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ অংশ সকল সামাজিক বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসেন।

চুয়ান্ন সালের গোড়ায় ঢাকার সদরঘাটের 'রূপমহল' সিনেমার স্টেজের পেছনের, পাঁচিল ভেঙে যে বড় মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল তাতে অভিনীত হয়েছিল তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটক। তখন কি কেউ জানতেন, এই নাটক অভিনয়ের পর চার বছর না

ফুরুতেই এই মঞ্চে আরও একটি বড় নাটকের অভিনয় হবে এবং সেটি এক রাজনৈতিক নাটক? মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আনুষ্ঠানিক জন্ম 'রূপমহল' সিনেমার এই মঞ্চেই। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে ন্যাপের (অবিভক্ত) জন্মলাভের এই সভায় এই একই মঞ্চে অভিনেতাদের বদলে বসা ছিলেন নেতারা। তাদের মধ্যে ছিলেন মওলানা ভাসানী, সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফ্ফার খান (বাদশা খান), ওয়ালি খান, মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, গউস খান বেজেঞ্জো এবং আতাউল্লা খান মেঙ্গল।

ষাটের দশকের গোড়ায় আমি যখন 'দৈনিক আজাদে' কাজ করি, তখন প্রতি সপ্তাহে 'বিচিত্র জীবন' নামে একটি ফিচার লিখতাম। বিভিন্ন পেশার মানুষের মাঝখান থেকে বেছে একটি বিচিত্র চরিত্র এই ফিচারে তুলে ধরা হতো। আমার সঙ্গে থাকতেন 'আজাদে'র তখনকার স্টাফ-ফটোগ্রাফার ফিরোজ। তার কাজ ছিল, আমি যে চরিত্রটিকে নিয়ে লিখছি, তার ছবি তোলা।

এই 'বিচিত্র জীবনের' চরিত্র খুঁজতে গিয়েই একদিন জানতে পারলাম, ঢাকার পতিতাপাড়া সাঁচিবন্দরে এক প্রবীণ মহিলা আছেন, যিনি এক সময় ঢাকার মঞ্চে নায়িকা চরিত্রেও অভিনয় করেছেন। তার আসল নাম কি জানা নেই। পাড়ার পতিতাদের কাছে তিনি সুধামাসী। অনেক চিন্তাভাবনার পর দ্বিধা এবং লোক লজ্জার ভয় কাটালাম এবং এক দুপুরে আগে খবর দিয়ে ফিরোজকে নিয়ে সুধামাসীর বাসায় গিয়ে হানা দিলাম।

সাঁচিবন্দর খুব প্রশস্ত গলি নয়। একটা মুখ পেরিয়ে বাদামতলির দিকে যাওয়া যায়। লাগোয়া আরও দু'একটি গলি। তখন কোনো কোনো বাড়ির সামনে লেখা দেখেছি 'গৃহস্থ বাড়ি'। অর্থাৎ এই বাড়িটি পতিতাদের নয়। ভাঙা জীর্ণ ছোট ছোট খুপড়ির মতো সেকেলে দালান। দোতলা তেতলাও রয়েছে কোনো কোনো ঘরে। সুধামাসীর ঘরটি দোতলায়। তখন তার বয়স পঞ্চাশের নীচে। শরীরে ভাঙন ধরেনি। চওড়া কপাল, তাতে লাল টকটকে সিঁদুর। উজ্জ্বল ফর্সা রঙ। পান খেয়ে ঠোঁট লাল। পরনে চওড়া লাল পাড়ের শাড়ি। সুধামাসী যে এককালে খুবই সুন্দরী ছিলেন, তাতে সন্দেহ ছিল না।

সুধামাসীর ঘরটিও খুবই পরিচ্ছন্ন। কাঠের চৌকির উপর ধবধবে সাদা চাদর। তার উপর তাকিয়া। দেয়ালের তাকে গনেশ মূর্তি, দেয়ালে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির ছবি। সুধামাসী মাটিতে মাদুর পেতে বসেন। একপাশে পানের থালা। চৌকির পাশে একটা টেবিল এবং তিনটে ছোট ছোট চেয়ার। আমি ও ফিরোজ দুটি চেয়ার দখল করলাম। সুধামাসী বললেন, আপনাদের কি খেতে দেই ভাই?

বললাম, আমরা খেতে আসিনি। আপনার সঙ্গে দু'চারটা কথা বলেই চলে যাব। আর আমার এই বন্ধুকে দেখছেন সঙ্গে, সে আপনার একটি দুটি ছবি তুলবে।

সুধামাসী একটু ইতস্ততঃ করলেন, মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমার ঘরে দেবতার প্রসাদ আছে। নারকেলের নাড়ু আর সন্দেশ। কোনো অশুচি নেই তাতে। দুটো এনে দি? আর বাইরের দোকান থেকে চা।

তার করুণ চেহারার দিকে চেয়ে না বলতে ইচ্ছে করল না। বললাম, ঠিক আছে, খাবারটাই আগে দিন।

খাওয়ার শেষে ফিরোজ দুটো 'স্নাপ' নিলেন তার ক্যামেরায়। সুধামাসী মাথায় ঘোমটা টেনে বসেছিলেন। এবার ঘোমটামুক্ত হয়ে পান মুখে দিলেন। বললেন, আমি কি বলবো, বলুন?

আপনি কি ছোটবেলা থেকেই অভিনয় শুরু করেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

ঃ না। এ লাইনে আসার পর শুরু করি। ঢাকার জমিদার হৃষিকেশ বাবুর নাম আপনারা জানেন? যিনি রোজগার্ডেন বানিয়েছিলেন এবং তার মালিক ছিলেন?

ঃ টিকাটুলির রোজ গার্ডেন ? পরে প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরীর মালিকেরা যেটি কিনে নেন বলে শুনেছি ?

সুধামাসী বললেন, হ্যাঁ। এই হৃষিকেশ বাবুর এক ভাইপোর আমি বাঁধা মেয়েমানুষ ছিলাম দশ বছর। তখন আমার বয়স কত আর, উনিশ-কুড়ি। তিনিই আমার নাম পাল্টে সুধাম্ী দিয়েছিলেন। আমাকে নাচ গান শিখিয়েছিলেন। আমি তাকে স্বামীর মতো ভক্তি করতাম। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন আমার কোনো দুঃখ ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলামঃ তিনিই আপনাকে অভিনয়ে নামান?

সুধামাসী ঘাড় নাড়লেন-হ্যাঁ। আরমানিটোলা ময়দানের কোণায় একটা হল ছিল। পরে নাম হয়েছিল বুঝি 'নিউ পিকচার প্যালেস'। এখনতো এটা সিনেমা হল। আগে ছিল থিয়েটার হল। বাবু একদিন বললেন, সুধা, তোমাকে সীতা নাটকে সীতার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। আমি ভয়ে লজ্জায় কেঁপে মরি। বললাম, বাবু আমি কি পারবো? বাবু বললেন, আমি এসে রোজ তোমাকে অভিনয় শেখাবো। তুমি পারবে।

ঃ তারপর

সুধাময়ী কিছুক্ষণ বুঝি স্মৃতির আবেশে তন্ময় হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, বাবুর কাছেই আমার অভিনয়ের তালিম। আরমানিটোলা মাঠের আরেক কোণাতেই কালীপ্রসন্ন বাবুর বান্ধব কুটির। বিরাট দালানবাড়ি। তার দাওয়ায় রিহার্সেল হতো। নাটকেও অভিনয় করেছি। এর কোনো কোনোটা নাটক ছিল না। ছিল যাত্রা।

জানতে চাইলাম ঃ অভিনয় ছাড়লেন কেন ?

সুধামাসী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন ঃ আমি ছাড়িনি, অভিনয়ই আমাকে ছেড়েছে। ভদ্রঘরের মেয়েরা থিয়েটারের পার্ট করতে শুরু করলেন, তখন পুরনো পেশায় ফিরে

আসতে বাধ্য হলাম। দেশভাগের সময়তো বড় বড় হিন্দু জমিদারেরা কলকাতায় চলে গেলেন। আমারও বয়স বেড়েছে। নতুন বাবু আর ধরতে পারলাম না।

ঃ এখন আপনার কিভাবে চলে—

ঃ এই পেশায় একটা সুবিধা আছে। বয়স হয়ে গেলে মাসী হওয়া যায়। নতুন যারা এ লাইনে আসে তাদের ট্রেনিং দেই, খদ্দেরের মনোরঞ্জন করার কৌশল শেখাই। ওরা মাসিমা ডাকে আর তাদের রোজগার থেকে যা দেয়, তাতেই কোনোরকম দিন চলে যায়। আমার মতো আরও কয়েকজন মাসী আছেন এ পাড়ায়। তারা পুলিশের সঙ্গে ভাব রাখেন, গুন্ডাদের হাত থেকে নতুন মেয়েদের বাঁচান। পাড়ায় মেয়েদের মধ্যে কোনো গন্ডগোল হলে তার সালিশী করেন—অর্থাৎ মাসীদের এখানে অনেক কাজ।

সুধামাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরোজের সঙ্গে রাস্তায় নামতেই দেখি, কয়েকটি অল্প-বয়সী মেয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে। এখন খদ্দের ধরার সময় নয় বলে রঙচঙ মাখেনি। তাদের মধ্যে একটি আমাদের কাছে এগিয়ে এসে ঠাট্টার সুরে বলল, ও নাগর, মাসীর ঘরে কেন, আমরা কি দোষ করলাম?

বিব্রতভাবে ফিরোজের দিকে তাকালাম। ফিরোজ বলল, দাঁড়ান, ওদের আমি দেখাচ্ছি, বলে মেয়েগুলোর দিকে ক্যামেরা তাক করতেই তারা দৌড়ে পালাল। কেউ কেউ চিৎকার করে বলল, পালা, পালা, এরা পুলিশের লোক।

আট

পঞ্চাশের দশকের ঢাকার নাটকে নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবদুর রহিম। তার অভিনেতা পরিচয় ছিল গৌণ। মুখ্য পরিচয় ছিল একজন কট্টর আপসহীন বামপন্থী ছাত্রনেতা হিসাবে। এই আপসহীন বামপন্থী পরে সাংবাদিক থেকে হলেন এরশাদের কূটনীতিক এবং পরে খালেদা জিয়ার সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধিকর্তা। এই আবদুর রহিমের কথা লিখতে গিয়েই মনে পড়লো আরেকজন বন্ধুর কথা। তিনি জহিরুল ইসলাম। রহিম ও জহিরুল একই বয়সী হবেন। একই মাপের মানুষ। ছাত্রজীবন থেকে জহিরও বামপন্থী। তবে কট্টর ছিলেন না। ছাত্রজীবন শেষ করে জহিরও সাংবাদিক হয়েছিলেন; একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদকও হয়েছিলেন। পরে সে চাকরিও ছেড়ে দিয়ে একটি সাধারণ কাজ নিয়ে সাধারণ জীবন যাপন করেছেন, গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে, সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন; কিন্তু কারও কাছে নত হননি, প্রলোভনের কাছে নিজেকে বিক্রি করেননি। আবদুর রহিমের কথায় জহিরুল ইসলামের কথাও আমার মনে পড়লো।

মানুষে মানুষে কত তফাৎ এবং একজন মানুষের বহিরঙ্গ এবং বোলচালই যে তার আসল পরিচয় নয়, ভেতরে লুকিয়ে থাকা আসল মানুষটির পরিচয় যে পাওয়া যায় তার কাজে, এই সত্যটি আমি আরও ভালভাবে উপলব্ধি করেছি আবদুর রহিমের পাশাপাশি জহিরুল ইসলামের কথা ভাবতে গিয়ে। ষাটের দশকে আবদুর রহিম ছিলেন উচ্চকণ্ঠ বামপন্থী। বামপন্থী, এমনকি মধ্য-বামপন্থীদের সম্পর্কেও সর্বদা সমালোচনামুখর। অন্যদিকে জহিরুল ইসলাম মিতবাক, চুপচাপ গোছের মানুষ, সহনশীল। কর্মজীবনে আবদুর রহিম এক মেরু থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে চলে গেছেন। কিন্তু জহিরুল ইসলাম কর্মজীবনেও নিজের বিশ্বাসের মেরুতে তেমনি মিতবাক, সহনশীল অথচ আরও শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। ভাগ্যান্বেষণে বিপরীত মেরুবিহার করেননি।

জহিরুল ইসলামের সঙ্গে আমার কবে পরিচয়? এই ব্যাপারে স্মৃতির বন্দরে কোনো সবুজ বাতির সন্ধান পাচ্ছি না। সম্ভবতঃ ষাটের দশকের গোড়াতেই এই পরিচয়ের সূত্রপাত। তখন ওয়াহিদুল-সনজিদা জুটি 'ছায়ানট' গড়ে তুলেছেন। রমনার বটমূল থেকে বলধা গার্ডেনের বৃক্ষমূল—সর্বত্র ছায়ানটের গানের আসর বসে। এই ছায়ানটের বন্ধুদের মাধ্যমেই আমার আরেক নতুন বন্ধু জুটলো—জহিরুল ইসলাম। ছায়ানট থেকে ছাত্র ইউনিয়ন সর্বত্র জহিরের আনাগোনা। ধানমন্ডি, গুলশান, বনানীর প্রগতিশীল এলিটদের ঘরোয়া বৈঠকেও তার নিয়মিত উপস্থিতি। ঢাকা শহরের তখনকার এলিট ক্লাশের অনেক প্রগতিশীল ও বামপন্থী নারী-পুরুষের জহির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এছাড়া আমাদের 'কমন' বন্ধুদের মধ্যে মাইদুল হাসান, আনোয়ার জাহিদ, আহমেদুর রহমান, আলী আকসাদ, ওয়াহেদুল হক-এরাতো ছিলেনই। পরিচয় আরেকটু ঘনিষ্ঠ হতেই জানলাম জহির সাংবাদিকও। তবে ইংরেজি সাংবাদিকতা করেন।

ষাটের দশকের একেবারে গোড়ায় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তার 'ইত্তেফাক প্রকাশনা' থেকে 'ঢাকা টাইমস' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। এই পত্রিকার সম্পাদক করা হয় সালাহউদ্দিন মাহমুদ নামে এক উর্দুভাষী সাংবাদিককে। বিহারী মোহাজের পরিবারে তার জন্ম। ঢাকায় মানুষ হয়েছেন। কথাবার্তায় সাংঘাতিক বামপন্থী। চাকরি করতেন কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায়। সালাহউদ্দিন প্রোগ্রেসিভ উর্দু রাইটার্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ফলে ঢাকায় বামপন্থী সাহিত্যিক মহলেও ছিল তার বেজায় কদর। তিনি নাকি কবিতাও লিখতেন। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সভায় তাকে একবার মাত্র একটি কবিতা পাঠ করতে শুনেছি। উর্দুতে লেখা কবিতা। তার প্রথম লাইন—"কাকাতুয়া ভোলেভালে" জাতীয় কিছু হবে। তখনকার কোনো কোনো তরুণ বাঙালি কবি আড়ালে-আবডালে এই লাইনটি নিয়ে হাসিমস্করা করেছেন। কিন্তু অত বড় বামপন্থী লেখক ও সাংবাদিক সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস তাদের ছিল না। প্রগতিশীল

বাঙালি সাহিত্যিক মহল থেকে তার প্রভাব ও প্রতাপ প্রসারিত হয় ঢাকার সাংবাদিক মহলেও। তিনি সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হন।

মানিক মিয়া কি ভেবে তাকে 'ঢাকা টাইমস'—এর সম্পাদক করেছিলেন, আমার জানা নেই। সালাহউদ্দিন মাহমুদ আবার তার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সহকারী হিসেবে আহমদ হুমায়ুনকে (পরে 'দৈনিক বাংলার' সম্পাদক)। চেহারায়, পোশাকে আসাকে, ভাবভঙ্গিতে আহমদ হুমায়ুন তখন ছিলেন সালাহউদ্দিন মাহমুদের একেবারে প্রোটোটাইপ। তেমনি হাঁটু-অব্দি ঝোলানো লম্বা পাঞ্জাবি, ঢোলা পাজামা এবং মুখে কঠোর বামপন্থী তাত্ত্বিকতা। জহিরুল ইসলাম এদের সঙ্গেই 'ঢাকা টাইমস্-এ কাজ করেছেন অথবা পরে করেছেন, তা আমার স্মরণ নেই। আমার এটুকু মনে আছে জহির কিছুদিন 'ঢাকা টাইম্স্' একা সম্পাদনাও করেছেন। সালাহ্উদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

সালাহ্উদ্দিন মাহমুদের মুখোশ খুলে যায় পূর্ব পাকিস্তানে ছয়দফা আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু আগে। বেশ কিছুকাল থেকেই তার ঘনিষ্ঠতা ছিল পিকিংপন্থী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে। ছয়দফা আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু আগে সালাহ্উদ্দিন মাহমুদই প্রথম সর্ন্তর্পণে এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রচার শুরু করেন যে, ছয়দফা আসলে আমেরিকার 'সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির'(সিআইএ) দ্বারা তৈরি। পাকিস্তান যেহেতু ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং চীনের দিকে ঝুঁকেছে, সেহেতু পাকিস্তান ভাগ করার জন্য আমেরিকার পেন্টাগন একটা নীল-নক্‌শা তৈরি করেছে এবং ছয়দফা নাম দিয়ে শেখ মুজিবের মাধ্যমে প্রচার করছে। তার এই থিয়োরি তখন পিকিংপন্থী বন্ধুরা সোৎসাহে লুফে নেন।

এই প্রচারণা চালাতে গিয়েই তিনি প্রথম ধরা পড়েন। তার আগেই 'ঢাকা টাইমস' তাকে ছাড়তে হয়। জানা গেল, আইয়ুব সরকারের সাংস্কৃতিক গোয়েন্দা সংস্থা 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' (বিএনআর) তাকে প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মাঝে বসিয়ে ট্রয়ের ঘোড়ার মতো লালন করছে। ছয়দফার আন্দোলন থেকে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত এই কয়েক বছরেই সালাহ্উদ্দিন মাহমুদের প্রগতিশীল বামপন্থীর ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে তিনি পাকিস্তানী হানাদারদের সহায়তায় করাচীতে পলায়ন করেন।

এই সালাহ্উদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে ষাটের দশকের গোড়ায় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে জহিরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠতা এবং নিয়মিত ওঠাবসা আমাকে জহির সম্পর্কে তখন কিছুটা সন্দিহান করে তুলেছিল। ভাবতে শুরু করেছিলাম, ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে জহিরও হয়তো ক্ষমতার

সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে চান। আমার এ ভুলটা ভাঙতে বহুদিন সময় লেগেছে।

১৯৭৫ সালের জুন মাসে অসুস্থ স্ত্রীকে লন্ডনের হাসপাতালে রেখে আমি কিছুদিনের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলাম। যথারীতি জহির এসে আমার বাসায় হানা দিয়েছেন এবং একদিন তার বাসায় দুপুরে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। জহির তখন বিবাহিত। তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার তখনো দেখা হয়নি। তাকে দেখার লোভে সহজেই দুপুরের খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করলাম। নির্দিষ্ট দিনে জহিরের বাসায় গিয়ে দেখি তাহেরউদ্দিন ঠাকুরও উপস্থিত। তখন তিনি মন্ত্রী। নামে প্রতিমন্ত্রী হলেও মন্ত্রীর চাইতেও বেশি ক্ষমতাবান। তাকে আমি তখন অপছন্দ করতে শুরু করেছি। কারণটা ব্যক্তিগত নয়, রাজনৈতিক। আমার সঙ্গে তখন দেখা হলেই তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এক গাল হেসে বঙ্গবন্ধুর অতি প্রশস্তি শুরু করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুজিব নগরে খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও চাষী মাহবুব আলমের সঙ্গে মিলে তিনি কি ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা আমার জানা ছিল। পঁচাত্তরের গোড়াতেও তার ভূমিকা ছিল দিনে বঙ্গবন্ধুর অনুগত্ মন্ত্রী এবং রাতে আগামসি লেনে খোন্দকার মোশতাক আহমদের রুদ্ধদ্বার গোপন সভার সদস্য। তাই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তার অতি প্রশস্তি শুনে আমার মনে সন্দেহ আরো বাড়তো। আমি বঙ্গবন্ধুকে এই ব্যাপারে কয়েকবার সাবধান করেছি। এমনকি আমার সম্পাদিত 'দৈনিক জনপদে' বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করে কঠিন ভাষায় 'তৃতীয় মত' কলাম লিখেছি। বঙ্গবন্ধু আমার এসব লেখায় কখনো রাগ করেননি, হেসে সব উড়িয়ে দিতেন। হয়তো ভাবতেন, আমারই সমগোত্রীয় সাংবাদিক তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের প্রভাবশালী মন্ত্রী হওয়ার বিরাট সৌভাগ্যে আমি ঈর্ষান্বিত।

জহিরুল ইসলামের বাসাতেও সেদিন খাওয়ার টেবিলে তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে দেখে আমি খুশি হইনি। তবে তা প্রকাশ করিনি। জহির আমার মনের ভাব টের পেয়েছিলেন। তিনি বেশি কথা বলেন না। খাওয়া শেষে বিদায় নিয়ে যখন গাড়িতে উঠতে যাব তখন জহির মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, তাহের আমার ব্যক্তিগত বন্ধু— ওইটুকুই। তার রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

একটানা দীর্ঘ সময় বিদেশে থাকায় জহিরের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু মাঝে মাঝে যোগাযোগ হতো। আমার কোনো প্রয়োজনে জহিরকে কোনো চিঠি লিখলে জহির সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজটি করতেন। তিনি চিঠি লিখে আমার জবাব না পেলে কখনো ক্ষুণ্ন হননি, মাঝখানে একবার মাত্র জেনেছিলাম, তিনি একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক হয়েছেন। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকেননি। সরকারি চাকুরি, গাড়ি বাড়ি তিনি বহু আগেই ছেড়েছেন বলে জানতাম। এখন এই ইংরেজি দৈনিকের

চাকুরিটিও ছেড়ে দিয়ে তিনি কিভাবে সংসার চালাচ্ছেন, কিভাবে এই অর্থনৈতিক সংকটের দিনে টিকে আছেন, তা ভেবে যে মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হইনি তাও নয়। ঠিক এই সময়— সম্ভবতঃ আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে— আমার লন্ডনের শহরতলির বাসায় একটা চিঠি এসে হাজির। খামের উপর হাতের লেখা দেখেই বুঝতে পারলাম জহিরের চিঠি। চিঠিটা খুলে সঙ্গে সঙ্গে পড়লাম। জহির লিখেছেন, "গাফ্‌ফার, আমাকে এরশাদ সরকার লন্ডনে একটা বড় চাকুরি অফার করেছেন। অবশ্য এর পেছনে আমাদের বন্ধু আনোয়ার জাহিদ এবং তোয়াব খানের চেষ্টা ও সুপারিশ কাজ করেছে। লন্ডনের বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলারের পদটি মিনিস্টার র‍্যাংকে উন্নীত করা হয়েছে। আমাকে এই প্রেস মিনিস্টারের পদ অফার করা হয়েছে। আমার একটি চাকুরি অবশ্যই দরকার। কিন্তু বিদেশে এরশাদ সরকারের প্রচারকার্যের সঙ্গে যুক্ত বড় পদ গ্রহণ করলে মনে হয় না আমি এই ধরনের কাজে সাফল্য দেখাতে পারবো। সেই সঙ্গে বিবেকের তাড়নাও রয়েছে। চিরকাল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যুক্ত থেকে এখন কি সেই স্বৈরাচারের কাছেই দাসখত দেব ? ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না। তাই আপনার পরামর্শ চাচ্ছি। যতই লোভনীয় হোক, আমার পক্ষে এই চাকুরি গ্রহণ করা কি উচিৎ হবে?"

এই চিঠিটার জবাব কি দেব, তা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই মাস খানেক ধরে সেই চিঠির জবাব দেওয়া হলো না। কি করে লিখি, জহির আর্থিক টানাটানি আর সহ্য না করে এই লোভনীয় চাকুরিটা নিন। তাহলে জহির ভাবতে পারেন, আমিও 'তৃতীয় মতে' বড় বড় নীতিবাক্য লিখছি বটে, তলে তলে স্বৈরাচারের কাছে মাথা বিক্রি করেছি এবং তাকেও মাথা বিক্রি করার পরামর্শ দিচ্ছি। আবার তাকে কি করে বলবো, আপনি চাকুরিটা নীতি ও আদর্শের জন্য নেবেন না। তাহলে তার জীবিকার বিকল্প উপায় কি? কোন উপায় না দেখিয়ে কেবল উপদেশ দেওয়া তো খুবই সহজ।

এরপর আরও কিছুকাল কেটে গেল। জহিরের চিঠির জবাব দেওয়া হলো না। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম বিদেশে এমন উচ্চপদের অফার। জহির অনেক ভেবেচিন্তে নিশ্চয়ই অফারটি গ্রহণ করেছেন। যে কোনো সময় শুনবো, তিনি লন্ডনে এসেছেন এবং কুইন্স গেটে আমাদের এ্যাম্বাসিতে তার সঙ্গে দেখা হবে।

কিন্তু জহির এলেন না। ঢাকা থেকে আমাদের দু'জনেরই বন্ধু এক সাংবাদিক এসেছিলেন লন্ডনে। তার মুখে শুনলাম, জহিরুল ইসলাম এরশাদ সরকারের চাকুরির অফার গ্রহণ করেননি। খবরটা শুনে নিজের মনকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলাম, বিদেশে, বিশেষ করে লন্ডনে, মিনিস্টার র‍্যাংকের উচ্চপদ; সাউথ কেনসিংটনের বড় অভিজাত পাড়ায় মাসে দেড় থেকে দু'হাজার পাউন্ডের ভাড়া করা বাড়ি; শোফার-চালিত গাড়ি, অফিস ক্লার্ক, টাইপিস্ট, সেক্রেটারি—, আমাকে যদি ঢাকার দৈনিকে সম্পাদক থাকাকালে এমন সরকারী চাকুরির অফার দেওয়া হতো,

আমি কি না বলতে পারতাম? মন জবাব দিলো, পারতাম না। লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে আমি জহিরের চাইতে অনেক বেশি পরিচিত হতে পারি; কিন্তু মানুষ হিসেবে জহির যে আমার চাইতে অনেক বড়, একথা স্বীকার করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই।

কয়েকদিন পর শুনলাম, লন্ডনে প্রেস মিনিস্টার পদের যে অফার জহিরুল ইসলাম গ্রহণ করেননি, সেটি গ্রহণ করেছেন আবদুর রহিম। তিনি ইতিমধ্যেই লন্ডনে এসে পৌঁছেছেন।

তিরানব্বুইয়ের জানুয়ারী মাসে ঢাকার মাটিতে পা দিয়েই মনে মনে জহিরের দেখা পাওয়ার প্রত্যাশা করেছি। না, এয়ারপোর্টে তিনি আসেননি। মনে মনে রাগ হয়েছে। জহিরকে কি তাহলে আমার খুঁজে বের করতে হবে?

না, তাকে খুঁজে বের করতে হল না। জহির নিজেই একদিন টেলিফোন করলেন আমার আত্মীয়ের স্বামীবাগের বাসায়। আমি তখন সেখানেই ছিলাম। জহির বললেন, আপনাকে ক'দিন যাবত খুঁজছি। কিছুতেই ধরতে পাচ্ছি না। শুনলাম, আপনার পশ্চিম ধানমন্ডির বাসায় টেলিফোন নেই। আপনি এখন কোথাও যাবেন না। আমি আসছি।

আমি উন্মুখ হয়ে বসে রইলাম। সতেরো বছর পর আবার দেখা হবে জহিরুল ইসলামের সঙ্গে।

নয়

জহিরুল ইসলাম এলেন। ঘড়ি ধরেই এলেন বলা চলে। টেলিফোন করে এক ঘন্টার মধ্যে পৌছে গেলেন স্বামীবাগের বাসায়। সতেরো বছর আগে জহিরকে যেমন দেখেছিলাম, এখনো প্রায় তেমনই আছেন। পরিবর্তনের মধ্যে থুতনিতে একটু দাঁড়ি। জহির এমনিতেই কথা কম বলেন। পুরনো দিন, পুরনো বন্ধুবান্ধব নিয়ে কিছুকিছু কথাবার্তা হল। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, জহির, আপনি কি আগের সেই বামঘেঁষা মনোভাবই আঁকড়ে ধরে আছেন ?

জহিরের একটি অভ্যেস মুচকি মুচকি হাসা। সেই পুরনো মুচকি হেসে বললেন, আপনার কি ধারণা?

বললাম, আমার ধারণা, আপনি সম্ভবতঃ ডঃ কামাল হোসেনের গণতান্ত্রিক ফোরামে ('৯৩ সালের জানুয়ারী মাসের কথা। তখনো গণ ফোরাম নামে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়নি) গিয়ে জুটেছেন।

ঃ আপনার এই ধারনা করার কারণটা জানতে পারি? জহির জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম, আপনার এলিট ক্লাসের বন্ধুবান্ধবদের অনেকেইতো সেখানে গিয়ে

জুটেছেন। এমন কি আমাদের দু'জনের কমন ফ্রেন্ড জিয়াউল হক টুলু তো এখন ব্যবসায়ের বাইরে রাজনীতিতে নামার কথা ভাবছেন। শুনছি গণতান্ত্রিক ফোরাম গঠনে তিনি ডঃ কামাল হোসেনের একজন পরামর্শদাতা এবং পেট্রন।

জহিরুল ইসলাম মৃদুস্বরে বললেন, পলিটিক্স আর ফ্রেন্ডশিপ এক জিনিস নয় গাফ্ফার। টুলু এখনো আমার বন্ধু। কিন্তু রাজনৈতিক মতামত আমাদের এক নয়।

বিস্মিত হয়ে বললাম, আপনি তাহলে গণতান্ত্রিক ফোরামে নেই?

জহির মুচকি হাসলেন। বললেন, আমি দেশের 'মেইন ষ্ট্রিম' রাজনীতিতে থাকতে চাই। এই 'মেইন ষ্ট্রীম' রাজনীতিতে দেশের সবচাইতে বড় এবং গণতান্ত্রিক দল হচ্ছে আওয়ামী লীগ। এই দলের নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা এখন যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও 'ম্যাচিওরিটির' পরিচয় দিচ্ছেন, তাতে আমার নতুন রাজনৈতিক পীর খোঁজার দরকার আছে কি?

ঃ কারা ডঃ কামাল হোসেনকে নতুন রাজনৈতিক পীর হিসেবে খাড়া করতে চাচ্ছেন বলে আপনি মনে করেন?

ঃ কিছু 'পলিটিক্যাল অরফ্যান' (রাজনৈতিক এতিম)। যাদের কোনো দলে আশ্রয় হয়নি কিংবা দল ভেঙে গেছে অথবা তারা দল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন।

বললাম, ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে কিছু প্রবীণ বুদ্ধিজীবী এবং কূটনীতিক আছেন। যেমন ইতিহাসবিদ ডঃ সালাহউদ্দিন আহমদ, কূটনীতিক ফখরুদ্দিন আহমদ, অর্থনীতিবিদ ডঃ মোশাররফ হোসেন, রেহমান সোবহান। কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যেও অনেকে এসে গণতান্ত্রিক ফোরামের মঞ্চে আসন নিয়েছেন। এরা নিশ্চয়ই 'পলিটিক্যাল অরফ্যান' নন!

জহির বললেন, এদের 'পলিটিক্যাল অরফ্যান' বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। এরা সকলেই ডঃ কামাল হোসেনকে সমর্থন দিচ্ছেন দেশে নির্দলীয় ভিত্তিতে অথবা সর্বদলীয় ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গড়ে তোলার আন্দোলন শুরু করার জন্য। নতুন রাজনৈতিক দল গঠনে এদের কারো উৎসাহ অথবা সমর্থন নেই। ডঃ কামালও বার বার বলছেন, গণতান্ত্রিক ফোরাম কোনো নতুন রাজনৈতিক দল নয় এবং ফোরাম রাজনৈতিক দল গঠনের কোনো উদ্যোগও নয়। তার এ প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক তার সঙ্গে এসেছেন। তারা যদি বুঝে ফেলেন, ডঃ কামাল হোসেনের মনে ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তিনি দলছুট কিছু লোক নিয়ে নতুন রাজনৈতিক দল করতে চান, তাহলে এরা কেউ তার সঙ্গে থাকবেন না।

বললাম, আপনি এ সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত?

জহির বললেন, হ্যাঁ, আমি এতটাই নিশ্চিত। তবে আমার ধারণা, ডঃ কামাল হোসেন হয়তো শেষ পর্যন্ত নতুন দল গঠনের মতো পাগলামি করবেন না। এ

সম্পর্কে আপনার কি মত?

বললাম, ডঃ কামাল হোসেন নতুন রাজনৈতিক দল করবেন। কথাটা এখন তিনি বলছেন না। কিন্তু এই কৌশলই তার কাল হবে। এ কৌশল ধরা পড়ার পর দেশের মুক্ত-বুদ্ধির কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কূটনীতিক, অর্থনীতিবিদ কেউ তার সঙ্গে থাকবেন না। তাকে বিভিন্ন দল ভাঙা লোক নিয়ে নতুন দল গড়তে হবে। আমি ডঃ কামাল হোসেনের নতুন দল গড়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় একটা কলাম লিখেছি। তাতে আমার বন্ধুদের অনেকেই বিরক্ত হয়ে বলছেন, আমি বড় বেশি আগাম কথা লিখছি। কিন্তু সময় এলে দেখতে পাবেন, আমার কথা কতটা সত্য হয়!

জহির জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি ধারণা, নতুন দল গঠন করে কামাল হোসেন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সফল হবেন?

কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বললাম, আমার ধারণা হবেন না। প্রথম কথা, তিনি বাংলার মানুষের নাড়ির স্পন্দন বোঝেন না। বাংলাদেশের মাটি, মানুষ, কালচারের সঙ্গে নিজেকে 'আইডেন্টিফাই' করতে পারেননি। চিরকাল 'ইনটেলেকচুয়াল' পরগাছা হিসেবে রয়ে গেছেন। বাংলাদেশের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রতিও তার কোন 'কমিটমেন্ট' নেই। তার দল বাংলাদেশের মানুষকে কী রাজনৈতিক দর্শন এবং নতুন কর্মসূচি উপহার দেবে? কেবল সন্ত্রাস দমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কয়েকটি মৌলিক গলদ দূর করার কথা বলা? সে সম্পর্কে তার ফোরামের নির্দিষ্ট কর্মসূচী কী হবে? কেবল মহাসমাবেশ, গণ দরখাস্ত আর ফাঁকে ফাঁকে বিদেশ ভ্রমণ?

জহির বললেন, আপনার বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, তাহলে কামাল হোসেন নতুন দল গড়তে যাবেন কোন দূরাশায়? তিনি অবশ্যই বুদ্ধিমান লোক। নতুন দল গড়ার পরিনাম কি হবে, তা কি বুঝতে পারছেন না?

বললাম, হয়তো বুঝতে পেরেও কিছুই করতে পারছেন না। দেশে এবং বিদেশে যারা তার প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক, তারা বাংলাদেশে পঁচাত্তর-পূর্ব রাজনীতি যাতে আবার প্রতিষ্ঠা না পায়, আওয়ামী লীগ যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে, সেজন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তায় এখন ধস নেমেছে। ফলে তারা যেকোন ঘোড়ার উপর বাজি ধরতে রাজি। যদি তাদের চতুর চেষ্টায় এই ঘোড়া জিতে যায়; অথবা না জিতলেও আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসা ঠেকানো যায়?

জহির বললেন, দীর্ঘকাল আওয়ামী লীগ রাজনীতি করেও ডঃ কামাল হোসেন এই সহজ সত্যটা বুঝছেন না?

ঃ ক্ষমতার লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়।

ঃ কামাল হোসেন ক্ষমতা লোভী? জহিরের কণ্ঠে এবার সত্যিকারের বিস্ময়।

বললাম, তিনি ক্ষমতালোভী নন, 'ক্যারিয়ারিস্ট'। আমার একটি বিশ্লেষণ হচ্ছে এই 'ক্যারিয়ার' গঠনের জন্যই তিনি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের যুগে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন এবং বর্তমানে আওয়ামী লীগের দুর্দিনে এই 'ক্যারিয়ারের' জন্যই তিনি আবার আওয়ামী লীগ ত্যাগ করতে পারেন।

জহির ঃ আপনার এ বিশ্লেষণের পেছনে কোনো যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে?

ঃ কিছু কিছু যে নেই, তাও নয়। বললাম।

ঃ একটা প্রমাণ দিন। জহির বললেন।

ঃ ছিয়াশি সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যোগ দেবে না, এটা ছিল দৃঢ় ব্যক্ত সিদ্ধান্ত। রাতারাতি এই সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে যেতে হল কেন?

জহির বললেন, ডঃ কামাল হোসেনের জেদে। তিনিই এ সিদ্ধান্তটা শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন। পরে এজন্য সব অপবাদ মাথা পেতে নিতে হয়েছে হাসিনাকে।

বললাম ঃ ঘটনা এখানেই শেষ নয়। তারপরেরও একটি ঘটনা আছে। যা কখনো সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর অর্থনীতিবিদ ডঃ মোশাররফ হোসেন হঠাৎ একদিন শেখ হাসিনার বাসায় এসে হাজির। হাসিনা শিক্ষক এবং অর্থনীতিবিদ হিসেবে ডঃ মোশাররফ হোসেনকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। মোশাররফ হোসেন একথা সেকথার পর হঠাৎ হাসিনার দিকে চেয়ে অনুনয়-মাখা কণ্ঠে বললেন, 'হাসিনা, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'অনুরোধটা কি?' হাসিনা জিজ্ঞাসা করলেন। মোশাররফ হোসেন বললেন, 'তুমি এবার নির্বাচনে প্রার্থী হয়ো না। ডঃ কামাল হোসেনকে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা হতে দাও। তুমি দলের নেত্রী হয়ে জনগণের মাঝে থাকো।' হাসিনা তার প্রস্তাব শুনে থ' হয়ে গেলেন। ডঃ মোশাররফ হোসেন এবং ডঃ কামাল হোসেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাহলে প্রস্তাবটা কি ডঃ কামালের তরফ থেকেই এসেছে? হাসিনা একটু ভেবে বললেন, আমরা যে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে পারবো না, আমাদের বিরোধী দল হিসেবে বসতে হবে, এ ধারণাটা আপনাকে কে দিলেন?' ডঃ মোশাররফ হোসেন একটু থতমত খেলেন। বললেন, না না তোমরা যে বিরোধী দলেই বসবে এমন কথা আমি বলছি না। নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করার মতো অবস্থাতেও তোমরা অবশ্যই পৌছতে পারো।' হাসিনা বললেন, আমরা যদি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করি, তাহলে ডঃ কামাল হোসেন কোন্ পদটি

চাইবেন? প্রধানমন্ত্রীর পদ কি? আর সেই সম্ভাবনা মনে রেখেই কি তিনি দলের সভায় নির্বাচনে যোগ দেয়ার জন্য অত জেদ দেখাচ্ছিলেন? ডঃ মোশাররফ হোসেনের মুখে আর রা নেই। তিনি শেখ হাসিনার কথার জবাব দিতে না পেরে সেদিনের মতো বিদায় হয়েছিলেন। ছিয়াশির এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে পরাজিত হয়ে ডঃ কামাল হোসেন আবার জেদ ধরেছিলেন পার্লামেন্ট বর্জন করতে হবে।

জহির বললেন, শেখ হাসিনার সঙ্গে ডঃ মোশাররফ হোসেনের এ আলাপের খবর আপনি কার কাছে শুনলেন? হাসিনার কাছে কি?

বললাম ঃ না। তবে একজন সাংবাদিক কি তার সংবাদ সূত্র সব সময় ডিস্‌ক্লোজ করে?

জহির হেসে ফেললেন। বললেন, না তা করেন না। তবে আমিও কি তা জানতে পারি না।

ঃ নিশ্চয় পারেন, তবে প্রকাশ্যে নয়। আমি কথা শেষ না করতেই দরোজায় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন নূরুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধুর এককালের ছায়া-সহচর। এক সময় আওয়ামী লীগের প্রচার সচীবও ছিলেন। আজকাল সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে চাকরি করেন। ঢাকায় এসে তাকে সঙ্গে নিয়েই আমি গিয়েছিলাম ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের তীর্থ দর্শনে। নূরুল ইসলাম ঘরে ঢুকেই বললেন, গাফ্‌ফার ভাই, শেখ হাসিনার সঙ্গে তো আপনার দেখা হয়ে গেছে। এবার আরেকজনের সঙ্গে আপনার দেখা হওয়া প্রয়োজন।

ঃ কার কথা বলছেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

ঃ ডঃ কামাল হোসেনের কথা বলছি। নূরুল ইসলাম বললেন।

আমি এবং জহির দু'জনেই এক সঙ্গে বলে উঠলাম, আমরা তাকে নিয়েই এতক্ষণ আলাপ করছিলাম।

ঃ কি আলাপ করছিলেন? নূরুল ইসলাম জানতে চাইলেন।

জহির বললেন, গাফ্‌ফারের ধারণা, ডঃ কামাল হোসেন নতুন দল গঠন করবেনই।

নূরুল ইসলাম বললেন, আমারও তাই ধারণা। আর সেজন্যই কামাল হোসেনের সঙ্গে আপনার দেখা হওয়া দরকার।

বললাম, একটু খুলে বলুন।

নূরুল ইসলাম ঃ আওয়ামী লীগকে ভালবাসি বলেই অনুরোধটা আপনাকে করছি। শেখ হাসিনা ও ডঃ কামাল হোসেনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ভাঙাতে পারেন, এমন কোনো লোক আর দেখছি না, তাই আপনাকে বলছি। নতুন দল গঠন করার জন্য তাকে কিছু বাজে-লোক উস্কানি দিচ্ছে। এই দল গঠন করা হলে আওয়ামী লীগের তো

ক্ষতি হবেই, ডঃ কামালেরও ক্ষতি হবে। তিনি একটা বড়দলের নেতৃত্ব হারাবেন। আবার আওয়ামী লীগও তার মতো একজন বিদ্বান ও অভিজ্ঞ নেতার নেতৃত্ব ও পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হবে। এই মুহূর্তে শেখ হাসিনা ও ডঃ কামালের মধ্যে একটা সমঝোতা দরকার।

আমার কণ্ঠে তখন দ্বিধা। বললাম, আমি একজন সামান্য লোক। শেখ হাসিনা অথবা ডঃ কামাল হোসেন দু'জনের একজনও কি আমার পরামর্শ শুনবেন?

নুরুল ইসলাম বললেন, হয়তো শুনবেন না, কিন্তু দু'জনকে যদি একবার সামনা- সামনি আলাপ আলোচনার জন্য বসাতে পারেন, সেটাও হবে এই মুহূর্তে একটি বড় কাজ।

বললাম, কামাল হোসেন যদি আওয়ামী লীগ ছেড়ে নতুন দল গঠন করেন, তাহলে আওয়ামী লীগের আরও কয়েকজন বড় নেতা তার সঙ্গে যাবেন বলে শুনছি, এ কথা কি সত্য?

নূরুল ইসলাম দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, বাজে কথা। কেউ তার সঙ্গে যাবেন না। কামাল হোসেন মিথ্যা আশায় নিজেকেই নিজে ধ্বংস করবেন। তাকে ধ্বংস হতে দেবেন না। তিনি বঙ্গবন্ধুর পাশে পাশে ছিলেন। আওয়ামী লীগে এখানো তার প্রয়োজন রয়েছে। আওয়ামী লীগে তাকে ধরে রাখা দরকার।

মনে পড়লো, '৯২ সালের শেষের দিকে ডঃ কামাল হোসেন লন্ডন গিয়েছিলেন এবং আমার সঙ্গে বসতে চেয়েছিলেন। আমি আকস্মিকভাবে ভিয়েনায় চলে যাওয়ায় এই দেখা আর হয়নি। এখন ঢাকায় যখন এসেছি এবং ডঃ কামালও যখন ঢাকাতেই আছেন, তখন তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া সৌজন্যের খাতিরেও আমার উচিত। নূরুল ইসলামকে সেকথা জানালাম। নূরুল ইসলাম সোৎসাহে বললেন, তাহলে আগামীকালই চলুন।

বললাম ঃ কোনো এপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই যাব?

নূরুল ইসলাম বললেন, ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে আপনার এপয়েন্টমেন্টের দরকার নেই। আগামীকাল সকালে আপনি কোথায় থাকবেন?

ঃ পশ্চিম ধানমন্ডির বাসায়।

ঃ আমি ভোরেই সেখানে চলে আসবো। নূরুল ইসলাম বললেন।

জহির বললেন, পশ্চিম ধানমন্ডি থেকে ডঃ কামালের বেইলী রোডের বাসায় যেতে বেশি সময় লাগবে না। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

বেলা গড়িয়ে তখন দুপুর হয়ে এসেছে। নূরুল ইসলাম এবং জহিরকে বললাম, আমাকে আজ একবার 'বাংলার বাণী' অফিসে যেতে হবে। আপনারাও আমার সঙ্গে চলুন।

দু'জনেই সানন্দে রাজি হলেন।

দশ

লন্ডনের মতো ঢাকায় সংবাদপত্রের পাড়া নেই। এককালে ফ্লিট স্ট্রীট ছিল লন্ডনে 'সংবাদপত্রের পাড়া'। অধিকাংশ বড় বড় দৈনিকের অফিস ছিল ফ্লিট স্ট্রীটে। এখন এই পাড়া ভেঙে গেছে। বড় বড় কাগজগুলোর কেউ চলে গেছেন ডকল্যান্ডে, কেউ ওয়াপিংয়ে, কেউ বা আইল-অব-ডগে। ঢাকায় এ জাতীয় 'কাগজের পাড়া' কখনো গড়ে ওঠেনি। পাকিস্তান আমলে ঢাকা থেকে যখন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়, তখন থেকে 'আজাদের' অফিস রমনার ঢাকেশ্বরীতে। 'ইত্তেফাকের' অফিস প্রথমে হাটখোলায়, তারপর রামকৃষ্ণ মিশন রোডে। মোহন মিয়ার 'মিল্লাতের' (বর্তমান 'মিল্লাত' নয়) অফিস ছিল একেবারে পুরনো ঢাকায় সদরঘাটের কাছে ওল্ড কোর্ট স্ট্রীটে। ইংরেজী দৈনিক 'অবজারভার' এবং 'মর্নিং নিউজের'' প্রথম দিকের অফিসও ছিল পুরনো ঢাকায় সদরঘাটের কাছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই নতুন গড়ে ওঠা মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় গড়ে ওঠে দৈনিক সংবাদপত্রের একাধিক অফিস। কাছেই ডিআইটি এভেন্যুউতে (বর্তমানে রাজউক) প্রতিষ্ঠিত হয় ট্রাস্ট ভবন— দৈনিক পাকিস্তান (বাংলা) ও 'মর্নিং নিউজের' অফিস। হামিদুল হক চৌধুরীর 'পাকিস্তান'(বাংলাদেশ) অবজারভার' সদরঘাট থেকে উঠে আসে মতিঝিলে এবং এখান থেকেই প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পূর্বদেশ'। সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্য মাসিক 'সমকাল' এবং সমকাল প্রেসও টিকাটুলি থেকে চলে আসে মতিঝিলে। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মতিঝিলেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলার বাণী'র অফিস। 'বাংলার বাণী প্রকাশনা' থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজি দৈনিক 'বাংলাদেশ টাইমস।' ১৯৭৩-৭৪ সালে আমি যে দৈনিক কাগজটি সম্পাদনা করতাম, সেই 'দৈনিক জনপদে'রও প্রথম অফিস ছিল মতিঝিলে। ফলে তখন আমার মনে একটা ধারণা গড়ে উঠছিল যে, কালক্রমে ঢাকার মতিঝিল এলাকাতেও হয়তো লন্ডনের ফ্লিট স্ট্রীটের মতো একটা কাগজের পাড়া তৈরি হবে।

মতিঝিলে কাগজের পাড়া তৈরি হয়নি বটে, কিন্তু এখান থেকেই এখন বেরোয় দেশের পাঁচটি ইংরেজি ও বাংলা জাতীয় দৈনিক- (আমি '৯৩-এর জানুয়ারী মাসে ঢাকায় থাকাকালে এখান থেকেই বের হয় দৈনিক 'জনকণ্ঠও)। দৈনিক 'বাংলার বাণী'র উপর দিয়ে বেশ ঝড়-ঝাপটা গেছে। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতাকে হত্যা করা হয়। পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ ছিল কিছুকাল। তবু সব ঝড়-ঝাপ্টার মুখে কাগজটি যে এখনো টিকে আছে, শুধু টিকে থাকা নয়, ভালভাবে টিকে আছে, এখানেই পাঠকদের মধ্যে এই পত্রিকার দৃঢ়নিবদ্ধ শিকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

'বাংলার বাণী' অফিসের দোরগোড়ায় পা দিয়েই মনে পড়লো শেখ ফজলুল হক মনির কথা। আঠারো বছর আগে ঢাকা ছেড়ে যখন লন্ডনে যাচ্ছি, তখন এক সন্ধ্যায় এই দোরগোড়ায় শেখ মনি আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভালোয় ভালোয় আবার দেশে ফিরে আসুন। আমি দেশে ফিরে এসেছি। কিন্তু শেখ মনি আর বেঁচে নেই। বেঁচে আছে তার পত্রিকা, তার সংগঠন। এই পত্রিকার পরিচালক এখন তার দুই ভাই— শেখ ফজলুল করিম সেলিম এবং শেখ ফজলুর রহমান মারুফ। শেখ মনি যাদের নিয়ে এই পত্রিকাটি শুরু করেছিলেন এবং যারা ছিলেন তার রাজনৈতিক ও সাংবাদিক জীবনের সহকর্মী এবং অনুগামী, তারা এখনো বাংলার বাণীকেই ঘিরে রয়েছেন, একই পরিবারের মতো যূথবদ্ধ হয়ে। অনেক দিন পর দেখা হল আজিজ মিসির ও মীর নূরুল ইসলামের সঙ্গে। দু'জনেই আমার বহু পুরনো সহকর্মী এবং দেখা হল ওবায়দুল কাদের, আমির হোসেন, ফকীর আবদুল রাজ্জাক, শফিকুল আজিজ মুকুল এবং আরও অনেকের সঙ্গে। শেখ মারুফকে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলাম। যেমন লম্বা, তেমনি সপ্রতিভ চেহারা। ঠোঁটে ঘন গোঁফ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, তরুণ বয়সী বঙ্গবন্ধুকে দেখছি। সেদিক থেকে শেখ সেলিম একটু ভিন্ন চরিত্রের। অল্প কথার গম্ভীর মানুষ। কিন্তু রসবোধ প্রচুর। হঠাৎ চুটকি কথায় হাসাতে পারেন। সেলিম এখন শুধু সম্পাদক নন, একজন পার্লামেন্ট সদস্যও। রাজনীতি করার সঙ্গে পার্লামেন্ট সদস্যের গুরু দায়িত্ব বহন এবং একই সঙ্গে একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু সেলিম ও মারুফ 'বাংলার বাণী'কে শুধু টিকিয়ে রাখা নয়, একটি উন্নত, আধুনিক প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকায় পরিণত করেছেন। এখানে তাদের সাংগঠনিক শক্তি ও কৃতিত্বের পরিচয়। তাছাড়া বাংলার বাণীর পুরনো পরিবারকেও তারা বাঁচিয়ে রেখেছেন। আজিজ মিসির এককালে ছিলেন শুধু চিত্র-সাংবাদিক। এখন তিনি শক্তিশালী কলামিস্ট এবং নাট্যকার। মীর নূরুল ইসলাম শুধু সাংবাদিক নন, সাহিত্যিকও। আমির হোসেন শুধু ভালো সাংবাদিক নন, একজন দক্ষ সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কলামিস্ট এবং ওবায়দুল কাদেরও একাধারে রাজনীতিক এবং কলামিস্ট। এককালে আমি ভাবতাম, চারদিকে এত অপপ্রচার, গুজব আর চরিত্র হননের ভয়াবহ রাজনীতি; এর মাঝখানে ক্ষীণ দীপশিখার মতো আমরা মুষ্টিমেয় কিছু সাংবাদিক ও সাহিত্যিক বেঁচে আছি, যারা বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের আদর্শে এখনো একনিষ্ঠ। আমাদের মৃত্যুর পর এই আদর্শের বাতিঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখবেন কারা? এই আশঙ্কাটি আমার মনে এখন আর নেই। আমির হোসেন, ওবায়দুল কাদের, ফকীর আবদুর রাজ্জাক, শফিকুল আজিজ মুকুলের মতো আরো অনেকের লেখা পড়ে মনে আশা জাগে, বাতিঘরে বাতি নিভবে না, বরং নতুন নতুন বাতি জ্বলে উঠবে। বাংলাদেশে যেসব শক্তিশালী লেখক, কবি, সাংবাদিক ও

কলামিস্ট আগে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণে দ্বিধা করতেন, এখন তারাও এগিয়ে এসে আরও বলিষ্ঠ ভাষায় বলছেন বঙ্গবন্ধুর কথা, তাঁর আদর্শের কথা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা। শুধু 'বাংলার বাণী'তে নয়, ঢাকার বিভিন্ন কাগজে আজকাল বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এদের লেখা পড়ি, আর স্মরণ করি সেই ইংরেজি প্রবাদটিকে Man can be destroyed, but his ideals can never be defeated (একজন মানুষকে ধ্বংস করা যায় ; কিন্তু তার আদর্শকে কখনো পরাভূত করা যায় না।)।

তেজগা শিল্প এলাকা থেকে 'বাংলার বাণী' অফিস মতিঝিলে সরিয়ে আনার ব্যাপারে শেখ মনিকে যারা বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি সাইয়িদ আতিকুল্লাহ। আতিকুল্লাহ পঞ্চাশের দশকের প্রথম সারির কবি। দীর্ঘকাল তার পেশা ছিল সাংবাদিকতা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় ছিলেন ব্যাংকার। জনতা ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার অফিস ছিল মতিঝিলে জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে। একেবারে রাস্তার সঙ্গে লাগোয়া আতিকুল্লাহর অফিস ঘরটি। তার আতিথেয়তা ছিল সর্বজন ব্যপ্ত। মন খারাপ হলেই তার কাছে ছুটতাম। চা, বিস্কিট জুটতো, সেই সঙ্গে সান্ত্বনা ও পরামর্শ। শুধু আমি নই, ঢাকার শিল্পী সাহিত্যিকদের অনেকেরই তখন আড্ডাঘর ছিল আতিকুল্লাহর অফিসটি। দুর্মুখ বলে তার খ্যাতি ছিল। এখনো আছে। কিন্তু গভীরভাবে না মিশলে এই মানুষটির অমন উত্তাপ ও বন্ধুত্বভরা হৃদয়টির সন্ধান সহজে পাওয়া যায় না। আতিকুল্লাহ ঠাস্ ঠাস্ মুখের উপর একটি কথা বলে দেন; কিন্তু দুঃসময়ে তার মতো নির্ভরযোগ্য বন্ধু সহজে মেলে না।

আতিকুল্লাহর মতোই তার কবিতাতেও নিবিষ্ট না হলে উত্তাপ অনুভব করা যাবে না। বাক-চাতুর্য ও আবেগময়তা ছাড়াও যে এক ধরনের কাব্যভাষা তৈরি করা যায় এবং সেই ভাষায় ব্যক্তির আর্তি এবং সমষ্টির যুগ-যন্ত্রণা প্রকাশ করা সম্ভব, আতিকুল্লাহর কবিতা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই আতিকুল্লাহর সঙ্গে কিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শেখ মনির ভাব হয়েছিল, এই দুই বিপরীত চরিত্রের মানুষ পরস্পরের এত কাছে এসেছিলেন, তা আমার জানা নেই। কিন্তু তখন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, শেখ মনি শুধু আতিকুল্লাহর কথাই শোনেন না, তাকে শ্রদ্ধাও করেন। আমাকে যখন শেখ মনি 'বাংলার বাণী'র নির্বাহী সম্পাদকের চাকুরি গ্রহণের অফার দেন, তখন এই অফার গ্রহণে আমার দ্বিধা ছিল। পত্রিকাটির অফিস ছিল তখন তেজগাঁ শিল্প এলাকায়। আমার বাসা হাটখোলাতে। রোজ অতদূরে যাওয়া আসার কথা ভেবে এই চাকুরি গ্রহণে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। মনি তখন আমার বাসায় এসে হাজির। বললেন, 'কাপড় পরে আমার গাড়িতে উঠুন।' বললাম, কোথায় যাবো? মনি বললেন, 'আতিক ভাইয়ের অফিসে। তিনিতো আপনার বন্ধু।' বললাম, আতিকুল্লাহ আমার বহুদিনের বন্ধু। 'সওগাতে' সাহিত্যের আড্ডায় তার সঙ্গে দিনের

পর দিন ওঠাবসা করেছি, আড্ডা মেরেছি। মনি বললেন, 'আমিও তাকে শ্রদ্ধা করি। চলুন তার কাছে। তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, আপনার 'বাংলার বাণী'তে যোগ দেওয়া উচিৎ কিনা'? আমি আপনাদের দুই বন্ধুর আলাপের মাঝখানে থাকবো না। আপনাকে জনতা ব্যাংকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাব।'

শেখ মনি তার কথা রাখলেন। আমাকে আতিকুল্লাহর রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে এককাপ চা খেয়ে বিদায় নিলেন। আতিকুল্লাহ্ বললেন, গাফফার, আপনিতো শেখ মুজিব এবং তার দলের সমর্থক।

বললাম, সমর্থক একথা ঠিক। কিন্তু আওয়ামী লীগ সম্পর্কে আমার অনেক রিজার্ভেসন রয়েছে। আমি যে কাগজেই কাজ করি না কেন, একজন স্বাধীন কলামিস্ট হিসেবে থাকতে চাই।

আতিকুল্লাহ্ বললেন, আপনার মতের সঙ্গে একশ' ভাগ মিলবে, এমন কাগজ কোথাও পাবেন না। বরং 'বাংলার বাণী'তেই অনেক বেশি স্বাধীনতা পাবেন। শেখ মনি বাইরে থেকে খুবই রাগী এবং কাঠখোট্টা। কিন্তু তার সঙ্গে মেশার পর মনে হয়েছে, তার কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান দুইই পাওয়া সম্ভব। এটা নির্ভর করে তাকে চেনা এবং বোঝার উপরে।

বললাম, 'বাংলার বাণী' অফিসের দূরত্বের কথাটাও আপনি ভেবে দেখুন।

আতিকুল্লাহ্ বললেন, এই সমস্যা খুব বেশি দিন থাকবে না। বাংলার বাণী' শীঘ্রই মতিঝিলে চলে যাবে। এই ব্যাপারে শেখ মনি জনতা ব্যাংকেরও সাহায্য ও সহযোগিতা চাইছেন।

বললাম, আতিকুল্লাহ, আপনার কি ধারণা, শেখ মনির মতো একজন অনভিজ্ঞ যুবক একটি দৈনিক কাগজ শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারবেন?

আতিকুল্লাহ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, শেখ মনির অনেক দোষের কথা অনেকের কাছে শুনি। হয়তো তা সত্য। কিন্তু তার মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব ও সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে মনে হয়, 'বাংলার বাণী'র টিকে না থাকার কোনো কারণ নেই।

বললাম, আপনার পরামর্শ মেনে নিলাম। 'বাংলার বাণী'তে আমি যোগ দেব।

এর সিকি শতাব্দী পরের কথা। '৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে 'বাংলার বাণী'র অফিসে বসে মনে পড়লো সাইয়িদ আতিকুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। সিকি শতাব্দী ধরে 'বাংলার বাণী' টিকে আছে। আরও যে টিকে থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই।

এই আতিকুল্লাহ্কে নিয়ে আরেকটি ঘটনার কথাও মনে পড়ে। পঁচাত্তর সালের গোড়ার দিকের কথা। আমি লন্ডন থেকে কিছুদিনের জন্য ঢাকায় ফিরেছি। বঙ্গবন্ধু তখন তার বাকশাল পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। একদিন দুপুরে দেখা হতেই বললেন,

আমার একজন জনসংযোগ অফিসার দরকার। তোয়াবকেতো (সাংবাদিক তোয়াব খান) সেক্রেটারি করে নিয়েছি। এদিকে রোজই সাক্ষাতপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। বিদেশীদের সংখ্যাও কম নয়। তাই আরো একজন অফিসার আবশ্যক, যার ইংরেজি খুবই ভাল। তুমি কারো নাম সাজেষ্ট করতে পারো?

একটু ভেবে বললাম, শহীদুল হককে তো আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তার কথা ভেবে দেখবেন ?

বঙ্গবন্ধু হাসলেন, তাকেতো মনি 'বাংলাদেশ টাইমস'-এর জন্য নিয়েছে।

বললাম, তাহলে চট করে কারো নাম বলতে পারবো না।

বঙ্গবন্ধু বললেন, সাইয়িদ আতিকুল্লাহকে তুমি চেনো?

লাফিয়ে উঠলাম, সবচাইতে ভালো হয় তাকে যদি নেন ! আপনি কার কাছে তার কথা জানলেন?

মনির কাছে। বঙ্গবন্ধু বললেন। টেবিলের উপর রাখা একটা কাগজ (সম্ভবতঃ কোনো কাগজের সাময়িকীর পাতা) দেখিয়ে বললেন, তার একটি কবিতাও আমি পড়েছি। তুমি তার কবিতা বোঝ?

বললাম, আধুনিক কবিতা অনুভব করার। সব সময় আক্ষরিক অর্থে বুঝতে হবে এমন কথা নেই।

বঙ্গবন্ধু হাসতে লাগলেন। বললেন, আমার দৌড়তো রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল পর্যন্ত। যদি তোমাদের আধুনিক কবিতা না বুঝি তাহলে আতিকুল্লাহ আবার রাগ করবেন নাতো?

বিস্মিত হয়ে বললাম, আতিকুল্লাহ রাগ করবেন কেন?

বঙ্গবন্ধুর মুখে তেমনি রহস্যময় হাসি। বললেন, হয়তো তিনি ভাববেন, শেখ মুজিব আধুনিক কবিতা বোঝে না, তার চাকরি করে কি লাভ ?

বললাম, আতিকুল্লাহ্ এ ধরনের কথা কেন ভাবতে যাবেন ? তিনিতো ব্যাংকেও চাকুরি করেছেন, ব্যাংকের কর্তারা কি আধুনিক কবিতা বোঝেন? আর আপনি যে কবিতা বোঝেন না তাতো নয়। কবিতা তো আপনি ভালোবাসেন।

বঙ্গবন্ধু এবার হাসি থামিয়ে বললেন, মনিকে আমি কি বলেছি জানো? আতিকুল্লাহকে আমি চাই। শুনেছি সে নাকি মুখের উপর চট করে সত্য কথাটা বলে দেয়। আমি এই সত্য কথাটা শুনতে চাই। যে কবিতা বুঝি না, তাও বুঝতে চাই। তাই ভাবছি, সাইয়িদ আতিকুল্লাহকেই গণভবনের এই চাকরিটা অফার করবো।

বঙ্গবন্ধুর মুখে এই কথাটা শোনার পর আমার একবার মনে হয়েছিল, সাইয়িদ আতিকুল্লাহর কাছে ছুটে গিয়ে তাকে এই সুসংবাদটা জানাই। পরে নিজকে সংযত করেছি। মনে হয়েছে শেষ পর্যন্ত 'প্রাসাদ-চক্রান্তে' আতিকুল্লাহ্ যদি এই অফারটা না পান, তাহলে আমাকে ভুল বুঝবেন। তার চেয়ে বরং অপেক্ষা করে দেখি কি হয়!

এর ক'দিন পরেই আমার আবার লন্ডন যাত্রা। এবার অনেকটা অগস্ত্য যাত্রার মতো। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলেন। তার সরকার উৎখাত হল। দীর্ঘ সতর বছর আমার আর দেশে ফেরা হয়নি। আতিকুল্লাহ্‌কেও জিজ্ঞাসা করা হয়নি, তাকে এই চাকরির অফারটা জানানোর সুযোগ অথবা সময় বঙ্গবন্ধুর হয়েছিল কিনা?

'৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে দেশে ফিরে যখন টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি দর্শনে যাই, তখন আমার ইচ্ছে হয়েছিল, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ্‌কে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। বঙ্গবন্ধুকে বলি, আপনি তো তাকে একবার কাছে টানতে চেয়েছিলেন। সময় পাননি, তাই এবার তাকে ধরে এনেছি। আতিকুল্লাহ্ এখানো কবিতা লেখেন। আরো চমৎকার কবিতা। আপনি কি তার কবিতা শুনবেন ?

এগার

প্রায় একযুগ আগে সাইয়িদ আতিকুল্লাহর একটা কবিতা পড়েছিলাম। 'সচিত্র সন্ধানী'র ঈদ সংখ্যায়। 'প্রার্থনার সময়'। তারতো অনেক কবিতাই পড়েছি এখানে-সেখানে; এখনো পড়ছি। কিন্তু এই কবিতাটি আমার ভালো লেগেছিল বলে ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলাম। মাঝে মাঝে পড়তাম, এখনো পড়ি।

"মধ্যরাতের ওধারে ঘন কালো অন্ধকার
চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবার পর
মনে হয় এই পৃথিবীতে একা আমিই কেবল রোগ-জর্জর
সইতে পারিনে যন্ত্রনার এত বড় ভার কিংবা অত্যাচার
আসলে যা হয় যখন তুমি থাকো না আমার কাছাকাছি
একলা চেষ্টা করে হাত-পা ছুঁড়ে দেদার চারদিকে
তবে আমি বাঁচি।
ঠায় বসে মেঝের ওপর মধ্যরাতের ওধারে
ঝড়ের মতোন আউড়ে যাই কতো কিছু সুদীর্ঘ প্রার্থনা
যেন তোমার ভালো হয় সারা বছর, বাঘ ভালুক না পারে
তোমাকে কামড়াতে কোনো সময়, জ্বলন্ত এক দুর্ভাবনা
আমাকে বসিয়ে রাখে ভোর হবার আগ পর্যন্ত ঠিক টান দেওয়া
এক ধনুকের মতো শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস। যেচে টেনে নেওয়া
বুকের ওপর যা কিছু দুর্বিষহ তোমার জন্যে যখনি তুমি থাকো
দু'চোখের আড়ালে দূরে, নাগালের বাইরে আর মানে নাকো
কিছুতেই দূরত্ব ছাড়া অন্য কোনো কিছু কিংবা হৃদয়

তখনি বিনিদ্র রাত, উত্তীর্ণ মধ্যযামে প্রার্থনার সঠিক সময়-"

কবিতাটি বড়। মাত্র অর্ধেকটা এখানে তুলে ধরলাম। পুরো কবিতাটির আমেজ একরকম। আবার ভাগ করে পড়লে আলাদা। যেমন-" গোলাগুলির শব্দ, ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর হঠাৎ বিশৃঙ্খলা শহরের বুকে/আরও একটি সামরিক অভ্যুত্থানে অনেকেই হিসাব মিলাচ্ছে তাল ঠুকে।" এখানে এসে আমার মতো পাঠকমন বড় রকমের নাড়া খায়। মনে হয়, উত্তীর্ণ মধ্যযামে প্রার্থনার সঠিক সময়ের আবিষ্টতা থেকে, একটি একান্ত আলাপের অনুভব থেকে যেন ইয়াহিয়া কিংবা জিয়া- এরশাদের বধ্যভূমির বাস্তবতায় ফিরে এলাম। আফ্রিকার অথবা ল্যাটিন আমেরিকার কোনো বধ্যভূমির সঙ্গে বাংলাদেশের যে বধ্যভূমির বড় মিল এবং ব্যক্তিমনের প্রার্থনায় উচ্চারিত একান্ত আলাপ যেখানে পলাতক ও নিরুদ্দিষ্ট।

আমাদের পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমান নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এই দশক থেকে বাংলাদেশের কবিতায় ধীরে ধীরে একটা প্রভাব বলয়ও তৈরি করেছেন। তার এই প্রভাব বলয়ের বাইরে বাস করা অনেক সমসাময়িক অথবা তরুণ কবির পক্ষেই ছিল অসম্ভব ব্যাপার। চেষ্টা করেছেন অনেকেই। যেমন হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ। হাসানের কবিতার শক্তিশালী গদ্যময়তা এবং রাজনৈতিক চেতনা, আলাউদ্দিন আল আজাদের সহজ, উচ্চকণ্ঠ যুগযন্ত্রণার রাজনৈতিক ভাষ্য, শামসুল হকের নিজস্ব শব্দের যাদু, নগর চেতনা এবং বাকবৈদগ্ধ বাংলাদেশের আধুনিক কবিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে; কিন্তু নিজস্ব কিংবা নতুন বলয় তৈরি করেনি। শামসুর রাহমান তার প্রথম কবিতার বইয়ের নাম রাখতে চেয়েছিলেন "মেধাবী রাতের নদী"। তার এই মেধা আত্মস্থ করেছিল জীবনানন্দ থেকে শুরু করে অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন পর্যন্ত ত্রিশের ও চল্লিশের আধুনিক কবিদের সকল ঐতিহ্যকে। জীবনানন্দের অনাগরিক, নিঃসর্গ-চেতনায় তিনি স্থিত ছিলেন দীর্ঘকাল। কিন্তু মহাযুদ্ধোত্তর নগরজীবন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ তার কবি চেতনাকে বার বার নির্মাণ করেছে। বলা উচিত পুনর্নির্মাণ করেছে।

শামসুর রাহমানের এই ধীর-বিস্তৃত প্রভাব বলয়ের বাইরে সাইয়িদ আতিকুল্লাহকে আমার সবসময়েই মনে হয়েছে একটি নিরুচ্চার ব্যতিক্রম। তিনি নিজে কোনো বলয় সৃষ্টি করেননি, আবার কোনো বলয়ে হারিয়েও যাননি। নিজস্ব ছোট জ্যামিতিক বৃত্তেই সকল সময়ে রয়েছেন সমাসীন। কথা বলেছেন একমাত্র নিজের ভঙ্গিতে। ষাটের দশকে যখন নির্মলেন্দু গুণ, রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রফিক আজাদ, আবুল হাসানের মতো শক্তিশালী তরুণ কবিদের আবির্ভাব ঘটে, তখনও আতিকুল্লাহ নিজের বৃত্তে নিজের ভাষায় কথা বলেছেন। তিনি এগিয়েছেন। পিছু হটেননি। পঞ্চাশের অনেক কবির মতো কোনো নতুন বলয়ের আড়ালে হারিয়েও যাননি।

তিরানব্বুই সালের জানুয়ারি মাসে সাইয়িদ আতিকুল্লাহর সঙ্গে আবার দেখা হল গাজী শাহাবুদ্দিনের বাসায়। 'সচিত্র সন্ধানী'র সম্পাদক গাজী শাহাবুদ্দিন। তার আমন্ত্রণে সেই রাতে অনেকেই এসে জুটেছিলেন। শামসুর রাহমান, ফয়েজ আহমদ, কাইয়ুম চৌধুরী, ডঃ আনিসুজ্জামান, মতিউর রহমান এবং আরো অনেকে। সাইয়িদ আতিকুল্লাহতো অবশ্যই। ভোজন এবং আড্ডা সেই দুপুর রাত পর্যন্ত। মনে হল যেন পঞ্চাশ দশকের সেই সওগাতী আড্ডা। আমাদের কারো যেন বয়স বাড়েনি। আমরা সকলেই তেমনি চপল, চটুল এবং অসংযমী। ফয়েজ যখন কথা বলেন, তাকে থামানো যায় না। এম. আর. আখতার মুকুলের গল্পের ভাণ্ডার অফুরান। কিছুমাত্র বদলাননি। সাইয়িদ আতিকুল্লাহ্ও বেশি কথা বলেন না। যেটুকু বলেন তাতে রাখ রাখ গুড় গুড় ভাব নেই। সওগাত অফিসের সাহিত্য সভায় বসে কারো খুশির তোয়াক্কা না করে যেমন নিজের কথাটি অসঙ্কোচে বলতেন, আজো তেমনি বললেন দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দল ও তার নেতা সম্পর্কে নিজের মত। কেউ তার সঙ্গে একমত হলেন কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

আমরা অনেকেই যে আজ আর পঞ্চাশের দশকের তরুণ নই, একথা সেদিন 'সন্ধানী'র আড্ডায় বসে একবারও মনে পড়েনি। অনেকের সঙ্গেই যে বহুকাল দেখা হয়নি, সেকথাও একবার স্মরণ হয়নি। মনে হয়েছে, সওগাতী আড্ডার মতোই বুঝি সপ্তাহ না ঘুরতে শুক্রবারের সন্ধ্যায় আমরা আবার মিলিত হয়েছি এবং পরস্পরের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে তর্কে ও বাক-বিতণ্ডায় মেতে উঠেছি। মাঝরাতে যখন পান-ভোজন ও আড্ডা সমাপ্তি, তখন মনে পড়লো প্রত্যেকেরই নিজের নিজের কথা। শামসুর রাহমান একটা বড়রোগের ধকল কাটিয়ে উঠেছেন, তার আর রাতজাগা ঠিক নয়। ফয়েজ থাকেন জামাতীদের আস্তানার কাছে; তাকে সাবধান হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। আনিসুজ্জামানের হার্টের অসুখের পরীক্ষা হয়েছে বেশিদিন নয়, রাতজাগার ব্যাপারে তারও সাবধানতা দরকার। আমার পায়ে বাতের ব্যথা; মনে পড়লো হট্টগোলে আজ ওষুধ খাওয়া হয়নি। সবশেষে সাইয়িদ আতিকুল্লাহ মুখ খুললেন। তিনিও কি একটা রোগে ভুগছেন। গাজী শাহাবুদ্দিনের বাসায় সেদিনের সন্ধ্যায় আমরা অনেকেই এসেছিলাম পঞ্চাশের তরুণ সেজে। মাঝরাতে আড্ডা ভেঙ্গে গেলে, বিদায় নেবার সময় আমরা হয়ে গেলাম নব্বুইয়ের দশকের প্রৌঢ়। মনে পড়লো এই আসরে সওগাতের আড্ডার অনেকেই আজ নেই। তারা আছেন আজিমপুরে অথবা বনানীতে। গাজীর বাসা থেকে গাড়িতে বাসায় ফেরার পথে নিজের মনেই গান গাইলাম, 'আর কি কখনো কবে/ এমনও সন্ধ্যা হবে/ জনমের মতো হায় হয়ে গেল সারা।'

আজকাল ঢাকা ও লণ্ডনের দূরত্ব খুব বেশি নয়। আমার ছোট বেলায় স্টীমারে ও

ট্রেনে চেপে বরিশাল থেকে কলকাতায় যেতে যত সময় লাগতো, এখন বিমানে ঢাকা থেকে লণ্ডনে যেতে তত সময় লাগে না। পদ্মার ইলিশ, লাউ শাক, কলমি শাকও এখন লণ্ডনের বাজারে পাওয়া যায়। রাজশাহীর আম, লিচু, জলডুবির আনারস, বগুড়ার দই, মুক্তগাছার মণ্ডা-কি পাওয়া যায় না লণ্ডনে? ঢাকার গানের ক্যাসেট,বই আর খবরের কাগজে ব্রিকলেনের দোকান ভর্তি। লণ্ডনে বসে এখন হাত বাড়ালেই বাংলাদেশ।

লণ্ডনের অদূরে ডিউজবারি শহরে নাকি লর্ড ক্লাইভের কবর। গল্প শুনেছি, এক বাঙালি তরুণ এই কবরের উপর একদিন পেচ্ছাব করতে যাচ্ছিল। তার এক বন্ধু বাধা দিল, এই এই কি করছিস? প্রথমজন বলল, 'এই হারামজাদার কবরে পেচ্ছাব করতে চাই। এই ব্যাটাইতো নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে হত্যা করেছে, আমাদের দেশটাকে লুট করে শেষ করে দিয়েছে।' দ্বিতীয় জন বলল, ' তোর সব কথাই মেনে নিলাম; কিন্তু তুইও তো একথা স্বীকার করবি; আজ আমরা যে লাখ দেড়েক দুয়েক বাঙালি এদেশে আছি, এই ব্যাটা ডাকাতই তাদের গ্রেট গ্রেট গ্রাণ্ড ফাদার। তিনিই আমাদের এদেশে আসার পথ করে দিয়েছেন। তার অছিলাতেই আমরা এদেশে এসে দুটো পাউণ্ড কামাচ্ছি। তুই যে আজ ঘরে ইংরেজ বিবি নিয়ে এদেশে তন্দুরি রেস্তোরাঁর ব্যবসা চালাচ্ছিস, তাও কি এই লর্ড সাহেবের কৃপায় নয়?

বন্ধুর যুক্তি শুনে সেই তরুণ বাঙালি ক্লাইভের কবরে সেদিন আর পেচ্ছাব করেনি।

তাই বলছিলাম, লণ্ডনে এখন হাত বাড়ালেই বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশের যে জিনিষটি এখানে শত মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যায় না, তা হচ্ছে ঢাকার সেই জমজমাট আড্ডা। বাংলাদেশে সাহিত্য, রাজনীতি, ব্যবসা সবই আড্ডা কেন্দ্রিক। বিলেতে সব কিছুই রুটিন মাফিক, ঘড়ি বাঁধা, নিয়ম মাফিক। আমি যখন লণ্ডনের বাংলা সাপ্তাহিকের সম্পাদক, নিজের একটা অফিসঘর ছিল, তখনো আড্ডা বসানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। বন্ধু এসেছেন। চা পানিরও ফরমাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঘড়ি ধরে সবাই একে একে অথবা সদলে বিদায় নিয়েছেন। কারো হয়তো বিকেল চারটেয় নার্সারি থেকে ছেলেমেয়েকে ঘরে নিতে হবে। কারো স্ত্রী কোনো টিউব ষ্টেশনে অপেক্ষা করছেন। তাকে ঠিক সন্ধ্যে ছ'টায় ষ্টেশন থেকে গাড়িতে তুলে বাসায় নিয়ে যেতে হবে। কারো স্ত্রী অফিসে কাজ করেন, আজ ঘরে ফিরতে দেরি হবে, তাই স্বামীকেই ঘরে ফিরে রান্না সারতে হবে। কারো আজ সন্ধ্যায় সেন্সবারিতে শপিং না সারলেই নয়। কেউ বা লাষ্ট উইক এণ্ডে বাড়িতে হুভারিং-এর কাজটা সারতে পারেননি, আজ সন্ধ্যায় সারবেন; কারণ, এই উইক এণ্ডে বাসায় পার্টি বসবে। কারো ফিস্ট্যাঙ্কের পানি বদলানো হয়নি; কারো বিড়ালকে খাবার দিয়ে আসা হয়নি; আড্ডার

এক মহিলা একদিন বললেন, তিনি বেবি মাইন্ডারের কাছে বেবি রেখে এসেছেন, এখন তার বেবি কালেক্ট করার সময়। কোনো কোনো তরুণ বন্ধুকেতো সন্ধ্যা ছ'টার পর আড্ডায় ধরে রাখা যায় না; তার গার্ল ফ্রেন্ড অপেক্ষা করছে কোনো পাবে কিম্বা আন্ডার গ্রাউন্ড ষ্টেশনে।

লন্ডনে তাই আড্ডা জমানো সহজ নয়। অফিসে নয়, বাসাতেও নয়। বাসায় সন্ধ্যার পর বুড়ো মানুষদের আড্ডা ছেলেমেয়েরা পছন্দ করে না। তাদের হোমওয়ার্ক অথবা টিভি দেখার ডিষ্টার্ব হয়। কারো কারো স্ত্রী স্বামীর মুখের উপর বলে দেন, "এটাতো আর তোমাদের ঢাকা নয় যে, দশ-পাঁচটা ঝি পাওয়া যায়। সারাদিন খেটেখুটে সন্ধ্যায় একটু বিশ্রাম করবো, তাও তোমাদের জ্বালায় পারি না।"

দিনে দুপুরে মন খারাপ হলে কোনো বন্ধুর অফিসে ঢু মারবো সে উপায়ও লন্ডনে নেই। বন্ধু যদি বড় অফিসার কিম্বা বড় ব্যবসায়ী হন, তাহলে তার সেক্রেটারিই পথ্ আগলে বসে থাকবে। বলবে, 'এপয়েন্টমেন্ট নেই, আজ দেখা হবে না।' যেসব বন্ধুর সেক্রেটারি নেই, তারা হাতঘড়ি দেখিয়ে বলবেন, সরি ফ্রেন্ড, একটা জরুরী এপয়েন্টমেন্ট আছে। তুই বরং একদিন আগে টেলিফোন করে চলে আসিস। দুপুরের কুইক লাঞ্চটা আমার সঙ্গেই সেরে যাবি।

লন্ডনে তাই সব আছে, আড্ডা নেই। ঢাকাইয়া কিম্বা কলকাতাইয়া আড্ডা। সাইয়িদ আতিকুল্লাহর অফিসকক্ষের মতো এখানে কোনো বন্ধুর অফিস কক্ষকে ইচ্ছে হলেই আড্ডাঘর বানানো যায় না। ঢাকার রাস্তায় কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে কেউ কাউকে সহজে ছাড়তে চাই না। এখানে হ্যাল্লো বলে পাশ কাটাতে হয়। যদি কাউকে বলি, একটু ফ্রি আছিস? কথা বলবো। অমনি তিনি পকেট থেকে ডায়েরি বের করেন। আজ তার ক'টা এপয়েন্টনমেন্ট, তা ব্যস্ততার সঙ্গে বলেন। ব্যস্ত না থাকলেও ব্যস্ততার ভান করেন। এই ভান করাটাই এখানকার কর্মাশিয়াল কালচার। সম্ভবতঃ সোস্যাল কালচারও।

লন্ডনে এসে প্রথম দিকে তাই আড্ডার বিরহে, আড্ডাবিহনে দারুণ কষ্ট পেয়েছি। বার বার মনে পড়েছে পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের ঢাকাইয়া আড্ডার কথা। 'ইত্তেফাক' অফিসে মানিক মিয়ার রাজনৈতিক আড্ডা, 'সওগাত' অফিসে সাহিত্যের আড্ডা, ওয়াহিদুল-সনজিদার বাড়িতে গানের আড্ডা, প্রেসক্লাবের চা ও তাসের আড্ডা, আরও কত আড্ডার কথা। এসব আড্ডায় ছেলে-বুড়ো, নবীন-প্রবীণ, অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। সবাই মন খুলে, যার যা খুশি কথা বলতেন। 'সওগাতের' সাহিত্যের আড্ডায় অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী একদিন দাঁড়িয়ে সাহিত্যের একটা গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে কথা বলছেন, তখন সেই আড্ডাতে হাজির খালেদ চৌধুরীও। খালেদ চৌধুরী সাহিত্যিক নন। তখন

ছিলেন সাহিত্য-প্রেমী। 'সওগাতে'র সকল দিনের আড্ডায় তার নিত্য হাজিরা। তিনি কথাও বলতেন বঙ্কিমি যুগের বইয়ের ভাষায়। বলতেন, তাতে সংক্ষেপে অনেক বেশী কথা বলা যায়। সেদিন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর বক্তৃতা শুনতে শুনতে ভাবাবেগে তার কথায় সায় দিয়ে খালেদ মাথা দুলিয়ে বলে উঠলেন, 'অবশ্য অবশ্য।' মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তার কথা শুনে কি বুঝলেন, তিনিই জানেন। নিজের কথা থামিয়ে হঠাৎ তিনি বসে পড়লেন। সবাই বিস্মিত হয়ে শুধালেন, আপনি থেমে গেলেন যে? মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বললেন, আমাকে খালেদ চৌধুরী বসে পড়তে বললেন যে! তার কথা শুনে, সওগাতে'র আড্ডায় হাসির রোল উঠেছিলো।

সত্তরের দশকের কলকাতাতেও দেখেছি, এই জমজমাট আড্ডা। গঙ্গার স্রোত যে বুড়িগঙ্গার স্রোত থেকে আলাদা নয়, তার প্রমাণ পেয়েছি কলকাতার আনন্দবাজারের আড্ডায়; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অফিস আর বাড়ির আড্ডায়, কৃত্তিবাসের' সাহিত্যের আড্ডায়। সুনীলের গড়িয়াহটার বাড়ির আড্ডায় আসতেন অনেক সাহিত্যিক; সন্তোষ কুমার ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ এবং আরও অনেকে। উপকরণ চা ড্রিংক্স গান কবিতা। শুনেছি, ঢাকার কবি বেলাল চৌধুরীও ছিলেন এককালে এই আড্ডার একজন সদস্য। তার সঙ্গে এই আড্ডায় আমার কখনো দেখা হয়নি।

আনন্দবাজার অফিসে তখন একই রুমে বসতেন গৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী) এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বিকেলের দিকে কোনো কোনো দিন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চটোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু এসে জুটতেন। আসতেন গৌর কিশোর ঘোষ ও সুনীলের ভক্ত ও অনুরাগীদের কেউ কেউ। চা আসতো। আসতো কাগজের ঠোঙায় মুড়ি আর পেয়াজু। ডালমুট, সিঙ্গারা, গরম জিলিপি। আমি থাকতাম সেন্ট্রাল ক্যালকাটায় নিজাম প্যালেসের একটা কামরায়। বিকেলে ট্রামে চেপে এই আড্ডায় আসা আমার একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গৌরদা আমাকে দেখলেই বলতেন, গাফ্ফার, তুমি জিভেগজা খাবে'? তিনি জানতেন, এই মিষ্টি আমার খুব প্রিয়। কিন্তু এই মিষ্টির চাইতেও আমার কাছে যা অধিক প্রিয় ছিল, তা গৌরকিশোর ঘোষের সরস আড্ডা জমানো গল্প।

একদিন বিকেলে আনন্দবাজার অফিসে ঢুকবো বলে ট্রাম থেকে ধর্মতলার মোড়ে নেমেছি; দেখি, রাস্তার মাঝখানে একটা তেলের ড্রামের উপর দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশের জায়গায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় ট্রাফিক কন্ট্রোল করছেন। দেখেই বুঝলাম তার হুঁশ নেই। উল্টোপাল্টা হাত দেখিয়ে গাড়ির ড্রাইভারদের বিভ্রান্ত করছেন। যে কোনো সময় একটা এক্সিডেন্ট ঘটতে পারে। পাঞ্জাবী আর শিখ ড্রাইভারেরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাকে বাপ তুলে গালি দিচ্ছে। আমি এক মুহূর্ত ভাবলাম। তারপর বহুকষ্টে

রাস্তার মাঝখানে তেলের ড্রামের কাছে গেলাম। বললাম, শক্তি যেকোনো সময় পুলিশ এসে পড়লে আপনাকে গ্রেফতার করবে। আপনি নেমে আসুন।

শক্তি তেলের ড্রাম থেকে নামতে চান না। বহু কষ্টে তাকে নামালাম। তারপর একপ্রকার জোর খাটিয়ে তাকে আনন্দবাজার অফিস পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলাম। লিফ্‌ট দিয়ে উপরে উঠার সময় শক্তিকে বললাম, শক্তি আপনার দিনে ড্রিঙ্ক করা উচিত নয়। আপনি এত চমৎকার কবিতা লেখেন!

শক্তি চোখ পাকিয়ে বললেন, 'তুমি কবিতার ছাই বোঝ; তোমার কবিতা বোঝার উপর আমি পেচ্ছাব করি।;

প্রচন্ড রাগ হয়েছিল প্রথমে। সে রাগ দমন করলাম। শক্তি এখন বেঘোর। তাকে প্রথমে নিয়ে গেলাম 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কক্ষে। তিনি শশব্যস্ত হয়ে বললেন, গাফ্‌ফার, প্লিজ, ওকে অমিতাভ চৌধুরীর ঘরে নিয়ে যান।' অমিতাভ চৌধুরী তখন আনন্দাবাজারের বার্তা সম্পাদক। শক্তিও আনন্দবাজারে কাজ করেন। ছোটদের পাতা 'আনন্দমেলা'র দেখাশোনার ভার তার ওপর। অমিতাভ চৌধুরীর ঘরে শক্তিকে নিয়ে যেতেই তিনি টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেন, বললেন, আমি ওর স্ত্রীকে টেলিফোন করে দিচ্ছি, এসে ট্যাক্সি করে বাড়িতে নিয়ে যাক।

দু'দিন পরে 'আনন্দবাজারের' আড্ডাতেই আবার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে জিভ কেটে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ভাই, পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাই। সেদিন বেঘোরে আপনাকে কি বলেছি, না বলেছি, কিছু স্মরণ নেই। খুবই অপরাধ করেছি। বলুন, আপনি আমাকে ক্ষমা করলেন?

গৌরদা বললেন, 'শক্তি, তুমি গাফ্‌ফারকে জিভেগজা খাওয়াও, তাহলেই সে তোমাকে ক্ষমা করে দেবে।'

এই হল গঙ্গা এবং বুড়িগঙ্গা। কলকাতা এবং ঢাকা। লন্ডনে এই আড্ডা নেই। শক্তি, সুনীল, আতিকুল্লাহ কেউ নেই। লন্ডন অনেক বড় শহর। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ যেন বড়ই নিঃসঙ্গ।

বারো

'বাংলার বাণী'র অফিসটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম সেদিন। সঙ্গে রইলেন শেখ সেলিম, শেখ মারুফ এবং আমার পুরনো ও নতুন সাংবাদিক বন্ধুরা। 'বাংলার বাণী'র এখন রয়েছে অত্যাধুনিক ছাপাখানাও। তাছাড়া ডেস্কটপ টাইপ সেটিং ব্যবস্থা। 'বাংলাদেশ টাইমস' এখন আর বাণী পাবলিকেশন্স গ্রুপের কাগজ নয়। কিন্তু 'সিনেমা' সাপ্তাহিক এখনো রয়ে গেছে। শেখ ফজলুল হক মনির আমলে এটি

ছিল ব্রডশিট পত্রিকা। এখন ম্যাগাজিন সাইজের মাল্টিকালার সাপ্তাহিক। শেখ মারুফ এখন এই সিনে সাপ্তাহিকের সর্বাধিনায়ক।

'বাংলার বাণী' অফিসের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িত। যদিও এই অফিসে 'বাংলার বাণী' স্থানান্তর হওয়ার পর আমি আর কাগজটির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। কিন্তু প্রায়ই আসতাম এই অফিসে। কখনো শেখ মনি, কখনো আবদুল আওয়াল খানের ঘরে আড্ডা দিতাম। আওয়াল তখন ছিলেন 'বাংলার বাণী'র বার্তা-সম্পাদক। আমার দীর্ঘকালের বন্ধু এবং সাংবাদিক সহকর্মী। আওয়াল যখন যে কাগজে চাকরি করেছেন, সেই কাগজেই আমাকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। 'বাংলার বাণী'তে আমার তখন যোগ দেয়ার পেছনে আরেকটি বড় কারণ ছিল আওয়ালের নেপথ্য ভূমিকা। সত্তরের দশকের গোড়ায় 'বাংলার বাণী' অফিসে গেলে শেখ মনি ও আওয়াল দু'জনের ঘরেই আমাকে ঢু মারতে হতো। শেখ মনির ঘর প্রায়ই থাকতো লোকজনে ভর্তি। শ্রমিক লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীরা শেখ মনির ঘর জুড়ে বসে থাকতেন। তার সঙ্গে একান্তে আলাপ করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার।

তবু তার সঙ্গে আমার একদিন মুখোমুখি তর্ক হল; আনোয়ারুল ইসলাম ববি এবং আনোয়ার জাহিদকে বাণী গ্রুপের পাবলিকেশন্সে পরিচালনা ও সম্পাদনা বিভাগে চাকরি দেয়া নিয়ে। আনোয়ার জাহিদকে করা হয়েছিল বাংলাদেশ টাইমস-এর বার্তা-সম্পাদক এবং আনোয়ারুল ইসলাম ববি পেয়েছিলেন গ্রুপ পাবলিকেশন্সের ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব। দু'জনেই অত্যন্ত যোগ্য লোক সন্দেহ নেই। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাদের ভূমিকা ছিল দুঃখজনক। (আনোয়ারুল ইসলাম ববি মারা গেছেন। তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।) ববিকে তবু ক্ষমা করা যায়। কিন্তু আনোয়ার জাহিদের ভূমিকা ছিল জঘন্য জাতিদ্রোহিতার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদি দেশদ্রোহী ও কোলাবরেটরদের প্রকৃত বিচার হতো, তাহলে আনোয়ার জাহিদের ভাগ্যে কি ঘটতো, সে সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

অদৃষ্টের কি পরিহাস; ঢাকায় আমার সাংবাদিক জীবনে যে দু'ব্যক্তি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারা হলেন, আনোয়ার জাহিদ এবং আনোয়ারুল ইসলাম ববি। ষাটের দশকের শেষদিকে ববি যখন তার আত্মীয় হামিদুল হক চৌধুরীর 'অবজার্ভার গ্রুপের' প্রকাশনায় যোগদান করেন, তখন আমি 'দৈনিক পূর্বদেশের' সহকারী সম্পাদক। বয়সের দিক থেকেও আমরা ছিলাম কাছাকাছি। সুতরাং সহজেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। অবজার্ভার অফিসের পেছনেই পূর্বাণী হোটেল। সন্ধ্যায় 'অবজার্ভার' অফিস থেকে বেরিয়ে 'পূর্বাণীর' 'জলসা ঘরে' বসে পান-ভোজন এবং আড্ডা দেওয়া ছিল আমাদের একটি নিয়মিত কাজ। এই আড্ডায় মাঝে মাঝে এসে

জুটতেন জহির রায়হান, সুর শিল্পী আলতাফ মাহমুদ। জহির সম্ভবতঃ তখন 'লেট দেয়ার বি লাইট' ছবি তৈরির পরিকল্পনা করছেন। যতদূর মনে পড়ে, একদিন তখনকার নতুন নায়িকা অলিভিয়াকে নিয়েও তিনি এসেছিলেন এই আড্ডায়।

ববির সঙ্গে মিশতে গিয়ে একটা কথা বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি তার নানা হামিদুল হক চৌধুরীর মতোই মুজিব-বিরোধী (হামিদুল হক ছিলেন মুজিব বিদ্বেষী) এবং আওয়ামী লীগের ভালো কাজেরও সমালোচক। আমি তার সঙ্গে সন্তর্পণে রাজনৈতিক আলাপ এড়িয়ে চলতাম। 'অবজার্ভার' অফিসে ববির ঘরে বসে যখন আড্ডা দিতাম, তখন আরও একজন সেই আড্ডায় এসে জুটতেন, তিনি হামিদুল হক চৌধুরীর একমাত্র ছেলে খালেদ হামিদুল হক। খালেদ ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ার জন্য বিদেশে কাটিয়েছেন। তখন দেশে ফিরে 'অবজার্ভারের' 'লিগ্যাল এডভাইজার' পদে বসেছেন। খালেদ এবং ববি দু'জনকে দেখেই আমার মনে হতো, এই দু'জন মানুষই অতি সজ্জন, উচ্চ শিক্ষিত এবং মার্জিত রুচির; কিন্তু শিকড়হীন ব্যক্তিত্ব। খালেদ বাংলা পড়তেও পারতেন না। বিদেশে ইংরেজী ভাষায় লেখাপড়া শিখে, লন্ডনের সোসাইটিতে বড় হয়ে পশ্চিমা কালচারে কেতাদুরস্ত হয়েছেন; কিন্তু নিজের ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে অজ্ঞ। খালেদকে মাঝে মাঝে আমার মনে হতো, একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। বিলেতেও নিশ্চয়ই তিনি এশিয়ান বাদামী মানুষ হিসেবে শাদা সমাজের উঁচুতলায় ঠাঁই পাননি; আবার দেশে ফিরেও নিজের সমাজে ঠাঁই করে নিতে পারছেন না। এই ধরনের মানুষ ক্রমশঃ আত্মকেন্দ্রিক উন্নাসিক, কখনো কখনো 'স্নব' হয়ে ওঠেন। খালেদের মধ্যেও তার কিছু কিছু প্রবণতা তখন লক্ষ্য করতাম। নিজের যে সমাজকে তিনি চেনেন না, জানেন না, তার ভাষা, সংস্কৃতি রাজনীতির প্রতিও তার কোনো 'কমিটমেন্ট' গড়ে ওঠেনি; এটা আমি ববি চরিত্রেও লক্ষ্য করেছি। এ জন্য তাদের দোষ দেই না। যেসব বাপ মা, তাদের ছেলেমেয়েদের নিজের সমাজের তথাকথিত গ্রাম্যতা, অনগ্রসরতা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে একেবারে পশ্চিমা কায়দায় সাহেবসুবো করে মানুষ করতে চান, তারা শেষ পর্যন্ত কিছু ট্রাজিক চরিত্র তৈরি করে যান; আসল মানুষ তৈরি করতে পারেন না। আমাদের এ্যাংলো- ইন্ডিয়ান অথবা এ্যাংলো- বেঙ্গলি কম্যুনিটি থেকে অনেক উচ্চ শিক্ষিত, প্রতিভাবান মানুষ তৈরি হয়েছে; কিন্তু একজনও গান্ধী, সুভাষ বসু বা শেখ মুজিব তৈরি হয়নি।

ববি দীর্ঘকাল নিজের দেশে সাংবাদিকতার পেশায় অবস্থান করায় নিজের 'স্নবারি' ও আত্মকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও অন্যের সঙ্গে অনেকটা সহজে 'কম্যুনিকেট' করতে পারতেন। ষাটের দশকের শেষদিকে এই কাজটি খালেদ হামিদুল হক মোটেই পারতেন না। ববি ছিলেন 'ক্লেভার'; খালেদ 'সিম্পল', কিন্তু একগুঁয়ে ও জেদী। ববির চাইতে খালেদকেই আমার বেশি ভালো লাগতো। আওয়ামী লীগ ও

শেখ মুজিব সম্পর্কে তার কোনো বিদ্বেষ ও বিরূপতা ছিল না। বরং কিছুটা অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী মন ছিল তখন তার। মাঝে মাঝেই অফিসের কাজের ফাঁকে নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠলে তিনি আমার কাছে এসে বসতেন। বাংলা জানতেন না। 'পূর্বদেশ' কাগজটি উল্টো করে ধরে জিজ্ঞাসা করতেন, আজ আপনারা লীড্ নিউজ কি করেছেন?

আমি হাসতাম, কাগজটা সোজা করে ধরুন।

সত্তরের সেই নির্বাচনী ডামাডোলের দিনে খালেদ একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট্ শেখ মুজিব ওয়ান্টস? ডাজ হি ওয়ান্ট টু বিকাম এ ডি ভ্যালেরা ফর বাংলাদেশ?' (শেখ মুজিব কি চান? তিনি কি বাংলাদেশের ডি ভ্যালেরা হতে চান?)

বাংলাদেশ নামটি তখন মুখে মুখে চালু হয়ে গেছে। দেখলাম, খালেদ তার বাবার মতো 'অবসেসড্' নন। হামিদুল হক কিছুতেই বাংলাদেশ নাম উচ্চারণ করতে চাইতেন না। কিন্তু খালেদ অনায়াসে উচ্চারণ করলেন বাংলাদেশ। বাপের মতো পূর্ব পাকিস্তান বললেন না। খালেদের কথার জবাবে সেদিন বলেছি, শেখ মুজিব ডি ভ্যালেরার চাইতেও বড় নেতা। ডি ভ্যালেরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, জেল জুলুম ভুগে অর্ধেক আয়ারল্যান্ড মাত্র স্বাধীন করেছেন, শেখ মুজিব গোটা বাংলাদেশকেই মুক্ত করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমার পাঠকদের জন্য ডি ভ্যালেরা সম্পর্কে একটি গল্প (সত্য কাহিনী) এখানে উপহার দি। আয়ারল্যান্ডের মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ডি ভ্যালেরা বহুবার বৃটিশদের হাতে বন্দী হন। একবার বৃটিশরা তাকে এক নির্জন কারাবাসে পাঠিয়ে দেয়। তাকে মুক্তি দেয়া হচ্ছিল না। ডি ভ্যালেরা তখন তার এক বন্ধুকে চিঠি পাঠালেন; তাতে লিখলেন, "বন্ধু, সামনে আমার জন্মদিন। আমাকে তোমরা কি কেউ জন্মদিনের একটা কেক পাঠাবে না? তোমার কাছ থেকে একটা স্পেশাল কেক পেতে চাই। তার আকৃতি এবং মাপের বিবরণ দিলাম। আশাকরি, ঠিক আমার জন্মদিনে তোমার কেকটা আমার কাছে পৌঁছে যাবে।"

চিঠি পেয়ে বন্ধু তার মর্মার্থ বুঝলেন। তিনি ডি ভ্যালেরার জন্মদিনে সত্যি সত্যি তাকে একটা কেক পাঠালেন। আর সেই কেকের মাঝে ভরে দিলেন ভ্যালেরার বর্ণিত আকৃতি ও মাপের একটি চাবি। জেল কর্তৃপক্ষের মনে কোনো সন্দেহ উঁকি দিল না। সাধারণ একটি কেক দেখতে পেয়ে তারা সেটি ডি ভ্যালেরার সেলে পৌঁছে দিলেন। একরাতে ডি ভ্যালেরা সেই চাবির সাহায্যে সেলের তালা খুলে, জেলের দেয়াল টপকে পালালেন। তাকে আর ধরা যায়নি। আয়ারল্যান্ডের লোকসঙ্গীতে এখনো তার নামে গান শোনা যায়। ডি ভ্যালেরার ইতিহাস খুব বেশিদিন আগের নয়। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন, নানা লোকগাঁথা ও

গীতির নায়ক। একটি লোকগাঁথার বাংলা তরজমা করলে এই দাঁড়ায়ঃ

"ডি ভ্যালেরা আমাদের নেতা,
মুক্তিদাতা এবং ত্রাতা
তিনি আমাদের আত্মার আত্মীয়
আপনজন
তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন
সর্বক্ষণ।
মাটির কবরে শুয়ে তিনি
আকাশের সূর্য হয়ে জ্বলেন
আয়ারল্যান্ড আমার দেশ
আমরা আইরিশ— এই কথা তিনি বলেন।"

ডি ভ্যালেরা প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানি। খালেদ হামিদুল হকের কথায় ফিরে যাই। খালেদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার আরও একটি কারণ ছিল। কারণটি ব্যক্তিগত। ষাটের দশকে আমার মধ্যে ভালো হোক আর মন্দ হোক একটি অভ্যেস গড়ে উঠেছিল, তা হলো জেমস্ হেড্লি চেজের থ্রিলার এবং 'প্লেবয়'। ম্যাগাজিন সংগ্রহ করা এবং পড়া। হেডলি চেজের বই নিউ মার্কেটে, ষ্টেডিয়াম মার্কেটের বইয়ের দোকানে তখন পাওয়া যেতো (অবশ্যই খুঁজতে হতো)। কিন্তু 'প্লেবয়' ম্যাগাজিন পাওয়া যেতো না। কিছু পুরনো কপি বিদেশী দূতাবাসের অফিসারদের হাত ঘুরে বাজারে আসতো; তাও থাকতো একজন বা দু'জন হকারের কাছে। এই হকারদের একজন ফজলু। মুখে ছোট করে ছাঁটা দাড়ি; নোয়াখালী নিবাসী এই তরুণ হকার তখন বাড়ি বাড়ি ঘুরে টাইম, নিউজ উইক, ইকোনমিষ্ট, নিউ ষ্টেটসম্যান ইত্যাদি ম্যাগাজিন বিক্রি করতো। আমার সঙ্গে তার ছিল স্পেশাল সম্পর্ক। কিছু কিছু নিষিদ্ধ এবং দুর্লভ পত্রিকা সে আমাকে জোগান দিতো। তার মধ্যে একটি ছিল 'প্লেবয়' দাম বড় চড়া। তখনকার দিনেই প্রতিসংখ্যা পনর টাকা। ফজলু মাঝে মাঝে খাতির করে আমাকে দশ টাকায় দিতো। (এই ফজলুও এখন বেঁচে নেই।) '৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় গিয়ে তার দেখা পাইনি। অতি অল্প বয়সেই এই তরুণ বন্ধুকে আমি হারিয়েছি। খালেদ হামিদুল হক টের পেলেন, আমার বাসায় হেডলি চেজ এবং 'প্লেবয়ের' কালেকশন রয়েছে। তিনিও এই দুই নেশায় আমারই মত আসক্ত।. ফলে ঘন ঘন আমার বাসায় হানা দিতেন। বই ও ম্যাগাজিন ধার নিতেন। কোনো কোনো দিন বাসায় এসে দেখতাম, খালেদ আমার আগেই এসে সোফার উপরে বসে আছেন। আমার বাসায় তখন 'ফ্রিজ' নেই। 'মিটসেফে' রাখা মাছ কিংবা মাংস আমার স্ত্রী গরম করে দিয়েছেন। তিনি তা চা সহযোগে খাচ্ছেন

এবং 'প্লেবয়ের' পাতা উল্টাচ্ছেন।

এবার ববির কথা বলি। আনোয়ারুল ইসলাম ববি। খালেদের সঙ্গে তার চরিত্রের পার্থক্য এই যে, খালেদ সহজ এবং সরল; ববি বুদ্ধিমান এবং চতুর। ষাটের দশকের শেষদিকে শ্রমিক নেতা এবং আইয়ুব আমলের পার্লামেন্ট সদস্য মাহবুবুল হক ছিলেন একাধারে 'দৈনিক পূর্বদেশের' সম্পাদক এবং 'অবজার্ভার' গ্রুপের ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে। তিনি কিছুদিনের জন্য ছুটিতে গেলে আনোয়ারুল ইসলাম ববিকে সাময়িকভাবে তার দায়িত্ব পালনের জন্য অবজার্ভার ভবনে আনা হয়। ববি অবজার্ভারে এসেই প্রথমে মাহবুবুল হকের রুমটি দখল করলেন। তারপর অবজার্ভার ও পূর্বদেশের সাংবাদিক ও কর্মচারীদের ভেতর নিজের একটা গ্রুপ গঠনেরও চেষ্টা শুরু করলেন। মাহবুবুল হক ছুটি শেষে নোয়াখালী থেকে ঢাকায় ফিরে এসে দেখেন, তার রুমটি বেদখলে, এমনকি তার ব্যক্তিগত বেয়ারাটিও ববির পরিচর্যায় রত। ববি আভাসে ইঙ্গিতে মাহবুবুল হককে জানিয়ে দিলেন, মাহবুবুল হক যেন 'পূর্বদেশের' সম্পাদকের পদটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন; অবজার্ভারের ম্যানেজমেন্টের কর্তা হওয়ার চেষ্টা আর না করেন।

কিন্তু বুদ্ধির খেলা ও চাতুরিতে ববি যে মাহবুবুল হকের কাছে একেবারেই শিশু, তা কয়েকদিনের মধ্যেই ধরা পড়লো। নিজের কক্ষ ও পদ হারিয়ে মাহবুবুল হক প্রথমে কিছুই বললেন না। বরং ভালো মানুষের মতো চেহারা করে বললেন, 'ববি ছেলে মানুষ, একটু চেয়ারে বসতে চায় বসুক।' তিনি তার সাবেক রুমের সামনেই খোলা জায়গায় চেয়ার পেতে বসলেন। 'পূর্বদেশের' সম্পাদকীয় লেখার ব্রিফিং মিটিংও তিনি আমাদের নিয়ে সেখানে বসাতেন। হামিদুল হক চৌধুরী একদিন তা দেখে বললেন, সে কি মাহবুব, তুমি বাইরে বসছো কেন? মাহবুবুল হক বললেন, ববি ছেলে মানুষ। রুম ছাড়তে চায় না, সে ওখানেই থাকুক।

হামিদুল হক তখন আর কিছু বললেন না। মাহবুবুল হকের জন্য পাশেই একটি ছোট কক্ষ নির্ধারিত হলো। এগুলো আসল কক্ষ নয়। খোলা ফ্লোরে একেকটি জায়গা অস্থায়ীভাবে ঘিরে দিয়ে আলাদা ছোট্ট বড় অফিস কক্ষ করা হয়েছিল। মাহবুবুল হক কিছুদিন এই ছোট্ট অফিস কক্ষে বসলেন। তারপর একদিন 'অবজার্ভার' ভবনে দোতলায় উঠে দেখি, মাহবুবুল হক আবার নিজের অফিস কক্ষে পুনর্বাসিত; পাশের ছোট ঘরটিতে বসে ববি দাঁতে নখ খুঁটছেন। আমাকে দেখে রাগে গজ গজ করতে করতে বললেন, গাফফার আমি হামিদুল হক চৌধুরীর চাকরি আর করবো না।

তার রাগের কারণ বুঝতে পেরে বললাম, তোমার সব বিলেতী বিদ্যেবুদ্ধি মাহবুবুল হকের গেঁয়ো বুদ্ধির কাছে হেরে গেছে। এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে আরও বোকামি করতে যেও না।

তেরো

বালাদেশের সাংবাদিকতায় আনোয়ারুল ইসলাম ববির শেষ অবদান ইংরেজী দৈনিক 'মর্নিং সান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা। ববি জীবনে কোনদিন রাজনীতি করেননি। কিন্তু হামিদুল হক চৌধুরীর রাজনৈতিক মতের প্রভাব তিনি কোনোদিন কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। এই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি মাহবুবুল হকও। অথচ শ্রমিক রাজনীতি থেকে মাহবুবুল হকের অভ্যুদয়। রাজনীতিই ছিল তার সারাজীবনের ধ্যানজ্ঞান। আনোয়ারুল ইসলাম ববির সঙ্গে এখানে ছিল তার চরিত্রের পার্থক্য। বিস্ময়ের কথা এই যে, মাহবুবুল হক এবং ববি দু'জনেই অকালমৃত্যু বরণ করেছেন। মাহবুবুল হকের প্রতিভা, মেধা ও ব্যক্তিত্ব ববির ছিল না; কিন্তু উন্নতমানের আধুনিক সংবাদপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দু'জনেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রমিক রাজনীতিতে জড়িত থাকার সময়েই মাহবুবুল হক নোয়াখালী থেকে প্রকাশ করেছিলেন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। নাম 'পল্লীবার্তা।' ষাটের দশকের গোড়ায় হামিদুল হক চৌধুরী পত্রিকাটি তার অবজারভার গ্রুপ পাবলিকেশন্সের অন্তর্ভুক্ত করে নেন্ এবং ঢাকার 'অবজার্ভার হাউস' থেকে সাপ্তাহিক পল্লীবার্তার প্রকাশ শুরু হয়। পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে মাহবুবুল হকের নাম থাকলেও কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস এই সময় পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন। তার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পল্লীবার্তা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আইয়ুবের স্বৈরশাসন এবং বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের বৈষম্য নীতি সম্পর্কে পত্রিকাটি ছিল অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ। এই পত্রিকাতেই আবদুল গণি হাজারী তার বিখ্যাত 'কালো পেঁচার ডায়েরি' কলামটি লেখা শুরু করেন। আমিও ঈশা খাঁ এই ছদ্মনামে 'পল্লীবার্তায়' বেশ কিছুকাল একটি কলাম লিখেছি।

ষাটের দশকের শেষদিকে 'পল্লীবার্তা' কিছুকাল কেবল 'সাপ্তাহিক বার্তা' নামে প্রকাশিত হয়; তারপর 'পূর্বদেশ' নাম গ্রহণ করে। ১৯৬৯ সালে 'পূর্বদেশ' দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। কথা ছিল সন্দ্বীপ-গান্ধী নামে পরিচিত প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ 'দৈনিক পূর্বদেশের' সম্পাদক হবেন। কিন্তু মাহবুবুল হক বুদ্ধির প্যাঁচ খাটিয়ে নিজেই পত্রিকাটির সম্পাদক হয়ে বসেন। মাহবুবুল হক একই সঙ্গে ছিলেন রাজনীতিক, শ্রমিক নেতা, আইয়ুব আমলের পার্লামেন্ট সদস্য এবং শেষ পর্যন্ত হন দৈনিক পত্রিকার ব্যবস্থাপক ও সম্পাদক।

বক্তা হিসেবেও মাহবুবুল হকের কোনো তুলনা ছিল না। ইংরেজী ও বাংলা

দু'ভাষাতেই তিনি অগর্নল বক্তৃতা দিতে এবং শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। পাকিস্তানে আইয়ুব আমলের পার্লামেন্টে মাহবুবুল হকের বক্তৃতা কখনো কখনো সরকারী দলের এমপি ও মন্ত্রীদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করতো। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা ও বৈষম্যনীতি সম্পর্কে তিনি পার্লামেন্টে যেসব তথ্য ও দলিলপত্র তুলে ধরতেন, তার জবাব দেওয়া আইয়ুবের মন্ত্রীদের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হতো না। এজন্য তখন অনেকেই মনে করতেন, মাহবুবুল হক পার্লামেন্টে যেসব বক্তৃতা দেন, তার পেছনে হামিদুল হক চৌধুরীরি ব্রিফিং রয়েছে। একবার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য ও বঞ্চনা নীতি সম্পর্কে মাহবুবুল হক পার্লামেন্টে কয়েক ঘন্টাব্যাপী এমন আবেগময় অথচ তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন যে, ঢাকার অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকায় তা প্রথম পাতায় লীড় নিউজ করা হয় এবং একটি কাগজে সেই খবরের হেডিং দেওয়া হল—"জাতীয় সংসদে (পার্লামেন্টে) ক্রুদ্ধ ফণিনীর গর্জন।" সেবার পার্লামেন্ট অধিবেশন শেষে মাহবুবুল হক রাওয়ালপিন্ডি থেকে ঢাকায় ফিরে এলে ঢাকা বিমানবন্দরে সকল বিরোধী দলের নেতা তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানান।

মাহবুবুল হক সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সন্দেহ নেই, হামিদুল হক চৌধুরীর সান্নিধ্য ও প্রভাব তার চরিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। আবার এই প্রভাবই হয়েছে এমন একজন সম্ভাবনাময় রাজনীতিকের ট্রাজিক পতনেরও কারণ। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত মাহবুবুল হক বাঙালির জাতীয়তবাদী রাজনীতির মূল ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে পারেননি। আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের নেতৃত্ব সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত বিরূপতাও এর একটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে বলে আমার ধারণা। এই ব্যাপারে হামিদুল হক চৌধুরীর আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ তাকে প্রভাবিত করে থাকলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হামিদুল হক চৌধুরী পাকিস্তানে পলায়ন করেন এবং মাহবুবুল হক কোলাবরেশন আইনে অভিযুক্ত হয়ে কারাবন্দী হন। জেল থেকে তিনি যখন মুক্ত হন, তখন তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। এ সময় তার মোহাম্মদপুরের বাসায় আমি প্রায়ই যেতাম। বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনি আমার সঙ্গে গল্প করতেন। রাজনীতির গল্প। দেখতাম, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি তখনো চিন্তাভাবনা করছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "দেশ স্বাধীন হয়েছে, শেখ মুজিব ক্ষমতায় বসেছেন। বাইরের শত্রু পরাজিত। কিন্তু 'এনিমি উইদিন'—ভেতরের শত্রু পরাজিত হয়েছে কি? তারা সাময়িকভাবে পশ্চাৎপসরণ করেছে। সুযোগ পেলেই তারা আঘাত হানবে। শেখ মুজিব এই আঘাত সামলানোর কোনো কথা আগেভাবেই চিন্তাভাবনা করছেন কি? মাহবুবুল হকের এই প্রশ্নের কোনো জবাব আমি কখনো দেইনি। ভাবতাম, এটা তার রুগ্ন ও হতাশ মনের অহেতুক শংকা।

মাহবুবুল হক হৃদরোগে আকস্মিকভাবে মারা যান ১৯৭৪ সালের ৫ই জুন বুধবার রাত আটটায় ঢাকায় তার মোহাম্মদপুরের বাসায়। তার মাত্র একদিন আগে ৩রা জুন সোমবার সারা বিকেল আমি তার সঙ্গে কাটিয়েছি। ঢাকায় তখন বাংলাদেশ জাতীয় সম্পাদক পরিষদের অর্গানাইজিং কমিটি গঠনের উদ্যোগ চলছে। আমাকে চেয়ারম্যান হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আমি অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যাপারে বেশিরভাগ সময় তখন কলকাতায় থাকি; নিজে যে দৈনিক পত্রিকাটির সম্পাদনা করি, সেটিও ভালভাবে দেখাশোনা করতে পারি না; এই অবস্থায় দেশের জাতীয় সম্পাদক পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত হবে কিনা, তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। মাহবুবুল হককে সে কথা বলতেই তিনি বললেন, 'তুমি কোনো দ্বিধা না করে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করো। দেশ মাত্র স্বাধীন হয়েছে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতেও ক্ষমতায় যেতে পারেনি। তাকে একটি রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় যেতে হয়েছে। ক্ষমতায় বসে তারা একটু বাড়াবাড়ি করবেই। এই সময় শেখ সাহেবের কাছাকাছি একজন লোকের সম্পাদক পরিষদের চেয়ারম্যান থাকা উচিত। দেশে স্বাধীন সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা তাকে সব সময় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার।

৪ঠা জুন মঙ্গলবার যেতে হয়েছিল সাভারে। অসুস্থ মাহবুবুল হককে আর দেখতে যাওয়া হয়নি। তাছাড়া মনে হচ্ছিল, তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। সুতরাং মনে ততটা তাড়া ছিল না। ৫ই জুন বুধবার সন্ধ্যা ছ'টায় 'পূর্বাণী হোটেলে' বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের বৈঠক শুরু হল। নির্বাচিত হল অর্গানাইজিং কমিটি। আমার আশংকা ছিল, শেখ ফজলুল হক মনি অথবা 'সংবাদের' আহমেদুল কবির আমার চেয়ারম্যান হওয়াটা হয়তো পছন্দ করবেন না। কিন্তু দু'জনেই আমাকে সমর্থন জানালেন। সেবার বাংলাদেশ জাতীয় সম্পাদক পরিষদের চেয়ারম্যান হলাম আমি, সেক্রেটারী হলেন এহতেশাম হায়দার চৌধুরী (তখন তিনি 'দৈনিক পূর্বদেশের' সম্পাদক) এবং ট্রেজারার হলেন 'ইত্তেফাকের' আনোয়ার হোসেন মঞ্জু।

রাত দশটার দিকে সদরঘাটে দৈনিক জনপদের' অফিসে গেলাম টুকিটাকি কাজ সারতে। 'দৈনিক জনপদের' সম্পাদকীয় বিভাগের অফিস তখন সদরঘাটে পুরনো অবজারভার হাউসের দোতলায়। অফিসে পৌঁছে দেখি ইলেকট্রিসিটি নেই। এটা তখন ঢাকায় হরহামেশা হচ্ছে। তার উপর জোর বৃষ্টি। অফিসে প্রত্যেকটি টেবিলে একটি-দুটি মোমবাতি জ্বলছে। তাতে অন্ধকার দূর হয়নি। বরং চারদিকে কেমন একটা ভৌতিক আবছা পরিবেশ। ঠিক এই সময় আমাকে জানানো হল, রাত আটটায় মাহবুবুল হক ইন্তেকাল করেছেন।

এই ঝড়ো অন্ধকার রাতে প্রচন্ড শব্দে একটা বাজ পড়লেও সম্ভবতঃ আমি এতটা চমকে উঠতাম না, যতটা চমকে উঠলাম মাহবুবুল হকের মৃত্যু সংবাদ শুনে।

হঠাৎ যেন মূক ও বধির হয়ে গেল আমার সমস্ত চেতনা। খবরটা শুনে অনেকটা সময় চুপ করে বসে রয়েছি। কোনো কথা বলতে পারিনি। সাংবাদিক হিসেবে মাহবুবুল হক আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। উনসত্তর ও সত্তর সালে 'পূর্বদেশের' সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার সময় তার ব্যক্তিত্বের জাদু আমাকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তার রাজনীতি আমি কখনো সমর্থন করিনি, পছন্দও করিনি। '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তার ভূমিকা আমার কাছে মনে হয়েছে দুঃখজনক। অথচ এই মানুষটি ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙালি। রাজনীতিক হিসেবে, পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে,সম্পাদক হিসেবে বাঙালির স্বার্থ ও অধিকারের জন্য সারাজীবন লড়াই করেছেন। অথচ এই স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামের চূড়ান্ত দিনটি যখন এগিয়ে এলো তখন তিনি রইলেন দূরে, অপর পক্ষের শিবিরে। তার এই ভূমিকা আমি কখনো ক্ষমা করতে পারিনি। একথা তিনিও জানতেন। তবু তার প্রতি আমার ছিল অসীম দুর্বলতা ও আকর্ষণ। তিনি জেল থেকে মুক্ত হতেই তার কাছে ছুটে গেছি। তাকে 'দৈনিক জনপদের' ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণে রাজি করিয়েছি। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বার বার দেখতে গেছি। কখনো মনে হয়নি, তিনি এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে যাবেন।

সেই অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টির রাতেই মোহাম্মদপুরে মাহবুবুল হকের বাসায় গেলাম। সেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। বাড়ির সামনের দিকে একটা ঘরে মাটিতে খাটিয়ার উপর তার মৃতদেহ রাখা হয়েছে। মোমবাতির আলোয় তার মুখ দেখলাম। মনে হল, তিনি ঘুমিয়ে রয়েছেন। তার মৃত্যু আকস্মিক। মৃত্যুর আগে তিনি নাকি এক গ্লাস আখের রস খেতে চেয়েছিলেন। বিকেল থেকেই পেটে কিছুটা অস্থিরতা ও অস্বস্তিবোধ করছিলো। তখন ঘরের লোকেরা মনে করেছিলেন পেটে গ্যাস হয়েছে।

মাঝরাতের পর কে এম দাশ লেনের বাসায় ফিরে বিছানায় শুয়ে আর ঘুম হয়নি। বার বার 'পূর্বদেশের' সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার দিনগুলোর কথা মনে পড়েছে। বার বার চোখের পর্দায় ভেসে উঠেছে মাহবুবুল হকের মুখ। সকালে বিছানা ছেড়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ঝড় বৃষ্টির নাম নিশানাও নেই। চারদিকে ছড়ানো প্রসন্ন সকালের রোদ। দশটার আগেই হাবিবউদ্দিন আহমদ তার গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। তিনি এককালে কাষ্টমস-এর বড় অফিসার ছিলেন। এখন (১৯৭৪) 'দৈনিক জনপদের' ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তিনিও মাহবুবুল হকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তার চোখ মুখ তখন শোকবিহ্বল। বললেন, 'আমার সঙ্গে মাহবুবের বাসায় চলুন। তাকে একবার শেষ দেখা দেখে আসি।'

তাঁর গাড়িতে উঠলাম। মোহাম্মদপুরে মাহবুবুল হকের বাসায় যখন পৌঁছলাম,

তখন সেই বাড়িতে কারো সাড়াশব্দ নেই। দরোজায় কড়ানাড়ার পর কে একজন বেরিয়ে এসে বললেন, আজ (৬ই জুন বৃহস্পতিবার) সকাল ছ'টায় মাহবুবুল হকের লাশ তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর ফরহাদনগর গ্রামে দাফনের জন্য ট্রাকযোগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাবিবউদ্দিন চোখের পানি মুছে বললেন, "মাহবুবের সঙ্গে আর শেষ দেখা হল না।"

ওই দিন সন্ধ্যায় বরিশাল-পটুয়াখালী সমিতি তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মৃত্যুবার্ষিকী পালনের আয়োজন করেছিলেন। এই সমিতির একজন কর্তা তখন ছিলেন বাহাউদ্দিন আহমদ। চল্লিশের দশকে বরিশাল শহরে মহিউদ্দিন ও বাহাউদ্দিন এই দু'টি নাম ছিল বলতে গেলে সমার্থবোধক। দু'জনেই ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনে নামকরা ছাত্রনেতা। শাহ আজিজ ও শেখ মুজিব গ্রুপ হিসেবে মুসলিম ছাত্রলীগ ভাগ হয়ে গেলে মহিউদ্দিন আহমদ শাহ আজিজ গ্রুপে, বাহাউদ্দিন আহমদ শেখ মুজিব গ্রুপে থেকে যান। ফলে তাদের রাজনৈতিক বন্ধুত্বেরও ইতি। ছাত্র আন্দোলনে বাহাউদ্দিন আহমদ, শামসুল হক চৌধুরী (আইনজীবীদের আন্দোলনের অন্যতম নেতা) এককালে ছিলেন শেখ মুজিবের বন্ধু ও সহকর্মী। ভাষা আন্দোলনেও তারা জেল খেটেছেন। বাহাউদ্দিন আহমদ এক সময় বরিশালের এ কে স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন। তখন আমি ছিলাম তার ছাত্র। মহিউদ্দিন আহমদ রাজনীতি ছাড়েননি। তিনি এখন আওয়ামী লীগের একজন প্রবীণ নেতা। অন্যদিকে বাহাউদ্দিন আহমদ রাজনীতি ছেড়ে দেন। এই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মানুষটি রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ায় দেশের রাজনীতিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে আমার ধারণা। বাহাউদ্দিন আহমদ শেষ পর্যন্ত পাসপোর্ট অফিসের চাকরিতে যোগ দেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পাসপোর্ট বিভাগের প্রধানের পদে বসেন এবং এই পদ থেকেই অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৭৪ সালের ৬ই জুন বৃহস্পতিবার মানিক মিয়ার মৃত্যুবার্ষিকীর সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বাহাউদ্দিন আহমদই আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সভায় উপস্থিত হয়ে দেখি, জহুর হোসেন চৌধুরীও প্রধান বক্তাদের একজন। আমাকে দেখে বললেন, মাহবুবের লাশ দেখতে গিয়েছিলেন?

বললাম, কাল রাতেই গিয়েছিলাম। আজ সকালেও একবার গেছি। ততক্ষণে তার লাশ নিয়ে সকলে ফরহাদনগরে চলে গেছে।

জহুর হোসেন চৌধুরী কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আমাদের সকলের মাথার উপরেই এখন ওয়ারেন্ট ঝুলছে। মানিক মিয়া চলে গেছেন। আমি আর সালাম ভাই (অবজারভারের আবদুস সালাম) আছি। কবে ডাক আসবে ঠিক নেই। মাহবুবের তো এত আগে যাওয়ার কথা ছিল না। সেই আগে চলে গেল।

বললাম, জহুর ভাই, আমার বিশ্লেষণ জানেন? মাহবুবুল হক আত্মদ্বন্দ্বের বলি হয়েছেন। তিনি ছিলেন বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের একজন সামনের কাতারের প্রবক্তা। অথচ তাকে জীবনের শেষ দিকে এমন একটি ভূমিকা বেছে নিতে হয়েছে যা ছিল বিশ্বাস ও মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দ্বন্দ্ব ও আত্মপীড়া তাকে বাঁচতে দেয়নি, তার অকাল মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

জহুর চৌধুরী বললেন, হতে পারে আপনার বিশ্লেষণই ঠিক। আপনারা এখনো ইয়ং। আপনাদের বহুদিন বাঁচার কথা। তাই আপনার কাছে একটা অনুরোধ রইলো। আমাদের জীবন অনেক সত্য-মিথ্যায় আবৃত। আমাদের মৃত্যুর পর এই সত্য-মিথ্যা বাছাই করে আমাদের জীবনের যেটুকু সত্য, সেটুকু কি সময় ও সুযোগ হলে মানুষকে জানতে দেবেন?

জহুর হোসেন চৌধুরী সাধারণতঃ আবেগতাড়িত কথাবার্তা বলতেন না। আজ তার মুখে এই ধরনের কথা শুনে একটু বিস্মিত হলাম। বললাম, জহুর ভাই, যদি বেঁচে থাকি, আমার যতটুকু সাধ্য, ততটুকু আমি করবো।

রাত্রে বাসায় ফিরতেই টেলিফোন। অপর প্রান্তে আনোয়ারুল ইসলাম ববি। বললেন, মাহবুবুল হকের মৃত্যুতে বড় শক্ পেয়েছি গাফফার। তাই তোমাকে টেলিফোন করলাম। তার সঙ্গে আমারই ঝগড়াঝাটি হয়েছে বেশি।

বললামঃ ববি, বেঁচে থাকার অর্থই দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত। মৃত্যুতে তার অবসান। সুতরাং পুরনো কথা আর মনে রেখো না। তাতে দুঃখই শুধু বাড়বে।

ববি বললেন, আগামীকাল (৭ই জুন শুক্রবার) আজাদ অফিসে মওলানা আকরম খাঁর ১০৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সভা। বক্তৃতা করবেন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং মোহাম্মদ মোদাব্বের। তোমার নামও বক্তাদের তালিকায় দেখছি। তুমি কি যাচ্ছো?

বললামঃ নিশ্চয়ই। তুমি কি আসবে?

ববি বললেন, আগে ভেবেছিলাম যাব না। এখন ঠিক করেছি যাব। তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার।

চৌদ্দ

'দৈনিক আজাদ' অফিসের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটি লালবাগের দিকে চলে গেছে, তার নাম ঢাকেশ্বরী রোড। এখনও এই নামটি বহাল আছে, না মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ রোড নাম ধারণ করেছে, তা আমার জানা নেই। ঢাকার বহু প্রাচীন ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি এই রাস্তাতেই রয়েছে। এই মন্দিরের জন্য রাস্তাটির নাম

ঢাকেশ্বরী রোড। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা, ঢাকেশ্বরী দেবীর নামে শহরের নাম হয়েছে ঢাকা। একটি কাহিনী হল, মোগল সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ তৎকালীন স্বাধীন বাংলার বার ভুঁইয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে শীতলক্ষ্মা নদী পেরিয়ে বুড়িগঙ্গার পারে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে তার বজরা থেকে অবতরণ করেন। তিনি জায়গাটির নাম জানতেন না। ফলে সেনাবাহিনীকে আদেশ দিলেন। ঢাক বাজাতে। এই ঢাকের শব্দ যতদূর যাবে, ততদূর পর্যন্ত একটি নগর গড়ার আদেশ তিনি দিলেন। এই নগর গড়ার শুরুতেই একটি মন্দির তৈরি করে তাতে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তিনি পূজা দেন। এই মন্দিরটিই নাকি ঢাকেশ্বরী মন্দির। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে শহরটি তৈরি হওয়ায় এর নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখা হয় বলেও জানা যায়। বাঙালির লিখিত ইতিহাস বড় কম। সুতরাং ঢাকা শহরের উৎপত্তি ও নাম নিয়েও নানা মুনির নানা মত। একেক গবেষক একেক কথা বলেছেন। তবে একটি ব্যাপারে তারা সকলেই একমত যে, ঢাকেশ্বরী মন্দির বাংলাদেশের বহু প্রাচীন মন্দিরের একটি।

এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সামনে গাছতলায় গাড়ি রেখে সামান্য হেঁটে 'আজাদ' অফিসে গেলাম। ড্রাইভার ইয়াকুব রইলো গাড়িতে। ১৯৭৪ সালের ৭ই জুন শুক্রবার। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর ১০৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সভা। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, মুজিবুর রহমান খাঁ এবং আরও অনেকে মওলানার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন। আমিও দিলাম। আমাদের বক্তৃতা ছিল মোটামুটি স্মৃতিচারণমূলক। মোহাম্মদ মোদাব্বের এবং মুজিবুর রহমান খাঁ দীর্ঘদিন 'আজাদে' সাংবাদিকতা করেছেন। মওলানার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে তারা বহুকাল ছিলেন।সুতরাং মওলানা চরিত্রের অনেক অজানা তথ্য তারা তুলে ধরলেন। আমিও কম করে হলে মওলানার সান্নিধ্যে ছ'সাত বছর কাটিয়েছি। এই সময়টা আমি ছিলাম 'দৈনিক আজাদে'র সহকারী সম্পাদক এবং কখনো 'মাসিক মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। রোজ বিকেলে তার কাছে আমাকে যেতে হতো সম্পাদকীয় লেখার ব্রিফিং নেয়ার জন্য। আসলে ব্রিফিং নয়। বিকেলে তার গোলদালানের বারান্দায় বসে অথবা 'আজাদ' অফিসের সামনের মাঠে ইজি চেয়ারে শুয়ে তিনি তার সম্পাদকীয় বিভাগের লোকজনের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসতেন।

সন্দেহ নেই মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন এক বিস্ময়কর ও বিরল প্রতিভা। কিন্তু তার চরিত্র আমার কাছে এখনো এক আশ্চর্যজনক ধাঁধা। ব্যক্তিগত জীবনে তার মতো উদার, অসাম্প্রদায়িক, মননশীল এবং মুক্তবুদ্ধির মানুষ আমি কম দেখেছি। গোটা যৌবনকাল এবং প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি ছিলেন কংগ্রেসী রাজনীতির অনুসারী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদের ঘনিষ্ঠ

সহচর। দেশবন্ধুর অনুপ্রেরণায় এবং সাহায্যে তিনি যে বাংলা দৈনিক পত্রিকাটি বের করেছিলেন, তার নাম 'দৈনিক সেবক'। কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা 'দৈনিক বসুমতি' প্রভৃতি কংগ্রেস সমর্থক দৈনিকেরও যখন কট্টর সাম্প্রদায়িক ভূমিকা ছিল, তখন কেবলমাত্র উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভূমিকার জন্যই 'দৈনিক সেবক'কে বলা হতো হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী-বাহক। মওলানা আবুল কালাম আজাদ একসময় কলকাতা থেকে 'আল হেলাল' নাকে একটি উর্দু দৈনিক এবং 'কমরেড' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক বের করেছিলেন। বৃটিশবিরোধী ভূমিকার জন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকার দু'টি পত্রিকাই বন্ধ করে দেয়। মওলানা আজাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মওলানা আকরম খাঁ সেই সময় কলকাতা থেকে একটি উর্দু দৈনিক প্রকাশ করেছিলেন। মওলানা আজাদ প্রথম দিকে কিছুদিন এই উর্দু দৈনিকের সম্পাদকীয় লিখে দিয়েছেন। তারপর গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় আর পারেননি। এর অনেক পরে মওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগের রাজনীতি করার সময়ে কলকাতা থেকে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকও বের করেছিলেন। তারও নাম তিনি রেখেছিলেন 'কমরেড'।

কৈশোরে মওলানা আকরম খাঁর সাংবাদিকতা শুরু সাপ্তাহিক মোহাম্মদী নামে মযহাবি ঝগড়ার এক কাগজে। মুসলমানেরা এক ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের মধ্যে নানা ভাগ এবং নানা মযহাব। হানাফী মযহাবিদের কাগজ ছিল 'সাপ্তাহিক হানাফী'। এই 'হানাফী, ও 'মোহাম্মদী পত্রিকার মধ্যে মযহাবি ঝগড়া ও খিস্তিখেউর লেগেই থাকতো। 'মোহাম্মদী' কাগজের মালিক তার কাগজে মওলানা আকরম খাঁকে চাকরি দিয়েছিলেন 'হানাফী' কাগজের বক্তব্য ও খিস্তিখেউরের জবাব লেখার জন্য। আকরাম খাঁ মুসলমানদের মধ্যে মযহাবি ঝগড়া পছন্দ করতেন না। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই মযহাবি ঝগড়া নিয়ে লেখালেখি বন্ধ করে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে বৃটিশবিরোধী তীব্র এবং শানিত লেখা শুরু করেন। ফলে কাগজটি রাজরোষে পড়ে। কাগজের মালিকেরা 'মোহাম্মদী' বন্ধ করে দিতে চাইলে তিনি কাগজটির পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেন। এরপর তিনি আর মযহাবি ঝগড়ায় 'মোহাম্মদী'কে জড়িত করেননি। বরং একটি অসাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে গড়ে তোলেন। 'মোহাম্মদী'কে যখন তিনি কিছুকালের জন্য দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তর করেন, তখন তিনি এই দৈনিকের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন একনিষ্ঠ কংগ্রেসী সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, খদ্দরধারী বুদ্ধিজীবী, প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে।

ব্যক্তিগত জীবনেও আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার ধার ধারতেন না মওলানা আকরম খাঁ। একদিনের কথা বলি। ১৯৫৯ কি ৬০ সাল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান 'আজাদ'

অফিসে এসেছেন বয়োবৃদ্ধ মওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তখন রমজান মাস। মওলানার গোলদালানের বাসভবনে বৈঠক। প্রেসিডেন্ট বিকেল চারটের দিকে এলেন। তার জন্য চা-পানির ব্যবস্থা করা হলো। কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনাও হল। তারপর প্রেসিডেন্ট যখন বিদায় নেবেন, তখন ফটোগ্রাফারদের সামনে দু'জনে হাসিমুখে বসলেন ছবি তোলার জন্য। সহসা মওলানা ফটোগ্রাফারদের বাধা দিলেন। বললেন, দাঁড়াও। তারপর বেয়ারাদের ইঙ্গিত করলেন, টেবিলের উপরে রাখা চায়ের ট্রে, বিস্কিট ইত্যাদি সরিয়ে ফেলার জন্য। আইয়ুবের এতক্ষণে হুঁশ হল। তিনি 'ইসলামী জমহুরিয়ার প্রেসিডেন্ট। রোজার মাসে ইফতারির সময়ের আগে তিনি এবং মওলানা আকরম খাঁ ছবি তুলছেন এবং তাদের সামনে টেবিলে রয়েছে চা নাশতা, এটা পরদিন কাগজে বেরুলে তাদের জন্য বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করবে। বেয়ারারা তাদের কাজ শেষ করতেই ফটোগ্রাফারদের ছবি তোলার অনুমতি দেয়া হলো। আইয়ুব হেসে মওলানাকে বললেন, 'মওলানা সাহাব, আপ্ বহুৎ আকলমন্দ লীডার।'

মওলানা নিজে ছিলেন লা মযহাবি। অর্থাৎ আল্লাহ, রসুল, কোরআন, হাদিসের পর তিনি আর কিছু বিশ্বাস করতেন না। শিয়া, সুন্নী, হানাফি, শাফী ইত্যাদি ফেরকা ও মযহাবি বিভাগও মানতেন না। মৃত্যুর আগে তিনি তার ছেলে কামরুল আনাম খাঁকে নির্দেশ দিয়ে যান যে মৃত্যুর পরে তাকে যেন লা মযহাবিদের প্রথানুসারে কোনো চিহ্ন না রেখে কবর দেয়া হয়। কবর চিহ্নিত ও স্থায়ী করা হলে তা থেকে কবর পূজার উদ্ভব হয় বলে তিনি মনে করতেন।

আমি মওলানা আকরম খাঁর 'দৈনিক মোহাম্মদী' বা 'দৈনিক সেবকে'র কোনো সংখ্যা দেখিনি। ত্রিশের দশকে কলকাতা থেকে 'দৈনিক আজাদ' বের হয়। তার প্রথম সংখ্যাসহ বেশ কয়েকটি সংখ্যা 'আজাদ অফিসের পুরনো ফাইলে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। 'দৈনিক আজাদে'র প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় মাস্তুলের উপর দু'লাইন কবিতা ছাপা হয়েছিল।

"বাধাবন্ধনে বজ্র হানিয়া উষাপথে তুলি তূর্য্যনাদ
নবজীবনের নবঅভিযানে ঝান্ডা উড়ায়ে চলে আজাদ।"

আমার বহুকাল ধারণা ছিল, এই কবিতা নজরুলের লেখা। ষাটের দশকে ঢাকায় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'মাহে নও' অফিসে বসে একদিন এই প্রসঙ্গে আলোচনার সময় জানতে পারি কবিতাটি নজরুলের লেখা নয়। কবি আবদুল কাদির জানালেন, এটি তার লেখা।

মওলানা আকরম খাঁ তার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মত অসাম্প্রদায়িক নেতার দ্বারা ছিলেন গভীরভাবে প্রভাবিত। আবার ধর্মীয়

ধ্যানধারণায় মওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো মুক্তবুদ্ধি, উদার ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ আলেমের দ্বারা ছিলেন অনুপ্রাণিত। আর এখানেই মওলানা আকরম খাঁর চরিত্র আমার কাছে এক বিস্ময়কর ধাঁধা। প্রৌঢ় বয়সে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের মতো অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতাদের সাম্প্রদায়িক ভূমিকায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পাকিস্তান দাবির সমর্থক হয়েছিলেন, মুসলিম লীগ রাজনীতিতে নেতৃত্বদানের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এরও একটা ব্যাখ্যা মেলে। কিন্তু তিনি কি করে বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণের যুগে একশ্রেণীর অজ্ঞ মোল্লা ও কট্টর মৌলবাদীদের নেতা সেজে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, শিখা, জয়শ্রী, সওগাত গ্রুপের প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং 'দৈনিক আজাদ' ও 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকা দু'টিকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে বিনাদ্বিধায় ব্যবহার করেছেন, এই ধাঁধা'র জবাব আমি এখনো মেলাতে পারিনি। এককালে তিনি মওলানা আবুল কালাম আজাদের ভাবশিষ্য ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালে সেই মওলানা আজাদকে আকরম খাঁর কাগজে শুধু সমালোচনা করা নয়, অশোভনভাবে নাম দেয়া হল, 'মওলানা অবলাকান্ত অযোধ্যা'। এমন কি ১৯৪৫-৪৬ সালের দিকে জিন্নার চক্রান্তে যখন কলকাতার গড়ের মাঠে ঈদের নামাজে ইমামতিত্ব করা থেকে মওলানা আবুল কালাম আজাদকে বাদ দিয়ে মওলানা আজাদ সোবহানি নামে জিন্নাভক্ত এক চামচা মওলানাকে ইমামতিত্ব করার দায়িত্ব দেয়া হয়,, তখনও 'আজাদ' কাগজে এই চক্রান্তকে সমর্থন জানানো হয়েছিল। মুসলিম লীগ রাজনীতিতে তিনি আবুল হাশিম-সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপের প্রগতিশীল ধারার নয়, খাজা নাজিমউদ্দিনের প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাৎমুখী ধারার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন। অথচ ত্রিশের দশকে মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন বাংলাদেশের ফিউডাল-স্বার্থ ও প্রভুত্বের ঘোরবিরোধী এবং কৃষক ও রায়ত আন্দোলনের সমর্থক। ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা সমিতিরও তিনি ছিলেন গোড়ার দিকের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। আমার ধারণা, চল্লিশের দশকে মওলানা আকরম খাঁ যদি তার বিপুল জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম লীগের অবাঙালি 'ফিউডাল' কোটারি স্বার্থকে সমর্থন না জানাতেন, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস বহু আগে অন্যভাবে তৈরি হতো।

ষাটের দশকের প্রথম দিকে যখন 'দৈনিক আজাদে' কাজ করি এবং মওলানা আকরম খাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলাম, তখন তার চরিত্রের এই দ্বৈতভাবটি বোঝার আমি চেষ্টা করি। কিন্তু সফল হইনি। তাকে তার আত্মজীবনী লেখার জন্য নানাভাবে তাগাদা দিয়েও সাড়া জাগাতে পারিনি। আত্মজীবনীর বদলে মৃত্যুর আগে তিনি "মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" নামে একটি বই লেখা শুরু করেন। প্রথমে 'মাসিক মোহাম্মদী'তে এটি ধারাবাহিকভাবে ছাপা শুরু হয়। মওলানা এই বইয়ে

ইংরেজ লেখকদের লেখার প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি নিজের হাতে লিখতেন। ইংরেজি উদ্ধৃতিটুকু নিজ হাতে লিখে নীচে ব্রাকেট দিয়ে লিখতেন, "গাফ্‌ফার চৌধুরী, এই ইংরেজির তরজমা করে দিও।" আমি ইংরেজি উদ্ধৃতি অনুবাদ করে তা যথাস্থানে যোগ করে দিতাম।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলনেও গোঁড়ামি ও ধর্মীয় কুসংস্কারের সমর্থক গ্রুপের প্রতি মওলানা আকরম খাঁ ও তার গ্রুপ প্রকাশনার সমর্থন তরুণ ও প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা বাড়ায়নি। অথচ মওলানা বিনা দ্বিধায় তার কাগজে নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, অদ্বৈতমল্ল বর্মন, বসুধা চক্রবর্তীর মতো বামঘেঁষা প্রগতিশীল অমুসলিম সাহিত্যেকদের চাকরি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে একটা মজার ঘটনা বলি। চল্লিশের দশকের গোড়ায় মুসলিম লীগ ত্যাগ করার পর শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন করেন এবং 'নবযুগ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা বের করেন। প্রথমে এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন কবি নজরুল ইসলাম। নজরুল গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে খুলনার মওলানা আহমদ আলী (বর্তমানের প্রবীণ সাংবাদিক এম আনিসুজ্জামানের বাবা) 'নবযুগের' সম্পাদক হন। 'আজাদে'র প্রথম পৃষ্ঠায় মাস্তুলের নীচে লেখা থাকতো "মোছলেম বঙ্গ ও আসামের একমাত্র দৈনিক"। মুসলমান পরিচালিত আরেকটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে 'নবযুগ' প্রকাশিত হওয়ায় আজাদের একমাত্র দৈনিকের বিশেষণটি পাল্টানোর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ব্যবসা ক্ষেত্রেও 'আজাদ' প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। ফলে 'আজাদে' দাবি করা হল, "নবযুগ" মুসলমানদের দ্বারা চালিত দৈনিক পত্রিকার নয়। যদিও হক সাহেব পত্রিকাটি বের করেছেন, কার্যতঃ পত্রিকাটি চালায় হিন্দু সাংবাদিকেরা।" সেই ঘোর ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার যুগে 'আজাদে'র এই প্রচারণা 'নবযুগে'র জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মওলানা আহমদ আলী ছিলেন 'পলিটিক্যাল পলেমিক' লেখায় সিদ্ধহস্ত। কিছুকাল নরমগরম ভাষায় 'আজাদে'র প্রচারণার প্রতিবাদ করার পর তিনি একদিন 'নবযুগে' একটি সম্পাদকীয় লিখলেন। শিরোনাম "যবনিকার অন্তরালে"। এই সম্পাদকীয়তে 'আজাদে'র সম্পাদকীয় ও বার্তা বিভাগের প্রধান আঠারো জন ষ্টাফের নাম দেয়া হল। এই আঠারো জনের মধ্যে বারোজন হিন্দু এবং ছয়জন মাত্র মুসলমান। এই নামগুলো উল্লেখ করার পর মওলানা আহমদ আলী লিখলেন, "প্রথম ছয়টি নাম লইয়া আমাদের কোনো প্রশ্ন নাই। কিন্তু অবশিষ্ট বারো জন কোন দেশের, কি ধরনের মুসলমান, তাহা তাহাদের লুঙ্গি তুলিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।" 'যবনিকার অন্তরালে'র এই তীব্র আক্রমণের কোনো জবাব 'আজাদ' আর দেননি, তবে 'একমাত্র দৈনিকে'র সাইন বোর্ডও তারা বদল করেননি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা থেকে যখন 'আজাদ' প্রকাশ শুরু হয়,

তখন এই 'একমাত্র দৈনিকে'র বিশেষণটি পত্রিকার মাস্তুলে আর দেখা যায়নি।

কবি কাজী নজরুল ইসলামও এক সময় মওলানা আকরম খাঁর কাগজে কাজ করেছেন। কিন্তু কাগজগুলোর গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার সঙ্গে তিনি তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি। 'মোসলেম ভারত', 'সওগাত' প্রভৃতি কাগজ ছিল তার লেখার উপযুক্ত বাহন। তিনি মোহাম্মদী কাগজটিকে ঠাট্টা করে লিখতেন মহা+মুদী = মোহাম্মদী। 'মাসিক মোহাম্মদী'তেও নজরুলের বিরুদ্ধে অনেক বিদ্রুপাত্মক ও শ্লেষাত্মক লেখা বেরিয়েছে। কিন্তু ষাটের দশকের গোড়ায় 'আজাদ' অফিসে কাজ করার সময় নজরুল সম্পর্কে মওলানা আকরম খাঁর অদ্ভুত আবেগমাখা অনুভূতি লক্ষ্য করেছি। একদিন বিকেলে তার কাছে একা বসে আছি। হঠাৎ নজরুলের প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি বললেন, জানো, একদল মওলবী নজরুলকে বলতো নাস্তিক, কাফের। খলিলের মা (মওলানার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং তার তিন ছেলে সদরুল আনাম খাঁ (খলিল), বদরুল আনাম খাঁ (বকুল) এবং কামরুল আনাম খাঁ'র (মুকুল) মা)। একথা বিশ্বাস করতেন না। আমাকে বলতেন, 'আপনারা একজন খাঁটি মুসলমানকে কাফের আখ্যা দিচ্ছেন। এটা আল্লা সইবেন না।' আমি বললাম, মওলবীরা ফতোয়া দিলে আমি কি করবো? তোমাকে তো নজরুল মা ডাকে, তাকে বুঝাও, সে যেন ধর্ম নিয়ে, মওলবী মওলানাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে কবিতা না লেখে। খলিলের মা বললেন, 'আপনি আপনার মওলবীদের ডাকুন। আমিও নজরুলকে ডাকি। কাদের কথা সত্য, সামনা সামনি তার পরীক্ষা হোক।' খলিলের মায়ের মতলব কি, তখন তা বুঝতে পারিনি। তবু মওলবী সাহেবদের বাসায় দাওয়াত করতে রাজি হলাম। খলিলের মা বললেন, তিনিও নজরুলকে ডেকে পাঠাবেন। নির্দিষ্ট দিনে মওলবী-মওলানারা আমার বাসায় এসে হাজির। খলিলের মা পর্দার আড়ালে রইলেন। সেখানে বসেই বললেন, 'আপনারা নাস্তা করুন। নজরুল এখনই এসে পড়বে।' মওলবী-মওলানা সাহেবরা খুশি মনে খলিলের মায়ের হাতের বানানো নাস্তা খাচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে উদাত্ত পুরুষালী কণ্ঠে গাওয়া মধুর গজলের শব্দ ভেসে এলো। খালি গলায় কে একজন গেয়ে উঠলেনঃ "তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে/যেন পূর্ণিমারই শিশু চাঁদ দোলে/যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে/কুল মুখলুকাতে ধ্বনি ওঠে কে এলো ভাই/কলেমা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে কে এলো ভাই।" এই মধুর গজলগীত শুনে মওলবী সাহেবেরা আত্মহারা হয়ে গেলেন। গান শেষ হলে খলিলের মা পর্দার ওপাশ থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই আলেম সাহেবেরা, এই গজল যিনি লিখেছেন, তার সম্পর্কে আপনাদের মত কি? সকল মওলবী সাহেব এক বাক্যে বললেন, 'পরম পূণ্যবান লোক। এককথায় তিনি জান্নাতুল ফেরদৌসে চলে যাবেন। 'খলিলের মা বললেন', তাহলে আপনারা

তাকে কাফের বলছেন কেন? তার বিরুদ্ধে এত লেখালেখি করছেন কেন? জানেন ইনি কে? ইনিই কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি নিজেই তার গজল আপনাদের গেয়ে শোনালেন।' খলিলের মায়ের কথা শুনে মওলবী সাহেবেরা একেবারে চুপ। তারা কেবল একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

এই কাহিনী বলা শেষ করে মওলানা আকরম খাঁ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, আজ আর খলিলের মা বেঁচে নেই। নজরুলও তো স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় কলকাতায় পড়ে আছে। আমার মাঝে মাঝে তার গজল শুনতে ইচ্ছা করে। বিশেষ করে ওই গজলটা— তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে। এই গজলটা শুনলে খলিলের মায়ের কথাও আমার মনে পড়ে।

১৯৭৪ সালের ৭ই জুন শুক্রবার সন্ধ্যা। মওলানা আকরম খাঁর ১০৫তম জন্মবার্ষিকীর সভা শেষে 'আজাদ' অফিস থেকে বের হলাম। আমার গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই দেখি ঢাকেশ্বরী মন্দিরের গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন আনোয়ারুল ইসলাম ববি।

পনেরো

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের চাতালে তখন বেশ কিছু পূজারীর ভীড়। ভেতরে কাসর ঘন্টা বাজছে। সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। আনোয়ারুল ইসলাম ববিকে সেই মন্দিরের সামনে দাঁড়ানো দেখে ঠাট্টা করে বললাম, কি ববি, পূজা করতে এসেছো নাকি?

ববি বললেন, ঠাট্টা রাখো। গাড়িতে ওঠো। ইন্টারকনে চলো। কথা আছে।

বললাম, তুমি মওলানা আকরম খাঁর জন্মবার্ষিকীর সভায় যোগ দেবে বলেছিলে। এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ঃ ঠিক সময় আসতে পারিনি। ববি বললেন, দেরি যখন হয়েই গেছে, তখন আর ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে করলো না। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভার ইয়াকুবকে বললাম, চলো হোটেল ইন্টারকনের দিকে। বেশীক্ষণ বসবো না সেখানে। তোমাকে আজ সকাল সকাল ছেড়ে দেব।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের (এখন শেরাটন হোটেল) 'লাউঞ্জ বারে' বসে ববি বললেন, তুমি বঙ্গবন্ধুকে বল, 'বাংলাদেশ অবজার্ভার' কাগজটা আমার হাতে ছেড়ে দিতে। ওবায়দুল হক সাহেবদের (তৎকালীন অবজার্ভারের সম্পাদক) মত সম্পাদক দিয়ে ইংরেজি কাগজ চালিয়ে তার কোনো লাভ হবে না। ওবায়দুল হক সাহেব ভালো লোক। কিন্তু মুজিব সরকারের এখন দরকার একজন 'এগ্রেসিভ এবং এসারটিভ

এডিটর'।

কানের কাছে বোমা ফাটলেও এতটা চমকে উঠতাম না। বললাম, ববি, তুমি পাগল হয়েছো। বঙ্গবন্ধুর কাছে এই ধরনের কোনো প্রস্তাব নিয়ে যাওয়াও মস্তবড় পাগলামি। আর তোমার মাথায় এই পাগলামি ঢুকলো কেন?

ববি বললেন, শেখ মুজিব এখন সতর্ক না হলে পরে পস্তাবেন। তার বিরুদ্ধে একটা বড় রকমের প্রোপাগান্ডা শুরু হতে যাচ্ছে। তোমরা কি বিদেশী কাগজগুলো একবার খুলেও দেখো না?

জিজ্ঞাসা করলামঃ কি ধরনের প্রোপাগান্ডা?

ঃ ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক। বলা হয়েছে তার প্রশাসন অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ। তিনি নিজে মিনি ডিকটেটর। তার রক্ষী বাহিনী বিরোধী দলের বহুলোক খুন করছে।

বললাম, বৃটেন ও আমেরিকার কিছু কিছু কাগজে যে এ ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে, তা লক্ষ্য করেছি।

ববি বললেন, বৃটেন এবং আমেরিকার কেন, দিল্লী এবং বোম্বের বড় বড় কাগজগুলোতে কি লেখা হচ্ছে? কুলদীপ নায়ারের মতো সাংবাদিকেরা শেখ মুজিব এবং তার দলের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। কুলদীপ নায়ারের লেখায় এনায়েতুল্লাহ খানের 'হলিডে' কাগজ থেকে ভুরি ভুরি উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে।

বললাম, কুলদীপ নায়ার এবং এনায়েতুল্লাহ খান একই আন্তর্জাতিক লবীর লোক।

ববি বিদ্রুপ করে বললেন, চমৎকার ব্যাখ্যা। তোমাদের 'ইত্তেফাক গ্রুপের' মালিকদের বর্তমান ভূমিকাটা কি?

হেসে বললাম, তুমিতো সব খবরই রাখো দেখছি।

ববি আমার ঠাট্টা গায়ে মাখলেন না। বললেন, আমাকেতো তোমরা কোলাবরেটদের দলেই ঠেলে দিয়েছো। ফলে ওই দলের ভেতরের খবরাখবর ভালো করেই জানি। তাই তোমাকে বলছি, শেখ মুজিব তার দেশের সাধারণ মানুষের সমর্থন পেয়েছেন, কিন্তু এলিট ক্লাশের আসল সমর্থন পাননি। এই এলিট ক্লাশের মধ্যে দু'ধরনের কোলাবরেটর ছিল। একদল প্যাসিভ এবং আরেক দল একটিভ। একটিভ কোলাবরেটরদের তোমরা চিহ্নিত করেছো, তারা এখন আপাততঃ একঘরে। কিন্তু প্যাসিভ কোলাবরেটরের দল এখন সক্রিয় হয়ে সামনে চলে এসেছে। তাদের কেউ কেউ বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী সেজে শেখ মুজিবের আশপাশে গিয়েও আশ্রয় নিয়েছে। এদের গোপন আঁতাত ও যোগাযোগ লন্ডন, ওয়াশিংটন ও দিল্লীর একটা শক্তিশালী আন্তর্জাতিক 'লবীর' সঙ্গে। উপমহাদেশের

রাজনীতিতে তাদের প্রথম 'টার্গেট' শেখ মুজিব। তার বিরুদ্ধেই প্রথম শুরু করা হচ্ছে 'প্রোপাগান্ডা ওয়ার'।

এবার আমাকে একটু 'সিরিয়াস' হতে হল। আনোয়ারুল ইসলাম ববিকে আমি কখনোই 'সিরিয়াস' লোক হিসেবে গ্রহণ করিনি। তার কথাবার্তা ছিল প্রায় সময় চটুল। তাকে আমি মনে করতাম 'প্লেবয়' জাতীয় চরিত্র। এখন তার মুখে রাজনীতির 'সিরিয়াস' আলোচনা শুনে মনোযোগী হতে হল। বললাম, এই আন্তর্জাতিক 'প্রোপাগান্ডা ওয়ারের' মোকাবিলায় তুমি 'অবজার্ভার' কাগজ হাতে নিয়ে কি করবে? তুমিতো কাগজের 'এডিটোরিয়াল সাইডের' কিছু জানো না। ম্যানেজমেন্ট ভাল বোঝ।

ববি বললেন, আমি লিখতে জানি না, কিন্তু লেখাতে জানি। আমি 'অবজার্ভার' কাগজ হাতে পেলে দেশ-বিদেশের "এগ্রেসিভ, এসারটিভ" লেখকদের জোগার করবো। শেখ মুজিব এবং তার "পলিসি" সমর্থন করে তারা শক্ত হাতে লিখবেন, তার বিরুদ্ধে "প্রোপাগান্ডার" জবাব দেবেন এবং তার জন্য শক্ত "ডিফেন্স" তৈরি করবেন।

ববি একটু চুপ করলেন, তারপর বললেন, বাংলা ভাষায় শেখ মুজিবের দিস্তাদিস্তা স্তুতি লিখে তোমরা তাকে রক্ষা করতে পারবে না। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক "প্রোপাগান্ডা ওয়ার" শুরু করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ভাষায়, আন্তর্জাতিকভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে। 'গার্ডিয়ান', 'টাইমস', 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'হেরাল্ড ট্রিবিউন', 'টাইমস অব ইন্ডিয়া', 'হিন্দু', 'হিন্দুস্থান টাইমস' এসব কাগজের 'প্রোপাগান্ডার' জবাব তোমরা দেবে বাংলা কাগজে বাংলায় জবাব লিখে? আমাকে হাসিও না।

বললাম, সরকারের হাতে 'মর্নিং নিউজ', 'বাংলাদেশ অবজার্ভার' পত্রিকা রয়েছে। হালে 'বাংলাদেশ টাইমস' বেরিয়েছে। তুমিতো তার একটির সঙ্গে যুক্ত।

ববি বললেন, এগুলোর ভাষা ইংরেজি, কিন্তু এগুলোকে আমি ইংরেজি কাগজ মনে করি না। মনে করি, ঢাকার বাংলা কাগজের ইংরেজি অনুবাদ। এগুলো অনুবাদ পত্রিকা। অনুবাদ পত্রিকা নয়, শেখ সাহেবের দরকার 'অরিজিনাল এফেক্টিভ' ইংরেজি পত্রিকা এবং আন্তর্জাতিক মানের 'এসারটিভ ও পপুলার' ইংরেজি ভাষার 'কলামিষ্ট'। তার এখন শক্ত 'ডিফেন্স' দরকার। সেই সঙ্গে 'এগ্রেসিভ পাবলিসিটি'। ওবায়দুল হক সাহেবরা ভালো লোক। ইংরেজি 'গ্রামার' জানা উচ্চমানের লেখক। কিন্তু কুলদীপ নায়ার, প্রেম ভাটিয়ার কথা দূরে থাক, এনায়েতুল্লা খানের মতোও দক্ষ পলিটিক্যাল 'কলামিষ্ট' অথবা 'জার্নালিষ্ট' তারা নন।

বললাম, তাহলে তোমার মতে, শেখ সাহেবের উচিৎ ছিল এনায়েতুল্লা খানদের

দলে টানা?

ববি বললেন, নিশ্চয়ই। একশ'বার। আওয়ামী লীগের সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য কি জানো, পাকিস্তানীরা বাংলাদেশে এতবড় জেনোসাইড ঘটানোর পরেও বাঙালি এলিট ক্লাশে তাদের কোলাবরেটর তৈরি করেতে পেরেছে। আর আওয়ামী লীগ পাকিস্তানীদের মধ্যে দূরে থাক, বৃটেন, আমেরিকা— এমনকি মিত্র ভারতেও এলিট ক্লাশে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ও দক্ষ সাংবাদিক ও কলামিষ্টদের মধ্যে একজন সমর্থকও জোগার করতে পারেননি। শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরও তাই আজ 'ডিফেন্সলেস'। তোমরা বাংলায় শেখ মুজিবের দিস্তা দিস্তা প্রশস্তি লিখেও তাকে রক্ষা করতে পারবে না। এটা পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ নয়। তাদের চাইতে লক্ষগুণ শক্তিশালী একটি আন্তর্জাতিক 'লবীর' সঙ্গে এই যুদ্ধ। তুমিতো হিন্দু 'মিথোলজি' জানো। দশানন রাবণের মতো এই 'লবীর' দশমুখ। অসীম তার 'প্রোপাগান্ডার' শক্তি। এই 'প্রোপাগান্ডার' যুদ্ধে হেরে গেলে আওয়ামী লীগ একাত্তরের যুদ্ধে জিতেও বেশীদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না।

বললাম, তোমার না হয় বঙ্গবন্ধুর কাছে হঠাৎ করে দেখা করার বা কথা বলার সুযোগ নেই। কিন্তু শেখ মনির কাগজেইতো তুমি কাজ করছো। তাকে কথাগুলো বলছো না কেন?

ঃ বলেছি। ববি জানালেন, শুধু অবজার্ভার আমার হাতে পেতে চাই, একথা জানাইনি। মনি সব শুনে বলেছেন, তিনিও কথাগুলো গুরুত্বের সঙ্গে ভাববেন।

ঃ অবজার্ভার হাতে পেলে তুমি কি করবে?

ঃ শক্তিশালী জার্নালিষ্ট টীম গঠন করবো। লন্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী, পিন্ডি সব জায়গা থেকে বেছে কলামিষ্ট জোগার করবো। বাংলাদেশের পক্ষে তাদের দিয়ে শক্ত ডিফেন্স গড়ে তুলবো, বিরুদ্ধ-প্রচারণার তথ্যনির্ভর জবাব দেব। হামিদুল হক চৌধুরী জানতেন, কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বা সাহিত্যিক হলেই ভালো সাংবাদিক হওয়া যায় না। তাই সরকারী চাকরি ছাড়িয়ে আবদুস সালামকে এনে বসিয়েছিলেন অবজার্ভারের সম্পাদকের পদে। করাচী থেকে আই. এইচ. বার্নিকে নিয়ে এসেছিলেন অবজার্ভারের এডিটোরিয়াল ষ্টাফ করে। তোমার আওয়ামী লীগ সরকার শুধু দলের অনুগত সাংবাদিক খোঁজেন, দক্ষ সাংবাদিক খোঁজেন না। আওয়ামী লীগ সমর্থক একজনও ইংরেজি ভাষার সাংবাদিক নেই, এমনওতো নয়। এ.বি.এম মূসাকে আমি পছন্দ করি বা না করি, সে একজন দক্ষ সাংবাদিক, দক্ষ পলিটিকাল রিপোর্টারও। বিদেশের সঙ্গেও তার ভালো যোগাযোগ। 'সানডে টাইমস'-এর সঙ্গে সে যুক্ত। তাকে কেন আওয়ামী লীগ সরকার প্রথমে টেলিভিশনে এবং পরে 'মর্নিং নিউজের' মতো পত্রিকায় ডাম্প্ না করে 'অবজার্ভারের' সম্পাদকের পদে বসালো

না, এটাও আমার কাছে বিস্ময়। মুসাও অনেক বেশী দক্ষতার সঙ্গে দেশে বিদেশে শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ-বিরোধী প্রোপাগান্ডা কাউন্টার করতে পারতো।

বললাম, মুসাকেতো 'মর্নিং নিউজের' সম্পাদক পদে বসানো হয়েছিল।

ববি হাসলেন, চার্চিলওতো ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে ভারতে পাঠিয়েছিলেন 'পলিটিক্যাল ডেডলক্‌' ভাঙার জন্য। তিনি জানতেন, ক্রিপ্‌স্‌ তা পারবেন না; নিজের 'ক্রেডিবিলিটি' হারাবেন। আওয়ামী লীগ সরকারের ভেতরে মুসার যেসব বন্ধু তাকে উৎসাহ দিয়ে 'মর্নিং নিউজের' সম্পাদক পদে বসিয়েছিলেন, তারাও জানতেন, পাকিস্তানীদের দ্বারা পরিত্যক্ত এবং বহু বছর যাবত বাঙালি পাঠকের কাছে ধিকৃত 'মর্নিং নিউজের' ডুবো-জাহাজ আবার ভাসানো মুসার পক্ষেও সম্ভব হবে না; সে তার 'ক্রেডিবিলিটি' হারাবে। ফলে তারা তাদের একজন দক্ষ প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচবে। মুসা তাদের জন্য আর 'চ্যালেঞ্জ' হয়ে উঠবে না।

রাত হয়েছিল। তাই ববির কাছে বিদায় চাইলাম। তাকে কথা দিলাম, তার অবজার্ভারের প্রস্তাব নয়, তার সঙ্গে আলোচনার অন্যান্য দিকগুলো আমি সুযোগ পেলেই বঙ্গবন্ধুর কাছে তুলে ধরবো।

আনোয়ারুল ইসলাম ববির সঙ্গে এটাই আমার শেষ সাক্ষাৎ। তারপর আমি দেশ ছেড়েছি। দীর্ঘকাল একটানা বিদেশে থেকেছি। তবে মাঝে মাঝে ববির খবর যে পাইনি তা নয়। চট্টগ্রাম থেকে তার ইংরেজি দৈনিক বের করার খবরও আমি পেয়েছিলাম। সবশেষে ঢাকা থেকে 'মর্নিং সানের' প্রকাশ। লন্ডনে বসেই শুনলাম, তার কাগজে আওয়ামী লীগ বিরোধী খবরই বেশী থাকে। তার কাগজ অফিসে হামলার খবরও আমি শুনেছি। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে স্বদেশে ফিরে যাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবো বলে ভেবেছি, তাদের মধ্যে আনোয়ারুল ইসলাম ববির নামও ছিল। কিন্তু দেখা হবার আগেই তিনি আমার দিকে বজ্রশেল ছুঁড়লেন। ঢাকায় পৌঁছার দু'দিন না যেতেই তার কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় খবর ছাপানো হল, "এজিসি জয়েনিং আওয়ামী লীগ" অর্থাৎ আমি দেশে ফিরেই আওয়ামী লীগে যোগ দিচ্ছি। খবরে আরও বলা হল, ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাকে 'রিসিভ' করার জন্য শেখ হাসিনার একজন বিশেষ দূত গিয়েছিলেন।

ঢাকায় সেই পূর্বানী হোটেলের লাউঞ্জে বসেই 'মর্নিং সান' কাগজের খবরটি আমার চোখে পড়লো। মনে দুঃখ পেলাম। ববির কাগজে এই ধরনের মিথ্যা খবর। আমি তার বন্ধু এবং ঢাকায় এখন স্বশরীরে হাজির। তিনি আমার কাছে খবরটির সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইতে পারতেন। বিমান বন্দরে শেখ হাসিনার লোক গিয়েছিলেন, গিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের একজন সদস্যও। সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য। তার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এখন

যে ক'দিন বেঁচে আছি, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা নিয়েই দিনগুলো কাটিয়ে যেতে চাই। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার ইচ্ছে নেই, আগ্রহতো নেই-ই।

পূবার্নী হোটেল থেকে 'মর্নিং সান' অফিসে টেলিফোন করলাম। ভাগ্য ভালো। ববিকে পেয়ে গেলাম। ববির সেই পুরনো অমায়িক হাসি। 'আরে গাফ্ফার যে, কবে দেখা হবে?

বললাম, আগে আমার কথার জবাব দাও। আমি তোমার বন্ধু। আমি দেশের মাটিতে পা না দিতেই আমার সম্পর্কে মিথ্যে খবর ছেপেছো কেন?

ববি অপ্রতিভ হলেন না। বললেন, কোন্ খবর? ওহ, তোমার আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ার খবর? আরে ওটাতো স্পেকুলেটিভ খবর। তুমি এদ্দিন পরে দেশে ফিরেছো। আর খবরের কাগজে তোমার সম্পর্কে স্পেকুলেশন বেরুবে না?

বললাম, আমার মতো একজন সাধারণ নাগরিক সম্পর্কেও স্পেকুলেশন করতে হবে? তোমাদের কাগজে কি খবরের এতই দুর্ভিক্ষ?

ববি হা হা করে হাসতে লাগলেন, বললেন, মাফ করে দাও ভাই। তোমার সম্পর্কে দু'একটা গুজব ছেপে যদি কাগজ দু'এক কপি বেশী বিক্রি হয়, তাহলে আপত্তি করছো কেন?

রেগে গিয়েছিলাম, তাই বলে ফেললাম, ববি, তোমার কাগজ যে বেশী চলে না, তা জেনেছি। তুমি একবার আমাকে বলেছিলে, 'অবজার্ভার' হাতে পেলে দেখিয়ে দেবে, কিভাবে কাগজ চালাতে হয়। এখন নিজের কাগজ 'মর্নিং সান' হাতে পেয়ে তা দেখিয়ে দিচ্ছো না কেন?

ববি মৃদুস্বরে বললেন, গাফ্ফার, তুমি রেগে গেছো। আমার অফিসে চলে আসো। এক সঙ্গে কোথাও বসে একটু আড্ডা দেয়া যাক। বহুকাল তোমার সঙ্গে আড্ডা দেই না।

বললাম, আজ নয় ববি। লন্ডনে ফিরে যাওয়ার আগে একবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।

ববির সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। আর হবেও না। সেদিন জানতাম না, এই আমাদের শেষ কথাবার্তা।

ষোল

আনোয়ার জাহিদের কথা আমি প্রথম শুনি নির্মল সেনের মুখে। সাংবাদিক এবং রাজনীতিক নির্মল সেন। ষাটের দশক শুরু হওয়ার কিছু আগে অথবা একেবারে শুরুতে নির্মল সেন একদিন আমাকে জানালেন, তোমার কি আনোয়ার

জাহিদ এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে? দু'জনেই ছাত্রজীবন সবে শেষ করেছেন এবং বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এখন সাংবাদিকতায় ঢুকেছেন।

আনোয়ার জাহিদ এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুর দু'জনেরই সুদর্শন চেহারা এবং আলাপ ব্যবহারের প্রশংসা করলেন নির্মল সেন। বিশেষ করে আনোয়ার জাহিদ সম্পর্কে বললেন, জাহিদ সত্যই সুদর্শন তরুণ। টানা চোখ, লম্বা ফর্সা চেহারা। মেয়েদের মন কেড়ে নেওয়ার মতো। লেখাপড়াতেও ভালো। ইংরেজী বাংলা দুটোই ভালো জানে।

দীর্ঘকাল পরেও আনোয়ার জাহিদ সম্পর্কে নির্মল সেন, আমাদের সকলের নির্মলদার এই মন্তব্যটি আমার এখনো মনে আছে। কারণ, তার এই মন্তব্যটি শুনেই আনোয়ার জাহিদ সম্পর্কে আমি বেশ আগ্রহী হয়ে পড়ি। তারপর 'ইত্তেফাক' অফিসে সেই ষাটের দশকের গোড়াতেই আনোয়ার জাহিদের সঙ্গে আমার পরিচয়। দেখে বুঝলাম, নির্মল সেন তার সম্পর্কে অত্যুক্তি করেননি। সত্যই তার চেহারা, কথাবার্তা আকর্ষণীয়। সবচাইতে ভালো লাগলো তার সহৃদয়তা। রাজনৈতিক চিন্তায় বামপন্থী। কিন্তু একপেশে উগ্রতা নেই। অন্যের মতামত একোমোডেট করতে পারেন। সহজেই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

ষাটের দশকের গোড়ায় আমি ছিলাম 'দৈনিক আজাদের' সম্পাদকীয় বিভাগে। সেখান থেকে চাকরি ছেড়ে কয়েকদিনের জন্য 'ইত্তেফাকে' যোগ দিয়েছিলাম। ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় বিভাগে তখন 'নব্য টার্কির' দল রাজত্ব করছেন। আহমেদুর রহমান (ভীমরুল), মইদুল হাসান, আলী আকসাদ এবং তাদের সঙ্গে দু'টি নতুন মুখ— আনোয়ার জাহিদ এবং মকবুলার রহমান। আহমেদ আমার পুরনো বন্ধু। মইদুলের সঙ্গে পরিচয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবনেই। আলী আকসাদের সঙ্গে মাখামাখি সেই কলেজ জীবন থেকে। নতুন বন্ধু জুটলেন জাহিদ এবং মকবুল। জাহিদের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

জাহিদ সম্ভবতঃ কিছুকাল 'দৈনিক সংবাদে'ও কাজ করেছেন। আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তবে যতটুকু স্মরণ হয়, 'ইত্তেফাকে'ই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আইয়ুব সরকারের 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সের' বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় জাহিদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। এক সঙ্গে আমরা মিছিল করেছি। পুলিশের লাঠির ভয়ে এক সঙ্গে দৌড়েছি। আমাদের দু'জনার মধ্যে রাজনৈতিক মতান্তর ছিল; তা মনান্তরে পরিণত হয়নি। জাহিদ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। মাঝে মাঝেই জেলে যান। আমি স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে জেল খেটেছি।তারপর আর ও মুখো হইনি। রাজনৈতিক বিশ্বাসেও আমি ছিলাম মধ্যপন্থী। সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁক, কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। জাহিদ প্রায়ই

আজিমপুরে চীনা বিল্ডিং-এর পেছনের গলিতে আমার বাসায় আসতেন। আমরা চুটিয়ে রাজনীতি আলোচনা করতাম। প্রেসক্লাবে গিয়ে চায়ের আড্ডা জমাতাম। সেই আড্ডায় এসে জুটতেন আহমেদুর রহমান, মইদুল হাসান, ওয়াহেদুল হক, শহীদ সাবের এবং আরো অনেকে।

আমার বড় মেয়ে তনিমা যখন খুবই ছোট তখন তার একবার খারাপ ধরনের জ্বর হয়। মাসের পর মাস ধরে জ্বর আর সারে না। বড় বড় ডাক্তার এনে দেখালাম। এন্টিবায়োটিকস ঔষধের শিশিতে ঘর ভরে গেল। কিন্তু মেয়ের জ্বর নামে না। দিন দিন শুকিয়ে হাড্ডিসার। তনিমার মা আর আমি দু'জনেই ভয় পেয়ে গেলাম। কি করি? তাকে কি চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাব? এই সময় আনোয়ার জাহিদ বাসায় এসে হাজির। বললেন, গাফ্ফার, আমার একটা কথা শুনবেন? বিদেশে যেতে হবে না। ঢাকাতেই আপনার মেয়ে ভালো হয়ে যাবে। আপনি সব বড় ডাক্তার বিদায় করুন। তারপর ওয়ারি থেকে ডাঃ নন্দীকে ডাকুন। তিনি এসে আপনার মেয়েকে একবার দেখুন।

ডাক্তার নন্দীর নাম আমার বহুকাল ধরে জানা। তার ভাই ভবেশ নন্দী একজন নামকরা কংগ্রেস নেতা। ডাক্তার নন্দী ওয়ারিতে নিজের বাড়িতে থাকেন। মাত্র পাঁচ টাকা ভিজিট নেন। গরীব রোগীরা চিড়েমুড়ি সঙ্গে করে নিয়ে রাত থাকতে তার বাড়ির বারান্দায় এসে বসে থাকে। ভোরে ডাক্তার বাবু তাদের দেখবেন এই আশায়। ডাক্তার নন্দী তাদের কাছ থেকে ফি নেন না। এই পাঁচ টাকা ফিয়ের ডাক্তারের উপর মেয়ের চিকিৎসার ব্যাপারে ভরসা করতে সাহস হচ্ছিল না। তাকে ইতিমধ্যেই ঢাকায় বড় বড় ডাক্তাররা দেখেছেন। যাদের ফি ষোল থেকে কুড়ি টাকা। তখন এটাই ছিল সর্বোচ্চ ফি। তারা দামী দামী ঔষধ দিয়েছেন। তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না।

জাহিদ আমার মনের ভাব টের পেলেন। বললেন, আপনার কি ডাক্তার নন্দীর উপর ভরসা হচ্ছে না?

আমি সত্যি ভরসা পাচ্ছিলাম না। কিন্তু জাহিদ যাতে মনে আঘাত না পান, সেজন্য বললাম, না তা নয়। ডাক্তার নন্দী শুনেছি খুবই ব্যস্ত ডাক্তার। আমার এমার্জেন্সী কলে তিনি কি সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারবেন?

জাহিদ বললেন, আমার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। আমি তাকে ডাকবো। আগামীকালই তিনি এসে তনুকে দেখে যাবেন।

এরপর আর না বলা চলে না। জাহিদ সেদিনের মতো বিদায় নিলেন। কিন্তু পরদিন ভোরেই ডাক্তার নন্দী বাসায় এসে হাজির। বিরাট দশাসই চেহারা। ভুঁড়ির উপর স্টেথিসকোপ ঝুলছে। কিন্তু অমায়িক ব্যবহার। রোগী এবং তার আত্মীয়

স্বজনের মনে তা সাহস আনে। তনিমাকে তিনি প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর বলেলেন, আমার প্রথম প্রেসক্রিপসন হচ্ছে তাকে সব ঔষধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেবেন। এমনকি এন্টিবায়োটিকসও।

সভয়ে বললাম, ডাক্তার বাবু চব্বিশঘন্টা ওর গায়ে জ্বর থাকে। ১০২ ডিগ্রীর মতো। এর নীচে নামে না।

ডাক্তার নন্দী নির্বিকার মুখে বললেন, তা হোক। ঔষধ খাওয়ানো একেবারে বন্ধ। রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব এখন আমার। এরপর পথ্যের কথা। এখন কি খাওয়াচ্ছেন?

ঃ রবিনসন্সের বার্লি। মাঝে মাঝে একটা দুটো টোস্ট। গরম দুধ। তার বেশি কিছু নয়। ডাক্তাররা এই ব্যবস্থাই করেছেন।

ডাক্তার নন্দী বললেন, মেয়েটাকেতো প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছেন দেখছি। আজ থেকেই তাকে ভাত খেতে দেবেন।

আমি চমকে উঠলাম। জ্বরের রোগীকে ভাত? মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, ভাতের নাম শুনে তার রোগশীর্ণ মুখেও খুশির আভা। ডাক্তার নন্দী আরো জোরের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, ভাত। প্রথম দু'দিন 'সফট রাইস'। সঙ্গে মাগুর মাছ এবং ঝোল। একটু চিকেন সুপ। 'সফট বয়েল্ড এগ্‌ ইত্যাদি। দু'দিন পর 'হার্ড রাইস' এবং 'ফুল মিল'। কোনো বাধা নিষেধ নেই। জ্বরটা নেমে গেলে আমি কিছু ভিটামিন দেব। কোনো ঔষধ আর নয়।

ভয়ে ভয়ে বললাম ঃ ডাক্তার বাবু, আজ তিনমাস ধরে এ মেয়ের টানা জ্বর। মোটে ভালো হচ্ছে না। তাকে আপনি ভাত খাওয়াবেন, ঔষধ বন্ধ করবেন? মেয়ে বাঁচবে তো?

নন্দী বললেন ঃ তাহলেই বাঁচবে। ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করুন এবং ভগবানের উপর ভরসা রাখুন। আপনার মেয়েকে গাদা গাদা ঔষধ খাইয়ে একেবারে কাহিল করে ফেলা হয়েছে। 'বডির ন্যাচারাল রেজিস্টেন্স' নেই। জ্বর তাই নামছে না। ঔষধও রেজিস্টেন্ট হয়ে গেছে। কোনো কাজ দিচ্ছে না। আগে ওর শরীরের স্বাভাবিক শক্তি ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

ডাক্তার নন্দী বিদায় নেওয়ার আগেই আনোয়ার জাহিদ এসে হাজির। সব শুনে বললেন, গাফফার, আমি কি নিউমার্কেটের কাঁচা বাজার থেকে মাগুর মাছ আর কচি মুরগী কিনে এনে দেব?

বললাম ঃ না, জাহিদ। আপনাকে আর বাজারে দৌড়াতে হবে না, আপনি বাসায় এসেছেন। চা খান।

তনিমাকে ঔষধ খাওয়ানো বন্ধ করা হল। প্রথমে নরম ভাত, তারপর শক্ত ভাত

দেওয়া হল। তিনদিন পর মেয়ে বিছানায় উঠে বসলো। পাঁচ দিনের দিন তার জ্বর একেবারে নেমে গেল। জাহিদকে জড়িয়ে ধরে বললাম, জাহিদ, আপনি এখনো বিয়ে করেননি, সন্তানের বাপ হননি। সন্তানের কঠিন রোগমুক্তি বাপমায়ের মনে কি স্বস্তি ও আনন্দ আনে, তা আপনাকে বুঝাতে পারবো না।

এরপর থেকে ডাক্তার নন্দী হয়ে উঠলেন আমাদের একেবারে গৃহচিকিৎসক। সামান্য অসুখ বিসুখেও তার শরণাপন্ন হতাম। ১৯৬৪ সালে গভর্ণর মোনায়েম খাঁ আদমজী জুট মিল থেকে কিছু অবাঙালি শ্রমিক ভাড়া করে এনে ঢাকা নারায়ণগঞ্জে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধালেন। সংখ্যালঘুরা ভয়ে আবার দেশ ছাড়তে শুরু করলো। ডাক্তার নন্দীর বাড়ির উপর গুন্ডারা হামলা চালালো। পুলিশ ডেকেও ডাক্তার পরিবার প্রোটেকসন পেলেন না। তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে যেতো হলো ঢাকার সকল দলমতের নাগরিক নিয়ে গঠিত 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি'কে। এই কমিটিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আমরা অনেকেই নাম লিখিয়েছিলাম। আমি, ফয়েজ আহমদ, ওয়াহেদুল হক, মইদুল হাসান, আনোয়ার জাহিদ, আহমেদুর রহমান, জিয়াউল হক টুলু, রেজা আলী (বিটপি এডভারটাইজার্স) প্রমুখ। ফয়েজ এবং ওয়াহেদুলের নেতৃত্বেই একটি স্কোয়াড গিয়ে ডাক্তার নন্দীর পরিবারকে গুন্ডাদের কবল থেকে মুক্ত করে আজিমপুরে জহুর হোসেন চৌধুরীর বাসায় নিয়ে যান। সেখানে কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর ডাক্তার নন্দী সপরিবারে কলকাতায় চলে যান। তার দেশত্যাগ ও বাস্তুত্যাগের খবর জানাজানি হওয়ার পর অসংখ্য গরীব রোগী তার ওয়ারির পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে কেঁদেছে, আর বলেছে, ডাক্তার বাবু, আপনি ফিরে আসুন।

ডাক্তার নন্দীর মতো একজন দেশপ্রেমিক এবং জনপ্রিয় চিকিৎসককে সপরিবারে দেশছাড়া করেও মোনায়েম খাঁর প্রশাসন সন্তুষ্ট হয়নি। তার বাড়িটি পরিত্যক্ত শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং রটনা করা হয় যে, দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তার নন্দী ভারতের পক্ষে গোপন গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত ছিলেন। সেই খবর ফাঁস হতেই গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তিনি সপরিবারে ভারতে পালিয়ে গেছেন।

ডাক্তার নন্দীর ওয়ারির বিরাট বাড়িটি পরিত্যাক্ত শত্রু সম্পত্তি হিসেবে নামমাত্র মূল্যে কিনে নেওয়ার নামে শর্ষিনার তখনকার পীর (বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হানাদারদের কোলাবরেটর হিসেবে যিনি জেলে ঢোকেন) দখল করেন।

ডাক্তার নন্দীর কথা থাক। ষাটের দশকের একেবারে গোড়ায় আনোয়ার জাহিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর্বে ফিরে যাই। এ সময় 'দৈনিক আজাদে'র মালিক পক্ষ বনাম সাংবাদিক ইউনিয়নে'র বিরোধে আমরা বেশ কিছু সাংবাদিক চাকরি হারাই। আজাদের ত্রিশ বছরের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনও চাকরিচ্যুত

হন। বেশ কিছুদিন বেকার থাকার পর আমাদের চাকরি হল একটি নতুন দৈনিক পত্রিকায়। 'দৈনিক জেহাদ'। পুরনো ঢাকার হৃষিকেশ দাস রোড থেকে জাতীয় মুদ্রণ প্রেসের মহিউদ্দিন আহমদ কাগজটি বের করলেন। সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন। আমি সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলাম। কবি শামসুর রাহমান তখন ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজে'র বার্তা বিভাগে কাজ করতেন। তিনি বাংলা সাংবাদিকতায় যোগ দেওয়ার জন্য 'মর্নিং নিউজে'র চাকরি ছেড়ে 'জেহাদের' 'সম্পাদকীয় বিভাগে চলে আসেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি 'জেহাদে' থাকেননি। সম্ভবত ঃ 'মর্নিং নিউজে'ই ফিরে গিয়েছিলেন। তার শূন্যস্থানে আমিই আনোয়ার জাহিদকে নিয়ে আসি। 'জেহাদে'র সম্পাদকীয় লেখা ছাড়াও জাহিদ 'নিউজ ডেস্কের' কিছু কিছু কাজও দেখাশোনা করতেন।

জেহাদের বার্তা বিভাগে 'আজাদের' চাকরিচ্যুত বেশ কিছু সাংবাদিক ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মোসলেম আলী বিশ্বাসও। (বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ঢাকায় 'দৈনিক জনপদের' নির্বাহী সম্পাদক এবং পরে রাজশাহীর 'দৈনিক বার্তা'র সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে লন্ডনে বসে খবর পেয়েছি, তিনি মারা গেছেন)। বর্তমানের প্রবীণ কলামিস্ট এবং রাজনীতিক নির্মল সেনও ছিলেন ' জেহাদের' বার্তা বিভাগে। তিনি মোহাম্মদ মোদাব্বেরের 'অর্ধ- সাপ্তাহিক পাকিস্তান' কাগজে কিছুদিন হয়তো এক আধটু সাংবাদিকতা করেছেন। সাংবাদিকতায় তার প্রকৃত হাতেখড়ি 'দৈনিক জেহাদ' কাগজেই। জেহাদের চীফ রিপোর্টার ছিলেন সৈয়দ আসাদুজ্জামান বাচ্চু। কিন্তু রাতদিন খেটে যারা রিপোর্ট সংগ্রহ করতেন, তাদের মধ্যে ছিলেন হেদায়েত হোসেন মোরশেদ এবং নাজিমউদ্দিন মানিক। দু'জনেই তখন একেবারে তরুণ এবং নতুন সাংবাদিক। মানিকের তখন থেকেই খদ্দরের হাঁটু-ঢাকা পাঞ্জাবী এবং ঢোলা পাজামা। হেদায়েত পান খেয়ে দাঁত লাল করে রাখতো। তার ভাষা ছিল খুবই ভালো। তাকে আমি আরও একটি কারণে পছন্দ করতাম। তার বাড়িও বরিশালে। চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের সেই রমরমা অবস্থার সময়ে তার মামা মওলানা নূরুজ্জামান ছিলেন বরিশালে মুসলিম লীগ দলের সামনের কাতারের নেতা। বরিশাল জেলা মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের সালারে-জেলা। ইংরেজী, উর্দু, বাংলা তিন ভাষাতে তিনি অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। বরিশাল মুসলিম লীগের তখনকার আরেকজন নেতা এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য আরিফ চৌধুরী (কবি আসাদ চৌধুরীর বাবা) ছিলেন মওলানা নুরুজ্জামানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সুবাদে তিনি আমাদের গ্রামের বাড়িতে একাধিকবার গেছেন। তার ভাগ্নে হিসেবে হেদায়েত হোসেন মোরশেদের প্রতি তাই আমার ছিল বিশেষ টান। ষাটের দশকে মোহতারেমা ফাতেমা জিন্না যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে জেনারেল আউয়ুব খাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তখন মওলানা নুরুজ্জামান

ছিলেন ফাতেমা জিন্নার 'প্রাইভেট সেক্রেটারিদের' একজন। তারপর তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।

সাংবাদিকতায় আনোয়ার জাহিদের পারদর্শিতা আমি গোড়া থেকেই লক্ষ্য করেছি। দ্রুত সম্পাদকীয় লেখা, খবর বাছাই করা, এমন কি নতুন রিপোর্টারদের 'ব্রিফিং' দেওয়ার ব্যাপারেও তার দক্ষতা আমাদের অনেকের চাইতে বেশি। হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, নাজিমউদ্দিন মানিকের মতো 'জেহাদে'র তখনকার তরুণ সাংবাদিকদের অনেকেই জাহিদের ব্রিফিং দ্বারা উপকৃত হয়েছেন বলে আমার ধারণা।

রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জাহিদের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি ১৯৬৪ সালে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে। সরকারি দলের উদ্যোগে অবাঙালি দাঙ্গাকারী ভাড়া করে এই দাঙ্গা বাধানো হয়। বাঙালির সেক্যুলার জাতীয় চেতনা এইবার সবচাইতে তীব্রভাবে জেগে ওঠে। নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদের বদলে সক্রিয় প্রতিরোধে তারা এগিয়ে যান। সর্বদলীয় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের জন্য ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের উল্টোদিকে ব্যবসায়ী সাইদুল হাসানের (একাত্তরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দ্বারা অপহৃত এবং তাদের হাতেই নিহত) অফিসে দাঙ্গা প্রতিরোধের সর্বদলীয় বৈঠক বসে। বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা যোগ দেন। পরে মানিক মিয়া, আবদুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরী সহ অন্যান্য পত্রিকা সম্পাদকেরাও দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটিতে সক্রিয় ভূমিকা নেন। এই কমিটির কাজে তখন সবচাইতে 'মিলিট্যান্ট' ভূমিকা নিয়েছিলেন সিরাজুল হোসেন খান(পরে এরশাদের সামরিক সরকারের মন্ত্রী), ছায়ানটের ওয়াহেদুল হক, আহমেদুর রহমান এবং আনোয়ার জাহিদ।

তখনো আমি জানতাম না আনোয়ার জাহিদ প্রেমে পড়েছেন এবং তার প্রেমিকা তখনকার বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন জাঁদরেল নেত্রী। শুধু এইটুকু জানতাম, বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা মস্কো ও বেইজিংপন্থী এই দুই নামে ক্রমশঃ বিভক্ত হচ্ছেন এবং আনোয়ার জাহিদের ঝোঁক বেইজিং-এর দিকে।

(সতের)

"পূবেতে বন্দনা করি পূবের ভানুশ্বর
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কার শহর
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পাহাড়

দক্ষিণে বন্দনা করি বঙ্গোপসাগর
তারপরে বন্দনা করি বুড়িগঙ্গা নদী
ঢেউয়েতে লুকাইয়া আছে অনেক নেকীবদী
বাংলাদেশের খবর যদি আমার কাছে চাও
বুড়িগঙ্গার স্রোত ধরিয়া উজান পথে যাও।"

আনোয়ার জাহিদের কথা বলছিলাম। ষাটের দশকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রতিভাবান সাংবাদিক। তখন নির্যাতিত অথচ বিরাট সম্ভাবনাময় প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী। মনে মনে জাহিদকে ঈর্ষাও করতাম। আমি তার মতো সুদর্শন নই। তার মতো একনিষ্ঠ বামপন্থী নই। তার মতো গুছিয়ে বক্তৃতা দিতে পারি না। তার মতো সহজে বন্ধু বানানোর এবং বন্ধুত্ব ধরে রাখার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি 'লোনার', তিনি 'পপুলার'।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও জাহিদ সম্পর্কে আমার এই ঈর্ষা আরও বাড়লো, যখন শুনলাম, তখনকার বামপন্থী রাজনীতি ও নারী আন্দোলনের দ্যুতিময় নক্ষত্র কামরুন্নাহার লাইলী জাহিদের প্রেমে পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই লাইলীর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি অনার্সের ছাত্র এবং ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত। লাইলী সম্ভবতঃ তখন এম. এ. পড়েন এবং ছাত্র ইউনিয়নের একজন জাঁদরেল নেত্রী। লাইলী একটু মোটাসোটা ছিলেন, কিন্তু তার রূপ ছিল আকর্ষণীয়। কোমল স্বভাবের, কিন্তু স্পষ্টভাষী। অনেকেই তাকে ভালোবাসতেন এবং সেই সঙ্গে ভয়ও করতেন। লাইলী সাবেক বৃহত্তর বরিশালের পিরোজপুরের মেয়ে। তার বাবা ছিলেন উকিল। পরিবারের বন্ধন, ভালবাসা সবকিছু উপেক্ষা করে লাইলী বেছে নিয়েছিলেন বাম রাজনীতির ছন্নছাড়া জীবন।

ষাটের দশকের বেশীর ভাগ সময় আমি 'দৈনিক আজাদে' চাকরি করেছি। কিন্তু নিয়মিত আড্ডা দিতাম রামকৃষ্ণ মিশন রোডে 'দৈনিক ইত্তেফাকের' অফিসে। 'ইত্তেফাকেই' আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কাজ করতেন। আহমেদুর রহমান, মঈদুল হাসান, আলী আকসাদ, আনোয়ার জাহিদ, মকবুল (বর্তমানে ডঃ মকবুলার রহমান)। 'ইত্তেফাক গ্রুপের' ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ঢাকা টাইমস' থেকে এসে এই আড্ডায় জুটতেন সালাউদ্দিন মোহাম্মদ, জহিরুল ইসলাম। আমাদের এই আড্ডার মক্ষিরানী ছিলেন কামরুন্নাহার লাইলী। 'ইত্তেফাকে' তখন একমাত্র মহিলা সাংবাদিক তিনি। লাইলী 'ইত্তেফাকের' মহিলাদের পাতা সম্পাদনা করতেন। লাইলীর বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি আমাদের সঙ্গে সমানে চেঁচিয়ে সমানে টেবিল চাপড়ে তর্ক জুড়তেন। মাঝে মাঝে রেগে গেলে তার ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠতো। আমি তার সঙ্গে তর্ক করা বন্ধ করে দিতাম। তার দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, রেগে গেলে লাইলীকে আরও সুন্দর

দেখায়। 'ইত্তেফাকের' প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কোনো কোনো দিন আমাদের অফিস কক্ষের পাশ দিয়ে হেঁটে তার নিজের কক্ষে ঢুকতেন। আমাকে ডেকে নিয়ে মৃদু হেসে বলতেন, "আপনারা পাঁচ-ছ'জন পুরুষ। কেবলতো লাইলীর গলা শুনছি। তার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠছেন না বুঝি।"

বাম রাজনীতি করতে গিয়ে জাহিদের মতোই লাইলীকে বার বার নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। আজ তার মাথায় ওয়ারেন্ট, কাল হুলিয়া, পরশু ঢাকা থেকে বহিষ্কারাদেশ। এত নির্যাতন, হয়রানির মধ্যেও লাইলীকে দেখতাম হাসিমুখ; নিজের বিশ্বাস ও কর্মপন্থায় অটল। 'ইত্তেফাক' অফিসে আনোয়ার জাহিদ তখন সম্পাদকীয় বিভাগের স্টাফ। লাইলীও 'ইত্তেফাকে' চাকরি করেন। সম্ভবতঃ এখানেই তাদের পরিচয়। রাজনৈতিক বিশ্বাসের অভিন্নতা তাদের আরও কাছাকাছি করেছে।

'ইত্তেফাক' অফিসে বসে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে জাহিদ আর লাইলী দীর্ঘদিন মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা খেলেছেন। আমার তা জানা ছিল না। জাহিদ সব কথাই আমাকে বলতেন। কিন্তু তার এই গোপন প্রেমের কথা আমাকে কখনো বলেননি। লাইলী তখন 'ইত্তেফাক' অফিসের কাছেই গোপীবাগে একটা টিনের ঘরের বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। দু'টো টিনের ঘর মিলিয়ে বাড়ি। সামনের ঘরটির পেছনে এক টুকরো উঠান। তারপর আরেকটি ঘর। অনেকটা গ্রামের বাড়ির মতো। একা এই বাড়ির ভাড়া বহন করা কষ্টকর। তাই লাইলী একজন সাবটেনান্ট নিয়েছিলেন। এই সাবটেনান্ট 'ইত্তেফাকের' আহমেদুর রহমান (ভীমরুল)। আহমেদ আমারও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তখন বিয়ে থা করেননি। আমার সন্দেহ ছিল আহমেদ আর লাইলীর মধ্যেই হয়তো গোপনে মন দেওয়া-নেওয়া চলছে।

আমার এই সন্দেহ যে কতটা অমূলক, তা একদিন আকস্মিকভাবে জেনে ফেললাম। সেদিনও আমার কে এম দাশ লেনের বাসা থেকে হেঁটে 'ইত্তেফাক' অফিসে আড্ডা দিতে এসেছি। দেখি, অফিস কক্ষে লাইলী একা বসে কাজ করছেন। আর কেউ নেই। আনোয়ার জাহিদকে পাবো না, তা জানতাম। তখন তিনি জেলে রাজবন্দী। কিন্তু আহমেদ এবং মইদুলও নেই। মানিক মিয়ার কক্ষ থেকে কোনা সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। লাইলীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করে ফেরার উদ্যোগ করতেই লাইলী বললেন, কি চলে যাচ্ছেন যে বড়! আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে আপনার বুঝি ইচ্ছে হয় না।

মনে মনে বললাম, খুবই ইচ্ছে হয়। মুখে বললাম, আপনি কাজে ব্যস্ত। তাই ডিসটার্ব করতে সাহস হয়নি।

লাইলী বললেন, আমার কাজ প্রায় শেষ। মেয়েদের পাতার এই লেখাগুলো ফোরম্যান বজলু মিয়াকে ('ইত্তেফাক' প্রেসের তখনকার ফোরম্যান বজলুর রহমান)

এখনি বুঝিয়ে দেব। তারপরই আমার ছুটি। বসুন, আপনাকে চা আর আলুর চপ খাওয়াবো।

খাওয়ার নামে আমি এমনিতেই দুর্বল। বললাম, চপগুলো সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন বুঝি?

লাইলী হেসে বললেন, না আনিনি। আজ আপনাকে আমার বাসায় নিয়ে যাব। তারপর গরম গরম আলুর চপ আর চা খাবেন। এইতো কাছেই গোপীবাগে আমার বাসা। হেঁটে যেতে দশ মিনিট লাগে। যাবেন তো?

নিশ্চয় যাব, বলে সেদিনের খবরের কাগজের ফাইলে মন দিলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যে লাইলী কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। কাঁধে তার ব্যাগটি ঝুলিয়ে বললেন, চলুন।

বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন রোড ধরে গোপীবাগের দিকে হাঁটতে ভালোই লাগছিল। ঢাকা শহর তখন এমন জনাকীর্ণ নয়। গোপীবাগেরও তখন ছিল মফঃস্বল শহরের বনেদী মধ্যবিত্ত পাড়ার মতো চেহারা। লাইলীর সামনের ঘরটাতে তালা ঝুলছে। অর্থাৎ আহমেদুর রহমান বাসাতেও নেই। (এমন চমৎকার বিকেলে না থাকারই কথা)। আমরা সামনের ঘরের পাশ কাটিয়ে উঠোন পেরিয়ে পেছনে লাইলীর ঘরে ঢুকলাম। ছোট্ট একফালি ঘর। ড্রয়িং কাম বেডরুম। লাইলী মিটসেফ থেকে আলুর চপ বের করলেন। স্টোভের উপর গরম করলেন। চায়ের পানি চড়ালেন। সব শেষে ধূমায়িত চায়ের কাপ এবং গরম আলুর চপ সামনে নিয়ে দু'জনেই বেতের চেয়ারে বসলাম।

ঃ আপনিতো কাছেই কে এম দাশ লেনে থাকেন? লাইলী জিজ্ঞাসা করলেন।

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমি জানি,আপনি সেলিমাকে বিয়ে করেছেন। ওরাও আমাদের সঙ্গে পিরোজপুরে থাকতো। আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট।

ঃ আপনাকেও সে চেনে। লাইলী আপা ডাকে।

ঃ বহুদিন ওকে দেখি না। একদিন সেলিমাকে দেখতে যাবো।

ঃ একদিন আসুন। আমরা দু'জনেই খুব খুশি হবো।

ঃ আপনাদের কি বাচ্চা হয়েছে?

ঃ একটি ছেলে। এক বছরের উপর বয়স।

লাইলী হেসে বললেন, গাফফার আপনি খুব করিৎকর্মা পুরুষ। এই বয়সেই সাংবাদিকতায় প্রতিষ্ঠিত। বিয়ে করেছেন। এমন কি ছেলের বাপও হয়েছেন।

বললাম ঃ আপনারও সংসারী হতে আপত্তি কোথায়? নিজেতো রাজনীতি আর সাংবাদিকতা নিয়ে ডুবে আছেন। আপনার সময় নেই। আমি একজন রাজপুত্রের

সন্ধান করে দেব?

লাইলী একটু লাল হয়ে উঠলেন। মাথা নীচু করে বললেন, আপনি তাহলে জানেন না। আমার ধারণা ছিল আপনি জানেন। আমি একজন রাজপুত্রের সন্ধান পেয়েছি।

ঃ কে সে? আমার ঔৎসুক্য তখন আর বাঁধ মানছিল না।

লাইলী মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। রাজনৈতিক অঙ্গনের সেই চিরচেনা ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত লাইলীকে আর কখনো লাজ-রক্তিম মুখে এমন মাথা নীচু করে বসে থাকতে দেখিনি। কিন্তু যে নামটি তার মুখে শুনবো বলে আমি দম বন্ধ করে বসেছিলাম, সে নামটি তার মুখে উচ্চারিত হলো না। লাইলী বললেন, আনোয়ার জাহিদ।

এবার আমার কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকার পালা। যখন চোখ তুললাম, তখন প্রথমেই দেখলাম, লাইলীর বিছানার কাছে একটা বেতের টেবিলে জাহিদের ফ্রেমে বাঁধা ছবি (আশ্চর্য, এতক্ষণ ছবিটা আমার চোখে পড়েনি)। স্যুট-টাই-পরা জাহিদের ছবি। ছবিটিতে একটি মালা ঝুলছে। হয়তো লাইলীর নিজের হাতে গাঁথা মালা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লাইলী আবার স্বাভাবিক হলেন। তার মুখের লাজ রক্তিম ভাবটা কেটে গেল। বললেন, জাহিদ এখন জেলে। ও ছাড়া পেলেই আমাদের বিয়ে হবে। তাই আহমেদুর রহমানের কথা ভাবছি। এতদিন ধরে সে এই বাসাতেই আছে। কিন্তু আমাদের বিয়ে হওয়ার পর নবদম্পতির সঙ্গে ওর এই ছোট্ট বাসায় থাকা ঠিক হবে না, ওর জন্য স্বস্তিকরও হবে না। তাই আহমেদের জন্য একটা বাসা খোঁজা এখন দরকার। আপনিতো জানেন, আহমেদ কি ধরনের ছন্নছাড়া পুরুষ। নিজে বাসা খুঁজে বের করবে, তা ওর দ্বারা সম্ভব হবে না। তাই সকলকে বলেছি, আপনাকেও বলছি। ওর জন্য একটা বাসা খুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

বললামঃ নিশ্চয়ই করবো! কে এম দাশ লেনের বাড়িতে আমরা দু'ভাড়াটে থাকি। বাড়তি রুম নেই। নইলে আহমেদকে আমার সঙ্গেই থাকতে বলতাম।

লাইলীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। এর বেশ কিছুদিন পরেই শুনলাম আনোয়ার জাহিদের বিয়ে। লাইলীর সঙ্গে। খবরটা দিলেন 'ইত্তেফাকের' মানিক মিয়া। বললেন, তিনি এই বিয়েতে 'উকিল বাবার' দায়িত্ব পালন করবেন। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেটে এই বিয়ে। জাহিদ নিরাপত্তা আইনে বন্দী। বিয়ের জন্য তাকে প্যারোলেও দু'একদিনের জন্য মুক্তি দেওয়া হবে না। লাইলীকেই কনে সাজিয়ে জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই কাজী বিয়ে পড়াবেন।

আমার জীবনে এটা এক অভিনব বিয়ে। কোনো আড়ম্বর, জাঁকজমক নেই।

উৎসব নেই। শরবত খাইয়ে জেল গেটে অনুষ্ঠান। বর কনেকে দু'দণ্ড নিরালা বসতেও দেওয়া হলো না। জাহিদ এবং লাইলীর অধিকাংশ বন্ধুরাই জেল গেটে হাজির হয়েছিলেন বিয়ে উপলক্ষে। বিয়ে পড়ানোর পর শুভদৃষ্টি এবং মিষ্টিমুখ। তারপর লাইলীর রাজপুত্র ঢুকলেন আবার জেলে। আর লাইলী ফিরে গেলেন গোপীবাগে তার শূন্য বাসায়।

(আঠারো)

ষাটের দশকের অতিবাম বিপ্লবী আনোয়ার জাহিদ সত্তরের দশকে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর কোলাবরেটর হবেন, হবেন পাকিস্তান আর্মিকে মাংস সাপ্লাই দেওয়ার কন্ট্রাক্টর এবং আশির দশকে হবেন টিনপট ডিক্টেটর এরশাদের ঝাড়ুদার মন্ত্রী, এটা আমি কখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারি না। কামরুন্নাহার লাইলীর ভালবাসার মর্যাদাও জাহিদ রাখেননি। ফলে লাইলীকে তার সন্তানদের নিয়ে একদিন জাহিদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেতে হয়েছে। লাইলী শেষ পর্যন্ত আইন পরীক্ষা দিয়ে আইনজীবী হয়েছেন এবং ঢাকা বারে যোগ দিয়েছেন। আইনজীবী হিসেবেও তিনি নাম করেছেন। মাঝে মাঝে আমি ঢাকা বার লাইব্রেরিতে যেতাম। সেখানে দেখতাম, কালো গাউন পরা লাইলী বিরাট হলঘরের এক প্রান্তে বসে তার মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলছেন। কালো গাউন পরা লাইলীকেও অপূর্ব লাগতো। একদিন তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, আপনি সুন্দরী মহিলা উকিল, কালো গাউন পরলেও মক্কেলের অভাব হবে না।

লাইলী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন, 'কই আসল মক্কেলকে তো ধরে রাখতে পারছি না।' বলতেই তার মুখে একটা ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তিনি আনোয়ার জাহিদের কথা ইঙ্গিতে বলছেন। তখন জাহিদ সম্পর্কে নানা কানাঘুষা চলছিল। শুধু তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে নয়। তার রাজনীতি সম্পর্কেও। আমার একটি কথাও বিশ্বাস হতো না। জাহিদের চেহারায়, কথাবার্তায় ছিল (সম্ভবত এখনো আছে) একটা নিষ্পাপ সারল্য। আমার মনে হতো, জাহিদ ভুল করতে পারেন, কিন্তু অন্যায় ও অসৎ পথে যেতে পারেন না। লাইলীর সঙ্গে তার মনোমালিন্যের ব্যাপারেও আমার মনে হতো, লাইলী লাজনম্র ঘরের-বউ নন; বরং তখনকার বাঙালি সমাজের এক উগ্র, স্বাধীনচেতা নারীসত্তা। জাহিদও পুরুষ হিসেবে কম একরোখা নন। মধ্যবিত্ত বাঙালি সংসারের গোবেচারা স্বামীর ভূমিকা গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভবত সম্ভব নয়। ফলে জাহিদ-লাইলী মনোমালিন্য হয়তো দুই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার সংঘর্ষ। প্রথম প্রেমের মোহ আর দেহমিলনের রহস্য ফুরোতেই সেই সংঘর্ষ প্রকট হয়ে উঠেছে।

আমার এই ধারণা বেশিদিন টেকেনি। জাহিদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর লাইলীকে আমি যতবারই দেখেছি, মনে হয়েছে এ লাইলী আর আগের লাইলী এক নন। লাইলীর সেই দেহের আভা, মনের তেজ যেন ক্রমশঃই ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হতে লাগলো, লাইলী জাহিদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। আর এই প্রতারনার ব্যথা ও বেদনা তিনি ভুলতে পারছেন না। ফলে তিনি এখন শুধু অসুখী নন, ধীরে ধীরে অসুস্থও হয়ে পড়ছেন। এ অসুস্থতা সত্ত্বেও এত শীঘ্র তিনি মারা যাবেন, তা আমি ভাবতে পারিনি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় দু'বছর পর লাইলীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা জাতীয় প্রেস ক্লাবের এক সভায়। লাইলী তখনো রাজনীতিতে সক্রিয়। আর আনোয়ার জাহিদ হানাদারদের কোলাবরেটর ও দালাল হিসেবে চিহ্নিত ও অভিযুক্ত।

"বাংলাদেশে মৌলিক অধিকার রক্ষা ও আইনের সাহায্য কমিটি" গঠনের অছিলায় কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ও আইনজীবীর নামে প্রেসক্লাবে এ সভাটি ডাকা হয়েছিল। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এবং 'হলিডে' পত্রিকার এনায়েতুল্লাহ খানও সম্ভবতঃ এ সভায় যোগ দিয়েছিলেন। আমিও এই সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কিন্তু সভায় যোগ দিয়েই বুঝলাম, আমি আমাদের "পিকিংপন্থী" ভাইদের ট্র্যাপে পা দিয়েছি। এটা মৌলিক অধিকার রক্ষা কমিটি গঠনের আবরণে তাদের রাজনৈতিক সভা। একের পর এক বক্তা উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। তাতে মৌলিক অধিকার ও রাজনৈতিক বন্দীদের আইনগত সাহায্যদান সম্পর্কে একটি কথাও বলা হল না। শেখ মুজিব ও তার সরকার সম্পর্কে চলল সমানে বিষোদগার। রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারের সত্য-মিথ্যা অতিরঞ্জিত কাহিনী। কামরুন্নাহার লাইলীও এ সভায় বক্তৃতা দিলেন। অভিযোগ করলেন, রক্ষী বাহিনী গ্রামে গ্রামে নারী নির্যাতন চালাচ্ছে।

আমাকেও বক্তৃতা দিতে ডাকা হল। আমি তখন আমার লেখায় আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা করছি। ফলে সভার উদ্যোক্তারা ভেবেছিলেন, আমিও তাদের সঙ্গে গলা মেলাবো। কিন্তু আমি যখন বক্তৃতা শুরু করলাম, তখন তাদের ভুল ভাঙলো। আমি বললাম, কোনো দেশেই একটা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রের দাঁড়িপাল্লা সকলের জন্য সমানভাবে ব্যবহার করা হয় না। দেশপ্রেমিক ও দেশদ্রোহীদের একই দাঁড়িপাল্লায় সমান ওজনে মাপা হয় না। এমন কি আমার অনেক বন্ধুর কাছে যে দেশ 'পবিত্র ভূমি' হিসেবে চিহ্নিত, সেই 'পবিত্র ভূমি' নয়াচীনেও নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শত্রুদের প্রতি কিছুমাত্র ক্ষমা দেখানো হয়নি; কিংবা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দেশপ্রেমিক সাধারণ নাগরিকদের সমতুল্য একথাও স্বীকার করা হয়নি। নয়াচীনের তুলনায় নয়া বাংলাদেশ বরং দেশদ্রোহী ও কোলাবরেটর এবং তাদের মিত্রদের প্রতি

অনেক বেশি নমনীয় এবং সহনীয় মনোভাব দেখিয়েছে। তা না হলে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দু'বছরের মধ্যে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের এ সভায় আমাদের মধ্যে অনেকেরই গলা উঁচিয়ে বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হতো না।

আমার বক্তব্য সভার উদ্যোক্তাদের খুশি করলো না। খুশি করার কথাও নয়। তারা সময়াভাবের অজুহাতে আমার বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করারও ইঙ্গিত দিলেন। আমি আমার বক্তৃতায় বললাম, আপনারা রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারের কথা বলছেন। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে অরাজক অবস্থা থেকে মুক্ত করা এবং সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে রক্ষীবাহিনী কোথাও কোথাও অবশ্যই বাড়াবাড়ি করে থাকতে পারে। হয়তো এখনো করছে। অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ায় লাল ফৌজ এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর নয়াচীনে গণফৌজ কি এর চাইতে অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করেনি? আপনারা রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারের কথা বলছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা বলছেন না কেন যে, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করার আগে এক বিপুল পরিমাণ আধুনিক সমরাস্ত্র দেশদ্রোহী কোলাবরেটর এবং মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী কিছু তথাকথিত বামদলের হাতে দিয়ে গেছে। এ দলগুলোর মধ্যে জামাত, আলবদর, আল শামস-এর আত্মগোপনকারী নেতা ও কর্মীরা যেমন আছে, তেমনি আছে পিকিংয়ের প্রতি অনুগত বলে পরিচিত পূর্ববঙ্গ কম্যুনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি, সাম্যবাদী দল, সর্বহারা পার্টি নামে পরিচিত কিছু দল— যাদের কেউ কেউ বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতাতেও বিশ্বাসী নয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও দেশটিকে পূর্ব বঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান ইত্যাদি নামে অভিহিত করছে। এ দলগুলোর সন্ত্রাসী অংশের হাতে এ পর্যন্ত কত থানা লুট হয়েছে, কত নিরীহ চাষী জোতদার আখ্যা লাভ করে নিহত হয়েছে, কত গ্রাম ধ্বংস হয়েছে; সবচাইতে বড় কথা, এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কতজন নেতা ও এমপি'কে হত্যা করা হয়েছে, তার একটা হিসেব রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারের অতিরঞ্জিত বিবরণের পাশাপাশি আপনারা তুলে ধরবেন কি? পাকিস্তানী হানাদারদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আজ যারা সদ্য স্বাধীন একটা দেশের অস্তিত্বকে সাবোটাজ করার কাজে লিপ্ত, তাদের মতো লোকদের অন্য কোনো উন্নত গণতান্ত্রিক দেশেও কিভাবে মোকাবিলা ও দমন করা হয়েছে, তার একটা ইতিহাস আমাকে এ সভায় তুলে ধরতে দেবেন কি? আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হওয়ায় আপনাদের কেউ কেউ এটাকে জাতীয় মুক্তির বিপ্লব বলে স্বীকার করতে রাজি নন। ভালো কথা। তাহলে কি, বিদেশী হানাদার বাহিনীর সহযোগিতায় এবং তাদের স্বার্থে অস্ত্র লাভ করে দেশের এ বিপন্ন মুহূর্তে সর্বত্র অরাজকতা সৃষ্টি করা, গ্রামের থানা লুট করা, কৃষকের গোলার ধান লুটে নেওয়া, সম্পন্ন চাষীদের হত্যা করা, গরীব কনস্টেবলকে খুন করা হচ্ছে প্রকৃত জাতীয় বিপ্লব? চীন যখন জাপানের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তখন কুওমিংটাঙ

সরকারের চিরশত্রু মাও ঝে দুং গিয়ে হাত মিলিয়েছিলেন চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে। আপনাদের অনেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মিলানো নীতিবিরুদ্ধ কাজ মনে করেছেন। বিপ্লবের নামে হাত মিলিয়েছিলেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। এখন গলা মিলিয়েছেন পলাতক রাজাকার, আলবদর, কোলাবরেটর, জামাতী ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের সঙ্গে। আপনাদের কাছে আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা, বামপন্থী বলে পরিচিত একদল বিভ্রান্ত বামের সন্ত্রাস দ্বারা কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, না জামাত চক্র ও প্রতিবিপ্লবী মহল উপকৃত হচ্ছে? মুৎসুদ্দী পুঁজি ও লুটেরা-শ্রেণীর সরকার আখ্যা দিয়ে আজকের মুজিব সরকারকে যদি উচ্ছেদ করা হয়, তাহলে বাংলাদেশে কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটার কোনো সম্ভাবনা আছে? না, সামরিক ফ্যাসিবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদ এবং একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা ক্ষমতা দখল করবে? এ ভয়াবহ আশঙ্কার কথাটি কি আপনাদের মধ্যে যারা তত্ত্ববিদ বলে পরিচিত, তারা একবারও ভেবে দেখেছেন?

আমার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর সভায় মৃদু গুঞ্জন উঠলো। কিন্তু কেউ আমার বক্তব্য খণ্ডন করা বা প্রতিবাদ করার জন্য এগিয়ে এলেন না। যতদূর মনে পড়ে দিনটা ছিল রবিবার।-১৯৭৪ সালের ৩১শে মার্চ। আওয়ামী লীগ তখন শাসন ক্ষমতায়। ফলে সরাসরি আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করে কেউ বোধহয় চিহ্নিত হতে রাজি ছিলেন না। সভায় তড়িঘড়ি করে "মৌলিক অধিকার রক্ষা ও আইনের সাহায্য কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করা হল। আমাকেও তাতে একজন সদস্য করা হল। সম্ভবতঃ মুখরক্ষার জন্য। কমিটির নেতৃত্ব রইলো সর্বজন পরিচিত পিকিংপন্থীদের হাতে।

দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে। বিকেলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের একটা ব্রিফিং মিটিং। সুতরাং বাসায় ফিরতে আর ইচ্ছে হল না। প্রেসক্লাবের পেছনের বাগানে একটা গাছের নীচে কয়েকটা চেয়ার পাতা। তার একটিতে গিয়ে বসলাম। প্রেসক্লাব ভবন তখন এতটা সম্প্রসারণ করা হয়নি। পেছনের বাগানটা বেশ বড় ছিল। শীতের মৌসুমে নেট টানিয়ে সেখানে ব্যাডমিন্টন খেলা হতো। আজকের সভাও ছিল এই বাগানে। সভার চেয়ার-টেবিল তখনো চারদিকে ছড়ানো ছিটানো।

সভার অধিকাংশ লোক চলে গেছেন। সাংবাদিকদের কেউ কেউ গেছেন দোতলায় তাস খেলতে। আমি এক কাপ চায়ের অর্ডার দেব কিনা ভাবছি। এমন সময় লাইলী এসে পাশের চেয়ারে বসলেন। সম্ভবত এটাই আমাদের শেষ দেখা।

বললাম ঃ চা খাবেন?

লাইলী সায় দিলেন। বললেন ঃ সঙ্গে একটা সিঙ্গারাও।

চা সিঙ্গারা দুইই এলো। লাইলী বললেন, আপনি আজ আওয়ামী সরকারের খুব

গুণ গাইলেন।

বললাম ঃ গুণ গাওয়া নয়, সত্য কথা বলেছি। আমার বিবেচনায় আওয়ামী লীগ সরকার যেসব ভুল করছে, সেসব কথাও তো লিখছি। আমার আশংকা, উগ্র ডান আর বিভ্রান্ত বাম মিলে দেশটাকে এক ভয়াবহ সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় ও ক্ষমতা দখলকে অনিবার্য করে তুলছে। মাঝখানে আওয়ামী লীগ সরকারের কিছু কিছু ব্যর্থতা ও বিভ্রান্তি তো রয়েছেই।

লাইলী বললেন, আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনায় যাবো না। আমাকে শুধু একটি সত্য কথা বলুন। আওয়ামী লীগ সরকার কি সত্যই হানাদার বাহিনীর কোলাবরেটর ও দালালদের শাস্তি দিতে চায়?

ঃ একথা কেন বলছেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

ঃ তাহলে বড় বড় কোলাবরেটরদের উচ্চপদে বসিয়ে ছোট ছোট সাধারণ কোলাবরেটরদের এত হয়রান করা কেন? এমনও দেখা যাচ্ছে, গ্রামে ধানের জমি নিয়ে, ঘরের পাশের ক্ষেত নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া আছে। তাদের একজন হয়তো আওয়ামী লীগার। সে অন্যজনকে কোলাবরেটর আখ্যা দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছে। এই নিরীহ লোকটি জেলে পঁচে মরছে। অন্যদিকে বড় বড় শহরে যারা আসল কোলাবরেটর ছিল, তারা শুধু সরকারের ক্ষমা নয়, সরকার বা সরকারের সমর্থক লোকজনদের অনুগ্রহে বড় বড় চাকরীও পাচ্ছে।

আমি তার কথার জবাব দিতে যাচ্ছিলাম। দেখি, তিনি মুখ ঘুরিয়ে বসে আছেন। তার ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। চট করে আমার মনে হল, লাইলী কি তার স্বামী আনোয়ার জাহিদের সম্পর্কে ইঙ্গিত করছেন? নইলে তার কথায় এত ক্ষোভ ও বেদনা মেশানো কেন?

আমি তাই কথার পিঠে আর কথা বাড়ালাম না। নিজেও চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ পর লাইলী মুখ ফেরালেন। দেখি তার চোখ লাল (কেঁদেছেন কি?)। হাতের চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, গাফ্ফার আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি ব্যক্তিগত কথা বলছি না। আমার ব্যক্তিগত দুঃখ-শোক আর নেই। ছেলেমেয়েগুলো বড় হলে, মানুষ হলে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই নিশ্চিন্ত মনে মরতে পারবো।

বললাম ঃ এত শিগগির মরার কথা ভাবছেন কেন?

লাইলী হাসলেন ঃ সারাজীবন যুদ্ধ করেছি, আন্দোলন করেছি, জেল খেটেছি। এখনো যুদ্ধ করছি। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বড় ক্লান্ত। আমাদের চারপাশের জগৎটা হঠাৎ কেমন করে যেন পাল্টে গেল। এ জগতে নিজেকে বড় বেমানান মনে হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, কোথাও গেলে যদি শান্তি পেতাম।

লাইলীকে কোনো সান্ত্বনার কথা সেদিন বলতে পারিনি। আমার নিজের জীবনও তখন বিপর্যস্ত। গুরুতর অসুস্থ স্ত্রী কলকাতার হাসপাতালে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঢাকায়। আমি প্রতিমাসে ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে চক্কর খাচ্ছি। মাঝে মাঝে যখন নিজের অবস্থাই নিজের কাছে অসহ্য মনে হয়, তখন মনে মনে জীবনানন্দের কবিতা আওড়াই— "কোথাও সান্ত্বনা নেই, পৃথিবীতে শান্তি নেই আজ।"

এর বেশ কয়েক বছর পর লণ্ডনে বসে যখন লাইলীর মৃত্যুর খবর পেয়েছি, তখন মনে হয়েছে, সারা জীবনের যুদ্ধক্লান্ত এই মহীয়সী মহিলা এতদিনে শান্তি পেলেন, বিশ্রাম নিলেন। চুয়াত্তর সালের মার্চ মাসে ঢাকার প্রেসক্লাবে বসে তার বলা কথাগুলো কানে বেজে উঠেছে, 'কোথাও গেলে যদি শান্তি পেতাম!' সেই শান্তি তিনি এতদিনে পেয়েছেন।

কামরুন্নাহার লাইলী আজ নেই। কিন্তু আনোয়ার জাহিদ এখনো বেঁচে আছেন। মাঝখানে একদিন খবরের কাগজে পড়েছি, ষাটের দশকের এই বুদ্ধিদীপ্ত জনপ্রিয় বাম তরুণ, নব্বুইয়ের দশকে জামাতী ও ফ্রিডম পার্টির দোসর হিসেবে জনতার হাতে মার খেয়েছেন।

আনোয়ার জাহিদের এই বেঁচে থাকা কি সত্যিই বেঁচে থাকা? লাইলী আজ বেঁচে থাকলে তার এককালের প্রেমিক রাজপুত্রের এই পতন দেখে হয়তো মনে গভীর আঘাত পেতেন। অন্ততঃ সেই আঘাত থেকে তিনি বেঁচে গেছেন।

(উনিশ)

ষাটের দশকের গোড়ায় চীন ও ভারতের সম্পর্ক অবনতির একেবারে অতলে গিয়ে ঠেকে। পঞ্চাশের দশকের ভারতে 'হিন্দী-চীনা ভাই-ভাই' শ্লোগানের যে মাতামাতি দেখা দিয়েছিল, ষাটের দশকে দুই দেশের মধ্যে একটা অল্পদিনের যুদ্ধের পরই দেখা দিল তার বিপরীত স্রোত। চীনের কুৎসার কেচ্ছায় ভারতের প্রত্যেকটি পত্রিকার পাতা তখন ভর্তি। চীন মানেই একটা কুৎসিত কদাকার ড্রাগন। ভারতের মানুষ তার নাম শুনলে আঁৎকে ওঠে। কলকাতার রাস্তায় বাচ্চা ফেরিওয়ালারা আর চীনাবাদাম চীনাবাদাম বলে চিৎকার করে না। বলে বাদাম খাবেন বাবু বাদাম? কেউ কেউ আবার ইংরেজী শিখে নিয়েছে। বলে পীনাট। ভুলেও চীনা বাদাম বলে চেঁচালে উত্তেজিত জনতার হাতে বেদম মার খায়।

এমন যে বর্ষীয়ান সাহিত্যিক মনোজ বসু, পঞ্চাশের দশকে চীন ঘুরে এসে একটা বই লিখেছিলেন, "চীন দেখে এলাম", ষাটের দশকে তার দেশের সরকার এবং জনতার মারমূর্তি দেখে বইটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিলেন। বইটিতে

চীনের প্রশংসায় যা লিখেছিলেন, তা 'ডিনাউন্স' করলেন। চীন-ভারত যুদ্ধের কিছুকাল পরেই (ষাটের দশকেই) প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আকস্মিকভাবে মারা যান। তখন ভূবনেশ্বরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। নেহেরু যাচ্ছেন এই সম্মেলনে। এক সাংবাদিক তাকে রসিকতা করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'নেহেরুজি, আপনার পরে কে ভারতের কর্ণধার হবেন? নেহেরু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার জীবনসন্ধ্যা এখনো ঘনিয়ে আসেনি।' সম্ভবতঃ এই মন্তব্য করার একদিন কি দু'দিন পরেই পণ্ডিত নেহেরু আকস্মিকভাবে মারা যান।

তখন নেহেরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কেউ বলেছিলেন, চীন-ভারত যুদ্ধের ধাক্কা নেহেরু সামলে উঠতে পারেননি। চীন-ভারত মৈত্রী ছিল তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের একটা বড় ভিত্তি। এজন্যই আমেরিকার সকল চাপের মুখে জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে ভারত বার বার চীনকে সমর্থন দিয়েছে, বান্দুং শীর্ষ সম্মেলনে চীনকে ডেকে এনেছে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে নিজের সঙ্গে নিয়ে নেহেরু আর সকল রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, চীনের পঞ্চশীলার নীতিকে বান্দুং সম্মেলনের সর্বসম্মত ঘোষণা বলে গ্রহণ করেছেন। এই চীন তিব্বত গ্রাসের পর সীমান্ত নিয়ে ভারতের সঙ্গে ঝগড়া করবে, তুচ্ছ ছুতানাতায় সংঘর্ষ বাঁধাবে এবং শুধু সংঘর্ষ বাঁধানো নয়, বিরাট সেনাবাহিনীর দ্বারা 'হিউম্যান ওয়েভ' (human wave) তৈরি করে হিমালয়ের চূড়া থেকে নেমে আসামের তেজপুর পর্যন্ত ভারতকে খেদিয়ে নিয়ে আসবে, ভারত ও নেহেরু সরকারকে 'হিউমিলেট' করবে, এটা হয়তো নেহেরু কখনো ভাবতেও পারেননি। তার বন্ধুদের কেউ কেউ বললেন, এই মনোকষ্টই তার হৃদরোগ ও আকস্মিক মৃত্যুর কারণ।

কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর নয়াচীন যখন সম্পূর্ণ একঘরে, জাতিসংঘে তাইওয়ানকে চীনের প্রতিনিধিত্বের অবৈধ আসনে আমেরিকা বসিয়ে রেখেছে এবং চীনের জাতিসংঘভুক্তির প্রস্তাবে বার বার 'ভেটো' দিচ্ছে, তখন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া একমাত্র নেহেরুর ভারতই গিয়ে চীনের পাশে দাঁড়িয়েছে; চীন-ভারত মৈত্রীর জোয়ার সৃষ্টি করেছে। চীন কিন্তু একবারও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একথাটি স্বীকার করেনি। বরং বান্দুং সম্মেলনে নেহেরুর ভূমিকা সম্পর্কে চৌ এন লাই পরবর্তীকালে ঠাট্টা করে বলেছেন, "বান্দুং সম্মেলনে নেহেরু এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন তিনি আমার বড় দাদা। আর সকলের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় এই দাদাগিরিই তিনি ফলাচ্ছিলেন।"

নেহেরুর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই (একই ষাটের দশকে) মারা গেলেন তার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তিনিও পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরপরই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে শান্তি চুক্তির বৈঠকে যোগ

দিতে গিয়ে আকস্মিকভাবে মারা যান। ভারতের এক প্রধানমন্ত্রী মারা গেলেন চীন-ভারত যুদ্ধের পর; আরেকজন গেলেন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। লণ্ডনের একটি কাগজ তখন রসিকতা করে লিখেছিল, "গান্ধিজী তার মন্ত্রশিষ্যদের অহিংসামন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বড় ভুল করে গেছেন। অহিংসা ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ হতে পারে, রাষ্ট্র পরিচালনার নয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় রক্তপাত, যুদ্ধবিগ্রহ থাকবেই। প্রমাণিত হয়েছে গান্ধিজীর শিষ্যরা দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালক, কিন্তু যুদ্ধ সহ্য করার মানসিক বল, শক্ত হৃদয় তাদের নেই। দুই যুদ্ধের পর পরই ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু তার প্রমাণ।"

চল্লিশের দশকের একেবারে শেষদিকে চিয়াং কাইশেকের কুওমিংটাং সরকারের পতন এবং মাও ঝে দুংয়ের নেতৃত্বে নয়াচীনের অভ্যুদয়ের সময় আমি ছিলাম স্কুলের ছাত্র। কিন্তু মাওয়ের জীবন, তার লংমার্চ, গণফৌজের বীরত্বগাথা আমার কাছে ছিল রূপকথার মতো। এই রূপকথার মোহাবেশ আমার মনে আরও গভীর করে তোলেন পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় ঢাকার এক বিখ্যাত সাংবাদিক সরলানন্দ সেন। তিনি 'দৈনিক আজাদের' সাংবাদিক ছিলেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা থেকে 'দৈনিক সংবাদ' বের হলে তিনি তাতে যোগ দেন। সাংবাদিকতায় তার কাছে আমি শিক্ষানবিসি করেছি। বাংলাভাষায় মাও ঝে দুংয়ের জীবন কথা প্রথম লেখেন সরলানন্দ সেন সেই চল্লিশের দশকের শেষ দিকেই। এই বই পড়ে মাওয়ের প্রতি ভক্তি আমার আরও বেড়ে যায়। এই অন্ধ ভক্তি ষাটের দশকের গোড়া পর্যন্ত অটুট ছিল। (সরলানন্দ সেন শেষ পর্যন্ত ঢাকায় থাকেননি। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে কলকাতায় চলে যান। দীর্ঘকাল পরে ১৯৭১ সালে কলকাতায় তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। তখনো তিনি সাংবাদিক।)

ষাটের দশকের গোড়াতে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধও চীনের প্রতি আমার মোহমুগ্ধ ভাব নষ্ট করেনি। আমার বিশ্বাস জন্মেছিল, মাও ঝে-দুং মহাত্মা গান্ধীর চাইতে অনেক বড় নেতা। আরও বিশ্বাস জন্মেছিল, নেহেরু যত বড় আধুনিক রাষ্ট্রনেতাই হোন না কেন, তিনি পশ্চিমা গণতন্ত্রের অনুকরণে ভারতের গরীব জনসাধারণের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমৃদ্ধি আনতে পারবেন না। সেই মুক্তি ও সমৃদ্ধি সারা এশিয়ার জন্য আনবে নতুন চীনের নয়া গণতন্ত্র। নয়াচীন দীর্ঘদিনের কলোনিয়াল শাসনে পিষ্ট এশিয়ার জাতিগুলোকে মুক্তির পথ দেখাবে, মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য জোগাবে। এ বিশ্বাস থেকেই চীন যখন ষাটের দশকে একটি ক্ষুদ্র হাইড্রোজেন বোমা তৈরিতে সক্ষম হল, তখন ঢাকার এক কাগজে উল্লসিত হয়ে লিখেছিলাম, "নব্য এশিয়ার হাতে অস্ত্র এসেছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের দিন ফুরুলো বলে।"

ঠিক এ সময় আনোয়ার জাহিদ আমার কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন। বললেন, 'পাকিস্তান-চীন মৈত্রী সমিতি' গঠনের উদ্দেশ্যে তারা পূর্বাণী হোটেলের বড় হলঘরে একটা সভা ডেকেছেন। সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে মীর্জা গোলাম হাফিজও আছেন এবং তিনিই এ সভায় সভাপতিত্ব করবেন। জাহিদ বললেন, এই সমিতি হবে অরাজনৈতিক এবং সকল দলমতের লোকেরাই এই সমিতিতে যোগ দিতে পারেন। আমি বাংলাদেশের কম্যুনিস্টদের পিকিং ও মস্কো কোনো জোটের সমর্থক না হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান ও চীনের মৈত্রীতে বিশ্বাসী একজন সাংবাদিক হিসেবে এই সমিতিতে যোগ দিতে পারি। আমি সানন্দে রাজি হলাম এবং 'পূর্বাণী' হোটেলের সভায় গিয়ে মৈত্রী সমিতির একজন সদস্যও হলাম।

চীন-ভারত যুদ্ধের রেশ তখনো উপমহাদেশে বিরাজমান। ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি, এমনকি পিকিংপন্থীরা নানাভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানেও এসেছে তার প্রতিক্রিয়ার ঢেউ। কিন্তু পদ্মার ও মেঘনার পানি চাঁদপুরের কাছে একস্থানে মিশে গিয়েও যেমন এক বর্ণ ধারণ করেনি, তেমনি মস্কো-পিকিংয়ের মতদ্বৈধতার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে এক বর্ণ ও এক আকার ধারণ করলো না। ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে পিকিংপন্থীরা নানাভাগে ভাগ হলেও তারা আরও সরকার বিরোধী হয়ে উঠলেন; আর পূর্ব বাংলার পিকিংপন্থীরা আইয়ুব সরকারের সঙ্গে অঘোষিত আঁতাত গড়ে তুললেন। তখনকার পূর্ব-পাকিস্তানে সেকুলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি বড় দুর্গ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি পর্যন্ত ভাগ হয়ে গেল। মওলানা ভাসানী নেতৃত্ব দিলেন পিকিংপন্থী অংশের; মস্কোপন্থী অংশের নেতা হলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। ভাসানী-আইয়ুব গোপন বৈঠকের কথা শোনা গেল। দীর্ঘকাল বিনা বিচারে আটক কম্যুনিস্টদের মধ্যে পিকিংপন্থী অংশের কর্মীরা ধীরে ধীরে ছাড়া পেতে লাগলেন। পঞ্চাশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচাইতে মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্রদলটি ছিল 'ইসলামিক ব্রাদারহুড' (আমরা ঠাট্টা করে বলতাম আই. বি.বা পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ) নামে পরিচিত। তাদের একাধিক নেতা উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত ঘুরে এসে মাওবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। ভারত বিরোধিতার নামে প্রচারিত সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা মার্কস ও মাওয়ের বাণীর উদ্ধৃতির আবরণে চমৎকার প্রগতিশীল তত্ত্ব হিসেবে তুলে ধরা হতে লাগলো। (পরবর্তীকালে এরা শেখ মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে উগ্র ফ্যাসিবাদী জাতীয়তা আর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তার তথাকথিত তত্ত্বের মধ্যে বাংলাদেশের সকল জাতিগোষ্ঠীর সমান স্বীকৃতির অত্যাশ্চর্য উপাদানও আবিষ্কার করেছেন)।

ষাটের দশকের এই ক্রান্তিকালে আমিও নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছি। একদিকে চীনের প্রতি মুগ্ধভাব, অন্যদিকে স্বদেশে চীনাপন্থীদের নানা কার্যকলাপে সংশয়,

আমাকেও সন্দিগ্ধমনা করে তুলেছে। এই সময় আবার একটি ঘটনা ঘটালেন আনোয়ার জাহিদ। আমাকে জানালেন, দিল্লীর চীনা দূতাবাসে বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে একদল ভারতীয় গুণ্ডা গিয়ে ঢোকে। তারা চীনা কূটনীতিকদের উপর হামলা চালায়। পুলিশ দূতাবাসে ঢুকে চীনা কূটনীতিকদের রক্ষা করার বদলে এমন মারধোর করেছে যে, তাতে আহত কয়েকজন কূটনীতিকে জীবন রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ। মুমূর্ষু অবস্থায় তাদের স্ট্রেচারে করে বিমানে তোলা হয়েছে। এই বিমান ঢাকা বিমান বন্দর হয়ে পিকিংয়ে যাবে। ঢাকায় বিমান বন্দরে ঘন্টা তিনেক এই কূটনীতিকদের ডাক্তারী পরীক্ষা হবে। মৈত্রী সমিতির সদস্যরা তাদের জন্য ফলমূল নিয়ে বিমান বন্দরে যাবে এবং তাদের সংবর্ধনা জানাবে। আমিও যেন যাই।

দিল্লীর চীনা দূতাবাসে ভারতীয় জনতার বিক্ষোভের খবর কাগজেই বেরিয়েছিল। ভারতীয় কাগজে বলা হয়েছে, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কূটনীতিকদের কয়েকজনের হাতাহাতি হয় এবং তাদের দু'একজন সামান্য আহত হন। পুলিশ উচ্ছৃংখল বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

দিল্লীর চীনা দূতাবাসের ঘটনায় আমিও মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। ঢাকা বিমান বন্দরে (পুরনো) কূটনীতিকদের স্ট্রেচারে করে বিমান থেকে নামিয়ে ভিআইপি লাউঞ্জের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কেবল চোখ দুটো দেখা যায়। আনোয়ার জাহিদ শ্লোগান দিচ্ছেন আধিপত্যবাদী ভারত মুর্দাবাদ, চীন-পাকিস্তান ভাই ভাই। চীন-পাকিস্তান মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক। মীর্জা হাফিজ স্ট্রেচারের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। মৈত্রী সমিতির সদস্যরা শ্লোগানে গলা মেলাচ্ছেন। কিন্তু বিমান বন্দরে মৈত্রী সমিতির সদস্য যত না এসেছেন, তার চাইতে বেশি এসেছেন আইয়ুবের কনভেনশন লীগের নেতা-কর্মীরা। আইয়ুবের মন্ত্রী পুলিশের সাবেক আইজি দোহা সাহেবকেও দেখা গেলো বিমান বন্দরে। শ্লোগানে সকলেই গলা মেলাচ্ছেন।

ভিআইপি লাউঞ্জে স্ট্রেচারগুলো ঢুকতেই তার সামনে পুলিশ পাহারা বসলো। অল্প আহত চীনা কূটনীতিকেরা, হাতে পায়ে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে বিমান থেকে নেমেছেন। তারা ভিআইপি কক্ষে গিয়ে ঢুকতেই তার দরোজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। প্রাদেশিক মন্ত্রী, কনভেনশন লীগের নেতা, প্রাদেশিক সরকারের প্রোটোকল অফিসার এবং মৈত্রী সমিতির সদস্যরা বিদায় নিলেন। রয়ে গেলেন মীর্জা গোলাম হাফিজ, আনোয়ার জাহিদ এবং ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কয়েকজন কর্মকর্তা। স্ট্রেচারে শোয়া কূটনীতিকদের ছবি তুলতে খবরের কাগজের যেসব ফটোগ্রাফার এসেছিলেন, তারাও ফোটো তুলে বিদায় নিয়েছেন।

জাহিদ খাবার হাতে বার বারই ভিআইপি কক্ষে যাওয়া আসা করছেন। আমি এক ফাঁকে বললাম, জাহিদ, আমি কি একবার ভেতরে যেতে পারি? কূটনীতিকদের

দু'একজনের সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চাই। তাহলে হয়তো এ সম্পর্কে কিছু লিখতে পারবো।

জাহিদ সরাসরি না বলতে চাইলেন না। বললেন, ওদের এখন ডাক্তারি পরীক্ষা হচ্ছে। 'লং এয়ার জার্নি' ওরা সহ্য করতে পারবেন কিনা, না ঢাকার হাসপাতালে কয়েকদিন ওদের রাখতে হবে, তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। গরম দুধ এবং কিছু ফল ওদের খেতে দেওয়া হবে। এসময় ভেতরে ঢুকে আপনি কি কথা বলতে চান?

বললাম, আমি ওদের ডিসটার্ব করতে চাই না। কিন্তু একটু অপেক্ষা করে দেখি। যদি সুযোগ হয়, ভেতরে ঢুকে দু'একটা কথা বলবো। আপনি একটু পুলিশদের বলে রাখুন।

জাহিদ সম্মতি জানালেন। প্রায় ঘন্টাখানেক পর সুযোগ পেলাম। মীর্জা গোলাম হাফিজ ঘর থেকে বেরুলেন। সুতরাং দরোজা খোলা হল। আমি সেই ফাঁকে ঢুকলাম। পুলিশ বাঁধা দিল না। ঘরে ঢুকে দেখি, সেই স্ট্রেচারে শোয়া, সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজে বাঁধা তিন মূর্তি উঠে বসেছেন। তাদের মাথায়, মুখে এখন ব্যাণ্ডেজ নেই। তারা পা ছড়িয়ে বসে হাসাহাসি করছেন। তাদের হাতে খোসা ছড়ানো কলা। ঘরের ভেতরে কোন ডাক্তার নেই।

ঘরের ভেতরে আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হল না। কথা বলার তো নয়ই। এই প্রথম আমার মনে আনোয়ার জাহিদ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগলো, পূর্ব পাকিস্তানের বাম রাজনীতিতে তার আসল ভূমিকা কি? আর দিল্লীর চীনা-দূতাবাসের ঘটনাও কতটা অতিরঞ্জিত এবং কতটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত?

(বিশ)

আমার জীবনটা এক লক্ষ্যহীন উল্কার মতো কেটে গেল। না পারলাম অসৎ হতে। না পারলাম সৎ রইতে। সংসারী হয়েও হতে হল বাউণ্ডেলে। ঘর বেঁধেও হতে হল বিবাগী। শেষ পর্যন্ত বিদেশী। দেশকে ভালবেসে হতে হল দেশত্যাগী। চেয়েছিলাম সাহিত্য করবো। হলাম সাংবাদিক— 'যে পেশায় কোনো বন্ধু থাকে না'। কথাটা বলেছেন সম্ভবতঃ ওয়াল্টার লিপম্যান। স্ত্রী ভাবেন অপদার্থ। বন্ধুরা ভাবেন বিশ্বাসের অযোগ্য। ছেলেমেয়ের সঙ্গে 'কালচারাল' ও 'কম্যুনিকেশন গ্যাপ' যোজন যোজন (বিদেশে বসবাসের পুরস্কার)! রাজনৈতিক কলামিস্ট। কিন্তু আমার নিষ্ঠায়, যে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করি তাদেরও বিশ্বাস নেই। যাদের সমর্থন করি না, তারা দুর্নাম ছড়ান। যখন মনের ক্ষোভ ও ব্যথা আর সহ্য হয় না, তখন রবীন্দ্রনাথ পড়ি। মনে হয় রবীন্দ্রনাথই আমার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র আত্মীয়। সুখে

তাঁর কাছে যাই। দুঃখেও তাঁর কাছে যাই। নিন্দায়, দুঃখে, অপমানে তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। একমাত্র সঙ্গী। তিনি আমাকে কখনো বিমুখ করেন না। আমাকে নিঃসঙ্গ জেনে বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দেন। দিনরাত্রির সঙ্গী হন। তাঁর পুরনো— বহু পুরনো কবিতাও আমার কাছে নতুন মনে হয়— "কত সুখ ছিল হয়ে গেছে দুখ/কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ/ম্লান হয়ে গেছে কত উৎসুক উন্মুখ ভালবাসা।"

ছেলেবেলায় যারা বন্ধু ছিলেন তারা একে একে হারিয়ে গেছেন। প্রথম যৌবনে যাকে ভালবাসতাম, ক্লাস পালিয়ে চন্দ্রায়, ভাওয়ালের বনে, শ্রীপুরের শালবনে সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যায় ট্রেনে জীবনানন্দের 'আশ্বিনের জ্যোৎস্নার প্রান্তর' পেরিয়ে ঢাকায় ফিরে আসতাম, তার বাবা একদিন ডেকে বলেছিলেন, 'ওহে বৎস, এবার এ পথ ছাড়ো। আমার মেয়েটির বিয়ের কথাবার্তা আসছে। কেউ ডাক্তার, কেউ সিএসপি (তখনকার সিভিল সার্ভিসেস অব পাকিস্তান) অফিসার। তুমিতো শুনছি সাংবাদিক হবে। এদেশে সাংবাদিকদের পেটে ভাত নেই (তখন সত্যি ছিল না)। আমার মেয়ের শাড়ি-গয়না দূরে থাক, লিপস্টিক কেনার পয়সাও তুমি আয় করতে পারবে না। এসব রোমান্স-টোমান্স উবে যাবে। খামোকা কেন নিজের এবং মেয়েটার কপালে দুঃখ টেনে আনছো? পথ ছাড়ো।'

আমি পথ ছাড়িনি। দাখিতাই একদিন সহসা আমার জীবন থেকে বিদায় নিলেন, বিদায় বাক্য উচ্চারণ ছাড়াই। ধীরে ধীরে তাকেও ভুলে গেলাম। ভোলাটা সহজ ছিল। সহজ ছিল না ভোলার বেদনা সহ্য করা। এই বেদনা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম নিজের গল্পের চরিত্রের মধ্যে, কবিতার মধ্যে। মনে আছে তাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম। "কেনো আর ফাঁদ পাতো শরতের শিশির শ্রাবণে/জানি তুমি পলাতক আশ্বিনের বিমুগ্ধ এ গানে/ আমার হৃদয় যদি চাঁদ হয়ে জ্বলে পুড়ে যায়/তুমি ফিরে তাকাবে না এ বিষন্ন প্রাণের সভায়।"

বাকি লাইনগুলো মনে নেই। কবিতাটি বহুদিন আমার কাছে খাতাবন্দী হয়ে ছিল। তারপর ছাপতে দিয়েছিলাম মাসিক 'মাহে নও' পত্রিকায়। 'মাহে নও'-এর সম্পাদক তখন কবি আবদুল কাদির। তিনি ছন্দের রাজা। ছান্দসিক কবি নামে পরিচিত ছিলেন। আমার কবিতাটি তার কেন ভাল লেগেছিল জানি না। তিনি প্রথমে এই কবিতা মাসিক মাহে নও পত্রিকায় ছাপেন। তার পর 'মাহে নও'-এর বিভিন্ন বছরের বাছাই করা সেরা লেখা নিয়ে যে বিশেষ বার্ষিক সংখ্যা বের করা হয়,তাতেও এই কবিতাটিকে আবার স্থান দেন।

আমার সহপাঠী ও বন্ধু কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ তখন 'মাহে নওয়ের' সহকারী-সম্পাদক। অন্যদিকে কবি আবদুল কাদিরের তিনি ভাইপো। এই মাহফুজউল্লাহ একদিন আমাকে জানালেন, আপনার কবিতাটি আবদুল কাদির

সাহেবের খুব ভালো লেগেছে। তবে কবিতার একটি শব্দ তিনি বদলে দিয়েছেন।

ঃ কোন্ শব্দটি? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ঃ শ্রাবনে শব্দটি। মাহফুজউল্লাহ বললেন। আপনি 'শরতের শিশির শ্রাবনের' সঙ্গে 'আশ্বিনের বিমুগ্ধ গানের' মিল দিয়েছেন। তার কাছে 'শ্রাবরের' সঙ্গে 'গানের' অন্তমিল ভালো লাগেনি। তিনি 'শিশির শ্রাবনে' কথাটিকে শিশির-সিনানে' করে দিয়েছেন।

মুখ বেজার করে অনেকক্ষণ বসে থেকেছি। সিনান (স্নান থেকে) শব্দটি যে আধুনিক কাব্য-রুচির ঘোরবিরোধী, একথা মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহকে তখন বলে লাভ নেই। কারণ, কবিতাটি ছাপা হয়ে গেছে এবং বিশেষ সংখ্যা 'মাহে নও' বাজারে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

আমার একটি ধারণা, মানুষের মনে বেদনার নদীতে বিস্মৃতির বালু হয়তো জমে। তা কখনো শুকিয়ে যায় না। আমার ব্যথার ক্ষতেও প্রলেপ পড়েছিল। একেবারে শুকিয়ে যায়নি। তার প্রমাণ পেলাম দীর্ঘকাল পর। মুক্তিযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসি। তখন আমি সুখী সংসারী। কিছুকাল পরেই নতুন দৈনিক পত্রিকা বেরুলো 'জনপদ'। আমি তার সম্পাদক। মোটা বেতন। গাড়ি বাড়ি দুই আছে। সমাজের উচ্চ শিখরে আমার অবস্থান এবং ক্ষমতাবানদের সঙ্গে নিত্য ওঠাবসা। বঙ্গভবনের পাশে টয়েনবি সার্কুলার রোডে (জয়কালী মন্দির রোডের মোড়ে) আমার নতুন অফিস। নতুন রোটারি মেশিন আনার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এ সময় অফিসে একদিন টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই শুনতে পেলাম, কেমন আছো?

গলার স্বর চিনতে না পেরে বললাম, কে বলছেন?

ঃ এরই মধ্যে গলার স্বরটাও ভুলে গেছো?

এবার চিনতে পারলাম। পেয়ে বিস্মিত হলাম। যেভাবে প্রথম যৌবনে সে আমার কাছ থেকে কিছু বলা-কওয়া ছাড়াই বিদায় নিয়েছে, আমি যদি তার কাছ থেকে সেভাবে বিদায় নিতাম, তাহলে দীর্ঘকাল পর হঠাৎ তাকে এমন সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে টেলিফোন করতে পারতাম না। এমনভাবে কথা বলতে পারতাম না। মেয়েরা কি তাহলে সব পারে? আমার ধারণা, পারে। নারীবাদী পাঠক বন্ধুরা আমাকে একদেশদর্শী ভাববেন না। আমি নারী প্রগতিতে বিশ্বাসী। অবাধ নারী স্বাধীনতাতেও। তবে একটা কথা বিশ্বাস করি না যে, কেবল পুরুষেরাই নারীর উপর নির্যাতন চালায়। পুরুষ নারীর স্বাধীনতা হরণ করেছে। তার পায়ে দাসত্বের শিকল পরিয়েছে। তবু পুরুষতান্ত্রিক ও পুরুষশাসিত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসেও

দেখা যায়, সে নারীকে সর্বতোভাবে জয় করতে পারেনি। শৃঙ্খলিত হয়েও নারী রয়ে গেছে অপরাজিত। পুরুষের কাছে অধরা।

নারীর উপর পুরুষের অত্যাচার স্থূল, জৈবিক এবং দৈহিক। পুরুষের উপর নারীর অত্যাচার সূক্ষ্ম, অদৃশ্য এবং মানসিক। তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে এখানেই আমার দ্বিমত। তসলিমা নারীর উপর পুরুষের স্থূল বর্বরতা দেখেছেন। পুরুষের উপর নারীর সূক্ষ্ম ও দেহাতীত নির্যাতন দেখেননি। সেই পুরাকালের একটি পুরনো গল্প বলি। এক রাজা তার গরীব প্রজার সুন্দরী স্ত্রীকে কামনা করেছিলেন। অর্থ, ঐশ্বর্য্য, পাটরানীর পদের প্রলোভন কোনো কিছুতেই যখন সেই নারীকে টলানো গেল না, রাজা তখন কৌশলে ডাকাতের দ্বারা গরীব প্রজাটিকে খুন করালেন। তার সুন্দরী স্ত্রীকে অপহরণ করে রাজ প্রাসাদে এনে নির্জন কুঠরিতে বন্দী করলেন।

রাজা পুরুষ। রাজ্যের ও সমাজের কর্তৃত্ব তার হাতে। প্রজার সেই সুন্দরী স্ত্রীর আত্মরক্ষার আর কোনো পথ রইলো না। একরাতে রাজা পাগলের মতো তাকে টেনে নিয়ে গেলেন বিছানায়। বললেন, তোমাকে পাওয়ার আশায় এই রাজ্য তোমার পায়ে সঁপে দিতে চেয়েছি, তোমাকে পাটরাণী করতে চেয়েছি। তুমি রাজি হওনি। এখন তুমি আমার হাতের মুঠোয়। তোমাকে রক্ষা করবে কে?

সুন্দরী বললেন, কেউ না। আমিই আমাকে রক্ষা করবো। আপনি আমার শরীরটা নিয়ে পুতুল খেলা খেলতে পারেন। কিন্তু আমাকে আপনি পাবেন না।

রাজা হেসে বললেন, আচ্ছা সে দেখা যাবে।

দিনের পর দিন যায়। রাতের পর রাত। রাজা রোজ রাতে সেই সুন্দরী নারীর শরীরটা উপভোগ করেন। কিন্তু তার মনের যেন নাগাল পান না। একটা কাঠের গুঁড়ির মতো সেই নারীর নগ্ন শরীরটা শয্যায় এলিয়ে পড়ে থাকে। রাজা নানাভাবে চেষ্টা করেন। তাতে সাড়া জাগাতে পারেন না। চুমোয় চুমোয় ভরে দেন তার ঠোঁট। মনে হয় শক্ত, ঠাণ্ডা, পাথরে যেন ঠোঁট ঘঁষছেন। পাথরে তৈরি পুতুলের শরীর নিয়ে খেলছেন। মাসের পর মাস চেষ্টা করেও রাজা সেই নারীকে টলাতে পারলেন না। পারলেন না তার পাথরের শরীরে প্রাণ সঞ্চার করতে। রাগে, দুঃখে, অতৃপ্তিতে তিনি পাগল হয়ে উঠলেন। বার বার সেই নারীর শরীর উপভোগ করেও তার অতৃপ্তিই কেবল বাড়ছে। এই নারীর শরীরে যেন সুধা নেই। রাজার জন্য আছে কেবল বিষ। শেষ পর্যন্ত না পেরে একদিন সেই নারীকে রাজা বললেন, তুমি আমার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছো।

রাজার কথার জবাব দিলেন না সুন্দরী। শুধু মুচকি হাসলেন। পরদিন দেখা গেল রাজপ্রসাদের আরেকটি নির্জন কুঠুরিতে কড়ি-কাঠের সঙ্গে রাজার মৃতদেহ ঝুলছে। তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

আমাদের দেশের আধা ফিউডাল কৃষিভিত্তিক সমাজে নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। সেখানেও দেখেছি, সংসারে স্বামীকে নয়, স্ত্রীকে কর্তৃত্ব ফলাতে। আমার বাবাতো লেখাপড়া জানতেন। সমাজপতি ছিলেন। রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন। আয় রোজগারও ছিল একা তারই। অন্যদিকে আমার মা এক পয়সাও আয় করতেন না। লেখাপড়ার দৌড় পুঁথিপাঠ পর্যন্ত। তিনি সুর করে হাশেম কাজীর পুঁথি, সোনাভান, জঙ্গনামা, শহীদে কারবালার পুঁথি পড়তেন। আমরা ভাইবোনেরা ছোটবেলায় নিবিষ্টমনে তা শুনতাম। এই মাকেই দেখেছি, সংসারে অধিকাংশ ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্তটি দিতে। আমার জাঁদরেল জমিদার বাবাকে নয়।

নিজের কথায় ফিরে যাই। টেলিফোনে সেদিন তার গলা চিনতে পেরে বিস্মিত হলাম। তার কথার জবাব দিলাম না। সে একটু চুপ থেকে বললো, তোমার বৌ, ছেলেমেয়ে কেমন আছে?

বললাম, ভালো। তোমার স্বামী এবং ছেলেমেয়েরাও নিশ্চয়ই ভালো আছে।

সে বলল, ভালো বলতে পারি না। তবে একরকম আছি। দিন কেটে যাচ্ছে।

এরপর আবার বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। টেলিফোনের লাইন কেটে গেছে কিনা জানার জন্য হ্যালো বলতেই অপরপ্রান্ত থেকে সে বলল, তোমাকে একটা অনুরোধ জানানোর জন্য টেলিফোন করেছি। অনুরোধটি রাখবে?

ঃ কি অনুরোধ?

ঃ আমার বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তুমি রাজি থাকলে তিনি তোমার কাছে যাবেন।

বললাম, আমি সবসময় তোমার বাবার কাছে গিয়ে দেখা করেছি। এখন তিনি কেন আসবেন? দরকারটা কি বলো। আমিই তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো।

সে বলল, দরকারটা আমার। আমারই তোমার সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলা উচিত। কিন্তু বাবার জেদ, তিনি যাবেন। তুমি তার কাছে আসো, তা তিনি চান না। তুমি তার কাছে এখন বিরাট একটা কিছু। লেখক, পত্রিকার সম্পাদক। বঙ্গবন্ধুর কাছে তুমি সকালে-বিকালে যাও। বাবা এখন প্রায়ই তোমার গল্প করেন। তোমার লেখা পড়েন।

হায়রে নিয়তি! বললাম, ঠিক আছে। তিনি কখন আসতে চান?

ঃ তুমি রাজি হলে আগামীকালই। তোমার অফিসে যাবেন। তবে একটু প্রাইভেটলি কথা বলতে চান।

বললাম, বেশ! সকাল দশটায় আমি অফিসে থাকবো।

পরদিন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে তিনি এলেন। বুড়ো হয়েছেন। সব চুল পাকা। পেশায় ডাক্তার। এখনো গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে রাখেন। আমার অফিসকক্ষে

চেয়ার টেনে বসলেন। আমি চায়ের অর্ডার দিতেই শশব্যস্ত হয়ে বললেন, আমি জানি বাবা, তুমি খুব ব্যস্ত মানুষ, তোমার সময় নষ্ট না করে দু'এক কথায় অনুরোধটি জানিয়ে বিদায় নেব।

চা এলো। তিনি বললেন, আমার জামাইটিও বাবা ডাক্তার। তুমি সম্ভবতঃ জানো। ছেলেমেয়ের বাবা হয়েছে।কিন্তু এই কুড়ি বাইশ বছরেও পসার জমাতে পারেনি। বহুদিন আমার চেম্বারেই বসেছে। আমার রোগীদেরই চিকিৎসা করেছে। তার কাছে কোনো নতুন রোগী আসেনি।

তিনি একটু থামলেন। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, শেষ পর্যন্ত সে সরকারী চাকরি নিয়েছে। তাও এই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু আগে। পোস্টিং ঢাকাতে। সুতরাং আমার মেয়েও একটা কলেজে মাস্টারি করে কিছু রোজগার করতে পারছে। এখন বাবা, আমার এই জামাইকে মহকুমা শহরে বদলি করা হয়েছে। শুনে আমাদের সকলের মাথায় বজ্রপাত। আমার মেয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছে। মফঃস্বল শহরে গিয়ে স্বামীর একার আয়ে তার সংসার চলবে না। তার পক্ষে সেখানে গিয়ে মাস্টারি পাওয়া এবং করা সম্ভব হবে কিনা তাও সে জানে না। তাই বাবা, শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে আসতে হল।

বললাম, আমাকে কি করতে হবে বলুন।

ঃ আমার জামাইয়ের এই বদলির অর্ডারটা তোমাকে ক্যানসেল করাতে হবে বাবা। তুমি পারবে। শুনেছি, বঙ্গবন্ধু তোমাকে খুবই স্নেহ করেন। তাছাড়া তুমি নিজেই একটা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ....

তাকে থামাতে হল। বললাম, এই সামান্য ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাওয়া উচিত হবে না। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রীই যথেষ্ট। তিনি আমার অনুরোধ রাখবেন কিনা জানি না। আমি চেষ্টা করবো।

তিনি কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হয়ে উঠলেন। বললেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তোমার কথা শুনবেন। নিশ্চয়ই শুনবেন। আমি জানি তিনি শুনবেন। বলেই জামাইয়ের নাম, বর্তমান পদ ও চাকরিস্থল, বদলির অর্ডার নাম্বার, কোথায় বদলি হয়েছেন সব একটা কাগজে লিখে আমার হাতে দিলেন। তারপর আমাকে আরো অনেক স্তুতিবাক্য শুনিয়ে বিদায় নিলেন।

আবদুল মালেক উকিল তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি আমার অনুরোধ রাখলেন। সেই বদলি অর্ডার তিনি বাতিল করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর আরো একবার টেলিফোন এসেছিল। করেছিল সে-ই। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের বাসায় একবেলা ডালভাত খাওয়ার আমন্ত্রণ। বলেছিলাম যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি।

আমার ব্যর্থ প্রেমের গল্প পাঠকদের শোনানোর জন্য আজকের এ কাহিনী নয়।

আমার বলার কথা, ঢাকায় সেই পঞ্চাশের দশকেও নারী স্বাধীনতার ঢেউ যখন ওঠেনি, ঘোড়ার গাড়ির চারদিকে শাড়ি দিয়ে পর্দা তৈরি করে মেয়েদের স্কুলে কলেজে যেতে হতো, তখনও পুরুষেরাই যে কেবল সকল ব্যাপারে নারীর উপর নির্যাতন করেছেন, তাদের বঞ্চনা করেছেন, তা নয়। সুযোগ পেলে মেয়েরাও পুরুষের উপর সূক্ষ্ম নির্যাতন চালাতে পেছপা হননি। নারীবাদীরা আমার গল্প শুনে বলবেন, মেয়েদের বাবারাও তো পুরুষ। সেই পুরুষদের নির্দেশেই তারা প্রেমিক পুরুষদের প্রত্যাখ্যান করেছে। নিজেদের ইচ্ছায় নয়। হয়তো ব্যাপারটা তাই। সবই পুরুষের দোষ। তবু আরেকটা গল্প এখানে বলি। এটাও সেই পঞ্চাশের দশকের গল্প।

এ গল্পের নায়কের নাম যদি বলি, তাহলে তাকে চিনতে একমুহূত অনেকের দেরি হবে না। পঞ্চাশের দশকে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। প্রগতিশীল তরুণ কবি। তার এম এ পরীক্ষার রেজাল্ট না বেরুতেই তাকে তার বিভাগে লেকচারার পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। সুদর্শন স্মার্ট চেহারা তার। সকল মহলে তিনি জনপ্রিয়। আমাদের এই নায়ক প্রেমে পড়লেন। নায়িকা তারই ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী। অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের খুবই সুন্দরী মেয়ে। প্রেম যখন অনেকদূর গড়িয়েছে তখন নায়িকা জানালেন, মাস্টারের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে তার পরিবার রাজি নন। মাস্টারদের আয় উপার্জন আর কত? সামাজিক মর্যাদাও বা তেমন কি? সুতরাং তাকে পেতে হলে নায়ককে সিএসপি (সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস) পরীক্ষা দিয়ে বড় সরকারী অফিসার হতে হবে। তখন ঢাকার শিক্ষিত ও এলিট সমাজে সাংবাদিক, শিক্ষক, উকিল এরা ছিলেন অকুলীন বর। কেউ সহজে মেয়ে দিতে চাইতেন না। বাজার দর চড়া ছিল সিএসপি অফিসার, ডিপ্লোম্যাট, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার পাত্রদের। এদের মধ্যে সদ্য পরীক্ষায় পাস করে নতুন অফিসার হয়েছেন এমন সিএসপি অফিসারেরাই ছিলেন পাত্রীপক্ষের অধিকাংশের 'ফার্স্ট চয়েস'।

আমাদের নায়ক পড়লেন বিপাকে। কাব্য-সাধনা ও শিক্ষকতা তার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে তিনি লক্ষ্যচ্যুত। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন। একগাদা ঘুমের বড়ি খেলেন। তার বন্ধুরা যখন টের পেল, তখন তার প্রায় অন্তিম অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নেয়া হল। ডাক্তার বহু কষ্টে তার পেট থেকে উনিশটি ঘুমের বড়ির বর্জ্য বের করলেন। মরতে মরতেও নায়ক বেঁচে উঠলেন। নায়িকার মন নরম হল। তবু বললেন, তুমি সুপিরিয়র সার্ভিসের পরীক্ষাটাতো দাও। তারপর কি হয় দেখা যাবে। নায়ক পরীক্ষা দিয়ে ভালভাবে পাস করলেন। তারপর তার কপালে বরমাল্য জুটেছিল। সরকারী চাকরির সবগুলো উঁচু ধাপ পেরিয়ে তিনি রাষ্ট্রদূত এবং মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। এ গল্পের নায়িকা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। ইচ্ছে করলেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

স্বামী গ্রহণে পরিবারের অনিচ্ছা হয়তো অগ্রাহ্যই করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। হয়তো নারীবাদীরা বলবেন, এটাও তার চেতন অথবা অবচেতন মনে বহু শতকের পুরুষশাসিত সমাজের প্রভাবের ফল। হতে পারে। আমি তর্ক তুলতে চাই না।

নব্বুইয়ের দশকের গোড়ায়—১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে দীর্ঘকাল বিদেশ-বাসের পর ঢাকায় গিয়ে দেখি, সমাজ জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন। শহুরে শিক্ষিত সমাজে সুপিরিয়র সার্ভিসের পাত্রদের আগের বাজার দর আর নেই। ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়াররাও আগের স্থানচ্যুত হয়েছেন। এখন বরের বাজারে ফার্স্ট গ্রেডের ও ফার্স্ট চয়েসের বর হলেন আর্মির তরুণ অফিসার। সেকেন্ড চয়েস ফরেন সার্ভিসের তরুণ বর (তরুণী স্ত্রীরা সহজেই বিদেশে যেতে পারবেন)। 'থার্ড চয়েস' কোনো এনজিও'র উর্ধতন পদে তরুণ কর্মকর্তা অথবা অর্ধশিক্ষিত ছেলে। আমাদের সমাজের উচ্চ পর্যায়ের এই নতুন স্তর বিন্যাসের গুরুত্ব, প্রভাব ও পরিণাম ফল নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরা কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা করেছেন কিনা আমি জানি না। ঢাকার সমাজ দূর অথবা অদূর ভবিষ্যতে আবার কোনোদিন সিভিল সমাজের মর্যাদা ফিরে পাবে কিনা, তা সম্ভবত এই সমাজ বিজ্ঞানীরাই ভালো বলতে পারেন।

ওই জানুয়ারী মাসেই ঢাকার এক উঁচু মহলের শিক্ষিত পরিবারের বাসায় গিয়েছিলাম। এ পরিবারের বড় মেয়েটি সুন্দরী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাশের শেষ বর্ষের ছাত্রী। ঢাকার সমাজ জীবনে এখন অনেক পরিবর্তন। মেয়ের মা প্রকাশ্যেই গর্ব করে বললেন, তার মেয়ের এখন তিন চারটি ঘনিষ্ঠ ছেলেবন্ধু। মেয়ের আলটিমেট পছন্দ কাকে, তা তিনি জানেন না। তার ধারণা আর্মির তরুণ অফিসারটির দিকেই মেয়ের টান।

বললাম, মেয়ে আর্মির অফিসার পছন্দ করছে কেন? তাদের জীবনতো ঝুঁকিপূর্ণ।

মা হেসে উঠে বললেন, আপনি লন্ডন থেকে এসেছেন তো, তাই এসব কথা বলছেন। আমাদের দেশে আর্মি অফিসারদের জীবন মোটেই ঝুঁকিপূর্ণ নয়। বরং তাদের আয়-উন্নতির সম্ভাবনা অনেক বেশি। চাই কি দেশের প্রেসিডেন্ট পদেও তারা বসে যেতে পারে। আর কোন্ সার্ভিসের লোকের এমন সম্ভাবনা আছে বলুনতো?

বললাম, কেন জুডিসিয়াল সার্ভিসের লোকদের। অনেক 'জাস্টিস'তো প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

মেয়ের মা হাতের তুড়ি বাজিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন। বললেন, তা ওই এ্যাকটিনি পর্যন্ত। অথবা ক্ষমতাহীন প্রেসিডেন্ট। আসল প্রেসিডেন্ট কেউ হতে পেরেছেন?

(একুশ)

প্রায় দু'দশক পরে ঢাকায় ফিরে আমাদের মোতাহার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল না, এটা আমার এক পরম পরিতাপ। মোতাহার ভাইয়ের পুরো নাম মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী। তার সঙ্গে দেখা হল না, এজন্য তিনি দায়ী নন, দায়ী আমি। ইচ্ছে ছিল, ঢাকায় তার গোপীবাগের বাসায় গিয়ে সিদ্দিকী পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা করবো; মোতাহার ভাইয়ের সঙ্গে লম্বা আড্ডা দেব। পুরনো দিনের স্মৃতির আনন্দ-বেদনার রস উপভোগ করবো দু'জনে সমানভাবে। সেই দিনগুলোর বারো আনা লোকই এখন বেঁচে নেই। সেই পুরনো ঢাকার ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের সেই 'মিল্লাত' (বর্তমানের 'মিল্লাত' নয়) অফিসের আড্ডার লোকগুলোও সকলে এখন নেই। যে দু'চারজন আছেন, তারা ধূসর গোধূলির বিষণ্ন সন্ধ্যায় শেষ-খেয়ার যাত্রী।

মোতাহার ভাইয়ের সঙ্গে যে দেখা হল না, সেই দোষ ষোল আনা আমার। মাত্র এক মাস দেশে ছিলাম। নানা হুড়-হাঙ্গামায় কেমন করে যে দিনগুলো কেটে গেল বুঝতে পারিনি। খেয়াল হল লন্ডনে ফিরে আসার সময় প্লেনে চেপে। একে একে স্মরণ হল অনেক প্রিয় এবং পরিচিত মুখের । তাদের সঙ্গে কি জীবনে আমার আর দেখা হবে?

মোতাহার ভাই সাংবাদিক না হয়েও দীর্ঘকাল দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। রাজনীতিক না হয়েও এক সময় বাংলাদেশের (সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের) রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ নেপথ্য-ভূমিকা পালন করেছেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পক্ষাবলম্বন করেও তিনি চিরকাল থেকেছেন অজাতশত্রু। পোশাকে, জীবনযাত্রায় একেবারেই সাদাসিধে; কিন্তু চরিত্রে ও আচরণে চরম অভিজাত। এমন একটি মানুষ আমাদের বাঙালি মুসলমান সমাজে বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না।

মোতাহার ভাই ফরিদপুরের জমিদার বংশের সন্তান। ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়ার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। জীবন শুরু করেছিলেন তার রাজনৈতিক সাগরেদ হিসেবেই। ফলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার মতের বনিবনা বেশি ছিল না। কিন্তু দারুণ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে আওয়ামী পন্থীদের প্রধান দূর্গ 'ইত্তেফাক' ভবনের সঙ্গে। 'ইত্তেফাকে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তাকে চিরকাল 'ইত্তেফাক' ও মানিক মিয়ার পরিবারেরই একজন মনে হয়েছে। 'ইত্তেফাক' ও মানিক মিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে অনেকেই মোতাহার ভাইকে আওয়ামী লীগার ভাবতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ

বিরোধী। কিন্তু তার এই বিরোধিতা কখনো বিদ্বেষে পরিণত হয়নি। বরং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেও তার একটা সহজ সরল প্রীতির সম্পর্ক ছিল দেখেছি।

চেহারাতেও মোতাহার ভাই সুন্দর এবং সুপুরুষ। ফর্সা টকটকে রঙ। ঋজু লম্বা শরীর। সেই সত্তরের দশকেও দেখেছি, তার শরীরে মেদ জমেনি, মাথার চুল সাদা। কিন্তু টাক পড়েনি। বয়সে তিনি আমার বড় ভাইয়ের চাইতেও একটু বড়। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে যখন তার সঙ্গে কাজ করি, তখন দু'জনের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নিকট-বয়সী বড়ভাই ও ছোটো ভাইয়ের। ঠাট্টা করে বলতাম, মোতাহার ভাই, আপনার তো দেখছি রমণীমোহন চেহারা। কত মেয়ে মানুষের বুক ভেঙেছেন?

মোতাহার ভাই হাসতেন। "কলেজে পড়ার সময় যখন ধুতি-চাদর পরতাম, তখন হিন্দু মেয়েরাও আমার দিকে দু'একবার তাকিয়েছে বৈকি।" তিনি বলতেন।

মোতাহার ভাইকে স্যুট-টাই পরতে কদাচিৎ দেখেছি। তার নিত্যাদিনের পোশাক ছিল সদ্য ক্রিজ-ভাঙা সাদা পাজামা আর সাদা পাঞ্জাবী। বেশ কিছুকাল চাকরি করেছেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে। তখনকার ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির খোদাবক্‌শ্ সাহেব মোতাহার ভাইকে খুবই পছন্দ করতেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তার উপর নির্ভর করতেন। এ ব্যবসায়ের ফাঁকে তাকে কখনো দেখা যেতো কে এম দাশ লেনে হক ভবনে শেরে বাংলার পাশে। কখনো তখনকার বিখ্যাত ত্রয়ী-সম্পাদক মানিক মিয়া, আবদুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরীর আড্ডায়। এই তিন সম্পাদকের সঙ্গে মোতাহার ভাই একই সঙ্গে কিভাবে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখেছিলেন, তা ভেবে আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত হতাম। সালাম সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া ছাড়া আর সকল ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল ডান। জহুর হোসেন চৌধুরী বাম। মানিক মিয়া কখনো সেন্ট্রাল-রাইট, কখনো সেন্ট্রাল-লেফট। মোতাহার ভাই মাঝে মাঝে এদের মধ্যে ব্যালান্স রক্ষা করতেন। মানিক মিয়া ও সালাম সাহেবের মধ্যে মুখোমুখি ঝগড়া হয়ে কথা বলা বন্ধ হলে তিনি দুই বন্ধুর ঝগড়া মেটানোর দায়িত্ব নিতেন।

মোতাহার ভাইয়ের আরেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন খোন্দকার আবদুল হামিদ। খোন্দকার হামিদ আমারও সাংবাদিক গুরু। কিন্তু তার রাজনৈতিক মতামতের কম্পাসের কাটা তার নিজের স্বার্থ-সুবিধামতো ঘুরতো। তিনি কখনো শেরে বাংলার ছায়া-সহচর। কখনো শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাব-শিষ্য। কখনো বলছেন, মুজিবই হচ্ছে জাতির একমাত্র দিশারী। আবার মুজিব হত্যার পরেই দল ভারি করেছেন জিয়াউর রহমানের। বাঙালি জাতীয়তার মুন্ডুপাত করেছেন। 'বাংলাদেশী জাতীয়তা' নামে কাঁঠালের-আমসত্ত্বের তত্ত্ব প্রচার করেছেন। এত কিছু সত্ত্বেও খোন্দকার

হামিদের কলম ছিল শক্তিশালী। মোতাহার ভাই তার রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতার নয়, তার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্টে ভাঙনের সময় খোন্দকার আবদুল হামিদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে কখনো হক পন্থী, কখনো আতাউর রহমান পন্থী। আরেকবার তাকে দেখা গেছে, কফিলউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত ১১জন পরিষদ সদস্যের স্বতন্ত্র গ্রুপের সদস্য হিসেবে। '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও তার ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। খোন্দকার হামিদের এতসব ডিগবাজির মধ্যেও মোতাহার ভাই তার ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে সুদিনে-দুর্দিনে কখনো তাকে ত্যাগ করেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর খোন্দকার হামিদ যখন জেলে, তখন তার পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছেন। আবার জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে খোন্দকার হামিদ যখন বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা বলতে গেলে পরিত্যক্ত, তখন মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। আমরা অনেকেই তখন এটা পছন্দ করিনি। তবু সেই কাহিনী এখানে বললাম এজন্যে যে, ১৯৭২ সালের শেষ দিকে সদ্য-জেলখাটা এবং স্বজন-বন্ধুবান্ধব দ্বারা প্রায় পরিত্যক্ত খোন্দকার আবদুল হামিদের পাশে গিয়ে প্রকাশ্যে দাঁড়াতে তখন যথেষ্ট সাহসের দরকার ছিল। আমরা পছন্দ করি বা না করি, এই সাহসটা মোতাহার ভাই দেখিয়েছিলেন। ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়। 'মিল্লাত' পত্রিকায় আমার সাংবাদিকতাকে কেন্দ্র করে। ১৯৫১ সালের শেষ দিকে ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) যখন 'দৈনিক মিল্লাতের' প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। মোহাম্মদ মোদাব্বের পত্রিকার সম্পাদক। শিগগিরই মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের সঙ্গে মোহন মিয়ার ক্ষমতার লড়াই শুরু হয় এবং মোহন মিয়া এই লড়াইয়ে পরাজিত হন। তিনি ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ-বিরোধী শিবিরের দিকে ঝুঁকতে থাকেন। মোহন মিয়ার রাজনৈতিক বিপর্যয়ে মিল্লাতেরও অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। মোহাম্মদ মোদাব্বের 'মিল্লাত' ছেড়ে দেন। এই সময় যথাক্রমে খোন্দকার আবদুল হামিদ, মুসতাফা নূরউল ইসলাম, সিকান্দার আবু জাফর পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন কাজ করেছেন। বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। কখনো রহিম উদ্দিন সিদ্দিকী নামে এক ভদ্রলোক।

'মিল্লাতে' বেতনলাভ অনিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবু পত্রিকাটিকে প্রবল ইচ্ছা শক্তির জোরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। তাকে ঘিরে 'মিল্লাতে' একটি সাংবাদিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যারা পরবর্তীকালে সকলেই স্বনামে খ্যাত হয়েছেন। যেমন—আহমেদুর রহমান (পরবর্তীকালে 'ইত্তেফাকের ভীমরুল), বদরুল হাসান (পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার অধ্যাপক ও সাহিত্যিক), সিরাজউদ্দিন (পরবর্তীকালে সিএসপি অফিসার), আবদুর রহিম(পরবর্তীকালে তথ্য

ও গণসংযোগ দফতরের প্রধান), হাসানুজ্জামান খান(বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক), কামাল লোহানী (প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক), সিরাজুল হুদা (বাংলা ভাষার অধ্যাপক) এবং আরো অনেকে। এরা ছিলেন বার্তা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

'মিল্লাতে'র সম্পাদকীয় লেখার বাঁধাধরা লোক তখন কেউ ছিলনা। ঠেকার কাজ চালাতেন কখনো পাটোয়ারী, কখনো আহমেদুর রহমান। মোহন মিয়া পত্রিকাটিকে ঠিকঠাক মতো চালানোর জন্য ফরিদপুর থেকে এক প্রবীণ সাংবাদিককে আমদানী করলেন। তার নাম আবদুর রব। এই নামটি আজ আর কারো কাছে পরিচিত নয়। কিন্তু ত্রিশের ও চল্লিশের দশকে এই নামটি ছিল বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পরিচিতি। এত বড় সমাজ-সেবক বাংলাদেশে খুব কম জন্মেছেন। কেবল নিজের চেষ্টায় তিনি "ইনসান ইনসাফ সমিতি" নামে একটি বিরাট সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সারা দেশময়। এই সমিতির দু'টি মুখপত্র প্রকাশিত হতো বাংলা এবং ইংরেজীতে। বাংলা কাগজটির নাম ছিল 'মাসিক খাদেম'। ইংরেজী কাগজটির নাম ছিল 'সার্ভেন্ট অব হিউম্যানিটি'। দু'টি কাগজই সম্পাদনা করতেন আবদুর রব সাহেব। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন রব সাহেব ফরিদপুরে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। মোহন মিয়া তাকে ঢাকায় ডেকে পাঠালেন 'মিল্লাতের' সম্পাদক পদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে।

পত্রিকাটির সেই টলটলায়মান অবস্থার দিনে আমি চাকরি প্রার্থী হলাম। 'দৈনিক সংবাদে' সারা রাত জেগে বার্তা বিভাগে কাজ করে তখন আমার স্বাস্থ্যে ধস নেমেছে।তাই সেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। 'সওগাতের' মাস মাহিনা পঞ্চাশ টাকায় মাস চলে না। তাই 'মিল্লাতে' গেলাম। যদি 'সওগাতের' চাকুরিটি রেখে তার সঙ্গে আরেকটি পার্ট টাইম চাকরি যোগ করতে পারি। সেই চাকরির বেতন অনিয়মিত পেলেও ক্ষতি নেই।

নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। ঢাকায় আমার প্রথম সাংবাদিক জীবন শুরু ১৯৫০ সালে বলিয়াদি প্রেস থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক ইনসাফ' কাগজে। এই কাগজের বার্তা বিভাগের নাইট-সিফ্‌ট-এ আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছি। পাটোয়ারী তখন বিয়ে করেননি। বলিয়াদি প্রেসের (বংশাল রোড) পাশেই একটা বাড়িতে ট্যুইশনি করতেন। সেই সুবাদে সেই বাড়িতেই থাকতেন।

'মিল্লাতে' গিয়ে পাটোয়ারীর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি আমাকে বার্তা বিভাগে জয়েন করার সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। বললাম, বার্তা বিভাগের রাতজাগা চাকরিতে আমার আর আগ্রহ নেই। আমি লিখতে পারি। সম্পাদকীয় লেখার কাজ চাই।

পাটোয়ারী রাজি হলেন। তাদের সম্পাদকীয় লেখার একজন লোক দরকার ছিল। আহমেদুর রহমান প্রায়ই সম্পাদকীয় লিখতেন। লোকাভাবে বার্তা বিভাগ

থেকে তাকে ছাড়া যাচ্ছিল না। সুতরাং পার্ট-টাইম চাকরি বলা হলেও দেড়শ' টাকা বেতনে পুরো ছ"দিন সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব পেলাম। সঙ্গে আহমেদুর রহমানও থাকবেন। পাটোয়ারী আমাকে চাকরির প্রথম দিনেই মোতাহার হোসেন সিদ্দিকীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, মোহন মিয়ার অনুপস্থিতিতে উনিই কাগজের প্রকাশনার কাজ দেখাশোনা করেন। মোতাহার ভাই আমার আরও পঞ্চাশ টাকা মাস মাহিনা বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'তোমাকে 'মিল্লাতের' সাপ্তাহিক সাহিত্য বিভাগটাও দেখাশোনা করতে হবে।' আমার আনন্দ প্রকাশের তখন আর ভাষা নেই।

'মিল্লাতের' সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেওয়ার এক সপ্তাহ পরেই জানলাম, ফরিদপুর থেকে নতুন সম্পাদক আসছেন তার নাম আবদুর রব। আর কেউ না চিনলেও নাম শুনেই আমি তাকে চিনতে পারলাম। 'মিল্লাতে' তার নাম সম্পাদক হিসেবে ছাপা হবে জেনে আরও খুশি হলাম। সকলকে জানিয়ে দিলাম, আবদুর রব সাহেব একজন বিখ্যাত সম্পাদক এবং সমাজ সেবক। তার খাদেমুল ইনসান সমিতি, খাদেম ও 'সার্ভেন্ট অব হিউম্যানিটি' কাগজের নাম এক সময় সারা বাংলাদেশে মশহুর ছিল। আমাদের গণ্ডগ্রাম বরিশালের উলানিয়াতে পর্যন্ত খাদেমুল ইনসান সমিতির শাখা ছিল। খাদেম এবং 'সার্ভেন্ট অব হিউম্যানিটি' নিয়মিত যেতো সেখানে।

যথাসময়ে আমাদের নতুন সম্পাদক অফিসে এলেন। ছোটখাটো শুকনো পাতলা চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক। খিটখিটে মেজাজ। নাম শুনে তার সম্পর্কে যা কল্পনা করেছিলাম, বাস্তবে তা মোটেও মিলতে চাইলো না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই ভেবে যে, যৌবন বয়সে তিনি নিশ্চয়ই জনদরদী সমাজ সেবক ছিলেন। এখন তার সমিতি নেই, কাগজ নেই। বুড়ো হয়েছেন। তাই মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে।

প্রথম দিনেই তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন, কাগজে যা বাংলা লেখা বেরোয়, তা আদৌ বাংলা হচ্ছে না। বার্তা বিভাগের সকল শিফ্‌টের সকল খবর, রিপোর্ট প্রেসে যাবার আগে তাকে দেখাতে হবে। আমাদের সম্পাদকীয় তাঁকে দেখাতে হবে। আমাদের সম্পাদকীয় তাকে দেখিয়ে প্রেসে পাঠাতে অসুবিধা ছিল না। কিন্তু প্রতি শিফ্‌টের অনুবাদ করা নিউজের বস্তা সময় মতো দেখে দেওয়া ছিল তার একার পক্ষে অসম্ভব। তিনি সহজে সেগুলো প্রেসে পাঠাতেন না। ফলে সময় মতো খবর কম্পোজ করে কাগজ বের করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। তাকে বোঝানো গেল না, এটা মাসিক কাগজ নয়; দৈনিক কাগজ। ঘড়ি ধরে প্রেসে লেখা না গেলে কাগজ বেরোয় না। তার উপর বিভিন্ন খবর ও লেখায় তার সংশোধনীর নমুনা দেখে কারো

মুখে আর কথা নেই। তিনি সহজ ও প্রচলিত বাংলা শব্দ কেটে খবরের ভাষা সংশোধনের নামে এমন সব দুর্বোধ্য অপ্রচলিত শব্দ অনাবশ্যকভাবে ঢোকাতে শুরু করলেন যে, ওই খবর পাঠ করে সাধারণ পাঠকের কিছু বোঝার উপায় ছিল না। তার বাক্যগঠন রীতিও অত্যন্ত সেকেলে। তার কোনো কোনো লেখা, সংশোধনী পড়ে হাসি সামলানো মুশকিল হতো।

সবচাইতে মুশকিলে পড়লাম আমি ও আহমেদুর রহমান। আমরা হয়তো ঠিক করেছি আমি পাটের দাম নিয়ে লিখবো, আহমেদ লিখবেন আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে; রব সাহেব শুনেই হা হা করে উঠতেন. না, না, এগুলো কি আবার সম্পাদকীয়ের সাবজেক্ট হল নাকি? এসব সাবজেক্ট নিয়ে তো সবাই লেখে। 'মিল্লাতে' সম্পাদকীয় লেখার ব্যাপারে অরিজিনালিটির পরিচয় দিতে হবে। সেই অরিজিনালিটি কি? না, ফরিদপুরে একটা গাভী এক সঙ্গে চারটে বাছুর জন্ম দিয়েছে, এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা নিয়ে লিখতে হবে। আর আন্তর্জাতিক বিষয়? সুদূর নর্থ পোলেও নাকি মুসলমানের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা নিয়ে লিখলে কেমন হয়? এসব সাবজেক্ট নিয়ে লেখার জন্যে তিনি যা ব্রিফিং দিতেন, তা শুনে একদিন তার সামনেই খুক্ করে হেসে ফেললাম। তিনি রেগে গিয়ে আমাদের বেয়াদপ বলে গালি দিলেন। এবং সেদিন একাই সম্পাদকীয় লিখবেন বলে জানালেন। তার লেখা সেই সম্পাদকীয় পড়ে 'মিল্লাতে'র প্রুফ রিডারেরাই হেসে অস্থির। শেষ পর্যন্ত পাটোয়ারী শেষ রাতে নিজে একটা সম্পাদকীয় লিখে কাগজ যথাসময়ে বের করার ব্যবস্থা করলেন।

মোহন মিয়ার কানে কথাটা গেল। তিনি মোতাহার ভাইকে অফিসে পাঠালেন, রব সাহেবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করা এবং অপরের কাজে তিনি যাতে আর বাগড়া না দেন, তার ব্যবস্থা করার জন্যে। মোতাহার ভাই অনেকক্ষণ ধরে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তিনি আমাদের সকলের মাথার উপরে অভিভাবকের মতো। তিনি শুধু আমাদের তত্ত্বাবধান করুন, কারো কাজে যেন হস্তক্ষেপ না করেন।

রব সাহেব চটে গেলেন। বললেন, তিনি সম্পাদক। কাগজ সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। মোতাহার ভাই তাকে একটি দৈনিক কাগজ চালানোর সুবিধা-অসুবিধা বুঝানোর চেষ্টা করলেন। রব সাহেব হঠাৎ মাত্রা হারিয়ে ফেলে বলে উঠলেন, তুমি আমাকে কাগজ চালাবার কাজ শেখাতে এসেছো? বাঁদর কোথাকার!

মোতাহার ভাই সত্যি অভিজাত চরিত্রের লোক। গাল শুনেও চুপ করে রইলেন। রব সাহেব উৎসাহ পেয়ে বললেন, তুমি একটি জন্তু!

মোতাহার ভাই চুপ। রব সাহেব বললেন, তুমি একটি গরু!

মোতাহার ভাই চুপ।

রব সাহেব বললেন, তুমি একটি বদমাস!

মোতাহার ভাইয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো। তিনি বললেন, আপনি একটি চেয়ার।

রব সাহেব ঃ তুমি একটি গর্দভ।

মোতাহার ভাই ঃ আপনি একটি টেবিল।

রব সাহেব ঃ তুমি একটি বরাহ্।

মোতাহার ভাই ঃ আপনি একটি চেয়ারের পায়া।

আধঘন্টা ধরে চললো এই বাকযুদ্ধ। রব সাহেবের মুখ থেকে এরপর অশ্লীল কথা বের হতে লাগলো। মোতাহার ভাইয়ের মুখে একটি অশ্লীল শব্দও শোনা গেল না।

এমন বিস্ময়কর বাকযুদ্ধের উদাহরণ আমার সারা জীবনে নেই। ফলে ঘটনাটি আমার পক্ষে এখনো ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

(বাইশ)

একটি মাত্র অশ্লীল বাক্য ব্যবহার না করেও মোতাহার হোসেন সিদ্দিকি সেদিনকার বাকযুদ্ধে জিতে গেলেন। পরাজিত হলেন প্রবীণ ভূয়োদর্শি সমাজ-সেবক এবং সাংবাদিক আবদুর রব। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল এবং তিনি টেবিল চাপড়ে সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মোতাহার ভাই আরও কিছুক্ষণ সেই ঘরে বসে রইলেন। তারপর আমাদের বললেন, তোমরা যে যার টেবিলে গিয়ে কাজ কর। আশা করছি উনি আর তোমাদের বিরক্ত করবেন না।

'দৈনিক মিল্লাতের' সম্পাদক পদ থেকে এবার আবদুর রব সাহেবের বিদায়। মোহন মিয়া তাকে বিদায় দিলেন। রব সাহেবের বিদায়ে আমার মনে ছিল মিশ্র ভাব। একদিকে তার অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ায় খুশি হয়েছিলাম। অন্যদিকে ছেলেবেলা থেকে খাদেমুল ইনসান সমিতির নেতা, খাদেম ও 'সার্ভেন্ট অব হিউম্যানিটি' কাগজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আবদুর রব সম্পর্কে মনে যে একটি ভাবমূর্তি খাড়া রেখেছিলাম, সেটি এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ভেঙে যাওয়ায় দুঃখও পেয়েছিলাম। কিন্তু 'মিল্লাত' অফিসে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। সবচাইতে খুশি হলেন আহমেদুর রহমান। তার উপরেই আবদুর রব সাহেব কর্তৃত্ব খাটাতে চাইতেন বেশি। আমি দুর্মুখ ছিলাম বলে আমাকে বেশি ঘাটাতে চাইতেন না। আহমেদুর রহমান সেদিন পকেটের পয়সা খরচ করে মিল্লাতের স্টাফের জন্য চায়ের

অর্ডার দিলেন। আমাকে বললেন, চলুন গাফ্ফার, আমরা নাজাত দিবস পালন করি। নাজাত দিবসের অর্থ জানেন তো, মুক্তি দিবস।

এতকাল মোতাহার ভাই ছিলেন সম্পাদক হিসেবে 'মিল্লাতের' স্টপগ্যাপ এরেজমেন্ট। অর্থাৎ সম্পাদক পদটি শূন্য হলে তার নাম ভারপ্রাপ্ত-সম্পাদক হিসেবে ছাপা হতো। রব সাহেব বিদায় নেয়ার পর তিনি পাকাপাকি সম্পাদক হলেন। এরপর মাঝখানে সম্ভবত সিকান্দার আবু জাফরও একবার সম্পাদক হয়েছিলেন। তবে 'মিল্লাতের' সকল সম্পাদকই এসেছেন এবং চলে গেছেন। মাঝে মাঝে সাময়িক বিরতি দিয়ে মোতাহার ভাই-ই স্থায়ীভাবে থেকে গেছেন।

মোতাহার ভাই জীবনে কখনো সাংবাদিকতা করেননি। কিন্তু সম্পাদকীয়ের বিষয় নির্বাচন এবং সম্পাদকীয়ের কোন্ কথাটি এডিট করা দরকার সে বিষয়ে তার চোখকান বেশ খোলা থাকতো। তিনি কখনো আমাদের লেখা পড়েও দেখতেন না। আমরা লেখার পরে তাকে পড়ে শোনাতাম। তিনি চেয়ারে বসে চোখ মুদে শুনতে শুনতে হঠাৎ চোখ খুলে বলতেন, উহু, এই কথাটি যাবে না। তিনি ছুটিছাটায় গেলে আমার আর আহমেদুর রহমানের উপর দায়িত্ব বর্তাতো, 'মিল্লাত' অফিস থেকে আজিমপুর কলোনীতে খোন্দকার আবদুস হামিদের ফ্লাটে গিয়ে তার কাছ থেকে সম্পাদকীয় লেখার ব্রিফিং নেয়া এবং সেখানে বসেই সেটা লিখে হামিদ সাহেবকে শুনিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর মিল্লাত অফিসে ফিরে এসে লেখা প্রেসে দেওয়া। দুপুর একটার দিকে আমি এবং আহমেদুর রহমান 'মিল্লাত' অফিসে এসে মিলিত হতাম। একাউন্টস সেকশনের দত্তবাবু (পরে অবজার্রভারে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব নগরে ছিলেন মুজিব নগর সরকারের অন্যতম হিসাবরক্ষক) আমাদের গুণে গুণে দেড় টাকা দিতেন। আমাদের রিকশা ভাড়া। তখনকার দিনে সদরঘাট থেকে নতুন ঢাকায় আজিমপুর কলোনীতে যেতে লাগতো বারো আনা (৭৫ পয়সা); আসতেও তাই। আমি ও আহমেদ একই রিকশায় হামিদ সাহেবের বাসায় যাতায়াত করতাম। আমরা দু'জনেই তখন কলেজের ছাত্র। এই সময়টা আমাদের সাংবাদিক জীবনের সবচাইতে গঠনমূলক সময় বলে আমি এখনো মনে করি। খোন্দকার হামিদের রাজনৈতিক সকল মতের সঙ্গে তখনো আমি একমত ছিলাম না। কিন্তু সম্পাদকীয় লেখার বিষয় নির্বাচন এবং বিষয়টিকে উত্থাপন করার চমৎকার কৌশল তিনি আমাদের যত্ন করে শেখাতেন। এদিক থেকে তিনি আমার এবং আহমেদুরের সাংবাদিক গুরু ছিলেন, একথা স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই।

মোতাহার ভাই ছুটিছাটা থেকে ফিরে এলেও মাঝে মাঝেই খোন্দকার হামিদের বাসায় আমাদের যেতে হতো। তিনি মিল্লাতের সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেয়ার পরেও

বহুকাল ছিলেন পত্রিকাটির অঘোষিত উপদেষ্টা। বিশেষ করে মোতাহার ভাইয়ের সঙ্গে তার ছিল গভীর ঘনিষ্ঠতা। কখনো কখনো মোতাহার ভাই আমাদের সঙ্গে খোন্দকার হামিদের আজিমপুরের ফ্লাটে যেতেন। হামিদ সাহেব এক চোখ বন্ধ করে গল্প করতে ভালবাসতেন। একদিন তিনি তার জীবনের একটি গল্প শোনালেন। বললেন, তিনি তখন সরকারী চাকরি করেন। ঢাকা রেডিও'তে স্ক্রিপ্ট রাইটারের চাকরি। সংসার খরচ সরকারী বেতনে চলে না। তাই সন্ধ্যায় 'মিল্লাত' অফিসে গিয়ে সম্পাদকীয় লিখতেন। একবার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বেতার ভাষণ দেবেন। হামিদ সাহেবের উপর তার উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব দিলেন ভাষণটি লেখার। যেদিন নূরুল আমিনের ভাষণটি বেতারে প্রচারিত হল, সেদিন সন্ধ্যায় 'মিল্লাত' অফিসে গিয়ে তিনি দেখেন পত্রিকার মালিক, রাজনীতিবিদ ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া সম্পাদকের কক্ষে বসে আছেন। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের সঙ্গে মোহন মিয়ার রাজনৈতিক ঝগড়া তখন মাত্র শুরু হয়েছে।

হামিদ সাহেবের সঙ্গে দেখা হতেই মোহন মিয়া বললেন, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আজ চীফ মিনিস্টারের বেতার ভাষণ শুনেছেন?

ঃ জ্বি শুনেছি। (হামিদ সাহেব নিজেই যে ভাষণটা লিখেছেন, তা চেপে গেলেন)।

ঃ আপনাকে আজ এই ভাষণের উপর এডিটোরিয়াল লিখতে হবে। পয়েন্ট বাই পয়েন্ট জোরালো জবাব দিতে হবে। আমি নূরুল আমিনকে এবার আর ছাড়বো না।

মোহন মিয়া দু'একটা পয়েন্ট তাকে ব্রিফ করলেন। বাকিটা হামিদ সাহেবকেই লিখতে হবে। তিনি বিপদে পড়লেন। যে ভাষণ তিনি লিখেছেন, যে যুক্তি তিনি দাঁড় করিয়েছেন, এখন তিনি নিজেই তার পাল্টা যুক্তি দাঁড় করান কিভাবে? কিন্তু সে কথাতো আর মোহন মিয়াকে বলা যায় না। সুতরাং কাগজ কলম নিয়ে তিনি বসলেন এবং নিজের লেখা ভাষণের যুক্তি ও তথ্যের বিরুদ্ধে এমন যুক্তি ও তথ্য দাঁড় করালেন যে পরদিন 'মিল্লাতে'র সম্পাদকীয় পড়ে সরকারী মহলে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল।

আমি এবং আহমেদুর রহমান দু'জনেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি যে কাজটা করেছেন তাতে কি সাংবাদিকতার 'এথিকস' খেলাপ করা হয়নি?

তিনি ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার সুরে বলেছেন, যে গরীব সাংবাদিকের পেটে ভাত নেই, তার আবার 'এথিকস্!'

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হল। হক সাহেব গৃহবন্দী। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বেপরোয়া ধরপাকড় চলছে। মেজর-জেনারেল ইসকান্দার মির্জা ঢাকায় গভর্ণর হয়ে এসেছেন। আর্মির জিওসি আইয়ুব খানের সঙ্গে

ব্যাটন বগলে খোলা জীপে রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাবি ও বালুচ সৈন্য। চারদিকে ভীতি ও ত্রাসের ভাব। 'মোবাইল কোর্ট' যখন তখন যাকে তাকে ধরে সামান্য অপরাধে বেত মারা হচ্ছে, জেলে পাঠানো হচ্ছে।

এর আগে সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা আমাদের কারোই ছিল না। বৃটিশ আমলেও এমন ত্রাসের রাজত্বে বাস করিনি। তখন এটাও বুঝতে পারিনি, সরাসরি সামরিক শাসন প্রবর্তনের আগে '৫৪ সালের এই ঘটনা হচ্ছে মিনি রিহার্সাল।

'মিল্লাত' অফিসে আমরা সাংবাদিকেরা দুরু দুরু বুকে কাজ করি। কিছুই লেখা যায় না। দু'বেলা অবাঙালি উর্দুভাষী অফিসার আসে। সঙ্গে প্রাদেশিক তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন বাঙালি অফিসার। অবাঙালি অফিসারের সামনে তিনি ভেড়ার মতো কাঁপতে থাকেন। বীরত্ব ফলান আমাদের উপর।

খোন্দকার হামিদ যুক্তফ্রন্টের টিকেটে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনিও তখন জেলে। মোতাহার ভাই ঘন ঘন 'মিল্লাত' অফিসে আসেন। তার মনে ভয়, কখন পত্রিকায় কি বেফাঁস কথা ছাপা হয়ে যায়। তাহলে পত্রিকা বন্ধ হবে, সম্পাদক ও প্রকাশককে জেলে যেতে হবে। সবচাইতে বিস্ময়ের কথা, খবর প্রকাশের উপর সেন্সর বসানো হয়নি, কিন্তু এমন ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সবগুলো কাগজই সেলফ সেন্সরশিপ মেনে চলছেন।

সম্পাদক হিসেবে মোতাহার ভাইয়ের কিছুটা সাহসের পরিচয় এই সময়েই আমি পাই। আর্মি গভর্ণর ও ৯২ (ক) ধারার শাসনের ভীতি একটু কমে আসতেই যুক্তফ্রন্ট সমর্থক পত্রিকা হিসেবে 'ইত্তেফাক' দাবি জানালেন, স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশের অধিকার দিতে হবে। নইলে পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলাম খালি রাখা হবে। তাতে কিছু লেখা হবে না। 'মিল্লাত'ও তখন যুক্তফ্রন্ট সমর্থক কাগজ। সুতরাং মিল্লাতেও সম্পাদকীয় কলাম একদিন খালি রাখা হয়। পরদিনই সরকারী হুমকি, পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলাম খালি রাখা যাবে না। খালি রাখা হলে পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করে দেওয়া হতে পারে।

মোতাহার ভাই চিন্তিত হলেন, এখন কি করা যায়? আহমেদুর রহমান পরামর্শ দিলেন, পুরানো ঢাকায় উঁইপোকার উপদ্রব বেড়েছে, তা নিয়ে সম্পাদকীয় লিখলে কেমন হয়?

আমি বললাম, তাহলে তো সরকারী হুকুমই মেনে নেয়া হল। সরকারী হুকুম মানবো, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটা কিছু করা দরকার, যাতে সরকার বুঝতে পারেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও অধিকার খর্ব হওয়ায় সাংবাদিকেরা ক্ষুব্ধ।

মোতাহার ভাই বললেন, সেটা কি ভাবে করা যায়?

আমি একটু ভেবে চিন্তে বললাম, পবিত্র কোরান ও হাদিসের বাণী দিয়ে

সম্পাদকীয় কলামটি ভরে দিলে কেমন হয়?

ঃ কি ধরনের বাণী? মোতাহার ভাই জানতে চাইলেন।

আমি তাকে দু'একটা বাণী কাগজে লিখে দেখালাম। আমার ভয় ছিল, মোতাহার ভাই হয়তো এসব বাণীও এ সময়ে ছাপতে সাহসী হবেন না।

মোতাহার ভাই কিছুক্ষণ ভাবলেন। ইত্তেফাকের মানিক মিয়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ টেলিফোনে আলাপ করলেন। রিসিভার রেখে দিয়ে বললেন, গাফ্ফার, তোমার প্রস্তাব মতই কাজ হবে। তুমি কোরান ও হাদিসের বাণী দিয়ে কলামটা ভরে দাও। মানিক মিয়াও তোমার বুদ্ধির তারিফ করেছেন।

সেদিন রাতে সরকারী অফিসাররা 'মিল্লাত' অফিসে এসে সম্পাদকীয় কলাম খালি থাকছে না দেখে খুশি হলেন। আরও খুশি হলেন কোরান ও হাদিসের বাণী ছাপা হচ্ছে শুনে।

পরদিন কাগজ দেখে তাদের চক্ষু স্থির। 'মিল্লাতের' সম্পাদকীয় কলামে পবিত্র কোরান ও হাদিসের যেসব বাণী ছাপা হয়েছে, তার প্রথমটি হল, "অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জেহাদ"। "একজন শহীদের রক্ত এক হাজার জ্ঞানী ব্যক্তির দোয়াতের কালির চাইতে পবিত্র"। " হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও এবং আল্লাহর রজ্জু ধারণ কর, কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

সকল উদ্ধৃতি এখন আমার মনে নেই। পরদিন সরকারী তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাঙালি অফিসারটি বিষণ্ন মুখে মিল্লাত অফিসে এলেন। বললেন, এ আপনারা কি করেছেন?

আমরা বললাম, পত্রিকায় যদি পবিত্র কোরান ও হাদিসের বাণীও ছাপা না যায়, তাহলে সেকথা আপনারা লিখিত অর্ডার হিসেবে আমাদের দিন। আমরা অর্ডার মেনে চলবো।

অফিসার ম্লান হেসে বললেন, আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? কোরান হাদিসের বাণী না ছাপার জন্য সরকার লিখিত অর্ডার কি করে দেবেন? আগামীকাল সেক্রেটারিয়েটে 'প্রেস কনসালটেটিভ বডির' বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে আপনাদের লেখার অধিকার সম্পর্কে সরকার সম্পাদকদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন, সিদ্ধান্ত দেবেন।

এই 'কনসালটেটিভ বডির' বৈঠক থেকে ফিরে এসে মোতাহার ভাই আমাদের হাসিমুখে জানালেন, সাংবাদিকদের বিপদ অনেকটা কেটে গেছে। পুরোপুরি স্বাধীনভাবে না হলেও এখন মোটামুটি খোলাখুলিভাবে তোমরা কলম চালাতে পারবে।

চুয়ান্ন সালের আরেকদিনের ঘটনা। দুপুরের দিকে সম্পাদকীয় লেখার জন্য

'মিল্লাত' অফিসে এসেছি, মোতাহার ভাই জিজ্ঞেস করলেন, গাফ্ফার, তুমি আমার সঙ্গে জেল গেটে যাবে?

জেল গেট মানে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেট। একটু চমকিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, জেল গেটে কেন মোতাহার ভাই?

ঃ খোন্দকার হামিদের জন্য একটা মশারি, একটা বালিশ ও চাদর জেলে দিয়ে আসতে হবে। তাকে এখনো ক্লাশ দেওয়া হয়নি। সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে রাখা হয়েছে।

বললাম, শুনেছি জেল গেটে আইবি অফিসারেরা বসে থাকে। তাদের কাছে একটা লিস্ট আছে। জেল গেটে কেউ গেলে তার নাম ওই তালিকায় থাকলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে এরেস্ট করা হয়।

মোতাহার ভাই বললেন, তুমি ভাবছো, ওরা আমাদেরও এরেস্ট করে জেলে ঢুকিয়ে দিতে পারে?

ঃ অসম্ভব কি? বললাম।

মোতাহার ভাই হেসে বললেন, তাহলেতো ভালই হয়। আসলে বাইরের চেয়ে জেলেই এখন আমাদের বন্ধুবান্ধবেরা আছে বেশি। তুমি আর আমি গিয়ে জুটলে আড্ডা জমবে ভালো।

বুঝলাম, মোতাহার ভাইকে আমি ভয় দেখাতে পারিনি।

'মিল্লাতে' চাকরি করলেও তখন আমার লক্ষ্য ছিল, 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি পাওয়ার। 'ইত্তেফাক' জনপ্রিয় দৈনিক। আওয়ামী লীগের সমর্থক। আমারও রাজনৈতিক মতামতের কাছাকাছি। মানিক মিয়ার 'রাজনৈতিক মঞ্চ'র আমি ভক্ত পাঠক। ছাত্রনেতা আবদুল আউয়াল তখন 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় বিভাগের প্রভাবশালী ব্যক্তি। আমাকে তিনি জানালেন, 'ইত্তেফাকে' লোকের দরকার হলেই তিনি আমার কথা মানিক মিয়াকে বলবেন।

কিন্তু মানিক মিয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটলো অপ্রত্যাশিতভাবে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তখন ভাঙাগড়ার খেলা চলছে। যুক্তফ্রন্টকে ভাঙার জন্য করাচীর অবাঙালি শাসকেরা নানাভাবে খেলছেন। কখনো বলা হচ্ছে হক সাহেব ট্রেইটর। কখনো বলা হচ্ছে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারতের দালাল, তিনি যুক্ত বাংলা গঠনের চক্রান্তে লিপ্ত। সরকারী প্রচারণায় গলা মিলিয়েছে ঢাকার তখনকার দুটি প্রভাবশালী ইংরেজি ও বাংলা দৈনিক পত্রিকাই— 'মর্নিং নিউজ' এবং 'আজাদ'। 'মর্নিং নিউজে' একদিন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে এমন একটি সম্পাদকীয় লেখা হল, যা শুধু শালীনতা-বর্জিত নয়, জঘন্য কুৎসায় ভর্তি। মানিক মিয়া মোতাহার ভাইকে অনুরোধ জানালেন, 'মিল্লাতেও' যেন 'মর্নিং নিউজের' এই কুৎসিত

অপপ্রচারের জবাব দেওয়া হয়। কেবলমাত্র 'ইত্তেফাকের' রাজনৈতিক মঞ্চে জবাব লিখে তিনি তার রাগ মেটাতে পারছেন না।

অনেক ভেবেচিন্তে মোতাহার ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পারবে, 'মর্নিং নিউজের' এই অভব্য লেখার জবাব দিতে?

ঃ চেষ্টা করে দেখতে পারি। উত্তর দিয়েছিলাম।

পাঁচ-ছয় ঘন্টা একটানা লিখে 'মর্নিং নিউজের' লেখার জবাব খাড়া করলাম। এই লেখায় আমার সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি দিয়েছিলাম ঢেলে। 'মিল্লাতে' সম্পাদকীয় হিসেবে লেখাটা ছাপা হল। শিরোনাম "হিজ মাস্টার্স ভয়েসের ধৃষ্টতা।" মিল্লাতের পাতা আড়াই কলাম জুড়ে সম্পাদকীয়টি ছাপা হল।

পরের দিন মোতাহার ভাই প্রসন্ন হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে অফিসে ঢুকলেন। বললেন, গাফ্ফার, তুমি কেল্লা মাত করে দিয়েছো। আজ মানিক ভাই তার দরবারে জহুর চৌধুরী, আবদুস সালাম সাহেব সকলকে ডেকে তোমার লেখা সম্পাদকীয় পড়ে শুনিয়েছেন। বলেছেন, 'মর্নিং নিউজের' লেখার এর চাইতে ভালো জবাব আর হতে পারে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই মানিক মিয়া 'মিল্লাত' অফিসে টেলিফোন করে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। বললেন, আপনাকে 'কনগ্রাচুলেশন'। আমার চাইতেও কড়া জবাব লিখেছেন। আমি করাচীতে শহীদ সাহেবকে টেলিফোনে আপনার লেখার কিছু কিছু অংশ শুনিয়েছি। তিনিও আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আমি তখন নবিশ সম্পাদকীয় লেখক। কলেজের ছাত্র। কিন্তু একটা লেখাতেই এমন সমাদর ও প্রশংসা পাব, তা কল্পনাও করতে পারিনি। মোতাহার ভাই বললেন, তুমি আর আহমেদুর রহমান দু'জনেই চলো আজ আমার বাড়িতে। তোমাদের ভাবীর হাতের রান্না খাওয়াবো।

(তেইশ)

উনিশ শ' তিরানব্বই সালের জানুয়ারী মাসের এক সকালে ঢাকা থেকে যাচ্ছিলাম মাওয়া হয়ে টুঙ্গিপাড়ায়। বুড়িগঙ্গা সেতুর উপর দিয়ে গাড়ি চলছে। কুড়ি বছর আগে আমি যখন ঢাকায়, তখন এই সেতু ছিল না। গাড়িতে বসেই নীচে চেয়ে দেখলাম বুড়িগঙ্গা অনেক শুকিয়ে গেছে। ওপারে জিঞ্জিরা দেখা যাচ্ছে। তার শ্যাম সবুজ শোভাও অনেকটা মিলিয়ে গেছে।মনে মনে ভাবলাম, আমি যদি বুড়ো হতে পারি, বুড়িগঙ্গা কেন বুড়ি হবে না? তার বয়স তো আমার চাইতে অনেক

অনেক বেশি। কত শতাব্দীর কে বলবে? তবু ক্ষীণস্রোতা বুড়িগঙ্গার বুকে এখনো তিরতির ঢেউ গড়াচ্ছে বাতাসের সোহাগে। সূর্যের রঙ ছলকাচ্ছে তার ঘোলাটে পানিতে। ছোট ছোট ইঞ্জিন লাগানো নৌকা যাত্রী নিয়ে এপার-ওপার করছে।

কুড়ি বছর আগে, আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন এই ইঞ্জিন বসানো নৌকা ছিল না। ছিল এক মাল্লাই খেয়া নৌকা। একটি দু'টি নয় অসংখ্য। সারাদিন যাত্রী নিয়ে এপার-ওপার করতো। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন মাঝে মাঝে শখ হতো বুড়িগঙ্গায় নৌকা ভ্রমণের। ছোট ডিঙ্গির মতো নৌকায় এক সঙ্গে তিন-চার বন্ধু চড়তাম। ভাড়া ঘন্টায় ছিল পাঁচসিকে। দু'তিন ঘন্টা ঘুরে, বুড়িগঙ্গার ঢেউয়ের নাগর দোলায় নেচে মিল ব্যারাকের কাছে একটা ঘাটে নামতাম। সেখানে ছিল একটি চালা ঘরের টি স্টল। এই স্টলের আলুর দম, শিমের বিচির সিঙ্গারা আর আখের গুড়ের বরফ মেশানো শরবত ছিল বিখ্যাত। মাথা প্রতি বিল উঠতো মাত্র দশ আনা। আর এই শরবত ও সিঙ্গারার লোভে সদরঘাট থেকে নারায়ণগঞ্জগামী বাসে চেপে, কখনো বাসের ভেতরে জায়গা না পেয়ে হ্যান্ডল ধরে ঝুলতে ঝুলতে মিল ব্যারাকের কাছে এই স্টলের সামনে কতদিন এসে নেমেছি, তার হিসেবে নেই।

দুই বাংলাকে জুড়েই গঙ্গা যেন মায়ের মতো বাহু প্রসারিত করে বুকের নিধিকে আগলে রেখেছে। গঙ্গা, আদিগঙ্গা, নবগঙ্গা কত নাম তার। এই গঙ্গার স্তুতি-প্রশস্তি আছে আবহমান বাংলার মহাকাব্যে, কাব্যে, লিরিকে, গানে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রয়াণে নজরুল লিখেছিলেন, 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিলো পথ ভুলে ওগো/ ওগো এই গঙ্গার কূলে।' আর ভূপেন হাজারিকার সেই মন কেড়ে নেওয়া গানটি— 'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা।'

সেদিন বুড়িগঙ্গা সেতুর উপর গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চেয়ে রয়েছি বুড়িগঙ্গার স্রোতের দিকে। মনে মনে ভেবেছি, সারা পৃথিবী ঘুরতে গিয়ে কত নদী, সাগর, মহাসাগরইতো দেখেছি। টেমস, রাইন, সিন, ইংলিশ চ্যানেল, আটলান্টিক, ভূমধ্যসাগর। কিন্তু বাংলাদেশের নদী মেঘনা, পদ্মা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, আড়িয়াল খাঁ, গোমতির পাড়ে দাঁড়িয়ে মন যেমন উতলা হয়, আর কোথাও তা হয় না। বুড়িগঙ্গার ক্ষীণ স্রোতও এখন কত স্মৃতির ছবি এঁকে চলেছে আমার মনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সেদিন অনুচ্চকণ্ঠে বলেছি, 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।'

সেই কৈশোরে, কলেজে পড়ার দিনগুলোতে বুড়িগঙ্গার পাড়ে আসতাম বৎসরের নৌকা-বাইচ দেখতে। দুর্গাপূজার সময় আসতাম প্রতিমা বিসর্জন দেখতে। 'দৈনিক মিল্লাতে' যখন চাকরি করি, তখন সুধাময় নামে এক তরুণ

কম্পোজিটার ছিল 'মিল্লাত' প্রেসে। বাড়ি ফরিদপুর। মোহন মিয়াদের প্রজা ছিল হয়তো। ক্লাশ নাইন পর্যন্ত পড়ে আর লেখাপড়া করেনি। ঢাকায় এসে চাকরি নিয়েছে। আমাকে দুপুরে সম্পাদকের ঘরে একা ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখলেই সে কাছে আসতো। জিজ্ঞেস করতো, বাবু, খেয়ে এসেছেন? যদি বলতাম, খেয়ে আসিনি, তাহলে বলতো, পাইস হোটেলে খেতে যাবেন? আমার কাকার হোটেল। আজ শিম আর রুই মাছের ঝোল রান্না হয়েছে। যাবেন?

পাইস হোটেল মানে বুড়িগঙ্গার ঘাটে বাঁধা সারি সারি দোতলা কোষা নৌকার উপরে ভাতের হোটেল। অধিকাংশই ছিল হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত। তাই কোনোটার নাম শ্রীদুর্গা হোটেল, কোনোটা অন্নপূর্ণা হোটেল। সুধাময়ের কাকা একটু শিক্ষিত উদারমনা হিন্দু ছিলেন। তাঁর হোটেলের নাম ছিল রিভার ভিউ হোটেল। এসব হোটেল এখন নেই। সেই পাকিস্তান আমলের শেষ দিকেই নতুন লঞ্চ টার্মিনাল ভবন তৈরি হয় বুড়িগঙ্গার ঘাটের বিরাট এলাকা জুড়ে। ফলে বুড়িগঙ্গার পারের আগের সেই সারি-বাঁধা কোষা নৌকা, নৌকার উপরের ভাতের হোটেল এখন আর নেই। দু'একটি হয়তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমার চোখে পড়েনি।

বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরার দিকে থাকতো সারি সারি নৌকা বাঁধা। বেদে-বেদেনীর দলের নৌকা। সারাজীবন তারা নৌকায় বাস করে, সংসার করে, সন্তান প্রসব করে। জিঞ্জিরায় গেলে আমি অবাক হয়ে তাদের দেখতাম। পিঠে পুটুলির মতো শিশু-সন্তান বাঁধা। হাতে বৈঠা। বিড়ির আগুন মুখে বেদেনী। আঁটসাঁট যৌবন শিহরিত শরীর। সাপের খেলা দেখায়। কাঁচের চুড়ি বেচে। তুক ঝাড়ফুঁক, গাছের শিকড়ের চিকিৎসা করে। যৌবনের মোহমাখা চোখে আমি এদের নিয়ে গল্প লিখেছি।

জিঞ্জিরায় এখনো একটি ভাঙ্গা দূর্গ আছে। নওয়াবি আমলের দূর্গ। সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যার পর তার মা আমেনা বেগমকে পরিবারের আরও কয়েকজনসহ এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। মীরজাফরের ছেলে মীরনের আদেশে এই বুড়িগঙ্গার (কারো কারো মতে শীতলক্ষ্যায়) নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে তাদেরও মৃত্যু ঘটানো হয়। শয়তান মীরনের চরিত্রের ও চেহারার সঙ্গে এ যুগের মুজিব-হত্যাকারীদের অন্যতম পালের গোদা কর্নেল (অবঃ) ফারুকের আশ্চর্য মিল। মীরনের মুখেও সব সময় থাকতো ধর্মের বাণী। চরিত্রে সে ছিল লম্পট এবং ঘাতক। বজ্রপাতে এই বর্বরের মৃত্যু হয়। জিঞ্জিরার দূর্গ নিয়ে ষাটের দশকে 'দৈনিক আজাদে" আমি ফিচার লিখেছি।

বৃটিশ আমলে একেবারে কিশোর বয়সে স্টিমারে চেপে বাবার সঙ্গে আমি প্রথম ঢাকায় আসি। ঢাকা তখন জেলা শহর। এত লোকজন হৈচৈ ছিল না। সমাজ

জীবনও ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এই সমাজ জীবনে নওয়াব বাড়ি এবং মহল্লার সর্দারদের ছিল দারুণ প্রভাব। রমনা গ্রীন ছিল সত্যিই অতুলনীয় সবুজ সমারোহে ভরা। অধিকাংশ মসজিদে পানির চৌবাচ্চায় রঙিন মাছ খেলা করতো। রমনার হাজার বছরের পুরনো কালীবাড়ির সুউচ্চমন্দির-চূড়ার দিকে চেয়ে তাক লেগে যেতো। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রতিসন্ধ্যায় বেজে উঠতো ঢাকের বাদ্যি। নারিন্দায় বৈষ্ণবদের মন্দিরে জাগতো কীর্তনের মূর্ছনা। সাত রওজায় প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে বসতো কাওয়ালির জলসা। তারা মসজিদ, লালবাগের কেল্লা, সাত গম্বুজ মসজিদ ছিল ট্যুরিস্টদের প্রধান আকর্ষণ।

বৃটিশ আমলের পর পাকিস্তানী আমলেরও গোড়ার দিকে কোনো স্টিমার ঢাকার ঘাটে এসে ভেড়ার আগে ভোঁ দিতো না। খুব ধীর গতিতে নওয়াবদের প্রাসাদ আহসান মঞ্জিলের ঘাটের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতো। শুনেছি, নওয়াবদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য বৃটিশ আমলের স্টিমার কোম্পানি এই নিয়মটা করেছিলেন। ঢাকার নওয়াবেরা ছিলেন বৃটিশদের খয়ের খাঁ। আসল নওয়াবদের তাড়িয়ে এই বংশের আদি পুরুষ গনি মিয়াকে ঢাকার নওয়াব পদে বসিয়েছিল বৃটিশ সরকার। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই গনি মিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। হাজার হাজার দেশী সিপাহীকে পালা করে আন্টাঘরের ময়দানে (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়া হয়। সাতদিন বহু লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল গাছের ডালে। তখনকার ঢাকার মানুষ বহুকাল এই আন্টাঘরের ময়দানের আশপাশ দিয়ে ভয়ে হাঁটতে চাইতো না। চামড়ার ব্যবসায়ী (পরে তারা দাবি করেছেন চামড়া ও শালের ব্যবসায়ী) গনি মিয়া রাতারাতি খেতাব পেলেন ঢাকার নওয়াব বাহাদুর। বুড়িগঙ্গার পারে রংপুরের এক জমিদারের বিলাস ভবন কিনে 'নওয়াব আবদুল গনি বাহাদুর' সেটিকে প্রাসাদে রূপান্তর করেন। ছেলের নামে প্রাসাদের নাম দেন আহসান মঞ্জিল। পুরনো আহসান মঞ্জিল অবশ্য এখন নেই। একবার ঢাকায় প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সঙ্গে বুড়িগঙ্গায় জলোচ্ছ্বাস হয়। পুরনো আহসান মঞ্জিল সেই ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংস হয়। নতুন করে আবার আহসান মঞ্জিল তৈরি করা হয়।

এই নওয়াব পরিবারের সবচাইতে খ্যাত ব্যক্তি ছিলেন নওয়াব সলিমুল্লাহ। তিনিও বৃটিশদের খয়ের খাঁ ছিলেন। ১৯০৬ সালে তার আমন্ত্রণেই ভারতের সব বড় বড় নওয়াব— নওয়াব ভিকারুল মূলক, নওয়াব মোহসিন উল মূলক প্রমুখ এসে যোগ দিয়েছিলেন মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে। আহসান মঞ্জিলে এক কনফারেন্স হয়েছিল। সম্ভবতঃ একমাত্র বাঙালি তাতে যোগ দিয়েছিলেন তরুণ ফজলুল হক। ওই সময়ে আহসান মঞ্জিলেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম।

শোনা যায়, নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আহসান মঞ্জিলে দিনে তার বিশ্রাম এবং রাত্রে যাতে তার সুনিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, সে জন্য বৃটিশ সরকারের হুকুমে ঢাকার ঘাটে স্টিমারের ভোঁ দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নওয়াব সলিমুল্লাহর পর নওয়াব হবিবুল্লাহ। তারপর নওয়াব হাসান আসকারী। আসকারীর আমলে বুড়িগঙ্গায় স্টিমার আসা বন্ধ হয়। নদীতে পলি জমায় স্টিমার চলাচলের মত পানির গভীরতা আর ছিল না। সুতরাং স্টিমারের ভোঁ দেয়ার প্রথাটিও পরে আর চালু করার কথা ওঠেনি।

সেই পঞ্চাশের দশকে 'মিল্লাত' অফিসে বসে ঢাকার নওয়াব পরিবারের ইতিহাস শুনেছি তখনকার ঢাকার একজন নামকরা পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ তৈফুর সাহেবের মুখে। ঢাকা জাদুঘরের তখনকার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক আহমদ হাসান দানী ঢাকার ইতিহাস নিয়ে ইংরেজিতে যে বই লেখেন, তাতেও সহায়তা যুগিয়েছিলেন বয়োবৃদ্ধ তৈফুর সাহেব। তার এক মেয়ে লায়লা আর্জুমান্দ বানু গজল গানে এক সময় সারা উপমহাদেশ জুড়ে খ্যাত ছিলেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত তার গজল সম্প্রচার করা হতো। পাকিস্তান আমলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

'মিল্লাতে' তৈফুর সাহেবের একটি সাক্ষাতকার আমি ছেপেছিলাম। এই সাক্ষাতকারটি গ্রহণের জন্য তার বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু তিনি নিজেই 'মিল্লাত' অফিসে এসে হাজির হন। সম্পাদকের জন্য রক্ষিত ইজিচেয়ারটিতে শুয়ে তিনি পাক্কা দু'ঘন্টা বলে গেছেন ঢাকার ইতিহাস। সেই ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ, তেমনি রোমাঞ্চকর। আমার দুঃখ তিনশ' বছরের কলকাতা নিয়ে কত গল্প, উপন্যাস লেখা হয়েছে, কত ছায়াছবি তৈরি হয়েছে; হাজার বছরের আরও বৈচিত্র্যময় ঢাকা শহর নিয়ে কিছুই হয়নি।

তৈফুর সাহেব যেদিন 'মিল্লাত' অফিসে এসেছিলেন, সেদিনটি আমার কাছে আরো এক কারণে স্মরণীয়। 'মিল্লাতের' দোতলা অফিস থেকে নেমে তৈফুর সাহেবকে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দিয়ে অফিস কক্ষে ফিরে এসেছি, নিউজরুম থেকে জানানো হল, আমার টেলিফোন এসেছে। দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলতেই মোটা এবং ভারিক্কি গলা, "হ্যালো চিনতে পারছো আমাকে?" বললাম, মুজিব ভাই (শেখ মুজিবুর রহমান)।

একটু হাসির শব্দ। তারপরেই তিনি বললেন, তোমার লেখা পড়েছি। মানিক ভাই আমাকে দেখিয়েছেন।

বুঝলাম, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে 'মর্নিং নিউজে' যে এডিটোরিয়াল বেরিয়েছিল, 'মিল্লাতে' তার যে জবাব দিয়েছিলাম, সেই লেখার কথা তিনি

বলছেন। বললাম, তাতো বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে মুজিব ভাই।

তিনি বললেন, আমি কি আর সবসময় সবকিছু ঠিক সময় হাতে পাই? কখনো জেলে, কখনো বাড়িতে, কখনো মফঃস্বলে; এই করেইতো আমার দিন কাটে। তোমার লেখাটা পড়তেও আমার তাই দেরি হয়ে গেছে। তুমি আমার লিডারকে ডিফেন্ড করেছো, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো না। এটা ছিল সাংবাদিক হিসেবে তোমার কর্তব্য। তবে এই কর্তব্য পালনের জন্য তোমাকে আমি একটু খুশি করতে চাই। মুজিব ভাই যখন ডাকো, তখন আমার কথায় আশা করি না বলবে না।

তার কথা আমি বুঝতে পারলাম না। বললাম, লেখাটা যে আপনার ভালো লেগেছে, সেটাই আমার বড় পাওয়া। এর চাইতে বেশি আমি আর কি চাইবো?

শেখ মুজিব সে কথার জবাব দিলেন না। বললেন, তুমি এখন কি করছো?

ঃ তৈফুর সাহেবের একটা ইন্টারভিউ নেয়া এইমাত্র শেষ করেছি।

ঃ হাতে কাজ না থাকলে একটা রিকশা ডেকে 'ইত্তেফাক' অফিসে চলে আসো। আমি মানিক ভাইয়ের সামনে বসে আছি। তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

তখুনি দৌড়ে অফিস থেকে বেরুলাম। দেখি সম্পাদক মোতাহার ভাই অফিসে ঢুকছেন। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছো?

ঃ ইত্তেফাক অফিসে।

মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, মানিক ভাই ডেকেছেন? তোমাকে 'ইত্তেফাকে' চাকরি অফার করছেন?

বললাম, না মোতাহার ভাই, মানিক মিয়া আমাকে ডাকেননি। মুজিব ভাই আমাকে ডেকেছেন। 'মর্নিং নিউজের' লেখার যে উত্তর আমরা দিয়েছি, সেটা পড়ে তিনি খুশি হয়েছেন।

মোতাহার ভাই বললেন, মানিক মিয়াও তোমাকে ডাকতে পারেন। 'ইত্তেফাকে' চাকরি অফার করতে পারেন। তোমাকে বলে রাখি গাফফার, আমি তাতে আপত্তি করবো না। 'মিল্লাতের' অসুবিধে হবে। কিন্তু তুমি আরও বড় হও, এটা আমিও মনে-প্রাণে চাই।

কত যুগ আগের কথা। কিন্তু মোতাহার ভাইয়ের এই কথা কটি এখনো আমার কানে বাজে। তার রাজনৈতিক মতের সাথে কোনকালেও আমার মিল ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু এমন একটি আত্মভোলা, সহজ সাদাসিধে মানুষ আমি জীবনে খুব বেশি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ যুগে এমন মানুষ সত্যি বিরল।

রিকশা ধরার জন্য আমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত হাঁটতে হলো। আধ-ঘন্টারও কম সময়ে পৌঁছে গেলাম হাট খোলায়। 'ইত্তেফাকের' তখন নিজস্ব অফিস ও প্রেস নেই। নয় নম্বর হাটখোলা রোডে প্যারামাউন্ট প্রেসে 'ইত্তেফাক' ছাপা হয়। প্রেসের অফিসেই 'ইত্তেফাকের' অফিস। প্রেসের মালিক হাবিবুর রহমান সাহেব তার চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলে মানিক মিয়া সেই চেয়ারে বসেন। এক কোণায় একটি মাত্র টেবিলে নিউজ-এডিটর তার শিফটের সাংবাদিকদের নিয়ে গাদাগাদি করে কাজ করেন। বাইরে একটা চালাঘরে পত্রিকার একাউন্টস ও ম্যানেজমেন্ট সেকশন। সেটা একটা ছোট গুদাম ঘরের মতো। মানিক মিয়া তখনো প্রৌঢ়ত্বে পা দেননি। ঠোঁটের উপর খাড়াখাড়া হিটলারি গোঁফ। চেহারায় একটা রাগি ভাব। আমাকে দেখে একটি কথাও বললেন না। বিস্মিত হলাম এই মানুষটিই কিছুদিন আগে আমাকে টেলিফোনে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

শেখ মুজিব আমাকে দেখে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললেন। কোনো ভূমিকা না করেই বললেন, তোমার লেখাটা পড়ার পর থেকেই ভাবছি তোমাকে কিছু একটা দেব। কি দেব ভাবতে ভাবতে মেলা দিন কেটে গেছে। পরে মানিক ভাইকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, এটা কলম কিনে দিন। একটা ভালো কলম। তার কথামতোই একটা কলম কিনেছি।

লজ্জিত হয়ে বললাম, এসবের কোন দরকার ছিল না মুজিব ভাই।

শেখ মুজিব হাসলেন। প্যাকেট খুলে কলমটা বের করে আমার বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। খুবই সুন্দর বেগুনি রঙের ঝর্ণা কলম। তখনকার দামি শেফার্স পেন। অত দামি ও সুন্দর কলম আমি তখন পর্যন্ত ব্যবহার করিনি। অভিভূত হয়ে বলেছি, মুজিব ভাই, এত দামি কলমের কোন দরকার ছিল না।

শেখ মুজিব বললেন, তোমার লেখা এ কলমের চেয়ে অনেক দামি। আমি চাই, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তুমি এই কলম দিয়ে লিখে আমাদের সমর্থন কর।

কী জবাব দেব? আমি নিশ্চুপ রইলাম।

শেখ মুজিব একবার মানিক মিয়ার দিকে আরেকবার আমার দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা নাচিয়ে মুচকি হেসে বললেন, আরও একটা কারণে তোমাকে কলম দিলাম। কারণটা কি জানো?

বললাম ঃ না মুজিব ভাই, জানি না।

শেখ মুজিবের ঠোঁটে তখনো স্মিত হাসি। বললেন, যদি কোনো দিন আমার বিরুদ্ধে কিছু লেখো, তাহলে এই কলমটা হাতে নিয়ে বেশি কিছু লিখতে পারবে না।

তার কথা শুনে মানিক মিয়াও এবার হেসে ফেললেন।

পরবর্তী দুই দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনীতির যেমন সমর্থন করেছি, তেমনি সমালোচনাও করেছি। কখনো কখনো করেছি কঠোর সমালোচনা। অবশ্য সেই শেফার্স কলমটা তখন আমার হাতে ছিল না।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে টুঙ্গিপাড়ায় তার সমাধিতে দাঁড়িয়ে পুরনো দিনগুলোর কথা একে একে মনে পড়েছে। মিথ্যে বলবো না, চোখে পানি এসেছে। তার সমাধির পাথুরে বেদিতে মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে বলেছি; "মুক্তিদাতা, তোমারও ক্ষমা, তোমারও দয়া/ রবে চির পাথেয় চির যাত্রার।"

(চব্বিশ)

বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে আমি একটি কলম নয়, তিন দশকে তিনটি কলম এবং একটি হাতঘড়ি উপহার পেয়েছি। কলম তিনটি নেই, হাতঘড়িটি আছে। পঞ্চাশের দশকে কলমটা কিভাবে পেয়েছিলাম তা আগেই বলেছি। ষাটের দশকে দ্বিতীয় কলমটি উপহার পাওয়া নয়, একরকম জোর করে নেওয়া। ১৯৬৫ সালের মে মাসে 'ইত্তেফাকের', সহকারী-সম্পাদক আহমেদুর রহমান('মিঠাকড়া' কলামের ভীমরুল) কায়রো বিমান- দুর্ঘটনায় অন্যান্য যাত্রী ও সাংবাদিকদের সঙ্গে নিহত হন। আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ছিলেন; দৈনিক মিল্লাতে ছিলেন সহকর্মী। ১৯৫৮ সালে আইয়ুবের ক্ষমতা দখলের পর 'মিল্লাত' বন্ধ হয়ে গেলে মানিক মিয়া আহমেদকে 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় বিভাগে নিয়ে আসেন। বিমান-দুর্ঘটনায় আহমেদুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর সময় আমি 'ইত্তেফাকের' চাকুরিতে ছিলাম না। কিন্তু মানিক মিয়া আমাকে আহমেদের উপরে শোক-সম্পাদকীয় লেখার জন্য তার অফিসে ডেকে নেন। এই শোক-সম্পাদকীয় লেখার কথা ছিল আহমেদুর রহমানের আরেক বন্ধু এবং ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় বিভাগের তখনকার তরুণ সদস্য মইদুল হাসানের (মূলধারা '৭১ গ্রন্থের লেখক)। কিন্তু আহমেদের মৃত্যু-খবর পেয়ে মইদুল সম্পাদকীয় কক্ষের টেবিলে মাথা রেখে এতই কাঁদছিলেন যে, তার পক্ষে সম্পাদকীয় লেখার জন্য কলম ধরা সম্ভব ছিল না।

মানিক মিয়া তার ইজিচেয়ারে বিষন্ন মুখে বসেছিলেন। দুপুরের দিকেই খবরটা এসেছে যে পিআইএ'র কায়রোগামী উদ্বোধনী ফ্লাইট কায়রোর অদূরে বিধ্বস্ত হয়েছে। তাতে সকল যাত্রী নিহত। খবর পেয়েই মানিক মিয়া, মোতাহার ভাই, মইদুল, সিরাজউদ্দিন হোসেন এবং আরো অনেকে ছুটে গিয়েছিলেন আহমেদুর

রহমানের বাসায়; তার সদ্য-বিধবা স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জানানোর জন্য। অন্যান্য নিহত সাংবাদিকদের বাসাতেও তারা গিয়েছিলেন। সবশেষে 'ইত্তেফাক' অফিসে ফিরে এসে শোকে তারা ভেঙে পড়েছিলেন। সিরাজউদ্দিন হোসেন তখন নিউজ-এডিটর। তাকেও শোক-সম্পাদকীয়টি লিখতে বলা হয়েছিল; তিনিও চোখের পানি গোপন করে বললেন, না, না, আমি পারবো না।

শেষ পর্যন্ত এই সম্পাদকীয় লেখার জন্য একজন পাষন্ড-হৃদয় সাংবাদিকের দরকার হল। সেই সাংবাদিকটি আমি। তার উপর আহমেদুর রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহপাঠী। আমি মে মাসের তপ্ত দুপুরে নারিন্দায় শরৎগুপ্ত রোডের বাসায় দুপুরের খাওয়া শেষে একটু সুখ-নিদ্রার সাধনায় ছিলাম, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। নির্মল সেন (আমাদের সকলের নির্মলদা) জানালেন, কায়রোতে বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে। তাতে মোজাম্মেল হক (তখন দৈনিক পাকিস্তানের, বর্তমানে দৈনিক বাংলা, নিউজ-এডিটর), আহমেদুর রহমানসহ সকল সাংবাদিক ও যাত্রী নিহত। একজন দু'জন নয়, পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু কয়েকজন সাংবাদিকের এমন আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য সম্ভবতঃ চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেই চেতনা ফিরলো আবার টেলিফোনের শব্দে। এবার মানিক ভাইয়ের গলা--গাফ্ফার, খবরতো শুনেছেন। আপনাকে একবার অফিসে আসতে হয়।

কেন, কি জন্য তিনি ডাকছেন, কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। একটা রিকশা ডেকে রামকৃষ্ণ মিশন রোডে 'ইত্তেফাক' অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। 'ইত্তেফাক' অফিস তখন ছোট একতলা পুরনো বিল্ডিং। ছাদের উপরে ছাপড়া তুলে তার এক অংশে নিউজ সেকসন, অন্য অংশে সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ। নীচে দু'টি কক্ষ জুড়ে সম্পাদকীয় বিভাগ। একটি ঘর মানিক মিয়ার নিজস্ব। সেই ঘরে ঢুকে প্রথমেই যে দৃশ্যটি চোখে পড়লো, মানিক মিয়া তার ইজি চেয়ারে বিষণ্ন মুখে বসে আছেন। তার পাশেই রাখা টেবিলটাতে মাথা রেখে মইদুল হাসান কাঁদছেন। মানিক মিয়ার ইজিচেয়ারের হাতলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সিরাজউদ্দিন হোসেন, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী এবং আরও অনেকে। সারা ঘর জুড়ে একটা থমথমে শোকাবহ পরিবেশ।

প্রথমে এই অসহনীয় নিস্তব্ধতা ভাঙলেন মানিক মিয়াই। বললেন, গাফ্ফার, আমাদের অবস্থাতো দেখছেন। আমার আজ 'রাজনৈতিক মঞ্চের' ডিকটেসন দেওয়ার মতোও মনের অবস্থা নেই। মইদুল, সিরাজ সাহেব দু'জনেই ভেঙে পড়েছেন। আহমেদুর রহমানের উপর আপনাকেই সম্পাদকীয় লিখতে হবে।

মনে মনে ভাবলাম, ১৯৫৮ সালে আমার প্রথম ছেলে বাবুর মৃতদেহ আমি

নিজে আজিমপুরের কবরে শুইয়েছি। আর আজ প্রিয়তম বন্ধু আহমেদুর রহমানের নির্মম মৃত্যুর উপর শোক গাঁথা লিখতে পারবো না? নজরুল কি করে তার সবচাইতে প্রিয় ছেলে বুলবুলের মৃত্যুর দিনই হিজমাষ্টার্স ভয়েস কোম্পানীর অফিসে গিয়ে দরোজা বন্ধ করে গান লিখেছিলেন, 'হারিয়ে গেছে আমার গানের বুলবুলি,' কিম্বা 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়?' মানিক ভাইকে বললাম, আপনারা শুধু এই ঘরটা খালি করে দিন মানিক ভাই। আহমেদুর রহমানের মৃত্যুর উপর আমিই শোক-সম্পাদকীয় লিখবো।

যে কাজটা সেদিন 'ইত্তেফাক' অফিসে আর কেউ পারেননি, মানিক মিয়ার ঘরে দরোজায় খিল এঁটে আমিই সেই কাজটা করেছিলাম। আগের দিন দুপুরে ঢাকার প্রেসক্লাবে যে আহমেদুর রহমানকে নিয়ে চায়ের টেবিলে আড্ডা দিয়েছি, পরের দিন বিকেলে 'ইত্তেফাক' অফিসে বসে সেই আহমেদুর রহমানের (অন্যান্য নিহত সাংবাদিকসহ) মৃত্যুর উপর সম্পাদকীয় লিখেছি। আমার মতো পাষাণ হৃদয় মানুষ আর কোথায় আছে?

সেই যে শোক-সম্পাদকীয় লেখা, তারপর 'ইত্তেফাকেই' আমাকে থেকে যেতে হল। মানিক ভাই বললেন, আহমেদুর রহমান নেই। কিন্তু 'মিঠাকড়া' কলামটিতো চালু রাখতে হবে। গাফ্‌ফার, আপনি 'ইত্তেফাকে' আবার 'জয়েন' করুন।

মইদুল হাসান আপত্তি জানালেন। বললেন, গাফ্‌ফার 'ইত্তেফাকে' আসুন। কিন্তু 'ইত্তেফাকের' পাতায় 'মিঠাকড়া' কলামটি আর চালু রাখা যাবে না। আহমেদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে ওই কলামটি আর প্রকাশ করা উচিৎ নয়।

মানিক মিয়া বললেন, বেশ তাই হোক। তবে 'মিঠাকড়ার' জায়গায় একটা কলামতো প্রকাশ করতে হবে। আমিতো আর রোজ 'রাজনৈতিক মঞ্চ' লিখতে পারবো না। আপনারা কলামের একটা নতুন নাম ঠিক করুন। গাফ্‌ফারই কলামটি লিখবে।

কয়েকদিন ভেবে চিন্তে মইদুল হাসানই কলামের নাম এবং কলাম লেখকের 'পেন নেম' ঠিক করলেন। কলামের নাম "দশ দিগন্তে।" কলামিষ্টের নাম পদাতিক। আমি পদাতিক নামে 'ইত্তেফাকে' আবার কলম চালনা শুরু করলাম।

এরই দু'এক মাস পরের কথা। একদিন সকাল দশটার দিকে মানিক মিয়া তাঁর ইজিচেয়ারে শুয়ে 'রাজনৈতিক মঞ্চের' ডিকটেসন দিচ্ছেন, হঠাৎ দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমি মানিক মিয়ার পাশের টেবিলে বসে ডিকটেসন নিচ্ছিলাম। শেখ সাহেব সেই টেবিলের সামনে-রাখা চেয়ারটাতে বসলেন। মানিক

মিয়াকে লেখাজোকা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে বললেন, আমি অসময়ে এসেছি মানিক ভাই। আপনি লেখা নিয়ে ব্যস্ত। এখন বরং চলে যাই।

মানিক মিয়া বললেন, আমি 'ইত্তেফাক' নিয়ে সারাদিনই ব্যস্ত থাকি। আপনি বসুন। কথা আছে।

শেখ মুজিব পাইপে আগুন ধরালেন। আমি টেবিলে কলম নামিয়ে একটু বিশ্রাম নিলাম। মানিক মিয়ার 'রাজনৈতিক মঞ্চে'র ডিকটেসন নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে প্রায় রোজই এরকম বিশ্রাম নিতে হতো। অসংখ্য লোক আসতো মানিক মিয়ার কাছে। মানিক মিয়া কাউকে না বলতেন না। এমনকি তার লেখার সময়েও নয়। এটা এক আশ্চর্য গুণ ছিল তার। মাঝপথে লেখার ডিকটেসন দেওয়া থামিয়ে তিনি হয়তো আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া, আবদুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরী বা এই ধরনের কোনো রাজনৈতিক নেতা বা সম্পাদকের সঙ্গে জোর রাজনৈতিক আলাপ জুড়তেন। তারপর সেই আলোচনা শেষ হতেই আবার লেখার ডিকটেসন দিতে শুরু করতেন। শুধু বলতেন, শেষের লাইনটা যেন কি বলেছিলাম? খেই ধরিয়ে দিলেই তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ মুদে আবার অনর্গল ডিকটেসন দিতে পারতেন।

আজও তাই হল। আমি লেখার মাঝে একটু বিশ্রাম পেয়ে খুশি হলাম। আমাদের তিনজনের জন্যই চা এলো। শেখ মুজিব ঠোঁট থেকে পাইপ সরিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। বললেন, আহমেদুর রহমানতো এখন নেই। 'দশ দিগন্তে' কলামের পদাতিকটি কে?

ঃ গাফ্ফার। মানিক ভাই বললেন।

শেখ মুজিব হাসলেন, আমিও তাই সন্দেহ করেছিলাম।

আমি তাদের কথা শুনছিলাম আর লক্ষ্য করছিলাম, মুজিব ভাইয়ের কালো ফতুয়া কোটের (পরে মুজিবকোট নামে খ্যাত) পকেটে একটা দামি কলম। মনে হল পার্কার। খুবই সুন্দর কলম। লোভ হল। মানিক মিয়া ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণের জন্য বাথরুমে যেতেই বললাম, মুজিব ভাই, আপনি আমাকে যে কলমটি দিয়েছিলেন, সেটি হারিয়ে ফেলেছি।

ঃ আরেকটা কলম চাও? তাহলে একদিন আমার আলফার অফিসে আসো। নতুন একটা কলম কিনে দেব।

শেখ মুজিব তখন গুলিস্তান সিনেমা হলের কাছে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু এভেনিউতে) আলফা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অফিসে বসতেন।

একটু সাহস করে বললাম, নতুন কলম চাই না। আপনার পকেটে একটা সুন্দর কলম দেখছি।

শেখ মুজিব নিজের পকেটের দিকে তাকালেন। কলমটা পকেট থেকে বের করে বললেন, এটা আমি তোমাকে দিতে চাই না। আমি এটা উপহার হিসেবে পেয়েছি। বেবি আমাকে দিয়েছে। জানোত, সে মিলিটারি মেজাজের মেয়েমানুষ।

বলেই কলমটা পকেটে রেখে দিলেন।

বেবি মানে আখতার সোলায়মান। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর একমাত্র মেয়ে। শেখ মুজিব ও আখতার সোলায়মানের মধ্যে ছিল ভাইবোনের মতো দারুণ সম্পর্ক। দু'জনের মধ্যে প্রায়ই খুনসুটিও লেগে থাকতো। আবার ঝগড়া বিবাদও। ছয়-দফা আন্দোলনের সময় এই ঝগড়া চরমে ওঠে।

মানিক মিয়া বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। ইজিচেয়ারে বসতে গিয়ে বললেন, মুজিব মিয়া, আপনার সম্পর্কে নানা কথা কানে আসছে। আপনি কি পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলতে চান?

শেখ মুজিব কোনো কথা বলার আগেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, মানিক ভাই, আপনারা এখন সিরিয়াস রাজনৈতিক আলোচনা করবেন। আমি অন্য ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করি।

মানিক মিয়া বললেন, না, না, আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে না। আপনি বসুন।

আমি আবার চেয়ারে বসলাম। শেখ মুজিব বললেন, পাকিস্তানতো আমরা বাঙালিরা গড়েছিলাম। আমরা তা ভাঙতে চাইবো কেন? তবে পাকিস্তানে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহলে সে পাকিস্তানে আমাদের থেকে লাভ কি?

মানিক মিয়া বললেন, মনসুর ভাইয়ের (আবুল মনসুর আহমদ) কাছে শুনছি, আপনি আইয়ুবের বিরুদ্ধে একটা বড় আন্দোলনে নামতে চান? এই আন্দোলনে আপনি কাদের সমর্থন পাবেন ? আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমেদের মতো আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতারা আপনার সঙ্গে নেই। মওলানা ভাসানী এতকাল পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের বিরুদ্ধে কথা বললেন, এখন তিনি মশিউর রহমান যাদু মিয়ার কবলে। আইয়ুব খার সঙ্গে নাকি তাঁর গোপন যোগাযোগ চলছে।

শেখ মুজিব বললেন, আতাউর রহমান খানদের নিয়ে আমি ভাবি না। আপনার ভাষায় এরা হচ্ছেন 'কোলবালিশ নেতা।' মওলানা সাহেবের কিছু টাকা পয়সার লোভ আছে। কিন্তু বুড়ো বয়সেও তার রক্তে আগুন আছে। আমি এখনো গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালে যাদু মিয়ারা তাকে ধরে রাখতে পারবেন না।

মানিক মিয়া বললেন, আপনি কি ন্যাপ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থন পাবেন? তারাতো এখন পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়ালি খানদের সঙ্গে জোট বেঁধে সর্বপাকিস্তানী

রাজনীতির কথা ভাবছেন।

শেখ মুজিব বললেন, আমি তাঁদের সঙ্গে প্রকাশ্যে জোট বাঁধতে চাই না। তাহলে পশ্চিমাশক্তি ভাববে, আমি কম্যুনিষ্টদের খপ্পরে পড়েছি। পশ্চিমা শক্তির বিরোধিতায় আমাদের আন্দোলন অঙ্কুরেই নষ্ট হবে। কিন্তু বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের জন্য আমি এমন একটা কর্মসূচীর কথা ভাবছি, যে কর্মসূচীতে এই দলগুলো আমার পেছনে পেছনে আসতে বাধ্য হবে।

ঃ আপনার কর্মসূচীটি কি? মানিক মিয়া জিজ্ঞাসা করলেন।

ঃ এখনো সবই চিন্তাভাবনার স্তরে। কোনো স্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করতে পারিনি।

মানিক মিয়া বললেন, লীডার (শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী) এখন বেঁচে নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের বন্ধুদের কাছে শুনছি, আইয়ুব কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে একটা বড় রকমের 'গ্যামব্লিংয়ে' যেতে চান। ভারতের সঙ্গে পিন্ডির সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। এই সময় তাড়াহুড়া করে এমন কিছু করবেন না, যাতে আমরা সকলে একটা বড় রকমের বিপদে পড়ে যাই।

শেখ মুজিব হেসে উঠে বললেন, মানিক ভাই, আপনার কলমে যতটা জোর, মনেও ততটা জোর রাখুন। ইনশা আল্লাহ্‌ বাংলার অধিকার আদায় করে ছাড়বোই।

আরও ঘন্টাখানেক মানিক মিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনার পর শেখ মুজিব বিদায় নেওয়ার সময় পকেট থেকে কলমটা আবার বের করলেন। আমার হাতে সেটা গুঁজে দিয়ে কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন, বেবির উপহার। তা হোক। কলমটা তোমাকেই দিলাম। আমি জেলে বসেও ভাবতে পারবো এই কলম বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(পঁচিশ)

আমার 'তৃতীয় মত' কলামটির বয়সও চার দশক পূর্ণ হয়ে গেছে। ষাটের দশকের শেষ দিকে (১৯৬৭-৬৮) 'দৈনিক আজাদে' প্রথম এই কলামটি লেখা শুরু করি। তখনো ছয়-দফা আন্দোলনের ঝড়ো হাওয়া বইছে দেশে। 'দৈনিক ইত্তেফাকের' প্রকাশনা নিষিদ্ধ। প্রেস ও অফিস সরকার বাজেয়াপ্ত করে তালা মেরে রেখেছেন। 'ইত্তেফাকের' প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মানিক মিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু তার কাগজ ফেরত দেয়া হয়নি। আমি 'আওয়াজ' নামে একটি সান্ধ্য-দৈনিক নিজে চালাচ্ছিলাম এবং ছয়-দফার পক্ষে যথাসাধ্য

লিখছিলাম। অর্থাভাবে 'আওয়াজ' কাগজটিও ধরে রাখতে পারিনি। বাড়িতে প্রায় বেকারই বসে ছিলাম। এমন সময় সাংবাদিক আবদুল আওয়াল খানের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। আওয়াল আমার বহুদিনের বন্ধু। সে তখন 'আজাদের' বার্তা-সম্পাদক। সন্তোষ গুপ্ত সহযোগী বার্তা-সম্পাদক। ফয়েজ আহমদ চীফ রিপোর্টার। আজিজ মিসির সিনেমার পাতা এবং আজাদ পাবলিকেশন্স-এর সিনেমা-সাপ্তাহিক 'চিত্রাকাশের' সম্পাদক। আবদুল কুদ্দুস মাখন, আমিনুল হক বাদশা— এরা তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একই সঙ্গে কেউ 'আজাদের' বার্তা বিভাগে, কেউ রিপোর্টিং সেকশনে কাজ করেন।

'ইত্তেফাকের' অনুপস্থিতিতে আইয়ুব-মোনেমের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে 'আজাদ' তখন ছাত্র-জনতার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য মুখপত্র। মওলানা আকরম খাঁ তখনো বেঁচে আছেন (তিনি মারা যান ১৮ই আগষ্ট ১৯৬৮)। তার জীবদ্দশাতেই প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ গোষ্ঠীর মুখপত্রের ভূমিকা থেকে প্রগতিশীল গণআন্দোলনের বাণী বাহকের ভূমিকায় 'আজাদের' এই যে রূপান্তর, তার প্রধান কৃতিত্ব দিতে হয় মওলানা সাহেবের ছোট ছেলে মুকুল নামে পরিচিত কামরুল আনাম খাঁকে। তিনি কিছুদিন প্রিন্টিং টেকনোলজি শেখার জন্য বিলেতে ছিলেন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র তার মধ্যে নেই। চেহারায়, চলনে-বলনে পুরো আধুনিক বাঙালি। 'আজাদের' ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েই তিনি শুধু কাগজটির চেহারা নয়, চরিত্রও বদলে দেন। অবশ্য 'আজাদের' এই চরিত্র বদলের কাজে আওয়াল-ফয়েজ জুটির অবদানও কম নয়। গভর্নর মোনেম খানের ছবি 'আজাদে' ছাপা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। মোনেম খান এর প্রতিশোধও নিয়েছিল নির্মমভাবে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কিছু আগে (তার পতনের কিছু আগে) মওলানা আকরম খাঁর মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে তিনি 'আজাদে' পারিবারিক ঝগড়া উস্কে দিয়ে, লালবাগ থানায় তখনকার ওসিকে হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহার করে 'আজাদ' অফিসে একটি নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটতে দেন এবং কামরুল আনাম খাঁকে খুনের মামলার আসামী করে জেলে ঢুকিয়ে তার প্রতিপক্ষ আত্মীয়দের পত্রিকার অফিস জবরদখলে সাহায্য যোগান।

আগের কথায় ফিরে যাই। ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে ঢাকার প্রেসক্লাবে বসে আড্ডা দিচ্ছি। আওয়াল খান তাস খেলা শেষ করে দোতলা থেকে নামছিল। আমাকে দেখে বলল, তুইতো এখন বাড়িতেই বসে আছিস। 'আজাদের' সম্পাদকীয় বিভাগে লোক দরকার। তুই আয়। 'ইত্তেফাকের' কিছু বেকার সাংবাদিককেও 'আজাদের' বার্তা বিভাগে চাকরি দেয়া হয়েছে। নূরুল ইসলাম পাটোয়ারি, আবদুর রাজ্জাক সাহেবকেও (আদমজী পুরস্কার পাওয়া 'কন্যাকুমারী' উপন্যাসের লেখক)

সম্পাদকীয় বিভাগে জয়েন করার অফার দেয়া হয়েছে। তারা এলে তোদের টিম খুবই শক্তিশালী হবে।

পরদিনই 'আজাদের' চাকরিতে জয়েন করলাম। কামরুল আনাম খাঁ আমি জয়েন করায় খুব খুশি হলেন। তার কামরায় ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি আগে যখন 'আজাদে' কাজ করতেন, তখন ছদ্মনামে অনেকগুলো ফিচার লিখতেন। এবার নিজের নামে একটি কলাম লিখুন।

বললাম, আগে 'আজাদে' অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হতো। প্রেসিডেন্টকে লিখতে হতো ছদরে রিয়াসত, প্রধানমন্ত্রীকে উজিরে আজম, মুখ্যমন্ত্রীকে উজিরে আলা, প্রজাতন্ত্রকে জমহুরিয়াত, ইসলামকে এছলাম; তার পর কাগজের রাজনৈতিক মতামতও ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক। এই অবস্থায় এখন আমার নিজের নামে কিছু লিখতে গেলে নিজের মতই বলতে হবে। তা কি আপনারা সহ্য করবেন? উদাহরণ হিসেবে বলি, দেশে এখন ছ'দফার আন্দোলন চলছে। সরকার বলছেন, এটা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলন। আমি এই ছ'দফার পক্ষে। আমার লেখায় এই আন্দোলনের পক্ষে মত প্রকাশ করতে পারবো কি?

কামরুল আনাম খাঁ আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ধরে বললেন, কেন পারবেন না? ছ'দফাতো শুধু আওয়ামী লীগের বা শেখ মুজিবের দাবি নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষের দাবি। তাদের বাঁচামরার দাবি। শুধু মওলানা সাহেবকে খুশি রাখার জন্য সম্পাদকীয়তে সরাসরি ছ'দফাকে সমর্থন জানিয়ে কিছু লিখবেন না। আপনার কলামে মন খুলে লিখুন। এই ব্যাপারে মওলানা সাহেব রাগ করলে আমি তাকে সামলাবো।

কামরুল আনাম খাঁকে আমি বিশ্বাস করলাম। বিশ্বাস না করারও কিছু ছিল না। তার উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের কথা আমি জানতাম। ১৯৬৪ সালে গভর্ণর মোনেম খাঁ যখন ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছিলেন, তখন দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলনে কামরুল আনাম খাঁর সাহায্য ও সহযোগিতার কথা আমার মনে ছিল। তখনকার দাঙ্গা-প্রতিরোধ আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রচারপত্র 'পূর্ববঙ্গ রুখিয়া দাঁড়াও' কামরুল আনাম খাঁ আজাদ প্রেস থেকে বিনা পয়সায় ছেপে দেন। তখন ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। জিয়াউল হক টুলুর (বর্তমানে গণফোরামের অন্যতম নেতা) গাড়িতে আমি এবং টুলু মিলে এই প্রচার পুস্তিকা গাড়ির 'ফ্লোর' বোঝাই করে নিয়ে আসতাম প্রেসক্লাবের উল্টোদিকে সায়েদুল হাসানের (পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ) অফিসে। সেই অফিসেই ছিল দাঙ্গা-প্রতিরোধ কমিটির হেড অফিস। এই আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবও এই অফিসে আসতেন। তিনি 'আজাদ' অফিস থেকে প্রচারপত্র আনার জন্য কারফিউ পাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমাদের দু'জনের জন্য।

কামরুল আনাম খাঁ এবং আওয়াল খানের উৎসাহেই ১৯৬৭ সালে 'আজাদে' আমার 'তৃতীয় মত' কলামের যাত্রা শুরু। আমার পকেটে তখনো 'ইত্তেফাক' অফিসে বসে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে পাওয়া ফাউন্টেন পেনটি। ঢাকায় তখন বলপেন বেশ চালু হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি ফাউন্টেন পেন দিয়েই লিখি। 'তৃতীয় মত' লেখা শুরু করলাম শেখ মুজিবের দেয়া কলম দিয়ে। তিনি তখন দলের অসংখ্য নেতা ও কর্মীসহ জেলে। আমি তার কাছ থেকে পাওয়া কলম দিয়ে 'তৃতীয় মতের', লেখায় কখনো কখনো ছয়-দফার পক্ষে লিখতাম আর মনে মনে ভাবতাম, আহ্, লেখাটি যদি মুজিব ভাইয়ের চোখে পড়তো। বিস্ময়ের কথা; আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে আসার পর বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডির বাসায় বসে তিনি একদিন আমাকে বলেছেন, জেলে বসে তোমার 'তৃতীয় মত' কলমের কোনো কোনো লেখা আমি পড়েছি। ছয়-দফার পক্ষে বেশ জোরালো যুক্তি তুমি দিয়েছো। বিশেষ করে আমাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ভারতের এজেন্ট আখ্যা দিয়ে জেড. এ. সুলেরি 'পাকিস্তান টাইমস্' পত্রিকায় (সুলেরি তখন লাহোরের 'পাকিস্তান টাইমস্ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং 'মেন এন্ড ম্যাটার' নামে একটি নিয়মিত কলামও লিখতেন) যে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তার দাঁতভাঙ্গা জবাব তুমি দিয়েছো। সুলেরির মতো বিখ্যাত সম্পাদকের বিরুদ্ধে কলম ধরতে তুমি সাহসী হবে, আমি তা ভাবিনি। তোমাকে বেবীর (বেগম আখতার সোলায়মান) কাছ থেকে পাওয়া কলমটা দিয়ে কোনো ভুল করিনি।

বঙ্গবন্ধুর মুখে একথা শুনে সেদিন আমার মনে হয়েছিল, আমার সাংবাদিক জীবনে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু নেই।

এই কলমটিও আমি বেশি দিন রাখতে পারিনি। এটা হারাই সত্তরের সাধারণ নির্বাচনের সময়। এটা হারিয়ে মনে বড়ই দুঃখ পেয়েছিলাম। প্রথমতঃ কলমটি ছিল বঙ্গবন্ধুর দেয়া। দ্বিতীয়তঃ দেখতেও ছিল খুব সুন্দর। তখনকার পার্কার পেন।

বঙ্গবন্ধু আমাকে তৃতীয়-দফা কলম উপহার দেন তার আত্মজীবনীর ডিকটেসন নেয়ার সময়ে। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলজেরিয়ায় জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যাই আমরা দু'জন সম্পাদক। আমি এবং 'বাংলাদেশ অবজারভারের' তখনকার সম্পাদক ওবায়দুল হক সাহেব। আমাদের দু'জনকে হাত-খরচ হিসেবে দেয়া হয়েছিল ১০৬ ডলার করে। আলজিয়ার্সে পৌঁছে সঙ্গীসাথীরা সবাই শখের জিনিস কেনাকাটা করেছেন। আমি কিছু ফল, মিষ্টি 'মেলন' ছাড়া কিছুই কিনিনি। ছেলে অনুপমের অর্ডার ছিল, তার জন্য যেন একটা ভালো ট্রানজিষ্টার রেডিও অবশ্যই কিনে নিয়ে যাই। ঢাকায় ফেরার পথে বাহরাইনে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী প্লেন নামতেই সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন 'এয়ারপোর্টের

কাষ্টমস্‌ ফ্রি' দোকানে। আমিও নামলাম। ছেলের জন্য একটা রেডিও এবং টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনতেই ডলার ফুরিয়ে গেল। কারো কাছে বাড়তি ডলার নেই। সবাই জিনিস কিনছেন। ওবায়দুল হক সাহেব কিছুই কেনেননি। তার কাছ থেকে ডলার ধার নিলাম। তাতেও কিছু হল না। নিজের জন্য কিছুই কেনা হল না। প্লেনে গিয়ে উঠলাম। বঙ্গবন্ধুর গণসংযোগ অফিসার তোয়াব খান জানালেন, বঙ্গবন্ধু আমাকে তার কেবিনে যেতে বলেছেন।

বঙ্গবন্ধু তার কেবিনে সোফার উপর কাত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। একটু ঠাট্টার সুরে বললেন, খুব কেনাকাটা করলে বুঝি!

বললাম, একশ' ছ' ডলারে কি কেনাকাটা করা যায় বঙ্গবন্ধু?

বঙ্গবন্ধু বললেন, তোমরা যারা আমার সঙ্গে আছো, বিদেশে তাদের কিছুই কেনা উচিত নয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মানুষের কথা একবার ভাবো; আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের অবস্থা একবার ভেবে দেখো। আমার ইচ্ছে ছিল, হাসিনার ছেলে জয়ের জন্য কিছু একটা কিনবো, তাও কিনিনি।

ঃ ছেলে অনুপমের জন্য আমি একটা ট্রানজিষ্টার রেডিও কিনেছি। বঙ্গবন্ধুকে জানালাম।

বঙ্গবন্ধু আমার ডান হাতের কব্জির দিকে তাকালেন। বললেন, তোমার একটা রিষ্টওয়াচ কেনা উচিৎ ছিল। হাতের ঘড়ির অবস্থা তো দেখছি খুবই খারাপ।

একটু লজ্জা পেয়ে বললাম, এটাও আমার নয়। আমার এক আত্মীয়ের বহু পুরনো ঘড়ি। ধার করে নিয়ে এসেছি। আমার ঘড়িটা হঠাৎ ভেঙে গেছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর পার্সোনাল এসিষ্ট্যান্ট মোহাম্মদ হানিফকে ডাকলেন। হানিফ পরে ঢাকার মেয়র হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, প্লেন ছাড়তে আর দেরি কত?

হানিফ বলল, আর মিনিট পনর-বিশেক হবে।

ঃ রফিকুল্লাহ চৌধুরীকে (তখন প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী) বলো, গাফফারকে নিয়ে 'কাষ্টমস ফ্রি' দোকানে গিয়ে একটা রিস্টওয়াচ কিনতে।

আমি দারুণভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু হানিফের জবরদস্তির সঙ্গে পেরে উঠলাম না। সে এক রকম প্রায় ঠেলে বঙ্গবন্ধুর কেবিন থেকে আমাকে বাইরে নিয়ে এলো। বলল, চলুন গাফফার ভাই। রফিকুল্লাহ চৌধুরী তার সীটেই বসা আছেন।তার কাছে আপনাকে পৌছে দেই।

এয়ারপোর্টে ঘড়ির দোকানে পৌঁছে দেখি, বন্ধু এম আর আখতার মুকুলও সেখানে। তিনিও বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী সরকারী অফিসারদের টিমে ছিলেন। রফিকুল্লাহ চৌধুরী অনেক বাছাই করে একটি 'সুইস মেড ফেবার লিউবা' ঘড়ি পছন্দ করলেন। দাম ৪২ ডলার। ঘড়িটি সুন্দর। আমার পছন্দ হল না। কারণ ঘড়ির

চারপাশে গোল্ডেন কালার। আমি পুরুষের হাতে গোল্ডেন কালার মোটেই পছন্দ করি না। ছোটবেলা থেকে আমার একটা ধারণা, সোনালী রং শুধু মেয়েদের জন্য। কলেজে পড়ার সময়েই আমি সে জন্য সিলভার কালার ঘড়ি কিনেছি। সেদিন বাহরাইনে আরও ঘড়ি বাছাইয়ের সময় ছিল না। ঢাকার বিমান ছাড়ার ঘোষণা শোনা গেল। রফিকুল্লাহ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে আমার সহপাঠী ছিলেন। বললেন, 'কয়েকদিন হাতে পরলেই গোল্ডেন কালার তোমার গা সওয়া হয়ে যাবে।' বলে বেয়াল্লিশ ডলার দিয়ে ঘড়িটি কিনলেন।

ঘড়িটি তৎক্ষণাৎ হাতে পেলাম না। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ, এটা প্রথমে তার কাছে পৌঁছাতে হবে। রফিকুল্লাহ চৌধুরী তাই করলেন। বিমান যাত্রার বাকি সময়টুকু তিনি আর ঘড়ির কথা তুললেন না। ভাবলাম, আমাকে ঘড়িটি দেয়া সম্পর্কে তিনি মত বদলেছেন। মনে মনে ক্ষুণ্ন হলেও চুপ করে রইলাম। বঙ্গবন্ধু তার কেবিনে ওবায়দুল হক সাহেবকেও এ সময় ডেকে এনেছিলেন। বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা শুরু করলেন। বললেন, এই সমস্যা রাতারাতি দূর করা যাবে না। ম্যালথাস থিওরিতে যাই বলা হোক, প্রকৃতি আমাদের বাড়তি জনসংখ্যা ধ্বংস করে সমস্যার সমাধান করবে, এমন মির্মম ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা যায় না। জন্ম-শাসনের পরিকল্পনার সঙ্গে বাড়তি জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার চেষ্টা চালাতে হবে।

ওবায়দুল হক সাহেব বললেন, জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের দেশটাও বড় ছোট। এজন্য বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচাইতে ঘন বসতিপূর্ণ দেশ।

বঙ্গবন্ধু বললেন, একটা ভরসার কথা, বঙ্গোপসাগরে নতুন দ্বীপ উঠছে। পুরো দ্বীপ পানির উপরে মাথা তুললে তা বাংলাদেশের বর্তমান আয়তনের দেড়গুণ বড় হতে পারে।

আমি বললাম, ভারত ফারাক্কা নিয়ে যেভাবে খেলছে, তাতে এই দ্বীপ নিয়ে আবার কি খেলা শুরু করে, তা বলা যায় না।

বঙ্গবন্ধু বললেন, সবটাই নির্ভর করে সম্পর্কের উপর; ভারত তো পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক শত্রুতা সত্ত্বেও 'ইন্ডাজ বেসিন' নিয়ে চুক্তি করেছে। আমাদের সঙ্গে তো ভারতের এখন মিত্রতা। এই সম্পর্ক ধরে রাখা গেলে ফারাক্কার পানি এবং বঙ্গোপসাগরের নতুন দ্বীপ নিয়েও একটা সমঝোতায় আসা যাবে।

বললাম, ভারত আমাদের তুলনায় খুব বেশি বড় ও শক্তিশালী দেশ। এখানেই আমার ভয়। আমেরিকা কিভাবে কিউবাকে নিয়ে খেলছে, তাতো আমরা দেখতেই পাচ্ছি।

চা ও কেক এলো। আমিই বঙ্গবন্ধুর চা বানিয়ে দিলাম। বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্যের প্রতি

তার পার্সোনাল ফিজিসিয়ান ডাঃ নূরুল ইসলামের কড়া নজর। তার হুকুম, বঙ্গবন্ধুর চায়ে 'স্ট্রং লিকার' দেয়া যাবে না। বঙ্গবন্ধু সেই চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, এবার আলজিয়ার্সে ফিডেল ক্যাস্ট্রো আমাকে বলেছেন, আমেরিকা এত বড় এবং শক্তিশালী দেশ যে কিউবা সোস্যালিষ্ট দেশ হওয়া সত্ত্বেও ক্যাপিটালিষ্ট আমেরিকার সঙ্গে তাকে বন্ধুত্ব করে চলতে হবে। কিন্তু আমেরিকাই এই বন্ধুত্ব চায় না। চায় কিউবাকে ধ্বংস করতে। আপনাদের বাংলাদেশের একটা বড় সুবিধা এই যে, ভারত অনেক বড় দেশ হওয়া সত্ত্বেও সে এখন আপনাদের বন্ধু। সে বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চাইবে না; চাইবে নিজের আওতায় রাখতে। আপনাদের উচিৎ হবে, কৌশলে নিজেদের মর্যাদা এবং এই বন্ধুত্ব দুইই রক্ষা করে চলা। খুঁচিয়ে ভারতকে শত্রু বানানো উচিৎ হবে না।

বঙ্গবন্ধু একটু চুপ থেকে বললেন, আমি ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে একমত। আমার ধারণা, তোমরা যদি আমাকে আর কিছুদিন বাঁচতে দাও এবং দেশটা চালাতে দাও, তাহলে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একটা আলাপ আলোচনা করে ফারাক্কা সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করতে পারবো এবং ভবিষ্যতে বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ নিয়েও বড় সমস্যা দেখা দেবে না।

আলজেরিয়া থেকে ফিরে এসে ক'দিনের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় কাজের প্রচন্ড চাপের মধ্যেও বঙ্গবন্ধু আমাকে গণভবনে ডেকে পাঠান তার আত্মজীবনীর ডিকটেসন গ্রহণের জন্য। প্রথম দিনেই হাতে পেলাম ডিকটেসন নেয়ার জন্য 'গণভবন' এই কথাটি মুদ্রিত লেখার প্যাড। আর বিছানায় শুয়ে ডিকটেসন দেয়ার সময় বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে বঙ্গবন্ধু বের করলেন দু'টি প্যাকেট। একটিতে বাহরাইন এয়ারেপোর্ট কেনা হাতঘড়ি এবং আরেকটি প্যাকেটে একটি সুন্দর পার্কার কলম। কলম এবং ঘড়ি আমাকে হাতে তুলে দিয়ে বললেন, কলমটি তোমাকে দিলাম আমার আত্মজীবনীর ডিকটেসন নেয়ার জন্য। আর ঘড়িটি দিলাম আমাকে মনে রাখার জন্য।

দিনটা ছিল ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক সুন্দর দুপুর। বাইশ বছর আগের কথা। এখনো হাতের গোল্ডেন কালার ঘড়িটির দিকে তাকালে মনে হয়, বঙ্গবন্ধু গতকাল আমাকে কথাটি বলেছেন।

(ছাব্বিশ)

১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাস। তখন আমি সাময়িকভাবে কলকাতায় আস্তানা গেড়েছি। আমার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ। তার চিকিৎসা চলছে কলকাতার তখনকার

পিজি হাসপাতালে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উল্টোদিকেই হাসপাতালটি। একদিন সারা দুপুর হাসপাতালে স্ত্রীর বেডের পাশে কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে একটু মুক্ত বাতাসে ঘোরাঘুরির জন্য গড়ের মাঠের সবুজ ঘাসের উপর গিয়ে বসলাম। অদূরে রাস্তার উপর দিয়ে ঢং ঢং শব্দ করে ট্রাম গাড়ি ছুটছে। যাত্রী বোঝাই ট্রাম। হঠাৎ ইচ্ছে হল, ট্রামে চেপে ধর্মতলায় 'আনন্দবাজার' অফিসে চলে যাই। সেখানে সন্তোষ ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী আছেন। আছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গৌরকিশোর ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দি, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পাঠকপ্রিয় লেখক ও কবিরা। ভাবলাম, এদের কারো সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে এলে মনটা ভারমুক্ত হবে। এদের সকলের ঘরেই আমার অবারিত দ্বার।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। ময়দান থেকে বেরিয়ে ধর্মতলার একটা ট্রামে চেপে বললাম। কলকাতায় ট্রামেবাসে চাপার দুর্ভোগের কথা ভাবলে এখনো শিউরে উঠি। মনে হতো মানুষ নয়, একদল বলির পাঁঠাকে খাঁচাভর্তি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপনি চমৎকার ইস্ত্রি করা একটি শার্ট গায়ে দিয়ে ভীড় বোঝাই ট্রামে উঠলেন। নামার সময় দেখলেন, আপনার গায়ের জামাটি আর অক্ষত নেই। দেখে মনে হবে, এই মাত্র বুঝি কারো সঙ্গে মারদাঙ্গায় জামা ছিঁড়ে, জুতো হারিয়ে আপনার এই অবস্থা। ১৯৭৪ সালের কলকাতার ট্রামবাসের এই অবস্থা ১৯৯৩ সালে দেখেছি ঢাকার বাসে। আমার কপাল ভালো; ১৯৭৪ সালে আমাকে কলকাতার ট্রামে বাসে চড়তে হয়েছিল; ১৯৯৩ সালে ঢাকার বাসে উঠতে হয়নি।

১৯৭৪ সালের সেই জানুয়ারী মাসের সন্ধ্যায় কলকাতায় ট্রামে চাপলাম ধর্মতলায় যাওয়ার জন্য। অসম্ভব ভীড়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ায় স্ট্যালিনগ্রাডে জার্মান ও রুশ সৈন্যের মধ্যে নাকি প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য যুদ্ধ হয়েছিল। কলকাতার ট্রামে শুধু পাদানিতে পা রাখার জন্য যাত্রীদের সেইভাবে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। প্রতিদিনই এই যুদ্ধ হয়। আমি তখন প্রৌঢ়ত্বেও পা দেইনি। সুতরাং যুদ্ধ করেই ট্রামে চাপলাম। দেখি, কয়েকজন তরুণীযাত্রী পুরুষযাত্রীদের প্রচন্ড চাপের মধ্যে পিস্ট হয়েও দরোজার কাছে 'রড' ধরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। মনে সাহস পেলাম। মেয়েরা যা পারছে, আমি পুরুষ হয়ে তা পারবোনা? সেদিন আমার গায়ে ছিল রাজশাহীর সিল্কের পাঞ্জাবি। সেটার অবস্থা কি হয়েছে, তা নিয়ে চিন্তা করলাম না। শুধু দু'পায়ে ঠায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলাম। এই ভীড়, যুদ্ধ, ঠাসাঠাসির মধ্যেও রসিক বাঙালির নানা রকম মন্তব্য। যেমন একজন পুরুষ বলছে, ও দিদি, একটু সরে দাঁড়ান না। লোকে ভাববে, আমি বুঝি ইচ্ছে করে আপনার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছি!' অপরদিক থেকে একটি নারী কন্ঠ, 'ও ভাই, আপনিতো আমার দাদার বয়সী, হাতটা একটু সরান না।' সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ কন্ঠের জবাব,

'ওঠা আর কারো হাত হবে। আমার নয়। আমি তো ঝাকুনি সামলানোর জন্য রড ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি।' আরেকটি মিহি নারীকণ্ঠ প্রতিবাদ জানাল, 'ওটা রড নয়, আপনি আমার বাহু চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রাম ভর্তি হাসির হুল্লোড়। এটাই ছিল তখন প্রতিদিনের কলকাতার কড়চা।

ট্রামে চড়ার জন্য যেমন যুদ্ধ করেছিলাম, ধর্মতলার মোড়ে ট্রাম থেকে নামতেও তেমনি যুদ্ধ করতে হল। কিন্তু ফুটপাথে উঠে দম ছেড়ে পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিতেই বুকটা ছাৎ করে উঠলো। বুক পকেটে আমার মানিব্যাগটি নেই। তেমন পয়সাকড়ি ছিল না ব্যাগটিতে। সেজন্য দুঃখ হল না। কিন্তু মানিব্যাগের সঙ্গে বুক পকেটে রাখা দামি পার্কার পেনটিও উধাও। মনটা ভেঙে পড়লো। বঙ্গবন্ধুর দেওয়া প্রথম ও দ্বিতীয় কলম হারিয়েছি। তৃতীয় কলমটাও হারালাম। তার আত্মজীবনী লেখার কাজে সাহায্য করার জন্য কলমটা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। এখন দেশে ফিরে তার কাছে কী জবাব দেব?

কলমটা হারিয়ে হাতের গোল্ডেন কালার ঘড়িটার উপর মায়া বাড়লো। ঠিক করলাম, এই ঘড়ি হারানো চলবে না। ঘড়িটাও তো বঙ্গবন্ধুর দেওয়া। বঙ্গবন্ধু তখনো বেঁচে আছেন। তখনো বুঝতে পারিনি, অদূর ভবিষ্যতেই এই ঘড়ি আমার কাছে কত মহামূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন হবে! সুতরাং ঢাকায় ফিরে জাপানের তখনকার রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে একটি দামী 'সেকো' হাতঘড়ি উপহার পেতেই ঠিক করলাম, হাতের সোনালী রঙের ঘড়িটি ছেলে অনুপমকে উপহার দিয়ে রূপালী রঙের জাপানী ঘড়িটি নিজের হাতে বাঁধবো। কিন্তু গোল বাধালো আমার ছেলে। সে কিছুতেই পুরনো ঘড়ি নেবে না। ওই সিলভার কালার নতুন ঘড়ি নেবে। অনেক বুঝিয়েও তাকে শান্ত করা গেল না। সে তখন কিশোর। জাপানী ঘড়িটি তার কব্জিতে বেঢপ বড় দেখায়। তবু সেটাই তাকে দিতে হল। বঙ্গবন্ধুর দেওয়া গোল্ডেন কালারের 'ফেবার লিউবা' ঘড়ি আমার হাতেই রয়ে গেল।

১৯৭৫ সালের মধ্য-আগস্টের এক সকালে লন্ডনে ঘুম থেকে সহসা জেগে উঠে যখন জীবনের সেই চরম দুঃসংবাদটি শুনলাম, বঙ্গবন্ধু আর নেই, তখন হতচেতন অবস্থাতেও হাতঘড়িটির দিকে তাকিয়েছি। নিজের ছেলের কাছে মনে মনে কৃতজ্ঞতাবোধ করেছি। মনে হয়েছে, ভাগ্যিস, সেদিন এই হাতঘড়িটি সে নেয়নি, তাহলে এই শেষ সম্বল, শেষ স্মৃতিটুকুও হারাতাম।

বঙ্গবন্ধুর দেওয়া এই ঘড়িটি এখনো আমার হাতে আছে। তার 'স্টীল ব্যান্ড' নেই, 'লেদার ব্যান্ড' নিয়েছি; আগের কাঁচ নেই, কাঁচও বদলাতে হয়েছে; তবু ঘড়িটি আছে। গত বাইশ বছরে এই ঘড়িটি মেরামত করতে যত টাকা খরচ করেছি, তা দিয়ে তিন-চারটি নতুন দামি ঘড়ি কিনতে পারতাম। কিন্তু নতুন ঘড়ি কেনার আদৌ

ইচ্ছে হয়নি। আমার এক মেয়ে চাকরি পেয়ে বলেছে, আব্বা, তোমার হাতের এই ঘড়িটি 'এন্টিকস' হয়ে গেছে। ঘড়িটি বদলাও। আমি না হয় তোমাকে একটা ঘড়ি কিনে দেই।' তাকে এই ঘড়ির ইতিহাস বলতেই সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আর কথা বলেনি।

একবার লন্ডনে হাউস অব কমন্স-এ গেছি ডেভিড ওয়েনের সাক্ষাৎকার নিতে। তিনি তখন সোস্যাল ডেমোক্রাট দলের নেতা এবং পার্লামেন্ট সদস্য। আগে লেবার মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। বৃটিশ রাজনীতিতে তখনো তার বেশ প্রভাব। ঘন্টাখানেক ধরে তার সাক্ষাৎকার টুকলাম নোট বইয়ে। লেখার সময় মাঝে মাঝে হাতঘড়ি খুলে রাখা আমার অভ্যাস। সেদিনও রেখেছিলাম। সাক্ষাৎকার নেওয়া শেষে লম্বা করিডোর পেরিয়ে হাউস অব কমন্স-এর একটা গেটে এসে দাঁড়ালাম। ডেভিড ওয়েনের কক্ষ থেকে গেট সিকি মাইলেরও বেশি হবে। ডেভিড ওয়েনও বাইরে যাবেন। সুতরাং আমার পেছনে পেছনেই আসছিলেন। হঠাৎ আমার নজরে পড়লো, হাতে ঘড়ি নেই। সেটি ডেভিড ওয়েনের ঘরে টেবিলের উপর রেখে এসেছি।

মাথাটা বোঁ করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম। ডেভিড ওয়েনের কাছে ছুটে গেলাম। সব দ্বিধা-সংকোচ ভুলে সোজাসুজি বললাম, স্যার, আপনার ঘরে কি আবার যেতে পারি?

ডেভিড ওয়েন বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ কেন?

ঃ আমার হাতঘড়িটি আপনার টেবিলে রেখে এসেছি।

ডেভিড ওয়েন বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওই ঘড়িতে কেউ হাত দেবে না। আপনার ঠিকানা দিন। আমার সেক্রেটারি কাল সকালেই ফার্স্টক্লাশ মেলে আপনাকে পোস্ট করে দেবে।

কাতর কণ্ঠে বললাম, ঘড়িটা রেখে আমি যেতে পারি না স্যার। এই ঘড়ির একটা ইতিহাস আছে।

ডেভিড ওয়েন সম্ভবত একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। বললেন, 'আই য়্যাম ইন এ হারি।' নইলে এখনই আপনাকে আবার অফিসে নিয়ে যেতাম। ঘড়ির ইতিহাস? কি ইতিহাস সেটা?

বললাম, এই ঘড়ি আমাকে দিয়েছিলেন শেখ মুজিব। এটাই আমার কাছে তার শেষ স্মৃতিচিহ্ন।

ডেভিড ওয়েন অস্ফুষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মাই গড্!' শেখ মুজিব! আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি দাঁড়ান। আমি গিয়ে আপনার ঘড়ি নিয়ে আসছি।

সেই সিকি মাইল পথ বৃটেনের কিছুদিন আগের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় দৌড়ে পার

হলেন। আবার যখন ফিরে এলেন, তখন তার হাতে সেই ঘড়ি। নিজে আমার কব্জিতে ঘড়িটি বেঁধে দিয়ে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, এটা আমার টেবিলে এক রাতের জন্যও রেখে যাওয়া আপনার উচিত হতো না।

এই ঘড়ি নিয়ে আরও অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে আমায়। বছর দুই আগে গেছি নিউইয়র্কে। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়ার পালা চুকিয়ে লন্ডনে ফেরার আগে বিশ্রাম নিচ্ছি আমার বড় ভাইয়ের ছেলে মাহমুদ রেজার বাসায়। সে তার স্ত্রী আর শিশু পুত্র নিয়ে থাকে এস্টোরিয়ার এক বাড়িতে। এই বাড়িতেই একদিন হাত থেকে পড়ে যে পাতলা 'রডের' সঙ্গে ঘড়ির ব্যান্ড বাধা থাকে, সেই 'রড' ভেঙ্গে গেল। মাহমুদ বলল, আমাদের ঘরের কাছেই জ্যাকসন হাইট শপিং সেন্টার। সেখানে গিয়ে ঘড়িটি ঠিক করে আনা যাবে।

সেদিন বিকেলেই তার সঙ্গে জ্যাকসন হাইটে গেলাম। অধিকাংশই ইন্ডিয়ান দোকান। বাঙালি ও পাকিস্তানীদেরও দোকান আছে। বাঙালিদের 'মেঘনা গ্রোসারির' সাইনবোর্ড দেখলাম বাংলায়। আরও কয়েকটি দোকানে বাংলায় সাইনবোর্ড। মনটা আনন্দে, গর্বে ভরে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম, আজ যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন। তাহলে দেশে ফিরে তাকে বলতে পারতাম, আপনার স্বপ্ন সফল হয়েছে। সোনার বাংলার সোনালী আভা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

একটা গুজরাটি ঘড়ির দোকানে মাহমুদ আমাকে নিয়ে গেল। গুজরাটি যুবক আমার ঘড়িটি দেখেই হেসে উঠলো। বলল, এই এন্টিকসের স্পেয়ার পার্টস সারা আমেরিকায় পাবেন না। এখানে বছর বছর সব জিনিসের মডেল বদলায়। ওটা সারাতে যা লাগবে তা দিয়ে একটা নতুন ঘড়ি কিনে নিয়ে যান।

দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। আরো কয়েকটি ঘড়ির দোকান ঘুরে একই জবাব পেলাম। মাহমুদ আমাকে বিমর্ষভাবে হাঁটতে দেখে বলল, চাচা, বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ঘড়িটা যখন ফেলবেন না, তখন বাক্সে তুলে রাখুন। ওটা সম্ভবতঃ আর ব্যবহার করতে পারবেন না।

তার কথার জবাব দিলাম না। মনে হল, তার কথাই হয়তো ঠিক।

নিউইয়র্কে থাকতেই মাহমুদ একটা নতুন ঘড়ি কিনে নিয়ে এলো। বলল, আপাতত এটা হাতে বেঁধে সময় দেখার কাজ চালান। পুরনো ঘড়িটা লন্ডনে গিয়ে বাক্সে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তুলে রাখতে পারবেন।

কিন্তু মাহমুদের দেওয়া ঘড়িটা হাতে পরতে পারলাম না। কেন জানি মন সায় দিল না। লন্ডনে ফিরে এজওয়ারে আমার পুরনো ঘড়ি মেরামতের দোকানে গেলাম। দোকানী বলল, আমরা চেষ্টা করলে এই ঘড়ির 'স্পেয়ার পার্টস' জোগার করে ঘড়িটা সারিয়ে দিতে পারবো। আপনার খরচ একটু বেশি পড়বে। মনে

রাখবেন, ইংল্যান্ড এখনো আমেরিকার মতো অতো 'আল্ট্রামডার্ন' দেশ হয়ে যায়নি। এদেশে 'কনজারভেটিজম' এখনো বেঁচে আছে।

আমি 'কনজারভেটিভ' নই। কিন্তু সেদিন 'কনজারভেটিজমের' জয়ধ্বনি দিলাম। দোকানী সত্যি ঘড়িটা সারিয়ে দিয়েছেন। আমার হাতে এখনো শোভা পাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া সেই ঘড়ি। এই ঘড়িটির দিকে তাকালে আমার অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে নানারকম স্মৃতিকথা। আমাকে ডায়েরির পাতা হাতড়াতে হয় না।

১৯৭৩ সালের শেষদিকের একটি ঘটনা। বঙ্গবন্ধু পুরনো গণভবনের দোতলায় বিরাট কনফারেন্স হলটাতে বসে আছেন। তাকে ঘিরে রয়েছেন কাদের সিদ্দিকি, তখনকার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বদরুন্নেসা আহমদ এবং আরও অনেকে। কাদের সিদ্দিকির হাতে অনেকগুলো ছবির প্রিন্ট। সবই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাদের সিদ্দিকি এবং তার কাদেরিয়া বাহিনীর লোকজনের। কাদের সিদ্দিকি প্রত্যেকটি ছবির উল্টো সাদা দিক বঙ্গবন্ধুর সামনে রাখছেন, আর বঙ্গবন্ধু তাতে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন।

অটোগ্রাফ দেওয়া শেষ করে বঙ্গবন্ধু হঠাৎ বলে উঠলেন, আমি একটা কবিতা লিখেছি। কবিতা হয়তো হয়নি। গবিতাতো হয়েছে। তোমরা সবাই শোনো।

বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে পড়া শুরু করলেন, "আমার বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে/ বাংলার ভদ্রলোকেরা চুরি করে আর গোপনে বোচকা বাঁধে।"

আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, কবিতাটি আমি তোমাদের কাছে রেখে যাব। তাহলে আমার মৃত্যুর পরেও বাংলার দুঃখী মানুষ জানবে, আমি তাদের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোকদের চুরি আর দুর্নীতির জন্য কিছুই করতে পারছিলাম না।

সকলেই হাত বাড়ালেন কবিতাটির জন্য। কাদের সিদ্দিকি এবং বদরুন্নেসাও। আমিও সেদিন সেখানে উপস্থিত। বঙ্গবন্ধু হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, না, তোমাদের কাউকে নয়, এই কবিতাটি আমি গাফ্‌ফার চৌধুরীর কাছে রেখে যাচ্ছি। আমি যেদিন এই পৃথিবীতে থাকবো না, সেদিন গাফ্‌ফার বাংলার মানুষের কাছে সাক্ষ্য দেবে, আমি তাদের ভালোবেসেছিলাম। তাদের দুঃখ ঘুচাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের ভদ্রলোকেরা আমার চেষ্টা সফল হওয়ার পথে পদে পদে বাধা দিয়েছে।

বলেই কবিতাটির নীচে তিনি বড় বড় অক্ষরে সই করলেন। তারিখ বসালেন। তারপর সেটি আমার হাতে তুলে দিলেন।

(সাতাশ)

শুরু করেছিলাম পঞ্চাশের দশকের 'দৈনিক মিল্লাত' ও তার সম্পাদক মোতাহার হোসেন সিদ্দিকীর কথা বলা। কিন্তু কলম আমার অজ্ঞাতেই চলে গেছে সেই দশকে ও পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া কলম ও ঘড়ির কাহিনীতে। পঞ্চাশের দশকের কথাতেই আবার ফিরে যাই।

১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকের কথা। আমি তখনো 'মিল্লাতে' চাকরি করছি। সামনে বি. এ. সাবসিডিয়ারি সাবজেক্ট দুটোর পরীক্ষা। থাকি ফজলুল হক হলের টিই ৫ (টপ ইস্ট ফাইভ) রুমে। আমার রুমের একটা কি দুটো রুম পরেই থাকেন নেয়ামুল বশির। সাইয়িদ আতিকুল্লাহও এসে থাকেন মাঝে মাঝে একটা রুমে। বদরুল হাসানেরও মাঝে মাঝে আগমন ঘটে। উল্টো দিকে ওয়েস্টে দোতলায় থাকেন খোরশেদ আনোয়ার (পরবর্তীকালে মন্ত্রী)। এরা সকলেই তখন ছাত্র। নূরুল মোমেন ছিলেন আমাদের হাউস টিউটর। ড. মির্জা নূরুল হুদা ছিলেন প্রথম দিকে আমাদের প্রোভোস্ট। তারপর প্রোভোস্ট হয়ে আসেন ড. মযহারুল হক। দু'জনেই ছিলেন তখনকার খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ। ড. হুদা পরে প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং গভর্ণরও হয়েছিলেন।

এখন ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে, স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কত লোক ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েছেন, এখনো হচ্ছেন, যাদের অনেকের নামধাম, গুণগরিমা ভালোভাবে জানি না এবং বলতেও পারবো না। আর সে যুগে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো বহু ভাষাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক এবং দেশবিদেশ-খ্যাত পণ্ডিতের ভাগ্যে এই ভাইস-চ্যান্সেলরের পদটি জোটেনি। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই (১৯৫৪) তখন তিনি বাংলা বিভাগের প্রধান। তবে অবসর নিতে যাচ্ছেন এবং তার স্থলে বিভাগীয় প্রধান হয়ে আসছেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ভর্তির ফরমেও অনুমোদনের স্বাক্ষরটি দিয়েছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-ই। কি সাদাসিধে জীবন-যাপন ছিল এই বিখ্যাত পণ্ডিত এবং জ্ঞানীর, তা ভাবতেও এখন অবাক লাগে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সাধারণ শিক্ষক গাড়ি হাঁকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন; আর পঞ্চাশের দশকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে দেখেছি পুরানো ঢাকার বেগমবাজার থেকে বাসে চেপে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়ে এসে নামতে। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই আজিমপুর থেকে আসতেন সাইকেলে চেপে। ইংরেজী বিভাগের ড. সাজ্জাদ হোসেন আসতেন তার নাজিমুদ্দিন রোডের বাসা থেকে ছাতি মাথায় হেঁটে।

সন্দেহ নেই, আমাদের সমাজের উঁচু তলায় সেই আইয়ুবী জমানা থেকেই প্রাচুর্য্যের ছোঁয়াচ লেগেছিল। সেই জোয়ারের ভাগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককুলও। তাতে খুশি হওয়া ছাড়া দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই । দুঃখ পেয়েছি, সে যুগের প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সমাজে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হতে দেখে। ড. জেনকিনস যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ থেকে অবসর নেন, তখন এই পদটি সম্ভবতঃ দেয়া হয়েছিল বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে। অথচ এই পদটি পাওয়ার জন্য যিনি ছিলেন সবচাইতে যোগ্য এবং প্রকৃত দাবিদার— সেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে এই পদটি দেয়া হয়নি। ইংরেজ আমলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নির্বাচনে যোগ্যতা, মেধা, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাকে মানদণ্ড করা হতো; পাকিস্তানী জমানায়, বিশেষ করে আইয়ুব- মোনায়েম আমলে এই মানদণ্ড বদলে ফেলা হয়; শুরু হয় দলবাজি। বিএনপি সরকারের শাসনামলে এই নির্লজ্জ দলতন্ত্র সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, ছিলেন মনীষী। তাঁর দুর্ভাগ্য, তিনি বাংলাদেশে এবং বাঙালি মুসলমান সমাজে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি যদি লণ্ডনে বা প্যারিসে ইংরেজ বা ফরাসী হয়ে জন্মাতেন, কিংবা ভারত ভাগ হওয়ার পর কলকাতাতেও থেকে যেতেন, তাহলে আজ তার স্ট্যাচু শোভা পেতো লণ্ডন, প্যারিস কিংবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে এবং তার সম্পর্কে বের হতো নানা রকম গবেষণার বই।

এই জ্ঞান-তাপসের সঙ্গে ঢাকায় একদিনের বাস-যাত্রার অভিজ্ঞতার কথা বলি। কি এক কাজে চকবাজরে গিয়েছিলাম। বাসে ফজলুল হক হলে ফিরে আসছি। যাত্রীদের ভিড়ে দমবদ্ধ হয়ে আসার উপক্রম। হঠাৎ দেখি, সেই ভীড়ে ড. শহীদুল্লাহ্ বাসের 'রড' ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। বসার জায়গা পাননি। এক হাতে 'রড' ধরে আছেন, অন্য হাতে বিরাট ব্যাগ— যাতে তার বইপত্র, নোট ইত্যাদি ঠাসা। আমিও 'রড' ধরে দাঁড়ানো ছিলাম। ভীড় ঠেলে কোনরকমে তার কাছাকাছি হলাম। এক হাতে ভারী ব্যাগ, অন্য হাতে 'রড' ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে তার কষ্ট হচ্ছিল। বললাম, স্যার, ব্যাগটা আমার হাতে দিন।

তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

ঃ হলে ফিরে যাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের মোড়ে (তখন বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের অর্ধাংশ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-ভবন) একই স্টপেজে আমরা নামবো।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ, আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তোমার হাতে ব্যাগ দেবো না।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন দেবেন না স্যার?

তিনি বললেন, দেব না দুটো কারণে। প্রথম কারণ, আমি চাই না, কেউ আমাকে বুড়ো ভেবে দয়া দেখাক। দ্বিতীয় কারণ, আজ না হয় তুমি আমার ব্যাগ টানলে। আগামীকাল কে টানবে? পরশু? আমাকে তো রোজই বাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করতে হয়।

আমি অনুনয় করে বললাম, অন্ততঃ বাস থেকে নামার সময় ব্যাগটা আমার হাতে দিন স্যার। নইলে আপনার কষ্ট হবে।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ মৃদু হেসে বললেন, না, কষ্ট হবে না। তুমি একটু অপেক্ষা কর। তাহলেই বুঝবে, কেন আমার কষ্ট হবে না।

বাসটি তখনকার রেলক্রসিং পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কলা-ভবনের গেটের সামনে আসতেই ছোকরা কণ্ডাক্টর চেঁচিয়ে উঠলো, 'বুড্ডা আদমি, একদম রোখকে।' (বুড়ো মানুষ। একদম থামাও)।

বাস থেকে নেমে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে আরেকবার সালাম দিলাম। তিনি সালাম গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। আমি উল্টো দিকে ফজলুল হক হলে। মনে মনে ভাবলাম, বাসের এই ছোকরা কণ্ডাক্টাররা যদি জানতো, কাকে তারা রোজ বুড্ডা আদমি বলে চেঁচিয়ে বাস থেকে নামায়, তাহলে? অনেক পরে, ডঃ শহীদুল্লাহ্ যখন মারা গেলেন, তখন ভেবেছি, দেশের গোটা সমাজপতিরা, এলিট ক্লাশই যেখানে ড. শহীদুল্লাহ্‌র মণীষা ও পাণ্ডিত্যকে চিনতে পারেনি, সম্মান দিতে পারেনি , সেখানে ছোকরা বাস কণ্ডাক্টারদের দোষ দিয়ে লাভ কি? আমাদের সমাজে গাছের চাইতে যে আগাছার দাম বেশি, এটাতো কেবল আজকের সত্য নয়। বর্তমানে এ আগাছার কদর আরো বেড়েছে এই যা!

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো তেজী মানুষও। বিদ্যাসাগর তখনকার ইংরেজ লাট সাহেবের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। লাট সাহেব বলেছিলেন, "আমার সঙ্গে আবার দেখা করতে আসার সময় আপনি চটি জুতোটা পাল্টে আসবেন।" ঈশ্বরচন্দ্র সারাজীবন চটি জুতো পায়ে দিয়েছেন। তিনি যে ধরনের চটি জুতো পায়ে দিতেন, তার নাম এখনো বিদ্যাসাগর চটি। ইংরেজ লাট সাহেবের কথার জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমি দুঃখিত। চটি জুতো পাল্টাতে হলে আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে আসা হবে না।' তিনি সত্যি লাট সাহেবের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তার সঙ্গে দেখা করতে যাননি।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল হিসেবে ঢাকা সফরে এসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ যখন ঘোষণা করেন, মুসলিম দেশ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, তখন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র উপর

সরকারী চাপ প্রয়োগ করা হয়, তিনি যাতে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ড. শহীদুল্লাহ্ দৃঢ়ভাবে তাতে অসম্মতি জানান এবং ঘোষণা করেন, 'উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে একমাত্র যুক্তি যদি হয়, উর্দু ইসলামী ভাষা, তাহলে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করতে আপত্তি কোথায়?আরবীই হচ্ছে প্রকৃত ইসলামী ভাষা এবং পবিত্র কোরআনের ভাষা।'

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে তার মত বদলাতে প্রত্যক্ষ চাপ ব্যর্থ হওয়াতে এরপর শুরু হয় পরোক্ষ চাপ। তখনকার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান। আপনার যদি ভবিষ্যতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে বাংলা ভাষা নিয়ে বেশি মাতামাতি করবেন না।'

ড. শহীদুল্লাহ্ মৃদু হেসে জবাব দিয়েছেন, 'আমার সারাজীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় কেটেছে। বাকি জীবনটাও কাটবে বলে বিশ্বাস করি। আমার এই সারাজীবনের সাধনা তুচ্ছ একটা পদের জন্য আমি ব্যর্থ হতে দেবো আপনি ভাবছেন? তার চাইতে আমি একটি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক হয়ে বাকি জীবন কাটাবো, তা কি ভালো নয়?'

ফজলুর রহমান আর কথা বলতে পারেননি। ড. শহীদুল্লাহ্ পরবর্তীকালে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হননি। হওয়ার জন্য চেষ্টা-তদ্বিরও করেননি। কিন্তু ফজলুর রহমানের নামে তার মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসের একটি খণ্ড উৎসর্গ করা হয়েছে। কি বিচিত্র এই বঙ্গভূমি!·আর কত রঙ্গভরা তার মানুষের চরিত্র।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একজন খাঁটি ধার্মিক মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তার এই ধার্মিকতা কখনো তার জাতীয়তাকে আড়াল করতে পারেনি। বাঙালি জাতীয়তার তিনি ছিলেন একজন আদি প্রবক্তা। এমন কি বার্মিজ মুসলমানদের মতো বাঙালি মুসলমানেরও বাংলায় নাম রাখার পক্ষে তিনি অকাট্য যুক্তি দেখিয়েছেন। আরবী, ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাই ছিল তার সবচাইতে প্রিয় ভাষা। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষকতার জীবন থেকে তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন, তখন (১৯৫৪)ফজলুল হক হলে তার একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল; আর এই সংবর্ধনা সভার নেপথ্য আয়োজকদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। সে কথা ভেবে আমি এখনো গর্ববোধ করি।

১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে ক্লাশ শেষ করে রোজই আমাকে ছুটতে হতো 'মিল্লাত' অফিসে। বাসে চেপে সদরঘাটে গিয়ে নামতাম। আবার বাসে চেপে ফিরে আসতাম রমনায়। এই সময় হঠাৎ একদিন বিকেলে অফিসে বসে অনুভব করলাম, আমার শরীরটা ঝিমঝিম করছে। কেমন একটা

অবসাদে সারা শরীর নেতিয়ে পড়ছে। টেবিলের পাশে ইজিচেয়ারে শুয়ে রইলাম। ঘন্টাখানেক পর এই অবসাদ বোধ কেটে গিয়ে সুস্থ হয়ে উঠলাম। ভাবলাম এটা শরীরের সাময়িক অবসাদ। কিছু ভিটামিন খেতে হবে। পরদিন একই সময়ে আবার শরীরে রাজ্যের অবসাদ নেমে এলো এবং তারপর থেকে এটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

সপ্তাহখানেক ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করলাম। ভাবলাম, দেখি কি হয়? সারাদিন যে মানুষটি সুস্থ থাকি, বিকেল হলেই ঘন্টাখানেক বা ঘন্টা দুইয়ের জন্য কেন নেতিয়ে পড়ি? ইউনিভার্সিটির ডাক্তারের কাছে যেতে ইচ্ছে হল না। তখন এক বুড়ো ডাক্তার ছিলেন ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য। ঘোড়ার গাড়িতে চেপে তার ডিসপেনসারিতে আসতেন। রোগী না দেখেই অনেক সময় প্রেসক্রিপসন লিখে দিতেন। পেটে ব্যথা, মাথা ধরা, জ্বর সবকিছুর জন্য এক ওষুধ। শিশি ভর্তি লাল অথবা সবুজ মিক্সচার। দাগ মিলিয়ে খেতে হতো। কপালগুণে অসুখ সারতো, ওষুধের গুণে নয়। সুতরাং এই ডাক্তারের কাছে গিয়ে লাল-সবুজ রঙের মিক্সচার খেয়ে ভালো হব, তা বিশ্বাস হল না।

'মিল্লাত' অফিসেই একদিন বিকেলে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কম্পোজ সেকশনের সেই সুধাময়, যে আমাকে মাঝে মাঝে তাদের রিভারভিউ বোট-হোটেলে নিয়ে ভাত খাওয়াতো, সে এসে দেখলো, আমি ইজিচেয়ারে মরার মতো পড়ে আছি। সে আমার মাথায় হাত দিয়ে আঁৎকে উঠলো। বলল, 'বাবু, আপনার গা যে পুড়ে যাচ্ছে। অনেক জ্বর শরীরে।'

সে দিন আর দু'ঘন্টায় ভালো হলাম না। দু'তিনবার বমি হল। সম্পাদক মোতাহার ভাই অফিসে এসে আমার অবস্থা দেখলেন। সদরঘাট থেকে ট্যাকসি আনালেন আমাকে ফজলুল হক হলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। হলে পৌঁছে সোজা বিছানায়। সারা রাত জ্বরে কাতরালাম। বন্ধুরা এসে ঠাণ্ডা পানিতে মাথা ধোয়ালেন। তারপর ডাক্তার ডাকা হল। ভাবলাম, ঘোড়ার গাড়িতে চেপে সেই বুড়ো ডাক্তার আসবেন। শিশি ভর্তি লাল অথবা সবুজ ওষুধ দেবেন। তাতে এই জ্বর সারবে ভরসা হয় না। সম্ভবতঃ বাইরের ডাক্তার ডাকতে হবে। কিন্তু বাইরে চিকিৎসা করানোর মতো টাকা তো আমার হাতে নেই।

পরদিন সকালে জ্বরটা একটু কম ছিল। দশটার দিকে ডাক্তার এলেন। তাকে দেখে আমি চমকে গেলাম। তিনি সেই বুড়ো ডাক্তার নন। বয়সে একেবারে তরুণ। কালো শক্ত সুঠাম চেহারা। ঘোড়ার গাড়িতেও তিনি আসেননি। একটা সাইকেলে চেপে এসেছেন। বললেন, আমি আপনাদের ইউনিভার্সিটির নতুন ডাক্তার।

ঃ আগের বুড়ো ডাক্তার কোথায় গেলেন?

ঃ তিনি অবসর নিয়েছেন। আমি তার জায়গায় এসেছি।

খুশি হয়ে উঠলাম। এবার নিশ্চয়ই ভালো চিকিৎসা পাব। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার রোগের বিবরণ জেনে নিলেন। নাড়ি, জিহবা, চোখ ও বুক পরীক্ষা করলেন। বললেন, আপনার ম্যালেরিয়া হয়েছে। আমি বেশ ক'জন রোগী পেয়েছি আপনার মতো। কুইনাইন জাতীয় ওষুধ খাওয়ার পর তারা ভালো হয়েছে। আপনাকে আমি নোভাকিন ট্যাবলেট দেব। আমাদের ডিসপেনসারিতে নেই। বাজার থেকে আপনাকে কিনে খেতে হবে। খুব দামি ওষুধ নয়।

ওষুধ কিনে খেতে রাজি হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, পথ্য কি খাবো? আগের ডাক্তার তো কিছু হলেই ভাত খাওয়া বন্ধ করে কেবল দুধ-বার্লির ব্যবস্থা দিতেন।

নতুন ডাক্তার হাসলেন। বললেন, আধুনিক চিকিৎসায় ওসব পথ্যটথ্যের বালাই নেই। না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বেন। রোগ সারবে না। সুতরাং ভাত-মাছ সবই খাবেন। তাতে শক্তি পাবেন। তবে পরিমিত খাবেন।

নতুন ডাক্তারকে ডাক্তার বলে মনে হল না। মনে হল বন্ধু। আমার চাইতে বয়সে দু'চার বছরের বড় হবেন। বললেন, তার বাড়ি ছিল চব্বিশ পরগণায়। এখন ঢাকাতেই থাকেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে এই চাকরিতে ঢুকেছেন।

আমার বিছানার পাশে বসে তিনি অনেকক্ষণ বন্ধুর মতো গল্প করলেন। বললেন, 'আমার নাম মোহাম্মদ মূর্তজা। ডাক্তার মূর্তজা। ওষুধ খাওয়ার পর কেমন থাকেন জানাবেন।'

একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী ডাঃ মোহাম্মদ মূর্তজার সঙ্গে এভাবেই আমার প্রথম পরিচয়, যা পরে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল।

(আটাশ)

ডা. মোহাম্মদ মূর্তজার কথা মনে হলেই আমার চোখের সামনে একজন শক্ত সুঠাম আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে। কালো চেহারা। লম্বা ছিলেন না। কিন্তু স্বাস্থ্যে ভরপুর শরীর। সেই পঞ্চাশের দশকে তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক, তখন বিয়ে থা করেননি। থাকতেন আজিমপুরের পুরনো গোরস্থানের কাছে আজিমপুর কলোনির একটি ফ্লাটে।

মূর্তজার পৈত্রিক বাড়ি পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলায়। ছেলেবেলা তার

চরম দারিদ্র্য আর অবহেলার মধ্যে কেটেছে। আমার ধারণা, শৈশব জীবনের এ তিক্ততাই তাকে পরবর্তী জীবনে গোঁড়া এবং অন্ধ মাওবাদী করে তুলেছিল। তার বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর প্রথম স্ত্রীর সন্তান মূর্তজাকে অত্যন্ত অবহেলা করতেন। লেখাপড়ার খরচ দিতে চাইতেন না। মূর্তজা নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছেন। আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব পাকা হওয়ার পর একদিন নিজের কথা বলতে গিয়ে কাতর কণ্ঠে বলেছেন, জানেন গাফ্ফার, মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় কলেজের বেতন দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে আমাকে নিজের শরীরের রক্ত বেচতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন ছাত্র এবং তিনি যখন আমার ডাক্তার, তখনই তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠেছিল। সময় পেলেই তিনি ফজলুল হক হলের ইস্ট হাউসের তেতলার রুমটিতে আমার কাছে চলে আসতেন। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করতাম। রাজনীতি, সাহিত্য এবং কখনো কখনো ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ নিয়ে।

সেবার মূর্তজার চিকিৎসায় আমি ভালো হইনি। কুইনাইন জাতীয় নানারকম ঔষধ খাওয়া এবং ইঞ্জেকশন নেওয়া সত্ত্বেও আমার জ্বর ক্রমাগত বাড়তে লাগলো এবং আমি একেবারেই শয্যাশায়ী হলাম। ফলে এম্বুলেন্স এলো এবং আমাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ননপেয়িং জেনারেল ওয়ার্ডে ভর্তি করা হল। ডা. মূর্তজা হাসপাতালেও এলেন। ওয়ার্ডের ডাক্তারদের বললেন, তিনি আমার রোগটি ম্যালেরিয়া বলে মনে করছেন। ফলে আরো কিছুদিন আমার উপর ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা চলল। এ সময় আমাদের ওয়ার্ডে একদিন এলেন ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। তিনিও তখন তরুণ ডাক্তার। খুবই সুদর্শন মানুষ। সাদা 'এপ্রন' গায়ে। গলায় স্টেথিসকোপ ঝোলানো ডা. বদরুদ্দোজা তখন হয়তো অনেক তরুণীর হৃদয়েই মৃদু কম্পন ও শিহরণ জাগাতেন। তাকে নিয়ে অনেক গসিপও শুনতাম। কিন্তু তখন আমি রোগে কাতর। গসিপে কান দেওয়ার মতো অবস্থা নয়।

এই ডা. বদরুদ্দোজাই নতুন করে আমার রক্ত পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন। এই রক্ত পরীক্ষার পর ধরা পড়লো আমার রোগটি ম্যালেরিয়া নয়, প্যারা-টাইফয়েড। রোগ ধরা পড়ার পর ডা. বদরুদ্দোজা একদিন আমার বেডের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমি তখন থেকেই লক্ষ্য করেছি ডা. বদরুদ্দোজা শুধু ওষুধ দিয়ে নয়, হাল্কা রসিকতার মাধ্যমেও অনেক রোগীর রোগের কষ্ট কমানোর কৌশলটি জানেন। সেদিন আমার বেডের কাছে এসে হাসিমুখে বললেন, রোগী 'রিচ' না 'পুওর'?

বললাম, কথাটার অর্থ কি?

বদরুদ্দোজা বললেন, দামি ওষুধ কিনে খেতে পারবেন? নইলে হাসপাতালের সাধারণ ট্যাবলেট খাইয়ে আপনাকে ভালো করার চেষ্টা করতে হবে। তাতে ভালে

হবেন কি না, হলে কতদিনে হবেন জানি না।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওষুধটা কি?

ঃ ক্লোরোমাইসিন। নতুন বেরিয়েছে। টাইফয়েডের 'সিওর মেডিসিন'। কিন্তু এক বোতলের দাম ষোল টাকা (তখনকার দিনে ষোল টাকা অনেক টাকা। একজন বড় ডাক্তারের ভিজিটই ছিল ষোল টাকা)।

ওষুধের দাম শুনে আমাকে ভাবতে হল। এক বোতলের ট্যাবলেটে কাজ হবে না। কয়েক বোতলের ট্যাবলেট খেতে হবে। আমার নিজের টাকা নেই। 'দৈনিক মিল্লাতে' কাজ করি। দু'মাসের বেতন বাকি পড়ে আছে। যদি চেষ্টা তদ্বির করে টাকাটা আদায় করা যায়। বাঁচতে তো হবে। ডা. বদরুদ্দোজাকে জানালাম, ঔষধ কিনতে পারবো। তিনি হেসে বললেন, তাহলে ধরে নিন, আপনি ভালো হয়ে গেছেন। দামি ঔষধের নাম শুনেই আমার অনেক রোগী ভাল হয়ে যান।

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে তিনি হাসপাতালের 'প্যাডে প্রেসক্রিপশন' লিখে দিলেন। বললেন নার্সদের হাতে এই 'প্রেসক্রিপশন'সহ টাকা দেবেন। ওরাই আপনার ঔষধের ব্যবস্থা করবে।

পঞ্চাশের দশকেও টাইফয়েড, প্যারা-টাইফয়েড বাংলাদেশে মারাত্মক ব্যাধি। হলে রোগী সহজে বাঁচে না। আমি ছোটবেলায় দেখেছি, কারো টাইফয়েড রোগ হলে মাথায় অনবরত চব্বিশ ঘন্টা পানি ঢালার ব্যবস্থা করা হতো। সঙ্গে ঔষধ। তারপর আল্লার উপর নির্ভর করে থাকা। রোগীর ভালো হয়ে ওঠার নিশ্চয়তা খুব বেশি একটা থাকতো না। পরবর্তীকালে এন্টিবায়োটিকস গ্রুপের মেডিসিনের আবির্ভাব টাইফয়েড ভীতি দেশ থেকে দূর করে। ক্লোরোমাইসিন এই গ্রুপের প্রথম দিকের ঔষধ। তখন দাম বেশি ছিল বলে হাসপাতালে ফ্রি দেওয়া হতো না। আমার কপাল ভালো। এই ঔষধ কেনার পয়সা আমি জোগাড় করতে পেরেছিলাম। নইলে সেই পঞ্চাশের দশকে আমি সুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে বেরুতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আমার সঙ্গে আরও যে দু'জন টাইফয়েড রোগী একই ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন (একজন সতেরো আঠারো বছর বয়সের তরুণ), দু'জনেই এন্টিবায়োটিক ঔষধ কেনার পয়সা জোগাড় করতে পারেন নি। তাদের মরতে হয়েছে। সতেরো আঠারো বছরের তরুণটির বেড আমার পাশেই ছিল। এক রাতে দেখি, তার মুখ নার্সেরা সাদা কাপড়ে ঢেকে দিচ্ছে। অর্থাৎ তার মৃত্যু হয়েছে। অনেক বছর আগের কথা। তবু সেই মধ্যরাতের দুঃস্বপ্ন আমাকে এখনো তাড়া করে বেড়ায়।

আমার টাইফয়েড হয়েছে শুনে প্রথমেই যিনি আমাকে দেখতে ছুটে এলেন, তিনি 'দৈনিক মিল্লাতের' সম্পাদক মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী। 'মিল্লাতে' তখন

টাকা পয়সার খুবই টানাটানি। স্টাফকে ঠিকমতো বেতন দেওয়া যাচ্ছে না। এই সময় আমাকে দু'মাসের বেতন একসঙ্গে দেওয়া? মোতাহার ভাই কিভাবে টাকাটা সংগ্রহ করলেন জানি না। একদিন তিনি আমাকে দেখতে এলেন। একসঙ্গে দু'মাসের বেতনের টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, তোমার ক্লোরোমাইসিন কেনার ব্যাপারে যেন দেরি না হয়। টাকা যদি আরো লাগে, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। 'মিল্লাতে' তোমার টাকা পাওয়া না থাকলেও আমরা টাকা জোগার করে দেব।

মোতাহার ভাইয়ের কথা শুনে সেদিন কি সাহস পেয়েছিলাম, তা আজ কাউকে লিখে বোঝাতে পারবো না। এই হৃদয়বান মানুষটিকে সব সময় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

এ সময় ডা. মূর্তজার ডাক্তারি বিদ্যা সম্পর্কে আমার মনে একটু সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি হাসপাতালে মাঝে মধ্যেই আসতেন। তাড়াতাড়ি যাতে ভালো হয়ে উঠি, সেজন্য নানা রকম পরামর্শ দিতেন। আমি তার পরামর্শে কান দিতাম না। মূর্তজা বুঝতে পেরেছিলেন তার ডাক্তারি বিদ্যার উপর আমার আস্থা ও বিশ্বাস আর পুরোপুরি নেই। প্যারা-টাইফয়েড রোগকে তিনি ম্যালেরিয়া বলে 'ডায়োগনসিস' করেছিলেন। এতবড় একটা ভুল করে তিনি নিজেও মনে মনে লজ্জিত হয়েছিলেন। কিন্তু তখন মুখ ফুটে আমাকে আর কিছু বলেননি।

বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে নানা অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও অন্যান্য অনিয়মের কথা আজকাল হরহামেশা শোনা যায়। কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মতো রাজধানীর একটি হাসপাতালে কি ধরনের অবস্থা বিরাজ করতো, তার একটা বিবরণ দিচ্ছি। এটা আমার একদিনের অভিজ্ঞতা। একমাসের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গেলে আমাকে একটি আলাদা বই লিখতে হবে।

১৯৫৬ সালে আমি যখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নন পেয়িং একটি জেনারেল ওয়ার্ডে প্যারা-টাইফয়েডের রোগী, তখন আমার বেডের অদূরে আরেক রোগীর বেড ছিল। ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের মতো হবে। মাঝে মাঝে রোগ যন্ত্রণায় কাতরাতেন। আবার মাঝে মাঝে তার পাশের বেডের রোগীদের কাছে কাতরস্বরে কি যেন চাইতেন। আমি একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পর একদিন তার বেডের পাশ দিয়ে হাঁটছি। তিনি আমাকে ডাক দিলেন, ও ভাই, শুনছেন?

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি পকেট হাতড়ে কিছু পয়সা বের করলেন। বললেন, আমাকে চিঠি লেখার কাগজ কলম আর স্ট্যাম্প কিনে দেবেন? আপনার পায়ে পড়ছি ভাই।

তার কাতরতা দেখে বিস্মিত হলাম। বললাম, ওয়ার্ড বয়দের কাছে পয়সা

দিলেই পারেন।

ঃ তারা নেয় না। আমাকে চিঠিপত্র লিখতে এরা দেয় না। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। এরা আমাকে যে ঔষধ খাওয়াচ্ছে, তাতে আমি ভালো হব না। আমি বাড়ি গিয়ে নতুন ডাক্তার দেখাতে চাই। এদের চিকিৎসায় আমি বাঁচবো না। মরে যাব।

ঃ আপনার কি রোগ হয়েছে।

ঃ আমাকে তাও এরা বলে না। ভদ্রলোক আরও কাতর স্বরে বললেন।

এই সময় নার্স তাকে ঔষধ খাওয়াতে এলো। সুতরাং তার সঙ্গে কথা আর এগুলো না। তবে লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোক সচ্ছল অবস্থার। তার হাতে দামি ঘড়ি। চেইনটি সোনার। সোনার চশমার ফ্রেমটিও দামি। হাসপাতালের রোগীর পোশাক তিনি পরেননি। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী। গলায় সোনার মাদুলী। এক কথায় অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষ তিনি।

পরে এক নার্সকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ভদ্রলোক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন। রোগ লিওকেমিয়া। বড়জোর মাসখানেক বাঁচতে পারেন। মেডিকেসনের উপর আছেন। ঔষধ বদলিয়ে লাভ হবে না। কিন্তু ভদ্রলোকের ধারণা, বাসায় গিয়ে ডাক্তার বদলালেই তিনি ভালো হয়ে যাবেন। তাকে তার মারাত্মক রোগের কথা জানানো হয়নি।

একরাতে তার সারা শরীরও নার্সেরা সাদা কাপড়ে ঢেকে দিল। বুঝলাম, তিনি আর কাগজকলম কিংবা ডাকটিকেট কিনে দেওয়ার জন্য কাউকে জ্বালাতন করবেন না। মধ্যরাতের এ স্তব্ধ মৃত্যুর প্রহর আমার মনকেও যেন কেমন স্থবির করে দিয়েছিলো। এই ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়ার পর বেশ কয়েকটি মৃত্যু দেখলাম। আত্মীয়স্বজন প্রিয়পরিজন কাছে কেউ নেই; কেউ উচ্চস্বরে কেঁদে উঠছে না। বিলাপ করছে না; একজন মানুষ জীবনের সকল ব্যস্ততা ও কোলাহল থেকে চিরদিনের মতো মৃত্যুর শীতল নিস্তব্ধতায় হারিয়ে যাচ্ছে এবং এইভাবে আমিও যে কোন সময় হারিয়ে যেতে পারি, এই বোধ আমার সকল ইন্দ্রিয়কে যেন নিঃসাড় করে দিতো। মৃত্যু ভয় নয়; সকল ভয়ভীতির বাইরে এই বোধহীন অনুভূতির কোনো সংজ্ঞা নেই।

সে রাতে আমার আর ঘুম হয়নি। অদূরেই সেই ভদ্রলোকের লাশ। কাপড় ঢাকা। বেডটি চারদিক থেকে পর্দা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে নার্সেরা। এক ডাক্তার এসেছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ মৃত্যু হয়েছে বলে চূড়ান্ত রায় দিয়ে গেছেন। মাথার উপরে মিটিমিটি ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। জানালার কাঁচ দিয়ে ঢাকার রাত্রির আকাশ দেখা যায়। তার নীল রঙটি এখন যেন কালো আচ্ছাদনে ঢাকা। আমার মনে হচ্ছিল, সেই আকাশের নীচে দুটি লাশ পাশাপাশি শুয়ে আছে। একটি সেই ভদ্র লোকের।

অন্যটি আমার।

সম্ভবতঃ শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই ঘুম ভাঙলো সকালে একটু বেলা করে। ঘুম ভাঙতেই কান্নার শব্দ শুনলাম। সেই ভদ্রলোকের আত্মীয়স্বজনেরা এসেছেন। তাদের কেউ কেউ কাঁদছেন। কিন্তু সেই কান্নার শব্দ ছাপিয়ে একজনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনলাম, 'ঢাকার হাসপাতালেও এতবড় ডাকাতি হতে পারে? এর কি বিহিত নেই? কার কাছে এর জন্য প্রতিকার চাইবো?'

এই ক্রুদ্ধ প্রশ্নের জওয়াব কোনোদিক থেকে শোনা গেল না। ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয় যে যার মতো কাজ করছে। এই মৃতদেহ, তার চারপাশের লোকজন, সবই যেন একটি আলাদা জগৎ। সেই জগতের সঙ্গে আর কারো সম্পর্ক নেই।

লাশটি কাপড় ঢাকা অবস্থাতেই সরিয়ে নেওয়া হল। জানতে পারলাম, তার মৃত্যুর খবর জেনে ভোরে তার আত্মীয়-স্বজনেরা হাসপাতালে এসে দেখেন, বেডে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় লাশ পড়ে আছে। একটি সাদা কাপড় দিয়ে তা ঢাকা। তার হাতঘড়ি, গলার সোনার মাদুলী, গায়ের পাঞ্জাবী, পরনের পাজামা কিছুই নেই। মৃতদেহ থেকে কেউ জামা, কাপড়, ঘড়ি, গলার চেইন সবকিছু চুরি করতে পারে এবং তাও রাজধানীর একটি হাসপাতালে, এই অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। মৃত্যুর চাইতেও এই ঘটনা আমার কাছে ভয়াবহ মনে হল।

বিকেলের দিকে আমাকে দেখতে এলেন আবদুর রহিম। পরবর্তীকালে যিনি হয়েছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও গণসংযোগ দপ্তরের অধিকর্তা। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং মিল্লাতের সাংবাদিক। থাকেন ফজলুল হক হলে আমার পাশের রুমে। রহিম আমাকে দেখতে হাসপাতালে প্রায়ই আসতেন। তাকে হাসপাতালে মৃতদেহ থেকে কাপড়, ঘড়ি চুরির কথাটা জানিয়ে বললাম, আমার পকেটেও মোতাহার ভাইয়ের দেওয়া টাকা আছে। তা থেকে ক্লোরোমাইসিনের দাম দেই। হাতে আছে ঘড়ি। দামি ঘড়ি নয়। তবুও ভয় হচ্ছে, যদি হাসপাতালের বেডে হঠাৎ মরে যাই, তাহলে আমার লাশের উপরও অত্যাচার হবে। বিবস্ত্র করে লাশ বেডে ফেলে রাখা হবে।

রহিম বললেন, আপনি কি করতে চান?

তাকে হাত থেকে ঘড়ি খুলে দিলাম। পকেটের টাকা বুঝিয়ে দিলাম। বললাম ঃ এসবই আপনার কাছে রাখুন রহিম। ঘড়িটি আপনার হাতে বাঁধা থাকুক। যদি ভালো হয়ে হলে ফিরে যাই, তখন ফেরত নেব। টাকাও আপনার কাছে থাকুক। আপনিতো সপ্তাহে দু'তিনদিনই আমাকে দেখতে হাসপাতালে আসেন। যখন ঔষধ কেনার টাকার দরকার হবে তখন তা চেয়ে নেব। সব টাকা একসঙ্গে আমার কাছে রাখা ঠিক নয়।

রহিম ঘড়ি এবং টাকা দুই-ই তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। দরকার মতো ঔষধের টাকা তিনি দিতেন। ঘড়িটি ফেরত নিয়েছিলাম ভালো হয়ে ওঠার পর।

ডা. মূর্তজাকে হাসপাতালে আমার এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেছিলাম, এ সম্পর্কে খবরের কাগজে লেখালেখি করলে কেমন হয়?

ডা. মূর্তজা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেছিলেন, আপনি হাসপাতালের একটি ঘটনা দেখে এত মর্মাহত। আমি জানি শত শত ঘটনার কথা। খবরের কাগজে লিখে এর কোনো প্রতিকার হবে না গাফফার সাহেব। এই সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙতে না পারলে এর কোন প্রতিকার নেই। আর এই সমাজ ভাঙার জন্য দরকার শোষিত বঞ্চিত মানুষের হাতে বন্দুক। কলম নয়। কলম বিপ্লবের জন্য জমি প্রস্তুত করবে; কিন্তু বিপ্লব ঘটাবে বন্দুক। বন্দুকই সকল শক্তির উৎস; আমি এই থিয়োরিতে ক্রমশঃই বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

হাসপাতালের বেডে শুয়েই বলেছিলাম, ডাক্তার, আপনি রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা করেন, তা আমি জানতাম না। আপনি কি মাও ঝে দুংয়ের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন?

মূর্তজা বললেন, প্রভাবিত হব কেন? রীতিমতো দীক্ষা নিচ্ছি বলতে পারেন। আপনি ভালো হয়ে উঠুন। আপনাকেও চেয়ারম্যানের বই পড়তে দেব। দেখবেন পৃথিবীর শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য এই পথ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

আমার সঙ্গে ডা. মোহাম্মদ মূর্তজার পরিচয় ডাক্তার হিসেবে। সেদিন তার আরেক পরিচয় জানলাম।

(উনত্রিশ)

সময় ১৯৫৬ সাল। স্থান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের একটি জেনারেল ওয়ার্ড। সময় অপরাহ্ন। দুপুরের খাওয়ার পর সম্ভবত একটু ঘুম পেয়েছিল। কপালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি এলিজাবেথ। নার্স এলিজাবেথ। দেশী ক্রিশ্চান তরুণী। ঢাকা হাসপাতালের নার্স। যৌবন ভরপুর দেহ। মুখে মিষ্টি হাসি। আমি ডাকতাম, এলি। এলি বন্ধু ছিলেন আমার বন্ধু আবদুল কুদ্দুসের। কুদ্দুসের মাধ্যমেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। এই আবদুল কুদ্দুস এখন কোথায় আছেন জানি না। নোয়াখালিতে তার বাড়ি। বড় সরকারি চাকরি করতেন। এখন নিশ্চয়ই অবসর নিয়েছেন অথবা নিচ্ছেন। পঞ্চাশের দশকে আমরা দু'জনেই ছিলাম ছাত্র এবং সাংবাদিক। কুদ্দুস ছিলেন 'দৈনিক সংবাদের' রিপোর্টার। আমি ছিলাম 'দৈনিক মিল্লাতের' এসিস্ট্যান্ট এডিটর।

কুদ্দুসও থাকতেন ফজলুল হক হলে। কিছুকাল আমরা ছিলাম প্রায় অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে পুলিশের লাঠিতে আহত হয়ে বাংলাবাজারে একটা গুদাম ঘরে (তখন ছিল পাইওনিয়ার প্রেসের গুদামঘর) যখন আমাকে কয়েকদিন পড়ে থাকতে হয়েছিল, তখন কুদ্দুসই আমাকে রাতদিন দেখাশোনা করেছেন। নিজের পয়সায় খাবার কিনে এনেছেন, ঔষধ এনেছেন। যখন কুদ্দুস বড় চাকরি করেন, একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠনের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এই সংস্থাটির ব্যবস্থাপক ও মালিক ছিলেন লেখক ও সাংবাদিক আবদুল মতিন (বর্তমানে লণ্ডনে আছেন) এবং আদমজী সাহিত্য পুরস্কার পাওয়া লেখক প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক।

আবদুল কুদ্দুস ও এলিজাবেথের বন্ধুত্ব একদিন ফুলের কুঁড়ির মতো দল মেলবে, এই আশা আমার মনে বহুদিন ছিল। কুদ্দুসের বন্ধু হিসেবে আমার প্রতিও এলির ছিল অপরিসীম মায়া ও ভালবাসা। তিনি তখন অন্য ওয়ার্ডের নার্স। তবু রোজ ডিউটি শেষ হলে আমার ওয়ার্ডে আসতেন আমাকে দেখতে। কোনো কোনোদিন তার সঙ্গে আরেক তরুণী নার্স। তার নাম আমি এখন ভুলে গেছি। তারা আপেল, আঙুর, কমলা আমার জন্য নিয়ে আসতেন। কোনো কোনো সময় হরলিক্স্ বা ওভালটিনের কৌটা। আঙুর, আপেল তখন ঢাকায় দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য ছিল। কেবল ধনী রোগীরাই কিনে খেতে পারতেন। এলি প্রায়ই আমার বেডের শিয়রে মশারি টানানোর লোহার রডের সঙ্গে একটা-দুটো রঙিন বেলুন ঝুলিয়ে দিতেন। ডা. বদরুদ্দোজা রোগী দেখতে এসে আমার মাথার কাছে রঙিন বেলুন দেখে মাঝে মাঝে টিপ্পনি কাটতেন, ওহ্ আপনাকে তাহলে রঙিন বেলুন দেওয়ারও লোক আছে। আপনি তাহলে শিগগিরই ভালো হয়ে যাবেন।

সেদিন পড়ন্ত দুপুরে এই এলিজাবেথই আমার কপালে তার ঠাণ্ডা হাত রাখতেই তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেল। এলি বললেন, তোমার জ্বর আবার উঠেছে দেখছি।

বললাম, ক্লোরোমাইসিন খেয়ে ভালো হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তাররাও বলেছিলেন, হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু এখনতো দেখছি, আবার ঘুসঘুসে জ্বর উঠছে।

এলি বললেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। প্যারা-টাইফয়েড রোগটার ধরনই এই। একবার চলে গিয়ে আবার আসে। সুতরাং তোমাকে হাসপাতাল থেকে চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছুকাল ক্লোরোমাইসিন খেতে হবে।

এলিজাবেথ আমার কাছে থাকতে থাকতেই ডা. মূর্তজা এসে হাজির হলেন। হাসি মুখে বসে পড়লেন বেডের কোণাতেই। তার হাতে একটা ওয়াটারবেরিজ কম্পাউন্ডের বোতল।

বললাম, এটা কার জন্য?

ঃ আপনার জন্য। টনিক। খাওয়ার পর দু'চামচ খেয়ে নেবেন। তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুন। আমার সঙ্গে আপনাকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। মূর্তজা বললেন।

বিস্মিত হয়ে বললাম, এয়ারপোর্টে যেতে হবে। কেন?

উৎফুল্ল হাসিতে মূর্তজার সারা মুখ উদ্ভাসিত। বললেন, চৌ এন লাই ঢাকায় আসছেন। তাকে বিমানবন্দরে বিরাট সম্বর্ধনা জানানোর আয়োজন চলছে। আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে।

বললাম, কি করে যাব? আবার তো জ্বর উঠেছে।

মূর্তজা বললেন, আপনার গায়ে এখন যা জ্বর, তা গায়ে নিয়ে এশিয়া আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ চাষী মাঠে কাজ করে, শ্রমিকেরা গায়ে গতরে খাটে। মনে বল রাখুন। সারা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়া না দেখে আমরা মরবো না।

এলিজাবেথ বুঝলেন এখন আমার কাছে তার থাকা নিরর্থক। তিনি হাসিমুখে বিদায় নিলেন। মূর্তজার তত্ত্বকথায় আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। তাই চুপ করে রইলাম। মূর্তজা আমার বিরক্ত ভাব লক্ষ্য করলেন না; বলতে লাগলেন, চীনের আফিমখোর মানুষ আজ জেগে উঠেছে। দেখবেন, চেয়ারম্যান মাও ঝে দুংয়ের বিপ্লবের জোয়ারে সারা ভারত, পাকিস্তান প্লাবিত হয়ে গেছে। কোথায় ভেসে যাবে আপনাদের নেহরু, সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক; কোনো খোঁজই থাকবে না তাদের। একমাত্র বেঁচে থাকবেন ওই লুঙ্গিপরা মওলানা ভাসানী। তিনি কি বলেছেন জানেনতো, পঁয়ষট্টি সালের মধ্যে সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের বিজয় পতাকা উড়বে।

এবারও কথা বললাম না। মূর্তজার অতি উৎসাহে বাধা দিতে মন চাইলো না। তখনো পিকিং-মস্কোর দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য নয়। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়নি। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠেনি। আমরা যারা বয়সে তখন তরুণ ছিলাম, ছিলাম আওয়ামী লীগের কাছাকাছি, তারা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মনোভাব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলাম। মনে মনে আমরা অনেকেই অনুরাগী ছিলাম মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বের। সুতরাং মূর্তজার ভাসানী-প্রশস্তিতে আমার বাধা দেওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আতাউর রহমান খান; কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। ঢাকায় চীনের প্রধানমন্ত্রীকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়ার

জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়, তার বেসরকারি সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন বামপন্থী নেতাকেও গ্রহণ করা হয়েছিল। ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন সদস্যরা গঠন করেছিলেন বিরাট স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ। মূর্তজা এরই একটি যুব স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপের উৎসাহী সদস্য।

সেদিন বিশ্বময় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী জয় সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলার পর মূর্তজা আসল কথায় এলেন। বললেন, আপনিতো হাসপাতালের বেডে বসেও কবিতা লেখেন জানি।

ঃ তা লিখি। হঠাৎ কবিতা লেখার কথা কেন?

মূর্তজা এবার একটু ইতস্তত কণ্ঠে বললেন, আপনি চৌ এন লাইকে নিয়ে একটা গান লিখে দেবেন?

ঃ কারা গাইবেন?

ঃ তার নাগরিক সংবর্ধনা সভায় আমরাই গাইবো। মূর্তজা বললেন।

ঃ গান না হয় লিখলাম, সুর দেবেন কে?

ঃ আপনিতো বগুড়ার যুব নেতা গাজিউল হককে চেনেনই। তার ভাই নিজামুল হককে দিয়ে গানে সুর দেওয়া হবে। তিনি নামকরা গণসঙ্গীত শিল্পী।

ঃ তাকে এখন কোথায় পাবেন?

ঃ আমরা তাকে খুঁজে বের করবো। মূর্তজা জানালেন।

সেটা ছিল পঞ্চাশের দশক। সত্তরের দশক নয়। নয়াচীনকে নিয়ে তখন এশিয়ার সর্বত্রই প্রত্যাশা ও প্রশংসার জোয়ার বইছিল। চৌ এন লাইকে ঢাকায় স্বাগতঃ জানিয়ে গান লিখতে আমারও আপত্তি ছিল না। তাই মূর্তজাকে জানালাম, চেষ্টা করবো।

ঃ দু' একদিনের মধ্যে দিতে হবে।

ঃ তাই দেব।

মূর্তজা এবার আরো একটু সংকোচের সঙ্গে বললেন, গানটার মধ্যে যেন মাওয়ের কথাও একটু থাকে। তার মহান নেতৃত্বেই এশিয়ায় সমাজতন্ত্রী বিপ্লব চূড়ান্ত জয়ের অধিকারী হবে, এ বিশ্বাসটা গানে ব্যক্ত হওয়া দরকার।

আমার মনে আছে, সেই পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়েই আমি মূর্তজাকে বলেছিলাম, একটা গানে ব্যক্তি পূজার এতটা বাড়াবাড়ি কি ভাল দেখাবে? স্ট্যালিনকে নিয়ে ব্যক্তি পূজার এতটা বাড়াবাড়ির দরুনই 'ফল অব বার্লিনের' মতো এত চমৎকার ছবিটা ফ্লপ করেছে।

মূর্তজা আমার কথা আমল দিলেন না। বললেন, আমাদের একটি ছেলে চৌকে

স্বাগতঃ জানিয়ে একটা গান লেখার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের পছন্দ হয়নি। তবু তার দু'একটা লাইন শুনুন।

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে মূর্তজা গানটি পড়ে শোনালেন। এত দীর্ঘকাল পর যতটুকু মনে করতে পারছি, গানটার কয়েক লাইন ছিল এরকমঃ

" চৌ এন-লাই চৌ এন-লাই
ঢাকায় তোমায় স্বাগতঃ জানাই
মহান মাওয়ের পতাকাবাহী
আমরা সবাই।
নয়াচীন ও পাকিস্তানের
মানুষ আমরা ভাই ভাই।"

বলেছিলাম, চমৎকার গান। এটা দিয়েই এবার চালিয়ে দিন।

মূর্তজা বললেন, না, আরো ভালো গান চাই।

বললাম, ডাক্তার সাহেব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চীনের নায়ক ছিলেন কুয়োমিংটাঙ দলের নেতা চিয়াং কাইশেক। তখন তিনি দিল্লি হয়ে কলকাতা সফরে এসেছিলেন। তখন বৃটিশ রাজত্ব। কলকাতায় চিয়াং কাইশেকের সংবর্ধনার জন্য 'হিজমাস্টার্স ভয়েস' কোম্পানী রেকর্ড বের করেছিলেন। নজরুল এই গানটি লিখেছিলেন। এই গানের দু'টি লাইন শুনুনঃ

"বাংলার ইতিহাসে হল নব উল্লেখ
কিংশুক সাথে এল চিয়াং কাইশেক।"

মূর্তজা লাইন দু'টি শুনে ঠোঁট উল্টে বললেন, কোথায় চেয়ারম্যান মাও আর কোথায় চিয়াং ফিয়াং? আপনি গান লিখবেন এ যুগের দু'জন শ্রেষ্ঠ মানুষকে নিয়ে। তারা সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের নেতা।

মূর্তজার অনুরোধে সেবার চৌ এন লাইকে নিয়ে একটা গান আমি লিখেছিলাম। তাতে মাও ঝে দুংয়ের প্রশংসা বাক্যও ছিল। গানটা নাগরিক-সংবর্ধনা সভায় গাওয়া হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। কারণ, এই সংবর্ধনার দিন আমি জ্বরের ঘোরে হাসপাতালের বেডে ছিলাম শায়িত। ঢাকায় চৌ সংবর্ধনার খবর আমাকে পরে খবরের কাগজ দেখে জানতে হয়েছে।

মূর্তজাকে চৌ-এর উপর গান লিখে দেওয়ার পরদিন হাসপাতালে আমাকে দেখতে এলেন হাসান হাফিজুর রহমান এবং জহির রায়হান। চৌ এন লাইয়ের সংবর্ধনা নিয়ে দু'জনেই খুব ব্যস্ত এবং উৎসাহী। হাসান বললেন, গাফ্ফার, নাগরিক সংবর্ধনা সভায় চৌ এন লাইকে যে মানপত্র দেওয়া হবে, সেটি আপনাকে দিয়ে লেখাবো বলে আমরা ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আপনিতো অসুস্থ। বাংলায় মানপত্র

পড়া হবে। পড়বেন চীফ মিনিস্টার আতাউর রহমান খান। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ও চীনা ভাষায় তরজমা করা হবে।

বললাম, হাসান, আমার যে কি দুঃখ লাগছে, তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। গনচীনের প্রধানমন্ত্রীর জন্য মানপত্র লেখা আমার জীবনে কি সম্মান বয়ে আনতো, তা ভাবতেও পারছি না। আমার কপাল খারাপ, তাই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছি। হয়তো তার সভাতেও যেতে পারবো না।

মানপত্র লেখায় আমার একটু সুনাম ছিল। সেই ছাত্রজীবনেও বড় বড় নেতা, জ্ঞানী, গুণীর সংবর্ধনায় মানপত্র লেখার জন্য আমার ডাক পড়তো। ওই পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়েই ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান যখন এলেন ঢাকায়, তখন কার্জন হলে তাকে নাগরিক-সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। মানপত্র লেখার ভার পড়েছিল আমার উপরে। ড. আনিসুজ্জামানের হাতের লেখা মুক্তোর মতো সুন্দর। তিনি আমার লেখা বড় আর্ট পেপারে সুন্দর করে কপি করেছিলেন। সেটাই কাঁচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে মানপত্র হিসেবে পড়ার পর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানকে উপহার দেয়া হয়েছিল। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর একদিন কার্জন হলে সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সরোদ বাজিয়েছিলেন তিনি। প্যারিসে এক সন্ধ্যায় এই সরোদ বাজানোর পর লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকা লিখেছিলেন, 'হি লুক্স্ লাইক এন অর্ডিনারি ইনডিয়ান, বাট হোয়েন হি প্লেজ হি লুক্স্ লাইক এ গড্।' পুরনো কথা স্মরণ হওয়ায় আমার মনে দুঃখ আরো গাঢ় হল। মনে মনে ভাবলাম, জ্বরটা যদি দু'দিনও না আসতো, শরীরে যদি একটু বলও পেতাম, তাহলে চৌ এন লাইয়ের জন্য মানপত্র লেখার এই দুর্লভ সম্মান আমি নিশ্চয়ই হারাতাম না।

হাসান এবং জহির দু'জনেই আমার মনের দুঃখ টের পেলেন। জহির রায়হান আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, গাফ্ফার, আপনি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুন। আলতাফ মাহমুদ একটা গানের স্কুল খুলতে চান। এই স্কুলের জন্য আপনাকে কয়েকটা গান লিখে দিতে হবে।

আলতাফ মাহমুদ তখন একটা গানে সুরারোপ করেই সুরের জগতে প্রতিষ্ঠিত। এই গান, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।' তিনি গানের স্কুল খুলবেন জেনে খুশি হলাম।

দু'দিন পর ডা. মূর্তজা আবার আমাকে দেখতে এলেন হাসপাতালে। তিনি একটু চঞ্চল স্বভাবের ছিলেন। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতেন না। সেদিন কখনো আমার বেডে বসেন, কখনো উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে হাঁটেন। কথায় কথায় হঠাৎ একসময় বললেন, মওলানা ভাসানী দু'একদিনের মধ্যে হাসপাতালে আসবেন।

ঃ কেন? আমি উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

ঃ হাজী মোহাম্মদ দানেশকে দেখতে আসবেন। এই কৃষক-নেতা এখন হাসপাতালে আছেন।

হাজী দানেশ তখন হাসপাতালে আছেন আমিও জানতাম। তিনি হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডের খাবার খেয়ে চটে গিয়েছিলেন। জোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই খাবার খেলে ভালো মানুষও রোগী হয়ে যাবে। ফলে হাসপাতালের খাওয়া দাওয়া একটু উন্নত হয়েছিল। সকালে ব্রেকফাস্টের তালিকায় এক গ্লাস দুধ, দু'স্লাইস রুটি, একটু বাটার ও চিনির সঙ্গে একটা করে সেদ্ধ ডিম বরাদ্দ হয়েছিল। আমরা হাজী মোহাম্মদ দানেশের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিলাম।

মূর্তজা বললেন, মওলানা ভাসানী হাসপাতালে হাজী দানেশকে দেখতে এলে আপনাকেও হয়তো দেখতে আসবেন।

ঃ আপনি পাগল, না মাথা খারাপ? আমি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠেছিলাম। মওলানা ভাসানী আমাকে চেনেন না। নামও জানেন না। আমার মতো একজন সাধারণ ছাত্র অথবা সাংবাদিকের নাম জানার কথাও তার নয়। তাকে আমি বহুবার সভা সমিতিতে দেখেছি। সংখ্যাসাম্য-বিরোধী আন্দোলনের সময় একবার ঢাকা এয়ারপোর্টে, আরেকবার ঢাকার কারকুন বাড়ি লেনের বাসায় তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে। এই একটি বা দু'টি বারের সামনাসামনি দেখা সাক্ষাতে আমাকে তার মনের কথা নয়।

মূর্তজা বললেন, আমার মন বলছে তিনি আসবেন।

পরদিনই মওলানা ভাসানী এলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাজী মোহাম্মদ দানেশকে দেখার জন্য। কিছুক্ষণ পরেই দেখি আমাদের ওয়ার্ডের ডাক্তার এবং নার্সেরাও ছুটাছুটি করছেন। মওলানা সাহেব এই ওয়ার্ডেও আসবেন।

আমার বুকে ঢিপঢিপানি বেড়ে গেল। সত্যি কি তিনি আমাকে দেখতে আসবেন? তা কি করে হয়? তিনি আমাকে চেনেন না, জানেন না। হয়তো হাজী দানেশকে দেখতে এসে তিনি হাসপাতালের কয়েকটি ওয়ার্ডও পরিদর্শন করবেন। আমি ডা. মূর্তজার কথা শুনে ভাবছি, তিনি আমাকেও দেখতে আসবেন। এটা পাগলের প্রত্যাশা ছাড়া আর কি হতে পারে?

(ত্রিশ)

আমার আকুল অপেক্ষা শেষ হল। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বিকেলের দিকে এলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে আমাদের ওয়ার্ডে। তার সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, সিনিয়র ডাক্তার, মেট্রন, নার্সতো

ছিলেনই, আর ছিলেন ঢাকার আওয়ামী লীগের তখনকার একজন নেতা এবং 'ইত্তেফাকের' প্রথম মুদ্রাকর ও প্রকাশক ইয়ার মোহাম্মদ খান। মওলানা ঢাকায় এলে প্রথম দিকে ইয়ার মোহাম্মদ খানের কারকুন বাড়ি লেনের বাসাতেই উঠতেন। তার সঙ্গে আরো ছিলেন আবদুল ওয়াদুদ পাটোয়ারী। তখন আওয়ামী লীগের একজন নেতৃস্থানীয় যুব সংগঠক। 'ইত্তেফাকের' ব্যবস্থাপনা বিভাগেরও ছিলেন একজন কর্মকর্তা। আমরা তাকে ডাকতাম ওয়াদুদ ভাই। সে সময় আওয়ামী লীগের কোনো সভা সমিতি হলে বা শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচী থেকে ঢাকায় এলে ওয়াদুদ ভাই খাকি পোশাক পরে একটা জিপ 'গাড়িতে মাইক বসিয়ে সারা ঢাকা শহর চষে বেড়াতেন প্রচারের কাজে। এই ওয়াদুদ ভাইও এখন বেঁচে নেই। সেদিন হাসপাতালে খাকি পোশাকে ওয়াদুদ ভাইকে মনে হচ্ছিল মওলানা ভাসানীর দেহরক্ষীর মত।

মওলানা সাহেব হাজী দানেশকে দেখার পর আমাদের ওয়ার্ডেও এসেছেন। তিনি আমাকে দেখতে আসেননি। এসেছেন তার এক পুরনো বন্ধু ও সহকর্মীকে দেখতে। মওলানা ভাসানীর চাইতেও বয়সে কিছুটা বড় এবং তার আসাম রাজনীতির সহকর্মী। এরকম কেউ হাসপাতালের এই ওয়ার্ডে আছেন, আমরা তা জানতাম না। আমার বেডের উল্টোদিকে একটা বেডে ভদ্রলোক সপ্তাহ দুই ধরে আছেন। খুব সাদাসিধে মানুষ। সচ্ছল অবস্থারতো ননই, কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী বলেও এতদিন মনে হয়নি। তিনি কোনো খাতনামা নেতা বা কর্মী ছিলেন না, তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। তার কাছে বিকেলে ভিজিটরও আসতো কালে-ভদ্রে। সম্ভবত ঢাকায় তার তেমন আত্মীয় স্বজন ছিল না। তিনি চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকতেন। নার্স এসে তার মুখে থার্মোমিটার ঢুকাতো, ইনজেকশন দিতো, তাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তার নামধাম বা তার কি রোগ হয়েছে তা জানার জন্য কখনো মনে আগ্রহ দেখা দেয়নি।

আজ এই ভদ্রলোকই মওলানা ভাসানীকে দেখে তার বিছানায় সোজা টান হয়ে বসলেন। বললেন, মওলানা, এসো এসো।

মওলানা ভাসানী তার বেডে বসে পড়লেন। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন। মওলানা বললেন, তুমিতো আমাকে আসামে হামিদ মিয়া ডাকতে। এখন আবার মওলানা মওলানা করতে শুরু করেছো কেন?

ভদ্রলোক বললেন, তুমি তো মওলানাই। এখন দেশের কত বড় নেতা তুমি। তোমাকে কি আমি হামিদ মিয়া ডাকতে পারি? আসলে তোমাকে আমার তুমি বলাও উচিত নয়।

মওলানা ভাসানী চিৎকার করে উঠলেন, খামুস। আবদুর রহমান বকশী, তুমি আমার বড় ভাইয়ের মতো। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় কতকালের? আসামের সেই লাইনপ্রথা আন্দোলনের সময় থেকে। তুমি আমাকে কেন আপনি বলবে? আমি

তোমার হামিদ মিয়াই আছি।

আমি সবিস্ময়ে পঞ্চাশের দশকের অগ্নিপুরুষ মওলানা ভাসানীর সঙ্গে অতি সাধারণ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আলাপ শুনছিলাম। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না যে, 'মজলুম জননেতা' আমার চোখের সামনে হাসপাতালে বেডে শোয়া একজন সাধারণ মানুষকে এমনভাবে বন্ধু বলে জড়িয়ে ধরতে পারেন। এই গুণটি ফজলুল হক ও শেখ মুজিব ছাড়া আর কোনো নেতার মধ্যে দেখিনি।

মওলানা যাতে তার বন্ধুর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে পারেন, সেজন্য ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য সবাই একটু দূরে সরে গিয়েছিলেন। দেখলাম, মওলানা ভাসানী নিজে তার ঝোলা থেকে ফল বের করে নিজ হাতে তার মুখে তুলে দিচ্ছেন। বার বার তার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। ভদ্রলোক এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, আলেমা কেমন আছে?

আলেমা মানে বেগম ভাসানী। মওলানা বললেন, সে ভালো আছে। তোমাকে দেখতে হাসপাতালে আসবো তা সে জানে না। জানলে সাতকরা দিয়ে খাসির গোস্ত রেঁধে তোমার জন্য আমার সঙ্গে পাঠাতো। কিছুতেই ছাড়তো না।

মওলানা ভাসানী প্রায় আধঘন্টা রইলেন তার বন্ধুর কাছে। যখন তিনি বিদায় নেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন, তখন ঝড়ের বেগে আমাদের ওয়ার্ডে এসে ঢুকলেন ডা. মূর্তজা। মওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন, হুজুর, আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। একজন রোগী দেখতে সলিমুল্লাহ হলে যেতে হয়েছিল।

মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যে ডা. মূর্তজার পরিচয় আছে, তা বুঝতে পারলাম। আরো বুঝতে পারলাম মওলানা যে আজ হাসপাতালে আসবেন, মুর্তজা তা আগেই জানতেন। মওলানা তাকে তার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন, আসাম-রাজনীতি থেকে আবদুর রহমান বখশী আমার বন্ধু। টাকা-পয়সা নেই। সাদুল্লা যখন আসামের চীফ মিনিষ্টার, তখন কিছুদিন সে খাসমহালের কানুনগো ছিল। তারপর চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে ঢোকে। ঢাকায় চিকিৎসার জন্য এসেছে। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পরও কিছুদিন ঢাকায় থাকবে। তুমি তার একটু দেখাশোনা করো।

মূর্তজা সানন্দে মাথা নেড়ে তার সম্মতির কথা জানলেন। বললেন, আমার এক রোগী এবং বন্ধু আছেন এই ওয়ার্ডে। তাকে দেখতে রোজই আমি এখানে আসি। আমার বন্ধুর সঙ্গে আপনার বন্ধুকেও দেখে যাব। হাসপাতাল থেকে চলে যাওয়ার পর তার চিকিৎসার দায়িত্ব আমার।

মওলানা ভাসানী খুশি হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এই ওয়ার্ডে তোমার বন্ধুটি কে?

ডাঃ মূর্তজা সোৎসাহে আমাকে দেখালেন। বললেন, গাফ্‌ফার চৌধুরী। এখন

ইউনির্ভাসিটির অনার্সের ছাত্র। সেই সঙ্গে ভালো লেখক ও একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রভাত ফেরিতে যে গানটি-আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো–গাওয়া হয়, সেটি এরই লেখা।

ওয়াদুদ ভাইও মওলানাকে জানালেন, তিনি আমাকে চেনেন। আমি সাংবাদিকতাও করি। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ন-আহবায়ক (অপর আহবায়ক ছিলেন জহির রায়হান)।

মওলানা ভাসানী একেবারে আমার বেডের কাছে চলে এলেন। আমি বেডের উপর উঠে বসতে যাচ্ছিলাম। তিনি নিজে আমাকে শুইয়ে দিলেন। কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার গানটা শুনে আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাদের জাফর (প্রয়াত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দিন) অথবা খোন্দকার ইলিয়াসের বয়সী লোক। এখন দেখছি, তোমার একেবারেই কাঁচা বয়স। প্রভাতফেরির গানটা তুমি কখন লিখেছিলে?

ঃ ১৯৫২ সালেই। একুশে ফেব্রুয়ারীর বিকেলে হাসপাতালের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের বারান্দায় শহীদ বরকতের রক্তমাখা লাশ দেখে এই গানের প্রথম দু'টি লাইন আমার মনে জেগে ওঠে। পুরো গানটি অবশ্য লিখেছি দু'একদিন পরে ধীরে ধীরে।

মওলানা আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। তারপর ইয়ার মোহাম্মদ খানের দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তার নার্সদের বলো, তারা যেন চলে যায়। তারা তাদের ডিউটি করুন। আমি গাফফারকে একটু ফল খাইয়ে তবে যাবো।

বলেই নিজের ঝোলায় হাত দিলেন। সেখানে আর ফল নেই। সবই রহমান বখশীকে দেওয়া হয়ে গেছে। আমার মাথার কাছের টেবিলে নার্স এলিজাবেথের দেওয়া কমলা-আঙুর-আপেল ছিল। মওলানা সেখান থেকে একটা কমলা তুলে নিলেন।

আমি শশব্যস্ত হয়ে বললাম, হুজুর আমি নিজেই খেতে পারবো।

মওলানা বললেন, আমার হাতেও একটা খাও। বলেই কমলার খোসা ছাড়ালেন। তারপর একটা একটা করে কোয়া আমার মুখে তুলে দিতে লাগলেন।

এমন একটি ঘটনা আমার জীবনে ঘটবে আমি কল্পনাও করিনি। তাই কিছু সময় মনে হয়েছিল আমি স্বপ্ন দেখছি। তারপরই ভুল ভেঙেছে। না, এটা স্বপ্ন নয়। এই তো বিকেলের পড়ন্ত রোদ হাসপাতালের জানালার শার্সিতে খেলা করছে মাথার উপরে খুব মৃদুভাবে ঘুরছে বিদ্যুৎ-পাখা। চারদিকে রোগী, নার্স, ওয়ার্ডবয় রোগীদের ভিজিটরেরাও আসতে শুরু করেছেন। তাদের অনেকে অবাক বিস্ময়ে মওলানাকে দেখছেন।

কমলার শেষ কোয়াটি আমার মুখে পুরে দিয়ে মওলানা হঠাৎ বললেন, জাফরের (আবু জাফর শামসুদ্দিন) কাছে শুনেছি, তুমি আমাকে নিয়েও একটি কবিতা

লিখেছো। এটি কখন লিখেছো?

ঃ ১৯৫৫ সালে। আপনি তখন কলকাতায়। দেশে ফিরতে পারছেন না। ইসকান্দার মির্জা হুমকি দিয়েছে. দেশে ফিরলে আপনাকে গুলী করে মারা হবে। শেরে বাংলা গৃহবন্দী। তাকে বলা হয়েছে ট্রেইটর। শহীদ সোহরাওয়ার্দী গুরুতর অসুস্থ। শেখ মুজিবসহ হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা জেলে। পূর্ব পাকিস্তানে চলছে জাঙ্গীলাট ইসকান্দার মির্জার শাসন। চারদিকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। তখন মনে হয়েছে আপনি, একমাত্র আপনিই এদেশের নির্যাতীত মানুষের বন্ধু ও নেতা। একমাত্র আপনিই পারবেন পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষকে বাঁচাতে।

মওলানা ভাসানী বললেন, তুমি আমাকে কবিতাটি শোনাতে পারবে?

বললাম, বেশ লম্বা কবিতা। সবটা মুখস্থ নেই। তবে প্রথম দিকের চার পাঁচ লাইন শোনাতে পারব।

বেশ, তাই শোনাও। মওলানা ভাসানীকে একটা চেয়ার দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাতে বসলেন না। আমার বেডের একটা কোণায় বসে পড়লেন। আমাকে শুয়ে শুয়েই কবিতাটি আবৃত্তি করতে হলো।

"শহরে বন্দরে গ্রামে ঘরে
হৃদয় নগরে,
চোখের তারায় দেখি, মনের ভাষায় শুনি
বুকের সাড়ায় শুনি নাম
মওলানা ভাসানীর নাম।
সাত কোটি মানুষের প্রাণের কালাম
কণ্ঠে শুনি তার।
হতবাক সবিস্ময়ে দেখি।
জীবনে জীবনে একি
মিলিত প্রাণের গতি
আমাদের বাঁচার সংগ্রাম
মওলানা ভাসানীর নাম।"

আবৃতি শেষ করে মওলানার দিকে লজ্জিতভাবে তাকালাম। তিনি আমার কপালে আবার হাত বুলিয়ে দিলেন। বিড় বিড় করে দোয়া পড়লেন। ফুঁক দিলেন আমার সারা শরীরে। বললেন, তুমি ভালো হয়ে উঠে সন্তোষে এসো। যদি আমার কাছে একমাস থাকতে পারো, গ্রামের আলো-বাতাসে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

মওলানা ভাসানী বিদায় নিলেন। আমারও স্বপ্ন দেখা শেষ হল। ডা. মূর্তজাও মওলানার সঙ্গে সেদিনের মতো চলে গেলেন।

সন্ধ্যার পর সাংবাদিক বন্ধু আবদুল কুদ্দুস আর নার্স এলিজাবেথ এক সঙ্গে এসে হাজির হলেন। দু'জনেই খুব উত্তেজিত। কুদ্দুস বলল, তোকে নাকি আজ মওলালা ভাসানী দেখতে এসেছিলেন।

আমি মনের গোপন গর্বের ভাবটুকু প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। তাই মৃদুস্বরে বললাম, আমাকে নয়, তার এক বন্ধুকে দেখতে এসেছিলেন। ডা. মূর্তজার কাছে পরিচয় জেনে আমাকেও দেখে গেছেন।

এলিজাবেথ বললেন, সারা কলেজে, হাসপাতালে এটা রটে গেছে। আমি কি ভাবছি জানো, মওলানা ভাসানীর হাতে কমলা খাওয়ার পর আজ আমার হাতে কমলা খাওয়া কি তোমার মুখে রুচবে?

বললাম, নিশ্চয়ই রুচবে। মওলানা সাহেবের এবং তোমার হাতে ফল খাওয়ার মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য।

ঃ সেই পার্থক্যটা কি। এলিজাবেথের চোখে তখন কৌতুক ও কৌতুহল দুইই।

ঃ পার্থক্যটা হচ্ছে, একটি হাত স্নেহের এবং অপর হাতটি ভালবাসার। স্নেহ এবং ভালবাসার মধ্যে একটু সূক্ষ্ম ভেদরেখা আছে তা জানো?

কুদ্দুস হেসে উঠল। বলল, দেখিস তুই আমার এলিকে আবার পটাবার চেষ্টা করিস না।

এলিজাবেথ বললেন, গাফফার আমাকে পটাবার চেষ্টা করবে না। তার চোখ অন্যদিকে।

টের পেলাম, এলিজাবেথ ভাবছেন তার সঙ্গে যে সুন্দরী তরুণী নার্সটি আমাকে দেখতে আসেন, তার দিকে আমার নজর। বললাম, এলি, তোমার ধারনা ঠিক নয়। আমার জীবনে এখন একটিই মাত্র প্রেম, তা হচ্ছে আত্মপ্রেম। কবে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছাড়বো, ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ক্লাস করতে শুরু করবো, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মধুদা'র ক্যান্টিনে আড্ডা জমাবো, ভালোভাবে অনার্স পরীক্ষাটা দেব, এসব হচ্ছে এখন আমার একমাত্র চিন্তা।

এলিজাবেথ আমার চুলে বিলি কেটে দিয়ে বললেন, আমি বলছি, তুমি শিগগিরই ভালো হয়ে উঠবে। এখন একটু উঠে বসো। রাতের খাবার এখনি দেওয়া হবে। আমি তোমাকে আজ আর ফল নয়, এক গ্লাস হরলিকস বানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

এলিজাবেথ আমাকে এক গ্লাস হরলিকস দিলেন। বিদায় নেওয়ার সময় কুদ্দুস বলল, তোকে যে মওলানা ভাসানী দেখতে এসেছিলেন সে খবরটা কাগজে দেওয়া দরকার।

বিব্রতভাবে বললাম, সেটা ঠিক হবে না। তিনি আমাকে দেখতে আসেননি। এসেছিলেন তার আসাম জীবনের বন্ধু আবদুর রহমান বখশীকে দেখতে।

কুদ্দুস বলল, তুই ভাবিস না। আমি তার কথাটাও খবরে লিখে দেব।

পরদিন ঢাকার তিনটি দৈনিক 'ইত্তেফাক', 'সংবাদ' এবং 'মিল্লাতে' খবর বেরুলো, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অসুস্থ হাজি দানেশকে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে আবদুল গাফফার চৌধুরী নামে এক অসুস্থ ছাত্র-সাংবাদিকের সঙ্গেও কিছু সময় কাটান এবং তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। এছাড়া তিনি আবদুর রহমান বখশী নামে চিকিৎসাধীন এক বন্ধুর শয্যাপার্শ্বেও কিছু সময় ছিলেন। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আর যারা হাসপাতালে গিয়েছিলেন, তাদের নামও খবরে ছাপা হয়েছিল।

খবরে আবদুর রহমান বখশীর বদলে আমাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তাতে আমি বিব্রত বোধ করছিলাম। আমার বেডের উল্টোদিকের বেডেই ছিলেন আবদুর রহমান বখশী। তিনি কিন্তু খবরটা দেখে আদৌ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না; বরং মওলানা সাহেব তাকে যে আঙ্গুরের থোকা দিয়ে গিয়েছিলেন, তা থেকে এক থোকা আমাকে দিয়ে বললেন, আপনাদের মওলানা ভাসানী, আমার কাছে হামিদ মিয়া। আসামে সাদুল্লা-বরদোলুই এই দুই চীফ মিনিস্টারের আমলের রাজনৈতিক সিংহ। সাদুল্লা তাকে ডাকতেন মওলানা হামিদ খাঁ। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তিনি সভাপ্রতি ছিলেন। বাংলার মওলানা আকরম খাঁ এবং আসামের মওলানা হামিদ খাঁ, এই দু'নেতাকে চেনে না, এমন মানুষ তখন বাংলা-আসামে ছিল না। সেই মওলানা হামিদ খাঁ আমাকে হাসপাতালে দেখতে এসেছেন, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। খবরের কাগজে আমার নাম উঠলো কিনা, সেটা কোনো কথা নয়।

আবদুর রহমান বখশীর সঙ্গে আরো একবার আমার দেখা হয়েছে। তবে হাসপাতালে নয়; সন্তোষে মওলানার বাড়িতে।

দিন দুই পরে মুর্তজা আবার এলেন। আমি তখন বেডে শুয়ে এলিজাবেথের দেওয়া একটা ইংরেজী নভেল পড়ার চেষ্টা করছিলাম। চেখভের 'মাই ফার্স্ট লাভ'। মূর্তজা আমার হাতে সেই বই দেখে হা হা করে উঠলেন। বললেন, নাহ, আপনাকে আর মানুষ করা গেল না। এসব বাজে বই পড়ে সময় নষ্ট করছেন কেন? আমি আপনার জন্য ভালো বই নিয়ে এসেছি।

বলেই বগলের তলা থেকে কালো মলাটের উপর লাল কাস্তে হাতুড়ি ছাপা একটি বাংলা বই বের করলেন। কলকাতার এক প্রকাশনীর বই। নাম— 'চীনে কৃষক বিদ্রোহ এবং কমিউনিস্ট বিপ্লব'। লেখক মাও ঝে দুং। আসলে তার অনেকগুলো বক্তৃতার সংকলন।

(দ্বিতীয় খণ্ড শেষ)

বন্দরের কাল হলো শেষ

ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা-৩

—২৫

উৎসর্গ

অগ্রজ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

আবদুল মতিন-কে

লেখকের কথা

যারা 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পড়েছেন, তাদের কাছে এই বই সম্পর্কে নতুন করে কিছু জানানো নিষ্প্রয়োজন। এই বই খণ্ড খণ্ড জীবনচিত্র, স্মৃতিচিত্র এবং সমাজচিত্রও। এতে কাহিনীগত কোনো ধারাবাহিকতা নেই। ফলে প্রত্যেকটি খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনেক মানুষের, অনেক ঘটনার খণ্ড খণ্ড ছবি এঁকেছি। তা জোড়া লাগালে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হতে পারতো, সম্পূর্ণ কাহিনী হতে পারতো। কিন্তু সে উদ্দেশ্য নিয়ে 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা' লেখা নয়। বুড়িগঙ্গার জোয়ার-ভাঁটার মতোই আমার মনে বিভিন্ন সময়ের স্মৃতির যে জোয়ার-ভাঁটা লেগেছে, তার ছবিই তাৎক্ষণিকভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। চারপাশের যেসব খ্যাত-অখ্যাত, চেনা-অচেনা মানুষকে জানি, তাদেরও চরিত্রের খণ্ড ছবিই এঁকেছি। একটু গভীরে গেলে পাঠক তাতে পূর্ণ চরিত্রেরই প্রতিভাস পাবেন। যদি না পান, তা লেখকের দুর্বলতা অথবা অক্ষমতা। চরিত্রগুলোর নয়।

এই বইটি উৎসর্গ করলাম এমন একজন মানুষকে, যার সাহায্য ও ক্রমাগত তাগাদা ছাড়া আমার কোনো বই হয়তো এ বছরে পাঠকের হাতে পৌঁছতো না।

আগের দুই খণ্ডের মতো, 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা'র এই খণ্ডটিও পাঠকদের ভালো লাগলে লেখক হিসেবে তৃপ্তি পাব। খুশি হব।

[signature]

এজওয়ার, মিডেলসেক্স, ইংল্যান্ড

১২ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

এক

১৯৫৬ সালে আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নন্ পেয়িং জেনারেল ওয়ার্ডে প্যারা-টাইফয়েডের রোগী হিসাবে ভর্তি হয়েছিলাম। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েও আমাকে বেশ কিছুকাল অসুস্থ থাকতে হয়েছিল। তখন থাকতাম ফজলুল হক হলের টপ ইস্ট ফাইভ রুমে। এখন সেই রুমের নম্বর বদলে গেছে কিনা জানি না। নীচের তলায় ইস্ট ১১ নম্বর রুমে থাকতেন হাসান হাফিজুর রহমান। এটি ছিল সিঙ্গেল রুম। একটি ঐতিহাসিক ঘর। এখানে কত সাহিত্যিক সমাবেশ হয়েছে, কত রকম ছাত্রসভা হয়েছে, তার গোণাগুণতি নেই। এই রুমে প্রায়ই আড্ডা বসতো। আসতেন শামসুর রাহমান, ড. আনিসুজ্জামান (তখন তিনি ছাত্র), সৈয়দ শামসুল হক, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, শহীদ কাদরি, ফজল শাহাবুদ্দিন এবং আরো অনেকে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো—আমিতো ছিলামই। এখনকার কয়েকজন নামকরা রাজনীতিকও তখন ছিলেন ফজলুল হক হলে। বিএনপি'র আবদুস সালাম তালুকদার থাকতেন ইস্ট সিক্সটিন রুমে। এই রুমে বছর খানেক আমি তার রুমমেট ছিলাম। নর্থ হাউসে ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা জিল্লুর রহমান। বিএনপি আমলের মন্ত্রী মোহাম্মদ খোরশেদ আনোয়ার থাকতেন ওয়েস্ট হাউসে।

ফজলুল হক হলের ইস্ট ইলেভেন বা পূর্ব ১১ নম্বর রুমটির কথাই আমার বেশি মনে পড়ে। এই ঐতিহাসিক রুমটি এখন নেই। আমরা হল ছেড়ে চলে আসার পর এই রুমটি ভেঙে নতুন করিডোর তৈরি করে মেইন হলের সঙ্গে বাইরের ডাইনিং হলের সংযোগ করা হয়েছে। আমরা হলে থাকার সময়ে এই করিডোরটি ছিল না। বৃষ্টিবাদলার দিনে ছাতি মাথায় অথবা বৃষ্টিতে ভিজে মেইন গেট পেরিয়ে আমাদের ডাইনিং হলে যেতে হতো। আমি হাসপাতাল ছেড়ে আসার পর কিছুদিন হাসান ছিলেন আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তার সামনে তখন পরীক্ষা। পড়াশোনার ব্যস্ততার জন্য তিনি হল ছেড়ে বেরুতেন না। আমারও ঘুসঘুসে জ্বর লেগেই ছিল। ডাক্তারেরা বলেছিলেন, প্যারা-টাইফয়েড জ্বরের এটাই ধর্ম। বার বার ফিরে আসে। সুতরাং আমাকে দীর্ঘকাল বিশ্রাম এবং ওষুধের উপর থাকতে হবে। ফলে আমিও হলেই সারাক্ষণ থাকতাম। টপ ইস্ট ফাইভের রুমেই সারাদিন কাটাতাম। বই-কাগজ পড়তাম। বন্ধুবান্ধব এলে আড্ডা দিতাম। শখ হলে কবিতা লিখতাম। বিকেলের দিকটায় তেতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে একতলায় এগারো নম্বর রুমে হাসান হাফিজুর রহমানের কাছে গিয়ে বসতাম।

যেদিন বন্ধুবান্ধব কেউ আসতো না, সেদিন হাসানের সঙ্গেই চলতো ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা। বিষয় সাহিত্য, রাজনীতি, সিনেমা, মেয়েমানুষ সব কিছু। কোনো কোনোদিন হাসানের সঙ্গে আমার মতের মিল হতো না। যেদিন হতো না, সেদিন চলতো উদ্দাম তর্ক। হাসান হয়তো কোনোদিন বলতেন, আচ্ছা গাফফার, বলুনতো, ইউনিভার্সিটিতে যেসব ছাত্রী রাজনীতিতে একটিভ তাদের মধ্যে সবচাইতে আকর্ষণীয় কে?

আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগের কথা বলছি। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরের ক্লাসের ছাত্রীদের মধ্যে রাজনীতিতে খুবই একটিভ ছিলেন ফরিদা বারি মালিক (এখন ফরিদা হক) এবং কামরুন্নাহার লাইলি। ফরিদা বারি রবীন্দ্র সঙ্গীতেরও নামকরা শিল্পী ছিলেন। আমি তাকে ডাকতাম বীথি আপা। (আমাদের এই সম্পর্কটি এখনো বজায় আছে)।

হাসানের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, আকর্ষণীয় এবং সুন্দরী, এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আপনি কোন্‌টা জানতে চান?

হাসান বললেন, আগে কে বেশি আকর্ষণীয় তাই বলুন।

বললাম, আমার চোখে বীথি আপা— ফরিদা বারি মালিক।

হাসান বললেন, না, কামরুন্নাহার লাইলি বেশি আকর্ষণীয়।

তর্ক লাগলো। বললাম, লাইলি খুবই ফর্সা। কিন্তু বীথি আপার মতো ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য তার চেহারায় নেই।

হাসান আমার সঙ্গে একমত হলেন না।

হাসানের নিজের গায়ের রঙ ছিল গাঢ় শ্যাম। ফর্সা রঙের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল। কিন্তু প্রথম যখন আর্ট কলেজের এক ছাত্রীর প্রেমে পড়লেন, তখন দেখি, তার রঙও উজ্জ্বল শ্যাম। আমি ঠাট্টা করে হাসানকে বলেছিলাম, কি, ফর্সা রঙের মেয়ে খুঁজে পেলেন না?

আমার কথা শুনে হাসানের মুখটা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কোনো জবাব দেননি।

আমাদের সেই যৌবন-শিহরিত দিনগুলোর কথা এখনো মনে পড়ে। তখন ভাবতাম, একটি মেয়েও আমার দিকে ফিরে তাকায় না। আমি জগতের সবচাইতে বড় দুঃখী।এখন ভাবি, আমার জীবনে সেই দিনগুলোই ছিল সবচাইতে সুখের, সবচাইতে আনন্দের। কোথায় চলে গেল সেই স্বপ্নময় দিনগুলো চঞ্চল পাখনা উড়িয়ে দুরন্ত পায়রার মতো। স্মৃতির ভাঙা বন্দরে আমি যেন শুধু একা পড়ে আছি।

একদিনের কথা বলি। ঈদের ছুটি। হাসান প্রস্তাব দিলেন, চলুন কয়েকজন বন্ধু মিলে গুলিস্তান হলে সিনেমা দেখতে যাই। গুলিস্তান হলই তখন ঢাকার একমাত্র অভিজাত প্রেক্ষাগৃহ। ম্যাটিনি শোতে সবাই আমরা জুটলাম গুলিস্তান হলের সামনে।

হাসান এলেন তার প্রেমিকাকে নিয়ে। শিল্পী আমিনুল ইসলামের সঙ্গেও তার গার্ল ফ্রেণ্ড। সেও তখন আর্ট কলেজের ছাত্রী। পরে আমিনুলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর সঙ্গে সালেহা। সালেহাও সম্ভবতঃ তখন আর্ট কলেজের ছাত্রী। পরে বিয়ে হয় দেবদাসের সঙ্গেই। বাকি রইলাম আমরা দুই বন্ধু। আমি এবং দেবপ্রিয় বড়ুয়া (পরবর্তীকালে বাসস প্রধান, তখন ছিলেন ছাত্র)। আমাদের দু'জনেরই প্রেমিকা কিংবা সঙ্গিনী নেই। হাসান, আমিনুল, দেবদাস সিনেমা হলের আসনে জোড়ায় জোড়ায় বসলেন। দেবপ্রিয় মলিন হেসে আমাকে বললেন, চলুন গাফ্ফার, আমরা একসঙ্গে বসি। আমাদেরতো কেউ নেই।

হাসানের প্রেম বেশিদিন টেকেনি। পরে তার বিয়ে হয় যশোরের আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ মশিউর রহমানের শ্যালিকার সঙ্গে। মশিউর রহমান তখন ছিলেন মন্ত্রী। বিয়ের পর নতুন বৌ নিয়ে প্রথমে ঢাকার মন্ত্রিভবনেই উঠলেন হাসান। আমরা সেই ভবনে নতুন বৌ দেখতে গেলাম। হাসান বিছানার উপর একটা ঘিয়ে রঙের রাজশাহী সিল্কের জামা গায়ে বসে আছেন। খুবই হাসিখুশি। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে ফেলেছেন। তার বৌকেও দেখলাম। প্রথমেই চোখে পড়লো তার গায়ের অপূর্ব ফর্সা রঙ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল সুফি মোতাহার হোসেনের বিখ্যাত একটি কবিতার একটি লাইন— "হিমাদ্রি গিরির কন্যা, অঙ্গ যার তুষার ধবল।"

কতকাল আগের কথা। তবু মনে আছে মন্ত্রিভবনে দেখা হওয়ার পর হাসান কানের কাছে মুখ এনে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন দেখলেন?

ঃ খুবই সুন্দরী।

হাসান লাজুক হেসে তেমনি কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললেন, ওকে বিয়ে করেছি কেন জানেন, শুধু গায়ের রঙ দেখে। ফর্সা রঙের দিকে আমার যে কি দুর্বলতা, তাতো আপনি জানেন।

হেসে বলেছিলাম, জানি।

আগের কথায় ফিরে যাই। ফজলুল হক হলে হাসান হাফিজুর রহমানের এগারো নম্বর রুম। এই রুমে পূব মুখো একটি মাত্র জানালা ছিল। পেল্লায় জানালা। লোহার শিক বসানো। যখন কোনো দিন বন্ধুবান্ধব কেউ আসতো না, হাসান নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তখন এই জানালার পাশে বসে থাকতাম। দেখতাম শিরিষ গাছে শেষ বিকেলের আলোছায়ার খেলা। দেখতাম রাস্তায় রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি, দু'একটা মোটর গাড়ির চলাচল। পেছনে হাইকোর্টের রাস্তার দিক থেকে বাসের ভেঁপুর আওয়াজ পাওয়া যেতো। রেলওয়ে কলোনীর খাপড়া এবং ছোট ছোট বিল্ডিংগুলোর সামনে দেখতাম ছেলেমেয়েরা খেলা করছে।

আমি জানালার লোহার শিকে মাথা রেখে গান গাইতাম। বেশিরভাগ রবীন্দ্রসঙ্গীত। একমাত্র শ্রোতা হাসান। আমার গানের গলা ভালো নয়। কিন্তু গান আমার প্রিয় সঙ্গী। লোকজন কাছে না থাকলেই গান গাই। মনে মনে দুঃখ করি, আমার কণ্ঠস্বর ভালো নয় বলে। আবার এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেই, রবীন্দ্রনাথ যে অতবড় কবি, তারও গলার স্বর ছিল মেয়েলি। একবার দিলীপ কুমার রায়ের ভরাট গলায় গান শুনে সবাই যখন বাহবা দিচ্ছে, তখন রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি না হয় দিলীপের মতো গান গাইতে পারি না, দিলীপ কি পারে আমার মতো কবিতা লিখতে?'

হাসানের সেদিন কি হয়েছিল জানি না। হঠাৎ পড়াশোনা বন্ধ করে আমার দিকে চেয়ে বললেন, গাফ্‌ফার, একটা গান গেয়ে শোনান, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান।

বিস্মিত হয়েছিলাম তার অনুরোধ শুনে। কিন্তু আমাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হয়নি। আমি গান ধরেছিলাম, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা/তুমি আমার সাধের সাধনা।' আমার গান শেষ হতেই হাসান বলেছিলেন, গাফ্‌ফার, এখন আমি জানি, আপনি যখন নিঃসঙ্গ থাকেন, তখন কি করে সময় কাটান। নিশ্চয়ই গান গেয়ে। আর আপনি এত গান জানেন, তা আমি জানতাম না।

হেসে বলেছিলাম, শুনলে অবাক হবেন, খুব কম গানই আমি পুরোটা জানি।

প্রায় মাস দুয়েক রোগ-জর্জর শরীরে ফজলুল হক হলের আঙ্গিনা থেকে বাইরে পা দেইনি। এই সময়ে হাসান ছাড়া আর যিনি ছিলেন আমার নিত্যদিনের সঙ্গী, তিনি ডা. মোহাম্মদ মূর্তজা। তিনি সাইকেলে চেপে রোজই আসতেন আমার কাছে। জ্বর পরীক্ষা, ব্লাড প্রেসার মাপা ইত্যাদিতো করতেনই, বেশির ভাগ সময় কাটাতেন রাজনীতি ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনায়। কখনো কখনো তার পকেটে থাকতো নিজের লেখা প্রবন্ধ। সবই সমকালীন রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে লেখা। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণটি এসব লেখায় এত বেশি প্রকট থাকতো যে, আমি মাঝে মাঝে না বলে পারতাম না, আপনার লেখায় ভারসাম্য নেই। খুব বেশি একপেশে হয়ে যাচ্ছে। আপনি সব সমস্যাকেই এক মাত্রায় বিচার করতে চান। কিন্তু কোনো কোনো সমস্যা বহুমাত্রিক, এটা ভুলে যাবেন না। মার্কস্‌ নিজেও কিন্তু একথা বলে গেছেন। তাছাড়া আমার মতে মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞান, ধর্মীয় মতবাদ নয়।

মূর্তজা হাসতেন, বলতেন, সমস্যার সবগুলো মাত্রা বিচার করেই যে বিজ্ঞানের জন্ম, তার নাম মার্কস্‌বাদ। আমার লেখা তাই একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক।

তার সঙ্গে তর্ক করতাম না। কারণ, পরিচয় হওয়া থেকেই লক্ষ্য করছি, মূর্তজা ধর্মে অনাগ্রহী কিন্তু যা বিশ্বাস করেন, তা প্রায় ধর্মীয় উন্মাদনা নিয়ে বিশ্বাস করেন।

তার প্রবন্ধগুলো বিরাট লম্বা। ভাষা সাদামাটা। রোগক্লান্ত শরীরে বিছানায় শুয়ে থাকতাম বলেই তার এই লম্বা প্রবন্ধ শোনার মতো সময় পেতাম এবং ধৈর্য দেখাতে পারতাম। মূর্তজা কেবল তার লেখা শুনিয়ে ক্লান্ত হতেন না। তার বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে চাইতেন। যেমন, তার মত ছিল সশস্ত্র শ্রেণী-যুদ্ধ ছাড়া পৃথিবীর গরীব মানুষের মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। মাও ঝে-দুং যে বলেছেন, বন্দুকের নলই হচ্ছে সকল শক্তির উৎস, মূর্তজার কাছে এর চাইতে বড় সত্য আর কিছু ছিল না।

একদিন প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা ডাক্তার, আগে ইউনিভার্সিটির যে বুড়ো ডাক্তার ছিলেন, তিনি ঘোড়ার গাড়িতে চেপে রোগী দেখতে আসতেন। আপনি সাইকেলে চেপে আসেন কেন?

মূর্তজা প্রথমে বললেন, আমি বুড়ো হইনি বলে। একটু চুপ থেকে বললেন, রোগী দেখতে যাব আমি; সেজন্য একজন সহিস এবং একটি ঘোড়াকে কষ্ট করতে হবে কেন? আমি মানুষ এবং জন্তু কাউকেই খামোকা কষ্ট দিতে চাই না। তাছাড়া এ যুগে ঘোড়ার গাড়ি অচল। সাইকেলে চেপে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি যাওয়া আসা করা যায়।

আরো বছর খানেক পর ডা. মূর্তজা সাইকেল ছেড়ে একটা মোটরবাইক কিনেছিলেন।

প্যারা-টাইফয়েড থেকে মুক্ত হতেই জীবিকার ধান্ধায় আবার পথে বেরুতে হলো। 'দৈনিক মিল্লাতে'র সম্পাদকীয় বিভাগে আমার চাকরিটা ছিল। সেখানে গিয়েই আবার 'জয়েন' করলাম। সেই সঙ্গে শুরু করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস করাও।

এই সময় ছাত্র লীগ নেতা আবদুল আওয়াল আমাকে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে পাকড়াও করলেন। তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক। সভাপতি ছিলেন পাবনার আবদুল মোমিন তালুকদার। বিভাগ-পূর্ব ভারতে মুসলিম লীগের অঙ্গ ছাত্র সংগঠন হিসেবে মুসলিম ছাত্র লীগের জন্ম। এক সময় শাহ্ আজিজুর রহমান ছিলেন এই ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম ছাত্র লীগে ভাঙ্গন ধরে। মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপের নেতা ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং মওলানা আকরম খাঁ। প্রগতিশীল গ্রুপের নেতা ছিলেন বর্ধমানের আবুল হাশিম এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সুবিধাবাদী ছাত্রনেতা শাহ আজিজ খাজা নাজিমউদ্দিনের গ্রুপে গিয়ে জুটলেন। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, নূরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ ছাত্রনেতা জমায়েত হলেন আবুল হাশিম ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রুপে। পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠার পর নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। শাহ্ আজিজের গ্রুপটি পরিচিত হয় নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ রূপে। অন্যদিকে শেখ মুজিব তার সমমনা বন্ধুদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ। এই প্রগতিশীল ছাত্রদলটির হেড অফিস করা হয় ঢাকার ওল্ড মোগলটুলিতে।

শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুরোপুরি এই দলের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় ওল্ড মোগলটুলির ছাত্র লীগও বিভক্ত হয়। আওয়ামী লীগের এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বের অনুরাগী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নবাবপুর রোডে নতুন দলীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং অন্য ক্ষুদ্র অংশটি ওল্ড মোগলটুলিতেই থেকে যায়। আওয়ামী লীগের অঙ্গ ছাত্র সংগঠন রূপে পরিচিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে দীর্ঘকাল ছিলেন যথাক্রমে আবদুল মোমিন তালুকদার এবং আবদুল আওয়াল।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সম্পাদকের পরিচয় ছাড়াও আবদুল আওয়ালের আরেকটি বড় পরিচয় ছিল। তিনি 'দৈনিক ইত্তেফাক' যখন সাপ্তাহিক ছিল, তখন থেকেই ছিলেন এই পত্রিকার অঘোষিত নির্বাহী- সম্পাদক এবং সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার ডান হাত। বহুকাল 'ইত্তেফাকে' দ্বিতীয় শক্তিধর মানুষ বলতেই আবদুল আওয়ালকে বোঝাতো।

আবদুল আওয়াল কলেজ ছাড়ার পর কিছুকাল লেখাপড়া করেননি। সম্ভবতঃ তার আর্থিক অবস্থাই এর বড় কারণ। ছাত্র রাজনীতি নিয়েই তিনি বেশি ব্যস্ত ছিলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের রাজনৈতিক অনুসারী হিসেবে তাকে বার বার জেলে যেতে হয়েছে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটু বেশি বয়সে এসে ভর্তি হয়েছিলেন। রাজধানীর ছাত্র রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করাও ছিল সম্ভবতঃ তার নতুন করে লেখাপড়া শুরু করার আরেকটি কারণ।

১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি ছাত্র লীগে যোগ দেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহবায়ক নির্বাচিত হই আমি এবং জহির রায়হান। ফলে ছাত্র লীগ নেতা আবদুল আওয়ালের সঙ্গেও আমার এবং জহির রায়হানের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।

এই আবদুল আওয়াল যেদিন আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে পাকড়াও করলেন, তখন প্রথমে ভেবেছিলাম, তিনি সংগঠন সম্পর্কে কোনো আলাপ করবেন। কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি একবার 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলে। তোমার সেই আগ্রহ কি এখনো আছে?

সোৎসাহে বললাম, নিশ্চয়ই আছে।

ঃ তুমি মানিক মিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? আমি কিন্তু সঙ্গে থাকবো না।

মানিক মিয়ার হিটলারি গোঁফ এবং রাশভারি চেহারার কথা মনে পড়ায় একটু দমে গেলাম। মিনমিনে গলায় বললাম, কবে দেখা করতে হবে?

আগামীকালই। সকাল দশটা-এগারোটার দিকে হাটখোলা রোডে প্যারামাউন্ট প্রেসে যেতে হবে।

ঃ তিনি কি আমার সঙ্গে কথা বলবেন?

আওয়াল হেসে বললেন, তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি তোমার সঙ্গে না থাকলেও তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। আসলে তিনিই আমাকে বলেছেন, তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা জানাতে।

দুই

'ইত্তেফাক' অফিস তখন হাটখোলায়। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা বলছি। প্যারামাউন্ট প্রেসের ছোট অফিস ঘরেই 'ইত্তেফাক' অফিস। প্যারামাউন্ট প্রেসের মালিক হাবিবুর রহমান তার চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলে সেই চেয়ারে এসে বসতেন ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া। তার বাঁ পাশের একটা ছোট্ট টেবিলে পুরো বার্তা-বিভাগের বসার ব্যবস্থা। প্রুফ রিডাররা যে যেখানে পারতেন টুল-চেয়ার পেতে প্রুফ রিডিং করতেন। সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় যারা লিখতেন, তাদের বসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। খোন্দকার আবদুল হামিদ তখন 'ইত্তেফাকের' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বাসায় বসে সম্পাদকীয় অথবা মিঠাকড়া ফিচারটি লিখতেন। আবদুল আউয়াল বেশির ভাগ সময় ছাত্র রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মাঝে মাঝে এসে 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় লিখতেন অথবা মানিক মিয়ার 'রাজনৈতিক মঞ্চের' ডিকটেসন নিতেন। প্রায়শঃই এই ডিকটেসন নেয়ার কাজটি করতেন সিরাজুর রহমান। তখন তিনি ঢাকায় বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসে চাকরি করতেন। 'ইত্তেফাকে' ছিলেন পার্ট-টাইম। পরে তিনি বিবিসি রেডিওর বাংলা বিভাগে জয়েন করে লণ্ডনে চলে যান।

'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লেখার লোকদের জন্য মানিক মিয়ার (অথবা হাবিবুর রহমান সাহেবের) টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারই ছিল একমাত্র আসন। মানিক মিয়ার কাছে সাক্ষাৎপ্রার্থী কেউ এলে আমাকে ওই চেয়ার

ছেড়ে দিয়ে বাইরের বারান্দায় পায়চারি করে অপেক্ষা করতে হতো— কখন সাক্ষাৎপ্রার্থী চলে যান। আমি 'ইত্তেফাকে' জয়েন করার পর অফিসে বসেই সম্পাদকীয় অথবা 'মিঠাকড়া' কলামটি লিখতাম। এজন্য নিজের বসার একটি স্থান আমি খুঁজে নিয়েছিলাম। সে কথায় পরে আসছি।

আবদুল আউয়ালের নির্দেশে পরদিন বেলা এগারোটার দিকে ফজলুল হক হল থেকে একটা রিকশা নিয়ে হাঁটখোলায় প্যারামাউন্ট প্রেসে হাজির হলাম। মানিক মিয়া ততক্ষণে এসে গেছেন। তার মাথার চুল তখনো পাকেনি (অথবা কলপ ব্যবহার করতেন)। ঠোঁটের উপর হিটলারী গোঁফও কালো। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। সত্যি কথা বলতে কি, পরিচয়ের শুরুতে মানিক মিয়াকে আমি দারুণ ভয় করতাম। অথচ পরবর্তীকালে তার সম্পর্কে আমার মনে এই ভয়ডর দ্বিধার লেশমাত্র ছিল না। তার অসীম স্নেহ আমি লাভ করেছিলাম। বয়সের বাধা ডিঙ্গিয়ে তার অতি আপন হয়ে উঠেছিলাম। তার অকাল-মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের এই সম্পর্ক অটুট ছিল।

পরিচয়ের শুরুতে মানিক মিয়াকে যে আমি ভয় করতাম, তার একটা কারণ ছিল। তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি খুব সুখের নয়। 'ইত্তেফাক' তখন সাপ্তাহিক। মানিক মিয়ার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। থাকেন কমলাপুরের এক বস্তিতে। ১৯৫৩ সালের কথা। শুনতে পেলাম, সামনে নির্বাচন, তাই 'ইত্তেফাক' পত্রিকাকে চার-পৃষ্ঠার দৈনিক হিসেবে বের করার চেষ্টা চলছে। এই দৈনিকের জন্য দু'চারজন সাংবাদিক নেয়া হবে। আমি তখন দৈনিক 'সংবাদের' চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। বলতে গেলে বেকার। সুতরাং বন্ধুবান্ধব এবং হিতৈষীদের পরামর্শ শুনে একদিন কমলাপুরে মানিক মিয়ার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। একটা হতশ্রী খোলার বস্তি ঘরে 'ইত্তেফাকের' সম্পাদক থাকেন দেখে মনটা প্রথমেই মুষড়ে গেল। বসার-ঘর ছিল না। সুতরাং বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে মানিক মিয়া বেরিয়ে এলেন। পরনে লুঙ্গি। গায়ে একটা গেঞ্জি। পায়ে কাঠের খড়ম। আমাকে দেখে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কি চাই?

তাকে দেখেই ভয় পেয়েছিলাম। তবু, সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'ইত্তেফাক' দৈনিক হবে জেনে এসেছি। আমি সাংবাদিকতা জানি। দৈনিক সংবাদ-এ কাজ করতাম।

তিনি আমার কথা গায়ে মাখলেন না। রূঢ় কণ্ঠে বললেন, তা এখানে কি জন্য এসেছেন? চাকরিতো অফিসে। অফিসে গেলেই পারতেন।

বলেই যেভাবে তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে ঘরে ঢুকে গেলেন। আমার দিকে আর ফিরেও তাকালেন না। আমি কিছুক্ষণ বেকুবের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আবার রাস্তায় ফিরে এলাম।

আমি সেদিন ধরেই নিয়েছিলাম মানিক মিয়া অত্যন্ত রূঢ় প্রকৃতির লোক। তার কাছে গেলে আমার চাকরি হবে না। সুতরাং তখন আর চাকরির জন্য তার কাছে যাইনি। পরবর্তীকালে যখন 'ইত্তেফাকে' কাজ করেছি, তার সঙ্গে মিশেছি, তখন বিস্মিত হয়ে দেখেছি, বাহ্যিক রূঢ়তার আড়ালে কি আশ্চর্য সংবেদনশীল, মায়া-মমতায় আর্দ্র এই মানুষটির মন। সম্পাদক হিসেবে তার সাহসের কোনো তুলনা এখানো বাংলাদেশে নেই। যে কোন মতের বা দলের বন্ধুর বিপদে বিনা দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়ানোর মতো দ্বিতীয় মানুষও আমি দেখিনি।

এর প্রায় দু'আড়াই বছর পর ১৯৫৬ সালে আমি আবারও মানিক মিয়ার মুখোমুখি হলাম। এবার হাটখোলা রোডে প্যারামাউন্ট প্রেসে। এবারও আমি চাকরি প্রার্থী। আর মানিক মিয়ারও তখন স্বচ্ছল অবস্থা। তিনি দৈনিক পত্রিকার মালিক। আর বস্তিবাসী নন। থাকেন পুরনো ঢাকার দয়াগঞ্জে শরৎ গুপ্ত রোডের একটা ভাড়া করা দালান বাড়িতে।

আজ তার কাছ থেকে উষ্ণ ও অমায়িক ব্যবহার পেলাম। আমাকে একনজর দেখেই চিনে ফেলে বললেন, আরে গাফ্‌ফার সাহেব যে, আপনি এসে গেছেন। আমি আউয়ালকে বলেছিলাম আপনাকে খবর দিতে। তারপর সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, বসুন।

দু'আড়াই বছর আগের তিক্ত স্মৃতি আমার মনে ছিল। তাই কুণ্ঠিতভাবে চেয়ারটায় বসলাম। মানিক মিয়া বললেন, 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় বিভাগে আমাদের একজন লোক দরকার। 'মিল্লাতে' আপনার লেখা পড়ে আমার ভালো লেগেছে। আপনি কি 'ইত্তেফাকে' আসতে চান?

বললাম, জ্বি, আমি আসতে চাই।

আর কোনো কথা নয়। মানিক মিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তাহলে আজই মেইন এডিটোরিয়ালটা আপনি লিখে ফেলুন। বসার জায়গা কিন্তু নেই। এই টেবিলে বসেই লিখতে পারেন।

আমি তার কথা শুনে হতভম্ব। আড়াই-বছর আগে যার কাছে চাকরি চাইতে গিয়ে পত্রপাঠ বিদায় হয়েছিলাম, আজ সেই মানুষটি এককথায় চাকরি দিচ্ছেন, একবার জানতেও চাইছেন না যে, আজই আমি কাজে জয়েন করার অবস্থায় আছি কি না। সসঙ্কোচে মানিক মিয়াকে জানালাম, আমি এখনো দৈনিক 'মিল্লাতের' স্টাফ। সেখানে গিয়ে আগে আমাকে চাকরি ছাড়ার কথা বলতে হবে।

মানিক মিয়া মাথা নেড়ে বললেন, কিছু দরকার নেই। আমি এখনই মোতাহারকে ('মিল্লাত' সম্পাদক মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী) টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি যে, আপনি এখন থেকে 'ইত্তেফাকে' কাজ করবেন।

আমি সভয়ে বললাম, না মানিক ভাই, আপনি মোতাহার ভাইকে কিছু বলতে যাবেন না। আমি সম্প্রতি অসুখ থেকে উঠেছি। অসুখের সময় তিনি আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তাতে এভাবে 'মিল্লাতের' চাকরি ছেড়ে দিলে তিনি মনে কষ্ট পাবেন, আমাকে ভুল বুঝবেন। তার চাইতে আমি আজ 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় লিখছি। লেখা শেষ করে 'মিল্লাত' অফিসে যাব এবং মোতাহার ভাইকে সব কথা বুঝিয়ে বলবো।

মানিক মিয়া আপত্তি করলেন না। বললেন, বেশ তাই করুন। আপনি এখনই এডিটোরিয়াল লেখা শুরু করে দিন।

ঃ আপনি কি সাবজেক্টটা বলে দেবেন? বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

মানিক মিয়া বললেন, খাদ্য-পরিস্থিতি নিয়ে লিখলে ভালো হয়। প্রদেশে খাদ্য ঘাটতি বাড়ছে। যে কোনো সময় দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিতে পারে। অথচ চীফ মিনিস্টার গতকাল যা বলেছেন, তাতে এই সঙ্কটের কোনো আভাস নেই। তাকে একটু কড়াভাবে হুঁশিয়ার করে দেয়া দরকার। লেখার আগে চীফ মিনিস্টারের বক্তৃতার বিবরণটা পড়ে নিন।

'পূর্ব পাকিস্তানে' তখন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন। আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী। প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ বিরোধী দল। আতাউর রহমান খান বিরোধী দলের নেতা। আমি কাগজের ফাইল টেনে আবু হোসেন সরকারের বক্তৃতার বিবরণটা পড়তে শুরু করলাম।

এ সময় ঝড়ের বেগে প্যারামাউন্ট প্রেসের অফিস কক্ষে ঢুকলেন জহুর হোসেন চৌধুরী। তিনি তখন 'দৈনিক সংবাদের' সম্পাদক। তাকে দেখে আমি চেয়ার ছেড়ে দিলাম। জহুর চৌধুরী বললেন, মানিক ভাই, আপনি এখনো অফিসে? আজ প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির মিটিং আছে না?

মানিক মিয়া বললেন, আমি গাফ্ফার চৌধুরীকে আজকের মেইন এডিটোরিয়ালের ব্রিফিংটা দিয়েই রওয়ানা হবো ভাবছিলাম।

জহুর ভাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওহ্ আপনি এখানে এসে জুটেছেন?

এটা তার ঠাট্টা না প্রশ্ন বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে রইলাম।

মানিক মিয়া বললেন, আমিই ওকে ডেকে এনেছি। 'মিল্লাতে' কাজ করছে। মোহন মিয়ার কাগজের অবস্থাতো তুমি জানো। আজ আছে কাল নেই। 'সিরিয়াসলি' কাগজটা তিনি চালাচ্ছেন না। গাফ্ফার ভালো লেখে। 'মিল্লাতে' কাজ করে পচার চাইতে আমাদের সঙ্গে কাজ করলে ওর একটা ভবিষ্যৎ আছে।

মানিক মিয়া জহুর চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে আমাকে বললেন, লেখাটা শেষ করে সোজা প্রেসে কম্পোজের জন্য পাঠিয়ে দেবেন।

কুণ্ঠিতভাবে বললাম, আপনি আগে একবার দেখবেন না?

ঃ আগে দেখার দরকার নেই। বিকেলে ফিরে এসে গ্যালি প্রুফেই দেখে নেব।

মানিক মিয়া চলে গেলেন। প্রথম দিনেই আমার লেখা সম্পর্কে তার মনে দারুণ আস্থার ভাব দেখে বেজায় খুশি হয়েছিলাম। দুঃখ ছিল এই যে, এই খুশির ভাব কারো কাছে তখন প্রকাশ করতে পারিনি। কাউকে ডেকে বলতে পারিনি, আজকের দিনটা আমার জীবনে কতবড় সৌভাগ্যের দিন।

সেদিন খবরের কাগজের ফাইল খুঁজতে গিয়েই আমার নজরে পড়েছিল প্যারামাউন্ট প্রেসের এই অফিসে ঘরের পাশেই একটা ছোট গুদাম ঘর আছে। চারদিকে কাগজের স্তূপ। একটি ছোট্ট জানালা আছে। তা দিয়ে আলো বাতাস কিছুই ঢোকে না। দিনের বেলাতেও আলো জ্বালাতে হয়। তাছাড়া আছে একটি ভাঙ্গা টেবিল এবং হাতল-ভাঙ্গা দু'টি কি তিনটি চেয়ার। আমি এই ঘরটিকেই বেছে নিলাম আমার লেখার ঘর হিসেবে। আলোবাতাস না থাক, আমাকে কেউ এই ঘরে 'ডিস্টার্ব' করতে আসবে না।

'ইত্তেফাকের' জন্য আমার প্রথম লেখা সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল "খাদ্য পরিস্থিতি'। আবু হোসেন সরকারকে এই লেখায় কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলাম। আমার সাংবাদিক জীবনের অন্যতম গুরু খোন্দকার আবদুল হামিদ তার লেখায় প্রায়ই একটা ছড়া ব্যবহার করতেন,

"যদি প্রাণে বাঁচতে চান
সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচান।"

আমিও আবু হোসেন সরকারের বক্তব্যের কড়া সমালোচনায় এই ছড়াটি যুৎসইভাবে ব্যবহার করেছিলাম। তখন ঢাকার সবগুলো দৈনিক পত্রিকার পাতায় কলাম ছিল আটটির জায়গায় সাতটি। বেশ মোটামোটা কলাম। পরদিন 'ইত্তেফাকে' আমার এই সম্পাদকীয়টি আড়াই-কলাম জুড়ে ছাপা হয়েছিল। মানিক মিয়া লেখাটি পড়ে খুবই খুশি হয়েছিলেন। দেখা হতেই বললেন, ভাবছিলাম, আপনাকে দু'শ টাকা বেতন দেব। কিন্তু আজ রফিক সাহেবকে ('ইত্তেফাকের' তখনকার একাউন্টেন্ট-কাম-ক্যাশিয়ার) ডেকে বলে দিয়েছি, ওটা আড়াইশ' টাকা করে দিতে। আজ আমি 'রাজনৈতিক মঞ্চ' লিখতে চাই না। আপনি একটা সাবজেক্ট বেছে নিয়ে 'মিঠাকড়া' কলামটি লিখে ফেলুন।

এভাবেই শুরু হল 'ইত্তেফাকে' আমার সাংবাদিকতার নতুন সংসার।

ডা. মূর্তজা একদিন যথারীতি ফজলুল হক হলে আমার রুমে এসে 'ইত্তেফাকে' আমার চাকরি হওয়ার খবর শুনলেন। মন্তব্য করলেন, 'ইত্তেফাক'

মাস্ সার্কুলেটেড পেপার। আপনার সাংবাদিকতার জন্য এটা ভালো হল। আমি শুধু ভয় পাচ্ছি, আপনি না আবার মানিক মিয়ার রাজনৈতিক মতামত দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

বললাম, ক্ষতি কি? মানিক মিয়ার 'রাজনৈতিক মঞ্চ' অত্যন্ত 'পপুলার' কলাম। আমি যদি তার মতো লিখতে পারি, তাহলেতো আমারই বিরাট লাভ।

মূর্তজা মাথা নেড়ে বললেন, কিন্তু একথাতো সত্য, মানিক মিয়া সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, তিনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

হেসে বললাম, আগেতো দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রই আসুক। তারপর দেখা যাবে সমাজতন্ত্র আসে কিনা?

মূর্তজা আমার কথায় সায় দিলেন না। বললেন, না গাফ্‌ফার সাহেব, দেশে একবার বুর্জোয়া গণতন্ত্র জাঁকিয়ে বসলে সমাজতন্ত্র আর কায়েম করা যাবে না। দেখছেন না, বৃটেন, ফ্রান্স আমেরিকার অবস্থা। রাশিয়া ও চীনে বুর্জোয়া গণতন্ত্র জাঁকিয়ে বসার আগেই সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছিল। নইলে এই দুই দেশেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

বলতে বলতে তিনি পকেট থেকে একটা মোটা কাগজের বাণ্ডিল বের করলেন। বললেন, চীনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা দেশে কি ভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সে সম্পর্কে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি। নাম 'নয়া চীনের পথ আমাদের পথ'। আপনি লেখাটা একটু শুনবেন কি?

আমি ভীত কণ্ঠে বললাম, দোহাই ডাক্তার। আমাকে এখন আপনার অত লম্বা থিসিস শোনাতে শুরু করবেন না। বরং লেখাটা রেখে যান, আমি ধীরে সুস্থে পড়বো।

মূর্তজা বললেন, লেখাটা কি 'ইত্তেফাকের' সাহিত্যের পাতায় ছাপা যাবে?

আমি দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললাম, অসম্ভব। 'ইত্তেফাক' একটি প্রগতিশীল দৈনিক পত্রিকা। সম্পাদক মানিক মিয়াও এই লেখা ছাপতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু যিনি এখন 'ইত্তেফাকের' সাহিত্যের পাতার সম্পাদক, তিনি এই লেখা ছাপাতে চাইবেন কি না, আমার সন্দেহ আছে।

ঃ এই সাহিত্য সম্পাদকটি কে? মূর্তজা জানতে চাইলেন।

ঃ ভদ্রলোকের নাম শামসুল হক। আসামে বাড়ি ছিল। এখন ঢাকায় বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসে চাকরি করেন। সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে তার পেশাগত ভীতি আছে। সুতরাং তিনি সহজে এই ধরনের লেখা, যার শিরোনাম আবার 'নয়া চীনের পথ আমাদের পথ' ছাপতে চাইবেন না। আপনি 'দৈনিক সংবাদের' সাহিত্যের পাতায় লেখা ছাপানোর চেষ্টা করেন না কেন?

মূর্তজা মহাদুঃখিত কণ্ঠে বললেন, 'সংবাদের' সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক আরো কট্টর। তারা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে লেখা ছাপতে চান, কিন্তু আমার লেখা নয়। আমার লেখা নাকি বেশি বড় এবং তারা মনে করেন, লেখার ব্যাপারে আমার আরো অনুশীলন প্রয়োজন।

ডা. মোহাম্মদ মূর্তজা কখনো লেখার ব্যাপারে তার উৎসাহ হারাননি। কাগজের সম্পাদকেরা তার লেখা ফেরত দিয়েছে। তবু তিনি অনবরত লিখে চলেছেন। অবশেষে একদিন তার শুভদিন এলো। প্যারামাউন্ট প্রেসের মালিক হাবিবুর রহমান সাহেব ঠিক করলেন, তিনি তার প্রেস থেকে একটি সাহিত্য-মাসিক বের করবেন। তিনি আমাকে পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব দিতে চাইলেন। আমি তখন 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করছি। কিন্তু একটি সাহিত্য-মাসিক সম্পাদনার দারুণ লোভ ছিল আমার। তাই 'ইত্তেফাকের' চাকরিতে থেকেই 'পার্ট-টাইম' কাজ হিসেবে সাহিত্য-মাসিক সম্পাদনার দায়িত্ব নিলাম। পত্রিকাটির নাম ঠিক করে দিলেন শিল্পী-বন্ধু কাইয়ুম চৌধুরী। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ তিনি এঁকে দিলেন; এমন কি ভেতরের পাতার লে-আউটও। নাম হল 'সচিত্র মেঘনা'।

আমি সাহিত্য-মাসিকের সম্পাদক হয়েছি জেনে ডা. মূর্তজা সোজা প্যারামাউন্ট প্রেসে এসে হাজির। বগলে বিরাট লেখার ফাইল। একগাল হেসে বললেন, একটা বা দুটো লেখা নয়, সব লেখার ফাইল নিয়ে এসেছি। আপনার যখন যেটা পছন্দ হয় ছাপবেন। আমার আর লেখা ছাপানোর সমস্যা রইলো না।

আমি তার কাণ্ড দেখে হাসবো না কাঁদবো, ভেবে পেলাম না।

'মেঘনা' প্রকাশিত হবার পর প্রথম শুভেচ্ছা বাণী পেয়েছিলাম কোনো সাহিত্যিক কিংবা সাংবাদিকের কাছ থেকে নয়। পেয়েছিলাম একজন রাজনীতিকের কাছ থেকে। তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি তার শুভেচ্ছা বাণীতে লিখেছিলেন, 'মেঘনা, মধুমতি এইসব নদীর নামের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের চিরন্তন প্রাণ-প্রবাহ। এই প্রাণ-প্রবাহ থেকেই একদিন জোয়ার সৃষ্টি হবে। সেই জোয়ারই সকল শাসন-শোষণ-ষড়যন্ত্রের বালির বাঁধ ভেঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির মুক্তি ও স্বাধিকারকে সুনিশ্চিত করে তুলবে। আমরা মেঘনা-মধুমতির সেই জোয়ারের অপেক্ষায় আছি।'

তিন

জীবনে কি চেয়েছিলাম আর কি পেয়েছি তার কোনো হিসেব মিলাতে আজ আর পারছি না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কি পাইনি তার হিসেব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।' আমি কিন্তু এই হিসেব মিলাতে রাজি। কেবল অনেক অঙ্ক কষেও হিসেব

মেলে না। এই হিসেব যারা মেলাতে চান না, তারা রবীন্দ্রনাথের মতো কবি অথবা দার্শনিক। আর যারা এই হিসেব মেলাতে পারেন, তারা ইহ সংসারে সুখী।

ষাটের দশকের একটা গল্প বলি। এই হিসেব মেলানোর গল্প। আমি তখন মওলানা আকরম খাঁর 'দৈনিক আজাদের' সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করি। এই সময় 'আজাদের' মহিলা পাতার সম্পাদক ছিলেন মাসুদা চৌধুরী। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম এ ক্লাসের ছাত্রী। সুন্দরী তরুণী। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করে প্রচুর নাম করেছেন। 'আজাদ' অফিসে আসতেন। বসতেন সম্পাদকীয় বিভাগের যৌথ টেবিলটাতে আমার উল্টোদিকের চেয়ারে।

তিনি আমার চাইতে বয়সে দু'এক বছরের বড়। তবু স্বীকার করতে আপত্তি নেই, সেই ষাটের দশকের একেবারে গোড়ায় তিনি যখন আমার সামনের চেয়ারটাতে এসে বসতেন আমার ভালো লাগতো। তার চেহারায় এক ধরনের ক্লান্ত এবং স্নিগ্ধ লাবণ্য ছিল। সেটাই আমাকে দু'দণ্ড শান্তি দিতো। মাসুদা চৌধুরী এখন পরস্ত্রী। শুধু পরস্ত্রী নন, আমার বড় ভাইয়ের মতো বন্ধু শরফুল আলমের স্ত্রী এবং তার সন্তানের জননী। দু'জনেই ওয়াশিংটনে আছেন। আমি ওয়াশিংটনে যেবার প্রথম বক্তৃতা দিতে যাই মাসুদা চৌধুরী এসেছিলেন আমার সভায়। দেখা হয়েছে। অতীতের সুখ-দুঃখের কথাও হয়েছে। তার চেহারায় এখনো রয়েছে অস্তমিত লাবণ্যের আভা। যাক গে, পরস্ত্রীর রূপ বর্ণনায় আর কাজ নেই। ষাটের দশকের গোড়ার কথাই আবার বলি।

বাংলাদেশে বা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে সিনেমা শিল্প মাত্র হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুচ্ছে। 'মাটির পাহাড়' আর 'মুখ ও মুখোশ' ছবি আমাদের একমাত্র সম্বল। এহতেশাম উর্দু ছবি তৈরি করে লাহোরী উর্দু ছবির সঙ্গে পাল্লা দেয়ার চেষ্টা করছেন। এস এম পারভেজ খুব কষ্ট করে একটি সিনেমা সাপ্তাহিক চালান। নাম 'চিত্রালী'। সম্ভবতঃ একমাত্র সিনে-মাসিক ছিল 'চলন্তিকা'। ওয়াইজ ঘাটের শেলী প্রেস থেকে বেরুতো। আজিজ মিসির সম্পাদনা করতেন। ঝর্ণা বসাক তখন খুবই সুন্দরী তন্বী তরুণী অভিনেত্রী। ব্যাঙাচি যেমন খোলস বদল করে ব্যাঙ হয়; তেমনি ঝর্ণাও ঝর্ণা নামের খোলস ত্যাগ করে শবনম নামে মাত্র পর্দায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। সুলতানা জামান, সুমিতা তখন পরিচিত নায়িকা। কবরী, সুচন্দা, রওশন আরা ইত্যাদি নামের মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ঠিক সেই সময় একদিন 'আজাদ' অফিসে বসে মাসুদা চৌধুরীকে বললাম, মাসুদা আপা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

তিনি তার মহিলা পাতার লেখা সংশোধন করছিলেন প্রেসে পাঠানোর জন্য, মাথা তুলে বললেন, বলুন।

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৯মে'র ঝড়ের দু'দিন পর ১১ মে আমার বড় মেয়ে তনিমা এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করে। এই বাড়িতে বসেই আমি 'নাম না জানা ভোর' নামে একটি উপন্যাস লিখি। শেখ সাহেব বাজারের বাড়িটিই তার পটভূমি। এই উপন্যাসটি লেখারও একটি নেপথ্য কথা আছে। গাজি শাহাবুদ্দিন তখন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে 'সচিত্র সন্ধানী' বের করেছেন। তার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার জন্য একটি উপন্যাস দরকার। আমি রোজ পনর- বিশ পাতা করে লিখতাম। সঙ্গে সঙ্গে তা কম্পোজ করার জন্য নেওয়া হতো। আতাউস সামাদ তখন 'সন্ধানীর' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিই 'আজাদ' অফিস থেকে বাড়ি ফেরার মুখে আমার কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করতেন। তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করার জন্য তাগিদ দিতেন।

শেখ সাহেব বাজারের বাড়িতে বসেই আমি ডাঃ মূর্তজার ব্যক্তি মানসের সঙ্গে বেশি পরিচিত হয়ে উঠি। সকাল-সন্ধ্যা তার সঙ্গে ওঠাবসার ফলে শুধু বন্ধুত্ব নয়, এক ধরনের অন্তরঙ্গতাও গড়ে উঠেছিল। কৈশোরের দুঃখ-দরিদ্র্য তার মনোবল ভাঙতে পারেনি; বরং তাকে অদম্য ও বিদ্রোহী করে তুলেছিল। সাম্যবাদ ও মাওবাদের প্রতি তার অকুণ্ঠ আনুগত্য গড়ে উঠেছিল সম্ভবত এই বিদ্রোহী মনোভাব থেকেই। তার এই আনুগত্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। তার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মতের মিল হতো না। তাতে আমাদের বন্ধুত্বে কোনোদিন ফাটল ধরেনি। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন, আপনি নিম্ন মধ্যবিত্তের পাঁতি বুর্জোয় মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারছেন না।

আমি প্যারা-টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হওয়ার সময় তিনি আমার রোগটাকে ম্যালেরিয়া বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ফলে তার ডাক্তারি বিদ্যার উপর আমার আস্থা একটু কম ছিল। তাতে তিনি মনোক্ষুণ্ন হতেন না। আমার ছেলেমেয়ের ছোটখাটো রোগে নিজে যেচে চিকিৎসা করতেন। বলতেন, বড় রোগে আমার উপর ভরসা না করুন, ছোটখাটো রোগে বিশ্বাস রাখতে পারেন। আমার মেজো মেয়ে চিন্ময়ীর জন্মের সময়ে সারা রাত তিনি ছিলেন আমার বাসায়। শেষ রাতে নিজে গুলিস্তানের কাছে নাইট ফার্মেসিতে গিয়ে জরুরী ওষুধ নিয়ে এসেছেন।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ডাঃ মূর্তজা বাম— বিশেষ করে মাওবাদী রাজনীতিতে বেশি জড়িত হয়ে পড়েন। মাওবাদীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা এবং মাওবাদের প্রতি তার উগ্র আনুগত্য বাড়তে থাকে। আমি এই সময় ছাপাখানার ব্যবসা শুরু করি এবং পুরনো ঢাকায় বাসা নেই। মূর্তজাও বিয়ে-শাদী করে সংসারী হন। আমার সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হওয়া কমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

ডাঃ মূর্তজার খবর তারপর আর বহুদিন রাখিনি এবং পাইনি। সবশেষে যেদিন পেলাম, সেদিন মুক্তিযুদ্ধ শেষে কলকাতা থেকে মুক্ত বাংলাদেশে ফিরে এসেছি। আগেই শুনেছিলাম, ঢাকা মুক্ত হওয়ার কিছু আগে দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করার কথা। সেদিন জানতে পারলাম, এই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় ডাঃ মূর্তজাও আছেন। মীরপুরের বধ্যভূমিতে তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ সনাক্ত হওয়ার খবরও পরে জানতে পেরেছি। সাভারের জাতীয় বীরদের স্মৃতিসৌধে ডাঃ মোহাম্মদ মূর্তজা এখন একটি নাম। কিন্তু এই নামটির আড়ালে যে মানুষটি ছিলেন, তার যে সংগ্রাম, সাধনা, নীতিনিষ্ঠা ছিল, আমার মতো এমন করে তা অনেকেই জানেন না। ডাঃ মূর্তজার কথা মনে হলে এখনো আমার চোখে ভেসে উঠে একটি আত্মবিশ্বাসী হাসিমাখা মুখ। কানে বাজে তার কণ্ঠ— হোণ্ডায় চেপে যে কবিতা তিনি আবৃত্তি করতেন, "নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা/ মৃত্যুরে না করি শঙ্কা, দুর্দিনের অশ্রুজলধারা/ মস্তকে পড়িবে ঝরি তার মাঝে যাব অভিসারে/ জীবন সর্বস্ব ধন অর্পিয়াছি যারে।"

চার

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের সিদ্ধান্তটি ছিল আমার স্ত্রী সেলিমা আফরোজের। যত অসুখ-বিসুখ, বাধা-বিপত্তি থাক, এবার একবার দেশে যেতেই হবে। এক মাসের জন্য হলেও যাব। কিন্তু অসুস্থ এবং পঙ্গু স্ত্রীকে নিয়ে আমি একা কি করে দেশে যাব? মেয়ে বিনীতা অফার করলো, মায়ের নার্স হিসেবে সে সঙ্গে যাবে। বৃটিশ এয়ারওয়েজ জানালো, পঙ্গু যাত্রীর জন্য হুইলচেয়ার সমেত প্লেনে ওঠা এবং নামার সব ব্যবস্থা তাদের আছে, এমন কি আমার স্ত্রীর জন্য তারা একটি স্পেশাল সীটের ব্যবস্থা করবেন।

এরপর দেশে যাওয়ার দিন তারিখ ঠিক করা। সামনে জানুয়ারী মাস। ঠিক করলাম, শীতকালেই দেশে যাওয়া উচিত হবে। প্রায় কুড়ি বছর পর দেশে যাচ্ছি। হঠাৎ সেখানে মে-জুন মাসে গেলে গরম সহ্য হবে না। বরং ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসটাই হবে আমাদের জন্য ভালো সময়। তখন অসহ্য গরম থাকবে না। বৃষ্টি-বাদলা থাকবে না। সারাদিন থাকবে মিষ্টি রোদ। তাছাড়া সবরকম ফল শাক সবজির মওসুম এটা। সুতরাং খাওয়া- দাওয়াটাও জমবে ভালো।

কিন্তু যাব বললেই যাওয়া হয় না। দীর্ঘকাল পর আমরা বাংলাদেশে যাব শুনে আমাদের জিপি (জেনারেল প্রাকটিশনার) একগাদা ওষুধ, ইনজেকশনের বিধান

বললাম, আপনি চমৎকার অভিনয় করেন, তার উপর সুন্দরী .....

মাসুদা চৌধুরী আমাকে হঠাৎ থামতে দেখে বললেন, থামলেন কেন, বাকি কথাটাও বলুন।

আমি সহজ হয়ে সহজকণ্ঠে বললাম, ঢাকায় এখন সিনেমা শিল্প গড়ে উঠতে চলেছে। আজ না হোক, দশ বছরের মধ্যে এই শিল্পে রমরমা ভাব আসবেই। ঢাকার পর্দায় এখন সুন্দরী নায়িকার খুবই চাহিদা। পরে হয়তো অনেকেই এসে যাবেন। এই সময় আপনি কেন ছায়াছবিতে যাচ্ছেন না। আমার ধারণা, আপনি যেতে চাইলে এহতেশাম, সুভাষ দত্ত, এমন কি ফতেহ্ লোহানীর মতো পরিচালকও আপনাকে লুফে নেবে।

মাসুদা চৌধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ টেবিলের উপর রাখা নিউজপ্রিন্টের রাইটিং প্যাডে কলম দিয়ে আঁকিজুকি আঁকলেন। তারপর মৃদ স্বরে বললেন, আমার হিসেবটা খুব সোজা। ঢাকায় তৈরি ছবির বাজার এখনো গড়ে উঠেনি। ছবিতে অভিনয় করে খুব কম টাকা পাওয়া যায়। নায়ক-নায়িকারাও যা পান, তা উল্লেখ না করাই ভালো।

বললাম, এ অবস্থাতো চিরকাল থাকবে না।

মাসুদা চৌধুরী বললেন, আমিও সেই চিরকালের হিসেবটাই খতিয়ে দেখছি। আপনি বলছেন দশ বছর। আমার ধারণা, ঢাকার ছবির লাভজনক বাজার গড়ে উঠতে আরও পনর থেকে বিশ বছর লাগবে। তখন ঢাকার ছবিতে অভিনয় করে ভালো পয়সা পাওয়া যাবে। এই পনর-বিশ বছর পরে আমার বয়স কত হবে, তার হিসেব করেছেন? নায়িকা হওয়ার বয়স আমার থাকবে না। পর্দায় তখন কাঁচা বয়সী নতুন নায়িকারা আসবেন, ভালো পয়সা তারাই পবেন। তাহলে আমি এখন কি আশায় ঢাকার ছায়াছবিতে ঢুকবো? তার চাইতে এম এ টা পাস করে অন্য পেশাতেই ঢোকা কি আমার জন্য ভালো নয়?

সেদিন তরুণ বয়সের আবেগপ্রবণ মন নিয়ে তার হিসেবের যুক্তিটা মানতে চাইনি। কিন্তু প্রায় তিন দশক পর— নব্বুইয়ের দশকের গোড়ায় আবার ওয়াশিংটনে যখন তার সঙ্গে দেখা হল, তখন ষাটের দশকের গোড়ায় শোনা তার হিসেবের যুক্তিটা মনে পড়েছে এবং মনে মনেই তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। ওয়াশিংটনের উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজে মাসুদা চৌধুরী (আলম) এখন একটি প্রতিষ্ঠিত পরিচিত নাম। স্বামী, সন্তান, চাকরি, খ্যাতি এবং সুন্দর একটি বাড়ি নিয়ে তিনি সম্ভবত সুখেই আছেন। তাই বলছিলাম, ইহ সংসারে যারা জীবনের চাওয়ার পাওয়ার হিসেব মিলিয়ে চলতে পারেন, তারাই হয়তো জীবনে প্রকৃত সুখী।

ষাটের দশকে আমার তরুণ ডাক্তার বন্ধু মোহাম্মদ মূর্তজাও একথাটা মানতে

চাইতেন না যে, চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মিলিয়ে চলতে জানাটাই জীবনে সুখী হওয়ার পথ। মূর্তজার ভাষায় এই ধরনের সুখী লোকেরা আসলে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর। রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করে তিনি বলতেন, "স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ বৃহৎ জগত হতে/ সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।" আমাকে তার মোটর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে মাঝে মাঝে তিনি টংগির রাস্তা ধরে বিকেলের হাওয়া খেতে বেরুতেন। উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতেন, "নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা/ মৃত্যুরে না করি শঙ্কা, দুর্দিনের অশ্রুজলধারা/ মস্তকে পড়িবে ঝরি, তার মাঝে যাব অভিসারে/ জীবন "সর্বস্ব ধন অর্পিয়াছি যারে।"

এই ডাঃ মূর্তজা একদিন 'আজাদ' অফিসে এলেন। আমি তখন সম্পাদকীয় লেখা শেষ করে মাসুদা চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করছি। তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরও মূর্তজা তেমন কথাবার্তা বললেন না। মাসুদা চৌধুরী সেদিনের মতো কাজ শেষ করে রিকশা ডেকে চলে যেতেই তার ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটিতে বসে পড়ে মূর্তজা বললেন, আমি যখন বিয়ে করবো তখন ঠিক এ ধরনের এক মহিলার খোঁজ করবো।

বললাম, মাসুদা আপাকে আপনার ভাল লেগেছে?

মূর্তজা লজ্জা পেয়ে বললেন, না না আমি তার রূপের কথা বলছি না। বলছি তার কাজের কথা। আমি এমন মেয়ে চাই, যে হবে আমার সচিব সখী সঙ্গিনী। কেবল আমার শয্যাসঙ্গিনী হবে না; আমার কর্ম এবং সংগ্রামের সঙ্গিনীও হবে।

মাথায় দুষ্টবুদ্ধি এলো। বললাম, ডাক্তার আপনি তো এখন কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিক ডাক্তার হিসেবে ভালো বেতন পাচ্ছেন। আজিমপুর কলোনিতে চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়ে গেছেন। তাহলে বিয়েটা সেরে ফেলুন না কেন?

মূর্তজা মাথা নেড়ে বললেন, না, এখনই নয়। আমার বাবার কথাতো আপনাকে বলেছি। আমার মায়ের এবং আমার তিনি কোনই দেখাশোনা করতেন না। চরম দুর্দশার মধ্যে আমার মায়ের দিন কেটেছে। আমার পড়াশুনার খরচ আমাকেই জোগাতে হয়েছে। এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এই মায়ের যদি ভালভাবে দেখাশোনা না করি, ঝট করে একটা বিয়ে করে ফেলি, সেটা ঠিক হবে না। তবে তেমন মেয়ে যদি পাই, তাহলে বন্ধুত্ব করতে পারি। ভবিষ্যতে আমার চাকরিটা আরো পাকা হলে এবং আয় উপার্জন বাড়লে তখন বিয়ে করে ফেলবো।

বললাম, তাহলে আপনাকে এক মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি। চমৎকার কবিতা লেখেন, তাছাড়া নিজে শিক্ষকতা করে সেই টাকায় নিজের পরিবার চালান। তিনি নিজে এবং তার মা এই হল, তার পরিবার।

মূর্তজা একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন তার নাম কি? আপনি তাকে কি করে চেনেন?

বললাম, তার নাম দিলরুবা (আসল নাম এখানে লিখলাম না)। বখশি বাজারের কাছে বাসা। আমার কাছে মাঝে মাঝে কবিতা নিয়ে আসেন। আচার-ব্যবহারে খুবই ভদ্র।

মূর্তজা খুব উৎসাহী হলেন, মনে হলো না। বললেন, কবিতা লেখে এমন মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হবে মনে হয় না। কবিরা খুব রোমান্টিক হয়।

তবু একদিন আজাদ অফিসে দু'জনের আলাপ করিয়ে দিলাম। আলাপ করিয়ে দিয়েই আমার ছুটি। ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দিন দশেক পরেই দিলরুবার টেলিফোন পেলাম। বললেন, গাফ্‌ফার ভাই, আমাকে উদ্ধার করুন। কেমন মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেখা হলেই লম্বা লম্বা প্রবন্ধ শোনাতে চান, যার এক বর্ণ আমি বুঝি না, বুঝতে চাই না। রাজনীতির কথায় ঠাসা। আমি তাকে আমার কবিতা শোনাতে চাইলে বলেন, এসব ছিচকাঁদুনে কথা শুনতে চাই না।

মূর্তজা কিছুদিন পর মন্তব্য করলেন, মেয়েটি ভালো। তবে আমার জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো নয়। তার জগতটা বড় ছোট। আর দশটা বাঙালি মেয়ে যা চায়, একজন স্বামী, একটা সংসার, কয়েকটি ছেলেপুলে। তার বাইরে যে বিপুল বৃহৎ জগত আছে তার কিছু তারা জানতে চায় না। তার কবিতাতেও শুধু এসব চাওয়া পাওয়ার কথাই আছে। এর বাইরে যে সারা দুনিয়া জুড়ে কোটি কোটি মানুষ বাঁচার সংগ্রাম করছে, তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা তার নেই।

দিলরুবার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো না ডাঃ মূর্তজার। বরং আমার বাড়িতেই তার আনাগোনা বাড়তে লাগলো। এবার আরেকটু পিছনের কথা বলি। সম্ভবত ১৯৫৮ সালের জুলাই কি আগস্ট মাস। আইয়ুবের মার্শাল ল'য়ের অভিশাপ তখনো পাকিস্তানের কপালে নেমে আসেনি। আমি তখন 'দৈনিক ইত্তেফাকে' কাজ করি। 'ইত্তেফাকের' সম্পাদক এবং মালিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হঠাৎ ঠিক করলেন, 'ইত্তেফাক প্রকাশনা' থেকে তিনি একটি বাংলা সাপ্তাহিক বের করবেন। নাম ঠিক করলেন 'চাবুক'। সম্পাদক হিসেবে আমাকে বাছাই করা হল। কাগজের ডিক্লারেশন পেতে দেরী হল না। ঢাকায় তখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায়। ঢাকার এডিএম ছিলেন রুহুল কুদ্দুস। (ডিসিকে তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং এডিসিকে এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলা হতো)। তার কোর্টে যেতেই 'চাবুকের' ডিক্লারেশনে তিনি সই করে দিলেন। রুহুল কুদ্দুস ছিলেন সিভিল সার্ভিসের লোক এবং শেখ মুজিবের বন্ধু।

প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত সাহিত্য মাসিক 'মেঘনা' তখন বন্ধ হয়ে গেছে। 'ইত্তেফাকের' নতুন নিজস্ব ছাপাখানা এবং অফিস হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন রোডে। আমরা এই নতুন অফিসে বসি। সুতরাং একটা সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক হয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম। তবে 'চাবুক' বের হওয়াতে যিনি আমার চাইতেও খুশি হয়েছিলেন, তিনি ডাঃ মোহাম্মদ মূর্তজা। সপ্তাহে তিন-চারদিন তিনি আসতেন 'ইত্তেফাক' অফিসে। পকেট ভর্তি করে লেখা নিয়ে আসতেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানা সমস্যা নিয়ে লেখা। 'চাবুকের' জন্য প্রতি সপ্তাহেই অনেক লেখার দরকার হতো। ফলে মূর্তজার যেসব লেখা 'মেঘনায়' ছাপাতে পারিনি, 'চাবুকে' তা চোখ বুঁজে ছেপে দিয়েছি। আমার ধারণা, সাপ্তাহিক 'চাবুকের' স্বল্পস্থায়ী জীবনে ডাঃ মূর্তজার অসংখ্য লেখা ছাপা হয়েছে।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। দেশে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়। হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হন। সেন্সরশীপ ও সামরিক আইনের বিধিনিষেধের কড়াকড়িতে তখন 'ইত্তেফাক' চালু রাখাই কষ্টকর হয়ে উঠেছে, মাসিক মিয়া তাই 'চাবুক' বন্ধ করে দিলেন। আমার চাকরি জীবনেও ঘটলো বড় রকমের পরিবর্তন।

আমি তখন বিয়ে করেছি। কাঁধে নতুন সংসারের দায়িত্ব। আয়-উপার্জন বাড়ানো দরকার। এই সময় 'দৈনিক আজাদে' শরিকানা ঝগড়ায় কাগজটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। প্রদেশের সামরিক-প্রশাসক জেনারেল ওমরাও খান হস্তক্ষেপ করেন এবং সাময়িকভাবে কাগজটি পরিচালনার জন্য প্রবীণ সাংবদিক সৈয়দ জাফর আলীকে এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করা হয়। এই সৈয়দ জাফর আলীর সাহায্যেই আমি বর্ধিত বেতনে দৈনিক 'আজাদের' সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেই।

এতদিন বাস করেছি স্বামীবাগের এক ভাড়া করা বাসায়। 'আজাদে' চাকুরি নিয়ে আজিমপুর সংলগ্ন শেখ সাহেব বাজারে একটা নতুন দোতলা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে চলে এলাম। আমি আজিমপুরে আসাতে সকলের চাইতে খুশি হলেন ডাঃ মূর্তজা। তিনি পুরনো গোরস্থানের কাছে আজিমপুর কলোনীর ফ্লাটে থাকেন। তার বাসা থেকে আমার বাসায় হেঁটে আসতে পনের-কুড়ি মিনিটের বেশি লাগে না। এখন রোগী দেখা শেষ করে রোজই তিনি একবার আসা শুরু করলেন আমার বাসায়।

শেখ সাহেব বাজারের বাসায় আমি খুব বেশি দিন ছিলাম না। কিন্তু এ সময়টা আমার জন্য খুবই স্মরণীয়। ১৯৬১ সালের ৯ই মে ঢাকায় প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আতাউস সামাদ তখন 'আজাদের' রিপোর্টার। এই ঝড়ের ভয়াবহ তাণ্ডবের উপর 'আজাদে' রির্পোট ও ফিচার লিখে আতাউস সামাদ

দিলেন। তিনি সাদা বৃটিশ মহিলা। এক গাদা ম্যালেরিয়া ট্যাবলেটের প্রেসক্রিপশন হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, তোমাদের রাজধানী ঢাকা ম্যালেরিয়া-ফ্রি জোন। যদি শুধু ঢাকাতেই থাকো, তাহলে এই ট্যাবলেট খেতে হবে না। ঢাকার বাইরে যদি যাও, তাহলে এখন থেকেই এই ট্যাবলেট খেতে শুরু করো এবং লণ্ডনে ফিরে আসার পরেও পনর দিন খাবে। আর এখনি পাশের ঘরে যাও। নার্স তোমাকে কলেরা, টাইফয়েড এবং অন্যান্য ট্রপিক্যাল ডিজিজের টীকা-ইনজেকশন দিয়ে দেবে।

এরপরও ঝামেলা গেল না। আমাদের পরিবারের সকলেই এখন ডুয়েল সিটিজেন। অর্থাৎ সকলেরই বাংলাদেশ এবং বৃটেনের পাসপোর্ট রয়েছে। বাংলাদেশের পাসপোর্টে দেশে যাওয়াও ঝামেলার ব্যাপার। এয়ারপোর্ট ট্যাক্স দিত হয়। কাস্টমস এবং কারেন্সি রেগুলেশনের নানারকম ফরম পুরণ করতে হয়। আমরা তাই ঠিক করলাম, দেশে যেতে বৃটিশ পাসপোর্ট ব্যবহার করবো। আর তখনি মনে পড়লো, এই পোসপোর্টে দেশে যেতে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ভিসা সংগ্রহ করত হবে।

বাংলাদেশ দূতাবাসে পাসপোর্ট নবায়ন, ভিসা সংগ্রহ একটি সহজ ব্যাপার নয়। বহুদিন লণ্ডনের বাংলাদেশ দূতাবাসের পাসপোর্ট ডিপার্টমেন্ট হয়রানির আখড়া নামে পরিচিত ছিল। এখন অবশ্য অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তবু এই ভিসা জোগারের জন্যে দূতাবাসে পাসপোর্ট জমা দিয়ে দু'তিনদিন ঘোরাঘুরি করতে হবে ভেবে মনটা খারাপ হয়েছিল। কিন্তু অভয় দিল মাসুদ মান্নান। দূতাবাসের তরুণ অফিসার। জানাল, আমার বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্র জীবনের-সহপাঠী যুথীর ছেলে সে। আমাদের বীথি আপা, এককালের জনপ্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ফরিদা বারি মালিকের ছোট বোন যুথী। পরে ডাঃ আবদুল মান্নানের সঙ্গে বিয়ে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. অনার্স ক্লাসে যুথী আমার সহপাঠী ছিল। তার ছেলে মাসুদ। সুতরাং আমার গোটা পরিবারের পাসপোর্টে বাংলাদেশ-যাওয়ার ভিসার ছাপ পড়তে দেরী হলো না। মাসুদ মান্নান বলল, আপনাকে একদিনের বেশি দূতাবাসে আসতে হবে না। আপনি পাসপোর্টগুলো নিয়ে আমার টেবিলে এসে বসবেন। চা খাবেন। চা খেতে খেতে দেখবেন, আপনার পাসপোর্টগুলো রেডি হয়ে গেছে।

মাসুদ মান্নানের টেবিলে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভাবলাম, নিজের দেশে যাচ্ছি, তাও ভিসা সংগ্রহ করে। কপালে এও ছিল।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসের মাত্র শুরু তখন। স্ত্রী ও মেয়ে বিনীতাকে নিয়ে হিথরো এয়ারপোর্টে পেল্লায় জাম্বো জেটে চাপলাম। প্লেনটি বোম্বাই হয়ে যাবে ঢাকা। একেবারে গরু হাটার মতো মানুষ বোঝাই। দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। শুনলাম, বোম্বাইয়ে প্লেনটি নামলেই বারো আনা যাত্রী নেমে যাবে। তখন শুয়ে বসে, বাঙালি

এয়ার হোস্টেলের মধুর হাসি দেখতে দেখতে ঢাকায় পৌছতে পারবো।

রাত দশটায় প্লেন উড়াল দিল আকাশে। কিছুক্ষণের মধ্যে আলো ঝলমল লন্ডন নগরী অন্ধকারে হারিয়ে গেল। চোখ মুছে প্লেনের আসনে বসে ভাবতে লাগলাম দূর অতীতে যে ঢাকা শহরকে ফেলে এসেছি, এবার গিয়ে তাকে কী রূপে দেখবো? আমি কি তাকে চিনতে পারবো? না, সে আমাকে চিনবে? প্রায় কুড়ি বছর আগে ঢাকার যে এয়ারপোর্ট থেকে বাংলাদেশ বিমানে লন্ডনে রওয়ানা হয়েছিলাম, সে এয়ারপোর্টটি এখন নেই। তার বদলে টঙ্গির কাছে নতুন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামবো। এই নতুন এয়ারপোর্টে নেমে কি নিজের দেশে ফিরেছি বলে উপলব্ধি করতে পারবো? এয়ারপোর্টের মাটি ছুঁয়ে শিহরিত হতে পারবো? আত্মীয়-স্বজন ছাড়া ক'জন পরিচিত বন্ধুর মুখ দেখবো এয়ারপোর্টে নেমে? নাকি প্লেন থেকে নেমে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আমাকে গাইতে হবে 'চিনিলে না আমারে, কি চিনিলে না?"

ঢাকা বিমান বন্দরে পৌছার আগেই আমার এই ভুল অবশ্য ভাঙতে শুরু করেছিলো। বোম্বাইয়ের শান্তাক্রুজ বিমান বন্দর ছাড়ার পরেই দেখি, বৃটিশ এয়ারওয়েজের জাম্বো জেটটি একেবারে খালি হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে এখন আর শুধু পা ছড়িয়ে নয়, পাশাপাশি দু'তিনটা শূন্য আসনে গড়াগড়ি খেতে পারি। বিমান বালা, বিমানের এনাউন্সমেন্টের ভাষা সবকিছু পাল্টে গেছে। লন্ডন থেকে বোম্বাই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সাদা বৃটিশ এবং ব্রাউন ইণ্ডিয়ান এয়ার হোস্টেস। বোম্বাই ছাড়তেই দেখি, শাড়ি পরা শ্যামলা রঙের তন্বী এয়ার হোস্টেস পানীয় বিতরণ করছেন। মঝে মাঝে বাংলায় কথা বলছেন। প্লেনে এনাউন্সমেন্টের ভাষাও বদলে গেছে। ইংরেজীর সঙ্গে এবার বাংলা। আর হিন্দি নয়। কিছুক্ষণ পর খেয়াল হল, ইংরেজী এবং বাংলায় যে এনাউন্সমেন্ট মাঝে মাঝেই চলছে, তাঁতে একবারও জিয়া ইন্টারন্যাশনাল বিমান বন্দর এই কথাটা শুনিনি। বারবারই বলা হচ্ছে, "আমরা বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিমান বন্দরে অবতরণ করবো।" শুনেছিলাম, ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নাম এখন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। এই নামেই বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের প্লেনে ঢাকা যাত্রার সময় এনাউন্সমেন্ট চলে। আজ তার ব্যতিক্রম দেখে একটু বিস্মিত হলাম। বাঙালি এয়ার হোস্টেসকে ডেকে বললাম, বাংলায় যে ভদ্রলোক এনাউন্সমেন্ট করছেন, আমি কি তার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি? তরুণী প্রথমে একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। তারপরেই সহজ হয়ে বললেন, তিনিও আমার মতোই একজন এয়ারহোস্ট। তাকে ডেকে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে বৃটিশ এয়ারওয়েজের ব্যাজ পরা এক যুবক আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনার কি কোনো অসুবিধে হচ্ছে?

বললাম, বৃটিশ এয়ারওয়জের ভ্রমণ খুবই আরামদায়ক। কোনো অসুবিধার জন্য নয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনাকে ডেকেছি। আপনার যদি কোনো অসুবিধা থাকে, তাহলে জবাব দেবেন না।

যুবক বললেন, আগে আপনার প্রশ্নটা কি শুনি, তাহলে বুঝবো জবাবটা দিতে পারবো কি না?

এবার সোজাসুজি বলালাম, প্লেনে আপনার এনাউন্সমেন্টে আপনি একবারও জিয়া ইউন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কথাটি উচ্চারণ করেননি। বার বার বলছেন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। এর কারণ কি? বৃটিশ এয়ারওয়েজে কি জিয়া এয়ারপোর্ট বলা বারন?

যুবক ঠোঁট কামড়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, না, না, বারন নয়। আমরা দু'টি নামই বলে থাকি। যাত্রীরা যে নামটি বললে সহজে বুঝতে পারে, সে নামটিই বেশি বলে থাকি।

ঃ আজ কিন্তু একবারও জিয়া বিমান বন্দর বলেননি!

যুবক বললেন, আপনি কি বাংলাদেশ গভরমেন্টের কেউ?

মাথা নাড়লাম, না।

ঃ আপনি কি আমার এনাউন্সমেন্ট শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন?

ঃ মোটেই না। বরং খুশি হয়েছি।

ঃ কেন খুশি হয়েছেন?

ঃ জিয়া বিমান বন্দর না বলে ঢাকা বিমান বন্দর বলায়। আমার বিশ্বাস, ঢাকার নতুন বিমান বন্দর ঢাকা বিমান বন্দর নামেই পরিচিত হওয়া উচিত। যদি কোনো ব্যক্তির নামে চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে সে নামটি হবে, যিনি এই দেশটিকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করেছেন, সেই শেখ মুজিবের। এর জিয়া বিমান বন্দর নামকরণ এক চরম ধৃষ্টতা।

যুবক বললেন, আমি চাকরি করি। এ সম্পর্কে কোনো মতামত আমি দিতে পারি না। তবে বিমান বন্দরের নাম-বিভ্রাট নিয়ে আপনাকে একটি গল্প বলতে পারি।

ঃ বলুন।

ঃ বৃটিশ এয়ারওয়েজে চাকরি পাওয়ার পর আমি একবার ঠিক এভাবে বোম্বাই অথবা দুবাই হয়ে ঢাকার পথে যাচ্ছি। এনাউন্সমেন্ট করলাম, আমরা আর দেড় ঘন্টার মধ্যে জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অবতরণ করবো। এনাউন্সমেন্ট শেষ করে প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে ফিরে এসেছি। এক অবাঙালি প্যাসেঞ্জার শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মিষ্টার, আমি কি ভুল প্লেনে উঠেছি? আমি তো ভেবেছিলাম, ঢাকায় যাচ্ছি।

এখন মনে হচ্ছে জিম্বাবুয়েতে যাচ্ছি। জিয়া এয়ারপোর্ট কি জিম্বাবুয়েতে নয়?

গল্পটি সত্যি কি বানানো, যুবকের মুখ দেখে তা বুঝতে পারছিলাম না। তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। মনে হচ্ছিল, এই হাসি কৌতুকের অথবা ঠাট্টার।

ঢাকায় পৌঁছার আগেই প্লেনের ভেতরে আরো মজার কাণ্ড ঘটলো। প্লেনের ভেতরে আমরা তখন সকলেই বাঙালি যাত্রী। একজন অর্ধ-পরিচিত লোক তার আসন থেকে উঠে এসে আমার আসনের কাছে দাঁড়ালেন। বললেন, গাফ্‌ফার ভাই, ভাবীকে নিয়ে দেশে যাচ্ছেন?

বললাম, ঢাকাগামী প্লেনে যখন উঠেছি তখন আর কোথায় যাবো?

যাত্রী যুবা-বয়সী। বললেন, আপনি ভাগ্যবান ব্যক্তি। নামকরা লেখক, সাংবাদিক। আপনাকে তো ঢাকা এয়ারপোর্টে কাস্টমস-এর হয়রানি সহ্য করতে হবে না।

তার কথা শুনে আমার মনে হঠাৎ ভয় ঢুকলো। ঢাকায় কাস্টমস চেকের নামে বিমান যাত্রীদের হয়রানি করা, ঘুষ দাবি, দামী জিনিসপত্র সীজ করার নামে রেখে দেওয়া ইত্যাদি নানা অভিযোগ শুনেছি। ভাবলাম, এবার কি আমাকেও তার শিকার হতে হবে? বহুকাল পরে দেশে যাচ্ছি। স্বাভাবিকভাবেই আত্মীয়স্বজন, তাদের ছেলেমেয়ের জন্য আমার স্ত্রী ও মেয়ে কিছু কাপড়-চোপড়, অন্যান্য জিনিস স্যুটকেসে ভরে এনেছেন। তল্লাশীর নামে এগুলো যদি তছনছ করা হয়, তুচ্ছ অজুহাতে সীজ করা হয়, আমাদের দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়, তাহলে সেই হয়রানি সহ্য করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হবে।

সহযাত্রীকে বললাম, দীর্ঘকাল পরে দেশে যাচ্ছি। আমার গায়ে তো লেখা নেই, নাম গাফ্‌ফার চৌধুরী। কাস্টমস-এর লোকেরা আমাকে চিনবেন কি করে?

যুবক যাত্রী বললেন, আমি চিনলাম কি করে? আমাকে তো আপনি চিনতে পারেননি। আমি লণ্ডনে আপনার সভায় দু'একবার গান গেয়েছি।

এবার হেসে ফেললাম। বললাম, আপনি যখন গায়ক, তবে কাস্টমস-এর লোকেরা আপনাকে হয়তো চিনতে পারবেন। তাছাড়া আপনার স্যুটকেসে নিশ্চয়ই তেমন কোনো মাল নেই, যা কাস্টমস ধরতে পারে।

ঃ দু' একটি ইলেকট্রনিক গুডস আছে। সবই আত্মীয়স্বজনের ডিমাণ্ড। কিন্তু সে কথা কি কাস্টমস শুনতে চাইবে?

বললাম, এখন কি করবেন, ভেবেছেন?

যুবক যাত্রী বললেন, আপনার মাল নিশ্চয়ই চেক হবে না। যদি আমার একটি কি দুটি স্যুটকেস আপনার মালের সঙ্গে দিয়ে দেই ?

বললাম, এই কাজটি আমি করবো না। এই হেরোইন আর ড্রাগস পাচারের যুগে আমি কারো স্যুটকেস নিজের স্যুটকেস বলে সঙ্গে নিতে পারবো না। তাছাড়া আমার কাস্টমস চেক হবে না, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। আমার নাম গাফ্ফার চৌধুরী এই পরিচয় দিয়ে কাস্টমস চেক আমি এড়াতে চাই না। আর এড়াতে চাইলেও যে এড়াতে পারবো, তার নিশ্চয়তা নেই।

যুবক এবার অসহায় কণ্ঠে বললেন, তাহলে একটু দয়া করুন। যদি দেখি, আপনার মালের কাস্টমস চেক হচ্ছে না, তাহলে বলবো, আমরা আপনার আত্মীয়। এটুকু বলার অনুমতি আমাদের দিন।

বললাম, আমরা মানে কি? আপনার সঙ্গে কি আরো আত্মীয়স্বজন আছে?

ঃ জ্বি। দু'একজন মাত্র।

ঃ সকলের বাড়িই কি সিলেটে?

ঃ জ্বি।

যুবকযাত্রীর পাশে এই সময় আরো দু'জন যাত্রী এসে দাঁড়ালেন। তারা একটু বেশি বয়সের। তাদের একজন বললেন, স্যার, প্রতিবার কাস্টমসের হাতে কি ভাবে নাস্তানাবুদ হই, তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। হাজার হাজার টাকা ঘুষ দিয়েও রেহাই পাই না। গায়ের দামি জ্যাকেটটাও মাঝে মাঝে তারা খুলে রেখে দেয়। বলে, প্রেজেন্ট হিসেবে নিলাম। লণ্ডনে ফিরে গিয়ে আরেকটা কিনে নেবেন। আপনার দোহাই। আমাদের বাঁচান।

বাধ্য হয়ে বললাম, আমি নিজেই এই হয়রানি থেকে বাঁচবো কি না জানি না। যদি বাঁচি, তাহলে আমার আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে আপনারা যদি বাঁচতে পারেন, আমার আপত্তি নেই।

যুবক যাত্রীসহ তারা তিনজনেই আমাকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিজেদের আসনে ফিরে গেলেন।

ঢাকার আকাশে তখন ধূসর গোধুলি। শীতের দিন ছোট। প্লেন রানওয়েতে নেমে গতি হারালো। তারপর একসময় থামলো। আমার স্ত্রীকে হুইল-চেয়ারে চাপিয়ে প্লেন থেকে নামানোর ব্যবস্থা হল। বিনীতা গেল তার সঙ্গে। আমি অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। ঢাকার মাটিতে পা দিয়ে প্রথমে এক মুঠো ধুলো নিয়ে কপালে ঠেকালাম। মনে মনে বললাম, 'ধন্য আমি জন্মেছি মা, তোমার ধূলিতে/ জীবনে- মরণে আমি চাইনে ভুলিতে।"

ঠিক এই সময় কাস্টমস-এর ব্যাজপরা দাঁড়িওয়ালা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এসে কাছে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনিই গাফ্ফার চৌধুরী?

বললাম, জ্বি, কেন জিজ্ঞেস করছেন?

ঃ আপনার স্ত্রী ও মেয়ে প্লেন থেকে নেমে এসেছেন। আপনারা ভিআইপি রুমে চলুন। ওটা এয়ারকণ্ডিশন করা। আপনাদের মাল ওখানে নেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখান থেকেই আপনারা গাড়িতে উঠবেন।

একটু দ্বিধার সঙ্গে বললাম, আমাদের মাল বেশি নয়। কাস্টমস চেকিং হতে কত সময় লাগবে?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আপনাদের মাল চেকিং হবে না।

তার সঙ্গে সামনের দিকে একটু এগিয়ে যেতেই দেখি, আমার স্ত্রী হুইল-চেয়ারে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তার পাশে মেয়ে বিনীতা। আর তাদের ঘিরে রয়েছে অনেক অনেক আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, চেনা-অচেনা মুখ। অনেকেরই চোখ অশ্রুসজল।

একটা ট্রলিতে আমাদের মাল নিয়ে আসা হল। বিনীতাকে বললাম গুণে দেখেছো মা, সব ক'টা ব্যাগ ঠিকমতো এসেছে কিনা?

বিনীতা বলল, আমি দেখেছি আব্বা; সব ঠিক আছে।

এ সময় এক কাস্টমস অফিসার পেছন থেকে বলে উঠলেন, আপনি দেশে আসছেন, ক'দিন আগেই শুনেছিলাম। তবে এত আত্মীয়স্বজন নিয়ে আসছেন তা জানতাম না।

বিস্মিত হয়ে বললাম, এত আত্মীয়স্বজনের কথা কেন বলছেন? বিদেশে আমাদের আত্মীয়স্বজন কই?

অফিসার বললেন, এ পর্যন্ত সাতজনকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। তারা সকলেই আপনার আত্মীয়। কারো মালই চেক হয়নি।

বোম্বাই থেকে প্লেন ছাড়ার পর সেই তিন সহযাত্রীর কথা মনে পড়লো। তারা কি করে সাতজন হয়ে গেলেন, সেই রহস্য বুঝতে পেরে মনে মনে হাসলাম। আমার করার কিছুই ছিল না।

পাঁচ

জানুয়ারীর সেই ধূসর বিকেলে ঢাকার নতুন বিমান বন্দরে চেনা-অচেনা অনেক মুখ ছিল আমাদের জন্য অপেক্ষমান। চেনা বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথা বলছি, একজন অচেনা তরুন এগিয়ে এলেন। সালাম জানিয়ে বললেন, আমি শহীদ নূর হোসেনের ভাই। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার যদি গাড়ি দরকার হয়, সেজন্য গাড়িও নিয়ে এসেছি। আমি অনেকক্ষণ তার

দিকে চেয়ে রইলাম। শহীদ নূর হোসেনকে আমি দেখিনি। খবরের কাগজে তার ছবি দেখেছি। এতদিনে তার ভাইকে সামনে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, শহীদ নূর হোসেনকে আমি কোনদিন দেখিনি। মনে তাই দুঃখ ছিল। তোমাকে দেখে সেই দুঃখটা দূর হল।

আমার জন্য বিমান-বন্দরে এসেছিলেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য ডঃ মোহাম্মদ সেলিমও। তার পেছনে আমার দু'জন বহুকালের চেনা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক বন্ধু যে দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ তা চোখে পড়লো। একজন 'বাংলার বাণীর' নির্বাহী সম্পাদক মীর নূরুল ইসলাম, অন্যজন যুগ্ম-সম্পাদক আজিজ মিসির। মীর নূরুল ইসলামের চুল পেকেছে। চেহারায় বয়স বাড়ার সামান্য ছাপ পড়েছে। কিন্তু আজিজ মিসির আরো শুকিয়ে গেছেন। বয়সের ছাপ চেহারায় তেমন পড়েনি। কতকাল পরে দেখা! কিন্তু মনে হল, আবার আগামীকালই তাদের সঙ্গে ঢাকার কোনো কাগজের বার্তা বিভাগে কিংবা সম্পাদকীয় বিভাগে বসে একসঙ্গে কাজ করবো। আমি যেন বহুদিন ঢাকাতেই আছি। পেছনের কুড়িটি বছর হঠাৎ বহু দূরের স্মৃতির মত মিলিয়ে গেল।

আজিজ মিসির এখন প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং নাট্যকার। যৌবনে ছিলেন ডাকসাইটে রাজনীতিকও। কমিউনিস্ট পার্টির আণ্ডার গ্রাউণ্ড আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। আসল নাম সিরাজুল ইসলাম। এই সিরাজুল ইসলাম নামেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়। কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না। আমার পুরনো ডায়েরিতেও তার কোনো হদিস নেই। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় যে বিরাট সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল, যে সাহিত্য সম্মেলনে জড়ো হয়েছিলেন দুই বাংলার বহু সাহিত্যিক ও শিল্পী, সেই সম্মেলনেই চট্টগ্রামের মাহবুবুল আলম চৌধুরী আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রগতিশীল সাহিত্য শিবিরের তরুন ও নেতৃস্থানীয় লেখক সিরাজুল ইসলামের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বলে আবছা মনে পড়ে। এমনও হতে পারে, সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন আমাদের দু'জনের প্রথম পরিচিতি হওয়ার মাধ্যম। অথবা মাহবুবুল আলম এবং হাসান দু'জনেই। সেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতেই মাহবুবুল আলম চৌধুরী চট্টগ্রাম থেকে "সীমান্ত" নামে একটি উন্নতমানের সাহিত্য মাসিক প্রকাশ করেছিলেন। এটা ছিল সত্যি দুঃসাহসী প্রচেষ্টা। মুসলিম লীগের সেই ফ্যাসিবাদী শাসনের জমানায় "সীমান্ত" ছিল এক অসমসাহসী প্রতিবাদ। 'সীমান্তের' পাশাপাশি ঢাকা থেকে তখন ফজলে লোহানীর 'অগত্যাও' প্রকাশিত হচ্ছে। 'অগত্যারও' ছিল প্রগতিশীল ভূমিকা। কিন্তু সুর সিরিয়াস নয়, স্যাটায়ারে ভরা। 'সীমান্তের' কণ্ঠ সিরিয়াস এবং তাতে নতুন লেখকেরা বেপরোয়া

দুঃসাহসে কলম চালাতেন। বাংলাদেশের কৃষক বিদ্রোহ, শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে বহু বই লেখা হয়েছে। কিন্তু লেখক বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী লেখকদের নিয়ে তেমন কোনো ইতিহাস লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যদি লেখা হয়, তাহলে এদেশের প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনে চট্টগ্রামের মাহবুবুল আলম চৌধুরীর নামটি সামনের সারিতেই স্থান পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

ঢাকার কার্জন হলে পঞ্চাশের দশকের সেই সাহিত্য সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশন চলার ফাঁকে ফাঁকে বাইরে ঘাসে-ঢাকা চত্বরে বসে সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে কয়েকদিন আড্ডাও দিয়েছি বলে মনে পড়ে। সেই আড্ডাতে এসে সামিল হতেন ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান এবং আরো অনেকে। পন্থায় তখন আমরা কম-বেশি সকলেই বাম। তবে দল ভাগাভাগি ছিল। হাসান ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির অনুরাগী। আমার আনুগত্য ছিল আরএসপি'র (রেভ্যুলশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি) দিকে। সিরাজুল ইসলামও ছিলেন কমিউনিস্টদের আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত।

ঢাকার সাহিত্য সম্মেলন শেষে সিরাজুল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে যান। সুতরাং তার সঙ্গে আমার সম্পর্কেরও সেখানেই ইতি। তিন সাড়ে-তিন বছর পরে তার সঙ্গে আবার ঢাকাতেই দেখা, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। আমি তখন বিবাহিত এবং সদ্য পিতৃত্ব অর্জন করেছি। আমার ছেলে অনুপমের জন্ম হয়েছে। আমরা থাকি হাটখোলার কাছে এক নম্বর কে এম দাশ লেনের বাড়িতে। উল্টোদিকেই শেরে বাংলা ফজলুল হকের ২৭ কে এম দাশ লেনের বাড়ি। আমাদের বাড়িটি দোতলা। দু'বন্ধুতে মিলে ভাড়া নিয়েছিলাম। আমি ও রেজাউর রহমান বাদল। বাদল প্যারামাউন্ট প্রেসের মালিক হাবিবুর রহমান সাহেবের ছেলে। প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে যখন 'সচিত্র মাসিক মেঘনা' বের হয়, তখন আমি ছিলাম সম্পাদক, বাদল প্রকাশক। তাছাড়া আমরা ছিলাম সমবয়সী। প্রায় একই সময়ে আমাদের বিয়ে। বাদলের প্রথম স্ত্রী রুচির কোলে তখন একটি মেয়ে। আমার স্ত্রীর কোলে ছেলে অনু। তার বয়স তখন কয়েক মাস। দোলনায় শুয়ে দোল খায়। বাদল থাকতেন বাড়িটার উপরের তলায়। আমি নীচের ফ্লোরে।

১৯৫৯ সালের শেষের দিক। আইয়ুবের প্রথম সামরিক শাসনের দাপটে তখন সারাদেশ অস্থির। আমি 'দৈনিক ইত্তেফাকে' কোন রকমে মাথা বাঁচিয়ে কাজ করি। বিবাহিত জীবনের মাত্র দেড়-বছরের মাথায় সংসার জীবনে তেমন গুছিয়ে বসতে পারিনি। বাসায় ডাবল বেড এবং একটা ড্রেসিং টেবিলই ছিল সম্বল। সঙ্গে একটা টুল। আর চেয়ার-টেবিল ছিল না। কেনার পয়সাও ছিল না। ভাত খেতাম মাটিতে পাটি বিছিয়ে। একবার আমার বাসায় রাতে ভাত খেতে এলেন একসঙ্গে রণেশ দাশ

গুপ্ত, আহমেদুর রহমান (ভীমরুল), মইদুল হাসান এবং আনোয়ার জাহিদ। সকলকে ফ্লোরে পাটি বিছিয়ে খেতে দিয়েছিলাম। কোনো লজ্জা-সংকোচ অনুভব করিনি। তারাও কিছু মনে করেননি। এখন নিজের কাছেই তা অসম্ভব অবাস্তব ঘটনা মনে হয়। তখন এই বাসাতে প্রায়ই আসতেন আলাউদ্দিন আল আজাদ, তার স্ত্রী জমিলা ভাবীও। চেয়ার নেই। তাই শোয়ার খাটের উপরে বসেই ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প চলতো। ফাঁকে ফাঁকে চা। সেসব দিন এখন স্বপ্ন মনে হয়।

বাসায় চেয়ার-টেবিল নেই, তা নিয়ে আমার মনে কোনো কষ্ট ছিল না। কষ্ট ছিলো, কোন্ সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা টেবিলের অভাবে ঠিকমতো লেখাজোখার কাজ করতে পারতাম না বলে। বুকে বালিশ ঠেকিয়ে বিছানায় শুয়ে লেখার অভ্যেস আমার কোনকালে ছিল না, এখনো নেই। চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে একটা টেবিলে কাগজ-কলম নিয়ে না বসলে আমি লিখতে পারি না। ফলে সংসার জীবনের প্রথম দিকে আমার লেখার কাজ খুব এগুচ্ছিল না। এখানে ওখানে বসে দায়সারা ভাবে লিখতাম। আমার স্ত্রী তাই প্রায়ই সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, 'আগামী মাসে বেতনের টাকা হাতে এলে প্রথমেই তোমার জন্য একটা চেয়ার ও টেবিল কিনবো।' এই চেয়ার টেবিল আর কেনা হতো না। বেতনের আড়াইশ' টাকার একশ' টাকাই চলে যেতো বাড়ি ভাড়ায়। বাকি দেড়শ' টাকায় সারা মাসের গ্রাসাচ্ছাদন, ছেলের দুধ, খেলনা সবই।

ঠিক এই সময় একদিন সদরঘাটের মোড়ে আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে দেখা। মুখে সেই পরিচিত মুচকি হাসি। বললাম, আরে সিরাজ সাহেব যে!

সিরাজ সাহেব ঠোঁটে আঙুল চেপে বললেন, শ্ শ্। ওই নামে ডাকবেন না। আমার নাম আজিজ মিসির।

বিস্মিত হয়ে বললাম, আজিজ মিসির? পিতৃদত্ত নামটা বদলালেন কেন?

ঃ পুলিশের গুঁতায়। জানেন তো, কমিউনিস্ট, সাবভারসিভ এলিমেন্ট বলে তাদের খাতায় আমার নাম লেখা! বার বার এ্যারেস্ট, ওয়ারেন্টতো লেগেই আছে। তার উপর এখন মার্শাল ল'য়ের জমানা। তাই নামটা পাল্টেছি। নইলে শ্রীঘরে থাকতে হতো।

ঃ ঢাকায় কি বেড়াতে এসেছেন?

ঃ কিছুদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাইরে গা ঢাকা দিয়ে থাকবো বলে এসেছিলাম। এখন দেখছি, ঢাকাতেই থেকে যেতে হবে। সেজন্য ক'দিন যাবত ভাবছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

হেসে বললাম, ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হচ্ছে। ঢাকা থাকবেন, সেজন্য আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, সব কথা খুলে বলুন।

সিরাজুল ইসলাম ওরফে আজিজ মিসির বললেন, চলুন কাছেই ওয়াইজ ঘাটে আমার একটা আস্তানা হয়েছে। সেখানে একটু বসবেন, চা খাবেন। কথা আছে।

সদরঘাটের ভীড় ঠেলে পটুয়াটুলি,পটুয়াটুলি পেরিয়ে তখনকার মায়া সিনেমা হাতের ডান দিকে রেখে বুড়িগঙ্গার দিকে যেতেই রাস্তার একপাশে একটি ছোট ছাপাখানা। নাম শেলী প্রেস। ভেতরে কম্পোজিটরদের বসার ব্যবস্থা এবং মেশিন। দরোজার কাছে টুল টেবিল পেতে অফিস। আজিজ মিসির সেখানে আমাকে বসিয়ে চা এবং বিস্কিটের অর্ডার দিলেন। বললেন, এটা আমার এক আত্মীয়ের প্রেস। এখান থেকেই একটা মাসিক পত্রিকা বের করবো। নাম 'চলন্তিকা'। আগামী মাসেই প্রথম সংখ্যা বেরুবে।

উৎসাহিত হয়ে বললাম, নিশ্চয়ই সাহিত্য-পত্রিকা?

আজিজ মিসির আমার উৎসাহে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলেন। বললেন, না সিনেমা পত্রিকা।

ঃ সিনেমা পত্রিকা কেন?

ঃ এই মার্শাল ল'র জমানায় সাহিত্য পত্রিকা বের করে লাভ কি বলুন। একটি সৎ, প্রগতিশীল সাহিত্য-পত্রিকা মার্শাল ল' অথরিটি চালাতে দেবে না। কিছু লিখলেই পত্রিকা বন্ধ করবে, সম্পাদক প্রকাশককে এ্যারেস্ট করবে। তাই সিনেমা পত্রিকা বের করা। সাহিত্য সেবা না হোক, সাহিত্য ব্যবসা হবে।

বললাম, ঢাকায় তো ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠেনি।

আজিজ মিসির বললেন, গড়ে ওঠেনি বলেই তো গড়ে তুলতে হবে।

ঃ রাজনীতি ছাড়া সিনেমার লাইনেও আপনার ঝোঁক আছে, তা জানতাম না।

ঃ কাউকে কোনোদিন বলিনি। তবে কৈশোরকাল থেকেই এদিকে আমার ঝোঁক। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাট্য আন্দোলনগুলোর সঙ্গে আমি সবসময় জড়িত ছিলাম।

ঃ পত্রিকাটি কি আপনিই সম্পাদনা করবেন?

ঃ হ্যাঁ। আমার ছোট ভাইয়ের নামে ডিক্লারেশন নেয়া হয়েছে। সিরাজুল ইসলাম নামে ডিক্লারেশন পেতাম না। পুলিশের খাতায় রেকর্ড আছে। পুলিশের খাতায় আমার ছোট ভাইয়ের নামে কোন রেকর্ড নেই।

বললাম, বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। এখন আমার সঙ্গে কেন যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন, তা বলুন।

ততক্ষণে চা এসে গেছে। প্রেসের ম্যানেজার লম্বা তালপাতার সেপাইর মতো এক যুবক টেবিলে এনে দু'কাপ চা, খানকয়েক টোস্ট-বিস্কিট রাখলেন। আজিজ মিসির যুবকের পরিচয় দিলেন তার আত্মীয়। আমার দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনাকে 'চলন্তিকায়' লিখতে হবে। গল্প উপন্যাস সব কিছু। পত্রিকাটি

দাঁড় করানোর ব্যাপারে আমাকে অবশ্যই আপনার সাহায্য করতে হবে।

মনে মনে একটা থ্রিল অনুভব করলাম। এতকাল শুধু ছবিঘরে বসে ছবি দেখেছি। ছবির জগৎ আমার কাছে ধরাছোঁয়ার বাইরের কল্পলোক। এই জগতের মানুষেরা অশরীরী। শুধু ছায়া আর মায়া। ঢাকায় এই ছায়ার জগৎ নিয়ে একটাই মাত্র সিনে-সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'। কায়ক্লেশে চলে। 'সিনেমা' নামে একটি মাসিক কাগজ বেরিয়েছিল। সেটি অনিয়মিত। সম্ভবতঃ তখন লুপ্ত। সেদিক থেকে 'চলন্তিকাই' হবে ঢাকার একমাত্র সিনেমা মাসিক। এই পত্রিকার মাধ্যমে ছায়ার জগতের অশরীরী মানুষগুলোর সঙ্গে যদি আমার পরিচয় ঘটে, তাহলে মন্দ কি? আজিজ মিসিরকে জানালাম, আমি লিখবো। তবে ছোটগল্প।

আজিজ মিসির বললেন, না আপনাকে উপন্যাসও লিখতে হবে। সামনের দু'সংখ্যা পরেই আমাদের ঈদসংখ্যা বিরাট আকারে স্পেশাল ইস্যু হিসেবে বেরুবে। আপনার সম্পূর্ণ উপন্যাস তাতে থাকবে।

তার কথা শুনে আমার বুকে কাঁপন বেড়ে গেল। উপন্যাস বলতে আমার তখন একটিমাত্র বই 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'। চটি উপন্যাস। বড় উপন্যাস লেখা তখন আমার কাছে সমুদ্রে সাঁতার কাটার মতো। ছোটগল্প লেখার ছোট পরিসরেই তখন আমি আরাম পাই। কিছুটা নামও করেছিলাম।

আজিজ মিসির আমার মনের ভাব আঁচ করতে পেরে বললেন, ভয় পাবেন না। লিখতে বসলেই দেখবেন, আপনার কলম তর তর বেগে চলছে। আপনার কলমে শক্তি আছে। তাছাড়া এখনো তো দু'মাস সময় হাতে রয়েছে। আপনি আস্তে আস্তে লিখতে শুরু করুন।

তার কথায় সাহস পেলাম। বললাম, চেষ্টা করে দেখবো।

আজিজ মিসির বললেন, চেষ্টা নয়, আপনাকে আগামীকাল থেকেই লেখা শুরু করতে হবে। 'চলন্তিকার' প্রথম বিশেষ সংখ্যায় আপনার উপন্যাস যাবেই। আপনি আমাকে বাসার ঠিকানা দিন। আমি রোজ গিয়ে আপনাকে তাগাদা দেব।

তাকে কে এম দাশ লেনের বাসার ঠিকানা দিলাম। তিনি সেটা নোট বইয়ে টুকে নিয়ে বললেন, এই বাসাতেই আপনি ভাবী আর বাচ্চা ছেলে নিয়ে থাকেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমি কালই আপনার বাসায় গিয়ে হাজির হবো।

বলেই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার কভারের ছবি নির্বাচনের কাজে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। টেবিলের উপর তখনকার কয়েকজন নায়িকার ছবি। ঝর্ণা বসাক (শবনম), রওশন আরা, কবরী, সুলতানা জামান, সুমিতা। এরা তখন সকলেই নতুন মুখ। শুনলাম, এদের সকলের সঙ্গে আজিজ মিসিরের পরিচয় এবং খাতির রয়েছে। শুনে

খুব ঈর্ষা হল। সেদিনের মতো বিদায় নিলাম। বাসায় এসে স্ত্রীকে আমার সমস্যার কথা বললাম। আজিজ মিসিরকে তো কথা দিয়ে এসেছি 'চলন্তিকার' জন্য উপন্যাস লিখবো। এতো 'ইত্তেফাকের' সম্পাদকীয় লেখা নয় যে, অফিসে বসে লিখে দিয়ে আসবো। বাসায় বসে লিখতে হবে। কিন্তু লেখার টেবিল-চেয়ার কই?

ঘরে একটা পরিত্যক্ত বেতের চেয়ার ও টেবিল ছিল। সম্ভবত আগের ভাড়াটিয়া ফেলে গেছেন। চেয়ারটায় কোনভাবে বসা যায়। টেবিলটা খুবই নড়বড়ে। আমার স্ত্রী সেটার পায়ার নীচে ইট বসিয়ে ঘরের দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দিলেন। বললেন, এবার বসে দেখো, কোনোভাবে লেখালেখির কাজ চলে কিনা?

ঠেকলে মানুষ কী না করে! ওই ভাঙ্গা চেয়ার-টেবিলেই 'চলন্তিকার' জন্য উপন্যাস লেখার কাজে হাত দিলাম। প্লটের পর প্লট ভাবছি। কোনোটাই ঠিক মতো খাপ খাওয়াতে পারছি না। কাগজের পাতার পর পাতা নষ্ট হচ্ছে।

একদিন ভোরে আমার এই লেখার সময়েই বাসায় আজিজ মিসিরের আবির্ভাব। হাতে কালাচাঁদ গন্ধ বণিকের দোকান থেকে কেনা মিষ্টির প্যাকেট। আমার স্ত্রীর হাতে সেই প্যাকেট তুলে দিয়ে বললেন, ভাবী, পরিচয় করতে এলাম।

আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে দৌড়ালেন। চুলায় চায়ের কেতলি চাপালেন। ওই মিষ্টি দিয়েই অতিথি সেবার ব্যবস্থা হল।

অনুপম তখন দোলনায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বাইরের বারান্দায় ভোরের কাঁচা সোনার মতো রোদ কয়েকটা গাছের পাতা ভেদ করে এসে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমার হাতে কলম। মাথায় উপন্যাসের প্লটের জট। আজিজ মিসির হঠাৎ বেতের চেয়ারে কুঁজোর মতো বসে আমাকে লিখতে দেখে বললেন, গাফ্‌ফার সাহেব, আপনি কি এ চেয়ার টেবিলে বসেই লিখে থাকেন? আপনার কি কাঠের ভালো চেয়ার-টেবিল নেই?

বললাম, থাকলে তো আপনাকেই চেয়ারে বসতে দিতাম। খাটে আপনাকে বসতে হতো না।

আজিজ মিসির আমার কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

ছয়

দিন দুই পর আজিজ মিসির আবার এলেন কে এম দাস লেনে আমার বাসায়। মনে আছে হেমন্তের সকাল। কুয়াশা-মুড়ি-দেওয়া ভোর একটু একটু করে চোখ মেলে এখন হাসতে শুরু করেছে। আবার কাঁচা সোনার মতো রোদ ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের বারান্দায়। এইমাত্র অনুপমের সারা শরীরে ওলিভ ওয়েল মাখা শেষ

করেছে আমার স্ত্রী। সে মাটিতে সতরঞ্চির উপর শুয়ে হাত পা ছড়িয়ে খেলা করছে। তার শরীরে রোদের ঝিলিক।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই ভাঙা বেতের চেয়ারে বসে 'চলন্তিকা' মাসিকের জন্য উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম। মাঝে মাঝে গান গাইছিলাম "আয় হেমন্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা?' মনটা প্রসন্ন ছিল। উপন্যাসের চ্যাপ্টার দুই লেখা হয়ে গেছে। উপন্যাসের কাহিনী নতুন রাজধানী (প্রাদেশিক) ঢাকার নতুন গড়ে ওঠা উচ্চ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনের উত্থান পতন নিয়ে। একটি এ্যাংলো-খৃস্টান পরিবারকেও ঢুকিয়েছি উপন্যাসে। এই পরিবারের একটি মেয়ে রত্না— তাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে উপন্যাসের মূল কাহিনী। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকের ঢাকা শহর। তখনো উপন্যাসে নায়িকাকে যতটা খোলামেলা করে দেখাতে চাই, ততটা খোলামেলা করে দেখানোর মতো নায়িকা মুসলমান সমাজে ছিল না। দু'একজন যারা ছিলেন, তাদের চরিত্রকে ভিত্তি করে উপন্যাসের নায়িকার চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হলে বিপদ ছিল।

হেমন্তের মিষ্টি রোদ-মাখা ভোরে বাসায় ঢুকেই আজিজ মিসির হৈ চৈ শুরু করলেন, কই ভাবী, চা খাওয়ান।

আমার স্ত্রী বলল, শুধু চা খাবেন, না নাস্তাও?

আজিজ মিসির বললেন, অধিকন্তু ন দোষায়। (বেশি হলে দোষ নেই)।

আমি বারান্দায় টুলের উপর ছেলের পাহারায় বসলাম। আজিজ মিসিরকে বেতের চেয়ার ছেড়ে দিলাম। আমার স্ত্রী গেল ভাজা ডিম এবং টোস্ট-এর ব্যবস্থা করতে।

আজিজ মিসির আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন, আজকের মতো আপনার লেখা কি শেষ হয়েছে?

ঃ তা হয়েছে। মোটামুটি উপন্যাসের দু'চ্যাপ্টার দাঁড় করিয়ে ফেলেছি।

ঃ আমি তাহলে এই দুই চ্যাপ্টার আজ নিয়ে যাব। শুধু শেষের পাতাটা আপনার কাছে থাকবে। কনটিনিউয়েশন মনে রাখার জন্য। তবে আজ আরও একটা কাজ আছে আপনার।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কি কাজ?

ঃ আমার সঙ্গে আপনাকে আজ নয়াবাজারে যেতে হবে। আপনার আপাততঃ একটা চেয়ার আর টেবিল দরকার।

আরও বিস্মিত হয়ে বললাম, ফার্নিচারের দোকানতো সব ফরাসগঞ্জে। নয়াবাজারে শুধু কাঠ বিক্রি, কাঠ চেরাই করা হয়। আর আছে ঝালাইকরের দোকান। ফরাসগঞ্জে গিয়ে ফার্নিচার কিনবো এমন পয়সা আমার নেই। কাঠের একটা ছোট

চেয়ার এবং টেবিলেরই দাম পড়ে যাবে একশ' টাকার উপর।

আজিজ মিসির মুচকি হাসলেন। বললেন, সে জন্যই তো বলছি নয়াবাজারে চলুন। টেবিলের দাম আট টাকা। চেয়ারের দাম বারো টাকা। এই কুড়ি টাকায় আপনাকে আপাততঃ লেখার কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো চেয়ার টেবিল কিনে দেব।

আমার বিস্ময় গেল না। বললাম, আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়ি, তখন আরমানিটোলায় ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাস—বান্ধব কুটিরে থাকতাম। আরমানিটোলার কাছেই নয়াবাজার। শুধু কাঠের দোকানের সারি। অনেকে বলতো কাঠপট্টি। একটা ফার্নিচারের দোকানও সেখানে দেখিনি।

আজিজ মিসির বললেন, এখনো দেখবেন না। তবে ওই কাঠের আড়তদার, চেরাইকারীরাই নিজেদের জন্য কখনো কেরোসিন কাঠ, কখনো আমকাঠ, জামকাঠ দিয়ে ছোট টুল টেবিল চেয়ার বানায়। তাতে বার্নিসও থাকে না। ছ'মাস একবছর এই চেয়ার টেবিল ব্যবহার করা যায়। তারপর আর টেকে না। আর টেকারই বা দরকার কি? ছ'মাস ন'মাস পরে নিশ্চয়ই আপনার হাতে টাকা আসবে। ফরাসগঞ্জে ফার্নিচার মার্টে গিয়ে ভালো চেয়ার-টেবিল কিনতে পারবেন।

আমার স্ত্রী চা-নাস্তা নিয়ে এসে আমাদের শেষের দিকের আলাপ শুনেছিলো। সে তক্ষুণি একুশটি টাকা এনে আমার হাতে দিল। বলল, যাও, ওই আমগাছের কাঠেরই টেবিল-চেয়ার এখন কিনে নিয়ে আসো। তোমার লেখা চলুক। এক টাকা বেশি দিলাম। নয়াবাজারে তোমাদের যাওয়া-আসার রিকশা ভাড়া।

আজিজ মিসিরের সঙ্গে তখুনি ছুটলাম নয়াবাজারে। দু'তিনটি কাঠের দোকান ঘুরে ষোল টাকার মধ্যে ছোট চেয়ার এবং টেবিল পাওয়া গেল। সামান্য বার্নিসও তাতে করা হয়েছে। ফলে সস্তা চেয়ার টেবিলটার আভিজাত্য একটু বেড়েছে।

দাম দেওয়ার সময় আজিজ মিসির বললেন, দামটা আমি দেই। শত হোক, আপনি এই টেবিল চেয়ারে বসে তো আমার কাগজের জন্যই উপন্যাস লিখবেন।

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লাম। বললাম, না, তা হয় না। আপনি নতুন কাগজ বের করেছেন। টিকবে কি টিকবে না তার ঠিক নেই। নিজে স্ত্রী পুত্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেখে একা ঢাকায় পড়ে আছেন। এখন আপনার উপর চাপ বাড়াতে চাই না। 'চলন্তিকার' কাটতি বাড়ুক, আপনি একটু স্থির হোন, তখন না হয় ফরাসগঞ্জে গিয়ে সেগুন কাঠের চেয়ার টেবিল কিনে দেবেন।

আজিজ মিসির আর জোর করলেন না। নয়াবাজারে টেবিল চেয়ারসহ একটা রিকশায় আমাকে চাপিয়ে দিয়ে সেদিনের মতো বিদায় নিলেন। আমি মহা উল্লাসে দিগ্বিজয়ীয় ভঙ্গীতে আম কাঠের টেবিল-চেয়ারসহ বাসায় ফিরে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ভাঙা বেতের চেয়ার ও টেবিলটা নিক্ষিপ্ত হল রান্নাঘরের পাশে জ্বালানি কাঠ

রাখার ঘরে। আর আমার ডাইনিং কাম ড্রয়িং কাম বেড রুমের দেয়াল ঘেঁষে শোভা পেতে লাগলো নয়াবাজার থেকে সদ্য কিনে আনা বাদামি রঙের বার্নিস দেওয়া চেয়ার টেবিল।

নতুন চেয়ার টেবিল পেয়ে উৎসাহের আতিশয্যে সেদিন ভর দুপুরেই আবার উপন্যাসের নতুন অধ্যায় লিখতে বসে গেলাম। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলাম। বিকেলে খবরের কাগজে কলম পিষতে যেতে হয়। সেদিন তাই এক সময় চেয়ার টেবিলটা ছাড়তে হল। নইলে হয়তো সারাদিনই লিখতাম।

এই উপন্যাসটা যেদিন শেষ করে আজিজ মিসিরের হাতে তুলে দিলাম, সেদিন তার মুখে আনন্দের হাসি। আমার মুখে ছিল তৃপ্তি ও স্বস্তির হাসি। উপন্যাসের নাম দিয়েছিলাম 'তিমির সঙ্গিনী'। বেশ বড়সড়ো উপন্যাস। ছাপার অক্ষরে আগেই লেখাটা দেখবো, সেই আশায় প্রায় প্রতিদিনই সময় করে শেলী প্রেসে যেতাম উপন্যাসটির প্রুফ নিজে দেখার জন্য। একদিন চা-টোস্ট সহযোগে এই প্রুফ দেখার সময় আজিজ মিসির বললেন, আপনার উপন্যাসটির ইলাস্ট্রেশন করানোর ব্যবস্থা করেছি।

আমার আনন্দ আর বাগ মানে না। নিজের কল্পিত নায়ক নায়িকার চিত্ররূপ দেখবো, এও কি কম আনন্দের কথা! তখন ঢাকায় প্রকাশনা শিল্প বলতে শুধু স্কুল কলেজের পাঠ্য বই। একমাত্র কমার্শিয়াল আর্টিস্ট আবুল কাশেম। দু'একটা অপাঠ্য বইয়ের তিনি কভার করেন। কামরুল হাসান পেইনটিং নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। নিজের রুচি ও পছন্দের সঙ্গে খাপ খেলে কোনো ম্যাগাজিন বা বইয়ের ছবি এঁকে দিতেন। কাইয়ুম চৌধুরী তখন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে সবে যাত্রা শুরু করেছেন। তার অত্যাধুনিক ফর্ম। সাধারণ প্রকাশকদের মধ্যে তিনি তেমন পরিচিত নন। সুতরাং ধরে নিলাম 'চলন্তিকায়' আমার উপন্যাসের ইলাস্ট্রেশনের জন্য হয়তো আজিজ মিসির শিল্পী আবুল কাশেমের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করতেই আজিজ মিসির বললেন, না, একজন নতুন শিল্পী। এই ইসলামপুরের একটা গলিতেই তার ব্লক তৈরির কারখানা আছে। হাফটোন, লাইন দু'রকমের ব্লকই তৈরি করেন। তবে লাইন ব্লক বেশি। বিভিন্ন দোকান, জিনিসপত্রের পোস্টার ছাপানোর লাইন ব্লক। নিজেই ছবি এঁকে লাইন ব্লক তৈরি করে দেন। এটাই তার এখনকার পেশা। কিন্তু সিনেমার লাইনেও তার অসীম উৎসাহ।

বললাম, ভদ্রলোকের নাম কি?

আজিজ মিসির বললেন, সুভাষ দত্ত। আজই আপনাকে তার ব্লক ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাব। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। হয়তো আপনার উপন্যাসের ইলাস্ট্রেশন এতদিনে হয়ে গেছে। নিজের চোখেই দেখে আসতে পারবেন।

এক ফুঁয়ে বাতি নেভার মতো আমার উৎসাহ নিভে গেল। সুভাষ দত্ত নামটি তখন আমার কাছে পরিচিত নয়। ধরে নিলাম, ইসলামপুর অথবা পটুয়াটুলির গলিতে রাজা-রানী মার্কা বিড়ি, হাতীর শুঁড়অলা সরিষার তেলের টিনের লেবেলের ছবি আঁকা ও ব্লক তৈরির জন্য যেসব রদ্দিমার্কা ফ্যাক্টরি আছে, সুভাষ দত্ত তারই একটির মালিক এবং তার আঁকা ছবিও ওই রকম। মনে মনে ভাবলাম, সুভাষ দত্তের আঁকা আমার উপন্যাসের ইলাস্ট্রেশন পছন্দ না হলে আজিজ মিসিরকে অনুরোধ করবো, যেন ইলাস্ট্রেশন ছাড়াই উপন্যাসটি 'চলন্তিকায়' ছাপানো হয়।

তবু আগ্রহের বশে আজিজ মিসিরের সঙ্গে সুভাষ দত্তের ফ্যাক্টরিতে গেলাম। ছোটখাটো মানুষ। তার ফ্যাক্টরির বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। আমাদের দেখে হাতের কাজ রেখে চেয়ার টেনে বসতে দিলেন। প্রথম দেখাতেই তাকে ভাল লাগলো। সপ্রতিভ হাসিখুশি মানুষ। আজিজ মিসির তাকে বললেন, উপন্যাসের লেখককেই একেবারে আপনার কাছে ধরে নিয়ে এসেছি। ইলাস্ট্রেশন তিনি নিজেই দেখে পছন্দ করবেন।

সুভাষ দত্ত দু'কাপ চায়ের ব্যবস্থা করলেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা বড় বাদামি খামে ঢুকিয়ে রাখা 'তিমির সঙ্গিনী'র টাইটেল পেজের ইলাস্ট্রেশন বের করে আমার হাতে দিলেন।

নিমিষে নিজের মনে চরম লজ্জা পেলাম। সুভাষ দত্তকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। তাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনা-জানার আগেই তার শিল্পরুচি ও ছবি আঁকার দক্ষতা ও আধুনিকতা সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলাম। 'তিমির সঙ্গিনী'র যে ইলাস্ট্রেশন তিনি করেছিলেন, তা তখনকার কলকাতার যেকোনো উন্নতমানের সাহিত্য ও সিনেমা পত্রিকার গল্প উপন্যাসের ইলাস্ট্রেশনের সমতুল্য। খুশি হয়ে সুভাষ দত্তকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, চমৎকার হয়েছে।

সুভাষ দত্ত বললেন, আপনার উপন্যাসের কাহিনীও আমার ভালো লেগেছে। এই কাহিনী নিয়ে একটা ভালো ছবি করা যেতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ছায়াছবি সম্পর্কে আগ্রহী?

সুভাষ দত্ত বললেন, খুবই আগ্রহী। তবে অভিনয়ে নয়। ছবি পরিচালনায়। আমি ভালো কাহিনী, নতুন মুখের সন্ধানে আছি। ভালো প্রযোজক এবং ভালো টাকা হাতে পেলে ছবি তৈরির কাজে হাত দেব ভাবছি।

'তিমির সঙ্গিনী'র ইলাস্ট্রেশন দেখার পর থেকেই সুভাষ দত্ত নামের গোটা মানুষটি সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে গিয়েছিল। তিনি যে ভালো ছবি তৈরি করতে পারবেন, নিজে ছবির পরিচালক হিসেবে নাম করবেন, সে সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ ছিল না।

পরবর্তীকালে আমার ধারণাকে সত্যে পরিণত করে সুভাষ দত্ত সত্যি সত্যি ছায়াছবির নামকরা পরিচালক হন। তার হাতে একাধিক ভালো ছবি তৈরি হয়েছে। অনেক নতুন মুখ তিনি এনেছেন ছবির পর্দায়। তাদের কেউ কেউ এখন সফল এবং প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা-অভিনেত্রী। আমার যদি স্মৃতিভ্রম না হয়ে থাকে তাহলে বলবো, সুচন্দাও সম্ভবত সুভাষ দত্তেরই আবিষ্কার।

'চলন্তিকার' ঈদসংখ্যা সেবার বেশ মোটাসোটা হয়ে বেরিয়েছিল। তাতে আমার সম্পূর্ণ উপন্যাস। ভেতরে পাতায় পাতায় ছবি। তবে মাল্টিকালারে নয়। মাল্টিকালারে ছবি ছাপা তখনো ঢাকায় ব্যয় সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কলকাতার 'সিনেমা', উল্টোরথ' প্রভৃতি কাগজেও তখন মাল্টিকালার ছবি চাপা হতো না। হতো এক রঙা ছবি। 'চলন্তিকা'তেও নীল, লাল, বেগুনি ইত্যাদি নানা রঙের এক একটিতে নায়ক নায়িকাদের বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি ছাপা হয়েছিল।

আমার মনে তখন গোপন বাসনা ছিল 'তিমির সঙ্গিনী'র কাহিনী নিয়ে একটি ছবি করার। কয়েকজন ব্যবসায়ী বন্ধু এই ছবি তৈরিতে টাকা খাটাতেও রাজি ছিলেন। ফিল্ম স্ক্রিপ্ট লেখার অভিজ্ঞতা তখনো আমার হয়নি। এ ব্যাপারে সাহিত্যিক বন্ধু সৈয়দ শামসুল হকের সাহায্য নেব কিনা ভাবছিলাম। পূর্ব পাকিস্তানে নির্মিত প্রথম ছায়াছবি সম্ভবতঃ 'মুখ ও মুখোশ' অথবা 'মাটির পাহাড়'। 'মাটির পাহাড়' ছবির কাহিনীকার সৈয়দ শামসুল হক। ছাত্রজীবনেই তিনি একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে বোম্বেতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন ছায়াছবির জগতে কাজ করার নেশায়। আমার কাহিনী নিয়ে যে ছবি হবে, কল্পনায় তার একটা নীল নকশা তৈরি করে ফেলেছিলাম। ছবিটির পরিচালনায় থাকবেন সুভাষ দত্ত। তিনি যদি রাজি হন তাহলে রত্নার ভূমিকায় নায়িকা হবেন হোসনে আরা (সুবর্ণা মোস্তফার মা)। আমার মতে, তখন ঢাকার নাট্যমঞ্চে সবচাইতে সুন্দরী অভিনেত্রী ছিলেন হোসনে আরা। নায়ক হিসেবে আনোয়ার হোসেনের নাম মনে ছিল। ছবির গানও লিখবো আমি। সুরকার হিসেবে আমার বন্ধু ও সহপাঠী কুষ্টিয়ার আনোয়ার উদ্দিন খান। তার গানের গলা তখন একেবারে ধনঞ্জয়ের মতো। ধনঞ্জয়েরই ভাবশিষ্য ছিল সে।

কিন্তু আমার এই স্বপ্ন ও কল্পনা কখনো বাস্তব হয়নি। 'তিমির সঙ্গিনী' তিমিরেই রয়ে গেছে। কখনো ক্যামেরায় বন্দী হয়ে ছবির পর্দায় উঠে আসেনি। তার কারণ, 'চলন্তিকার' এই ঈদ সংখ্যাটি প্রকাশের বেশ কিছুদিন পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার আকস্মিকভাবে এক বিজ্ঞপ্তিতে সংখ্যাটিকে নিষিদ্ধ করে দেন। অপরাধ, তাতে 'তিমির সঙ্গিনী নামে একটি উপন্যাস আছে এবং তাতে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে, এরকম কথাবার্তা আছে।

তখন আইয়ুবের সামরিক শাসনের জমানা। 'ইত্তেফাক' প্রকাশনা গ্রুপের 'সাপ্তাহিক চাবুক' কাগজটি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি 'দৈনিক আজাদের' সম্পাদকীয়

বিভাগে মাত্র যোগ দিয়েছি। এই সময় কবি আবদুল কাদির একদিন 'আজাদ' অফিসে বেড়াতে এলেন। তার বাসা আজিমপুর কলোনীতে। মাঝে মাঝে তিনি পায়ে হেটে 'আজাদ' অফিসে চলে আসতেন তার বন্ধু আবুল কালাম শামসুদ্দিন ও মুজিবুর রহমান খাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে। বয়সে তাদের অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু সম্পাদকীয় বিভাগে এক সঙ্গে কাজ করি, সেই সুবাদে এই আড্ডাতে মাঝে মাঝে আমারও শরিক হওয়ার সুযোগ হতো।

এই আড্ডাতে বসেই কবি আবদুল কাদির আমাকে একদিন জানালেন, আপনার জন্য একটি বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

আমি উদ্বিগ্ন হলাম—কি ধরনের বিপদ?

ঃ 'চলন্তিকা' পত্রিকার বিশেষ ঈদ সংখ্যাটি সরকার বাজেয়াপ্ত করবেন। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। কারণ দর্শানো হবে, মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এ ধরনের কথাবার্তা সংখ্যাটিতে আছে। আসল কারণ বলা হবে না।

ঃ আসল কারণ কি?

ঃ আপনার 'তিমির সঙ্গিনী' উপন্যাস। এ উপন্যাসে কি আপনি মুসলমানেরা যেসব নারীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করে যেমন রাবেয়া, রহিমা এদের নিয়ে কোনো ঠাট্টা তামাসা করেছেন?

আমি দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করলাম, কক্ষণো না। তবে আমার উপন্যাসে তাদের নামের রেফারেন্স আছে।

কবি আবদুল কাদির বললেন, সেটাই আপনার বিরুদ্ধে গেছে। কেন মুসলমান নাম ধাম নিয়ে উপন্যাসে টানাটানি করতে যান? জানেন তো, আমাদের বাঙালি মুসলমানেরা এসব ব্যাপারে বড় বেশি স্পর্শকাতর।

আমার এত সাধের উপন্যাসটি নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় ভীত হয়ে বললাম, 'চলন্তিকার' ঈদ সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করার সরকারী বিজ্ঞপ্তিতো এখনও প্রকাশ হয়নি। আপনি আগে জানলেন কিভাবে?

কবি আবদুল কাদির হেসে বললেন, আমি সরকারী মাসিক 'মাহে নও'-এর সম্পাদক নই? সরকারী তথ্য বিভাগের একজন কর্মকর্তা নই? সুতরাং এসব বিষয় আমি আগে জানবো না তো কে জানবে?

বললাম, আমি কি এ সম্পর্কে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি?

কবি আবদুল কাদির একটু ভেবে বললেন, নিশ্চয়ই পারেন। তবে খবরদার, আমার কাছে কথাটা শুনেছেন, তা বলবেন না। আপনি কি কবি আবদুর রশীদ খানকে চেনেন।

বললাম, অবশ্যই চিনি।

কবি আবদুল কাদির বললেন, তাহলে তার সঙ্গে একবার যোগাযোগ করুন। তিনি প্রাদেশিক সরকারের তথ্য বিভাগের একজন কর্মকর্তা। তার সুপারিশেই 'চলন্তিকার' ঈদ সংখ্যা নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে।

সাত

ঢাকায় তখন কমলাপুর রেল স্টেশন হয়নি। পুরনো ও নতুন ঢাকার মধ্যিখানে ফুলবাড়িয়ায় মেইন রেল স্টেশন। সঙ্গেই একটা বড় পোস্টাফিস। তার সামনে আরএমএস (রয়াল মেইল সার্ভিস) লেখা বড় বড় ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকতো। বৃটিশ আমলে পোস্টাল সার্ভিসের নাম ছিল রয়াল মেইল সার্ভিস। বৃটিশ রাজত্ব শেষ হওয়ার পরেও বহুকাল ডাক তার বিভাগের গাড়ির গায়ে পুরনো নামটি লেখা ছিল। যেমন বৃটিশ আমলের বৃটিশ রাজার ছবিঅলা টাকার নোটে 'হুকমতে পাকিস্তান' ছাপ মেরে পাকিস্তান আমলে চালু ছিল বহুকাল।

এক সুন্দর সকালে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে এলাম। সঙ্গে স্ত্রী সেলিমা এবং ছেলে অনুপম। সে তখন স্বাস্থ্যবান শিশু। তাকে নতুন জামাকাপড় পরানো হয়েছে। মাথায় ফুল তোলা রঙিন টুপি। নারিন্দা রোডে আমার শ্বশুরের বাসা থেকে বেরুবার সময় আমার শাশুড়ি হঠাৎ অনুর কপালের একপাশে বড় একটা কালো কাজলের টীপ দিয়ে দিলেন। বললেন, 'লোকের চোখ লাগতে পারে। আমার নানুর অসুখ বিসুখ হতে পারে।' আমি এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। কিন্তু মায়ের মতো সরল মনের মানুষটির কাজে বাধা দিতেও ইচ্ছে হয়নি।

থার্ড ক্লাশে চড়া মানুষ আমি। এবার স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে ট্রেন জার্নিতে একটু আভিজাত্য ফলাবার জন্য ইন্টারক্লাসের টিকিট কিনেছিলাম। কপাল ভালো। বেঞ্চে শুধু দু'জনের বসার নয়, ছেলেকে শোওয়াবারও জায়গা হল। শুয়ে শুয়ে অনুপম বেশ কিছুক্ষণ খেলা করলো। দু'একজন যাত্রী আমাদের সঙ্গে আলাপ জমালেন, অনুপমকেও আদর করলেন। আশুগঞ্জের ব্রিজ ছাড়বার আগেই অনুপম ঘুমিয়ে পড়লো। আমি স্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে কাটিয়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার কাজে মন দিলাম।

আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে ঢাকা থেকে ট্রেনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেতে দু'পাশে বিস্তৃত ধানের ক্ষেত, সবুজ গাছগাছালি, উপরে উদার অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য বুঝি বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও নেই। আবার চৌত্রিশ বছর পরে জার্মানীর এক সুন্দর সামারের সকালে রাইন নদীর পাড় ঘেঁষে হ্যানোভার শহর থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টের দিকে গাড়িতে চেপে যেতে যেতে মনে

হয়েছিল, রাস্তার পাশে ফলের ভারে নত আঙুরের গাছ, নদীর একপাশে আকাশছোঁয়া কালো পাহাড়ের সারি, রাইনের আঁকাবাঁকা স্রোত, সবুজ শ্যামলিমা মাখা গাছগাছালি, রাস্তার মাঝে মাঝে নানা রঙের ফ্লাওয়ার বেড, উপরে নীলাকাশ; এমন তন্ময় সৌন্দর্যের তুলনা বুঝি আর কোথাও নেই পৃথিবীতে।

রবীন্দ্রনাথ সত্যি বলেছেন, 'ফুলের বনে যার পাশে যাই, তারেই লাগে ভালো।' পৃথিবীর বহু দেশতো ঘুরলাম। যখন যে দেশে গেছি, সে দেশের সৌন্দর্য মত্ত হয়ে দেখেছি। পঁয়ত্রিশ বছর আগে নিজের দেশ থেকে এক পা বাড়িয়ে অন্য দেশ দেখার সৌভাগ্য যখন আমার হয়নি, তখন ঢাকা শহর থেকে বের হয়ে মহকুমা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমার চোখ জুড়িয়ে দিয়েছিল। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, বাংলাদেশে শ্যামলে শ্যামল আর নীলিমায় নীল এত সৌন্দর্য থাকতে মানুষ কেন শহরগুলোতে পাথর আর পাষান চাপা দিয়ে সেই সৌন্দর্য ধ্বংস করে?

বেলা একটা কি দেড়টার দিকে গিয়ে পৌছেছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। প্লাটফরমে ট্রেনের অপেক্ষায় আজিজ মিসির পায়চারি করছিলেন। সেদিন তার সঙ্গে তার দু'ভাই হারুন এবং ওয়াকিল স্টেশনে উপস্থিত ছিল কিনা আজ স্পষ্ট মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে দু'জনেই ছিল। হারুনের পুরো নাম মোহাম্মদ হারুন উর রশীদ। তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।(পরে অধ্যাপক এবং বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছে।) ওয়াকিল কি স্কুলের ছাত্র ছিল? এখন আর মনে পড়ছে না।

দু'তিনটা রিকশা ডেকে আমরা রওয়ানা হলাম আজিজ মিসিরের বাড়িতে। তার বাবা-মা দু'জনেই তখন জীবিত। ছবির মতো সুন্দর রাস্তা দিয়ে রিকশা ছুটে চলল। আর সেই ধাবমান গাড়িতে বসে অনুপমের সে কি আনন্দ! সে মায়ের কোলে বসে কখনও খিল খিল করে হাসছে। কখনো চেষ্টা করছে কোল থেকে রাস্তায় নামতে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোনো সিনেমা হলে সম্ভবতঃ নতুন ছবি আসছে। ব্যাণ্ড বাজিয়ে একদল লোক পায়ে হেঁটে তার প্রচারপত্র বিলি করছে। ব্যান্ডের বাজনার পিছনে ছুটছে এক দল ছোট ছেলেমেয়ে। কে একজন একটা প্রচারপত্র আমাদের গাড়িতে ছুঁড়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখি, পুরনো ভারতীয় ছবি 'আনের' প্রচারপত্র। দিলীপ কুমার যোদ্ধার বেশে তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রচারপত্রের ছবিতে। পেছনে নৃত্যরতা নিম্মির মুখ।

আজিজ মিসিরের বাবা যে শহরের বেশ বিত্তশালী বনেদী মানুষ, তার বাড়ি দেখেই তা বুঝা গেল। আটচল্লিশ বন্ধের বিরাট আটচালা টিনের ঘর। পাশে আরো ছোট ছোট দু'টি ঘর। সামনে ফুলের বাগান। পেছনে দেয়াল ঘেরা শান বাঁধানো পুকুর। কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ পানি তাতে টলটলায়মান। বাড়ি ভর্তি নানারকম গাছ।

রিকশা থেকে নামতেই আজিজ মিসিরের বাবা ছুটে এলেন। আমাকেতো বুকে জড়িয়ে ধরলেনই, সেই সঙ্গে কাঁধে তুলে নিলেন অনুপমকে। বাড়িতে ঢুকেই হাঁকডাক শুরু করলেন, কই, হাত মুখ ধোয়ার পানি আনো। শরবত দাও। পিঠাগুলো তশ্‌তরিতে সাজিয়ে দাও।

আজিজ মিসিরের বাবা মা দু'জনেই তখন প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন। তেমন বুড়ো হননি। পান খেতে খেতে মা ছেলের-বৌয়ের কাজ তদারক করছিলেন। আজিজ মিসিরের স্ত্রী তখন তরুণী। পরণে রঙিন শাড়ি। আধো ঘোমটা ঢাকা মুখ প্রথম দেখলাম। দুই যমজ ছেলে জন্ম দিয়ে তখন তিনি আরেক সন্তানের জননী হতে চলেছেন। তিনি সেলি ও অনুপমের তত্ত্বতালাশ শুরু করলেন। কিছুক্ষনের মধ্যে দু'জনের ভাব জমে উঠলো। আমার ইচ্ছে ছিল আজিজ মিসিরের বাবাকে ডাকবো চাচা, তার মাকে চাচী। কিন্তু এক সময় লক্ষ্য করলাম, আজিজ মিসিরের মাকে সেলি খালা ডাকতে শুরু করেছে। সেই সুবাদে তার স্বামীকে খালু। সুতরাং আমারও তারা খালা এবং খালু হলেন।

হাত মুখ ধোয়া শেষ হল। বিরাট হলের মতো সামনের ঘরটাতে শীতল পাটি বিছানো চৌকির উপর আমরা বসলাম। ভাবী—আজিজ মিসিরের স্ত্রী কাঁচের গ্লাসে শরবত ঢেলে রেকাবিতে পিঠা সাজিয়ে দিলেন। এমন কারুকার্যময় সুস্বাদু পিঠা আমি বহুদিন দেখিনি। সামনে পেয়ে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম। খালা বললেন, এগুলো কিন্তু আমার বানানো নয়। বৌমার বাড়ি থেকে এসেছে। ওদের বাড়ির পিঠা বানানোর নামডাক সারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জুড়ে। বড় ঘরটাতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। আজিজ মিসির তার স্ত্রী ও যমজ ছেলেদের নিয়ে পাশের একটা ঘরে সরে গেলেন, অথবা সেই ঘরেই তারা থাকতেন। তার স্ত্রী হাসি মুখে রান্নাবান্না এবং আমাদের দেখাশোনার সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। দু'টি যমজ সন্তানকে সামলে এই দায়িত্ব বহন কম কথা নয়। আমার ভালো লাগলো আজিজ মিসিরের মা, আমার খালাকে। শাশুড়িসুলভ দাপট দেখানোর কোনো ভাব তার মধ্যে নেই। তার নিজের ছেলের এবং আমার স্ত্রীর সাথে সমানে বন্ধুর মতো গল্প করে চলেছেন, এটা ওটা সাহায্য করছেন। নিজের সম্পর্কে, তার স্বামী ও ছেলেদের সম্পর্কে নানা মজার গল্প বলছেন। আমার স্ত্রী আবার সেই গল্পগুলো শোনাতেন আমাকে।

এই বাড়িটাতে ছিল বিভিন্ন চেয়ারের উপর চমৎকার এমব্রয়ডারি করা কাপড়ের আসন। কাঠের সিলিংয়ের সঙ্গে ঝুলতো দড়ি দিয়ে তৈরি সুন্দর সুন্দর ছিগা। তার শিল্পকর্ম চেয়ে দেখার মতো। এমনকি আজিজ মিসিরের যমজ ছেলেদের জন্য হাতে তৈরি করা কাঁথার উপরেও ছিল নিপুণ সূঁচিশিল্প। কোনো শিল্পীর দ্বারা তৈরি নকশী কাঁথা যেন। বাড়ির সামনের বাগানটিতে নানারকম বাহারি ফুল। রোজ প্রত্যেকটি

গাছের যে যত্ন নেয়া হয়, তা দেখলেই বুঝা যায়। এসব দেখে সেলি একদিন জিজ্ঞেস করলো তার খালাকে, বাগানটি কে এত সুন্দর করে তৈরি করেছেন, তাতো জানি। খালুকে রোজ বাগানে কাজ করতে দেখি। কিন্তু চেয়ারের উপর কাপড়ের আসন, দড়ির ছিগা, আপনার নাতীদের নকশী কাঁথা, এগুলো কে করেছেন? আপনি, না আপনার বৌমা? এমন সুন্দর হাতের কাজ সহজে চোখে পড়ে না।

খালা মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, আমারও নয়, আমার বৌমারও নয়। শুনলে বিশ্বাস করবে? এসবই তোমার খালুর হাতের কাজ।

ঃ খালুর কাজ? সেলি প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি।

খালা বললেন, সত্যি তোমার খালুর কাজ। বুড়া রিটায়ার করেছেন। এখন বাড়িতে বসে সারাদিন বাগান করেন। কিন্তু বর্ষাকালে কি করবেন? তখন ঘরে বসেও নাতীদের জন্য পুরনো কাপড় দিয়ে কাঁথা সেলাই, চেয়ারের আসন তৈরি, দড়ির ছিগা বানানো ইত্যাদি কাজ করেন। কেন, তোমার ভালো লেগেছে? তোমার ছেলের জন্য একটা কাঁথা তৈরি করে দিতে বলবো?

সেলি তখন লজ্জায় না বলেছে। এখন দুঃখ করে করে বলে, তখন ভুল করেছি। খালুর হাতে একটা নকশী কাঁথা যদি বানিয়ে রাখতাম। এত সুন্দর কাজ। এখন লণ্ডনে এনেও ড্রয়িং রুম সাজাতে পারতাম।

আজিজ মিসিরের বাবা-মা দু'জনেই এখন নেই। মাতো আগেই গেছেন। চমৎকার গল্প বলতে পারতেন এই মায়ের মতো মহিলা। আজিজ মিসিরের সাহিত্য প্রতিভা সম্ভবতঃ তার কাছ থেকেই কিছুটা পাওয়া। সেলিকে গল্প শুনিয়ে তিনি হাসাতেন। একদিন বললেন আজিজ মিসির ও তার স্ত্রীকে নিয়ে একটি গল্প। বললেন, সিরাজ (আজিজ মিসিরের আসল নাম) এবং তার বৌ ওই পাশের ঘরটাতে তাদের যমজ ছেলে নিয়ে থাকে তোমরা দেখেছো। ওই ঘরে আর কেউ থাকে না। একদিন মাঝরাতে শুনি দুই ছেলে এক সঙ্গে কাঁদছে। ট্যা ট্যা— একটানা চীৎকার। সেই কান্না আর থামে না। ঘন্টা খানেক এই কান্না শুনে তোমার খালুকে জাগালাম। বললাম, নিশ্চয়ই পাশের ঘরে কোনো বিপদ হয়েছে। সিরাজ আর বৌমা কি এতই ঘুমকাতুরে যে, ছেলে দুটো ঘন্টাখানেক ধরে কাঁদছে, তারা টের পাচ্ছে না?

তোমার খালু বললেন, তাইতো। ব্যাপারটা খোঁজ করতে হয়। সেই মাঝরাতে বড় ঘরের দরজা খুলে আমরা পাশের ঘরে গেলাম। ছেলে দুটো তখন সমানে পাল্লা দিয়ে চীৎকার করছে। ঘরের সামনে গিয়ে আমরা অবাক। দরজায় তালা ঝুলছে। ঘরের ভেতরে বাচ্চারা। দরজায় তালা। ব্যাপারটা কি? অনেকক্ষণ সিরাজ আর সিরাজের বৌকে নাম ধরে ডাকলাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমাদের গলার আওয়াজ পেয়েই সম্ভবতঃ ছেলে দুটো চীৎকার আর কান্না আরো বাড়িয়ে দিল। ভয়ে

আমাদের বুক দুরুদুরু করতে লাগলো। সিরাজ আর বৌমার কোনো বিপদ-আপদ হয়নি তো? তোমার খালু বললেন, বিপদ-আপদ কি হবে? দেখছো না দরজার তালা ঝুলছে, নিশ্চয়ই তারা বাইরে গেছে। বললাম, তা কি করে হয়? দুটো ছেলেকে ঘরে তালা মেরে রেখে তারা বাইরে কোথায় যাবে?

তোমার খালু বললেন, যেখানেই যাক; এখন তালা ভাঙতে হবে। নইলে ছেলে দুটো চেঁচিয়েই মারা যাবে। তিনি ঘর থেকে একটা লোহার রড আনতে গেলেন তালা ভাঙার জন্য। আর ঠিক এ সময় বাড়ির সামনে একটা রিকশা ঠুনটুন আওয়াজ করে থামলো। দেখি, সিরাজ আর বৌমা চোরের মতো পা টিপে টিপে ঘরের দিকে আসছে। বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ নিশ্চয়ই তারাও পেয়েছে। তাই একটু দ্রুত হাঁটছে।

লোহার রড নিয়ে তোমার খালু ততক্ষণে ফিরে এসেছেন। হঠাৎ আমাদের দেখে বৌমা সিরাজের পেছনে গিয়ে লুকালো। সিরাজ আমতা আমতা করে বলল, আপনারা এখানে কি করছেন? তোমার খালু বললেন, কি করবো, তোমার ঘরের তালা ভাঙবার কথা ভাবছিলাম। নাতীদের কান্নায় সারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া এতক্ষণে জেগে উঠেছে মনে হয়।

সিরাজ লজ্জিত হয়ে বলল, আপনারা যান। আমরা ছেলেদের দেখছি।

তোমার খালু বললেন, আমরা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছে, তোমরা এতরাতে বাড়িতে ছেলে দুটোকে একলা ফেলে কোথায় গিয়েছিলে?

সিরাজ অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে রইলো। তারপর মিন মিন করে বললো, আমরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ওদের দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আমরা গেছি। মাঝরাতে জেগে উঠবে তা বুঝতে পারিনি।

সেলিকে গল্পটা বলে খালা বেদম হেসেছেন, সেলিকেও হাসিয়েছেন। সেলি আমার কাছে গল্পটা বলে আমাকে হাসিয়েছে।

দু'দিনেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এই বাড়িটাতে আমরা আপনজন হয়ে উঠেছিলাম। আজিজ মিসিরতো আছেনই। হারুন আর ওয়াকিলও যেন আমার ছোট দুই ভাই। খালু রোজই বাজার থেকে বড় বড় মাছ নিয়ে আসতেন। আজ রুই তো, কাল কাতলা, পরশু ইলিশ। তার উপর ঘরে বানানো নানারকম মিষ্টি আর পিঠাতো ছিলই। সেই সঙ্গে রোজ পাড়া বেড়ানো। দুপুরের রোদটা একটু ঝিমিয়ে আসতেই আমরা রিকশা নিয়ে বেরুতাম। আজ মিন্নাত আলীর বাড়িতে তো, কাল সুলতানের বাড়ি। দু'জনেই ছাত্রজীবনে ঢাকায় আমার বন্ধু ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তখন বড় বড় হিন্দু ব্যবসায়ী ছিলেন (হয়তো এখানো আছেন)। আর ব্রাহ্মণবাড়িয়াও ছিল একটি উন্নত ও শিক্ষিত মানুষের এলাকা। বাংলাদেশে সংস্কৃতি চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। সাহিত্য, সঙ্গীত সভা, নৃত্য, নাটক, যাত্রা, জারি, সারিতে সারা শহর সয়লাব। শহরের

ব্যবসায়ীরা ছিলেন সংস্কৃতিমনা। শহরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অকৃপণ হাতে চাঁদা দিতেন, পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' এই একটি উপন্যাস লিখেই যে লেখক স্মরণীয় হয়ে আছেন, সেই অদ্বৈত মল্ল বর্মণও ব্রাহ্মণবাড়িয়ারই সন্তান।

দেখলাম, মিন্নাত আলী আগের মতোই আছেন। পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের নামকরা কথাশিল্পী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র থাকাকালে ফজলুল হক হলে থাকতেন। আমার চাইতে দু'এক বছরের সিনিয়র। লম্বা একহারা পাতলা চেহারা। ঠোঁটের উপর সরু গোঁফ। খুবই রোমান্টিক মন।। লিখতেনও রোমান্টিক গল্প। তালাত মাহমুদের গান ভালোবাসেন। তার গল্পে তালাত মাহমুদের গানের উদ্ধৃতিও লক্ষ্য করেছি। একটি গানের কথা মনে আছে। "আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়/ মনে পড়ে মোরে প্রিয়/ চাঁদ হয়ে রবো আকাশের গায়/ বাতায়ন খুলে দিও।"

মিন্নাত আলী উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন না। না মানুষ হিসেবে, না লেখক হিসেবে। তাই সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার ডিগ্রী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই ফিরে গেলেন। মহিলা কলেজের অধ্যাপক হলেন। তার পর ধীরে ধীরে লেখার জগৎ থেকেও বিদায় নিলেন। পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে আমি তার বহু গল্প পড়েছি। তখন মনে হয়েছে, মিন্নাত আলী আমাদের কথাশিল্পে অনেক কিছু দেবেন। অনেক বড় কথাশিল্পী হবেন। কিন্তু তিনি সাধনার পথ ছেড়ে আত্মগোপনের পথ বেছে নিলেন। লেখার এত শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি তার পাঠকদের বিমুখ করলেন, তা ভেবে এখনো আমি বিস্মিত হই। তার কি আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল? সমারসেট মম বলেছেন, 'কেউ বড় লেখক হয়ে জন্মায় না। কেউ জন্ম থেকেই প্রথম শ্রেণীর লেখক হয় না। লিখতে লিখতে বড় লেখক হওয়া যায়। সাধনা করে তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীর লেখকের সারিতেও উন্নীত হওয়া যায়।' এই সত্যটিতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে আমরা অনেকেই হয়তো সাহিত্যের জগৎ থেকে হারিয়ে যেতাম না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমার আরেক বন্ধু ছিলেন সুলতান আহমেদ। ঢাকা কলেজে ছাত্র থাকাকালে আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই বন্ধুত্ব আর কখনো ছিন্ন হয়নি। সে হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার। ছাত্রজীবন থেকেই নাটকে অভিনয় করতো। ভাঁড়, বিদূষক ইত্যাদি ভূমিকাতে অভিনয় করাই ছিল তার বেশি পছন্দ। ব্যক্তিগত জীবনেও লোক হাসাতে তার মতো ওস্তাদ কম দেখেছি। মন খারাপ হলেই সুলতানের কাছে যেতাম। তার মনও হয়তো কোনো কারণে খারাপ। তবু সে আমাদের হাসাতো, নিজেও হাসতো। প্রায়ই কোট করতো রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি লাইন—"হাস্যমুখে অদৃষ্টকে করবো মোরা পরিহাস।"

সুলতান আগেই খবর পেয়েছিল আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিল, তার বাড়িতে না গেলে সে আমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে, যাতে ঢাকায় ফিরতে না পারি। এক বিকেলে রিকশা চেপে তার বাড়িতে হাজির হলাম। সুলতান দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনুপমকে রিকশা থেকেই কোলে তুলে নিল। গান ধরলো "শুধু তোমার বাণী নয়গো হে বন্ধু, হে প্রিয়/ মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

আট

"মনরে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

এই কথাগুলো প্রায়ই সুর করে গাইতো সুলতান। রবীন্দ্র সঙ্গীত আর লোকগীতির পংক্তি উচ্চারণে সে ছিল আমার বন্ধুদের মধ্যে প্রায় অদ্বিতীয়। আমার কলেজ-জীবনের বন্ধু। আমি সাহিত্যচর্চা করি, তার নেশা কারিগর (ইনজিনিয়ার) হওয়ার। আমাদের চিন্তাভাবনার জগৎ ছিল আলাদা। তবু কেমন করে আমরা দু'জনে এমন পরম বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম তা আজও বুঝে উঠতে পারি না। এই বন্ধুত্ব কর্মজীবনেও প্রসারিত হয়েছিল। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অনেক বন্ধুকেই তো এখন ভুলে গেছি। কিন্তু সুলতানকে আজও ভুলিনি। ঢাকা কলেজ থেকে বেরিয়ে সে ঢুকেছিল ঢাকা ইনজিনিয়ারিং কলেজে (পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়)। ইনজিনিয়ার হয়ে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত পলিটেকনিকের হেডও হয়েছিল। আমার এক শ্যালক পলিটেকনিকের ছাত্র ছিল। একদিন আমাকে এসে জানাল, সে পরীক্ষা ভালো দেয়নি। হয়তো পাস করতে পারবে না। আমি যেন একটু তদ্বির করি। বললাম. আমি তো তোমার কোনো টিচারকে চিনি না। আমি কি চেষ্টা-তদ্বির করবো? শ্যালক জানাল, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানই আমার বন্ধু (নাম সুলতান)। ঠিকানা নিয়ে তেজগাঁয় পলিটেকনিকের হেডের বাসায় গেলাম। আমার সেই সদাহাস্যময় বন্ধু সুলতান আমাকে দেখেই এক গাল হেসে বলল, নিশ্চয়ই শালাবাবুর তদ্বিরে এসেছো। আমি সব খবর রাখি।

এই সুলতানের ব্রাহ্মবাড়িয়ার বাসায় একটা সন্ধ্যা যে কি আনন্দ আর উল্লাসে কেটেছিল, তা আজ আর বিশ্বাস করতেও ইচ্ছা হয় না। বিশ্বাস হয় না এমন একটা সন্ধ্যা আমার জীবনে এসেছিল। তার বাসা থেকে আজিজ মিসিরের বাসায় ফিরে যাওয়ার সময় সুলতান চীৎকার করে বলেছে, শোন্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসেছিস

কালভৈরবের মূর্তি দেখে যাবি। এক সন্ধ্যা তিতাসের পারে কাটাবো। প্রাণ খুলে দু'জনে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবো।

সুলতানের সঙ্গেই একদিন কালভৈরবের মূর্তি দেখতে গেছি। অনুপমের সেদিন একটু সর্দিকাশি এবং পেটের অসুখের ভাব ছিল। ফলে সে ও তার মা সেলিমা আমাদের সঙ্গী হতে পারলো না। আরেকদিন তিতাসের পারেও কাটিয়েছি এক পুরো সন্ধ্যা। তিতাসের রূপ দেখে বিহ্বল মনে আবৃত্তি করতে চেয়েছি ঝিলমের উপর লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতা সন্ধ্যারাগে ঝিলমিল ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা/আঁধারে মলিন হল যেন খাপে ঢাকা ..।' সুলতান বাধা দিয়েছে, উহু, তিতাসের বেলায় ঝিলমের উপমা খাটে না। তিতাস খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার নয়; বর্ষাকাল ছাড়া তিতাস সবসময়ই ঘুমন্ত বন হরিণী।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এই সুলতানও বিদায় নিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে ফিরে শুনেছি, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আর তাদের কোলাবরেটেরেরা এই নিরীহ অরাজনৈতিক সুলতানকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছে। শুধু তো এক সুলতান নয়, আমার অসংখ্য আত্মীয় ও বন্ধু মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আমি সাবেক বৃহত্তর বরিশাল জেলার একটি থানার তিনটি ইউনিয়নের কথা জানি, যেখানে পাঁচশ'র উপর নিরীহ নারী পুরুষ ও কিশোরকে হত্যা করা হয়েছে। বেশির ভাগ হত্যাকাণ্ডে সহায়তা জুগিয়েছে জামাতীরা। তাই এদের সম্পর্কে অদম্য ঘৃণা এখনো আমি মন থেকে তাড়াতে পারিনি। তাড়াতে গেলেই মনে ভেসে ওঠে সুলতানের মুখ। ডাঃ মূর্তজার মুখ, আমার এক কিশোর ভাগ্নের মুখ, সদ্য বিবাহিত ভাইপো মারুফের মুখ, আরো অসংখ্য আত্মীয় ও বন্ধুর মুখ। এসব মুখ. আমার মনে ভেসে ওঠে, আর আমি মনে মনে গর্জাতে থাকি, সুকান্তের ভাষায় বলতে থাকি, 'স্বজন হারানো ভিটায় তোদের চিতা আমি তুলবোই।

পুরনো কথায় ফিরে যাই। ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় সুলতানের বাসায় এক সন্ধ্যা কাটিয়ে আজিজ মিসিরের বাসায় ফিরে এসেছি। বেশ কাটছিলো দিনগুলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। আরো দু'একটা দিন থাকবো ভেবেছিলাম। এমন সময় ঘটলো বিপত্তি। ছেলে অনুপমের সর্দিকাশিটা বেড়ে গিয়ে প্রবল জ্বর শুরু হল। আজিজ মিসির ডাক্তার নিয়ে এলেন। তিনি ওষুধ দিলেন। কিন্তু জ্বর নামে না। আমার প্রথম ছেলে বাবু জন্মের কয়েকদিন পরেই মারা গেছে। তাই এই ছেলেকে নিয়ে আমরা অল্পতেই উদ্বিগ্ন হতাম। ওষুধ খাওয়ানোর পর জ্বর যখন স্বাভাবিক নিয়মে নামার কথা, তার আগেই আমরা ছেলের জন্য অস্থির হয়ে পড়লাম। ঢাকায় ফিরে যেতে চাইলাম। কিন্তু অনুপম তখন প্রবল জ্বরে কাতরাচ্ছে। এই জ্বর গায়ে ছেলে নিয়ে ট্রেন জার্নির সাহস হল না। সারা রাত অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে স্বামী স্ত্রী বিছানায় বসে থাকি।

আমাদের অবস্থা দেখে আজিজ মিসিরের মা, আমাদের খালা বললেন, আমাদের ডাক্তারের হাতযশ খুব ভালো। সামান্য ওষুধ দিলেই জ্বরজারি ভালো হয়ে যায়। তোমাদের ছেলের যখন সারছে না এবং তোমরাও খুব অস্থির হয়ে পড়েছো, তখন আমার একটা কথা শুনবে?

আমরা তখন ছেলের জন্য যে কোনো কথা শুনতে রাজি। বললাম, বলুন খালা।

তিনি বললেন, গ্রামদেশে একটা কথা আছে, সুন্দর ছেলেপিলের দিকে খারাপ জ্বিনের নজর পড়ে। তখন ছেলেমেয়ের অসুখ আর ছাড়তে চায় না। জ্বিনের ওস্তাদকে ডেকে ঝাড়ফুঁক করাতে হয়। তোমাদের খালু এখানকার একজন জ্বিনের ওস্তাদকে চেনেন। তোমাদের যদি বিশ্বাস হয়, তাহলে তোমাদের খালুকে বলে দেখতে পারি।

জ্বিন-পরীর কিসসা-কাহিনী বইয়ে পড়েছি। ছেলেবেলায় বিশ্বাসও করেছি। বড় হয়ে মনে সে বিশ্বাসের জোর আর ছিল না। কিন্তু ছেলের সুস্থতার জন্য আমরা এখন জ্বিন পরী ভূত প্রেত সবকিছু বিশ্বাস করতে রাজি। খালাকে বললাম, আপনি খালুকে বলুন।

খালু সব শুনে প্রথমে মাথা নাড়লেন। বললেন, নতুন জায়গায় এসেছো। ছেলেপুলের একটু বাতাস বদলের অসুখ হবেই। ধৈর্য ধরো। তোমার ছেলে সেরে উঠবে। জ্বিনের ওস্তাদ ডাকে গ্রামের লোক। তোমরা শিক্ষিত লোকেরা কেন এসব করতে যাবে?

আমরা তাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলাম। বললাম, জ্বিনের ওস্তাদকে যত টাকা দিতে হয়, দেব।

খালু রাগ করলেন। বললেন, তোমরা আমার সিরাজের বন্ধু। সিরাজের মতই তোমরা আমার কাছে। সিরাজের ছেলেদের অসুখ হলে আমি টাকা খরচ করতাম না? টাকার কথা মুখে এনো না।

সেদিনই খালু মাঝ-বয়সী এক ভদ্রলোককে বাসায় ডেকে নিয়ে এলেন। পরণে পাজামা, গায়ে ফতুয়া। মাথায় নকশা পাড়ের গোল টুপি। থুতনিতে কিছু দাড়ি। ঘুমন্ত অনুকে অনেকক্ষণ দেখার পর তিনি বললেন, আপনাদের ছেলের উপর খুব একটা খারাপ জ্বিনের নজর পড়েছে। তাকে ভয় দেখালেও সে যাবে না। কিছু উত্তম -মধ্যমের ব্যবস্থা করতে হবে।

এখন মনে পড়লেও হাসি পায়। সেদিন ভদ্রলোকের কথা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করেছিলাম। বলেছিলাম, কি করতে হবে?

ঃ আগামীকাল রাতে আমি আসবো। অন্ধকার ঘরে দরোজা জানালা বন্ধ করে ছেলেকে কোলে নিয়ে আপনারা বসে থাকবেন। খবরদার আলো জ্বালাবেন না। আমি

দোয়া দরুদ পড়তে থাকবো। তারপর খারাপ জ্বিনটি এলে সহজ কথায় রাজি না হলে আমার দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করবো। তাকে রাজি হতে হবে।

আমার কৌতূহল হল। জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কি করে জানবো, জ্বিন এসেছে এবং আপনার কথায় রাজি হয়ে আমার ছেলের উপর নজর উঠিয়ে চলে যাচ্ছে?

ওস্তাদ বললেন, এই ঘরের পাশেই একটা বড় গাছ দেখছেন। জ্বিন এসে ওই গাছে বসবে। তার কথা আপনারা শুনতে পাবেন। আর যখন সে চলে যাবে, তখন গাছের একটা ডাল সে সশব্দে ভেঙে রেখে যাবে।

পরদিন মাঝ রাতে ওস্তাদ এলেন। কি আশ্চর্য, সেদিন আকাশেও একটি তারা নেই। তার কথামত ঘরের সব আলো নিভিয়ে দেয়া হল। কেবল ঘরের এক কোণে আগরবাতির মৃদু সৌরভ ও ক্ষীণ শিখা। বড় ঘরেই বিছানার উপর অনুপমকে কোলে নিয়ে সেলি বসলো। পাশে আমি। আমরা গা ঘেষাঘেষি করে বসলাম। মনে রোমাঞ্চ এবং ভয়ের শিরশির ভাব।

ওস্তাদ ঘরের এক কোণে বসেই দোয়া দরুদ অথবা কোনো মন্ত্র পড়ছিলেন। আমরা তার এক বর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। এইভাবে ঘন্টা খানেক কাটলো। তারপর ওস্তাদের কণ্ঠও আর শোনা গেল না। তিনি কি ঘরেই আছেন না বাইরে চলে গেলেন, তা বুঝতে পারলাম না।

আরও এক ঘন্টা। আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল অনন্ত প্রহর। এই অন্ধকার নিশা যেন আর শেষ হবে না, মনে ভয় থাকলে যা হয়। বাইরে যেন গাছটার ডালে ঝড়ো হাওয়ার শব্দ হচ্ছে শুনলাম। অথচ বাইরে বাতাস নেই। একবার মনে হলো, বাদুরের ডানা ঝাপটানোর মত শব্দ থেমে থেমে শোনা যাচ্ছে। একসময় তাও থেমে গেল। মাঝ রাত। রাস্তায় রিকশার টুংটাং আওয়াজও নেই। কিছুক্ষণ কাটলো সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে। সেই নিস্তব্ধতায় নিজের বুকের ধুকপুক শব্দ শুধু শুনছিলাম। হঠাৎ অনুপম একবার ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠলো। তারপরই ঘরের মধ্যে ভেসে এলো একটা খনখনে ভৌতিক আওয়াজ, নাঁ, নাঁ আঁমি যাঁব নাঁ।

ওস্তাদের কঠিন গলা শোনা গেল, তোকে যেতেই হবে। নইলে সোলায়মান নবীর চাবুকের বত্রিশ ঘা তোর পিঠে মারবো আমি।

আরো কিছুক্ষণ বাদানুবাদ। তারপর বাতাসে চাবুক মারার সপাসপ শব্দ। সেই খনখনে ভৌতিক কণ্ঠের, আর্ত চীৎকার।

অনুপম তখন চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। তাই জ্বিন এবং ওস্তাদের বাকি কথাবার্তা ভালো করে শুনতে পেলাম না। শুধু এক সময় বুঝতে পারলাম, ওস্তাদের হাতে মার খেয়ে জ্বিন এখন চলে যেতে রাজি হয়েছে। প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করছে,

আর সে আমার ছেলের অনিষ্ট করবে না।

ওস্তাদ বললেন, যা তোকে মাফ করে দিলাম। খবরদার এই ছেলের কাছে আর কখনো ঘেঁষবি না।

তার কথা শেষ না হতেই গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ হল। সাঁ সাঁ বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো শব্দ হল। তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

আমরা মিনিট পনের ঠায় বসে রইলাম। ওস্তাদের নির্দেশ পাওয়ার আগে ঘরে আলো জ্বালানো বা কথাবার্তা বলা নিষেধ ছিল। শেষ পর্যন্ত তার গলার আওয়াজ পেলাম। তিনি নিজেই ঘরে আলো জ্বালালেন। দেখি ঘরের এক কোণাতে একটা পিড়ির উপর তিনি বসে আছেন। অনুপমের কান্না তখন আরও বেড়েছে। ওস্তাদ বললেন, আর ভয় নেই। শয়তানটাকে তাড়িয়েছি। আপনাদের ছেলে ভালো হয়ে যাবে।

খালু তখন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন। খালা দরোজার ওপাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছেন। খালু ওস্তাদের হাতে কিছু টাকা দিলেন। কত দিলেন আমি জানতেও পারলাম না। জিজ্ঞাসা করেও যে তার কাছ থেকে জানতে পারবো না, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

এই জ্বিন-পরী তাড়ানোর ব্যাপারটা আমি এখনো বিশ্বাস করি না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বসে সেদিনও যে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলাম, তা নয়। কিন্তু ছেলের অসুখ বাড়তে থাকায় বাপের অবুঝ মন নিয়ে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলাম। তাছাড়া গোটা ব্যাপারটায় একটা ভয়ানক থ্রিল ছিল। অন্ধকার রাত। মাত্র একজন মানুষের কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের মতো শব্দ। বাইরে গাছের ডালে ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি। ভৌতিক কণ্ঠ। অশরীরী জ্বিনের কান্না এসবই রূপকথায়, শিশু পাঠ্য কেতাবে পড়েছি। বাস্তব জীবনে এর কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সে অভিজ্ঞতা হল। এটাও কি একটা কম লাভ?

খালু, আজিজ মিসিরের বাবাও বললেন, একই কথা। বললেন, মানুষতো পড়া-পানি খেয়েও ভালো হয়। গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর। কথায় বলে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস না থাকলে ডাক্তারের ওষুধ খেয়েও অসুখ ভালো হয় না। বিশ্বাস থাকলে তুলসি পাতার রস, কিম্বা আদা-মধু খেয়েও রোগ ভালো হয়; পড়া পানিতেও কাজ হয় দেখেছি। জ্বিনপরীর ভেলকি বাজিতে আমিও বিশ্বাস করি না। কিন্তু অনেকের রোগ সেরে যেতে দেখেছি। হয়তো রোগী বিশ্বাসের বলে নিজেই ভালো হয়েছেন। কিন্তু নামযশ বাড়ে হাতুড়ে ডাক্তারের।

পরদিন দুপুরে অনুপমের জ্বর নেমে গেল। তখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছিল

এটা জ্বিনের ওস্তাদের ওস্তাদি। অনু আমার কোলে চেপে কিছুক্ষণ সামনে ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়ালো। লক্ষ্য করলাম, তার জ্বর সেরে গেছে বটে। কিন্তু মুখে হামের মতো ছোট ছোট বিচির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ভয় পেলাম, হাম নয়তো। ছোট ছেলেমেয়েদের সাধারণতঃ জ্বরের সঙ্গেই হাম হয়। খালা অনুপমকে দেখে বললেন, এটা হাম নয়। আমার ছেলেদেরও ছোট বেলায় হাম হয়েছে। সুতরাং হাম আমি চিনি। তোমরা ঘাবড়ে যেও না। এটা মারাত্মক কিছু নয়। দু'দিনেই সেরে যাবে।

কিন্তু আরো দু'দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকার ভরসা হল না। ছেলে যদি আবার অসুস্থ হয়। বাড়ির সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়ে, এত যত্ন-আত্তি পাওয়ার এবং পিঠাপুলি খাওয়ার দুর্নিবার লোভ সম্বরণ করে সেদিন বিকেলের ট্রেনেই ঢাকা রওয়ানা হলাম। এবার অনুপমের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট কাটলাম। খালা সজল চোখে বিদায় দিলেন। খালু রিকশা পর্যন্ত এসে বার বার দোয়া করলেন। তাদের সঙ্গে এই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা।

ট্রেন হুইসেল বাজিয়ে ছেড়ে দিল। প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আজিজ মিসির, তার দু'ভাই হারুন ও ওয়াকিল, যতক্ষণ আমাদের দেখা যায়, হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। তারপর মোড়ের বাঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সেখানে ক'দিনের যত্ন-আত্তি, ভালোবাসা, বন্ধুত্বের সব স্মৃতি মিলিয়ে গেল। কেবল ট্রেন চলার একটানা ঝিকঝিক শব্দ আর মাঝে মাঝে হুইসেলের আওয়াজ শুনতে লাগলাম। গাড়ির জানালা দিয়ে দেখলাম, দু'পাশের গাছগাছালি, সবুজ ক্ষেত, খাল-বিল, নদী, ব্রীজ, ছোট ছোট গ্রাম, কুঁড়ে ঘর, ছেলেমেয়ের দঙ্গল সব পিছনে ছুটছে। আমরাই কেবল সামনে যাচ্ছি। মনে হল, এ জীবনে এ চলার যেন আর বিরাম নেই।

ঈদের ছুটির পর আজিজ মিসির ঢাকায় ফিরে এলেন। 'চলন্তিকার' আসর আবার জমে উঠলো। কয়েক মাস পর আজিজ মিসির জানালেন 'চলন্তিকার' আরেক বিশেষ সংখ্যা বর্ধিত আকারে বের হবে, আমাকে আবার পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখতে হবে। 'তিমির সঙ্গিনী' উপন্যাসটি ব্যাণ্ড হওয়ার ব্যথা তখনো আমার মনে ছিল। তবু নতুন করে লিখতে বসলাম। এবারের উপন্যাসটির নাম 'ছায়া হরিণী'। এবারও উপন্যাসের চিত্রায়ণ করলেন সুভাষ দত্ত। এবারও বিপত্তি দেখা দিল; তবে অন্যখানে। কবি আহসান হাবীব বহুদিন ধরে তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কথা ভাবছিলেন। তার প্রথম কবিতার বইয়ের নাম রাত্রি শেষ। দ্বিতীয় কবিতার বইয়ের নাম ঠিক করলেন 'ছায়া হরিণী।' তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। সাহিত্যিক হিসেবে আমার প্রতিষ্ঠা লাভের পেছনে তার সাহায্যও কম ছিল না। সুযোগ ও সময় পেলেই তার বাসায় যেতাম। সাহিত্যের আলোচনায় ঘন্টার পর ঘন্টা

কাটাতাম। তিনি একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম হবে 'ছায়া হরিণী'।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। হাবীব ভাইয়ের 'ছায়া হরিণী' তখনো ছাপা হয়নি। নামটা আমার এতই ভালো লেগেছিল যে, এই সুযোগে 'চলন্তিকার' জন্য লেখা আমার দ্বিতীয় উপন্যাসের নাম দিলাম 'ছায়া হরিণী'।

সুভাষ দত্ত উপন্যাসের ইলাস্ট্রেশন তখন সেরে ফেলেছেন। উপন্যাসের দু'এক ফর্মা ছাপাও হয়ে গেছে। এই সময় মনের গ্লানি আর চেপে রাখতে না পেরে আহসান হাবীবকে জানালাম, আমার উপন্যাসের নাম রেখেছি ছায়া হরিণী। শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। আহত কণ্ঠে বললেন, আমার কাছ থেকে এই ব্যবহার তিনি আশা করেননি।

আমি তার কাছে মাফ চাইলাম। বললাম, 'চলন্তিকার' কয়েক ফর্মা ছাপা হয়ে গেছে। সুতরাং নামটা আর পাল্টাতে পারছি না। তবে উপন্যাসটির শেষে একটি ঘোষণা ছেপে দেব যে, এই উপন্যাস বই আকারে ছাপা হওয়ার সময় অন্য নামে বেরুবে। কারণ, ছায়া হরিণী নামটি কবি আহসান হাবীব তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের জন্য বহু আগে ঠিক করে রেখেছেন।

আহসান হাবীব খুশি হলেন। তিনি আমার উপর তার রাগ ভুলে গেলেন। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আবার আগের মতো হয়ে উঠেছিল।

'চলন্তিকা' কি পুরো দু'বছর চলেছিল? আমার মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, সিনেমা মাসিক হিসেবে পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়েছিল। কাগজটির অকাল মৃত্যুর কারণ সম্ভবতঃ শেলি প্রেসের মালিকদের দুর্মতি। 'চলন্তিকা' বন্ধ হল। আজিজ মিসির বেকার হয়ে গেলেন।

নয়

নিজের কথা সাতকাহন করে বলছি। নিজের বন্ধুদের কথাও। পাঠকদের ধৈর্যের উপর যদি অত্যাচার করে থাকি তাহলে ক্ষমা চাই। কিন্তু জীবনের অপরাহ্ন বেলায় পৌঁছে অতীতের অস্ত অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে কেমন এক সম্মোহন মন্ত্রের আচ্ছন্নতা অনুভব করি। নিজেকেই নিজে পুনরাবিষ্কার করি। এর বেদনাও অপার আনন্দের মতো। আমার পাঠকদের সেই আনন্দেরই কিছুটা ভাগ দিতে চাই।

ষাটের দশকে আবার ফিরে যাই। এই দশকটা আমার জীবনে এক বিরাট ক্রান্তিকাল। ভালোয় মন্দে আলোয় আঁধারে মেশানো এই দশকটার কথা মনে হলে

শরীর ও মন থেকে হঠাৎ যেন বয়সের ভার, সব জরার ভার নেমে যায়। নিজেকে মনে হয় সম্রাটের মতো। বড়জোর সাম্রাজ্য হারানো সম্রাট। তাই এ দশকের যেকোন বন্ধুকে নিয়েই কাহিনী লিখি না কেন, আসলে তা আমার নিজের কাহিনী।

আমার বন্ধু আজিজ মিসিরকে খুব বেশিদিন বেকার থাকতে হয়নি। কিন্তু যে ক'দিন ছিলেন, সে ক'দিন তার দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। আমার যতদূর মনে পড়ে তার রাত্রিবাসের নির্দিষ্ট স্থানও সম্ভবত ছিলো না। আর খাওয়া-দাওয়াটাও চলতো পটুয়াটলী থেকে বুড়িগঙ্গার পার পর্যন্ত ছড়ানো ছিটানো হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতে। আমার ভয় হতো, এই অনিয়ম আরো কিছুকাল চললে তাকে গ্যাস্ট্রিক আলসারে না ধরে।

কিন্তু তার বেকারত্বের অবসান হলো আকস্মিকভাবে। এটা ষাটের দশকের সূচনাকালের কথা। আমি তখন 'দৈনিক আজাদের' সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করি। এ সময় 'আজাদের' ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন মওলানা আকরম খাঁর ছোট ছেলে কামরুল আনাম খাঁ। তার সঙ্গে আমার তখন দারুণ হৃদ্যতা। তিনি হঠাৎ একদিন আমাকে তার কক্ষে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'আজাদের' সিনেমা পাতার এডিটর শরফুল আলম ভয়েস অব আমেরিকায় চাকরি পেয়েছেন। তিনি ওয়াশিংটনে চলে যাচ্ছেন। তার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পারেন এমন একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ সিনেমা পাতার এডিটর দরকার।

শরফুল আলম তখন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে চাকরি করতেন। 'আজাদে' ছিল তার খণ্ডকালীন চাকরি। তার স্ত্রী মাসুদা চৌধুরী ছিলেন 'আজাদের' মহিলা পাতার সম্পাদক। মাসুদা চৌধুরীর মুখে তাদের ওয়াশিংটনে চলে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। কিন্তু তা যে এত শিগ্‌গির, বুঝতে পারিনি। কামরুল আনাম খানের মুখে এখন কথাটা আবার শুনতেই ধাঁ করে আজিজ মিসিরের নাম মনে পড়লো। বললাম, আমি এমন একজনকে চিনি, সিনেমা পাতার এডিটর করার জন্য যার চাইতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক এখন ঢাকায় পাওয়া যাবে না।

কামরুল আনাম খাঁ বললেন, তিনি কে?

আমি তাকে আজিজ মিসিরের নাম, তার 'চলন্তিকা' পত্রিকার কথা সব খুলে বললাম। কামরুল আনাম খাঁ বললেন, তাকে এখনই ধরে নিয়ে আসতে পারবেন? আমি তাহলে আজই কথাবার্তা পাকা করে ফেলতে চাই।

আমাকে আর পায় কে? পারলে আমি তখনই 'উড়াল' দেই। কিন্তু পরক্ষণেই একটা কথা ভেবে দমে গেলাম যে, এই ভর দুপুরে আজিজ মিসিরকে কোথায় খুঁজে পাবো? বেকার আজিজ মিসিরের তখন কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। অথচ তাকে তাড়াতাড়ি খুঁজে না পেলে এই চাকরিটা হাতছাড়া হতে পারে। 'আজাদ' অফিসে

আমার কোনো কোনো সহকর্মী বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য এই কাজটা পেতে আগ্রহী। কিন্তু কামরুল আনাম খাঁ চান শরফুল আলমের মতো একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক। তাই আমাকে এই লোক খুঁজে বের করার দায়িত্বটা দিয়েছিলেন।

সেদিন 'আজাদের' মূল সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব আমার ছিল না। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' লেখার কাজ আপাতত মূলতবি রেখে 'আজাদ' অফিস থেকে বের হলাম। একটা রিকশা ডেকে সেই গনগনে রোদ্দুরে ছুটলাম পটুয়াটুলীতে শেলি প্রেসের দিকে। ভাবলাম, 'চলন্তিকা' মাসিক ছাপা হতো শেলি প্রেসে। প্রেসের মালিক আজিজ মিসিরের আত্মীয়। তারা হয়তো তার খোঁজখবর দিতে পারবেন।

প্রেসে ঢুকতেই সেই লম্বা ছিপছিপে চেহারার যুবক, যিনি ছিলেন প্রেসের ম্যানেজার, চেহারায় হাসির আভা ফুটিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি সংক্ষেপে কুশল বিনিময়ের পর আজিজ মিসিরের খোঁজ জানতে চাইলাম। তিনি হেসে বললেন, আপনি এই অফিস ঘরের পেছনের ঘরটিতে যান। সেখানে একটা চৌকির উপর যিনি ঘুমিয়ে আছেন, তিনিই আজিজ মিসির।

উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, এই দিনে দুপুরে তিনি ঘুমাচ্ছেন, কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি তো?

ম্যানেজার বললেন, আপনার তিনি বন্ধু। আপনিই তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন।

পেছনের ঘরে গিয়ে দেখি, সত্যি সত্যি একটা কাঠের চৌকিতে আজিজ মিসির সটান লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। তবে ঘুমুচ্ছেন না। সম্ভবত সিগারেট টানছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসলেন। বললাম, গায়ে জামাটা চাপান। আমার সঙ্গে আপনাকে এখনি 'আজাদ' অফিসে যেতে হবে।

আজিজ মিসির বিস্মিত হলেন। বললেন, কেন?

ঃ আপনার বেকারত্ব ঘোচানোর জন্য।

আজিজ মিসির বললেন, হেয়ালি রাখুন। 'আজাদের' মতো কাগজে চাকরি পাওয়া এত সহজ নয়। তার উপর আমার গায়ে বাম রাজনীতির গন্ধ আছে।

বললাম, আপনি করবেন সিনেমা পাতা সম্পাদনা। বাম রাজনীতির গন্ধ তাতে বাধা হবে কেন? আরো ভেঙে বললাম, আজাদের সিনেমা পাতার সম্পাদক শরফুল আলম ভোয়ায় চাকরি নিয়ে আমেরিকায় চলে যাচ্ছেন। তার জায়গায় আপনার নাম আমি প্রস্তাব করেছি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর কামরুল আনাম খাঁ, মুকুল সাহেব রাজি হয়েছেন। আপনাকে এখনি ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি বলেছেন।

আজিজ মিসির তখনি চৌকি থেকে নামলেন। গায়ে জামা চাপালেন। তার চোখমুখের বিষণ্নতার ঘোর কেটে গেল। তাকে কিছুটা উৎফুল্ল মনে হল। দু'জনে প্রথমেই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে চা খেলাম। তারপর রিকশায় চেপে আবার রমনার

ঢাকেশ্বরী রোডের দিকে ছুটলাম। কামরুল আনাম খাঁ তার অফিস কক্ষেই ছিলেন। আমাদের কপাল ভালো। তার ব্লু টয়োটার পাঠান ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অফিসের সামনেই অপেক্ষা করছিল। অর্থাৎ এটা কামরুল আনাম খাঁর অফিস থেকে বাইরে কোথাও চলে যাওয়ার সময়। আমাদের দেখে তিনি যাত্রা স্থগিত রাখলেন এবং 'আজাদের' সিনেমার পাতার উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন। সবশেষে তিনি জানালেন, আজিজ মিসিরকে তার পছন্দ হয়েছে। আজই তিনি এপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করছেন। এ সপ্তাহ থেকেই আজিজ মিসিরকে কাজে জয়েন করতে হবে।

আজিজ মিসিরের বেকারত্ব ঘুচলো। এই নিয়োগ প্রাপ্তির পরও আজাদ অফিস থেকে বেরিয়ে গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে সম্ভবত অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। বললেন, আজ সকালেও ঘুম থেকে উঠে ভাবতে পারিনি যে, দুপুরের মধ্যেই আমার বেকারত্ব ঘুচতে চলেছে।

সেই যে সিনে জার্নালিস্ট হয়ে আজিজ মিসিরের 'আজাদে' ঢোকা, তারপর সাংবাদিক জীবনে তার ছেদ আর পড়েনি। ধীরে ধীরে পুরো সাংবাদিক হয়েছেন। এখন সাংবাদিকতাই তার মূল পেশা। 'দৈনিক বাংলার বাণী'র তিনি যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল। তাছাড়া নাটক, চলচ্চিত্রের অঙ্গনেও তার অবাধ পদচারণা। তিনি একজন সফল নাট্যকারও। টিভি এবং বেতারেও তার নাটক পরিবেশিত হয়। রাজনৈতিক চিন্তায় এখনো তিনি বাম ঘেঁষা। তবে ষাটের দশকের সেই কট্টর বাম একটিভিস্ট সিরাজুল ইসলাম নামক মানুষটিকে বর্তমানের আজিজ মিসিরের মধ্যে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ষাটের দশকের আরো একজন মানুষের কথা আমার মনে পড়ে। তিনি সাইয়িদ সিদ্দিকি। তিনি আমার চাইতে বেশী বয়সী ছিলেন। কিন্তু সম্পর্কটা দাঁড়িয়েছিল বন্ধুর মতো। ভয়েস অব আমেরিকার ঢাকা স্টুডিওর চার্জে তিনি ছিলেন। তার সহকারী ছিলেন কাফি খান। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বাংলা ছবির নায়ক। স্টুডিওর কলাকুশলী হিসেবে ছিলেন আবদুল হাই। যেমন লম্বা তেমনি ছিপছিপে চেহারা। সব সময় মুখে হাসি লেগে আছে।

একটু গোলগাল ভারিক্কি চেহারা ছিল সাইয়িদ সিদ্দিকির। গায়ের রঙ শ্যামলা। চোখে খুবই কম দেখতেন। অনেক বেশি পাওয়ারের চশমা চোখে থাকতো তার। পান খেতেন সারাদিন। কৌটাভর্তি জর্দা। এককালে, কলকাতার জীবনে কাজী নজরুল ইসলামের সাগরেদ ছিলেন। তার কাছ থেকেই পান খাওয়া শিখেছেন ও অভ্যাসে পরিণত করেছেন।

আমেরিকান তথ্য কেন্দ্র বা ইউ এস আই এস তখন ছিল তোপখানা রোডে,

জাতীয় প্রেসক্লাবের উল্টোদিকে। তোপখানা থেকে সেগুন বাগিচায় ঢোকার পথেই হাতের ডানদিকে পড়তো পেল্লায় ভবনটা। ঢুকে সিকিউরিটি ডেক্স পেরিয়ে ডানদিকে মোড় নিলেই পড়তো ভোয়ার স্টুডিও। বাঁ দিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসকক্ষে বসতেন সাইয়িদ সিদ্দিকি। স্টুডিওতে সারাদিনই যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন আবদুল হাই।

আমি তখন মাঝে মাঝে ঢাকা বেতারে নানারকম অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট লিখতাম। সেই সূত্রেই সাইয়িদ সিদ্দিকির সঙ্গে পরিচয়। তিনি আমার লেখা স্ক্রিপ্ট একদিন দেখে ফেললেন এবং পছন্দ করলেন। তারপর হঠাৎ একদিন ভোয়ার নাম লেখা একটা পিকআপে চেপে আমার কে এম দাশ লেনের বাসায় এসে হাজির। গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন আবদুল হাই। গাড়ি বোঝাই টেপ করার যন্ত্রপাতি, টেপ ইত্যাদি।

কোনো ভূমিকা না করে সাইয়িদ সিদ্দিকি বললেন, গাড়িতে উঠুন, আপনাকে নিয়ে রায়ের বাজারে যাব। সেখানকার মৃৎশিল্পের উপর একটা কথিকা প্রচারিত হবে ভোয়া থেকে। আপনি আমাদের সঙ্গে রায়ের বাজারে যাবেন। সেখানে যারা মাটির হাঁড়ি-পাতিল বাসন-কোসন বানায়, তাদের ইন্টারভিউ টেপ করবো। এই ইন্টারভিউ ভিত্তি করে আপনাকে স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে। বারো মিনিটের অনুষ্ঠান। আপনার ফি বারো ডলার। (সে সময়ে ৭২ টাকা)।

ঢাকা বেতারে স্ক্রিপ্ট—এমন কি মৌলিক গল্প কবিতা লিখে তখন পঁচিশ টাকার বেশি পাই না। সেখানে বারো মিনিটের স্ক্রিপ্ট লিখে ৭২ টাকা। হাতে স্বর্গ পেলাম। জানতে পারলাম, এরকম একটি স্ক্রিপ্ট নয়, বেশ কয়েকটি স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে। অর্থাৎ কয়েকটা মাস আমার বাড়তি আয়ের অঙ্কটা ভেবে মনের আনন্দ চেপে রাখা দায় হলো।

সাইয়িদ সিদ্দিকি ও আবদুল হাইয়ের সঙ্গে যে কয় মাস ভয়েস অব আমেরিকার জন্য কাজ করেছি, সে কটা মাস আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গে ঢাকার আশপাশে কত গ্রাম, জনপদ ঘুরেছি, কত নারী পুরুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবং এই সাক্ষাৎকার ভিত্তি করে ভোয়ার জন্য কত যে কথিকা লিখেছি, তার সীমা সংখ্যা নেই। ভোয়ার এই অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'হ্যাণ্ডস এক্রোস দা সী', বাংলায় 'মহা সিন্ধুর ওপার থেকে।' তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর এই অনুষ্ঠানটি তৈরি হতো। তাতে গানও থাকতো। বারো মিনিটের এ অনুষ্ঠানটি ঢাকায় বাণীবদ্ধ হওয়ার পর গোটা টেপটি বিমানযোগে ওয়াশিংটনে ভোয়ার হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সেখান থেকে সেটা প্রচারিত হতো বিশ্বময়।

কথিকাটির স্ক্রিপ্ট লিখতাম আমি। তাতে কণ্ঠ দিতেন ঢাকার সংস্কৃতি জগতের

তখনকার প্রবীন ও নবীন দিকপালেরা। যেমন ফতেহ লোহানী, শরফুল আলম, মিসেস কিচলু, কাফি খান, দাউদ খান মজলিস, মাসুদা চৌধুরী এবং আরো অনেকে। বাংলা উচ্চারণ নিয়ে সাইয়িদ সিদ্দিকির মতো এমন খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক আমি আর কোথাও দেখিনি। তার নিজের বাচনভঙ্গি, উচ্চারণ ছিল নিখুঁত। একবার আমি একটি কথিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটি লাইন ব্যবহার করেছিলাম। লাইন দুটি হলঃ "বহুদিন মনে ছিল আশা/রহিব আপন মনে/ ধরণীর এক কোণে/ ধন নয়, মান নয় এতোটুকু বাসা/ করেছিনু আশা।" ঢাকার এক বিখ্যাত শিল্পী এই কথিকায় কণ্ঠদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তার 'ধন নয় মান নয়'-এর উচ্চারণ সাইয়িদ সিদ্দিকির কিছুতেই পছন্দ হয় না। বিখ্যাত শিল্পীর চোখমুখ লজ্জায় লাল। তিনি স্বীকার করলেন, তার উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ। সাইয়িদ সিদ্দিকি বলার আগে তিনি এই ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত সাইয়িদ সিদ্দিকির নির্দেশে আমাকে কবিতার এই দুটি লাইন বদল করে অন্য লাইন কথিকায় যোগ করতে হয়েছিল।

শুধু বেতার-অনুষ্ঠান তৈরি করা ও পরিচালনায় নয়, শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে নাটক ও সঙ্গীতে সাইয়িদ সিদ্দিকির জ্ঞান ও পারদর্শিতা আমাকে মাঝে মাঝে অভিভূত করে ফেলতো। তার মনের একটি গোপন বাসনা ছিল, তিনি একটি উচ্চমানের বাংলা ছবি করবেন। সেজন্য তিনি কাহিনী বাছাই করাও শুরু করেছিলেন। আমার একটি দুটি উপন্যাসও তিনি পড়েছেন। বলেছেন, গল্প হিসেবে ভালো, কিন্তু ফিল্ম করার উপাদান কম। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' দেখে তিনি প্রশংসা করেছেন। কিন্তু মুগ্ধ হননি। বলেছেন, বিভূতিভূষণের রচনায় জড় জগতের যে চৈতন্যময় আলো, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে তা আরো ভালোভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিত ছিল।

ছবি তৈরি করার নেশায় তিনি শুধু কাহিনী বাছাই করা নয়, অভিনয়ের জন্য নতুন মুখও সন্ধান করে বেড়াতেন। একদিন 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' প্রোগ্রামের জন্য তার সঙ্গে ঢাকার এক শহরতলীতে গেছি, সেখানে এক তরুণীর সঙ্গে দেখা। উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে। সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছেন। এখনো চাকরি-বাকরি পাননি। তাই বাড়িতে বসে আছেন। স্থানীয় স্কুলে সাময়িকভাবে শিক্ষকতা করেন। এই এলাকায় একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি আছে। আমরা সমিতির কর্মকর্তাদের ইন্টারভিউ নেবো। তার উপর আমাকে স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে।

তরুণী এই ইন্টারভিউ দেয়ার ব্যাপারে সমিতির কর্মকর্তাদের সাহায্য যোগাচ্ছিলেন। নিজেও দু'চার কথা বলছিলেন। তার কণ্ঠস্বর মধুর। বাচনভঙ্গি চমৎকার। সাইয়িদ সিদ্দিকি বললেন, মেয়েটির উচ্চারণে কিছুটা জড়তা আছে।

একটু তালিম পেলে সব ত্রুটি শুধরে যাবে।

সাক্ষাৎকার নেওয়া শেষ হওয়ার পর আমরা যখন স্কুলের মাঠে গাছতলায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছি, তরুণী তখন আমাদের জন্য চা পানির ব্যবস্থা করছেন। সুযোগ পেয়ে সাইয়িদ সিদ্দিকি তার কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি?

ঃ নিলুফার।

ঃ ঢাকায় লেখাপড়া করেছো?

ঃ শুধু কলেজে পড়েছি ঢাকায়। বিএ পাস ডিগ্রী।

ঃ তোমার গলার স্বর খুব ভালো। গান-বাজনা করো নাকি ?

ঃ না।

ঃ কখনো অভিনয় করেছো? স্কুল বা কলেজের নাটকে ?

ঃ না।

ভভিনয় করার বা গান শেখার ইচ্ছে তোমার আছে ?

ঃ কখনো ভেবে দেখিনি।

সাইয়িদ সিদ্দিকি এবার স্পষ্টভাবে বললেন, তাহলে একটু ভেবে দেখো। আমি তোমাকে সুযোগ দেব। তোমার প্রতিভা রয়েছে।

নিলুফার মাথা নীচু করে রইলেন। কলেজ পড়ুয়া মেয়ে। তার তো এতটা লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই। সাইয়িদ সিদ্দিকি অসহিষ্ণু হলেন। বললেন, কি, কথা বলছো না কেন?

নিলুফার এবার আস্তে আস্তে মাথা তুললেন। বললেন, কি বলবো? আমার এখন বিয়ের কথা চলছে। প্রায় পাকা। সামনের ফাল্গুন মাসেই বিয়ে। শুনেছি উনি গান-বাজনা, অভিনয় পছন্দ করেন না। বিয়ের পর আমাকে ঘরের বৌ হিসেবেই থাকতে হবে।

সাইয়িদ সিদ্দিকি হঠাৎ শূন্যে দু'হাত ছুঁড়ে বললেন, বেশ, বেশ বিয়ে কর। তাহলে এত কষ্ট করে আর লেখাপড়াটা শিখলে কেন? এই বয়সেই বিয়ের জন্য তো গ্র্যাজুয়েট হওয়ার দরকার ছিল না।

দশ

লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডে একটি চীনা রেস্তোরাঁর নাম সান লী। আমি সাপ্তাহিক 'নতুন দিন' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে এই রেস্তোরাঁটির কাছেই পেল্লায় চারতলা অফিস ভবন 'উইকহাম হাউসে' ছিল পত্রিকাটির অফিস। সান লী তখন ছোট্ট টেক-এওয়ে। ওয়ার্কিং ক্লাসের মানুষ আসতো খাবার কিনতে। পাঁচ-দশ পাউণ্ডে কয়েকজনের

খাবার কেনা যেতো। এক বিধবা, তার ছেলে ও মেয়ে রেস্টুরেন্টটি চালাতো। ছেলেটির নাম সান। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স। বেশ হাসিখুশি, চটপটে।

ঢাকায় থাকাকালেই চীনা খাবারের প্রতি আমার ঝোঁক গড়ে উঠে। চীনা রাজনীতির প্রতি আমার যতটা বিরাগ, চীনা খাবারের প্রতি ততটা অনুরাগ। সুতরাং অফিসের কাজের ফাঁকে লাঞ্চ টাইমে, কিংবা কোনদিন অফিসে রাত পর্যন্ত কাজ করতে হলে 'সান লী'তে ঢুঁ মারতাম। অল্প পয়সায় বেশি খাওয়া। তার উপর আবার চীনা খাবার। সুতরাং 'সান লী'তে 'নতুন দিন' পত্রিকার স্টাফের ছিল নিত্য যাতায়াত।

আমার চোখের সামনেই 'সান লী' একটা ছোট টেক-এওয়ে থেকে চার- পাঁচ বছরের মধ্যে একটি বড় এবং অভিজাত রেস্তোরাঁ হয়ে গড়ে উঠলো। এখন আর 'সান লী' টেক-এওয়ে নয়। একটি অভিজাত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সোনালী ড্রাগনের মূর্তি আঁকা কাঁচের দেওয়ালঘেরা দামী রেস্টুরেন্ট। বিধবা মা অবসর নিয়েছেন। মেয়েটিরও বিয়ে হয়ে গেছে। সান তখনও বিয়ে করেনি। ধোপদুরস্ত কাপড়-চোপড় পরে কাউন্টারে বসে। এখন তিন চারটি ওয়েট্রেস তার। সব কটিই চীনা মেয়ে। ছোট চোখ, ছোট নাক, কিন্তু চমৎকার মিষ্টি চেহারা। পুতুলের মত পোশাক।

'সান লী' অভিজাত রেস্টুরেন্ট হওয়ার পরও সেখানে আমার যাতায়াত বন্ধ হয়নি। ছোকরা মালিক সানের সঙ্গে আমার রীতিমতো বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। আগে 'সান লী'তে একা খেতে যেতাম। এখন ঢাকা, কলকাতা, বোম্বাই (এখন মুম্বাই) থেকে বন্ধু বান্ধব কেউ এলে এই 'সান লী'তেই নিয়ে আসি। সান খুব আদর আপ্যায়ন করে। স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেয়। বোম্বে থেকে তালাত মাহমুদের ছেলে সস্ত্রীক যখন লণ্ডনে বেড়াতে এসেছিলো (তিনিও কণ্ঠশিল্পী), তাকেও এই রেস্টুরেন্টে নিয়ে এসেছি। ঢাকা থেকে আসা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকেও (আমি তার গানের অনুরাগী শ্রোতা) এক দুপুরে খাওয়াতে নিয়ে এসেছিলাম এই 'সান লী'তেই।

'সান লী'র সান এখন আমার পরম বন্ধু। বয়সে আমার ছেলের বয়সী। ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে একেবারে সমবয়সী। চীনাদের সম্পর্কে আমার বহুকাল ধারণা ছিল তারা গোমরা মুখ। হাসি ঠাট্টা জানে না। সানকে জানার এবং তার সঙ্গে মেশার পর আমার সেই ধারণা ভেঙ্গে গেছে। একদিন সান লী'তে বসে সানকে ঠাট্টা করে বললাম, সান, আমি বহু দেশের মেয়ে দেখেছি, বন্ধুত্ব করেছি। কিন্তু কোনো চীনা মেয়ের সঙ্গে আমার কোনদিন বন্ধুত্ব হয়নি। তুমি আমাকে একটি চীনা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে?

সান সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল— একটি কেন, দুটি চীনা মেয়ে আনবো। মাকে

তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব; তার মেয়েকে আমার বন্ধু হিসেবে রাখবো।

সানের রসিকতা জ্ঞান আমাকে সেদিন মুগ্ধ করেছিল। এই সানের মাধ্যমে 'সান লী'তে বসেই একদিন পরিচয় হলো লু সুন নামে এক চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে। ছোটখাট কৃশ চেহারা। হাতে বর্মী চুরুট। ভেবেছিলাম, বয়স ষাটের কাছাকাছি। যখন বললেন, তার বয়স আশির ঘর ছুঁই ছুঁই করছে তখন বিস্মিত হয়েছি। চীনাদের দেখে এমনিতেই বয়স অনুমান করা যায় না, লু সুনকে দেখে অনুমান করা আরো মুশকিল। সান জানাল, সম্পর্কে তিনি সানের বাবার কাকা। এখন সিঙ্গাপুরে থাকেন, লণ্ডনে বেড়াতে এসেছেন।

লু সুন আমাকে আরো বিস্মিত করে দিয়ে একদিন জানালেন, বর্তমানে সিঙ্গাপুরে তার টোবাকোর ব্যবসা ছেলেরাই দেখাশোনা করে। তবে ঢাকায় তিনি কুড়ি বছর কাটিয়েছেন। কলকাতায় দশ বছর। চেষ্টা করলে তিনি কিছু কথাবার্তা আমার সঙ্গে বাংলাতেও বলতে পারেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোন সময়টা আপনি ঢাকাতে ছিলেন?

ঃ ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ সাল। প্রথমে মোগলটুলিতে জুতো তৈরির দোকান ছিল। তারপর নতুন ঢাকায় চুংকিং রেস্টুরেন্ট।

বললাম, চুংকিং নানকিং এই নামগুলোর সঙ্গে আমি বেশ পরিচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চীনের রাজধানী ছিল নানকিং। জাপানী আগ্রাসনের মুখে রাজধানী অস্থায়ীভাবে সরিয়ে চুংকিংয়ে নেওয়া হয়।

লু সুন বললেন, ঠিক ধরেছেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ছিলাম কলকাতায়—নানকিং রেস্টুরেন্টে। তারপর টোবাকোর ব্যবসা ধরি। সিঙ্গাপুরে চলে যাই।

পৃথিবীটা যে গোল এবং খুবই ছোট এ সম্পর্কে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। নইলে চীনের লু সুন চল্লিশ বছর ধরে ঢাকা, কলকাতা, সিঙ্গাপুর ঘুরে এখন লণ্ডনের 'সান লী' রেস্টুরেন্টে বসে আমার সঙ্গে গল্প করেন কি ভাবে? চীনা নাসিক্য ধ্বনির সঙ্গে তার ভাঙা ভাঙা ইংরেজী শুনতে ভাল লাগছিল। কষ্ট হচ্ছিল না।

লু সুন একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কখনো চীনে গেছেন?

ঃ না, সে সৌভাগ্য হয়নি।

ঃ কেন, চীন দেশ আপনি পছন্দ করেন না ?

ঃ খুব করি। চীনা খাবার আরো বেশি পছন্দ করি। তবে চীনের রাজনীতি এবং সঙ্গীত মোটেই সহ্য করতে পারি না।

লু সুন রাগ করলেন না। হেসে উঠলেন। বললেন, চীনা গান আপনি শুনেছেন?

ঃ শুনেছি। পঞ্চাশের দশকে ঢাকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় 'হোয়াইট

হেয়ারড গার্ল' নামে একটি চীনা ছায়াছবি দেখার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। চীনে কম্যুনিস্ট বিপ্লবের কাহিনী নিয়ে ছবি। তাতে অসংখ্য গান ছিল। সেই গান শোনার পর ঠিক করেছি, কখনো ওই সঙ্গীত সুধা আর কানে ঢোকাবো না।

লু সুন হাসতে লাগলেন। বললেন, চীনা ভাষা না জানলে চীনা গান আপনার ভালো লাগবে না। এই গান সত্যিই মধুর। তবে আমার অনেক বাঙ্গালী বন্ধু বলেছে, তাদের কাছে এই গান বর্ষাকালের ব্যাঙের ডাকের মত মনে হয়। আপনার কাছে কি তাই মনে হয়?

বললাম, আমি অতোটা কঠোর মন্তব্য করতে চাই না। চীন দেশের গান হয়তো সত্যি মধুর। আমি তা বুঝি না বলে হয়তো আমার কানে তা মধুবর্ষণ করে না।

লু সুন বললেন, ঠিক ধরেছেন। বাংলাদেশে বহুকাল বাস করায় বাংলা ভাষা আমি কিছু বুঝি। সেজন্য বাংলা গান আমার ভালো লাগে। সত্তর সালে ঢাকার সভা সমিতিতে একটা গান শুনে শুনে আমার প্রায় জানা হয়ে গিয়েছিল। এখনো প্রথম লাইনটা গাইতে পারি।

বলেই লু সুন তার অপূর্ব নাসিক্য ধ্বনিতে চীনা উচ্চারণে বাংলা গান শোনালেন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। এমন কি এই গানের রচয়িতার নামও বললেন, রবীন্দ্রনাথ।

গান শেষ করে চুরুটে আগুন ধরিয়ে লু সুন বললেন, আপনারা সোনালি রঙ, সোনালি কথাটা খুব ভালবাসেন। আমরা চীনারাও এটা ভালবাসি। গোল্ডেন ড্রাগন হচ্ছে আমাদের সবচাইতে প্রিয় প্রতীক। আপনাদের যেমন সোনালি আঁশ কিংবা সোনালি ধান।

বললাম, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চীনাদের সঙ্গে বাঙালিদের এত যোগাযোগ, এত আত্মীয়তা, তবু ১৯৭১ সালে বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের সময় চীন দেশ সাহায্য জোগাল পাকিস্তানকে; শত্রুতা করলো বাঙালিদের। এটা আমাদের মনে অনেক আঘাত দিয়েছে।

লু সুন বললেন, দয়া করে আমাকে চীনা কমিউনিস্টদের একজন ভাববেন না। আমি হংকং-এর লোক। সেই ছোটবেলায় দেশ ছেড়েছি। তারপর আর দেশে বসবাস করিনি। এখন হয়তো শেষ জীবনটা সিঙ্গাপুরেই কাটবে। তবে ইচ্ছে আছে, শেষবারের মতো একবার ঢাকায় বেড়াতে যাব।

ঃ ঢাকা, আপনার ভালো লাগে?

ঃ ঢাকার চাইতেও আমার বেশি ভাল লাগে কলকাতা। কিন্তু ঢাকার মানুষের

কথা আমি ভুলতে পারি না। বিশেষ করে উনসত্তর সত্তর সালের ঢাকার মানুষ। সারা শহর তখন জঙ্গী মিছিলে ভরা। কত শ্লোগান কত ব্যানার, কত ফেস্টুন। ছেলেমেয়েদের চোখে মুখে সে কি সাহস আর উদ্দীপনা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গলায় শুনেছি শ্লোগান 'জয় বাংলা'। আর সেই মানুষটি। ছয়-ফুট লম্বা পাহাড়ের চূড়ার মতো। শেখ মুজিব। আপনাদের নেতা। সেই যে রেসকোর্সের ময়দানে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমার কাছে মনে হয়েছিল, হোয়াংহো নদীতে বন্যার প্লাবনে বাঁধ ভেঙ্গে গর্জাচ্ছে।

লু সুনের উদ্দীপ্ত চোখে মুখে যেন একাত্তরের বাংলার মুক্তিযুদ্ধের আভা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার বুক থেকে। বললাম, লু সুন, সেই ঢাকা নেই। সেই শেখ মুজিব নেই। সেই বাংলাদেশও নেই। এখন ঢাকায় গেলে দুঃখ পাবেন। আশাহীন, ভাষাহীন মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আপনি আর একাত্তরের বাংলাদেশ, বাঙালি জাতিকে খুঁজে পাবেন না। চীনের মানুষ অন্ততঃ একটা ব্যাপারে গর্ব করতে পারে। তারা চিয়াং চক্রকে (গণবিরোধী কুওমিংটাঙ অথবা চিয়াং কাইশেকের সরকার) চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়েছে। তারা আর সেখানে ফিরতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশে পরাজিত বাঙালি চিয়াং এর দল আবার ফিরে এসেছে। ক্ষমতা দখল করেছে। এখন তারাই ক্ষমতায়।

লু সুন একটু বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন, দেশটা কি আবার পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেছে?

ঃ নামে হয়নি, তবে কাজে আগের পূর্ব পাকিস্তানের চাইতেও পদানত কলোনি। বাঙালিদের দ্বারাই বাঙালিদের শাসন করা হচ্ছে। তবে শাসনদণ্ড নেপথ্যে ঘোরাচ্ছে আগের শাসকেরাই। আপনি এখন বাংলাদেশে গেলে বিশ্বাস করতে চাইবেন না, এই দেশে একদিন ভাষার জন্য মানুষ আন্দোলন করেছে, রক্ত দিয়েছে। বাংলা গান, বাংলা হরফের জন্য যুদ্ধ করেছে। স্বাধীনতা ও বাঙালি জাতীয়তার জন্য বাঙালি পুরুষ দিয়েছে প্রাণ, বাঙালি নারী দিয়েছে সম্ভ্রম। বাঙালি সংস্কৃতির সেই গর্বোন্নত চূড়াটি এখন নেই। এখন সেখানে অপসংস্কৃতির জয়জয়কার।

লু সুন আমার দীর্ঘ বক্তৃতা ধৈর্যের সঙ্গে শুনলেন। কি বুঝলেন, তিনিই জানেন। হঠাৎ ঠোঁট থেকে চুরুটটি সরিয়ে এসট্রেতে রেখে মৃদু স্বরে বললেন, আমি সারা-জীবন ব্যবসা করেছি। চাকুরি করেছি, রাজনীতি বুঝি না। লেখাপড়াও তেমন করিনি। তবে একটা কথা বুঝি, কোনো জাতির ভাষা, সংস্কৃতির বুনিয়াদ যদি খুব শক্ত হয়, তাহলে সে জাতি মরে না। কেউ তাকে মারতে পারে না। মাঝে মাঝে বিপদ আসে। মানুষ পথ হারায়। নিজের পরিচয় ভোলে। তারপর শক্ত আঘাত পেয়ে আবার জেগে ওঠে। এটা আমাদের চীনা জাতির জন্য সত্য হয়েছে। আপনাদের

বাঙালি জাতির জন্যও সত্য হবে।

লু সুনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর মাঝেমাঝেই 'সান লী'তে বসে তার সঙ্গে আমার গল্প হয়েছে। সব ব্যক্তিগত গল্প। দেশ-দেখা, ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশে দেশে চীনা খাবারের কদর, বৃটিশ শাসন অবসানের পর হংকং-এর ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি সম্পর্কেও তেমন লেখাপড়া না জানা এই চীনা ভদ্রলোক কথাবার্তা বলতে জানেন দেখে সেদিন সত্যিই অভিভূত হয়েছিলাম।

লু সুন বললেন, চীনা সভ্যতার কথাতো আপনি জানেন। কত হাজার বছরের পুরনো তা নিয়ে এখনো তর্ক তোলা চলে। তার ভাষা সংস্কৃতির বিশাল এবং ঐতিহ্যময় কাহিনী, চীনা সাম্রাজ্যের ইতিহাসও আপনি জানেন। সেই চীন একশ' বছর শুধু আফিম খেয়ে ঘুমিয়েছে। কোটি কোটি মানুষের দেশ। ছোট্ট দ্বীপ ইংল্যাণ্ডের সৈন্যরা তার ভূ-খণ্ড কেড়ে নিয়েছে। জাপান তার উপর হামলা চালাবার সাহস দেখিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চীনকে বলা হতো পঞ্চশক্তির এক শক্তি। আসলে চীনের কুওমিংটাঙ সরকার ছিল একটি তাঁবেদার সরকার। বৃটিশ ও আমেরিকানদের হুকুমে ওঠাবসা করতো।

ঃ আমি কম্যুনিস্ট নই। লু সুন বললেন, আমি মাও ঝে দুংকে একটা কারণে ভক্তি করি। তিনি চীনের মানুষকে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে দিয়েছেন। আফিম খাওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমেরিকা কেন, সারা পশ্চিমা শক্তির সৈন্য বাহিনীকে চীনারা যে একা প্রতিরোধ করতে পারে, জেনারেল ম্যাকআর্থারের মতো আমেরিকান সেনাপতিকে পরাজিত করতে পারে, কোরিয়ার যুদ্ধে চীনা লাল ফৌজ তা দেখিয়েছে। এই একটি কারণে সান ইয়াত সেনের মতো মাও ঝে দুংকেও আমি শ্রদ্ধা করি। নেতা হিসেবে মানি। নইলে মাও ঝে দুংয়ের শাসনে অনেক দোষক্রটি। তিনি দেশের মানুষকে কথা বলার স্বাধীনতা দেননি। স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দেননি। তার ভুল অর্থনৈতিক পলিসির জন্য দুর্ভিক্ষে ৯০ লাখ লোক না খেয়ে মারা গেছে। সেই খবরও তিনি দুনিয়ার মানুষকে জানতে দেননি। কিন্তু সব দোষ-ক্রটি সত্ত্বেও বলবো, মাও ঝে দুং চীনের শ্রেষ্ঠ নেতা। চীনের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকেই মাও ঝে দুংয়ের আবির্ভাব। তিনি আদর্শে হয়তো কম্যুনিস্ট ছিলেন। কিন্তু চরিত্রে ছিলেন খাঁটি চীনা।

বললাম, চীনের মানুষ মেইন ল্যাণ্ডের হোক, হংকং-এর হোক, তাইপে কিংবা ফরমোজার হোক, তারা নিজেদের চীনা বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন, চীনের সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে মাথা উঁচু করে কথা বলেন। বাঙালির সভ্যতা-সংস্কৃতি হাজার বছরের পুরনো। বাঙালি নামে তারা বহু শতাব্দী ধরে পরিচিত। তারপরও আজ স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালি নামে পরিচিত হতে অনেকে দ্বিধাবোধ করেন। বাংলার

সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বিজাতীয় বলে মুছে ফেলার চেষ্টা চালান। আপনি কমিউনিস্ট নন। তবু কমিউনিস্ট নেতা মাও ঝে দুংয়ের অনেক দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাকে নেতা বলে মানেন। তার নেতৃত্ব নিয়ে গর্ব করেন। আমাদের বাঙালিদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তারা জাতীয় নেতাদের শুধু ভুলত্রুটি খুঁজতেই ব্যস্ত। ইতিহাস থেকে তাদের নাম পর্যন্ত তারা মুছে ফেলতে চায়।

লু সুন কিছুক্ষণ চুপ করে আমার কথা শুনলেন। তার চুরুটে আবার আগুন ধরালেন। বললেন, বাঙালিদের হয়তো এখন এককালের চীনাদের মতো আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে ঘুমোবার পালা চলছে। কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না। এটা একটা টেম্পোরারি ফেজ। চীনা ভাষায় একটি প্রবাদ আছে। যাদের আছে একটা মহা প্রাচীর তারা দীর্ঘকাল রক্ষা পায়, যাদের তিনটা প্রাচীর তারা চিরকাল রক্ষা পায়।

ঃ কথাটা বুঝিয়ে বলুন। লু সুনকে অনুরোধ জানালাম।

লু সুন বললেন, চীনের মহাপ্রাচীরের (গ্রেট ওয়াল) কথা আপনি জানেন। এককালে সপ্তম আশ্চর্যের একটি আশ্চর্য ছিল। প্রাচীনকালে বহিরাক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছিল। দীর্ঘকাল এই প্রাচীর বাইরের হামলা থেকে চীনকে রক্ষা করেছে। বর্তমানের ক্ষেপণাস্ত্র আর পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে এই রক্ষা-প্রাচীরের আর কোনো দাম নেই। কিন্তু চীনের আছে আরো দুটি রক্ষা-প্রাচীর। একটি তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। অন্যটি তার বহু শতাব্দীর সাম্রাজ্যের ডায়নেস্টির ইতিহাস। আমাদের চীনাদের সঙ্গে আপনাদের বাঙালিদেরও এখানে বিরাট মিল। আপনাদের যতই আফিম খাওয়ানো হোক, জাতীয় চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা হোক, আত্মপরিচয়, জাতি পরিচয় বিকৃত করার চেষ্টা হোক, তিনটি রক্ষা প্রাচীর সকল চক্রান্ত ও হামলা থেকে আপনাদের রক্ষা করবে। আপনারা আবার বাঙালি হিসেবে জেগে উঠবেন।

ঃ বাঙালির এই তিনটা রক্ষা-প্রাচীর কি? জানতে চাইলাম।

লু সুন বললেন, কেন, আপনাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। এই ভাষার জন্য আপনারা রক্ত দিয়েছেন। দুই, আপনাদের কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা আমার সোনার বাংলা গানে গেয়ে আপনারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। এখন এই গান আপনাদের জাতীয় সঙ্গীত। তিন, আপনাদের শেখ মুজিব আরমুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। মাও ঝে দুংয়ের মতো তাঁর যত দোষত্রুটি ব্যর্থতা থাকুক, তিনি বাঙালি চেতনার মহাপ্রাচীর। যত ষড়যন্ত্র হোক, যত হামলা আসুক, বাঙালি সাময়িকভাবে পথভ্রষ্ট হবে, বিভ্রান্ত হবে। কিন্তু ধ্বংস হবে না। আবার বাঙালি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

লণ্ডনের 'সান লী' রেস্টুরেন্টে বসে লু সুনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে দীর্ঘ কুড়ি বছর পর দেশে ফিরে মনে

পড়েছিল লু সুনের কথা। ক্ষমতার মসনদে তখন রাজাকার। আসামীর কাঠগড়ায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। চারদিকে অন্ধকার যুগের মৌলবাদী আস্ফালন, ফ্যাসিবাদী বর্বরতা। ভাষা, সংস্কৃতি, জাতি পরিচয়, ইতিহাসকে মুছে ফেলার চলছিল একটানা অপপ্রয়াস। তবু আশা হারালাম না, পুরো একমাস বাংলাদেশে কাটিয়ে আশা হারাইনি। দেখেছি 'দানবের সব মূঢ় অপব্যয়ের' উর্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মহা মহীরুহ। লোকায়ত বাংলার ঘরে ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন আলাওল, পরাগল খাঁ, লালন ফকির, রবীন্দ্রনাথ। আর সবকিছুর উর্ধে একটি অনির্বাণ শিখা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শিখা। আর সেই শিখা হতে যে মানুষটি আকাশ ছুঁয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি শেখ মুজিব। আমাদের এখনো গড়ে-না-তোলা স্ট্যাচু অব লিবার্টি। লু সুনকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছি। অপরাজেয় বাংলার ধ্বংস নেই।

এগার

উনিশ শ' পঁচানব্বই সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ। আমার হাতে একটা চিঠি। ঢাকা থেকে লিখেছেন তারক সাহা। চিঠিতে তারিখ নেই। খামের উপর ঢাকার ডাকঘরের ছাপমারা তারিখ একুশে আগষ্ট। তারক সাহাকে আমি চিনি না। তার বাবা প্রহ্লাদ চন্দ্র সাহাকে চিনতাম। ঢাকার বাংলা বাজারের ১ শ্রীশ দাস লেনের বিউটি বোর্ডিংয়ের মালিক ছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার শুরুতেই (২৮ মার্চ) পাকিস্তানী হানাদারেরা তাকে বিউটি বোর্ডিং থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং নৃশংসভাবে হত্যা করে।

সেই শহীদ প্রহ্লাদ চন্দ্র সাহার ছেলে তারক সাহা। দীর্ঘকাল আগে ঢাকায় বসবাসের সময় যখন বিউটি বোর্ডিংয়ে যেতাম, তখন তারক সাহা সম্ভবতঃ ছোট ছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ বাবুকে আমার মনে আছে। দেশ ছেড়ে চলে আসার পর তার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তারকের চিঠিটা তাকে আবার স্মরণে এনে দিল। তারক লিখেছেন, "চৌধুরী কাক্কু, অনেক অনেক শ্রদ্ধাসহ লিখছি। আমি প্রহ্লাদ বাবুর ছোট ছেলে। ..... গত ৪ আগস্ট আমাদের বোর্ডিংয়ে আপনার পুরনো বন্ধুরা, যারা এখানে সব সময় আড্ডা দিতেন, যেমন শামসুর রাহমান কাক্কু, সৈয়দ শামসুল হক কাক্কু বেলাল চৌধুরী কাক্কু, ইমরুল কাক্কু এঁদের অনেকেই সমবেত হয়েছিলেন। প্রত্যেকেই পুরনো দিনের কথা স্মরণ করেছেন। বহুবার আপনার কথা স্মরণ করা হয়েছে। সকলেই আপনার অনুপস্থিতি অনুভব করেছেন। দেশের সব ক'টা প্রধান পত্রিকায় এই সমাবেশের সংবাদ ছাপা হয়েছে। আপনার কাছে কয়েকটা কাগজের ফোটোকপি পাঠালাম। যদি কখনো দেশে আসেন, তবে অবশ্য অবশ্যই আপনাদের স্মৃতি বিজড়িত বিউটি বোর্ডিংয়ে আসবেন।"

চিঠিটার সঙ্গে 'আজকের কাগজ', 'ভোরের কাগজ', 'বাংলা বাজার পত্রিকা' এবং 'সংবাদে' ছাপা খবরের ফোটোকপি। 'আজকের কাগজের' প্রতিবেদনের রাবীন্দ্রিক শিরোনাম বড় চমৎকার "আরেকটিবার আয়রে সখা প্রাণের মাঝে আয়।" সঙ্গে ছবি, সমর দাস ও সৈয়দ শামসুল হক পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে মাঝখানে শামসুর রাহমান। নিজে বিদেশে আছি। তবু এই 'স্মৃতি জাগানিয়া' সন্ধ্যায় হঠাৎ ফিরে গিয়ে এক বন্ধুর অনুপস্থিতি মনে মনে খুব অনুভব করলাম। তিনি কবি শহীদ কাদরি। কয়েক দশক আগে যিনি এই বিউটি বোর্ডিংয়ের কাছেই বাস করতেন এবং বিউটি বোর্ডিংয়ের আড্ডাটিও যিনি প্রথম গড়ে তুলেছিলেন। শহীদ কাদরিও এখন আমার মতো বহুকাল ধরে বিদেশে। আমেরিকায় থাকেন। আমি আমেরিকায় বেড়াতে গেলে তার সঙ্গে দেখা হয়। অসুখী, অতৃপ্ত কবি। কালে ভদ্রে এখন কবিতা লেখেন। যদি জিজ্ঞেস করি, শহীদ, তুমি এতো শক্তিশালী কবি, এখন কবিতা লেখোনা কেন? শহীদ কাদরির নিরুত্তাপ উত্তর,'দোস্ত, কি হবে কবিতা লিখে?' এই প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। বিশ্ব চরাচরে আর কারো জানা আছে কিনা জানি না।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে যখন দীর্ঘকাল পর দেশে বেড়াতে গিয়ে ঢাকায় ছিলাম, তখন বাংলা বাজারে বিউটি বোর্ডিংয়ে যাওয়ার ইচ্ছে একবার মনে জেগেছিল। ইচ্ছে পূরণ করিনি । মনে হয়েছে, কি হবে সেখানে গিয়ে? কয়েকটি ইট, কাঠ, পাথর দেখে ? এই বোর্ডিংয়ের যে প্রাণপুরুষ প্রহ্লাদ চন্দ্র সাহা, তিনি আজ নেই। এই বোর্ডিংয়ে একটি জমাট সাহিত্যিক আড্ডার প্রাণ যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই শহীদ কাদরিও আজ দেশে নেই। যৌবনের সেই উদ্দাম দিনগুলোর বন্ধুরা, দেবদাস চক্রবর্তী, আমিনুল ইসলাম, কায়সুল হক, সমর দাস, বেলাল চৌধুরী সকলেইতো আমরা এখন শেষ বয়সের কানাগলিতে বাস করছি। মাঝে মাঝে ফেলে আসা দিনগুলোর বিরাট বিস্তৃত সদর রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি। ঢাকার বিউটি বোর্ডিং আমাদের তেমনি একটি 'সকরুণ দীর্ঘশ্বাসের' জমাট বাঁধা ভবন। স্মৃতিময় ভুবন। এই ভুবন বেদনাঘন আনন্দের সাতটি তারের সুরেও বাঁধা।

সত্যি কথা বলবো, বিউটি বোর্ডিংয়ের আড্ডায় আমি নিয়মিত হাজিরা দিতাম না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আড্ডা ছিল 'সওগাতের আড্ডা।' পঞ্চাশের দশকের এই আড্ডাটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর বিউটি বোর্ডিংয়ের আড্ডা জমে ওঠে। ষাটের দশকের কবিতার আকাশে তখন নতুন নক্ষত্র ফুটতে শুরু করেছে। তাঁদের কেউ কেউ আসতেন এই আড্ডায়। আমি তখন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছি আড্ডার জীবন থেকে কর্মজীবনে। সুতরাং বিউটি বোর্ডিংয়ের আড্ডার স্মৃতি আমার মনে ততটা উজ্জ্বল নয়, যতটা উজ্জ্বল ১ শ্রীশ দাস লেনের এই বাড়িটি। সে আরেক স্মৃতির কথা। তখন

এই বাড়ি বিউটি বোর্ডিং হয়নি। এই বাড়ি তখন সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকার অফিস (বর্তমানের জামাত-ঘেঁষা 'সোনার বাংলা' পত্রিকা নয়)।

'সোনার বাংলা' ছিল অবিভক্ত বাংলার একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও সংবাদ সাপ্তাহিক। নলিনী কিশোর গুহ ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। পত্রিকাটির 'সোনার বাংলা' নাম রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই পত্রিকায় তার কবিতা ছাপা হয়েছে। বাংলা ভাগ হওয়ার আগে কলকাতা ও ঢাকার এমন কোনো বড় সাহিত্যিক নেই, যারা 'সোনার বাংলায়' লেখেননি। ক্রাউন সাইজের কাগজ। দু'রঙা প্রচ্ছদ। প্রথম পাতায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' পত্রিকার মতো সম্পাদকীয়। তারপর কয়েক পাতা জুড়ে দেশ বিদেশের খবর। তার পর, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। 'সোনার বাংলার' স্বর্ণযুগের সময়েই নারায়ণগঞ্জ থেকে বের হতো আরেকটি উন্নতমানের সাপ্তাহিক। নাম 'বার্তাবহ'। এটিও ক্রাউন সাইজের কাগজ ছিল। দু'রঙা কভার। ভেতরে সংবাদ, সম্পাদকীয় এবং গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ।

বাংলা ভাগের পরও 'সোনার বাংলা' কাগজটি টিকিয়ে রেখেছিলেন তার প্রকাশকেরা। তবে পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছুটা কমে গিয়েছিল। সম্পাদক নলিনী কিশোর গুহ বেশির ভাগ সময় কলকাতায় থাকতেন। কলকাতাতেও 'সোনার বাংলা'র একটা সাব-অফিস ছিল। ঢাকায় কাগজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর 'সোনার বাংলার' প্রকাশ বন্ধ করে তিনি যখন কলকাতায় চলে যান, তখনো তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বহুদিন অব্যাহত ছিল। সবচাইতে লজ্জা ও দুঃখের কথা, যার সঙ্গে সেই প্রথম ভীরু লেখক জীবনে আমার ছিল পরম সখ্য, তার নামটা আজ স্মৃতিকথা লিখতে বসে কিছুতেই মনে করতে পারছি না। শামসুর রাহমানেরও আগে আমি 'সোনার বাংলায়' লিখতে শুরু করি। সেটা ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে। আমি বরিশাল এ কে ইন্সটিটিউশনের ছাত্র। ক্লাস এইটে পড়ি। এরই মধ্যে আমার হাজতবাসের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে ছাত্র আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে। রাষ্ট্রভাষা দিবস তখন ছিল ১১ মার্চ। বরিশালে ছাত্র ধর্মঘটে যোগ দেয়ায় গ্রেফতারী পরোয়ানা বের হল। আবার জেলে যাওয়ার ভয়ে একরাতে স্টীমারে চেপে ঢাকায় পালালাম। আমার পাঠকেরা শুনলে অবাক হবেন, বরিশাল থেকে পালিয়ে এসে ঢাকায় নবাবপুর রোডে যে বাড়িটাতে উঠেছিলাম, সেটা ছিল জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক সদর অফিস। এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের তখনকার আমির। ডেপুটি-আমির ছিলেন মওলানা আবদুর রহিম। তারও বাড়ি বরিশালে। স্কুল জীবন থেকেই তাকে আমি চিনতাম। জামায়াত নামটি তখন এমন বিভীষিকার মতো নয়। বাংলাদেশের খুব কম লোক জানতো এই

প্রতিষ্ঠানের নাম। বাংলায় তাদের পত্র-পত্রিকা- ইশতেহার ছিল না বললেই চলে। বাঙালিদের মধ্যে মওলানা আবদুর রহিমই প্রথম জামায়াতকে পরিচিত করেন, জামায়াতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে। নিজে সুলেখক ছিলেন। বাংলায় মওলানা মওদুদীর বইপত্র অনুবাদ করতে শুরু করেন।

বরিশালেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি 'তানজিম' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাতে মওদুদীর রচনার বাংলা অনুবাদ, ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে কথাবার্তা ছিল। 'তানজিম' কাগজ অথবা এই কাগজের লেখা আমাকে কখনো আকৃষ্ট করেনি। আকৃষ্ট করেছিলেন মওলানা আবদুর রহিম। অত্যন্ত সজ্জন এবং রুচিশীল মানুষ ছিলেন তিনি। লম্বা সুন্দর সুপুরুষ। মুখে যৌবনে ছিল ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। গায়ে হাফ-হাতা শার্ট, পরণে ট্রাউজার। মোল্লাদের মতো পোশাক তিনি পরতেন না। মাথার টুপিটিও ছিল গোল নয়, কিশতি টুপি। বার্ধক্যে এসে তার জামাকাপড় একটু পাল্টেছিল। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর তিনিই প্রথম বাঙালি আমির। বর্তমানের নেতা গোলাম আযম এবং মওলানা আবদুর রহিমের মধ্যে তুলনা টানতে বলা হলে আমার চোখে দানব আর দেবতার ছবি ভেসে ওঠে।

বরিশাল থেকে ঢাকায় চলে আসার সময় মওলানা আবদুর রহিম আমাকে বলেছিলেন, ঢাকায় এলে আমার বাসায় উঠতে পারেন্। তিনি আমাকে একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে ঠিকানাটা ছিল ১০৬, নবাবপুর রোড। একেবারে রাস্তা থেকে একটা প্রশস্ত সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। এই দোতলার সামনের কামরা জামায়াতের অফিস। পেছনের ঘরে তখনকার পাঞ্জাবী আমির এবং মওলানা আবদুর রহিম থাকতেন। মওলানা আবদুর রহিমের আরেক বন্ধু ছিলেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হাকিম আবদুল মান্নান। বরিশাল থেকে তার সঙ্গেই আমি ঢাকায় পালিয়ে আসি এবং জামায়াতের অফিসে কয়েকদিনের জন্য আস্তানা গাড়ি। মওলানা আবদুর রহিম আমার থাকার এবং খাওয়া–দাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তার ধর্মীয় রাজনীতি আমি পছন্দ করতাম না। তাই বলে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনো ক্ষুণ্ন হয়নি। বরিশালে তার 'তানজিম' পত্রিকায় আমাদের সমালোচনা হতো; আমরা 'তানজিমের' লেখার কঠোর সমালোচনা করতাম। এই রাজনৈতিক মতপার্থক্য আমাদের সম্পর্কের পথে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সত্তরের দশকে মূলত গোলাম আযমের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর যে রাজনৈতিক চেহারা ফুটে ওঠে, পঞ্চাশের বা ষাটের দশকে আমরা কখনো তা কল্পনাও করিনি।

খুব ছোট বেলায় বাবার সঙ্গে ঢাকায় এসেছি। তারপর আর আসিনি। ফলে পাকিস্তান হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে যখন ঢাকায় এলাম, তখন গোটা শহর আমার কাছে অপরিচিত। রাস্তাঘাট চিনি না। তখন ঢাকা ছোট্ট মফস্বল শহর। কিন্তু আমার

মতো এক জেলা শহরের প্রায় গেঁয়ো তরুণের কাছে তখন ঢাকা শহরকে মনে হয়েছিল বিরাট মহাসাগরের মতো। কোথায় গিয়ে হারিয়ে যাব কে বলবে? সুতরাং বেশ ক'দিন ছিলাম জামায়াত অফিসে। তারপর খোঁজ পেলাম, আমাদের পরিবারের চৌধুরী মোহাম্মদ আরিফ কলতাবাজারে থাকেন। তিনি আমার আত্মীয় এবং তখন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য। কলতাবাজারের ১৩৬ আবদুর রউফ রোডে তার বাসা। উল্টোদিকের দোতলা বিল্ডিংয়ে 'দৈনিক আজাদের' ঢাকা অফিস। আজাদ' তখনো কলকাতা থেকে বের হয়। 'আজাদের' ঢাকা প্রতিনিধি ছিলেন আবুজাফর শামসুদ্দিন। তিনি সপরিবারে এই বাসায় থাকতেন।

আরিফ চৌধুরীর খোঁজ পেয়ে তার বাসায় বোচকাবুচকি নিয়ে এসে উঠলাম। তার বাসার সামনের ঘরের ফ্লোরে তোষক পেতে থাকার ব্যবস্থা হল। বরিশাল থেকে আমার পালানোর কারণ জেনে আরিফ চৌধুরী বললেন, দু'এক সপ্তাহ নয়, তুমি দু'একমাস ঢাকায় থাকো। পুলিশের হাঙ্গামা হুজ্জত মিটুক। তারপর বরিশালে যেও।

এমন চমৎকার ব্যবস্থা আর হয় না। আহার বাসস্থান ফ্রি। স্কুলে গিয়ে ক্লাস করতে হয় না। অঙ্কের মাস্টারের ধমক খেতে হয় না। বিকেলে দু'আনার কোচর ভর্তি চিনেবাদাম কিনে বুড়িগঙ্গার পারে ঘুরে বেড়াও। এখন ভাবতে অবাক লাগে, তখন পায়ে হেঁটে নর্থব্রুক হল রোড, ওয়াইজঘাট, সোয়ারিঘাট, চাঁদনিঘাট এমন কি মিলব্যারাকে গিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। আরিফ চৌধুরীর ছেলে আসাদ চৌধুরী তখন খুব ছোট। তাকে নিয়েও কোনো কোনোদিন নদীর পারে হাওয়া খেতে বেরুতাম। তখন ঢাকার সদরঘাট, নদীর পার এমন জনাকীর্ণ ছিল না। সন্ধ্যায় মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য অনেকে আসতেন নদীর পারে।

ঠিক এই সময় খোঁজ পেলাম, কলতাবাজার থেকে খুব কাছে–পায়ে হেঁটে পনর কুড়ি মিনিট হাঁটলেই বাংলা বাজারের শ্রীশ দাস লেন। গলিমুখেই চমৎকার একটা দোতলা বাড়ি। সামনে নিপুণ করে ছাঁটা ঘাসে ঢাকা লন। এই বাড়ি থেকেই বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকাটি বের হয়। দোতলা বাড়ির নীচের অংশে প্রেস। উপর তলায় অফিস। কলতাবাজারের বাসায় বসে একটা গল্প লিখে ফেললাম। নাম জীবন–শিল্প। গল্পটি নিয়ে একদিন দুরুদুরু বুকে 'সোনার বাংলা' অফিসের দোতলায় উঠলাম । দরোজার কাছেই এক গাদা ফাইলপত্র নিয়ে বসে আছেন সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক (যার নামটা ভুলে গেছি), তার পরের টেবিলে আরেক ভদ্রলোক— যুবাবয়সী। আমি লেখা নিয়ে এসেছি জেনে প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাকে যুবাবয়সী ভদ্রলোকের কাছে পাঠালেন। তার নামটা আমি ভুলিনি। মনোজ রায় চৌধুরী। তিনি নিজেও কবি। 'সোনার বাংলার' কবিতা/গল্প সেকশনের সম্পাদক। চেহারা সম্পাদকের মতো মোটেই নয়। ভারিক্কি কাঠখোট্টা ধরনের নন। বন্ধুর মতো

হেসে বসতে বললেন। ভাবলাম, হয়তো বলবেন, মাসখানেক পর খোঁজ নেবেন, লেখাটা মনোনীত হল কি না! না, মনোজ বাবু সম্পাদকের চিরাচরিত আচরণ আমার সঙ্গে করলেন না। লেখাটার খানিক অংশ পড়ে ফাইলে রাখলেন। বললেন, আপনাদের বাসায় টেলিফোন আছে ?

বললাম, না, নেই।

ঃ তাহলে দু'একদিন পর আপনাকে আরেকবার অফিসে আসতে হবে, গল্পটা মনোনীত হল কি না, তা জানার জন্য। আর যদি না আসেন এবং গল্পটি মনোনীত হয়, তাহলে যথাসময়ে ছাপা হয়ে যাবে। আপনার ঠিকানা নিশ্চয়ই গল্পের সঙ্গে দিয়েছেন। গল্পটি ছাপা হলে এককপি কাগজ আপনাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

সেদিন এটাই আমার কাছে মনে হয়েছিল এক বিরাট পাওয়া। 'সোনার বাংলার' মতো কাগজের সম্পাদক যে বলেছেন, আমার লেখাটি ছাপা হতে পারে এবং ছাপা হলে এককপি কাগজ বাসায় যাবে, তাতেই আমার লেখক জীবন যেন ধন্য হয়ে গেল।

সেদিনের মতো নমস্কার বিনিময় করে বিদায় নিলাম। ইচ্ছে ছিল সপ্তাহখানেক পর আবার মনোজ বাবুর কাছে গিয়ে গল্পটা সম্পর্কে খোঁজ নেব। কিন্তু তর সইলো না। দিন তিনেক পরেই 'সোনার বাংলা' অফিসে গিয়ে ঢুঁ দিলাম। মনোজ বাবু স্বল্পভাষী লোক। মাথা গুঁজে লেখা পড়ছিলেন। আমাকে দেখে সেই আগের দিনের মতো সামনের চেয়ারে বসতে অনুরোধ জানালেন। তারপর কোনো ভূমিকা না করেই বললেন, গল্পের খোঁজ নিতে এসেছেন? সেটিতো প্রেসে চলে গেছে। এ সংখ্যার কাগজেই ছাপা হচ্ছে।

আমার বুকের স্পন্দন বুঝি কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। নিজের কানকে সহসা বিশ্বাস হল না। কিছুক্ষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে মনোজ বাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, গল্পটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে?

মনোজ বাবু মৃদু হাসলেন, পছন্দ না হলে কি ছাপতে দিতাম? খুবই পছন্দ হয়েছে। আপনার গল্প লেখার হাত আছে। দ্বিতীয় গল্প কবে দেবেন বলুন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে আরো গল্প লিখেছেন?

আমি তখন নতুন গল্প লিখিনি। প্রথম গল্পটারই ফলাফল জানার অপেক্ষায় ছিলাম। ভয় হল, যদি বলি আমার হাতে নতুন গল্প নেই, তাহলে হয়তো অন্য কারো গল্প তিনি নির্বাচন করবেন। তাই মিথ্যা কথা বললাম, আরো একটি গল্প লিখেছি। যদি বলেন, আগামী সপ্তাহেই আপনাকে দিয়ে যাব।

মনোজ বাবু বললেন, চমৎকার। আজ শুক্রবার। আগামী সোমবার আমি আপনার গল্পের জন্য অপেক্ষা করবো।

তাকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে যাব, সে সময় সেই প্রথম দিনের প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখে কাছে এসে দাঁড়ালেন। পরম আত্মীয়ের মতো বললেন, আরে কই চলে যাচ্ছেন? চায়ের ফরমাশ দিচ্ছি। আজ আপনি আমাদের সঙ্গে চা খেয়ে যাবেন।

একটু থেমে তিনি বললেন, আপনার গল্পটি আমিও পড়েছি। আমারও ভালো লেগেছে। মনোজকে বলেছি তাড়াতাড়ি ছেপে দিতে। আপনি আরো লিখুন।

সেদিন আমার কাছে সারা 'সোনার বাংলা' অফিসটি, যা পরে হয়েছিল বিউটি বোর্ডিং, মনে হয়েছিল একটি পরম আকাঙ্ক্ষিত তীর্থভূমির মতো।

বারো

স্মৃতিকথা লিখে লাভ কি ? এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাকে বলেছি, গাছে গাছে যে এত বর্ণময় ফুল ফোটে, তাতে লাভ কি? বাসি হয়ে যায়। ঝরে যায়। তাহলে এত ফুল ফোটে কেন?

আমাদের হৃদয়েও রোজ স্মৃতির ফুল ফোটে। তা বেশিক্ষণ বাঁচে তা নয়। তবু ফুলের মতোই আমরা স্মৃতি চয়ন করতে ভালবাসি। আমার বাগানের ফুল যেমন অন্যকেও আনন্দ দেয়। আমার স্মৃতির আনন্দ-বেদনা তেমনি অন্যকেও নিশ্চয়ই স্পর্শ করে, আপ্লুত করে। তাই ঢাকার বাংলাবাজারের বিউটি বোর্ডিং-এর শহীদ প্রহ্লাদ চন্দ্র সাহার ছেলে তারক সাহার চিঠি লণ্ডনে যেদিন আমার হাতে এলো, সেদিন আমি নিজেও তিন দশক আগের স্মৃতি জাগানিয়া অনেকগুলো সন্ধ্যায় হঠাৎ ফিরে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, আমার চারপাশে বসে রয়েছেন, তখনকার আমারই মতো তরুণ বয়সী বন্ধুরা—শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরি, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান, কায়সুল হক এবং আরো অনেকে। অদ্ভুত এক বেদনাময় আনন্দে মনটা অভিভূত ছিল অনেকক্ষণ। তারপর যখন স্মৃতির বন্দর থেকে বর্তমানের বাস্তবতায় ফিরে এলাম, তখন মনে হল, এই স্মৃতির পাঁপড়ি ঝড়ে গিয়েও তার সুরভি রেখে গেছে হৃদয়ে। এই সুরভি এখনো মিশে আছে দেহের শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে। আমৃত্যু থাকবে।

এই বিউটি বোর্ডিংয়েই তো চল্লিশের দশকের শেষে এক ভীরু কিশোরের গল্প-লেখক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী এই নামটি তখন ছাপার অক্ষরে বেরুলেই সেই কিশোরের কি উল্লাস। এক সাম্রাজ্য জয়ের উল্লাস ছিল তাতে। তৈমুর লঙও কি 'ভগবানের চাবুক' নাম নিয়ে একটার পর একটা রাজ্য জয় করে এমন উল্লাস বোধ করেছিলেন?

'সোনার বাংলা' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন মনোজ রায় চৌধুরী। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বাংলা ভাষার আন্দোলনে স্কুলের ছাত্র হিসেবে যোগ দিয়ে বরিশালে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে ঢাকায় পালিয়ে এসেছিলাম। এটা আমার জন্য শাপে বর হয়েছিল। নইলে 'সোনার বাংলা' পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ হতো না। মনোজ রায় চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হতো না। তার তাগিদ না থাকলে দিনের পর দিন দিস্তা দিস্তা কাগজে গল্পের পর গল্প লিখতাম না।

শৈশবে আমার সাহিত্য চর্চা শুরু কবিতা দিয়ে। স্কুলের অঙ্কের খাতাও কবিতা লিখে ভরিয়েছি। আধুনিক কবিতার সঙ্গে তখন আমার পরিচয় হয়নি। জসীম উদ্দিন, গোলাম মোস্তফা, কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের মতো কবিতা লেখা তখন আমার জীবনের স্বপ্ন ও কামনা। প্রকৃতি, নারী, ব্যক্তিগত ভাবনার চাইতেও উচ্চকণ্ঠ দেশপ্রেম ছিল আমার কবিতার মুখ্য বিষয়। মনোজ রায় চৌধুরী আমার তখনকার কয়েকটি কবিতা দেখে বললেন, আপনার দ্বারা কবিতা লেখা হবে না। আপনি গল্প লিখুন। গল্প লেখায় আপনার চমৎকার হাত। এই কথাটা এক সময় আমাকে কবি আহসান হাবীবও বলেছিলেন। পরে দু'জনেই আবার মত বদলেছিলেন।

'সোনার বাংলা' অফিসে এই সময় মিনতি বসু নামে একটি মেয়ে আসতেন। তিনি কবিতা লিখতেন। মনোজ রায়ের কাছে কবিতা নিয়ে আসতেন। আমার চাইতে বয়সে বছর দু'য়েকের বড় হবেন। আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তিনি দশম শ্রেণীর। মনোজ রায়ই একদিন মিনতি বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, ইনি হৃষিকেশ দাস রোডে থাকেন। তার বাবার বুক বাইনিডং-এর দোকান আছে । মা শিক্ষকতা করেন। মিনতি চমৎকার কবিতা লেখেন। কিন্তু ছাপতে চান না। বলেন, তার কবিতা এখনো ছাপাবার মতো হয়নি। আমিও কবিতা লিখি। মিনতির কবিতা যে ছাপার যোগ্য, একথা সম্পাদক হিসেবেও বলতে পারি।

মিনতি তার কথা শুনে লজ্জা পেয়েই হয়তো মাথা নীচু করে বসে থাকতেন। মনোজ রায় একদিন বলে বসলেন, মিনতি, আপনার লেখা নতুন কবিতাটা গাফ্ফারকে পড়ে শোনান।

মিনতি তেমনি মাথা নীচু করে বসে রইলেন। জবাব দিলেন না। মনোজ রায় তখন তার হাত থেকে কবিতার খাতাটা টেনে নিয়ে নিজেই তার দু'টি কবিতা পড়ে শোনালেন। আমার কাছে মনে হল, এগুলো কি কবিতা? মিনতির কবিতায় জসীম উদ্দিনের মতো প্রকৃতির বর্ণনা নেই। গোলাম মোস্তফার মতো ঝঙ্কার নেই। কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের মতো ছন্দ নেই। বক্তব্যহীন ব্যক্তি মনের কিছু প্রলাপ।

কবিতা পড়া শেষ করে মনোজ রায় চৌধুরী বললেন, চমৎকার। মিনতির কবিতায় জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রভাব দেখা যায়।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়েছেন?

বললাম, একটি কবিতা পড়েছি—বনলতা সেন। বরিশালে আমার এক কবি বন্ধু তার কিছু কবিতা আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। আমার খুব মনে নেই।

মনোজ রায় বললেন, বলেন কি, মনে নেই? বিস্ময়ের কথা। আপনি বিষ্ণু দে, বুদ্ধদের বসু, সমর সেম এদের কবিতা পড়েছেন?

বললাম, তাদের কবিতার বই নেড়ে চেড়ে দেখেছি। আমার পড়ার ইচ্ছে হয়নি।

ঃতাহলে কাদের কবিতা আপনার ভালো লাগে?

লজ্জা পেয়ে পুরনো কবিদের নাম বললাম না। হালে যাদের কবিতা পড়ছি, তাদের নাম বললাম, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আশরাফ সিদ্দিকী।

মনোজ রায় এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা তাহলে পড়েন? তিনিও আধুনিক কবি। আপনি পুর্ববাংলার ছেলে। বিশেষ করে নদীনালা খালবিল ঘেরা বরিশালের। আপনারতো জীবনানন্দ দাশকে ভালো লাগা উচিৎ।

এই সময় চা এসে গেলো। সেদ্দিনের মতো বৈঠক শেষ। সেই সপ্তাহে 'সোনার বাংলায়' আমার একটি 'একাঙ্কিকা' প্রকাশিত হয়েছে। কয়েক কপি কাগজ বগলদাবা করে অফিসের বড়ো-গেট পেরিয়ে শ্রীশ দাস লেনে এসে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে সদরঘাটের দিকে যাব। চেয়ে দেখি মিনতি বসুও আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি হয়তো বাসায় ফিরে যাবেন। সাহস সঞ্চয় করে বললাম, মিনতি দি, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

মিনতি বড়ো রাস্তার দিকে যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন, দাঁড়ালেন। বললেন, কি কথা?

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ঃআমাদের বাসায়। হৃষিকেশ দাস রোডে।

আমি যাব সদরঘাটে। আমি কি আপনার সঙ্গে আসতে পারি?

ঃকেন?

ঃআমি হাঁটতে হাঁটতে এই আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে দু'চার কথা জানতে চাই। আমি নিজেও কবিতা লিখি। কিন্তু এই আধুনিক কবিতা আমার ভালো লাগে না।

মিনতি বললেন, একদিন আলোচনা করে আপনাকে আধুনিক কবিতা আমি বোঝাতে পারবো না। আপনাকে বেশি করে আধুনিক কবিদের কবিতা পড়তে হবে।

আপনার কাব্যবোধ ও কাব্যরুচি এখনো পুরনো যুগের কবিতার মধ্যে আবদ্ধ। তাই আধুনিক কবিতা আপনার মন টানে না। আপনাকে পুরনো রুচিবোধের দেয়াল ভাঙতে হবে। কবিতা পড়ার নতুন রুচি তৈরি করতে হবে।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন মিনতি দি?

মিনতি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, আপনি আমাকে দিদি ডেকেছেন যদিও আপনার চেয়ে আমি খুব বড় নই। আমি আপনাকে আধুনিক কবিদের বই ধার দিয়ে সাহয্য করতে পারি। অবশ্য আপনার বাড়ির কাছে কলতাবাজারের পাবলিক লাইব্রেরীতেও আপনি এসব বই পাবেন।

বললাম, বড় কবিদের কবিতা পড়ার আগে আমি আপনার কবিতা পড়তে চাই। আপনার যে দু'একটি কবিতা ছাপা হয়েছে, তা অবশ্য আমি পড়েছি। কিন্তু আপনিতো বেশি কবিতা ছাপেন না। কৃপণের ধনের মতো আগলে রাখেন।

মিনতি হেসে ফেললেন, আমিতো এখনো কবি নই। কবিতা লেখার নবিশ মাত্র। সব কবিতা কবিতাও হয় না। তার উপর সামনে মেট্রিক পরীক্ষা। ফলে কবিতা লেখা কমিয়ে দিয়েছি। আমার কবিতা পড়ে আপনার লাভ হবে না। বরং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পড়েন। সেই সঙ্গে জীবনানন্দ দাশ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাও পড়েন। আগে বিষ্ণুদেকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাবেন না।

বললাম, আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা কি?

মিনতি বললেন, এখনকার লেখা হলেই তা আধুনিক হয় না। পুরনো ধারা বর্তমানেও বেঁচে থাকতে পারে। পুরনো থেকে যা স্বতন্ত্র ও নতুন তাকে আধুনিক বলতে পারেন।

ঃ রবীন্দ্রনাথ কি আধুনিক?

মিনতি বললেন, আপনি ও আমি দু'জনেই স্কুলে পড়ি। আমাদের জন্য এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা খুবই উচ্চ চিন্তা। অনেকে বলবেন, আমাদের চিন্তা শক্তির বাইরে। তবু বলছি, পুরনো ও আধুনিকতার সংজ্ঞা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলার চিরায়ত কবিতার ধারা। তিনি চির আধুনিক।

বাংলাবাজারের মোড়ে এসে সদরঘাটের দিকে এগুবো, মিনতি যাবেন হৃষিকেশ দাশ রোডের দিকে। হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আসুন, আমাদের বাসায়। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন।

সেদিনের বিকেলটা বড় ভালো লাগছিল। বাংলাবাজার, হৃষিকেশ দাশ রোড তখন এমন জনাকীর্ণ নয়। দোকান পাটও তখন এতটা ছিল না। বরং হৃষিকেশ দাশ রোড ছিল মোটামুটি আবাসিক এলাকাই।

মিনতি বসুদের বাড়ি একেবারে বড় রাস্তার পাশে। সামনে একটা নর্দমা। সিঁড়ি

নর্দমার উপর দিয়ে ঘরে উঠে গেছে। মিনতিরা বাড়ির উপরের তলায় থাকেন। নীচের তলায় বুক বাইন্ডিং–এর সরঞ্জাম। বাইরের লোক তেমন নেই। মিনতির বাবা, এক কাকা এবং এক ভাই কাজ করেন। খুবই সরু একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। পুরনো চুনসুর্কির বাড়ি। কিন্তু ঝকঝকে তকতকে। বসার ঘরের দেয়ালে দেশবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের ছবি। বীণা হাতে বীণাপাণির একটি ছোট মূর্তি এক কোণে। ছোট একটা চৌকি। পাশে দু'টি চেয়ার। দেয়াল আলমিরা বইয়ে ঠাঁসা। চৌকির কোণায় দেয়ালে ঠেস দেওয়া একটি সেতার।

আমাকে একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে মিনতি বললেন, আমি এক ছুটে মাকে চা করতে বলে আসি। বাবা মায়ের সঙ্গে পরে আলাপ করিয়ে দেব।

বলেই ভেতরের ঘরের দিকে একছুট।

দেয়াল আলমিরাটা কাঁচ ঢাকা নয়। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রথমেই চোখে পড়লো নীচের তাকে একগাদা ম্যাগাজিন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পূর্বাশা' এবং 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা। আমি পত্রিকাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

মিনতি কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাইনি। বললেন, আজ সন্ধ্যায় আমার সেতারের টিচার আসবেন। তিনি আসার আগে আপনার সঙ্গে ঘন্টাখানেক গল্প করতে পারবো।

ঃআপনি বুঝি সেতারও শেখেন? জিজ্ঞেস করলাম।

ঃহ্যাঁ।

বিস্ময় প্রকাশ করলাম, আপনি আধুনিক কবিতা লেখেন, আবার সেতার বাজনাও শেখেন?

মিনতি বললেন, সেতার আর আধুনিক কবিতার মধ্যে বিরোধ কোথায়?

একটু ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললাম, একটা হচ্ছে সুর, আরেকটা অসুর।

মিনতি রাগ করলেন না, হাসতে লাগলেন। বললেন, দুটোই সুর। বাজাতে না জানলে দুটোই বেসুর।

মিনতির মা চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে রেকাবিতে খান কয়েক লুচি। আমাকে বললেন, বাবা, বসো। তুমিও বুঝি মিনুর মতো কবিতা লেখো?

তের

মিনতি বসুর মাকে দেখে আমার নিজের মায়ের কথা মনে পড়লো, তিনি তখনো বেঁচে আছেন। থাকেন বরিশালের গ্রামের বাড়িতে। কতদিন তাকে দেখি না। মিনতি বসুর মাকে দেখে তাকে হঠাৎ স্মরণ হলো। তবে দু'জনের পার্থক্যও

আছে। মিনতির মা ফর্সা। আমার মা শ্যামলা। মিনতির মায়ের মতো আমার মা অত কৃশ নন। তবু দু'জনের হাসির মধ্যে আশ্চর্য মিল। আমাকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'কি দেখছো বাবা?'

আপনাকে আমার মায়ের মতো লাগছে।

ঃ আমাকে তুমি মাসিমা ডেকো।

তিনি চৌকির উপর চা আর লুচি রেখে চলে গেলেন। মিনতি হেসে বললেন, আপনি খুব চালাক। আজ থেকে মাসিমার বাড়িতে আপনার অবারিত দ্বার।

মিনতি কি ছিলেন আমার প্রথম যৌবনের ভালোবাসা? না। এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। তাকে সত্যি দিদি ডেকেছিলাম। আমাকেও তিনি ছোট ভাইয়ের মতো দেখতেন। তার সান্নিধ্য খুব ভালো লাগতো। তাকে পেয়ে ঢাকায় আমার সেই সাময়িক অবস্থানের দিনগুলো নানা রঙে ঝলমলো হয়ে উঠেছিল। মিনতি খুব কম যেতেন 'সোনার বাংলা' অফিসে। কিন্তু কবে যাবেন, আমি জানতাম। সেদিন আমি 'সোনার বাংলা' অফিসে হাজির থাকতাম। মনোজ রায় চৌধুরী মাঝে মাঝে হেসে বলতেন, আপনি দেখছি ক্রমেই মিনতি বসুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি লজ্জিত মুখে হাসতাম। জবাব দিতাম না।

'সোনার বাংলা' অফিস থেকে মিনতি বসুর সঙ্গে তাদের হৃষিকেশ দাসের বাসায়। এটাও সপ্তাহের দু'তিন দিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিন মিনতির একটি সদ্যলেখা কবিতা পড়ে আমার হঠাৎ কি মনে হল, জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মিনুদি, তুমি কি মনোজ বাবুকে ভালোবাসো?

মিনতি বললেন, না তো। তোমার একথা কেন মনে হল? আমার কবিতা পড়ে?

ঃ অনেকটা তাই।

মিনতি বললেন, না এ কবিতাটা প্রেমের কবিতা নয়. কোনো মানুষকে নিয়ে লেখা নয়। আমার একটি পোষা বিড়াল ছিল। বিড়ালটা হঠাৎ হারিয়ে যায়। আমার ধারণা, রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে। নইলে সে পালাবার বিড়াল নয়। আমাকে খুব ভালোবাসতো। তাকে মনে পড়ায় লেখা।

মিনতির সঙ্গে কিছুদিন মিশে মনে হয়েছিল, আধুনিক কবিতা বুঝতে শুরু করেছি। এখন বুঝলাম, কিছু বুঝি না। লজ্জা পেয়ে বললাম, মিনুদি, আমি একটা আস্ত ইডিয়ট।

মিনতি আমার কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি মোটেই ইডিয়ট নও। তুমি আমার মায়ের পেটের ছোট ভাই। একদিন দেখবে, তুমি সবচাইতে ভালো কবিতা লিখছো!

আমার মাথার জেদ চেপে গেল। গল্প লেখা রেখে কবিতা লেখায় মন দিলাম। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লিখি, তবে আধুনিক কবিতা নয়। বরিশালে স্কুলের সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালেই আধুনিক কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেন নারায়ণ দাশ শর্মা। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র ছিলেন। বাংলাদেশের শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের বর্তমান নেতা নির্মল সেনের সম্ভবতঃ সহপাঠী ছিলেন এবং একই সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখনকার একটি বাম ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে। নিজেও কবিতা লিখতেন। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বরিশাল ছেড়ে চলে যান। আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে বরিশালে তখনকার আরো একজন শক্তিমান তরুণ কবি ছিলেন, অরবিন্দ গুহ। শামসুদ্দিন আবুল কালামও কালে.ভদ্রে কবিতা লিখতেন। তবে তিনি সার্বক্ষণিকভাবে ছিলেন কথাশিল্পী।

আধুনিক কবিতার দিকে হয়তো আমি চিরকালই মুখ ফিরিয়ে থাকতাম, যদি সেই চল্লিশের দশকের শেষের দিকেই আহসান হাবীবের 'রাত্রি শেষের'এবং আশরাফ সিদ্দিকীর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত (তখনো সম্ভবতঃ 'তালের মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা' বইটি প্রকাশিত হয়নি) কবিতা আমার মনে ভীষণভাবে দোলা না দিতো। আশরাফ সিদ্দিকীর 'সাপে কেটে মারা গেলো কবিতা আমার' কবিতাটি আমার কণ্ঠস্থ ছিল বহুকাল; সেই সঙ্গে আহসান হাবীবের রাত্রি শেষের 'কাশ্মীরী মেয়েটি,' 'রেইন কোট,' 'আজকের কবিতা' ইত্যাদি।

আমার মনে তখন থেকেই আধুনিক কবিতার দরোজা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছিল। জীবনানন্দ দাশ বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে চল্লিশের দশকের গোড়ায় শিক্ষকতা করতেন। তার নাম ও কবিতার সঙ্গে পরিচয় ছিল। ঘনিষ্টতা ছিল না। ঢাকায় মিনতি বসু আমার সেই ঘনিষ্ঠতা গড়ে দিলেন। কবির সঙ্গে নয়, তার কবিতার সঙ্গে।

মনে আছে, আটচল্লিশ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমি কয়েকঘন্টা ধরে কলতাবাজারে আরিফ চৌধুরীর বাসায় বসে কবিতার পর কবিতা লিখেছি। অনেকগুলোই ভালো লাগেনি। ছিঁড়ে ফেলেছি। কিছু কবিতা রেখেছি। একটি কবিতার প্রথম লাইন ছিল, "নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে শেষবেলার হাসি' বাকি লাইনগুলো মনে নেই। আরেকটা কবিতা লিখেছিলাম মিনতি বসুকে উৎসর্গ করে-"মিনতি দি, তোমাকে মিনতি করছি/তুমি আর কাউকে ভালবেসো না/শুধু কবিতা ভালবেসো/নইলে তোমার কবিতা ওই বিড়ালের মতো হারিয়ে যাবে/গাড়ি চাপা পড়ে মরবে/তুমি শুধু কাঁদবে আর কাঁদবে/কিন্তু তাকে আর খুঁজে পাবে না।" এই কবিতারও বাকি লাইনগুলো মনে নেই।

আজ এই দু'টি কবিতার কথা মনে পড়লে হাসি পায়। মনে হয়, কী ছেলেমানুষ ছিলাম। সেদিন কিন্তু একথা মনে হয়নি। দু'টো কবিতা নিয়ে বাংলাবাজারে 'সোনার বাংলো' অফিসে মনোজ রায় চৌধুরীর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তিনি কবিতা দু'টি পড়ে বললেন, আমি যে আগে বলেছিলাম, আপনার কবিতা লেখা উচিত নয়, সে কথা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তবে আপনাকে বেশ কিছুদিন কবিতা লেখা অনুশীলন করতে হবে এবং আরো বেশি করে কবিতা পড়তে হবে।

বলেছিলাম, পড়বো। তিনি আমাকে বিস্মিত করে দুটি কবিতার মধ্যে একটি 'সোনার বাংলায়' ছাপার জন্য বাছাই করলেন, যার প্রথম লাইন ছিল, 'নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে:' দ্বিতীয় কবিতাটি সম্পর্কে বললেন, এটি মিনতিকে দিন। তিনি খুশি হবেন।

প্রথম কবিতাটি 'সোনার বাংলায়' ছাপা হয়েছিল।

এক দুপুরে মিনতি বসুদের বাড়িতে আমার দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন। মাসিমা আমার পাতে কচি পাঁঠার মাংস তুলে দিয়ে বললেন, বাবা, আমরা তো পেঁয়াজ রসুন ব্যবহার করি না। তাই পেঁয়াজ রসুন দিয়ে রান্না করতেও জানি না। তোমার হয়তো আমার হাতে রান্না করা এই মাংস ভালো লাগবে না।

আমি তৃপ্তির সঙ্গেই সেই মাংস খাচ্ছিলাম। বলেছিলাম, না মাসিমা, আমার কিন্তু ভালোই লাগছে।

মাসিমা হেসে বললেন, তুমি আমাকে প্রবোধ দিচ্ছো।

খাওয়া শেষ করে মিনতির সঙ্গে একলা হতেই তাকে উৎসর্গ করা কবিতাটি তার হাতে দিলাম। মনোজ বাবু কি বলেছেন, তাও তাকে জানালাম। মিনতি একবার নয়, দু'বার পুরো কবিতাটি পড়লেন। কপালে ঠেকালেন। তারপর বললেন, তোমার এই হাতের লেখা আমার কাছে থাক। তোমার কাছে এর কপি আছে?

ঃ আছে। তোমার জন্যই এটা এনেছি।

মিনতি বললেন, কলকাতা থেকে এ মাসের 'পূর্বাশা' পত্রিকা এসেছে। তোমাকে আজ পড়তে দেব। এই পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যও একজন লেখক এবং কবি। যদি পারো, এই পত্রিকার গ্রাহক হয়ে যাও। তোমার সাহিত্য অনুশীলনে সাহায্য হবে।

তিনি আমাকে পত্রিকাটি দিলেন। কভারে ছবি টবি নেই। 'পূর্বাশা' কথাটি দুই রঙে বড় করে ছাপা। পাতা উল্টালেই প্রথম পৃষ্ঠায় পাইকা হরফে ছাপা একটি কবিতা। মিনতি বললেন, আমার খুব প্রিয় পত্রিকা। আর এই ভট্টাচার্য্য পরিবারও

বাংলায় খুব নামকরা পরিবার। বড় ভাই একজন অধ্যাপক। আরেক ভাই অজয় ভট্টাচার্য্য একজন বিখ্যাত গায়ক। তার বহু গানের রেকর্ড বেরিয়েছে। তৃতীয় ভাই স য় ভট্টাচার্য্য লেখক এবং সম্পাদক।

আমি লাফ দিয়ে উঠলাম, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তাহলে অজয় ভট্টাচার্য্যর ভাই?

মিনতি বললেন, তুমি অজয় ভট্টাচার্য্যর গান শুনেছো?

আমি নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, শুনেছি মানে? আমি তার গান গাইতে পারি।

মিনতি সবিস্ময়ে বললেন, তুমি গান গাইতে পারো? কই, একথাটাতো এতদিন বলোনি?

নিজের বোকামি বুঝতে পারলাম। মাথা নেড়ে বললাম, না মিনুদি আমি গান গাইতে পারি না। আমার গলা ভালো নয়। তবে অজয় ভট্টাচার্য্যর একটা গান এতই বিখ্যাত যে, গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ মানুষ পর্যন্ত রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময়েও এই গানটি গায়। আমিও লোকজন না থাকলে গাই।

ঃ গানের প্রথম লাইনটি কি? মিনতি জানতে চাইলেন।

ঃ"একদিন যবে গেয়েছিল পাখি ছায়া-ঘেরা নদী তীরে।"

মিনতি চাপা স্বরে বললেন, এই গানটি আমারও খুব প্রিয়। তোমার গলা যত খারাপ হোক, আমাকে একদিন গেয়ে শোনাবে? আমাদের ঘরে এই গানের রেকর্ডটি নেই। আমি তোমার কাছ থেকে শিখবো।

মিনতিকে কথা দিলাম, তাকে একদিন গানটি গেয়ে শোনাবো।

আজকাল হয়তো এই গানটির কথা অনেকেরই মনে নেই। এর সুর ও কথাও বাসিযুগের হয়ে গেছে। কিন্তু চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যে দু'টি গান, শুধু শহরে-বন্দরে নয়, গ্রামে-গঞ্জে, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ছেলে বুড়ো সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিলো, তার একটি কানন দেবীর গাওয়া 'আমি বনফুল গো'। অন্যটি অজয় ভট্টাচার্য্যের 'একদিন যবে গেয়েছিলো পাখি।' আমি তখন গ্রামের স্কুলের ছাত্র। দেখতাম, গ্রামের বাজারের পথে পাটের বোঝা নিয়ে যাচ্ছে গ্রাম্য ব্যবসায়ী, সেও হাঁটতে হাঁটতে গান গাইছে, 'আমি বনফুল গো' অথবা 'একদিন যবে গেয়েছিল পাখি।'

মিনতিও আমার গলায় এই গান না শুনে ছাড়লেন না। একদিন 'সোনার বাংলা' অফিস থেকে বেরিয়ে হৃষিকেশ দাস রোডের দিকে না গিয়ে তিনি আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন ভিক্টোরিয়া পার্কে (এখন যেটা বাহাদুর শাহ পার্ক)। শহীদ স্তম্ভটি তখন তৈরি হয়নি। ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে লোকজনের বসার বেঞ্চি ছিল। তেমন লোক সমাগম হতো না তখন। দু'একজন বুড়ো আসতেন বিকেলের হাঁটার ব্যায়াম চর্চার জন্য।

একটা বেঞ্চিতে বসে মিনতি বললেন, অজয় ভট্টাচার্য্যর সেই গানটা গাও। তুমি চীনাবাদাম খেতে ভালবাসো। তোমাকে আজ দু'আনার চীনাবাদাম কিনে খাওয়াবো।

নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়লাম। কবুল করেছি। গান না গেয়ে উপায় নেই। প্রথমে লজ্জায় গলার স্বর ফুটলো না। তারপর চাপা কণ্ঠে গাইলামঃ

"একদিন যবে গেয়েছিল পাখি
ছায়া ঘেরা নদী তীরে
সেইদিনও তোমায় বলেছিনু হায়
আবার আসিও ফিরে ॥
ডাকিও আবার সেই মমতায়
তেমনি পুলকে তেমনি ব্যথায়
সে মিনতি মোর কিছু কিগো নয়
তুমিওতো সেধেছিলে।
ছায়া-ঘেরা নদী তীরে ॥
আমারে ভুলিতে কি জানি কেন গো
তুমিওতো কেঁদেছিলে
আমি যেন হায় না ভুলি তোমায়
তুমিওতো সেধেছিলে।
আজ কেন তবে বিরহের ভার
পাষাণ সমান রহিল আমার
সে মিনতি মোর কিছু কিগো নয়
তুমিওতো সেধেছিলে।
ছায়া-ঘেরা নদী তীরে ॥ "

আমার বেসুরো কণ্ঠের গানও মিনতি কিছুক্ষণ আবিষ্ট হয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, নাহ্, এভাবে রাস্তায় বা পার্কে বসে গান শুনে সুর মনে রাখতে পারবো না। ঘরে তোমাকে নিয়ে হারমোনিয়ামের সামনে বসতে হবে।

এই গানের কথা ও সুর কবে হারিয়ে গেছে। অজয় ভট্টাচার্য্য আজ বেঁচে নেই। মিনতি বসু হয়তো বেঁচে আছেন। কোথায় আছেন জানি না। পঞ্চাশের দাঙ্গার পর মিনতিও বাবা-মার সঙ্গে ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় শরণার্থী হয়ে চলে যান। হৃষিকেষ দাশ রোডে বসু ব্রাদার্স, বুক বাইন্ডার্সের সাইনবোর্ডটিও উঠে যায়। এই গানটি এই বয়সেও যখন নিজের মনে গুনগুনিয়ে গাই, তখন চল্লিশের দশকের

একেবারে শেষদিকের ঢাকার কথা মনে পড়ে। মিনতির কথা মনে পড়ে। মাসিমার কথা মনে পড়ে। আরো মনে পড়ে অজয় ভট্টাচার্য্যর শোচনীয় মৃত্যুর কথা। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তার ভাই সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, যিনি 'পূর্বাশার' সম্পাদক ছিলেন, তিনিও আত্মহত্যা করেন। পরে শুনেছি, এই বংশে একটা মানসিক রোগ ছিল, সেটা আত্মহত্যার প্রবণতা।

আটচল্লিশ সালের শেষ দিকে আমি বরিশালে ফিরে যাই। সামনে স্কুলের এ্যানুয়াল পরীক্ষা। না ফিরে উপায় নেই। ততদিনে পুলিশও আমাকে আর খোঁজাখুঁজি করছে না। যেদিন সন্ধ্যায় ঢাকার বাদামতলীর ঘাটে বরিশালগামী স্টিমারে চাপবো, মিনতি বসু একেবারে স্টিমারের সিঁড়ির গোড়ায় ছুটে এলেন। আগের দিন তাদের কাছে বিদায় নিয়ে এসেছি। মাসিমা চোখ মুছে বলেছেন, ঢাকায় এলে এই বাসায় আবার এসো বাবা। মিনতির চোখও ছলছল করেছে। বলেছেন, আমাকে সপ্তাহে একটা চিঠি অবশ্যই পাঠাবে। সেই সঙ্গে নতুন লেখা কবিতাও।

স্টিমারে চড়ার আগে মিনতিদি'কে ছুটে আসতে দেখে তাই বিস্মিত হলাম। খুশিও হলাম। বললাম, মিনু দি, তুমি ছুটে এসেছো যে?

মিনতি বললেন, আমার হাতে একটা পুটুলি দেখছো? মা লুচি ভেজে দিয়েছেন। সঙ্গে তরকারি। বলেছেন, সারা-রাত সারা-দিন পর আগামীকাল সন্ধ্যায় স্টিমার গিয়ে পৌঁছবে বরিশালে। ছেলেটা পথে খাবে কি? মিনু একটা রিকশা ডেকে তাড়াতাড়ি যা। দ্যাখতো খাবারটা ওকে পৌঁছে দিতে পারিস কিনা?

আমি পুটুলিটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিনুদি'র দিকেও তাকালাম না। আমার বরিশালের গ্রামের নিজের মায়ের কথা আবার মনে পড়ে গেল।

চৌদ্দ

১৯৪৮ সালের পর বরিশাল থেকে আমার ঢাকায় যাতায়াত ঘন ঘন হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই যেতাম। কখনো কাজে। কখনো অকাজে। কলকাতা থেকে ঢাকায় 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা স্থানান্তরিত হওয়ার আগে বংশালের বলিয়াদী প্রেস থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা বের হয়েছিল। নাম 'দৈনিক জিন্দেগী'। কাজী আফসারউদ্দিন আহমদ (কথাশিল্পী) এবং এস এম বজলুল হক ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ পরে 'মৃত্তিকা' নামে একটি উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকাও বের করেছিলেন। তিনি এবং তার স্ত্রী জেবুন্নেসা আহমদ মিলে বিভাগ-উত্তর ঢাকায় শিশু-মাসিক বের করেন 'খেলাঘর'। অবশ্য ফয়েজ

আহমেদের 'হুল্লোড়,' না কাজী সাহেবের 'খেলাঘর,' কোনটি বিভাগ-উত্তর ঢাকায় প্রথম শিশু-কিশোর মাসিক, তা এখন আমার পক্ষে সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

কাজী আফসারউদ্দিন আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমি স্কুলের ছাত্র জেনেও তিনি আমাকে বরিশালে 'দৈনিক জিন্দেগীর' সংবাদদাতা নিযুক্ত করেছিলেন। এ সময় বরিশালে 'দৈনিক আজাদের' সংবাদদাতা ছিলেন মোহাম্মদ আলী আশরাফ। 'জিন্দেগী' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরেই 'দৈনিক আজাদ' কলকাতা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ঢাকায় চলে আসে। 'জিন্দেগী'ও 'আজাদে' খবর পাঠানো নিয়ে মোহাম্মদ আলী আশরাফ ও আমার মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো। কখনো হতো মনকষাকষি। আলী আশরাফ তখন বরিশালে সাপ্তাহিক 'খেলাফত' কাগজের সম্পাদক। আমি এই কাগজে কিছুদিন কাজ করেছি। মোহাম্মদ আলী আশরাফ পরে ঢাকায় চলে আসেন এবং কিছুকাল 'আজাদে' সাংবাদিকতা করার পর প্রেস ট্রাস্টের 'দৈনিক পাকিস্তানে' (বর্তমানে 'দৈনিক বাংলা') যোগ দেন। তিনি বাম রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। অল্প বয়সে মারা যান।

আমি তখন ঘোর বামপন্থী ছাত্র। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দর্শনে প্রচন্ডভাবে বিশ্বাসী। ছোটগল্প লেখার ব্যাপারে তখন আমি অনুসারী ছিলাম 'শাহেরবানু'-খ্যাত শামসুদ্দিন আবুল কালামের। কিন্তু গল্পে তাত্ত্বিকতা আমদানির ব্যাপারে আমাকে আকৃষ্ট করলেন আমার চাইতে দু'এক বছরের বড়, কিন্তু তখনই খ্যাতিমান গল্প লেখক ও কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ। তার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জেগে আছি' তখন মাত্র বেরিয়েছে। আজাদ মার্কসবাদী দর্শনে ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। 'অগত্যা' পত্রিকা গোষ্ঠীরও তিনি লেখক। ঢাকায় বেড়াতে গিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। পরিচিত হলাম 'নতুন কবিতা' গোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে। শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, তাসিকুল আলম খাঁ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং আরো অনেকের সঙ্গে। আধুনিক কবিতার সঙ্গেও আমার ভাব গড়ে উঠছে। নিজেও সেই কবিতা লিখছি। জীবনানন্দ দাশকে ভালো লাগতে শুরু করেছে। সেই সুবাদে শামসুর রাহমানকে। শামসুর রাহমান তখন ছিলেন জীবনানন্দ দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত।

১৯৪৯ সালের সবটা এবং ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি (আমার মেট্রিক পরীক্ষা অব্দি) সময়টা বরিশালে কাটালেও ঢাকার সঙ্গে আমার নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। আলাউদ্দিন আল আজাদ তখন আমাকে প্রায়শঃ চিঠি লিখতেন। আমিও লিখতাম। আমাদের সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কিভাবে প্রতিফলন ঘটাতে হবে, সে সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা থাকতো তার চিঠিতে। তার এই চিন্তাধারা থেকেই প্রভাবিত হয়ে তখন দুটি গল্প লিখেছিলাম।

১৯৪৮ সালের শেষ দিকে স্কুলের এ্যানুয়েল পরীক্ষা সামনে নিয়ে ঢাকা থেকে বরিশাল শহরে ফিরে গেলাম বটে, কিন্তু সেখানে আমার থাকা ও খাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো স্থান ছিল না। তখন মাত্র পাকিস্তান হয়েছে। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ও উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তার স্রোত তুঙ্গে। আমি যুক্ত ছিলাম অসাম্প্রদায়িক বাম ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে। আমার আত্মীয় স্বজনেরা এটা মোটেই পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল বা আর এসপি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্র কংগ্রেসের(মির্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা) সঙ্গে আমার মাখামাখি। সুতরাং কিছুদিন ছাত্র পড়িয়ে, সেই সুবাদে কারো বাড়িতে লজিং থেকে ভবঘুরে জীবনের নেশায় আমাকে পেয়ে বসেছিল। এ সময় বরিশাল শহরের একেবারে সদর রাস্তা—সদর রোডের উপর আমার থাকার ব্যবস্থা হল আকস্মিকভাবে।

স্টিমার ঘাট থেকে পুরনো কালেক্টরি ভবনের সামনে দিয়ে ফজলুল হক এভেনিউ হয়ে সদর রোড ধরে ডানদিকে ঘুরলেই একটি বড় স্টেশনারি দোকান ছিল তখন, চৌধুরী ব্রাদার্স। এই চৌধুরী ব্রাদার্সের দোতলায় তিনটি ছোট ছোট খুপড়ি ঘর। পেছনে ছিল কচুরিপানা ভর্তি পুকুর। এই খুপড়ি ঘরের দুটি ঘর ছিল 'ভারতের বলশেভিক পার্টি,' বরিশাল শাখার অফিস। সন্তোষবাবু নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন বলশেভিক পার্টির অন্যতম নেতা। তিনি মাঝেসাজেই কলকাতা থেকে বরিশালে আসতেন। তখন এই খুপড়ি ঘরের একটি হতো তার শয়নঘর। অন্যটি পার্টি অফিস। এই পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল আমার শৈশবকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিজয়েশ্বর রায় চৌধুরী।

পাকিস্তান হওয়ার পর বরিশালে বলশেভিক পার্টির কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। সন্তোষ বাবু কলকাতা থেকে আর আসতেন না। বিজয়েশ্বর রায়ের বাবা-মাও পাকিস্তান ছেড়ে ভারতের কলকাতায় চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেছিলেন। ঘর দুটির একটির জন্য বলশেভিক পার্টির আগাম ভাড়া দেওয়া ছিল মাস ছয়েকের জন্য। বিজয় আমাকে হোমলেস জেনে এই একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। আমি বোচকা-বুচকি নিয়ে এই ঘরটিতে উঠলাম। আমার একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা হল, Up-stair of Chowdhury Brothers, Sadar Road, Barisal.

এই ঠিকানাতেই চিঠি আসতো ঢাকা থেকে আলাউদ্দিন আল আজাদের। মনোজ রায় চৌধুরীর। সেই সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে আসতো 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' পত্রিকা। মিনতি বসুকে ঠিকানাটা জানাতেই তিনিও নিয়মিত চিঠি লিখতে শুরু করলেন। তার উৎসাহেই আমি 'পূর্বাশা' পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলাম। পূর্বাশা আমার কাছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। 'পূর্বাশায়' পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে শামসুর রাহমানও কবিতা লিখতে শুরু করেন, সেই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকাতেও।

ঢাকার 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় মিনতি বসুর কবিতা পড়তাম। আর মিনতি বসু পড়তেন আমার গল্প। মাঝে মাঝে তিনি আমার গল্পের সমালোচনা করতেন। লিখতেন, "তোমার..... গল্প খুব ভালো লগে। কিন্তু এই গল্পটি ভালো লাগেনি। তুমি মনে হয় আজকাল তোমার গল্পের চরিত্রের মুখ দিয়ে নিজের রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচার করতে চাও। এটা ভালো নয়। তাতে গল্পের রস ক্ষুণ্ন হয়। তত্ত্ব লিখতে হলে প্রবন্ধ লেখো।" আমি তার কবিতার সমালোচনা করতাম, আপনার কবিতা ক্রমশঃই বেশি রোমান্টিক হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, আপনি স্বপ্নের ঘোরে কবিতা লিখছেন। আপনি কি প্রেমে পড়েছেন মিনুদি? এটাতো প্রেমে পড়ার বয়স !

আমার প্রশ্নের জবাবে মিনতি বসু তার চিঠিতে লিখেছিলেন "আমার প্রেমে পড়ার সুযোগ কই? ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হতেই বাবা ও কাকা আমার জন্য পাত্র খুঁজতে শুরু করেছেন। তাদের ধারণা, পাকিস্তানে যেসব হিন্দু মেয়েরা বাস করে, তাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত। তার কারণ কি জানো? ঢাকার হৃষিকেশ দাশ রোড ছিল এতকাল হিন্দু পাড়া। এখন দু'চার ঘর মুসলমান বাসিন্দাও এসেছে। আমি একদিন হেটে বাসায় ফিরছিলাম, একটি মুসলমান ছেলে আমাকে দেখে শিস দিল। আরেক দিন একটা চিঠি ছুঁড়ে দিয়েছে। তাতে লেখা 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। বাবা ও কাকা ব্যাপারটা জেনে ঘাবড়ে গেছেন। আমি লজ্জায় তাদের কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু মনে মনে ভেবেছি, একটি মুসলমান ছেলে একটি হিন্দু মেয়েকে ভালোবাসা জানালে অন্যায়টা কি? সেতো আর জোর করে আমাকে অপহরণ করতে যাচ্ছে না।"

উনপঞ্চাশ সালটা কোনো রকমে কাটলো। মার্চ মাসে আমার মা মারা গেলেন। পরিবারের সঙ্গে, গ্রামের সঙ্গে আমার যে শেষ বন্ধন, তাও মনে হল ছিন্ন হয়ে গেল। গ্রামের বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে যখন বরিশাল শহরে ফিরলাম, তখন সামনে ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা। সাহিত্য চর্চা বন্ধ করে দিলাম। চিঠিপত্র লেখাও। কিছুদিনের জন্য ঢাকার আর সকলের সঙ্গে, এমন কি মিনতি বসুর সঙ্গেও আমার যোগাযোগ সাময়িকভাবে ছিন্ন হয়ে গেল।

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই মাসে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি জেলায় ভয়াবহ দাঙ্গা হল। আমি তখনো ঢাকার 'দৈনিক জিন্দেগী' পত্রিকার করেসপন্ডেন্ট। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এলেন দাঙ্গা উপদ্রুত বরিশালের অবস্থা নিজের চোখে দেখতে। বরিশাল শহরের অদূরেই মাধবপাশা গ্রাম হিন্দু-প্রধান এলাকা ছিল। জমিদার হিন্দু। তাদের বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ি। প্রধানমন্ত্রী গেলেন সেই বাড়িতে। সঙ্গে

সাংবাদিকেরা। আমারও যাওয়ার সুযোগ হল। মাধবপাশার জমিদার বাড়িতে জীবিত বলতে অবশিষ্ট ছিল একটি এগারো বছরের অসহায় বালিকা। সে যখন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীকে বাবা ডেকে তার পায়ের উপর কান্নায় ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়লো, তখন মুসলিম লীগের সেই জাঁদরেল নেতাও রুমালে চোখের পানি না মুছে পারেননি। বরিশাল সফরের পরেই লিয়াকত আলী খান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন এবং দিল্লীতে ছুটে গিয়ে স্বাক্ষর দেন ঐতিহাসিক নেহেরু-লিয়াকত চুক্তিতে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়েছিল। একবার নয়, দু'বার। শেষ পর্যন্ত মে কিম্বা জুন মাসে গিয়ে পরীক্ষা হয়েছিল। পরীক্ষা শেষে গ্রামের বাড়ি উলানিয়াতে চলে গেলাম। সামনে দীর্ঘ তিন মাসের অবকাশ। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবে তিন মাস পর। উলানিয়াতে কিছুদিন কাটিয়ে হাঁপিয়ে উঠলাম। চাচাতো ভাই হারুন বললো, চলো, কুমিল্লার সৈয়দপুরে বেড়াতে যাই। সেখানে তার মেজো বোন রওশন আপার বিয়ে হয়েছিল। তিনি তখন বেঁচে নেই। তার স্বামী, ছোট দুটি ছেলেমেয়ে আছে। আমরা সেখানে বেড়াতে গেলে তারা খুশি হবেন। মেঘনার পারে চাঁদপুর বন্দর থেকে সৈয়দপুর খুব কাছে। চাঁদপুর থেকে ট্রেনে চেপে বলাখাল স্টেশনে নেমে মাইল দুয়েক হাঁটলেই সৈয়দপুর গ্রাম। অদূরে বিখ্যাত মতলব বাজার। কিছুদিন সৈয়দপুরে বেড়িয়ে মনে হল, চাঁদপুরে যখন এসেছি, তখন ঢাকা আর কতদূর। দু'ভাই স্টিমারে চড়ে সোজা ঢাকায়।

ঢাকার মাটিতে পা দিয়েই মনে হল বাংলা বাজারে 'সোনার বাংলা' অফিসে ঢুঁ মারতে হবে। পরীক্ষার চাপে বহুদিন মনোজ রায় চৌধুরীকে গল্প পাঠাইনি। বরিশালে অবস্থানকালে কয়েকটি গল্প লিখেছি। তার দু'একটা তাকে দেব। মিনুদি'র হৃষিকেশ দাস রোডের বাড়িতে যাব। আলাউদ্দিন আল আজাদ তখন সম্ভবত থাকতেন আরমানিটোলায় ওয়ার্সি বুক সেন্টারের মালিকের বাসায়। তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে।

প্রথমেই গেলাম 'সোনার বাংলা' অফিসে। গেটে তালা লাগানো। আশপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করতেই তারা জানালেন, ওই অফিসতো দাঙ্গার পর কবে উঠে গেছে। বাবুরা বাড়ি প্রেস বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় চলে গেছেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে সেদিনের 'সোনার বাংলা' অফিস, এখনকার বিউটি বোর্ডিং-এর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, বরিশাল শহরে চৌধুরী ব্রাদার্সের ঠিকানায় 'সোনার বাংলা' পত্রিকা পাঠানো হয়। আমিতো কয়েক মাস সেখানে নেই। তাই কাগজটা যে বন্ধ হয়ে গেছে, তা জানতে পারিনি। মনোজ রায় চৌধুরী হয়তো আমাকে চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠি চৌধুরী ব্রাদার্সের লেটার বক্সেই পড়ে আছে।

ভাঙামন নিয়ে ঋষিকেশ দাস রোডের দিকে দৌড়ালাম। মিনতি বসুকে ধরতে হবে। তার কাছে 'সোনার বাংলার' সব খবর পাব। মিনুদি'কে বহুদিন চিঠি লিখিনি। তিনিও হয়তো আমার বরিশালের ঠিকানায় চিঠি লিখে লিখে জবাব না পেয়ে আমার উপর রাগ করে বসে আছেন। প্রথমে তার কাছে গিয়ে রাগ ভাঙাতে হবে।

বাংলাবাজার থেকে সোজা ঋষিকেশ দাস রোডে বোস ব্রাদার্সের সাইন বোর্ড লাগানো বুক বাইণ্ডিং-এর বাড়িটাতে গেলাম। বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। সেই সাইনবোর্ডটা নেই। দরোজায় নক্ করলাম। একবার, দু'বার, তিন বার, চার বার। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া, টুপি মাথায় এক প্রৌঢ় এসে দরোজা খুললেন। বললেন, কি চাই?

একটা অজানা আশঙ্কায় আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। তবু সাহস সঞ্চয় করে বললাম, এখানে কি বসু বাবুরা থাকেন?

ঃ তারা তো কবে এখান থেকে চলে গেছেন। প্রৌঢ় নিরুৎসাহ কণ্ঠে বললেন।

ঃ কোথায় গেছেন বলতে পারেন?

ঃ আমি কি করে জানবো? হিন্দুরা যেখানে যায়, কলিকাতায়।

ঃ আপনারা কি বাড়িটা কিনে নিয়েছেন?

প্রৌঢ় এবার ক্ষেপে গেলেন। বললেন, সে খবরে তোমার দরকার কি? তুমি কি তাদের আত্মীয়? তাহলে কলিকাতায় গিয়ে তাদেরই জিজ্ঞেস কর।

তার আকস্মিক রূঢ় আচরণে বিস্মিত হলাম এবং সেখান থেকে চলে এলাম।

সেদিন আমার চোখে পানি জমেছিল। মিনুদি'রা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাকে কি একটা খবর দিয়ে যাওয়াও দরকার মনে করেননি? আমি কি তাদের চোখে শুধু মুসলমান?

ঢাকা থেকে গ্রামে ফিরে এসে আবার যখন বরিশালে গেলাম, তখন আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম। একটা নয়, মিনতি বসুর তিন তিনটা চিঠি চৌধুরী ব্রাদার্সের ডাকবাক্সে ধূলিধূসরিত হয়ে আছে। শেষ চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'তোমার খোঁজ পাচ্ছি না। হয়তো শেষ দেখা হল না। আমরা ভিটেমাটি ছেড়ে শরণার্থী হয়ে পশ্চিম বঙ্গে চলে যাচ্ছি। কপালে কি আছে জানি না ভাই। কান্নায় বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। মা তো সারাদিন কাঁদছেন। সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে আমরা কি বাঁচবো ভাই? কিন্তু এখানেও তো আর থাকা চলে না। গাফ্ফার, এবার দাঙ্গার দিনগুলোতে মনে হয়েছিল আমাদের আর রক্ষা নেই।..... পশ্চিম বঙ্গে গিয়ে যদি

কোথাও আমাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই হয়. তোমাকে আবার চিঠি লিখবো।"

মিনতি বসু আমাকে আর চিঠি লেখেননি। তার কোনো খোঁজও আর পাইনি। তবে এর কয়েক সপ্তাহ পরে কলকাতা থেকে 'সোনার বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক নলিনী কিশোর গুহের একটা চিঠি পেয়েছিলাম। সঙ্গে 'পদাতিক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। চিঠিতে লিখেছেন, "কলকাতায় চলে এসে 'সোনার বাংলার' বদলে 'পদাতিক' নামে পত্রিকা বের করেছি। তোমাকে এক কপি পাঠালাম। শ্রী প্রবোধ কুমার সান্যালকে পত্রিকাটির সম্পাদক করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে কতটা পশুতে পরিণত করে তার প্রমাণ এবার ঢাকার দাঙ্গায় পেলাম। ঢাকায় বসবাস করা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব বলে মনে হল না।"

প্রবোধ কুমার সান্যাল আমার প্রিয় লেখক। সেই কৈশোরেই 'ইচড়ে পাকা' ছেলের মতো তার 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসটি পড়েছি। কিন্তু 'পদাতিক' পত্রিকাটির পাতা উল্টে বিস্মিত হলাম। পাতায় পাতায় শুধু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ছড়াছড়ি। ভারত সরকারের কাছে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে পূর্ববঙ্গ আক্রমণের আবেদন।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবলাম, নলিনী বাবুকে চিঠির জবাবে লিখে দি, সাম্প্রদায়িকতা পূর্ববঙ্গের অনেক মানুষকে পশুতে পরিণত করেছে। কিন্তু সেই পশুত্ব যে পশ্চিমবঙ্গে তাদের মধ্যেও জাগ্রত, 'পদাতিক' তার প্রমাণ।

মিনতি বসু, মনোজ রায় চৌধুরী আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য। ১৯৪৭ সালে দেশের বুকে ছুরি চালিয়ে আমরা যে আসলে আমাদের নিজেদের বুকে ছুরি চালিয়েছি, এই সত্যটা বোধহয় বুঝতে পারেননি গান্ধী, জিন্না, নেহেরু, প্যাটেল গং। তারা যে বিষবৃক্ষের চারা রোপণ করে গেছেন তাই এখন সারা উপমহাদেশে ডালাপালা ছড়িয়ে পাশবিকতা, সন্ত্রাস, হিংস্র মৌলবাদের বিজয় ঘোষণা করছে।

১৯৫০ সালেই আমার জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ম্যাট্রিক পাস করার পর কলেজে পড়ার জন্য স্থায়ীভাবে ঢাকায় যাব ঠিক করলাম। বরিশালে আমার কলেজে পড়ার খরচ চালাবে কে? ঢাকায় গিয়ে কোনো খবরের কাগজ অফিসে পার্ট-টাইম চাকরি জুটিয়ে এই খরচ হয়তো জোটাতে পারবো। তাছাড়া বরিশাল মফস্বল শহর। ঢাকা প্রদেশের রাজধানী। সাহিত্য-সংস্কৃতিরও মুল কেন্দ্র। শুভাকাঙ্খীরা বললেন, ঢাকায় গেলেই আমি সাহিত্যচর্চার বড় পরিধি পাব, সুযোগ-সুবিধা পাব। নিজের মনেও লোভ ছিল, ঢাকায় গেলে অনেক কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হবে। পরিচিতদের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়বে। তাদের মধ্য আছেন আহসান হাবীব (তার সঙ্গে আমার তখনো পরিচয় হয়নি)। তার 'রাত্রি শেষের' কবিতার সঙ্গে আমি অনুরাগী পাঠক হিসেবে পরিচিত। আছেন আশরাফ সিদ্দিকী, আলাউদ্দিন আল আজাদ। আছেন তখনকার সদ্য পরিচিত শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (বোরহান আমার সঙ্গে একই বছরে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং ঢাকায় একই কলেজে আমরা ভর্তি হই) এবং আরো অনেকে।

ঢাকায় যাওয়ার পাকা বন্দোবস্ত হতেই বরিশাল শহরে সদর রোডের যে চৌধুরী ব্রাদার্সের দোতলায় অস্থায়ীভাবে ডেরা বেঁধেছিলাম; সেই ডেরায় গেলাম, বাক্সপত্র, বিছানা, বইপত্র গুছিয়ে প্যাকিং করার জন্য । গিয়ে দেখি, চৌধুরী ব্রাদার্সের সাইনবোর্ড নামানো হচ্ছে। বিস্মিত হয়ে চৌধুরী বাবুদের একজনের কাছে এগিয়ে গেলাম। যিনি দোকানটিতে প্রায় সময়েই বসতেন, আমার চিঠিপত্রগুলো যত্ন করে রেখে দিতেন, তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এ কি সাইনবোর্ড নামাচ্ছেন কেন?

চৌধুরী আমার কথার জবাব না দিয়ে বললেন, আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম। আপনি এসে গেছেন ভালোই হয়েছে।

বিস্ময় বাড়লো, কেন খুঁজছিলেন?

ঃআপনাকে জানাতে যে, আমরা এই দোকান বিক্রি করে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আগামী মাস থেকে আপনাকে এই দোকানের দোতালায় থাকার জন্য নতুন মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হবে।

মিনতি বসু, মনোজ রায় চৌধুরী এবং আরো অনেক হিন্দু বন্ধুর কথা চট করে মনে জাগলো। বিষাদে মনটা ভরে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন?

ঃ আপাতত কলকাতায়। তারপর ভাগ্য যেখানে টেনে নেয়।

চুপ করে রইলাম। চৌধুরী বাবু বললেন, কাল বরং একসময় দোকানে আসবেন। নতুন মালিকেরা তখন থাকবেন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। ওরাও শরণার্থী। তবে মুসলমান। বিহার থেকে এসেছেন।

বললাম, আমি ঢাকায় চলে যাচ্ছি। এই দোকানের দোতলায় থাকার পাট আমারও চুকেছে।

দু'একদিনের মধ্যে আপনাদের টাকা-পয়সা চুকিয়ে দিব। নিজের বাক্স পেটরাও নিয়ে যাব।

চৌধুরী বাবু একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, জীবনে আর হয়তো দেখা

হবে না। দোষ ঘাট নিশ্চয় অনেক হয়েছে। ক্ষমা করে দেবেন।

আমার চোখে পানি এসেছিল, তা গোপন করে বললাম, চৌধুরী দা, আপনারাও আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

এর কয়েকদিন পর বরিশালের সদর রোডের সেই দোকানটিতে গিয়ে দেখি, পাজামা পাঞ্জাবি পরা এক গোলগাল উর্দুভাষী ভদ্রলোক নতুন করে মালপত্র সাজাচ্ছেন। দোকানের মাথায় বিরাট সাইনবোর্ড—খান ব্রাদার্স।

দোকানটির চৌধুরী ব্রাদার্স থেকে খান ব্রাদার্সে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী নিয়ে আমি তখন একটি গল্প লিখেছিলাম, নাম 'হিজরত''। বরিশালের 'সাপ্তাহিক নকীব' পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়েছিল।

পনেরো

বাংলাবাজারের 'সোনার বাংলা' পত্রিকার কথা মনে হতেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল ফরাসগঞ্জের পুঁথিঘরের কথা; তার মালিক চিত্তরঞ্জন সাহার কথা। বন্ধুরা তাকে ডাকেন চিত্ত সাহা। বয়সে যারা ছোট, তাদের সকলের তিনি চিত্ত দা। হাসিখুশি বৈঠকি মেজাজের মানুষ। সাহসী এবং বন্ধুবৎসল। পাকিস্তানী আমলের বাংলাদেশে তিনি মুক্তচিন্তার এবং প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারায় এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করেন। মুক্তধারা প্রকাশনী তারই কীর্তি। স্বাধীন বাংলাদেশেও বাঙ্গালী জাতীয়তার বিকাশে, মুক্তচিন্তার গতিধারা নির্মাণে, মৌলবাদের অন্ধকার থাবা থেকে আমাদের যুব ও শিশুমনকে, মুক্ত রাখার কাজে তিনি প্রকাশনা ব্যবসায়ে যে সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ ভুমিকা নেন, তা হয়তো একদিন এ দেশের সাহিত্য প্রকাশনার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হবে।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় এক মাস অবস্থানের সময় বাংলা বাজারের 'সোনার বাংলা' অফিসে (বর্তমানে যা বিউটি বোর্ডিং) একবার যাওয়ার কথা মনে হয়েছে, কিন্তু যাওয়া হয়নি। ফরাসগঞ্জের পুঁথিঘর এবং মুক্তধারার প্রাণপুরুষ চিত্তরঞ্জন সাহার কথাও মনে পড়েছে। তবে তার কাছে না গিয়ে পারিনি। ঢাকায় পৌঁছে কয়েদিন ধানমণ্ডিতে থাকার পর স্বামীবাগে আত্মীয় খালেদের বাসায় চলে এলাম। যেদিন এলাম তার পরদিনই টেলিফোন। আর কে? চিত্তদা। সেই পরিচিত হাসিখুশি ভরা কন্ঠ। ভনিতা না করে বললেন বাসায় আছেন তো, আমি আসছি।

বললাম, চিত্তদা, ঢাকায় এসেই আপনার কথা মনে করেছি। আপনি ফরাসগঞ্জ থেকে স্বামীবাগে আসার কষ্ট স্বীকার করবেন কেন? আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবোই ।

চিত্তদা বললেন, এত বছর পর দেশে এসেছেন, আগে তো দেখা হোক। আমি গাড়িতে আসবো। কষ্ট কি? তাছাড়া আপনার বৌদি আপনাকে নেমন্তন্ন করতেও চান।

ঃ আপনার বাসায় আমার কি নেমন্তন্ন লাগে? হাসতে হাসতে বললাম।

চিত্তদা মানা শুনলেন না। দুপুরের আগেই স্বামীবাগে যে বাসায় আমি ছিলাম, সেখানে এসে হাজির হলেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের মানুষ। দেখলাম গায়ের রঙ ময়লা হয়নি। কিন্তু চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে। আগের সেই উজ্জ্বল হাসিখুশির ভাবটা একটু স্তিমিত।

দেখা হতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমার বাসায় আপনাকে যেতে হবে।

একটা দুপুরের কথা জানালেন। দৃঢ়স্বরে বললেন, ওইদিন আর কোথাও এপয়েন্টমেন্ট রাখতে পারবেন না।

বললাম, এপয়েন্টমেন্টতো রাখবোই না;আগে কাউকে কথা দিয় থাকলেও তা আপনার ওখানে যাওয়ার জন্য বাতিল করে দেব।

ঃ আরো একজনকে দাওয়াত করেছি। তিনিও আসবেন। আপনারই বন্ধু।

উৎসুক হলাম ঃ কে?

ঃ ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

বহুকাল পর সিরাজের সঙ্গে দেখা হবে, ভাবতেই মনটা খুশিতে ভরে উঠলো. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার বেদনাতেও মন ভরে গেল। তার স্ত্রী কিছুকাল আগে মারা গেছেন। সিরাজের বিয়ের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। অল্প আলাপেই এই মহিলা আমাকে আপন করে ফেলেছিলেন। বিয়ের পর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমার বৌ আপনার লেখার ভক্ত।

আমি আবার ছিলাম সিরাজের লেখার ভক্ত। তার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মত সর্বক্ষেত্রে অভিন্ন নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সখ্যে কখনো চিড় ধরেনি। যাটের দশকের শেষ দিকে তাকে আমি আমার একটা উপন্যাস উৎসর্গও করেছিলাম। বিদেশে বসে যখন কাগজে দেখেছি. সিরাজের স্ত্রী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন. তখন এই বিদূষী মহিলার মৃত্যুতে আত্মীয়

হারানোর মতো ব্যথা অনুভব করেছি। দেশে ফিরে চিত্তদার কল্যানে সেই সিরাজের সঙ্গে সহসাই দেখা হবে জেনে খুশি হলাম। আমাকে খুশি হতে দেখে চিত্তদা বললেন, আপনি খুশি হবেন জানতাম। সিরাজ সাহেব শুধু ভালো লেখক নন, একজন ভালো মানুষও।

জিজ্ঞেস করলাম। বৌদি কেমন আছেন?

ঃ আমারই মতো। চিত্তদা বললেন। একটু হাসলেন, দু'জনেই তো বুড়ো হয়েছি। এখন পারের কড়ি গুণছি। আজ আর বসবো না। ওইদিন কথা হবে ভালো করে।

বলেই তিনি উঠলেন। দরোজার কাছে গিয়ে মাথা ঘোরালেন, গাড়ি পাঠাবো আপনাকে নিতে। সময়মতো যাবেন কিন্তু।

আমি জানি, চিত্তরঞ্জন সাহাও জানেন, আর যাই করি, তার নেমন্তন্নে আমি দেরি করবো না। তার কাছে আমার অনেক ঋণ।

'সোনার বাংলা' পত্রিকার সঙ্গে আমার জানাজানি স্কুল জীবনে, চল্লিশের দশকের একেবারে শেষ দিকে, চিত্তরঞ্জন সাহা এবং তার বিখ্যাত পুঁথিঘর প্রকাশনীর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় তখন আমি কর্মজীবনে, সংসার জীবনে ঢুকেছি। ষাটের দশকের মাঝমাঝি সময় সেটা।

সাংবাদিকতা করতে করতে আমার শখ হয়েছিল নিজেই একটা ছাপাখানা করার। স্বাধীন ব্যবসা করার দুর্বুদ্ধি মাথায় গজিয়েছিল। আমি যে মোটেও ব্যবসায়ী নই, একমাত্র কলম চালানো ছাড়া আর কোনো বিদ্যে যে আমার জানা নেই, এই সহজ সত্যটা তখন আমার মাথায় ঢোকেনি। একটা ছোটখাটো প্রেস করা তখন খুব বেশি মূলধনের ব্যাপার নয়। জাপানী মেশিন, বিশেষ করে ওপিআই নামক ট্রেডেল, ডিমাই এবং ডাবল ডিমাই মেশিনের তখন ঢাকার বাজারে খুব চল। আগে জাপানী মেশিন সস্তা ছিল। পরে দাম বাড়ে এবং ভালো মেশিন হিসেবেও নাম করে। এই দামী মেশিন কিনে প্রেস ব্যবসা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমার ছিল না। কিন্তু আমার মতো অনেক নব্য ব্যবসায়ীর কপাল তখন ভালো। জাপানী মেশিনের নকল হালকা চীনা মেশিন তখন বাংলাদেশে (তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে) আসতে শুরু করেছে। দাম অবিশ্বাস্য সস্তা। তেমন টেকসই নয়। কিন্তু ছাপা চমৎকার। অন্যদিকে ইসলামপুরের এক নামকরা ফাউন্ড্রি ঠিক লাইনো টাইপের মতো চমৎকার বাংলা হরফ, প্রগতি টাইপ নাম দিয়ে বাজারে ছেড়েছেন তখন। ধারে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় টাইপ, টাইপ রাখার কাঠের সেট ও অন্যান্য সরঞ্জাম কিনলাম। নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের অধ্যক্ষ খগেন বাবুর ছিল ইউনিয়ন কো

অপারেটিভ ব্যাংক। সেখান থেকে লোন এবং আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটা নতুন চীনা ডিমাই মেশিন কিনে ফেললাম। তারপর পুরনো ঢাকার নারিন্দার শরৎ গুপ্ত রোডে মহা সমারোহে উদ্বোধন করা হয় আমার ছাপাখানার। নাম অনুপম মুদ্রণ। বাসা ছিল আজিমপুরে— তখনকার চারতলা চীনা বিল্ডিংয়ের পেছনে। সেখান থেকে নারিন্দায় চলে এসে প্রেসের দোতলায় বসবাস শুরু করলাম।

চাকরি আর ব্যবাসা দুটো একসঙ্গে হয় না। সুতরাং খবরের কাগজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রেসের জন্য কাজ আনা, তা যথাসময়ে ছেপে ডেলিভারী দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রেসের কাজেই চব্বিশ ঘন্টা যুক্ত রাখলাম। কিন্তু কিছুদিন বাজারে ঘোরাফিরার পরেই বুঝলাম, স্বাধীন ব্যবসা কথাটা শুনতে যতটা মিষ্টি, আসলে তা সকলের জন্য ততটা মিষ্টি নয়। সস্তা চীনা মেশিনের দৌলতে তখন ঢাকার অলি গলিতে ছোট ছোট প্রেস বসেছে। সবাই কাজ চায়। বাজারে ভীষণ প্রতিযোগিতা। সব কাজে আবার পয়সা নেই। বাকিতে কাজ করিয়ে নেয়ার পর অনেকের পয়সা পাওয়া যায় না।

সাংবাদিক হিসেবে নিজের নামের গুণে ছোট খাটো কাজ যে কিছু না পাচ্ছিলাম, তা নয়। তাতে কাগজ কালি মবিলের দাম, কম্পোজিটর মেশিনম্যানের বেতন, ঘর ভাড়া ইত্যাদি দিয়ে নিজের আর কিছু থাকে না। হাজার বারোশ' মুদ্রণের নাটক নভেল কম্পোজ করে, ছেপে লাভ রাখা যায় না। লাভ মেশিনের চাকা ঘুরলে। পাঁচ দশ হাজার ছাপার কাজ পেলে তবেই লাভ। কিন্তু ঢাকায় তখন পাঁচ দশ হাজার কপি বই ছাপানোর প্রকাশক কই? বই কই? মওসুমের সময় স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের লম্বা ইমপ্রেশনের বই পাওয়া যেতো। কিন্তু তার কন্ট্রাক্ট বড় বড় প্রেসের সঙ্গে। ছোটখাটো প্রেসের পক্ষে সেই প্রতিযোগিতায় টেকাই মুশকিল।

ঠিক এই সময়, প্রেস ব্যবসায়ের ছ'মাস না যেতেই যখন আমার অবস্থা প্রায় হাবুডুবু, তখন আমার তরুণ মেশিনম্যান ওয়াহাব এসে একদিন টেবিলের কাছে দাঁড়াল। সে আমাকে পছন্দ করতো। আমিও তাকে পছন্দ করতাম। সে বিশ্বস্ত এবং কর্মী স্বভাবের। কাজে ফাঁকি দিতে কখনো তাকে দেখিনি। পরেও দেখেছি, আমার প্রেসের আর্থিক অবস্থা যখন খারাপ, তখনও সে আমাকে ছেড়ে সহজে যেতে চায়নি।

এই ওয়াহাব আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই বুঝলাম, সে আমাকে কিছু বলতে চায়। জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কিছু বলবে ওয়াহাব?

ওয়াহাব বললো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি কি পুঁথিঘরের চিত্ত বাবুকে চেনেন?

ঃ নাম শুনেছি। বললাম। শুনেছি পাঠ্য বইয়ের নোট বই ছেপে প্রচুর পয়সা করেছেন। তার নোট বইয়ের রমরমা ব্যবসা। তবে তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

ওয়াহাব বললো, একবার তার সঙ্গে দেখা করলে পারতেন। এখনতো পাঠ্য বই ছাপার সীজন। তিনি অনেক নোট বই রিপ্রিন্ট করবেন। এক একটা নোট বই এক লাখ দু'লাখ ছাপা হয়। আমাদের কম্পোজ করতে হবে না। তার কম্পোজ করা এবং সেটে জাস্টিফাই করা ফর্মা এনে শুধু মেশিনে ছাপালেই হলো। লাখ লাখ ইমপ্রেশন। রাতদিন মেশিন চলবে। এই তিনমাসে যা পয়সা কামাবেন, তা দিয়ে সারা বছরের প্রেসের খরচ উঠে যাবে। প্রেস বিজনেসের নিয়মটাইতো এটা।

বললাম, ওয়াহাব, পরামর্শটা ভালোই দিয়েছো। কিন্তু চিত্তবাবুতো আমাকে চেনেন না। তিনি কি আমাকে কাজ দিতে চাইবেন?

ওয়াহাব বললো, লেখক হিসেবে বাজারে অনেকেই আপনাকে চেনে। তিনিও নিশ্চয়ই চেনেন। তাছাড়া তিনি খুব ভালো মানুষ। ছোটোখাটো প্রেসকে সাধ্যমতো সাহায্য করেন।

ওয়াহাবকে তার এই সুপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ দিলাম। বললাম, আমি টেলিফোনে এপয়েন্টমেন্ট করে আগামীকালই যাব।

চিত্ত বাবু এবং তার পুঁথিঘর তখন বাংলাদেশে খুবই পরিচিত এবং বিখ্যাত নাম। ঢাকার বাইরে গ্রামে গিয়েও দেখেছি বড় বড় গাছের সঙ্গে 'পুঁথিঘরের' নাম লেখা বোর্ড টানানো। চিত্তবাবু নোয়াখালীর লোক। চৌমুহনী, ফেনীতে তার প্রকাশনা ব্যবসায়ের শুরু। ছোটো ব্যবসা হিসেবে আরম্ভ। নিজের কর্মোদ্যোগে বড় হয়েছেন। এখন এক নামে সারা বাংলাদেশে পুঁথিঘর পরিচিত। পুঁথিঘরের নোট বই, সাজেশন বুকস, সিওর সাকসেস স্কুলের শিক্ষকেরা পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের নির্ভরযোগ্য সহায়ক বই হিসেবে গণ্য করেন।

পরদিন প্রেস থেকেই তাকে টেলিফোন করলাম। কয়েকবারের চেষ্টায় পেলাম। নাম বলতেই বললেন, আপনাকে আমি চিনি। 'ইত্তেফাকে', 'আজাদে' আপনার লেখা আমি পড়েছি।

ঃ আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। খুব ব্যস্ত মানুষ আপনি। কখন আসতে পারি? একটু ব্যগ্রভাবেই কথাটা বললাম। চিত্তবাবু না আবার বলে বসেন, এখনতো বই ছাপার সীজন, খুব ব্যস্ত আছি। তিন-চারদিন পর টেলিফোন করবেন।

কিন্তু না, সে কথা তিনি বললেন না। আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, আমার যত ব্যস্ততাই থাক, আপনার সঙ্গে কথা বলতে কোনো অসুবিধে হবে না।

আপনি আসতে চানতো, আজ এখনও আসতে পারেন।

চিত্তবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আমি এখুনি আসছি। রিকশা ডাকছি।

ওয়াহাবকে ডেকে খবরটা দিলাম। বললো, আমার মন বলছে আপনি কাজ পাবেন। এক লাখ কেন, পঞ্চাশ হাজার ইমপ্রেশনের কাজ পেলেও রাতদিন আমাদের মেশিন চলবে।

ওয়াহাবের পিঠ চাপড়ে দিয়ে 'পুঁথিঘরের', উদ্দেশ্যে রিকশায় চেপে বসলাম।

দিনটা ভালো ছিল। অক্টোবরের শেষের দিক। এখনো শীত পড়েনি। কিন্তু রোদের তেজ কমে এসেছে। মাথার উপর রিকশার হুড তুলে দেওয়ার দরকার হল না।

চিত্তবাবু তার বইয়ের দোকানের ভেতরের ঘরে দু'জন ভদ্রলোকর সঙ্গে কথা বলছিলেন। হয়তো তার স্টাফ। আমাকে দেখে তারা বাইরে চলে গেলেন। চিত্তবাবু বললেন, গাফ্‌ফার সাহেব, বসুন। চা খাবেন, না ঠান্ডা কিছু?

ঃ চা খাবো। তার সামনের চেয়ারে বসে বললাম।

চিত্তবাবু সত্যিই সুদর্শন। সাধারণত বাঙ্গালীর অতো ফর্সা গায়ের রঙ হয় না। খুবই হাসিখুশি মানুষ। কথায় কথায় হাসেন। কিন্তু চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ। একটা বৈশিষ্ট্য তার লক্ষ্য করলাম, কথা বলার সময় তিনি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তখন ভেবেছি, হয়তো তিনি আলাপের ফাঁকে ফাঁকে জরুরী ব্যবসায়ের কথাও চিন্তা করেন।

আমার জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে চিত্তবাবু প্রথমেই যে কথাটি বললেন, তা হল, গাফফার সাহেব, এ লাইনতো আপনার নয়, এ ব্যবসায়ের লাইন। এ লাইনে এসে আপনিতো নিজের ক্ষতি করবেন। আপনাকে তো ভগবান অন্য কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

ভাবলাম, আমাকে কাজ না দেয়ার জন্য চিত্তবাবু অজুহাত তৈরি করছেন। তাই একটু হতাশ কণ্ঠে বললাম, ভগবান আমাকে যে কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকুন, আপাতত আমার প্রেসের জন্য কিছু কাজ না পেলে ভগবানের কাজ করার জন্য নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না।

চিত্তবাবু বললেন, আপনি লিখুন। আমাদের জন্য লিখুন। দেশের মানুষের জন্য লিখুন। তাহলেই দেখবেন, ভগবানই আপনাকে বেঁচে থাকতে, ভালোভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবেন।

আমি তার কথায় জবাব দিলাম না। চুপ করে রইলাম।

চিত্তবাবুও আর কথা বাড়ালেন না। আমি যখন তার কাছ থেকে প্রেসের কাজ

পাওয়া সম্পর্কে এক প্রকার হতাশ, তখন তিনি আমাকে একেবারে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার প্রেসে কি ডাবল ডিমাই মেশিন আছে?

বললাম, না। আমার ডিমাই মেশিন।

ঃ আটোমেটিক না হ্যান্ডফিড্?

ঃ অটোমেটিক।

ঃ প্রিন্টিং ক্যাপাসিটি কত?

ঃ ঘন্টায় হাজার-বারো শ'।

চিত্তবাবু বললেন, তাহলে কি আপনি আমার কাজ করতে পারবেন? আমার সকল বই ষোল পৃষ্ঠায় ফর্মা। ডাবল ডিমাই মেশিনে রাত দিন ছাপলে এক লাখ দেড়-লাখ ইমপ্রেশন সময়মতো শেষ করা যায়। আপনি ডিমাই মেশিনে আট পৃষ্ঠা করে কতদিনে ছাপবেন?

ঃ চব্বিশ ঘন্টা মেশিন চলবে।

ঃ মেশিনেরও তো রেস্ট দরকার। চিত্তবাবু বললেন।

আরেকবার ভাবলাম, তিনি এবার বলবেন, নাহ্ আপনাকে কাজ দিতে পারলাম না। দুঃখিত। কিন্তু চিত্তবাবু সেকথা বললেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার প্রেসে কাগজ রাখার গোডাউন আছে?

ঃ আছে।

ঃ কতটা কাগজ ধরে?

ঃ পঞ্চাশ-ষাট রিম।

চিত্তবাবু হাসলেন, প্রথম লটেই আপনার কাছে পাঁচশ' রিম কাগজ যাবে। প্রেসে জায়গা করতে পারবেন?

মাথা চুলকে বললাম, করতে হবে। অফিস রুম থেকে চেয়ার টেবিল সরিয়ে সেখানেও কাগজ রাখবো।

চিত্তবাবু এবার আর কথা বললেন না। ভাবলাম, এবার তিনি সেই চরম ও চূড়ান্ত কথাটি বলবেন, আপনাকে কাজ দিলে আপনি সামলাতে পারবেন না। আপনার বড় মেশিন নেই। কাগজ রাখারও জায়গা নেই।

কিন্তু এবারেও তিনি সে কথাটি বললেন না। চা এসে গেল। সঙ্গে বিস্কিট। তিনি আমার দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, আমার যে বইগুলো জরুরী দরকার নয়, সেই বইগুলোর দু'তিন ফর্মা করে আপনাকে দেব। এগুলোর পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ ইমপ্রেশন। বেশি ইমপ্রেশন। তাই আমার রেট কম। কিন্তু বড় প্রেসকে যে রেট দেই আপনাকে তাই দেবো। কাল গুদাম আর অফিসঘরটা খালি করে রাখবেন। কাগজ যাবে। পাঁচশ' রিমের মতো। সঙ্গে ফর্মা। পরে আরো

কাগজ যাবে। ডেলিভারিটা যাতে সময়মতো পাই, সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। আমি আপনার সম্পর্কে জহরলালকে এখনই বলে দিচ্ছি।

আমি তখন বিস্মিত ও চমকিত। মনে মনে ভাবলাম, এই জহরলাল আবার কে?

ষোল

চৌমুহনীর পুঁথিঘরের চিত্ত সাহা থেকে ঢাকার মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহাতে রূপান্তর পর্যন্ত চিত্তবাবুর যে ইতিহাস, তা পাকিস্তানী আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতার আমল পর্যন্ত বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য প্রকাশনার সবচাইতে শক্তিশালী প্রগতিশীল ধারাটির সঙ্গে যুক্ত। পাঠ্য বই– বিশেষ করে পাঠ্য বইয়ের সহায়ক অর্থ বই বা নোট বইয়ের প্রকাশক হিসেবে তার যাত্রা শুরু; কিন্তু মধ্যেপথে এসে তিনি প্রগতিশীল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও প্রকাশক হিসেবে যে ভূমিকাটি গ্রহণ করেন, তা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ও উজ্জ্বল ভূমিকা। এই ভূমিকা অভিজাত এলিট ক্লাশের পাঠকের জন্য কলকাতার সিগনেট প্রেসের মালিকের ভূমিকা নয়; আমি বরং চিত্তবাবুর এ ভূমিকাকে তুলনা করবো এই শতকের গোড়ায় ও মধ্যভাগে গণমানুষের দুয়ারে সৎ সাহিত্যকে সস্তায় ও সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য কলকাতার বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের মালিকেরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তার সঙ্গে।

আমি যখন ইস্কুলের ছাত্র, তখন আমাদের গ্রামে উলানিয়ায় জমিদার পরিবারের সদস্যদের কারো কারো ব্যক্তিগত পাঠাগার অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এ পরিবারের প্রয়াত বিখ্যাত সাহিত্যিক ফজলুর রহিম চৌধুরীর ব্যক্তিগত পাঠাগারে ধর্মীয় বই, ইতিহাস, ক্লাসিক সাহিত্য, উপন্যাস, মহাকাব্য তো ছিলই, এমনকি দীনেন্দ্র কুমার রায়ের তখনকার আমলের জনপ্রিয় রহস্য কাহিনী ব্লেক সিরিজের বইও ছিল। ছিল পাঁচকড়ি দে'র রহস্য উপন্যাসগুলো— যেমন 'নীলবসনা সুন্দরী; 'হত্যাকারী কে' ইত্যাদি বই। কবি আসাদ চৌধুরীর বাবা আরফি চৌধুরীর ব্যক্তিগত পাঠাগারটি ছিল রাজনৈতিক বইয়ে ঠাসা। তার শ্যালক সৈয়দ আব্বাস আলি চৌধুরী, তখন কলকাতা থেকে বই, সাহিত্য পত্রিকা এনে তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীটি সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন। আব্বাস আলি অল্প বয়সে গুটিবসন্ত রোগে মারা যান। তাছাড়া উলানিয়া করোনেশন হাই ইংলিশ ইস্কুলের পাঠাগারটিও তখন ছিল এখনকার কোনো শহরের ইস্কুলের পাঠাগারের চাইতেও সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়।

বিভাগপূর্ব বাংলাদেশে এই যে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য সাধারণ এবং ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়ে উঠেছিল, তার মূলে বিরাট অবদান ছিল কলকাতার বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের। সাধারণ মানুষের দুয়ারে দুয়ারে সৎ সাহিত্যকে পৌঁছাতে হবে, এই লক্ষ্য থেকে তারা সস্তায় বড় বড় লেখকদের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে শুরু করেন। সাধারণ বইয়ের সাইজের দ্বিগুণ আকারে এই গ্রন্থাবলী বেরুতো। ছাপা হতো একটু টেকসই নিউজপ্রিন্টে এবং প্রতিটি গ্রন্থাবলীর দাম রাখা হতো দেড় টাকা থেকে দু'টাকা। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সমগ্র বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর দাম ছিল দু'টাকা। এইভাবে বাংলাদেশের সকল বিখ্যাত লেখকের সুলভ সংস্করণ গ্রন্থাবলী তারা প্রকাশ করেছিলেন এবং সাধারণ পাঠকদের মধ্যে এই বই কেনার ধুম পড়ে গিয়েছিল। আমার মনে আছে, আমি যখন গ্রামের ইস্কুলের ষষ্ঠ কি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন স্যার ওয়াল্টার স্কটের সমস্ত ইংরেজী উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ পড়ে শেষ করেছি। তার মধ্যে ছিল 'আইভান হো' 'টালিসম্যানের' মতো উপন্যাস। বসুমতী সাহিত্য মন্দির বড় বড় ইংরেজ সাহিত্যিকের উপন্যাসের অনুবাদ গ্রন্থাবলীও প্রকাশ. করেছিলেন। বাঙালি লেখকদের বইয়ের মধ্যে ছিল সৌরিন্দ্রমোহন গ্রন্থাবলী, প্রভাতকুমার গ্রন্থাবলী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী গ্রন্থাবলী ইত্যাদি। অন্ততঃ জনা পঁচিশেক নামকরা লেখকের গ্রন্থাবলীতো ছিলই।

বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার পর বাংলা সাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে কিছুকাল ছিল বন্ধ্যাযুগ। ঢাকায় প্রকাশনা শিল্প তখনো গড়ে ওঠেনি। কলকাতা থেকেই বইপত্র আসতো। পাকিস্তানী শাসকদের সেটাও সহ্য হয়নি । তারা উর্দুর ছুরিতে বাংলাকে জবাই করার জন্য কলকাতা থেকে বাংলা বইপত্র, সাহিত্য পত্রিকা, এমন কি খবরের কাগজ আসাও ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেন। দুই বাংলার মধ্যে গড়ে তোলা হয় সাংস্কৃতিক বার্লিন ওয়াল। এভাবে বিভেদের পাঁচিল গড়ে তুলে তারা আশা করছিলেন, বাঙালি মুসলমানকে বাংলা ভাষা বিমুখ করবেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক হাজার বছরের ঐতিহ্য ও ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঙালি মুসলমানকে পশ্চিম পাকিস্তানের কালচারাল স্লেভে পরিণত করবেন এবং তখনকার অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক শাসন করবেন নিরঙ্কুশ।

তাদের এই চক্রান্ত হয়তো সফল হতো, যদি দেশ ভাগ হওয়ার এক বছর না পূরতেই (১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে) বাংলা ভাষার আন্দোলন শুরু না হতো; ঢাকার বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজের সচেতন অংশ এই আন্দোলনে এগিয়ে না আসতেন এবং পরবর্তীকালে বাংলা বইয়ের কিছু প্রকাশক ব্যবসায়ী মুনাফা বা অন্য যে উদ্দেশ্যেই হোক, ঝুঁকি নিয়ে বাংলা বই প্রকাশের নানা রকমের কৌশল গ্রহণ না করতেন। এদের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে যিনি ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স নামে লাভজনক

প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন, সেই প্রয়াত রুহুল আমিন নিজামীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো।

তখন সেই ষাটের দশকের আইয়ুবী জমানায় মনে হয়েছিল, নিজামী একজন লোভী ও অসাধু ব্যবসায়ী। তিনি কলকাতার অধিকাংশ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও ছোট-গল্প লেখকের বই বিনা অনুমতিতে সুলভ ঢাকা সংস্করণ হিসেবে প্রকাশ করতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দের বইয়েরও তিনি ঢাকা সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এসব বইয়ের বিপুল কাট্‌তি ছিল । ঢাকায় এক সঙ্গে হাজার হাজার কপি ছাপা সম্ভব না হলে তিনি লাহোরে অফসেট প্রেসে এসব বই ছেপে আনতেন।

মোটাবুদ্ধি পাকিস্তানী শাসকেরা তার এই কৌশলের মর্ম উপলদ্ধি করতে পারেনি। কথায় বলে বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো। পাকিস্তানী শাসকদের বেলাতেও তা সত্য হয়েছে। তারা দুই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ ও লেনদেন বন্ধ করে দিয়ে ভেবেছিলেন 'সব কিছু ঠিক হো যায়ে গা'। কিন্তু কিছুই ঠিক হলো না। রুহুল আমিন নিজামী এবং পরে তাকে অনুসরণকারী আরো কিছু প্রকাশকের মাহাত্ম্যে তখনকার পুর্ব পাকিস্তান কলকাতার বাংলা বই, এমন কি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বইতে ভরে গেল। পুর্ব পাকিস্তানে বাঙালির নতুন প্রজন্মকে তার সাহিত্য-সংস্কৃতির হাজার বছরের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা গেল না। এই পাইরেটস সাহিত্যের মাধ্যমেই নতুন বাঙ্গালি মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে এক বিরাট পাঠকগোষ্ঠী গড়ে উঠলো। রুহুল আমিন নিজামী এবং তার মতো আরো দু'চারজন প্রকাশক দুষ্ট ব্যবসায়ী বুদ্ধি এবং অতি মুনাফার লোভেই হয়তো তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে কলকাতার বইয়ের অবৈধ ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন; কিন্তু নিজেদের অজান্তেই তারা এই ব্যবসায়ের দ্বারা পাকিস্তানী আমলের বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মুল ধারাটিকে রক্ষার জন্য যে ভুমিকা নিয়েছেন এবং পাকিস্তানী শাসকদের 'কালচারাল কনসপিরেসি' ব্যর্থ করেছেন, তাও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার মতো।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি যখন কলকাতায় ছিলাম, তখন জনপ্রিয় কথাশিল্পী সমরেশ বসু আমাকে 'আনন্দবাজার' অফিসের বৈঠকি আলাপে একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "রুহুল আমিন নিজামী আমার বহু বই আমার বিনা অনুমতিতে ঢাকায় প্রকাশ করে বহু টাকা কামিয়েছেন বলে শুনেছি। পাকিস্তানী আমলের বিধিনিষেধের জন্য তার বিরুদ্ধে বইয়ের স্বত্ত্ব ও লেখকের দক্ষিণা সংক্রান্ত মামলা করার সুযোগ সুবিধা আমাদের পশ্চিম বঙ্গের লেখকদের ছিল না। তবু আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। পাকিস্তানী আমলে এমনিতেই ঢাকায় বৈধভাবে

কলকাতার লেখকদের বই প্রকাশ হতো না; লেখক হিসেবে টাকা পাওয়া দুরের কথা। সুতরাং নিজামী আমাকে আমার পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছেন এই অভিযোগ তুলবো না। বরং তিনি যে আমাকে পুর্ব পাকিস্তানের লাখ লাখ বাঙালি পাঠকের কাছে পৌছে দিয়েছেন, তাদের কাছে আমাকে লেখক হিসেবে পরিচিত রেখেছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন, এজন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

রুহুল আমিন নিজামীর মৃত্যুর খবর শুনে আমারও মনে হয়েছে, বাংলাদেশে পাকিস্তানী আমলের কোনো বই প্রকাশকের মর্মর মুর্তি যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে নিজামীর নয় কেন? বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ ছিলেন একজন প্রতারক এবং জালিয়াত। পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে তিনি লণ্ডনে ফিরে গেলে বৃটিশ জনগণ তাকে প্রতারণা ও জালিয়াতির জন্য ক্ষমা করেনি। তাকে মামলায় ঝুলিয়েছে। ক্লাইভকে আত্মহত্যা করে বিচার এড়াতে হয়েছিল। কিন্তু সেই ক্লাইভেরই বিরাট মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে লণ্ডনে রাজ প্রশাসনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের জনক ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাকে শ্রদ্ধা জানানো এখনো অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশেও এমন অনেক মানুষ আছেন, যাদের ব্যক্তিগত জীবন হয়তো প্রশংসনীয় নয়, কিন্তু দেশ ও জাতির জন্য তাদের কোনো একটি ভূমিকা হয়তো চিরস্মরণীয়।

চিত্তরঞ্জন সাহার কথা বলতে গিয়ে রুহুল আমিন নিজামীর কথা এসে গেলো। যদিও প্রকাশক হিসেবে এই দু'জনের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। চিত্তবাবু কখনো পাইরেট সাহিত্যের ব্যবসা করেননি। তিনি সব সময় ব্যবসায়ের সদর রাস্তায় মাথা উঁচু করে হেঁটেছেন। অলিতে-গলিতে টুঁ মারেননি। তবু পাঠ্য বইয়ের সহায়িকা নোট বইয়ের প্রকাশক হিসেবে প্রথমদিকে কেউ কেউ পুঁথিঘরের নামে নাক ছিটকেছেন। কিন্তু পরে তারা উপলব্ধি করেছেন চিত্তবাবু সিরিয়াস প্রকাশক। তিনি বটতলার সস্তা নোট বইয়ের প্রকাশক নন। তাঁর বইগুলো উন্নতমানের। ফলে অল্পদিনের মধ্যে সারা বাংলাদেশে পুঁথিঘরের অর্থ-পুস্তকের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা এত বেড়ে যায় যে, পাঠ্য বইয়ের সীজনে লাখ লাখ বই ছেপেও চিত্তবাবু কূল পেতেন না। প্রথমদিকে তিনি সাহিত্য প্রকাশনায় হাত দেননি। হাত দিয়েছেন তার প্রকাশনা ব্যবসায়ের ভিত্তি শক্ত হওয়ার পর। বাংলা সাহিত্যকে পাকিস্তানী শাসকদের থাবা থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি কলকাতার সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হননি; ঢাকার লেখকদের উৎসাহ দিয়েছেন, পৃষ্ঠপোষকতা জুগিয়েছেন এবং তাদের বইয়ের বাজার সৃষ্টি করেছেন। পুঁথিঘরের বই ডিষ্ট্রিবিউশনের দেশময় ছড়ানো শাখা-প্রশাখাকে তিনি সৎ সাহিত্যের বাজার সৃষ্টি করারও কাজে লাগিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রগতিশীল

ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন মুক্তধারা প্রকাশনী। মুক্তধারার মুক্ত চিন্তার বইয়ের প্রচার ও প্রসারতার জন্য এসকল বইয়ের আলোচনা নিয়ে একটি সাময়িকীও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পে যে ভূমিকাটির জন্য চিত্তরঞ্জন সাহা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, সে ভূমিকাটির কথা আমি পরে লিখবো। তার আগে পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ষাটের দশকের সেই মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় ছাপাখানার ব্যবসায়ে ঢুকে প্রাথমিক আর্থিক সঙ্কট চিত্তবাবুর সাহায্যেই কাটিয়ে উঠেছিলাম। পাঠ্য পুস্তকের সেই সারা মৌসুমেই তিনি আমার প্রেসে কাজ দিয়েছেন। জহরলাল সাহা তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তখন ছিলেন চিত্তবাবুর ডান হাত। ছাপার কাজ থাকলেই জহরলাল আমাকে টেলিফোন করতেন; কখনো বা ঠেলাগাড়ি বোঝাই রিমের পর রিম সাদা কাগজ পাঠিয়ে দিতেন। বিলের টাকার জন্যও আমাকে কখনো তাগাদা দিতে হয়নি। চাইলেই টাকা পেতাম। কখনো কখনো অগ্রিমও।

অল্পদিনেই চিত্তবাবুর সঙ্গে ব্যবসায়ের সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়ালো। আমি ব্যবসা করি এটা তিনি কখনো পছন্দ করেননি। প্রায়ই বলতেন, আপনি ব্যবসা ছাড়ুন। লেখার জগতে পুরোপুরি ফিরে যান। নিজেকে নষ্ট করবেন না।

একদিন বললেন, গাফফার সাহেব, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে একটা কথা আছে। স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়, পর ধর্ম ভয়াবহ।" অর্থ, নিজের ধর্মে অটল থেকে মৃত্যু হলেও ভালো। পরের ধর্ম আশ্রয় করে বাঁচোয়া নেই। কথাটা আপনাকে বলছি। আপনার ধর্ম হল লেখা। এই লেখার জগতে থাকতে গিয়ে আপনার মৃত্যু হলেও ভালো। ব্যবসা আপনার জন্য পরধর্ম। এই পরের ধর্ম গ্রহণ করে আপনি শান্তি পাবেন না; বাঁচতেও পারবেন না।

চিত্তবাবু ব্যবসায়ী হলেও লেখাপড়া জানা, সংস্কৃতিমনা মানুষ। তার একটা রাজনৈতিক মত নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই মতটা কি তা বহুদিন অনুমান করতে পারিনি। তিনি একজন সারভাইভালিস্ট। পাকিস্তানের আমলে হিন্দু ব্যবসায়ী হয়ে তাকে নিজের দেশে এবং ব্যবসায়ে টিকে থাকার জন্য বহু কৌশল খাটাতে হয়েছে। নিজের রাজনৈতিক মত চেপে রাখতে হয়েছে। প্রথমদিকে তাকে ধুতিপাঞ্জাবী পরতে দেখেছি। পরে দেখলাম, তিনি পাঞ্জাবীর সঙ্গে পাজামা ধরেছেন। ওই ষাটের দশকেই একদিনের কথা মনে আছে। তিনি তখন ফরাশগঞ্জের বর্তমান বিরাট ভবনে তার হেড অফিস স্থানান্তর করেছেন। তিনি তেতালায় থাকেন। নীচে বিরাট বুক বাইণ্ডিংয়ের কারখানা। প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই দোতলার সামনের ঘরটা তার অফিস।

সেদিন দুপুরের একটু আগে কি কারণে তার ফরাশগঞ্জের অফিসে গিয়েছিলাম, মনে নেই। এই প্রথমবার তার অফিসে গেলাম। চিত্তবাবু অফিসেই ছিলেন। একটা বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার পেছনে বড় একটা চেয়ারে তিনি বসা। টেবিলের সামনের দিকেও বাইরের লোকদের জন্য চেয়ার পাতা। চিত্তবাবুর পেছনের দেয়ালেই মোনায়েম খানের একটা বিরাট আবক্ষ ছবি। মোনায়েম খান তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর। মীরজাফরকে বলা হতো ক্লাইভের গাধা। এ আমলে মোনায়েম খান ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহল ও ছাত্র সমাজে পরিচিত ছিলেন আইয়ুবের গাধা নামে। তার দুঃশাসনে জনজীবন তখন অতিষ্ঠ। সেই মোনায়েম খানের ছবি পুঁথিঘরের চিত্তরঞ্জন সাহার অফিসের দেয়াল ঘরে? বললাম, চিত্তদা, ব্যাপারটা কি?

জানতাম চিত্তবাবুর সেন্স অব হিউমার অত্যন্ত প্রখর। বললেন, যস্মিন দেশে যদাচারেৎ।

ঃ একটু খুলে বলুন।

চিত্তবাবু তার টিপিক্যাল হাসিটা দিলেন। বললেন, এটা যদি হিন্দুর দেশ হতো, তাহলে ওখানে কি দেখতেন জানেন? একটা হাতীর শুঁড়ের মতো নাকওয়ালা গণেশের ছবি। নীচে লেখা থাকতো, শ্রী শ্রী গণেশায় নমঃ। এটা মুসলমানের দেশ। তাই বাদশার ছবি টানিয়ে রেখেছি। এখন তিনিই আমার রক্ষাকর্তা, সিদ্ধিদাতা গণেশ!

এরপর আর কথা চলে না।

বাংলাদেশ যখন ছয়-দফার আন্দোলনে উত্তাল তখন চিত্তবাবুর সঙ্গে আর আগের মতো সম্পর্ক রইলো না। দেখাসাক্ষাৎও কম হতো। আমি ততদিনে 'আওয়াজ' নাম দিয়ে নিজের প্রেস থেকে একটি সান্ধ্য দৈনিক বের করেছি। ছয়-দফা আন্দোলনে জোর সমর্থন দিচ্ছি। ঠিক এই সময় একদিন ফরাসগঞ্জের রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা। টেনে অফিসে নিয়ে গেলেন। নারকেলের নাড়ু, সন্দেশ আর শীতল ডাবের পানি খেতে দিলেন। বললেন, আপনাকে বললাম, লেখার জগতে ফিরে যান। আপনি ব্যবসা ছেড়ে একদম রাজনীতিতে নেমে গেলেন। এই দুঃসময়ে একটি দৈনিক পত্রিকা চালাবার ভার নিয়েছেন। তাও মিলিটারি সরকারের বিরুদ্ধে। ওরা আপনাকে ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করবে।

বললাম, চিত্তদা, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? দেশের, বাঙালির এই দুর্দিনে কোনো সুস্থ, বিবেকবান বাঙালির পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব?

ঃ আপনাকেতো চুপ থাকতে বলিনি। এই আন্দোলনকে আপনার লেখা দিয়ে আপনি সাহায্য জোগাতে পারতেন। আপনি তা না করে সোজাসুজি রাজনীতিতে নেমেছেন, কাগজ চালানোর বিরাট আর্থিক ঝুঁকি নিয়েছেন।

কৌতূহল হল। হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা চিত্তদা, আপনি ছয়-দফার আন্দোলন সমর্থন করেন?

চিত্তবাবু মৃদু হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের একজন হিন্দু ব্যবসায়ীর এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি নিরাপদ?

ঃ নিজেকে কেন আপনি হিন্দু ব্যবসায়ী বলেন ? আমার কণ্ঠে নিশ্চয়ই একটু উত্তাপ দেখা দিয়েছিল।

চিত্তবাবু শান্ত কণ্ঠে বললেন, দেশটাকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে নিজেকে বাঙালি বলার কোনো সুযোগ আপনারা রেখেছেন কি ?

আমি বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। তিনি কথাটা সিরিয়াসলি বলছেন, না ঠাট্টা করে, তা সেদিন বুঝতে পারিনি।

সতেরো

ছয়-দফা আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলোতে পুঁথিঘরের চিত্ত রঞ্জন সাহার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিংবা ব্যবসায়ী সম্পর্ক আর রইলো না। আমার প্রেসে কমার্শিয়াল কাজ করা তখন বন্ধ করে দিয়েছি। কেবল সান্ধ্য দৈনিক 'আওয়াজ' পত্রিকা বের করি। ছোট প্রেস। একটি ডাবল ক্রাউন সাইজের চার পাতার কাগজ বের করতেই হিমসিম খেতে হয়। চিত্ত বাবুর সঙ্গে কেন, অনেকের সঙ্গেই তখন আমার দেখা সাক্ষাৎ করা বা সামাজিকতা রক্ষার সম্পর্ক ছিল না।

কাগজ চলছিল ভালোই। 'ইত্তেফা'কে মানিক মিয়া নানা কারণে তখন ছয়-দফাকে ঢালাও সমর্থন দিতে পারছেন না। ('ইত্তেফাক' নিষিদ্ধ করার কিংবা সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ করার ভয় ছিল। কিছু পরেই 'ইত্তেফাক' শুধু নিষিদ্ধ করা নয়, তার প্রেস এবং ভবনও আইয়ুব-মোনায়েম সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন)। 'আওয়াজে' সে সমর্থন আমি দিচ্ছিলাম। এমন কিঢাকা, লাহোর, করাচী ও রাওয়ালপিণ্ডি থেকে প্রকাশিত সরকারী কাগজ- গুলোতে ছয়-দফার বিরুদ্ধে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছিল, তারও জবাব দিচ্ছিলাম। আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য একাধিক মামলায় আমাকে আসামী করা হয়েছিল। একটি মামলা মোনায়েম খাঁ করিয়েছিলেন তার মন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসিতের দ্বারা। এক লাখ টাকার মানহানির মামলা। আমার বিরুদ্ধে ননবেইলেবল ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছিল। আমি কিছু দিন গা ঢাকা দিয়েছিলাম। বিস্ময়ের কথা, আমাকে রক্ষা করার জন্য বিনা ফিতে আমার

উকিল হয়েছিলেন শাহ্ আজিজুর রহমান। মুসলিম লীগ তখন দু'ভাগে বিভক্ত। সরকারী মুসলীম লীগের নাম কনভেনশন মুসলিম লীগ। সরকার বিরোধী মুসলিম লীগের নাম কাউন্সিল মুসলীম লীগ। শাহ্ আজিজুর রহমান তখন কাউন্সিল মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ছিলেন।

আরো একটি বড় মামলা তখন আমার বিরুদ্ধে করা হয়েছিল। করেছিলেন লালবাগের জগন্নাথ সাহা রোডের এক ধনী ব্যবসায়ী ফজলুল করিম। তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। সান্ধ্য-দৈনিক 'আওয়াজ' কাগজটিকে সাহায্য করার জন্য তিনি আমাকে টাকা দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তখনকার একটি ব্যাংক (ইউনিয়ন ব্যাংক) থেকে প্রেসের জন্য দু'হাজার টাকা ঋণ নেয়ার সময় তিনি আমার জামিন হয়েছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে বুঝলাম, ফজলুল করিম কনভেনশন লীগের নেতা এবং মোনায়েম খাঁর মন্ত্রী কাজী কাদেরের বশংবদ লোক। মোনায়েম খাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিবাদে কাজীছা-পোষা সাংবাদিক পরাক্রান্ত রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকতে পারবো কি? ঠিক এই সময় চিত্তরঞ্জন সাহার সঙ্গে আকস্মিকভাবে আবার দেখা। তাও রাস্তায়। তিনি রিকশায় চড়ে যাচ্ছিলেন। আমি পদাতিক। সম্ভবতঃ বাংলাবাজারের রাস্তায়।. আমাকে দেখে তিনি রিকশা থামালেন এবং নেমে আসলেন। বললেন, বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। কেমন আছেন?

বললাম, ভালো নেই। দেনায় ডুবছি । সরকার এবং সরকারী দলের রোষে পড়েছি।

তাকে মামলা মোকদ্দমাগুলোর কথা ভেঙে বললাম।

চিত্তবাবু বললেন, আমি আপনাকে আগেই সাবধান করেছিলাম, আপনি সাপের লেজে পা রাখতে যাচ্ছেন। ভেবে চিন্তে রাখবেন।

ঃ এখন কি করি ? তার কাছে সকাতর পরামর্শ চাইলাম।

চিত্তবাবু হাসলেন, আপনাকে আমি কোনো পরামর্শ দিতে পারবো না। তবে আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে এ অবস্থায় কি করণীয় বলা হয়েছে, তা আপনাকে বলতে পারি।

ঃ বলুন।

ঃ কর্মযোগে মৃত্যুই শ্রেয়, আত্মসমর্পণ নয়। আত্মসমর্পণে আত্মার মৃত্যু হয়। কর্মযোগে মৃত্যুতে আত্মার নবজন্ম হয়। বিনাশ হয় না।

চিত্তবাবু সম্ভবতঃ সংস্কৃত কিছু শ্লোকও বলেছিলেন, তা মনে নেই এবং ডায়েরীতেও টুকে রাখতে পারিনি।

সেদিন আর কথা হয়নি। চিত্তবাবু রিকশায় উঠে চলে গেলেন। আমি বাসায় ফিরে এলাম। ঠিক সময়ে ফজলুল করিমকে টাকা দিতে না পারায় তিনি মামলা

করলেন। প্রেসের মালপত্র মেশিন ক্রোক করার পরোয়ানা বের করলেন। প্রেসের মেশিনপত্র ক্রোক করা হলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবে, এটাই সম্ভবতঃ আশা করেছিলেন। তাহলে আওয়ামী লীগ ও ছয়-দফা আন্দোলন সমর্থন করার আর কোনো কাগজ থাকে না। 'ইত্তেফাক' ততদিনে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

এবারও সাহায্য এলো বিস্ময়করভাবে। তখন পুরনো ঢাকার হাটখোলা রোডের কাছে অভয় দাস লেনে থাকতেন সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এডভোকেট ফরিদ আহমদ। তখন তিনি নেজামে ইসলাম দলের নেতা।(পরে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদারদের কোলাবরেটর হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে শোচনীয়ভাবে নিহত হন)। তিনি আমার পক্ষে উকিল হিসেবে দাঁড়ালেন। প্রেসটি ক্রোক পরোয়ানা থেকে রক্ষা করলেন। দেনার মামলাটি আমার মাথার উপর ঝুলে রইল। পরে আমার উকিল হিসেবে এই মামলা চালান আওয়ামী লীগের নেতা জিল্লুর রহমান। তিনি একটি নয়, একাধিক মামলা থেকে আমাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করেন।

কাদের তখন মন্ত্রীত্ব হারিয়েছেন। কিন্তু আইয়ুব খানের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন কাজী কাদের। তাই মোনায়েম খাঁ তার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষতি করতে পারছিলেন না। ফজলুল করিমের মাধ্যমে কাজী কাদের আমাকে চাপ দিলেন, আমি 'যেন 'আওয়াজে' শেখ মুজিব ও ছয়-দফার পক্ষে না লিখি। বরং আইয়ুব খান ও কনভেনশন লীগকে সমর্থন দেই। তবে কনভেনশন লীগের ভেতরে যে মোনায়েম খাঁ ও সবুর খাঁ বিরোধী গ্রুপ আছে, তাদের সমর্থন দেয়ার জন্য মোনায়েম ও সবুর খাঁর বিরুদ্ধে লেখালেখি করতে পারি।

আমি এই প্রস্তাবে রাজি হলাম না। ফজলুল করিম ব্যাংকে আমার ঋণের জন্য জামিন হয়েছিলেন, তা প্রত্যাহার করলেন এবং তার কাছে আমার যে ব্যক্তিগত ঋণ তা অবিলম্বে শোধ করার জন্য চাপ দিলেন। নইলে মামলা করবেন জানালেন। এই মামলা থেকে আমার বাঁচার একমাত্র উপায়, কারাবন্দী শেখ মুজিব ও ছয়-দফার বিরুদ্ধে কলম ধরা। স্বীকার করবো, আমার মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, দুর্বলতা ছিল। ছা-পোষা সাংবাদিক পরাক্রান্ত রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকতে পারবো কি?

ঠিক এই সময় চিত্তরঞ্জন সাহার সঙ্গে আকস্মিকভাবে আবার দেখা। তাও রাস্তায়। তিনি রিকশায় চড়ে যাচ্ছিলেন। আমি পদাতিক। সম্ভবতঃ বাংলাবাজারের রাস্তায়। আমাকে দেখে তিনি রিকশা থামালেন এবং নেমে আসলেন। বললেন, বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। কেমন আছেন?

বললাম, ভালো নেই। দেনায় ডুবছি। সরকার এবং সরকারী দলের রোষে পড়েছি।

তাকে মামলা মোকদ্দমাগুলোর কথা ভেঙে বললাম।

চিত্তবাবু বললেন, আমি আপনাকে আগেই সাবধান করেছিলাম, আপনি সাপের

লেজে পা রাখতে যাচ্ছেন। ভেবে চিন্তে রাখবেন।

ঃ এখন কি করি? তার কাছে সকাতর পরামর্শ চাইলাম।

চিত্তবাবু হাসলেন, আপনাকে আমি কোনো পরামর্শ দিতে পারবো না। তবে আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে এ অবস্থায় কি করণীয় বলা হয়েছে, তা আপনাকে বলতে পারি।

ঃ বলুন।

ঃ কর্মযোগে মৃত্যুই শ্রেয়, আত্মসমর্পণ নয়। আত্মসমর্পণে আত্মার মৃত্যুর হয়। কর্মযোগে মৃত্যুতে আত্মার নবজন্ম হয়। বিনাশ হয় না।

চিত্তবাবু সম্ভবঃ সংস্কৃত কিছু শ্লোকও বলেছিলেন, তা মনে নেই এবং ডায়েরীতেও টুকে রাখতে পারিনি।

সেদিন আর কথা হয়নি। চিত্তবাবু রিকশায় উঠে চলে গেলেন। আমি বাসায় ফিরে এলাম। ঠিক সময়ে ফজলুল করিমকে টাকা দিতে না পারায় তিনি মামলা করলেন। প্রেসের মালপত্র মেশিন ক্রোক করার পরোয়ানা বের করলেন। প্রেসের মেশিনপত্র ক্রোক করা হলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবে, এটাই সম্ভবতঃ আশা করেছিলেন। তাহলে আওয়ামী লীগ ও ছয়-দফা আন্দোলন সমর্থন করার আর কোনো কাগজ থাকে না। 'ইত্তেফাক' ততদিনে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

এবারও সাহায্য এলো বিস্ময়করভাবে। তখন পুরনো ঢাকার হাটখোলা রোডের কাছে অভয় দাস লেনে থাকতেন সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এডভোকেট ফরিদ আহমদ। তখন তিনি নেজামে ইসলাম দলের নেতা। (পরে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদারদের কোলাবরেটর হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে শোচনীয়ভাবে নিহত হন)। তিনি আমার পক্ষে উকিল হিসেবে দাঁড়ালেন। প্রেসটি ক্রোক পরোয়ানা থেকে রক্ষা করলেন। দেনার মামলাটি আমার মাথার উপর ঝুলে রইল। পরে আমার উকিল হিসেবে এই মামলা চালান আওয়ামী লীগের নেতা জিল্লুর রহমান। তিনি একটি নয়, একাধিক মামলা থেকে আমাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করেন।

চিত্তরঞ্জন সাহার কথাটি এখানে এ জন্যই উল্লেখ করলাম যে, এত মামলা মোকদ্দমার মুখে যদি সেদিন তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা না হতো, তার মুখে উদ্দীপনাময় সংস্কৃত শ্লোক শুনে মনোবল না বাড়তো, তাহলে হয়তো আত্মসমর্পণের পথই বেছে নিতাম।

ছয় দফার আন্দোলন, 'আগরতলার' মামলা, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, শেখ মুজিবের মুক্তি, পিন্ডিতে ব্যর্থ গোল টেবিল বৈঠক, আইয়ুব–মোনায়েম শাহীর পতন ইত্যাদি শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা প্রবাহের ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে তখন দেশ কিছুটা স্থিতিশীল; আমার জীবনও অনেকটা সুস্থির। জেনারেল ইয়াহিয়া তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। ঢাকায় 'অবজার্ভার গ্রুপ' থেকে 'পূর্বদেশ' নামে একটি নতুন দৈনিক পত্রিকা

বেরিয়েছে। আমি তার সহযোগী-সম্পাদক এবং পত্রিকাটিতে 'তৃতীয় মত' নামে একটি কলাম লিখি। কলামটি মোটামুটি পাঠক প্রিয়। নিন্দা-প্রশংসা দুইই প্রচুর পরিমাণে পাই।

'আওয়াজ' তখন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রেস বিক্রি করে দিয়েছি। শরৎগুপ্ত রোড থেকে বাসা গুটিয়ে অভয় দাস লেনে কামরুন্নাহার স্কুলের পাশে নতুন বাসায় উঠেছি। এই সময় আমার এক আত্মীয় জানালেন, ধানমন্ডিতে কিছু প্রাইভেট জমি আছে। তারা কিনতে যাচ্ছেন। আমিও যদি তাদের সঙ্গে যোগ দেই, তাহলে প্রত্যেকের ভাগে ছ'সাত কাঠা করে জমি পড়বে। এই জমিতে হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন থেকে লোন নিয়ে চমৎকার বাড়ী বানানো যাবে।

খবরটা শুনে আমার স্ত্রী বায়না ধরলেন এই জমি কিনতেই হবে। জমির দাম শুনে আমার চক্ষু চড়ক গাছে। এত টাকা আমি কোথায় পাবো ? স্ত্রী বললেন, তিনি তার মায়ের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার করবেন। জমি তিনি নিজেই কিনবেন। আমি যেন তাকে পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করে দেই ।

কিন্তু এই পাঁচ হাজার টাকাই বা আমি কোথায় পাই? তখনকার পাঁচ হাজার টাকা এখন লাখ টাকার সমান। বেতন পাই 'পূর্বদেশে' মাসে বারোশ' টাকা। তখন সেটাই ছিল আমার বয়সী সাংবাদিকদের সর্বোচ্চ বেতন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ঠিক করলাম, জীবনে দ্বিতীয় বারের মতো চিত্তরঞ্জন সাহার সাহায্য প্রার্থী হব।

চিত্তবাবু তখন ফরাসগঞ্জের বিরাট ভবনে বসেন। এটাই পুঁথিঘর ও মুক্তধারার হেড অফিস। তার বাসভবনও। টেলিফোন করতেই বললেন, সন্ধ্যায় আসুন। আপনার বৌদি বলেছেন, আজ রাতে আমাদের এখানে দু'টো ডালভাত খেয়ে যাবেন।

ঃ না, না, কোনো খাওয়া-দাওয়া নয়। আমি আসছি আপনার কাছে একটা বড় সাহায্য পাওয়ার জন্য।

চিত্তবাবু দমলেন না। বললেন, সাহায্য.চাইতে এলে কি খাওয়া-দাওয়া করতে নেই?

অগত্যা তার নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে হলো।

রাতে বৌদি খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। চিত্ত বাবুর মতোই ফর্সা গায়ের রং। স্বামীর মতোই হাসিখুশি। তাদের জীবনে যে একটা গোপন দুঃখ আছে, তখন তা আমি জানতাম না। বৌদির কোনো সন্তান নেই। এই দুঃখ তারা চমৎকার হাসি আর প্রাণবন্ত কথাবার্তা দ্বারা ঢেকে রাখতেন। কাউকে বুঝতে দিতেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পর চিত্তবাবু যখন মুখে পানের খিলি পুরেছেন (তিনি বেশ পান খান) তখন আমার জমি কেনার পরিকল্পনা এবং পাঁচ হাজার টাকা যে দরকার, সে

কথা জানালাম। মনে সংশয় ছিল, তখনকার দিনে এটা বিরাট অংকের টাকা। তিনি ঋণ হিসেবে দিতে রাজি হবেন কি না?

চিত্তবাবু বললেন, টাকা আপনাকে আমি দেব। তবে ঋণ হিসেবে নয়। কয়েকটা বই আমাকে দেবেন।

ভয় পেলাম। বই দিয়ে আর কয় টাকা পাব? তখনকার দিনে যত বড় লেখকই হোন, প্রকাশক পান্ডুলিপি নিয়ে একশ' দু'শ টাকার বেশি অগ্রিম দিতেন না। বলতেন বই আগে বাজারে চলে কিনা দেখি। চললে আপনার রয়ালটি পাবেন। তা ছাড়া আমার হাতে কোনো পান্ডুলপিও তখন নেই। সে কথা চিত্ত বাবুকে জানালাম।

চিত্তবাবু আমাকে অভয় দিলেন, আপনার হাতে পান্ডুলিপি নেই। কিন্তু আপনার প্রচুর লেখা এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। 'পূর্বদেশের' তৃতীয় মতের লেখাগুলো দিয়ে একটা চমৎকার সংকলন করা যায়। লেখাগুলো আমার খুবই ভালো লাগছে। তা ছাড়া আপনার লেখা অনেক গল্প দেখেছি বিভিন্ন কাগজে। সেগুলো সংগ্রহ করে একটা গল্পগ্রন্থ হয়। বাজারে আপনার যে বই আউট-অব-প্রিন্ট হয়ে গেছে, তারও একটি দু'টি আমাকে দিতে পারেন।

তার কথা শুনে তেমন উৎসাহ পেলাম না। হিসেব করে দেখলাম, তাকে তিনটি বইয়ের বেশি দিতে পারি না। একটি 'তৃতীয় মতের' প্রবন্ধ সংকলন, দ্বিতীয়টি বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত ছোট গল্পগুলোর একটি সংকলন এবং বাজারে আউট-অব-প্রিন্ট 'সম্রাটের ছবি' গল্প গ্রন্থটি। এটি প্রথম ছেপেছিলেন 'সমকাল' প্রকাশনী থেকে সিকান্দার আবু জাফর । বইটি তখন বাজারে ছিল না। জাফর ভাই বইটি আর ছাপেননি। এ ছাড়া আরো একটি বই বের করা যেতো। ঢাকার ইতিহাস ও প্রবাদ–কাহিনী নিয়ে লেখা 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' সিরিজের কাহিনীগুলোর সংকলন। ষাটের দশকের গোড়ায় সিরিজটি 'আজাদে' বেরিয়েছিল। কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি কপি সংগ্রহ করা কষ্টকর।

মনে মনে হিসাব করে দেখলাম, এই তিনটা বইয়ের জন্য আমার একজন বন্ধুবৎসল প্রকাশকও আমাকে অগ্রিম পাঁচ সাতশ' টাকার বেশি দেবেন না। কপিরাইট বিক্রি করলে হাজার, দেড়-হাজার টাকা পেতে পারি। এখন উপায়?

চিত্ত বাবুকে সমস্যাটি খোলাখুলি বলতেই তিনি বললেন, অত হিসেব করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার হিসেবের সম্পর্ক নয়। আপনি আমাকে তিনটি বই-ই দিন। কপিরাইট দিতে হবে না। আমি আপনাকে অগ্রিম তিন হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস হয়নি। তাই চুপ করে ছিলাম। পরে যখন আবার কথাটি বললেন, তখন বিশ্বাস হল। তবু দ্বিধা গেল না। বললাম, আমার টাকার

দরকার দু'একদিনের মধ্যে। পাভুলিপিতো কোনো বইয়েরই তৈরি নেই। তৈরি করতে অন্ততঃ দু'সপ্তাহ লাগবে। শুধু 'সম্রাটের ছবির' একটা কপি আপনাকে এখন দিতে পারি।

চিত্তবাবু বললেন, পাণ্ডুলিপি নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি কাল আপনার বাসায় আসছি। 'পুর্বদেশের' কপি নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে। যেসব কাগজে আপনার গল্প ছাপা হয়েছে, তার কপিও নিশ্চয় আছে। আপনি শুধু আপনার কাগজপত্রের সেই স্তূপ আমাকে দেখিয়ে দেবেন। আমিই সব বেছে বের করবো। তারপর কেটেকুটে কাগজে সেঁটে পাণ্ডুলিপি সাজানোর ভারও আমার উপর ছেড়ে দিন।

আমি তবু নিশ্চিন্ত হলাম না।

চিত্তবাবু যা ব্যস্ত মানুষ। তিনি কি কাল আমার বাসায় আসবেন? তিন হাজার টাকা এক সঙ্গে দেবেন? না, সাত দিন পরে দেবেন? এদিকে জমি রেজিষ্ট্রি করার সময় হাতে আছে মাত্র আর তিন দিন। আমার সঙ্গে আর যারা কিনছেন, তাদের সকলের টাকা রেডি।

পরদিন অভয় দাস লেনের বাসায় বসে অস্থির মনে প্রহর গুণছি, দুপুরের দিকে চিত্তবাবু এসে হাজির। বললেন, কই, আপনার কাগজ পত্রের স্তূপ কই?

আমি সেই স্তূপ দেখালাম, যা ঘাঁটার সাহস আমারও ছিল না।

চিত্তবাবু ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যে প্রচুর কাগজপত্র ঘেঁটে 'তৃতীয় মতের' গোটা পনর লেখা উদ্ধার করলেন, গল্পও বেরুলো দশ-বারোটি। পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, দু'টো বইতো হয়ে যাবেই। দিন এবার 'সম্রাটের ছবি' বইটির কপি।

বইটি আমার নতুন কেনা বুক শেলফে ছিল। এক কপি মাত্র বই। শিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীরের আঁকা প্রচ্ছদ। বইটি চিত্তবাবুকে দিলাম।

আমার স্ত্রী চা এনে দিলেন। চিত্তবাবু চা খেতে খেতে পকেট থেকে নগদ তিন হাজার টাকাই বের করলেন। বললেন, জমিটা কিনে ফেলুন। দেরি করবেন না। এই নিন টাকা।

হাত পেতে টাকাটা নিলাম। মনের উদ্বেগ দূর হল। বললাম, আপনাকে টাকাটার একটা রসিদ দেব?

চিত্তবাবু আমার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, আপনার হাতটাই আমার রসিদ। কাগজের রসিদ দিয়ে কি করবো? আপনি লিখুন। আপনার কাছ থেকে আরো বই চাই।

আঠারো

ধানমণ্ডিতে আমার স্ত্রীর জমি কেনা হয়ে গেল। রায়ের বাজারের একেবারে লাগোয়া জমি। জেলা রেজিস্ট্রারের অফিসে জমি রেজিস্ট্রিও হয়ে গেল। দু'এক দিনের মধ্যে হাতে দলিল পাব। ঠিক এই সময় আকস্মিকভাবে পাকিস্তানের ফৌজি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আহূত পাকিস্তানের নবনির্ব পার্লামেন্টের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা বাংলাদেশ (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) গর্জে উঠলো। শুরু হল শেখ মুজিবের আহবানে ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন। তারপর এলো পঁচিশে মার্চের (১৯৭১) সেই অভিশপ্ত রাত্রি। পাকিস্তানী হানাদারদের গণ হত্যাযজ্ঞের সূচনার রাত।

এখানে পুরোন এবং বহু বর্ণিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করবো না। কয়েকদিনের আতঙ্ক ও বিভীষিকার পর শহরে কারফিউ বলবৎ রাখার সময় যখন ধীরে ধীরে শিথিল হল, মানুষজনও নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে কারফিউ শিথিল রাখার কয়েক ঘন্টার সময়ে রাস্তায় বেরুতে শুরু করলো, তখন একদিন আমার এক আত্মীয় রেজা তাদের গুলশানের বাড়ি থেকে পুরনো ঢাকায় আমার বাসায় এসে হাজির। রেজার বাবা গোলাম কাদের সাহেব ছিলেন ধনী এবং প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। রেজার শ্বশুর আবদুল মতিন ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা (বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি পদে থাকাকালেই তার মৃত্যু হয়)। এই পরিবারের উচ্চমহলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আমি তখনো হাটখোলার কাছে, কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলের পাশে অভয় দাস লেনের ভাড়াটে বাসায় আছি। সেদিন সকালে ঘন্টা দুয়েকের জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছে। রেজা সেই সুযোগে গুলশান থেকে ছুটে এসেছেন আমার বাসায়।

আমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে তখন বরিশালে আমার শ্বশুরের গ্রামের বাড়িতে। অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই তারা বেড়াতে গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। শহরের বাসায় একা থাকি। প্রতিবেশী এক বন্ধুর স্ত্রী দুটো রেঁধে খাওয়ান। দিনে-রাত্রে ঘরে দরোজা বন্ধ রেখে ফ্লাট বাড়ির অন্যান্য প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটাই। চারদিকে মাঝে মাঝেই আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ। বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার দৃশ্য। জীবনটাকে তখন মনে হচ্ছিল, ইস্কুলে পাঠ্য বইয়ে পড়া কবিতার পংক্তির মতো–"আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর।" ভয় কাটানোর অমোঘ ওষুধ হিসেবে আমরা তখন বেছে নিয়েছিলাম দরোজা বন্ধ ঘরে সকলে একত্রে বসে আড্ডা দেওয়া। খাওয়া-দাওয়াও হতো এক সঙ্গে, একান্নবর্তী পরিবারের মতো।

সেদিন ঘন্টা দুয়েকের জন্য কারফিউ শিথিল হতেই আড্ডার বন্ধুরা প্রয়োজনে এদিক ওদিক ছুটলেন। আমি একা বাসায় বসে বুকসেলফ থেকে একটা পুরনো

ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি। শহরে কোন সংবাদপত্র নেই। দু'একটি যা থাকছে, মিলিটারি অথরিটির ভয়ে বা নির্দেশে খুবই ছোট আকারে বেরোয়। সেগুলোও শহরের সব জায়গায় ডিষ্ট্রিবিউট হয় না। জনজীবন একেবারেই অচল। আমি তখন ভাবছিলাম, ঢাকা–বরিশালের পথে একটা দু'টো লঞ্চ চলাচল শুরু হলেই স্ত্রী ছেলেমেয়ের কাছে গ্রামে চলে যাব। আমার খবর না জেনে এবং ঢাকা শহরের খবর শুনে তারা নিশ্চয়ই এখন খুব উদ্বিগ্ন।

ঠিক এই সময় রেজা এসে উপস্থিত। বললেন, ভাই একটা কথা বলবো।

আমি উদ্বিগ্নভাবে তার দিকে তাকালাম। রেজা বললেন, আপনি গ্রামে চলে যান। না পারলে এ বাড়ি থেকে কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিয়ে থাকুন।

তার মনের কথা আঁচ করতে পেরেও জিজ্ঞাসা করলাম–কেন?

রেজা মুখ ভার করে বললেন, সব কথা আমিও জানতে পারি না।তবে যেটুকু জেনেছি, তাতে বলতে পারি, অধ্যাপক, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের নামের নতুন লিষ্টি ওরা তৈরি করছে।

ওরা কারা, তা বুঝতে দেরি হল না। পঁচিশে মার্চের রাত্রে এত ক'জন বুদ্ধিজীবীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেও তাদের রক্তের তৃষা মেটেনি। ভয়ে ভয়ে বললাম, আমিতো কেউকেটা কেউ নই। আমাকেও কি ওরা খুঁজছে?

রেজা বললেন, আমার খবর তাই বলে। আপনি আজ রাত্রেই এ বাসা ছাড়ুন।

রেজা চলে গেলেন। ঠিক করলাম, আজ রাতটা পাশের কোন ফ্লাটে গিয়ে কাটাবো। কালই খবর নেব, সদরঘাটের লঞ্চঘাট থেকে কোন লঞ্চ চলাচল করে কি না! যদি না করে, বাসে চড়ে বা কোন বন্ধুর গাড়িতে আরিচাঘাট পর্যন্ত লিফট দিয়ে নদী পেরিয়ে বরিশালের দিকে যাবার চেষ্টা করবো। তাতে যদি দশ-বারো মাইল করে রোজ হাঁটতে হয় হাঁটবো।

তখন কারফিউ এবং ব্ল্যাক আউটের রাত। হেভি মিলিটারি ট্রাফিক ছাড়া ঢাকা শহরে আর কোন গাড়ি বা রিকশা চলাচলের শব্দ নেই। রূপকথার বিরান রাক্ষসপুরীর গল্প পড়েছিলাম। ঢাকা যেন এখন সেই বিরান রাক্ষসপুরী। রাতটা আতঙ্কে আশঙ্কায়, ঘুমে, আচ্ছন্নতায়, কখনো বা জেগে থেকে কোনভাবে কাটলো। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঠিক করলাম, খুবই সামান্য কাপড়-চোপড় পুটুলির মতো বেঁধে রাখবো। যাতে দীর্ঘ পথ হাঁটতে হলে ক্লান্ত না হই। পুটুলিটা সঙ্গেই রাখবো। যেন সুযোগ পেলেই ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও রওয়ানা হতে পারি।

পুটুলিটা বেঁধে শোওয়ার ঘরে রেখে দিলাম। কারফিউ ঘন্টা দুয়েকের জন্য উঠে গেলেই লঞ্চঘাটে গিয়ে দেখবো, কোনো লঞ্চ বরিশাল অথবা ফরিদপুরের দিকে যায় কি না। যদি যায় চোখ বুজে উঠে পড়বো। ফরিদপুরে গিয়ে পৌছতে পারলেও

সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বরিশালের দিকে রওয়ানা হতে পারবো। লোকের কাছে খবর শুনেছি, বরিশাল ও ফরিদপুর তখন পর্যন্ত মুক্ত এলাকা।

নিজেই এক কাপ চা বানিয়ে খেয়ে রওয়ানা হবার উদ্যোগ নিলাম। গোপনে বাসাটা ছাড়বো। বাড়িওয়ালাকেও কথাটা জানাবো না। তাহলে হয়তো চারদিকে রটে যাবে। বাসার বিভিন্ন ঘরে ঢুকে আমার চোখে পানি এলো। চারদিকে আমার ছেলেমেয়ের পড়ার বই, খেলনা ছড়ানো। আমার স্ত্রীর কাপড়-জামা, অন্যান্য জিনিস, যেখানে যেমনটি গুছিয়ে রেখে গেছেন,সেখানে তেমনটি আছে। টেলিফোনটি মৃতকণ্ঠ। পঁচিশে মার্চ রাতে মিলিটারিরাই শহরের অধিকাংশ টেলিফোন লাইন কেটে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ বিদ্রোহী বাঙালিরা যাতে নিজেদের মধ্যে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। তখনো টেবিলে আমার লেখার কাগজ, বইপত্র যেমন আছে, তেমনি রইলো। বসার ঘরের দেয়াল থেকে মিলিটারির ভয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবিটা আগেই সরিয়ে রেখেছিলাম। ফজলুল হকের ছবিটা রয়েছে। সেটার ফ্রেমে ও কাঁচে ধুলো জমেছে।

দরোজায় হঠাৎ নক্ হল। সতর্কভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—কে? এখন দরোজায় নক্ হলেই খুলে দেই না। হঠাৎ যদি মিলিটারি আসে! পেছনের দরোজা দিয়ে, দেয়াল টপকে পালাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আজ পালাতে হল না। দ্বিতীয় বার দরোজায় নক হতেই শব্দ ভেসে এলো, আমি মুস্তাফিজ।

নিশ্চিন্ত মনে দরোজা খুলে দিলাম। মুস্তাফিজুর রহমান আমার খুবই পরিচিত। তারও বাড়ি বরিশালে। স্ত্রী নয়ন রহমান তখন ঢাকার কাগজে গল্প লেখক হিসেবে মোটামুটি পরিচিতি অর্জন করেছেন। মুস্তাফিজ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর উচ্চপদে চাকরি করতেন। তখন সম্ভবতঃ ছিলেন হাবিব ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর জোনাল ম্যানেজার। ঢাকার রাস্তায় দামি গাড়ি হাঁকাতেন।

সেদিন মুস্তাফিজকে দেখে নিশ্চিন্ত মনে দরোজা খুলে দেয়ার আরো একটি কারণ ছিল। তখন মুস্তাফিজ ছিলেন ঘোর আওয়ামী লীগ বিদ্বেষী। তার রাজনৈতিক মত আমি পছন্দ করতাম না। কিন্তু ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে মিশতাম। পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রির পর থেকে তার বন্ধুত্ব আমার কাছে এক বিরাট ভরসার মতো হয়ে উঠলো। কারফিউ উঠে গেলে প্রায়ই মুস্তাফিজ তার গাড়ি নিয়ে আমার বাসায় আসতেন। তার গাড়িতে শহরে ঘুরে বেড়াতাম। পাশ দিয়ে রাইফেল-তাক-করা পাকিস্তানী সৈন্য-ভর্তি গাড়ি চলাচল করতো। মুস্তাফিজ তাতে ভয় পেতেন না। এই সময় ঢাকার রাস্তায় একটি দু'টির বেশি গাড়ি চলতে দেখা যেতো না। রিকশা তো নয়ই। মুস্তাফিজ তার গাড়ি নিয়ে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন। তার পাশে বসে আমি ভয় পেলে বলতেন, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা

নিরাপদ।' তার এই নির্ভয় ও নির্ভাবনার আসল কারণ কি ছিল, তা কখনো আমি বুঝতে পারিনি। শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, তার দ্বারা আমার কোন অনিষ্ট হবে না।

সেদিন ঘরে ঢুকেই মুস্তাফিজ প্রস্তাব দিলেন, চলুন আজ পূর্বাণী হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া যাক। আজ দু'ঘন্টার জায়গায় তিন ঘন্টা কারফিউ থাকবে না।

ঃ পূর্বাণী হোটেল কি আজ খোলা? জিজ্ঞাসা করলাম।

ঃ খোলা না থাকলে আমরা গেলেই খুলবে। মিলিটারির হুকুম, দোকানপাট, হোটেল সব খোলা রাখতে হবে।

সাহসে ভর করে তাকে বললাম, আপনার সঙ্গে 'পূর্বাণীতে' খেতে যাব। তবে আমার একটা উপকার করুন মুস্তাফিজ। আমি বরিশালে যেতে চাই। স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা গ্রামে রয়েছে। বহুদিন তাদের দেখি না। আমাকে আপনার গাড়িতে আরিচা ঘাটে পৌঁছে দিন। শুনেছি, আরিচা হয়ে একটু ঘোরাপথে হলেও এখনো বরিশালে যাওয়া যায়।

মুস্তাফিজ আমার কথায় বিস্ময় বা আপত্তির ভাব দেখালেন না। সদয় কণ্ঠে বললেন, কবে যেতে চান?

ঃ সম্ভব হলে আজই।

ঃ আজ নয়। পরশু চলুন। আমিও বরিশালটা একবার ঘুরে আসতে চাই। ঢাকার কাজগুলো আজকালের মধ্যে সেরে ফেলবো। তারপর পরশু চলুন। আমি সকালেই গাড়ি নিয়ে আসবো। প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, আরো দুটো রাত এই বাসায় না থেকে প্রতিবেশী কোন বন্ধুর বাসায় থাকবো। পরশু সকালে মুস্তাফিজ এলেই ঢাকা ছাড়বো প্লান ঠিক করে নিশ্চিন্ত মনে তার সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। 'পূর্বাণীতে' গিয়ে পৌঁছলাম।

হোটেল ঢুকে দেখি, তার অবস্থাও বিরান রাক্ষসপুরীর মতো। মিলিটারির হুকুমে হোটেল খোলা রাখতে হবে, তাই খোলা রাখা। 'জলসা ঘরের' মতো ডাইনিং কক্ষে একজনও খদ্দের নেই। দু'জন ওয়েটার ম্লান মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমাদের দেখে কাঁধের তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে একজন ওয়েটার বলল, মেনুর কোন আইটেমই নেই স্যার। কেবল বীফ্ কারি আর প্লেইন রাইস দিতে পারি। সঙ্গে লেনটিল্‌স্ সুপ।

মুস্তাফিজ বললেন, তাই দাও।

একটু পরে খাবার পরিবেশন করা হল। কিন্তু গরুর মাংস আর মুখে ওঠে না। শহরে তখন গুজব পাকিস্তানী সৈন্যেরা যে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছে, তাদের

কারো কারো দেহের মাংস নাকি গরুর মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। এই গুজব সত্য হতে পারে না। তবু গরুর মাংস আর মুখে উঠলো না। ডালের সুপ দিয়ে ভাত খাওয়া শেষ করলাম।

মুস্তাফিজ ভাবলেন আমি দুশ্চিন্তায় কাতর। তাই খেতে পারছি না। আমাকে অভয় দেয়ার জন্যই হয়তো বললেন, এখন আর শহরে মুসলমানদের কোন ভয় নেই। এখন বেছে বেছে হিন্দুদের ধরা হচ্ছে। মিলিটারির বেশি রাগ হিন্দুদের উপর। আপনি তো চিত্ত বাবুর খবর শুনেছেন।

হঠাৎ বুকটা ধক্ করে উঠলো, কোন চিত্ত বাবু?

ঃ পুঁথিঘরের চিত্ত সাহা!

ঃ কি হয়েছে তার?

উত্তরটা কি হতে পারে অনুমান করে আমার হৃৎপিণ্ড স্থির হয়ে যাবার উপক্রম তখন।

মুস্তাফিজ বললেন, তার প্রেস, অফিস, বুক বাইণ্ডিং কারখানা সব পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

ঃ আর চিত্ত বাবু?

ঃ তাকে হয়তো ধরতে পারেনি। ধরতে পারলে তিনি বাঁচবেন না। আবার হৃৎপিণ্ড যেন সচল হলো। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, আমাকে যেন চিত্ত বাবু সম্পর্কেও কোন খারাপ খবর জানতে না হয়।

'পূর্বাণী' থেকে মুস্তাফিজুর রহমানের গাড়িতেই বাসায় ফিরে এলাম। তিনি সেদিনের মতো বিদায় হলেন। বার বার আশ্বাস দিয়ে গেলেন, পরশু সকালে কারফিউ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়ি নিয়ে চলে আসবেন। তারপর আরিচা হয়ে বরিশালে যাওয়া যায় কি না, সে চেষ্টা আমরা করবো। পরে জেনেছিলাম, সদরঘাট থেকে তখনো লঞ্চ চলাচল শুরু হয়নি।

পরদিন ঢাকা শহরটা ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত। আমাদের পাড়াতেও ছিল মিলিটারি জিপের কম আনাগোনা। সকালে কারফিউ ওঠার পর নিজের ঘরে ফিরে এলাম। সবে চায়ের পানি চড়িয়েছি, দরোজায় আগের দিনের মতো নক। তাহলে মুস্তাফিজ কি আজই আরিচায় রওয়ানা হতে চান? সতর্কতার সঙ্গে দরোজা খুললাম। দেখি, দরোজার সামনে উদ্‌ভ্রান্তভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চিত্তরঞ্জন সাহা। পুঁথিঘর ও মুক্তধারার চিত্তবাবু।

দরোজা খুলতেই তিনি ঘরে ঢুকলেন। সোফার উপরে বসে পড়ে বললেন, আমার প্রেস, বাইণ্ডিং কারখানা বইয়ের গুদাম ঘর সব পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আপনার বইয়ের পাণ্ডুলিপিগুলোও নেই। অনেক লেখকের পাণ্ডুলিপি ছিল, সব পুড়ে ছাই হয়ে

গেছে।

বললাম, পাণ্ডুলিপি গেছে যাক, আপনি বেঁচে আছেন, তাতেই আমি খুশি।

চিত্তবাবু বললেন, আপনার কাছে এসেছি পরামর্শের জন্য। ভাবছি, লোকজন সংগ্রহ করে প্রেসের মালামাল যদি কিছু পুড়ে না গিয়ে থাকে, সেগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করি। ফরাসগঞ্জের অফিসটা খোলা রাখার ব্যবস্থা করি।

চকিতে মনে পড়লো আমার সম্পর্কে রেজার সতর্কীকরণ, চিত্তবাবু সম্পর্কে মুস্তাফিজের মন্তব্য।

দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, চিত্তদা, আপনি এখন আর ফরাসগঞ্জে ফিরে যাবেন না। বৌদি যেখানেই থাকুন, তাকে একটা বোরখা পরিয়ে সঙ্গে নিন। আজই আপনি বর্ডারর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

চিত্তবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি কোথায় যাবো?

ঃ বর্ডার পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতায় এবং আজই। এখনই আপনি রওয়ানা দিন।

চিত্তবাবু বিভ্রান্তভাবে একবার আমার দিকে তাকালেন? বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন, তাই যাবো। আপনার কথাই মেনে নিলাম। আমি যাচ্ছি।

চিত্তবাবুর গায়ে সাদা পাঞ্জাবি, পরনে সাদা পাজমা। বললাম, একটু দাঁড়ান।

শোবার ঘরে গিয়ে আমার ঈদের দিনে মাথায় দেয়ার কিসতি টুপিটা নিয়ে এলাম। চিত্তবাবুর মাথায় পরিয়ে দিয়ে বললাম, চিত্তদা, আসুন। যদি দু'জনেই বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে।

অভয় দাস লেনে আমার ভাড়াটে বাড়ির সামনে সরু গলিপথ দিয়ে হেঁটে চিত্তবাবু বড় রাস্তায় উঠে মিলিয়ে গেলেন। আমি নীচু কণ্ঠে নিজেকে শুনিয়ে শুধু বললাম, চিত্তদা, আমাদের কি কখনো আবার দেখা হবে?

উনিশ

চিত্তরঞ্জন সাহার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে, এটা ছিল সম্ভবতঃ আমার ভাগ্যলিপি। প্রায় সাড়ে-তিন মাস পর তার সঙ্গে আমার দেখা হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং ভিন্নস্থানে। এই দেখা হওয়ার আগের কাহিনীটুকু আগে বলে নিই।

বন্ধু মুস্তাফিজুর রহমান একাত্তরের এপ্রিলের সেই নির্দিষ্ট দিনটিতে সকালেই তার গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন আমার বাসায়। আমি লুঙ্গি, টুপি, তোয়ালে, টুথ পেস্ট ও টুথ ব্রাশ একটা পুঁটুলিতে বেঁধে তার গাড়িতে উঠেছিলাম। কিন্তু আরিচা পর্যন্ত

আমাদের যাওয়া হয়নি। অর্ধেক পথে গিয়ে শুনলাম, পদ্মায় ফেরি পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে। হানাদার বাহিনী নদীপথ অবরোধ করেছে। সুতরাং ঢাকায় ফিরে আসতে হলো।

সদরঘাটের লঞ্চঘাট থেকে দু'একটা ছোট লঞ্চ যাতয়াত শুরু করতেই দু'একবারের ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে একদিন (১৭ এপ্রিল, ১৯৭১) ফরিদপুরগামী একটা লঞ্চে ওঠার সুযোগ পেলাম। মুস্তাফিজ অবশ্য আমার সঙ্গে ছিলেন না। মেঘনা বক্ষে প্রচণ্ড তুফান, ফরিদপুরের একটা গঞ্জে পৌঁছে প্রথম মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তে দেখা; তারপর বরিশালে পৌঁছেই হানাদার বাহিনীর প্রচণ্ড বিমান হামলার মুখে নিশ্চিত মৃত্যুর থাবা এড়িয়ে কিভাবে শেষ পর্যন্ত গ্রামে গিয়ে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম এবং তাদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে এসেছিলাম, সে কাহিনী এখানে বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক। চিত্তবাবুর কথায় ফিরে যাই।

১৯৭১ সালের পয়লা জুন আমি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঢাকা থেকে পালাই। কুমিল্লায় এক রাত কাটিয়ে বর্ডারে সোনামুড়ায় উপস্থিত হই। সেখান থেকে আগরতলায়। আগরতলায় গোটা জুন মাস কাটিয়ে জুলাই মাসের গোড়ায় কলকাতায়। সম্পূর্ণ শূণ্য হাতে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। বন্ধু সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ খবর পেয়ে সৈয়দ আলী আহসানের তত্ত্বাবধানে গঠিত বুদ্ধিজীবী সাহায্য সংস্থা থেকে পাঁচশ' ভারতীয় রূপি সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। সাপ্তাহিক 'জয়বাংলা' কাগজ এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলাম, দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর কলাম লেখার অফার পেলাম।

সবইতো হলো। কিন্তু পরিবার পরিজন নিয়ে কলকাতার মতো শহরে থাকার জায়গা কোথায়? বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ শরণার্থী এসে কলকাতা ভরে ফেলেছে। আমার মতো সাহিত্যিক সাংবাদিকের সংখ্যাও কম নয়। কলকাতার মুসলমানপাড়া পার্ক সার্কাসে আর ঠাঁই নেই। হিন্দু পাড়ায় মুসলমান পরিবারকে কি আশ্রয় দেয়া হবে?

আশ্রয় সমস্যারও সমাধান হলো। ঢাকার পাইওনিয়ার প্রেসের আব্দুল মোহাইমেন সাহেব তখন আওয়ামী লীগের সাংসদ (প্রাদেশিক না জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তা মনে পড়ছে না)। তিনি তখন কলকাতায়। তার আত্মীয় নোয়াখালীর আরেকজন সাংসদ আব্দুর রশীদ স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতায় বাসা খুঁজছেন। বাসা একটি পাওয়া গেল শিয়ালদা ষ্টেশনের সামনে 'প্রাচী' সিনেমা হলের পিছনে ডিকসন লেনের গলিতে। এই ডিকসন লেনেই এক সময় বাংলার (অবিভক্ত বাংলা) কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'দৈনিক স্বাধীনতার' অফিস ছিল। এই

ডিকসন লেনের কাছেই থাকতেন কমরেড সোমনাথ লাহিড়ি। একাত্তর সালেও তিনি জীবিত ছিলেন এবং তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সকলের কাকাবাবু কমরেড মোজাফফর আহমদও তখন জীবিত ছিলেন।

মোহাইমেন সাহেব এই ডিকসন লেনেই একটি তেতলা বাড়ির দোতলায় একটি ফ্লাট জোগাড় করলেন। ভাড়া মাসে আড়াইশ' টাকা। আমাদের কারো পক্ষেই তখন মাসে আড়াইশ' টাকা ভাড়া দেয়ার সামর্থ্য নেই। মোহাইমেন সাহেব প্রস্তাব দিলেন রশীদ সাহেবের সঙ্গে আমাদের ফ্লাট শেয়ারিং-এর। দু'টি শোবার ঘরের একটি রশীদ সাহেব নিলেন. অন্যটি আমি। অর্থাৎ এই একটি ঘরেই স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে যে করে হোক মাথা গুঁজে থাকতে হবে। ড্রয়িং রুমে আমার শ্যালক হারুন, ভাই আসাদ চৌধুরী থাকবেন। কিচেন-বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যতই অসুবিধাজনক হোক তখন এই ব্যবস্থাই ছিল আমাদের জন্য স্বর্গ হাতে পাওয়া।

আগরতলা থেকে কলকাতায় আসার সময় সঙ্গে সম্বল ছিল একটি সতরঞ্চি, একটি মোটা চাদর, দু'টি বালিশ এবং একটি মশারী। মাটিতে সতরঞ্চি পেতে সেই ছোট মশারীর মধ্যে ছেলেমেয়েকে রেখে বাইরে মাদুর বিছিয়ে আমার ও স্ত্রীর শোয়ার ব্যবস্থা। মশারী নেই। আলো জ্বালিয়ে রেখেও মশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেলো না। ঢাকার 'জামায়াতী মশার' চাইতে কলকাতার 'আনন্দ মার্গী মশা' যে কম হিংস্র এবং কম রক্তলোলুপ নয়, তা কয়েকদিনের মধ্যে বোঝা গেল। শক্ত ফ্লোরে শুয়ে পিঠে ব্যথা করতে শুরু করলো। ফ্লাটটি ছিল আন-ফার্নিশড্। চেয়ার-টেবিলও ছিল না। কিছু এলুমিনিয়ামের হাড়িকুড়ি, কড়াই, ফ্রাইপেন, থালাবাসন কিনে দুই পরিবারের রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। এভাবে বেশি দিন চলে না। হাতে টাকাও নেই যে, মশারি, খাট, চেয়ার, টেবিলের ব্যবস্থা করবো। আমার আয় উপার্জন লিখে। 'যুগান্তর,' 'জয়বাংলা' কাগজের জন্য কলাম; স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে হয়। আমি শুয়ে বা উপুড় হয়ে লিখতে পারি না। একটি চেয়ার ও টেবিলের অভাবে ঘরে বসে আমার লেখাজোকার উপায় রইলো না।

ঠিক এই সময় মেঘ না চাইতে জল। সময়টা জুলাই মাসের শেষ কিংবা আগষ্ট মাসের প্রথম দিক। ট্রামে চেপে সম্ভবতঃ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (এখন বিধান সরণী) পার হচ্ছিলাম। যাত্রীদের ভিড়ে আমি ট্রামের ভিতরে রড ধরে ঝুলছিলাম। গরমে সেদ্ধ হচ্ছি। একটা স্টপেজে এসে ভিড় একটু কমতেই একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এলো – 'গাফফার সাহেব না ?'

চকিতে মুখ ফিরিয়ে দেখি, আমার সামনে ট্রামের সীটে চিত্তরঞ্জন সাহা বসে আছেন। ঠোঁট পান-রাঙা। পাঞ্জাবি-পাজামা শোভিত শরীর। মাথায় অবশ্য টুপি

নেই। পরম আত্মীয়ের মতো হেসে বললেন, সীট খালি হয়েছে। এখানে বসুন।

তার পাশে বসলাম। চিত্তবাবু বললেন, আপনি যে বর্ডার ক্রস করেছেন, তা আকাশ বাণীর খবরেই শুনেছি। কোথায় উঠেছেন, কেমন আছেন?

তাকে সংক্ষেপে আমার বর্তমান অবস্থা জানালাম।

চিত্তবাবু বললেন, এখন কোথায় যাচ্ছেন?

ঃমানিকতলায়। সেখানে অরুনিমা প্রেস নামে একটি ছাপাখানা আছে। 'জয়বাংলা' পত্রিকাটি এখন 'আর্থিক জগৎ' প্রেসে ছাপা হয়। তাদের ছাপা ভালো নয়। অরুনিমা প্রেসে 'জয়বাংলা' ছাপানো যায় কিনা, তা নিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে।

চিত্তবাবু বললেন, এটা কি খুবই জরুরী? আজই কি অরুনিমা প্রেসে না গেলে নয়? আগামীকাল গেলে হয় না ?

বললামঃ কেন?

চিত্তবাবু বললেন, আপনাকে আমার ডেরায় নিয়ে যেতাম। আমি এখানেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বইপত্র প্রকাশের জন্য মুক্তধারা প্রকাশনার একটি অফিস খুলেছি। পুঁথিপত্র নামেও এখানে একটি প্রকাশনা সংস্থা আছে। আমার এক দাদা চালান। আপনাকে সব কিছু দেখাবো।

বললামঃ বেশতো চলুন। এখনতো সকাল। বিকেলে না হয় অরুনিমা প্রেসে যাব। চিত্তবাবু বললেন, আজ অরুনিমা প্রেসে যাওয়ার প্রোগ্রাম বাদ দিন। বিকেলে আপনার অন্যকাজ আছে।

সবিস্ময়ে বললাম, কি কাজ? চিত্তবাবু রহস্যময় হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুললেন, সেটা সময়মতো জানবেন।

ট্রাম থেকে নেমে চিত্তবাবুর সঙ্গে একটা গলির মুখে ঢুকলাম। সেখানেই পুঁথিপত্রের ঘর। দোতলায় ঢাকার মতোই একটা ঘরে চিত্তবাবুর বসার ব্যবস্থা হয়েছে। চা সিঙ্গারা মিষ্টি এলো। চিত্তবাবু চা খেতে খেতে বললেন, ঢাকায় সেদিন আপনার কথা না শুনলে প্রাণে মারা যেতাম। আপনার কথা শোনার পর আর এক মুহূর্ত দেরি করিনি। নোয়াখালি হয়ে বর্ডার পেরুনোর জন্য যাত্রা করেছি। আপনার বৌদিকেও সঙ্গে আনতে পেরেছি।

বললাম, আপনি বেঁচে আছেন, ভালো আছেন দেখে খুশি হয়েছি। হানাদারদের হাতে ধরা পড়লে আর সকলের মতো আপনাকেও তারা হত্যা করতো।

চিত্তবাবু বললেন, বেঁচে যখন আছি, তখন দেশের প্রতি কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে চাই। বন্দুক হাতে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হতে পারবো না। কিন্তু আপনারা যারা কলম হাতে মুক্তিযুদ্ধে নেমেছেন তাদের সাহায্য জোগানো আমাদের মতো

মানুষের দায়িত্ব।

বলেই ড্রয়ার টেনে একটি ইশতাহার বের করলেন। মুক্তধারার প্রচারপত্র। বললেন,আমার প্রথম প্রোজেক্ট হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি বড় বই প্রকাশ করা। নাম হবে 'রক্তাক্ত বাংলা।' আরেকটি বই, দেশ থেকে যেসব সাহিত্যিক মুজিব নগরে চলে এসেছেন, মুক্তিযুদ্ধের উপর তাদের লেখা নিয়ে সংকলন। বইটির নাম আপনি ঠিক করবেন এবং আপনিই সম্পাদনা করবেন। প্রত্যেক লেখককে এই দু'টি বইয়ে লেখার জন্য টাকা দেওয়া হবে।

চিত্তবাবুর তর সয় না। আমি আগেও দেখেছি, সিদ্ধান্ত নিলে তিনি এক মুহূর্তও কোনো ব্যাপারে দেরি করতে চান না। সেদিনও 'পুঁথিপত্রে' বসিয়েই মুক্তধারার দ্বিতীয় বইটিরও নাম ঠিক করতে হলো। নাম "বাংলাদেশ কথা কয়।" সাহিত্যিক এবং ছায়াছবির পরিচালক জহির রায়হানও তখন কলকাতায় চলে এসেছেন। ঠিক হলো, তাকেও এই বইয়ের সম্পাদনার কাজে যুক্ত করা হবে। চিত্তবাবু তখনই এই দুই বইয়ের কাজের বাবত একটি মোটা অংকের টাকা অগ্রিম হিসেবে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, খালি হাতে বৌদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে শরণার্থী হিসেবে কলকাতায় এসেছেন। এই টাকাটা হাতে রাখুন। যখন যা দরকার হয় দেবো।

তখনই মনে মনে ঠিক করলাম, এই টাকা দিয়ে আজই একটা মশারি এবং দু'টো চৌকি কেনার ব্যবস্থা করবো। অপ্রত্যাশিতভাবে টাকাটা পাওয়ায় মনে মনে চিত্তবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞ হলাম। নিজেকেই নিজে বললাম, তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কোনোদিন শোধ হওয়ার নয়।

কলকাতার সবকিছু আমার সহ্য হয়। কিন্তু বিকেল থেকে তার আকাশে কালো কুয়াশার মতো যে ধোঁয়াশা দেখা দেয়, তা আমার সহ্য হয় না। কলকারখানার চিমনি থেকে উদ্‌গত ধূমে নাকি এই ধোঁয়াশার জন্ম। শীত গ্রীষ্ম বারো মাস কলকাতার সন্ধ্যার আকাশ এই ধোঁয়াশা ঢেকে রাখে। চিত্তবাবুর সঙ্গে সেদিন দুপুরে ভাত খেতে হলো। তারপর লম্বা আড্ডা। বেশিরভাগ দেশের কথা। বাংলাদেশ কি হানাদারমুক্ত হবে? যদি হয় কতদিনে? কবে আমরা দেশে ফিরতে পারবো? ভারত সরকার কি সত্যি সত্যি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবেন? যদি দেন, কতদিনে দেবেন?

বিকেল হওয়ার—অর্থাৎ কলকাতার আকাশে ধোঁয়াশা দেখা দেয়ার আগেই চিত্তবাবুর কাছে বিদায় চাইলাম। আজ আর মানিকতলায় যাবো না। বরং বাসায় ফিরে গিয়ে মশারী আর চৌকি কেনার চেষ্টা করতে হবে। চিত্তবাবুর কাছে বিদায় চাইতেই তিনি বললেন, এখনই কোথায় যাবেন? আপনাকে নিয়ে আমাকে আরেক জায়গায়

যেতে হবে।

ঃ কোথায়?

ঃ চলুন, দেখবেন।

আরেক প্রস্থ চা পানের পর আমরা বেরুলাম। এবার চিত্ত বাবুর সঙ্গে পুঁথিপত্রের এক কর্মচারী। আবার ট্রামে। তারপর সম্ভবত কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট পেরিয়ে এক ফার্নিচার পাড়ায়। চারদিকে শুধু ফার্নিচার আর তোষক লেপ্ বালিশের দোকান। চিত্তবাবু বললেন, মাটিতে বেশিদিন ঘুমুলে আপনি, বৌদি, ছেলেমেয়ে সকলেই অসুস্থ হবেন। যেভাবে আছেন শুনলাম, সেভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। যদি কলকাতায় পার্মানেন্ট থাকতেন তাহলে কিছু ফার্নিচার কিনে দিতাম। কিন্তু বেশিদিনতো আমরা থাকবো না। দেশে ফিরে যাব। সেজন্য কিছু ফার্নিচার, তোষক, বালিশ ভাড়া নিয়ে দিচ্ছি। ওরাই ডেলিভারি দিয়ে আসবে আপনার বাসায়। আবার যখন দেশে ফিরে যাবেন, তখন ওদের জানালে ওরাই ফেরত নিয়ে যাবে।

আমার পকেটে টাকা আছে। তাই সাহস করে বললাম ঃ কত টাকা দিতে হবে?

চিত্তবাবুর সেই রহস্যময় হাসির অর্থ এতক্ষণে বুঝলাম। বললেন, ছ'মাসের ভাড়ার টাকা ওদের এডভান্স দেয়া হয়ে গেছে। আপনি খাট, চেয়ার, টেবিলগুলো পছন্দ করে দিন। বাকি কাজ পুঁথিপত্রের এই লোকটি করবে।

সেই সন্ধ্যায় বহুদিন পর প্রফুল্ল মনে বাড়ি ফিরেছি। ফেরার পথে বৌ বাজার থেকে একটা মশারীও কিনেছি।

তখন থেকে প্রায়ই 'পুঁথিপত্রে' যাই। 'রক্তাক্ত বাংলা' 'বাংলাদেশ কথা কয়' বই দু'টির লেখা সংগ্রহ, সম্পাদানা, প্রুফ দেখার কাজে ব্যস্ত থাকি। আমাকে সাহায্য করার জন্য জহির রায়হানও এসে জুটলেন। তাছাড়া আমার আত্মীয় কবি আসাদ চৌধুরীতো সঙ্গে ছিলই। পুঁথিপত্রের কর্ণধার ছিলেন চিত্তবাবুর এক জ্ঞাতিভ্রাতা। লম্বা গ্রীসীয় চেহারা। সুদর্শন ঋজু মূর্তি। নাম অচ্যুত সাহা। চিত্তবাবুর চেয়ে বয়সে বড়। চিত্তবাবু তাকে ডাকতেন, দাদা। সুতরাং আমরাও ডাকতে শুরু করলাম, দাদা।

কোনো শিক্ষক নন, ভাষাতাত্ত্বিক নন। কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানে, বিশেষ করে বাংলা ভাষায় এই অচ্যুতদার বিস্ময়কর দখল দেখে আমরা তাকে সমীহ করে চলতাম। শব্দের অর্থ, ব্যবহার, বানান পদ্ধতি, বাক্য গঠন ইত্যাদি নানা ব্যাপারে তিনি আমার অহংকারে আঘাত না করে বহু ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। তার কাছে আমার বহু ভুল ধরা পড়েছে এবং তা শুধরে নিয়েছি।

একদিন বিকেলে এই দাদার সঙ্গে বসে গল্প করছি, হঠাৎ পুঁথিপত্রের অফিসে চিত্তবাবুর আবির্ভাব। আমাকে দেখে বললেন, আপনাকেই মনে মনে খুঁজছিলাম।

ঃ কেন?

ঃ একটা খুশির খবর দেব।

খুশির খবরটা কি ? আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ঃ আপনার 'সম্রাটের ছবি' গল্পের বইয়ের একটা কপি পেয়েছি।

খুশি হয়ে চীৎকার করে উঠলাম,হুররে। তারপর?

ঃ এই মাসেই বইটার কলকাতা সংস্করণ বের করে দেব। দেখি এখানকার মার্কেটে আপনার বই কেমন চলে?

আনন্দে আমার মুখে আর কথা সরে না। চিত্তবাবুকে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা জানালাম। তিনি বললেন, সমকাল প্রকাশনীর এই বইটিতে মলাট এঁকেছিলেন শিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর। নতুন বইয়ের পুরোন মলাট রাখা সম্ভব নয়। আমি মলাটের নতুন ছবি আঁকতে দিয়েছি।

ঃ কাকে দিলেন?

ঃ শিল্পী কামরুল হাসানকে। আপনি খুশি?

বললামঃ আমি গর্বিত। তিনি পার্ক সার্কাসেই আছেন। আমি তার সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করবো।

চিত্তবাবু বললেন, তিনিও আপনার খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। শিল্পী খালেদ চৌধুরীর বাসায় তিনি আছেন।

সেদিন আনন্দে অধীর মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো বাসায় ফিরেছি। সর্বপ্রথম স্ত্রী সেলিমাকে দিয়েছি খবরটা–কলকাতায় আমার গল্পের বই "সম্রাটের ছবি" বেরুচ্ছে।

বিশ

কলকাতায় 'পুথিপত্র' প্রকাশনার অফিসটি ছিল এন্টোনি বাগান লেনে। ট্রাম থেকে নেমে একটু হাঁটলেই গলির মধ্যে অফিসটা। অচ্যুতানন্দ সাহা ছিলেন প্রকাশনাটির সর্বেসর্বা। ঢাকার পুঁথিঘরের চিত্তরঞ্জন সাহা তাকে খুব মান্য করতেন। আর অচ্যুৎ বাবু আমাদের অচ্যুৎদাও মান্য করার মতো লোক ছিলেন। দীর্ঘ ছয় ফুটের মতো লম্বা। রাশ ভারি। তিনি সহজেই আমার শ্রদ্ধাও ভক্তি দুইই অর্জন করেছিলেন। আমার ও জহির রায়হানের সম্পাদনায় যখন কলকাতার পুঁথিপত্র' থেকে 'বাংলাদেশ কথা কয়' বইটি বের হয়, তখন অচ্যুতদার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এই মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রথম যে বিরাট প্রামাণ্য বইটি বের হয়, তার নাম 'রক্তাক্ত বাংলা।' চিত্তবাবু ছিলেন

সম্পাদনায়। কিন্তু প্রকাশনার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান করেছেন অচ্যুত সাহা। আমি সঙ্গে যোগান দিয়েছি মাত্র।

এই সময়ের একটি ঘটনা। 'রক্তাক্ত বাংলা' প্রকাশের কাজ তখন পুরোদমে চলছে। আমি একদিন ট্রাম থেকে নেমে এন্টোনি বাগান লেনের দিকে হাটছি, গলিমুখেই দেখি একটা বাড়িতে সামনের দরোজা খোলা। বসার ঘরে খোল-করতালের আওয়াজ এবং পূজোর মন্ত্রপাঠের মতো ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কৌতূহলবশতঃ বাড়িটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। এখন পূজোর সময় নয়। তাহলে এ বাড়িতে অসময়ে পূজোর আয়োজন কেন? এ সময় বাড়ি থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। লালপেড়ে শাদা শাড়ি পরণে। মাথায় রক্তজবার মতো রঙের সিঁদুর। টকটক করছে। বয়স চল্লিশ কিম্বা তার কিছু উপরে হবে। সুন্দর স্লিম শরীর। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন। আমি লজ্জা পেয়ে চলতে শুরু করবো, তিনি ডাক দিলেন, ও ভাই, শুনছেন? তার কথায় স্পষ্ট পূর্ববঙ্গীয় টান। আমি দাঁড়ালাম। তিনি আমার কাছে এসে এক মুহূর্ত আমাকে দেখে নিয়ে বললেন, আপনি জয় বাংলার লোক?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। সত্তরের দশকের এই শুরুর সময়টাতে কলকাতায় অনেকেই পূর্ববাংলা বা বাংলাদেশ না বলে তখনকার পূর্বপাকিস্তানকে জয় বাংলা বলতেন। আমার পরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতেই তিনি যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, জয় শেখ মুজিব।

আমি কপালে হাত ঠেকালাম। বললাম, জয় মুজিব।

মহিলা বললেন, আমার নাম সান্তনা। সান্তনা দাশ। আজ আমরা বাড়িতে বামুন ডেকে পূজো করাচ্ছি। শেখ মুজিবের জন্য পূজো। আপনি আসুন। একটু প্রসাদ খেয়ে যাবেন।

ঃ শেখ মুজিবের জন্য পূজো? তার জন্যে পূজো কেন? বিস্মিত হয়ে বললাম।

ঃ তার মঙ্গল ও দীর্ঘজীবনের জন্য পূজো। তিনি যাতে শত্রুর কারাগারে বেঁচে থাকেন, দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন, সেজন্য ঠাকুরের কাছে আমাদের এই আকুল প্রার্থনা।

বললাম, শেখ মুজিবতো বাংলাদেশের নেতা। আপনারা তার মঙ্গল চাইতে পারেন। তার জন্য পূজো দেবেন কেন ?

সান্তনা দাশ বললেন, তিনি সকল বাঙালির নেতা। তবে তাঁর জন্য বিশেষ করে আমরা যে পূজো দিচ্ছি, তার কারণ আছে। আমার পৈত্রিক বাড়ি ফরিদপুরের গিমাডাঙ্গায়। সেখানেই আমি জন্ম নিয়েছি। বড় হয়েছি। বিয়ের পর কলকাতায় চলে এসেছি।

তখনো গিমাডাঙ্গার নাম আমি শুনিনি। তাই একটু দ্বিধার সঙ্গে বললাম,গিমাডাঙ্গা বলে যে একটি জায়গা আছে, তা আমি জানতাম না।

সান্তনা বললেন, ওমা, সে কি কথা! গিমাডাঙ্গা স্কুলেই তো বঙ্গবন্ধু লেখাপড়া করেছেন। ওই স্কুলে আমার বাবা শিক্ষকতা করতেন। আমার বাবা এখন নেই। তিনি স্বর্গারোহন করেছেন। তিনি বলতেন, মুজিব মানুষ নয়। শাপগ্রস্ত দেবতা। শাপমোচন হলেই আবার স্বর্গে ফিরে যাবে।

সান্তনা দাশের বাড়িতে ঢুকতে হলো। দেখি, পূজোর বেদীর চারপাশে ধূপধূনো জ্বলছে। বেদীর উপরে বঙ্গবন্ধুর এক বিরাট ছবি। ছবিটিতেও চন্দনের ফোঁটা। সেদিন প্রসাদ খেয়ে এবং আবার আসবো প্রতিশ্রুতি দিয়ে সান্তনা দাশ ও তার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

এরকম অন্য ঘটনাও দেখেছি। শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ঘোড়ার-পিঠে-চড়া বিরাট স্ট্যাচুর নীচে এক জটাজুটধারী বুড়ো বসে থাকতেন। লোকে বলতো, পলিটিক্যাল সন্ন্যাসী। এককালে নাকি সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন সমিতির মেম্বার ছিলেন। পরে সুভাষ বসুর ফরোয়ার্ড ব্লক দলে যোগ দেন। সুভাষ বসুকে তিনি এতোটাই ভালোবাসতেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সুভাষ বসুর মৃত্যু-খবর এলে সেই তরুণ বয়সেই তিনি পাগল হয়ে যান। সারাক্ষণ তিনি বলতেন, "তাঁর (নেতাজীর) মৃত্যু হয়নি। তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন। সময় এলেই আত্মপ্রকাশ করবেন।" কেউ যদি তার সামনে বলতো, সুভাষ বসুর মৃত্যু হয়েছে, তাকে মারতে উদ্যত হতেন। শ্যাম বাজারে সুভাষ বসুর স্ট্যাচুর নীচে একটি ঝুপড়ি বেধে বাস করতেন। পুলিশ বহুবার এই ঝুপড়ি ভেঙে দিয়েছে। তাকে নড়াতে পারেনি।

ইদানিং এই বুড়ো সন্ন্যাসী কোথা থেকে শেখ মুজিবের একটি ছবি যোগার করেছেন। সেটি একটা লাঠির মাথায় বেঁধে তিনি দিনরাত সুভাষ বসুর স্ট্যাচুর চারপাশে ঘোরেন আর চীৎকার করেন, "তিনি এসেছেন। বলেছিলাম না, সময় হলে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। এবার তিনি নাম গ্রহণ করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান।"

এন্টোনি বাগান লেনে 'পুঁথিপত্রের' অফিসে বসে একদিন দু'টি ঘটনাই অচ্যুতদাকে জানালাম। অচ্যুতদা বললেন, আপনি চিত্ত সাহাকে বলুন, সে আপনাকে একদিন কুমোরপাড়ায় নিয়ে যাক। তাহলে বাঙালি হিন্দুর ইমাজিনেসনের দৌড় দেখতে পারবেন।

ঃ তার জন্য কুমোরপাড়ায় কেন যাব?

ঃদুর্গাপূজা আসছে না? দেবীমূর্তি তৈরি হচ্ছে সেখানে। গেলেই দেখবেন, দনুজদলনী মা দূর্গা এবার অসুর বধের জন্য শেখ মুজিবের শরণাপন্ন হয়েছেন।

অচ্যুতদা বললেন।

কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

ঃ বোঝার দরকার নেই। কোনো কুমোরের বাড়ি একবার ঘুরে আসুন, তাহলেই ব্যাপারটা চোখে দেখতে পাবেন।

ভাবলাম, সময়মতো একদিন চিত্তরঞ্জন সাহাকে নিয়ে কলকাতার কোনো কুমোর পাড়ায় যাব। শেষ পর্যন্ত কুমোর পাড়ায় আমার আর যাওয়া হয়নি। যাওয়ার কথা মনেও ছিল না। দেখতে দেখতে পূজার মৌসুম এসে গেল। সার্বজনীন দূর্গা পূজা। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় পূজামন্ডপ বসানো হয়েছে। তাতে দূর্গামূর্তি। প্রত্যেকটি মন্ডপে লাউডস্পীকার লাগিয়ে রাতদিন গান চলছে। কান ঝালাপালা হওয়ায় উপক্রম।

এই সময় একদিন মৌলালির দরগার সামনে ট্রাম থেকে নামছি, কাজী সব্যসাচীর সঙ্গে দেখা। কবি নজরুল ইসলামের বড় ছেলে। যেমন বিশাল শরীর, তেমনি ভরাট গলা। এখন তিনিও প্রয়াত। কবিতা আবৃত্তিতে তখন কলকাতায় তার জুড়ি ছিল না। ঈদে ও পূজার অনুষ্ঠানে পাড়ায় পাড়ায় তাকে কবিতা আবৃত্তির জন্য ডাকা হতো। এ সময় তার আয় উপার্জনও হতো প্রচুর। তার সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কলকাতায় যেসব বড় বড় অনুষ্ঠান হতো, তাতে কাজী সব্যসাচী তার বাবার বিদ্রোহী, ভাঙার গান, কান্ডারী হুশিয়ার প্রভৃতি কবিতা আবৃত্তি করতেন। আজ আমাকে দেখেই সব্যসাচী থামলেন। কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, তিনি বৌবাজারে পূজার অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন। কবিতা আবৃত্তি করবেন। একটু থেমে হেসে বললেন, এবার বঙ্গবন্ধু আমার ভাত মেরে দিয়েছেন। বহু পূজামণ্ডপে আমার কবিতা আবৃত্তির বদলে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাজানো হচ্ছে। কলকাতার মানুষ ওই ভাষণ শোনার জন্য পাগল। আর খোদা একটি কণ্ঠও দিয়েছেন তাকে। বজ্রকণ্ঠ কাকে বলে।

সব্যসাচীর কথায় অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না। ১৯৭১ সালের শারদীয়া পূজার সময কলকাতার রাজপথে, অলিগলিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাজানো হচ্ছে শুনতে পেয়েছি। রাজপথের চলমান জনস্রোত অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সেই ভাষণ শুনেছে। সব্যসাচী বললেন, পাকিস্তানী শাসকেরা পচিশ বছর চেষ্টা করে পূর্ববাংলার বাঙালির বাঙালিত্ব হরণ করতে পারেনি; কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিরা ভারতীয়ত্বের নেশায় এতোকাল বুঁদ হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তাদেব মনেও কষাঘাত করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তোমরাও বাঙালি। তাঁর এই ভাষণটি শুনলে তাই পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিদেরও গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

সেদিন আর কথা হল না। সব্যসাচী বললেন, আগামীকাল বৌবাজারে বসুমতী

অফিসের কাছে পূজামন্ডপে আসুন। আমার কবিতা আবৃত্তি আছে। শুনছি, হেমন্ত মুখার্জিও আসবেন। তিনি গান গাইবেন। আপনিতো কাছেই শিয়ালদাতে থাকেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে একবার ঘুরে যান।

তখন কথা দিলাম না যে যাব। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার দিকে বৌবাজারের ওই পূজামন্ডপে গিয়ে হাজির হলাম। হেমন্ত মুখার্জির গানের চাইতেও আমার কাছে বড় আকর্ষণ কাজী সব্যসাচীর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি শোনা।

পূজা মন্ডপে প্রতিমা দর্শন করতে গিয়ে অবাক হলাম। দূর্গার হাতে ত্রিশূল। তিনি অসুর নিধনে উদ্যত। আর অসুরটি হচ্ছে ইয়াহিয়া। সঙ্গে সঙ্গে 'পুঁথিপত্রের' অচ্যুত সাহার কথা মনে পড়লো। বুঝতে পারলাম, তিনি কেন আমাকে একবার কুমোর পাড়া ঘুরে আসতে বলেছিলেন। শুধু বৌবাজারের পূজা মন্ডপে নয়, কলকাতার বহু পূজা মন্ডপে সেবছর অসুরের চেহারায় ইয়াহিয়ার চেহারার ছাপ দেখা গেছে।

এন্টনী বাগান লেনে 'পুঁথিপত্রের' অফিসে বসে কলকাতার পূজায় সেবারের বৈশিষ্ট্যের কথাই একদিন আলোচনা করছিলাম। চিত্তরঞ্জন সাহা বললেন, বাঙালি হিন্দুর বহুকালের স্বদেশ-চেতনা বাংলা ভাগ হওয়ার ফলে খন্ডিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মনে দুঃখ ছিল। এতদিন সেই দুঃখের প্রকাশ ঘটেনি। এখন শেখ মুজিবের মধ্যে তারা সেই স্বদেশ-চেতনা ফিরে পেয়েছে বলে মনে করছে। সেজন্যই জয়বাংলা শ্লোগান, শেখ মুজিবকে নিয়ে তাদের এতো মাতামাতি। এর মধ্যে রাজনৈতিক বাস্তবতার চাইতে উচ্ছ্বাস আবেগ বেশী।

চিত্তবাবু ঠিকই বুঝেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ নিয়ে পশ্চিম বঙ্গের বাঙালি হিন্দুর এই উচ্ছ্বাস খুব বেশিদিন টেকেনি। রাজনৈতিক বাস্তবতা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেঃ

"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
মধ্যিখানে চর
সেই চরেতে শুয়ে আছে
মস্ত অজগর।
অজগরের বিষের লাভা
আকাশ করে কালো-
সূর্য্য বলে কোথায় গেলো
কোথায় আমার আলো?"

১৯৭১সালের ১৬ ডিসেম্বর। বাংলাদেশ হানাদার-মুক্ত হল। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার যেসব বন্ধুবান্ধব দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন, তারা আবার দেশে

ফিরে গেলেন। আমি কলকাতায় একেবারে একা হয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী তখন হাসপাতালে। সন্তান হবে। তাকে হাসপাতালে একা রেখে আমি দেশে যেতে পারি না। আমার সঙ্গে ডিকসন লেনের একই বাসায় ছিলেন নোয়াখালি থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের পার্লামেন্ট সদস্য আবদুর রশীদ সাহেব। তিনিও স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে ঢাকায় পাড়ি দিলেন। কলকাতায় আমার আর মন টেকে না। এই সময় চিত্তবাবু অভয় দিলেন, আপনি ঘাবড়াবেন না। আমি আরো কিছুদিন কলকাতায় আছি।

আমার মেয়ে ইন্দিরার জন্ম হল দশই জানুয়ারি তারিখে কলকাতার বালিগঞ্জ নার্সিং হোমে। ওই একই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় ফিরলেন। চিত্তবাবু বিকেলের দিকে ইন্দিরাকে দেখতে এলেন। বললেন, দেশ স্বাধীন। বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছেন। ভালোয় ভালোয় আপনার মেয়েও জন্ম নিয়েছে। চলুন, এবার আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যাই।

মনে আছে, আমার সারা শরীরে ওই কথায় বিদ্যুৎ চমক তৈরি হয়েছিল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, আমরা এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমরা আবার বাঙালি। বললাম, চিত্তদা, এখন সারা বুড়িগঙ্গার তীর জুড়ে, সারা ঢাকা জুড়ে, সারা দেশ জুড়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে, তাই না?

চিত্তসাহা বললেন, বুড়িগঙ্গার পারেই তো ফরাশগঞ্জ। আর সেখানেই আমাদের পুঁথিঘর, মুক্তধারার দোকান। নিশ্চয়ই সেখানেও এখন জয়বাংলার পতাকা উড়ছে।

শেষ